তলস্তয় রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদক

অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
সোমেন পাল
রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
রিফ্লেক্ট প্রিন্টার্স
৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

বাঁধাই :
আনন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৩৬, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

কুড়ি টাকা

অনুগ্রহ করে এটা পড়ুন

প্রিয় পাঠক, অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের একটি কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ইদানিং বহু বিশ্বখ্যাত লেখকের বই যে বাংলায় প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন; এবং নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রশংসনীয় উদ্যম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সুযোগে কোনও কোনও অসাধু প্রকাশক পাঠক-পাঠিকাদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে 'সমগ্র রচনাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মূল রচনার ৫০ শতাংশই মাঝে মাঝে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বিশ্ব সাহিত্যের মহান রচনাগুলির মূলের রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তারা যেন বাজার চলতি অন্যান্য রচনাবলীগুলি দেখে আমাদের বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করে নেন।

আমরা বিশেষ জোরের সঙ্গে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমাদের রচনাবলীতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই মূল রচনার হুবহু অনুবাদ। অনুবাদক কিংবা সম্পাদক কোনক্ষেত্রেই মূল রচনার একটি লাইনকেও কেটে বাদ দেবার মত ধৃষ্টতা দেখাননি। যদি কোন পাঠক আমাদের প্রকাশিত বইগুলিতে কোথাও একটি লাইনও কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে দেখাতে পারেন, তা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বইয়ের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব।

একটি অনুরোধ: অনুগ্রহ করে বইটি পড়ার পর অনুবাদ, সম্পাদনা এবং অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আপনার মতামত যদি আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হব। —প্রকাশক।

আমাদের প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলী

শেকস্‌পীয়র রচনাবলী
মাক্সিম গোর্কি রচনাবলী
মপাসাঁ রচনাবলী
দস্তয়েভস্কি রচনাবলী
ডিকেন্স রচনাবলী
চেকভ রচনাবলী
বঙ্গদর্শন

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

॥ দুর্ধর্ষ আদিম মানুষ ॥

কথাটা তুর্গেনেভের : ত্রোগলোদাইৎ। অর্থাৎ, গুহাবাসী দুর্ধর্ষ আদিম মানুষ। আর গোর্কির সাথে নিবিড় আলোচনায় লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, 'কী বিরাট পর্বত!'

অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের পর, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের অনতিকাল পরেই রুশজাতির সুমহান সাহিত্যিকদের যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার একেবারে শুরুতেই ছিল তলস্তয়ের নাম। 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকাটা ছিল ঠিক এরকম :

(১) তলস্তয় (২) দস্তয়েভস্কি (৩) লেরমন্তভ (৪) পুশকিন (৫) গোগোল (৬) র‍্যাডিশ্চেভ (৭) বেলিনস্কি……ইত্যাদি (ইজভেস্তিয়া, ২রা অগস্ট, ১৯১৮)

এই তালিকায় শিল্পীদের নাম যে কেবলমাত্র গুরুত্বের ভিত্তিতে পরপর সাজানো হয়েছিল এরকমটা ভাবার বিশেষ কোন কারণ নেই। তবু যে সর্বাগ্রে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছিল সেটাই হচ্ছে বিপুল ব্যঞ্জনাময়। শিল্পীর জীবনাবসানের পর লেনিনকে একই সাথে তাঁর শিল্পী সত্তার পক্ষে অন্যদিকে তলস্তয়বাদ নামক স্থবির দর্শনের বিপক্ষে কলম ধরতে হয়েছিল। 'নাশা জারায়া' পত্রিকার ১০ম সংখ্যায় ভি বাজারভের তলস্তয় সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; সেই প্রবন্ধে তিনি তলস্তয়ের মধ্যে 'বিশুদ্ধ মানবীয়' গুণাবলী আবিষ্কার করেছিলেন ; আর লেনিন দেখিয়েছিলেন প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্তিম আর্তনাদ। এমন যে শিল্পী, একটা গোটা যুগ যাঁর লেখায় ভাস্বর, তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে, সত্তার জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর স্ববিরোধ নিয়ে বহুবিধ প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। রোমান্টিক তুর্গেনেভের সাথে ঘরোয়া কথাবার্তায় (একবার তুর্গেনেভের পাণ্ডুলিপি শোনার সময় তলস্তয় টেনে ঘুম দিয়েছিলেন, আরেকবার যখন তিনি তাঁর কাছে মেয়ের প্রশংসা করছিলেন তখন তলস্তয় অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক মন্তব্য করেছিলেন। ফলতঃ এই দুই শিল্পী সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে কখনও বন্ধুত্ব নিবিড় কিংবা স্থায়ী হয়নি।) তলস্তয়ের একরোখা মেজাজ কতবার ফেটে পড়েছে। যে কোন মহৎ শিল্পীর কুলজী বিচারে বসলেই আমাদের দুটো বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। প্রথমতঃ, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা ; তাঁর যুগ ; দ্বিতীয়তঃ, সেই মানুষটির ব্যক্তি সত্তা—তাঁর আশৈশব জীবন। এ যেন আলো আর বাতাস—যা কিনা জীব জগতের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য দুটি শর্ত। আর আছে শীতল জল—যা তার সারা জীবনের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে তিরতির করে বয়ে চলে।

'এখানে, রাশিয়ায় সবকিছুই একেবারে ওলোটপালোট হয়ে গেছে এবং সবেমাত্র একটা আকার নিতে শুরু করেছে।' 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে লেভিনের এই বক্তব্যই তলস্তয়ের উপলব্ধি, তাঁর যুগের বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ প্রধান

দিক। তলস্তয় সম্পর্কে তুর্গেনেভ এবং লেনিনের বক্তব্যের সারটুকু পেতে হলে যে মৃত্তিকায় এই বিশাল মহীরুহের জন্ম সেই রাশিয়াকে বোঝা একান্ত জরুরী।

তলস্তয়ের শিল্পী জীবনের প্রত্যুষ, ভূমিদাস প্রথার আদিম জটাজালে আবদ্ধ রাশিয়ার আকাশ। যদিও সার্ফ প্রথা তখন ক্ষীয়মান, তবু তা কিঞ্চিৎমাত্রায় বলবৎ ছিল। ১৮৬১—১৯০৫ রাশিয়ার এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটকালেই সাহিত্যিক হিসেবে লিওর আবির্ভাব। তলস্তয়ের পটভূমি হিসেবে আমরা এই নির্দিষ্ট সময়টাই বেছে নেব। গোটা রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের কোষে কোষে তখন ভূমিদাসতন্ত্রের জীবাণু জাতির হৃদপিণ্ড কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদ বিকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ এই যুগ। তখনও পর্যন্ত চাষবাসের কাজ সর্বশান্ত কৃষকের হাতেই ন্যস্ত। ১৮৬১ সালে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে ভূমিদাসদের বরাদ্দ প্রাপ্য জমি হ্রাস করা হল। পুরনো ভূমিদাসপ্রথার বরাদ্দ জমিতে কৃষকরা আদিম পদ্ধতিতে চাষ করে চলেছে। ১৮৬১-র আগে পর্যন্ত কাঠের লাঙল আর নিজেদের ঘোড়া দিয়ে তাদের চাষ করতে হত, বেগার খাটতে হত জমিদারদের জন্যে। ১৮৬১ সালের পর থেকেই এই প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভাঙন শুরু হয়ে যায়; পাশ্চাত্যের দ্রুতগতিতা এশীয় স্থবিরতার মূলে এসে আঘাত করতে থাকে। অবহেলিত কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত ভাঙন থেকে বাঁচতে, দুখানা রুটির জন্যে, কাজের জন্যে কৃষকরা ছুটে আসতে থাকে শহরের দিকে। আর এই শস্তার শ্রম দিয়ে রেলগাড়ি চলা শুরু হয়, ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে থাকে কল-কারখানা।

প্রাচীন স্থবির রাশিয়ার এই দ্রুত ভাঙন ও আকস্মিক বিপর্যয়ই তলস্তয়ের শিল্পকর্মের বিপুল প্রেরণা। যদিও তাঁর কাছে এ প্রেরণা এসেছে নেতির দিক থেকে—ভাঙনের ট্রাজিক উপলব্ধিতে, জমি থেকে উৎখাত কৃষকের ছিন্নমূল যন্ত্রণায়। ফলতঃ যে মূল্যবোধে তিনি ভাবিত তার অধিকাংশই মানব জীবনের মূর্ত আদিম প্রশ্ন। কৃষিভিত্তিক সমাজে জমির মরণ টান; আর সে কারণেই তিনি আদিম।

অতঃপর তাঁর শিল্প সৃষ্টির সাফল্য আর বেদনার অন্বেষণের জন্য তাঁর জীবনের এক ঝলক দ্রুত পরিক্রমা আবশ্যক।

তাতিয়ানা মাসি তো ছেলের অমন কুৎসিত মুখখানা দেখে বিশ্বাসই করে বসলেন যে এ ছেলের বিয়ে আর হবে না। প্রকাণ্ড নাক, পিটপিটে ধূসর চোখ আর মোটা পুরু ঠোঁট। মা একদিন বলেছিলেন 'নিকোলেনকা, 'তোমার মুখের জন্যে কেউ তোমাকে ভালবাসবে না।' বেদনার্ত বালক তখন ঈশ্বরের কাছে সৌন্দর্য কামনা করেছিল সমস্ত পার্থিব সুখের বিনিময়ে। পরবর্তীকালে সেই সৌন্দর্যের স্বাদ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পের পর্বে পর্বে। স্ত্রী সোফিয়া এই উদ্দাম মানুষটির সাথে তাল রাখতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠতেন। তাছাড়া তিনি বয়েসেও তলস্তয়ের থেকে ষোল বছরের ছোট ছিলেন। বিয়ের সময় তার বয়েস ছিল মাত্র আঠার। ওদিকে বনেদী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ, সৈন্যবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোত, মদ, বেশ্যা আর জুয়ো খেলায় চোস্ত তলস্তয় তখন সত্যিই একজন আদিম এবং কিঞ্চিৎ দুর্ধর্ষ মানুষও বটে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সেবাস্তোপোলে তিনি জান দিয়ে লড়েছিলেন। সেখানকার দুর্গের ফলকে আজও তাঁর নাম খোদাই করা আছে। ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি টানও তারমধ্যে তখন খুব একটা কম নয়; অথচ সেই মানুষটিই শৈশবে একদিন পোষা শিকারী কুকুরটাকে গুলি করে হত্যা

করতে দেখে মনে মনে ব্যথিত হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে।

'জবানবন্দী'র প্রথম লাইনটাই হল: 'আমি খ্রীষ্টীয় মতবাদে দীক্ষিত হয়ে এক গোড়া পরিবারে বড় হয়ে উঠেছি।' তবু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্নে তারমধ্যে এক বিরাট টানাপোড়েন ছিল। তোতা পাখির মত শেখানো ধর্মীয় তত্ত্ব আর নিরস নিরর্থক প্রার্থনার রেশ আঠার বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পাঠ্যক্রম শেষ করার পর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। উপরন্তু এগার বছর বয়েসেই একদিন বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভালাদিমির মিলিউতিন এবং তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন তার অভিনব আবিষ্কারের কথা: ঈশ্বর বলে কিছুই নেই: এসব নিতান্তই মানুষের মগজের ফসল। অপরদিকে ছিল বড় ভাই দিমিত্রি; তিনি নিয়মিত উপোস করতেন আর পরিবারের সকলের সাথে তলস্তয়ও তাকে 'পীরবাবা' বলে ডাকতেন। তবু অন্তরের অন্তস্থলে ছিল বিস্ময়। দিমিত্রির অসাধারণ নিষ্ঠাই ছিল তার জন্মদাতা; আর ছিল ভবঘুরে গ্রিশা—যার গলায় ঝুলত মস্ত শিকলি আঁটা ক্রুশ। ঈশ্বরের কাছে তিনি যখন আকুল প্রার্থনায় শত্রু মিত্র সকলের মঙ্গল কামনা করতেন তখন ছোট্ট তলস্তয়ের বুক তোলপাড় করে জেগে উঠত হাজার প্রশ্ন। পরবর্তী জীবনে ইতি আর নেতির এই সংঘাত মূর্তরূপ ধারণ করে তার মধ্যে একদিকে তিনি তখন ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত 'নৈতিক আত্মশুদ্ধিতে' বিশ্বাসী, অন্যদিকে আলপাকার আলখাল্লা পরনে পাদ্রী আর যাজকদের বিরুদ্ধে তার রোষের অন্ত নেই। গির্জা আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মিথ্যাচার, লোভলালসার বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনায় মুখর তিনি।

আশ্চর্য, যৌবনের মধ্যাহ্নে এই মানুষটিই গর্ভবতী সোফিয়ার কথা বিস্মৃত হয়ে অন্য এক রমণীর প্রতি কামনায় সাবা দেহে এঁকেছিলেন আদিম জ্বরের বিকার: আর পরবর্তী জীবনে সেই তিনিই ঘোষণা করেছিলেন: 'এখন নৈতিক আত্মশুদ্ধিতে ব্রতী হয়েছি, আমি আর মাংস খাইনা, খাই ভাতের মণ্ড।'

স্পেনসার আর রুশোর ভক্ত এই জমিদার জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী, তবে তিনি চান জমিদার আর কৃষকের মধ্যে প্রাচীন মধুরতম সম্পর্ক বিরাজ করুক। 'পুনরুজ্জীবন, উপন্যাসের নায়ক নেখল্যুদভও তাই চান। ফলতঃ অত্যন্ত কম খাজনায় কৃষকদের ভেতর জমি বাটোয়ারা করে দেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর সাথে তার বিবাদও মূলতঃ দুটো কারণে। এক, তার প্রথম জীবনের মাত্রাতিরিক্ত আদিম প্রবৃত্তি, কামনার অন্ধ ঘোর; দুই, পরবর্তী জীবনে জমি বিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। শেষকালে তলস্তয় অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেন। নিজের কথায় আত্মিকশুদ্ধির মহাযজ্ঞে নিমজ্জিত হন। খ্রীষ্টের আবেশে লালিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র থেকে শুরু করে পাদ্রী পর্যন্ত কাউকেই তিনি রেহাই দেননি। লেনিনের কথায়: 'এক উদভ্রান্ত জমিদার' কিন্তু এক 'মহান শিল্পী'। আর অন্তিম মুহূর্তে যে মানুষটি নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী বার্ধক্যের বারাণসী, গৃহ ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে পুনরায় চড়াই ঠেলে এগোতে চান সে মানুষ তো দুর্ধর্ষ বটেই। যদিও ধ্যান-ধারণা আর প্রবৃত্তির দিক থেকে তিনি ছিলেন সত্যিই আদিম, যিনি পুঁজিতান্ত্রিক রাশিয়াকে বুঝতে পারেননি। তখন তা বোঝা সম্ভবও ছিল না। আবার আমরা তাই সেখানটাতেই ফিরে যেতে পারি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম: ত্রোগলোদাইৎ। জমিই হল তার প্রাণ,

তার আদিম শক্তি, যেখানে ফুল ফোটে, ফসল ফলে। কিন্তু শক্তিশালী দুটো দুর্ধর্ষ হাত না থাকলে মাটি কখনোই কথা বলে না।

।। তুলা থেকে সেভাস্তোপোল ।।

ইয়াসনায়া পলিয়ানায় প্রথম বুক ভরে পৃথিবীর বাতাস নেন তলস্তয়। অগস্ট মাসের ১৮ তারিখ, সাল ১৮২৮। শৈশবেই বাবা মা দুজনকে হারান। বাবার থেকে মার প্রতিই বেশি টান বোধ করতেন তিনি। নিজের জীবনস্মৃতি মূলক লেখা 'শৈশব-এ' মার স্মৃতি রোমন্থনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বারবার। অতি শৈশবের সেই স্মৃতি এতই অস্পষ্ট আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে কিছুতেই জননীর স্নেহসিক্ত মুখখানি তার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে না। ব্যর্থতার জ্বালা জন্ম দেয় বেদনাবিধুর আকুলতার। শক্ত-সমর্থ খরচে মানুষ বাবার কথা ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে স্মৃতি কথায়। শিকারী মানুষটির পোষা একদঙ্গল শিকারী কুকুরের কর্কশ ডাক চলনে-বলনে আভিজাত্য আর অহং বোধের অদ্ভুত প্রকাশ নিয়ে বাবার স্মৃতির সাথে কেমন করে যেন জড়িয়ে গেছে।

ইয়াসনায়ার কাছেপিঠেই 'তুলা'। তলস্তয়ের ঠাকুরদার জমিদারি ছিল তুলাতে। আজ সেই শহরের নাম তো অতিশয় পরিচিত। শিল্পীর জীবনের প্রথমাংশ এখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ে উঠেছে। নানান লেখায় তিনি বারবার ফিরে গেছেন তুলায়। কতবার যে অস্থিরস্মৃতিচারণায় তুলা তাঁকে অঢেল শান্তি দিয়েছে তার হিসেব নেই। বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন জমিদারি, আর মার দিক থেকেও জমিদারির ভাণ্ডার শূন্য ছিল না। বনেদী জমিদার পরিবার বলতে যা বোঝায় তারা ছিলেন তাই। 'কাউন্ট' শব্দটা আসলে একটা উপাধি : আমাদের দেশের রাজা, রায়বাহাদুরের মতই। এই খেতাব প্রথম পান তলস্তয়ের পূর্বপুরুষ পিটার আন্দ্রেইভিচ। তখন সম্রাট পিটারের আমল। সম্রাটের ছেলে ছিলেন একরোখা, ঘোর পিতৃবিদ্বেষী ; তিনি সম্রাটের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ সংঘটিত করেন, কিন্তু বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার দরুণ দেশ ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন বিদেশে। এই অবাধ্য পুত্রকে বশীভূত করা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তলস্তয়ের পূর্বপুরুষ পিটার আন্দ্রেইভিচের ওপর। তিনি তার সাফল্যের সম্মান পান সম্রাটের কাছে 'কাউন্ট' উপাধিতে। সেই থেকেই 'কাউন্ট' চলে আসছে আভিজাত্যের মুকুট নিয়ে। দস্তয়েভস্কি তো একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেই ছিলেন যে তলস্তয় লেখার জন্যে যে প্রচুর পরিমাণ টাকা পান তারজন্যে তার আভিজাত্য আর 'কাউন্ট' পদবিটার অবদান খুব কম নয়। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, সারা জীবনে প্রচুর লিখে জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দস্তয়েভস্কির অভাব কখনও ঘোচেনি।

ছোট বেলায় অদ্ভুত গৃহ শিক্ষক কার্লের কাছে বিস্ময়ের ঘোড়া ছুটিয়ে পড়াশুনো বেশ চলছিল। তখন থেকেই কার্ল, নিকোলাই (বড়ভাই), গ্রিশা ইত্যাদি চরিত্রগুলো শিশু শিল্পীর মনে রেখাপাত করতে থাকে। তখন থেকেই তিনি তাদের প্রকৃতি, মানসিকতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির আঁচড় পড়ে নিতে সচেষ্ট হন। সার্থক চরিত্র সৃষ্টির যে সাফল্য তিনি উপন্যাস এবং গল্প দাবি করতে পারেন তা দেখার চোখ তখনই শানিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন তিনি।

এরই মধ্যে শিকার আর বনভোজনের ভেতর দিয়ে জীবন এগিয়ে চলল তরতর করে। বাবার মর্জিতে তল্পিতল্পা নিয়ে মস্কো যেতে হল লেখাপড়ার জন্যে।

ততদিনে শিকার, হুল্লোড় আর অভিজাত জীবনের চোরাবালি ঘূর্ণির মত পাক দিয়ে ভবিষ্যতের 'ঋষি'কে (প্রসঙ্গত বলা ভাল, এদেশে তলস্তয়ের এই ঋষি চরিত্রই বেশি করে প্রচারিত হয়েছে; প্রতিবাদী, সত্যানুসন্ধানী, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী তলস্তয়কে আমরা অনেক কম চিনি। এমনকি তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব যে ভোগসর্বস্ব হেডোনিষ্ট ভাবধারার অনুকূলে কেটেছে তার জ্ঞানও নেই বললেই চলে। আমরা জানি না সেই মানুষটিকে, যিনি জার সরকারের বিচার ব্যবস্থার প্রধান দিক মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন।) ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মদের বুদবুদে, পতিতার কামনাতাড়িত চোখের নীলতারায়। পড়াশুনার পাঠ চুলোয় যাওয়ার দাখিল। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি: জুয়ো খেলে, মদ খেয়ে, মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে, মুঠোমুঠো টাকা উড়িয়ে ধারে জড়িয়ে গেছেন। একেবারে 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাসের নায়ক নেখলুদভের মতই সব শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্ররাজির মধ্যে এভাবেই হয়ত অণুতে অণুতে মিশে থাকেন শিল্পী নিজে, তাঁর মানসিকতা। নেখলুদভেরও পুনর্জন্ম ঘটেছিল আত্মশুদ্ধির একনিষ্ঠ প্রক্রিয়ায়। তলস্তয়ের মানবের প্রতি এই যে ঐশ্বরিক বিশ্বাস—অর্থাৎ শ্রেণীধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যেই বিরাজিত ভালত্বের পরমব্রহ্ম, তার উৎপত্তি সম্ভবত নিজের জীবন থেকেই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চোরা বান কাটিয়ে সত্যিই পরবর্তীকালে তিনি ভেসে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন অভিজাত রাশিয়া এবং ব্যক্তি নেখল্যুদভের পতন আর জাগরণের সুবিপুল কাহিনীই 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাসের মূল বিষয়। ব্যক্তি মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব এবং সামাজিক অবিচারের প্রশ্নও সেখানে যথাযথ তীক্ষ্ণতায় উপস্থিত। উপস্থিত মেয়ে ভোলানো বিচারক, মিথ্যাচারী উকিল আর মূর্তি হাতে পবিত্র যাজকের দল—যারা পাগলের মত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে বিকট চিৎকারে। রাশিয়া ভ্রমণকালে এই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) লিখেছেন: 'আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন হচ্ছিল তলস্তয়ের রিসারেকশান। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না।' [সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ।]

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে সম্ভবতঃ। তলস্তয়ের শৈশবের স্নিগ্ধ দীপল ছায়া নিয়ে আমরা এক লাফে এসে গেলাম যৌবনের ঘোড়ার ক্ষুরে, উন্মত্ত কামনায়, আবার তারপরেই সুনিপুণ তীক্ষ্ণ মন বিশ্লেষণী লেখা 'পুনরুজ্জীবন' প্রসঙ্গে। তবে প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বোধ হয় সরিনি একচুলও। কারণ ব্যক্তি তলস্তয়কে বোঝার একটা প্রয়াস এবং তাঁর শিল্পকর্মে কিভাবে তা প্রতিভাত হয়েছে, কিভাবেই বা গড়ে উঠল তলস্তয়বাদ এ সবই আমাদের অন্বেষণের অন্তর্গত। রাধিকার প্রাক যৌবন পর্ব এবং ভরাট যৌবনের অন্তর্বর্তীকাল সম্পর্কে বিদ্যাপতির বর্ণনা: 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল'। এক্ষেত্রেও শৈশবের পরিবেশ; শিশু তলস্তয়ের খরগোশ শিকার এবং বাবার নির্দেশ—'যতক্ষণ না একটা খরগোশ ধরতে পারছ আমাকে মুখ দেখাবে না'র ফলশ্রুতি: খরগোশের ছবি আঁকার চেষ্টা, পরবর্তী যুগের 'ভাল্লুক শিকার' গল্প এবং সাহসী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা। দিদিমার বিবাহ বার্ষিক দিবস উদযাপনের দিনই তলস্তয়ের শিল্প চর্চার হাতে খড়ি। কথা হচ্ছিল উপহার নিয়ে: কে কি উপহার দেবে দিদিমাকে। বড়দা দেবেন

ছবি। শিশু তলস্তয় অনেক ভেবে-চিন্তে বসে গেলেন কবিতা লিখতে। আকস্মিক উৎসবের যদি বা লেখা হল তারপর তো আর এগোয় না। সুতরাং শুরু হল কবিতা পড়া, অনুকরণ এবং শেষে জন্ম নিল একটা গোটা কবিতা। শিল্প চর্চার এই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণের এই ঝোঁক একান্তই স্বাভাবিক।

যাইহোক আগের কথায় ফিরে যাওয়াই সমুচিত। যৌবনের মত্তগর্ব আর স্পর্ধায় এবং বেহিসেবী জীবনের টানে ভাসতে ভাসতে তিনি গিয়ে ভিড়লেন সেনাবাহিনীতে। তৎকালীন রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশ সন্তানই সেনাবাহিনীতে নাম লেখাত। রাজ পরিবারের নৈকট্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা আর মধ্যযুগীয় নাইট-মার্কা মানসিকতাই তার প্রেরণা যোগাত। যথারীতি এমত অবস্থায় তলস্তয়ও পিটার্সবুর্গের সেনাবাহিনীতে গিয়ে নাম লেখালেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন বদলি হয়ে এলেন সেভাস্তোপোলে। যুদ্ধের রোমান্টিক আকর্ষণ আর পিতৃভূমি রক্ষার দৃঢ়পণ বুকে নিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেদিন তোপের মুখে দাঁড়িয়ে যুঝে চললেন। অচিরেই যুদ্ধ সংক্রান্ত রোমান্টিক ধ্যান ধারণা দ্রুত ভেঙে যেতে লাগল। ভাঙতে লাগল পুরনো ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন বীর সেনাপতিদের যুদ্ধ জয়ের উপাখ্যানের প্রতি বিশ্বাস। এসব কথা আরও পরে তাঁর লেখা 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে ঘনীভূত রূপ পেয়েছে। বার্নার্ড শ যুদ্ধকে দেখিয়েছেন রোমান্টিক বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে (অস্ত্র ও মানুষ), যেখানে একজন সৈনিক কার্তুজের থলেতে চকলেট ভরে রাখে; আর তলস্তয় যুদ্ধকে বিশাল এক ক্যানভাসে এঁকেছেন,—গোটা একটা জাতি, দল আর জনতার পরিপ্রেক্ষিতে।

একদিকে সৈন্যবাহিনীর এই বৃত্তি তাঁকে করে তুলল আরও দুর্দম, আরও কঠোর, আর যুদ্ধের বিভীষিকা তার মধ্যে জন্ম দিল ঘোর যুদ্ধ-বিদ্বেষী মনোভাব। 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের বীজ সেভাস্তোপোলের বারুদের উত্তাপেই অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রথমে তা পাতা মেলে সেভাস্তোপোলের গল্পে। ইতিমধ্যে নানান টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর পাঠও তাঁর চুকে গেছে।

।। ধূসর পাণ্ডুলিপি ।।

কবিতা লিখেছিলেন কবে সেই শৈশবের নিথর শান্ত আবহাওয়ায়। তারপর ভল্গার বুক দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে সময়ের আঁচড় কেটে। দুরন্ত যৌবন, কাজান বিশ্ববিদ্যালয় আর সৈন্যবাহিনীর হাতছানি অপরিণত মানুষটিকে দোটানায় ফেলে দেয়। পড়াশুনো ভাল লাগত না এক ফোঁটা; কতবার তো ছেড়েই দিয়েছিলেন। বাবা মা দুজনই ছেড়ে গেছেন মানুষটিকে সেই কোন প্রাচীনকালে, তা আর স্মরণেও নেই। তবু স্নেহ ছিল শীতল ছায়া ছড়িয়ে তাতিয়ানা মাসির নিবিড় আশ্রয়।

যৌথ পরিবারের সমস্ত লক্ষণই তলস্তয়ের পরিবারে উপস্থিত ছিল। বিধবা তাতিয়ানা মাসি সেই পরিবারের আপনজন। তিনিই লিওর একমাত্র নির্ভরস্থল। আপনমনে বিড়বিড় করে কত গল্পই না তাকে শুনিয়েছেন :...সেই যে স্ফটিকের প্রাসাদ, সুন্দরী কন্যার স্বপ্ন। পাগলরুক্ষু ছেলেটি তাতিয়ানার চোখের মণি। ভবঘুরে হয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন মাসিই তাকে বললেন : কিছুই যখন ভাল লাগেনা তখন গল্প লিখলেই তো পারিস।

গল্প! গল্প! সত্যিই তো বুকের ভেতর কত গল্প জমে আছে, একবার তাদের মুক্তি দিলেই তো হয়। আবছা আবছা বাবার মুখ, কাতেনকার সাদা দাড়

সব কিছু তার মনে পড়ে।

ওদিকে তখন 'সমসাময়িক' পত্রিকায় ডিকেন্সের 'ডেভিডকপার ফিল্ড'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ ছাপা হচ্ছে। সম্ভবতঃ 'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েই নিজের জীবনের ছেলেবেলার কথা ফুটিয়ে তোলার ঐকান্তিক সাধ জাগে তাঁর মনে; অন্যদিকে ছিল তাতিয়ানা মাসির অনুপ্রেরণা। বেদনাবিধুর আনন্দ আর রোমান্সের নিটোল শৈশব কথা বসে উঠল তাঁর জীবন স্মৃতি মূলক লেখা 'শৈশব-'এ। লেখা তো হল; তারপর? সমসাময়িকির দপ্তরে পাঠাবেন নাকি? আরেকবার চোখ বোলালে কেমন হয়? অবশেষে সংশয়ের কাঁটা উপড়ে 'শৈশব'-এর পাণ্ডুলিপি সমসাময়িকির দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। বুকে রইল পাণ্ডুলিপির ধূসর স্মৃতি আর আশা আশঙ্কার ঘূর্ণিঝড়। বেশি দিন সে যন্ত্রণা ধারণ করতে হয়নি তলস্তয়কে। সম্পাদক নেক্রাসভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বয়ে চিঠি এল। সাথে ছোট্ট একটা খবর—লেখা ছাপা হচ্ছে শিগগিরই। নেক্রাসভ তখন কবি, সমালোচক, বিদগ্ধ শিল্পী হিসেবে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত। সমসাময়িকির প্রতিটি সংখ্যা তখন নিজগুণে পাঠক মহলে সমাদৃত। এহেন পত্রিকার লেখা ছাপা হওয়া একজন তরুণ সাহিত্যিকের পক্ষে তো হাতে স্বর্গলাভ। শুধু ছাপা যে হল তাই নয়, প্রতিষ্ঠিত কবি নেক্রাসভের প্রেরণাও জুটল তাঁর ভাগ্যে; ফলতঃ মনস্থির করতে আর বিলম্ব করলেন না। সেই হল তলস্তয়ের কলম ধরার গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। কথা আর কাহিনীর মালাগাঁথারই সেই তো সূচনা। শিল্পীর পথ চলা শুরু হল—চড়াই আর উৎরাই ডিঙিয়ে। ১৮৫২ সালে ছাপা হল 'শৈশব,' আর সে দিনই রাশিয়া চিনে নিল তার দরদী শিল্পীকে।

॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধ ॥

অভিজাত রাশিয়া। ঘোড়ার ক্ষুর, মদের পেয়ালা, বিলিয়ার্ড আর জুয়োর আড্ডায় মুখ গুঁজে থেকে মধ্যযুগীয় বীরত্বের রেশ তখনও টিকে আছে; টিকে আছে সর্বনাশা ডুয়েল। যে কারণে তীক্ষ্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি পুশকিন আর লেরমন্তভ অকালেই ঝরে যান। জীবনে দু দুবার তলস্তয় সেই ডুয়েলের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। এক রোখা মানুষটির আরেকদিক এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নেক্রাসভের সাথে যতটা আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল তলস্তয়ের ততটাই তিক্ততা দানা বাঁধে তুর্গেনেভের সাথে। একবার তো তুর্গেনেভের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে এক আলালের ঘরের দুলাল লঙ্গিনভকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেই বসলেন। নেক্রাসভ দেখলেন মহাবিপদ। অতিকষ্টে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন; কিন্তু পরে আরেকবারও ঠিক এমনিই ঘটে, এবং তখনও নেক্রাসভই তাঁর সহায় হন।

॥ আমি নিঃসন্দেহ যে আমি একদিন বিখ্যাত হবই ॥

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তখন তিনি হাবিলদারের পদে বহাল। নিয়মিত রোজনামচা লেখা শুরু করেছেন। রোজনামচার সেই পাতায় একদিন কতকগুলো অক্ষর ফুটে উঠল: "আমি নিঃসন্দেহ যে আমি একদিন বিখ্যাত হবই।' উক্তিটিতে অহংবোধ স্পষ্ট, উচ্চাশার আকাশ ছোঁয়ার বাসনাও অকপটভাবে ব্যক্ত, কিন্তু তা মোটেই বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছের সাথে তুলনীয় নয়; বরং সেটা একজন আত্ম-সচেতন শিল্পীর জেদমাত্র। পরবর্তী পর্বে স্বীকারোক্তি লেখার সময় তলস্তয় নিজেই এ দম্ভকে আঘাত করে বলেছেন: 'ঐ সব বছরগুলোর কথা, ভয়ঙ্কর ভীতি ছাড়া আমি ভাবতেই পারিনা…যুদ্ধে মানুষ হত্যা করেছি, মানুষকে খুন করার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে

আহ্বান জানিয়েছি, তাদের জুয়োয় গো-হারান হেরেছি, কৃষকের শ্রম আত্মসাৎ করেছি, শাস্তি দিয়েছি তাদের, ঢিলে ঢালা জীবন কাটিয়েছি আর লোক ঠকিয়েছি।

'এভাবে দশ দশটা বছর কাটাই।

'সেই সময়েই লিখতে শুরু করি অহঙ্কার, গর্ব, আর লালসা থেকে। জীবনে যা করেছি লেখাতেও তাই করলাম। যশ আর অর্থ পাওয়ার জন্যেই লিখলাম; ফলে সুন্দরকে আড়াল করা আর মন্দটা দেখানো খুবই দরকার ছিল।'

এই হলেন সাতাশ বছরের তলস্তয়। শিল্প এবং শিল্পী। এখানেই তাঁর ব্যক্তি জীবনের সাথে শিল্পের নাড়ীর সম্পর্ক। এরও ছ বছর পরে বিয়ে করলেন তিনি; তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। ইউরোপ ভ্রমণ সাঙ্গ করেন এ সময়েই। বিদেশ থেকে ফিরে গ্রামাঞ্চলে পাঠশালা খুলে বসেন, এবং তখনই তার মধ্যে এই উপলব্ধি গাঢ় হয় যে নিজের জ্ঞান গভীর না হলে লোকশিক্ষার বিস্তার ঘটানো সত্যিই অসম্ভব। ফলে একবছর পাঠশালা চালিয়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন সেই জ্ঞান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফিরে আসেন ১৮৬১ সালে কৃষক মুক্তির সময়ে। একটি পত্রিকা প্রকাশ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষক জমিদার সম্পর্কের শান্তি সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রচারে ব্রতী হন, কিন্তু অচিরেই এই মতবাদের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেন।

১৮৭৮ এ শুরু হয় ঈশ্বর অন্বেষণ।

যাইহোক, রোজনামচার ঐ কথাটা কিন্তু নিছক দম্ভ ছিলনা, কোন বালখিল্য আবেগেও তার জন্ম নয়, সেটা ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস; যে বিশ্বাসের পশ্চাতে ছিল একনিষ্ঠ পবিত্র শ্রমের এক দীর্ঘ ইতিহাস। 'শৈশব' লেখার পর বেরিয়েছে 'বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়ের ডাইরী' আর 'হানা' নামক গল্প। 'লিখতেই হবে' এই বোধ আর শ্রেষ্ঠত্বের কামনা—এই দুয়ে মিলে শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। রোজনামচার পাতায় যুক্ত হয় আর একটি পংক্তি: 'ভাল হোক আর মন্দ হোক, আমাকে লিখতেই হবে।'

এমন লেখা বিরল নয় যা কিনা তিনি পঞ্চাশবারের বেশি কাটাকুটি করেছেন, বাতিল করেছেন নির্দয় ভাবে। রাত জেগে সেই সব লেখা কপি করতেন স্ত্রী সোফিয়া। লেখা সম্পর্কে তলস্তয়ের বক্তব্য হচ্ছে: 'প্রথমে মোটামুটি খসড়া করবে তখন ভাবনার পারম্পর্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তারপর লেখা নকল করার সময় অবান্তর বিষয় বাদ দেবে।...আবার যখন নকল করবে তখন নজর দেবে বক্তব্যের দিকে।'

শুধু যে শৈল্পিক উৎকর্ষ আর আঙ্গিক নিয়েই তিনি মাথা ঘামিয়েছেন তা কিন্তু মোটেই নয়, বরং বিষয়বস্তুর প্রশ্নেই তাঁর পরিশ্রম ছিল সমধিক 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাস লেখার সময় দীর্ঘদিন আদালতের এজলাস শুনেছেন তিনি।' 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে রয়েছে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাবারুদের ঝাঁঝাল অভিজ্ঞতা।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিল্পীদের কাছে শিল্পী তলস্তয় এক বিরাট আসন জুড়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। চিরায়ত সাহিত্যের জগতে সেই আসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত। কার্ল রাদেক তাঁর 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য'-র পাতায় মন্তব্য করেছেন যে পুশকিন আর তলস্তয়ের পথই রাশিয়ার নবীন সাহিত্যিকদের পথ।

রোজনামচার অক্ষরগুলো হয়ত এতদিনে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তলস্তয়ের শৈল্পিক উৎকর্ষ এক একটি যুগের বৈঠা বেয়ে পেরিয়ে চলেছে সেই আশাকে সফল করে: 'আমি নিঃসন্দেহ যে আমি একদিন বিখ্যাত হবই।'

॥ বিপ্লবের দর্পণ ॥

তুমি রিক্তা, তুমি ঋদ্ধা
তুমি বীর্যবতী, তুমি বন্ধ্যা
হে মাতা রাশিয়া!
(নেক্রাসভের কবিতা : 'রাশিয়ায় সুখী কে')

ভূমিদাস ব্যবস্থা থেকে সদ্যমুক্ত রাশিয়ার পিতৃতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চল তখন কুলাক আর সুদখোর তহশীলদারদের মুখের গ্রাসে পরিণত। অসংগঠিত কৃষক শ্রেণী বুক চাপড়াচ্ছে কিন্তু সংগ্রামের শক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। তাদের মধ্যে তখনও বিপ্লবী প্রত্যয়ই অনুপস্থিত। তলস্তয়ের বিচার করতে হবে তাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সর্বনাশা বিপদ এবং তজ্জনিত কৃষকশ্রেণীর জমি থেকে উৎখাত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষ্যকার হিসেবে। বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বক্ষণে কোটি কোটি রুশ কৃষকের আত্মার বাণী বহনকারী হিসেবে, তাদের ধ্যান ধারণার শৈল্পিক রূপকার হিসেবেই তলস্তয় মহান। যথার্থভাবে লেনিন তাই গোর্কিকে বলেছেন : 'আপনি কি আর একটা ব্যাপার জানেন? এই কাউন্টের আগমনের আগে সত্যি-কারের মুঝিক সাহিত্য বলে কিছুই ছিল না। (সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে : লেনিন)

সারাটা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা অভিজাত জমিদার ও ধনিকশ্রেণীকে ঘৃণা করতে শিখেছিল। আইন আদালত আর গির্জার ওপর এসেছিল ঘোরতর সন্দেহ, নিদারুণ অবিশ্বাস। কিন্তু তবু তারা শুধু কেঁদেই ছিল; আর প্রার্থনা করেছিল—যেমন করেছেন তলস্তয় : 'আমি এক ভয়ঙ্কর দুরাচারী পাপী'…। অথচ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের প্রশ্নে তাঁর অসহায় আর্তি : 'মন্দের প্রতিরোধ না করার দুর্বল উন্মত্ত প্রচার। ১৮৬১—১৯০৪ সাল পর্যন্ত যে যুগ সেই যুগের শিল্পী তলস্তয়। ১৯০৫ তো তার পরে। তখন কৃষকেরা অস্ত্র ধরেছে। তলস্তয়ের লেখায় পাই তার আগের যুগের নিষ্ঠুর শোষণ, অসহায় ক্রন্দন আর বিপুল অন্বেষণ। ১৯০৫ এর পটভূমি রচনায় তা অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

॥ একক পরিব্রজাক ॥

১৮৮০ সালের পর থেকে উন্মত্ত ধর্মীয় ভাবাবেগ বেড়ে চলল আরও। সমস্ত লেখার স্বত্ব তিনি দিয়ে দিলেন স্ত্রী সোফিয়াকে। সেটা ১৮৮৪ সালের কথা। আত্মশুদ্ধির বিপুল তাড়না তখন তার অন্তরে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য তাঁর সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। ঋষির বনবাসের সময় উপস্থিত। ততদিনে তিনি নিরামিষ ধরেছেন; সবদিকেই তখন অত্যন্ত মিতব্যয়ী; অথচ মনের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত। এ সময় তাঁর মনে হল গৃহের সাথে সম্পর্ক ছেদ না করতে পারলে আধ্যাত্মিক বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। সেটা ১৯১০ সাল। বরফ পড়ছে; কনকনে বাতাস; শীতের সবে শুরু। বৃদ্ধ শিল্পী ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়েছেন পরম সত্যের সন্ধানে—যাকে তিনি ঈশ্বর বলে জানেন। নিষ্ঠুর ঈশ্বরের হৃদয় সেদিন গলেছিল কিনা তা কে জানে, তবে অন্ধ বিশ্বাস বুকে নিয়ে মহান শিল্পী যেন কোন এক অজানা রেলগাড়ির প্রত্যাশায় এক রেল স্টেশনে এসে শেষ বারের মত তাঁর উষ্ণ নিশ্বাস ফেললেন।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভান ইলিচের মৃত্যু

আদালতের বড় বাড়িটায় মেলভিনস্কির মামলার শুনানি চলেছে। বিরতির সময় বিচারকের দল প্রসিকিউটরের সঙ্গে ইভান এগরভিচ শেবেকের দপ্তরে মিলিত হলেন। আলোচনা শুরু হল বিখ্যাত ক্রাসভ মামলা সম্পর্কে। ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, ও ব্যাপারটা আদালতের অধিকারের বাইরে; কিন্তু ইভান এগরভিচ তাতে মোটেই বিচলিত হলেন না। আর পিওতর ইভানভিচ—তিনি প্রথম থেকেই মুখ বন্ধ করে সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়ছিলেন। এবার বললেন, 'আরে, আপনারা জানেন-ই না! ইভান ইলিচ তো মারা গেছেন।'

'তাই নাকি?'

'এই তো, দেখুন না।' খবরের কাগজটা ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের হাতে দিতে দিতে বললেন ইভানভিচ।

চারপাশে কালো দাগের মধ্যে লেখা ছিল: 'প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা গলোভিনা গভীর শোকের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের জানাচ্ছেন যে তার প্রিয়তম স্বামী, আদালতের বিচারকমণ্ডলীর একজন সদস্য, ইভান ইলিচ গলোভিন ১৮৮২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। শুক্রবার বেলা ১টার সময় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।'

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ভদ্রমণ্ডলীর সহকর্মী ছিলেন ইভান ইলিচ; তাকে সকলেই পছন্দ করতেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, সকলে বলত, রোগটা নাকি আরোগ্যর বাইরে। যদিও তার চাকরিটা বহাল ছিল, কিন্তু আলাপ আলোচনায় শোনা যেত যে, তার মৃত্যুর পরই ওটা পাবেন আলেক্সেয়েভ; আর আলেক্সেয়েভের জায়গায় আসবেন ভিন্নিকোভ কিংবা স্তাবেল। তাই ইভান ইলিচের মৃত্যুর সংবাদটা পড়েই সমবেত সবার মনেই নিজেদের এবং বন্ধুবান্ধবদের চাকরিতে অদল-বদলের কথাটাই সর্বাগ্রে মনে এল।

ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ মনে মনে ভাবলেন, 'এবার নিশ্চয় স্তাবেল কিংবা ভিন্নিকোভের পদটা আমিই পাব। অনেকদিন থেকেই কর্তৃপক্ষ আমাকে কথা দিয়ে রেখেছেন। তার মানে এখন থেকে মাইনে বাড়বে আট শ রুবল, তাছাড়া অফিস খরচা বাবদ কিছু উপরি।'

পিওতর ইভানভিচ ভাবলেন, 'কালুগা থেকে শালাকে বদলি করে আনার জন্য একটা দরখাস্ত করা দরকার। তাতে বউ মনে মনে বেশ খুশিই হবে। তাহলে ওর বাপের বাড়ির কারও জন্য কখনও কিছু করিনা—এ অভিযোগ আর শুনতে হবেনা।' তারপর সকলকে শুনিয়ে বললেন, 'আমি আগেই জানতাম, ইভান ইলিচের পক্ষে এ ধাক্কা সামলানো সম্ভব নয়। সত্যি, ব্যাপারটা দুঃখজনক।'

'ওর আসলে হয়েছিলটা কি?'

'ডাক্তাররা সঠিক ধরতে পারেননি। এক একজন এক একরকম বলছিলেন। শেষবার যখন ওকে দেখতে যাই তখন মনে হয়েছিল হয়ত সেরে উঠবেন।'

'ছুটি শুরু হবার পর আমি আর ওর কাছে যেতে পারিনি। যাব-যাব করেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'ওর টাকা-কড়ি কেমন ছিল ?'

'স্ত্রীর কিছু সম্পত্তি আছে। তবে যতটা শোনা যায়, ততটা নয়।'

'এখন একবার যাওয়া দরকার। তবে ওর বাড়িটা বেশ দূরে।'

শেবেকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পিওতর ইভানভিচ বললেন, 'নদীর ওপারে থাকি সেটা আপনার সহ্য হচ্ছেনা দেখছি।' এ থেকেই কথা উঠল শহরের কোন এলাকাটা ভাল, কোনটা অসুবিধেজনক ইত্যাদি। তারপর সকলে মিলে গেলেন এজলাসে।

ইলিচের মৃত্যু সংবাদ শুনেই চাকরিতে পদোন্নতি এবং অদল-বদলের কথা ভাববার সাথে সাথে বরাবরের মত সকলেই এ ভেবে খুশি হলেন যে, তাদের বিশেষ পরিচিত লোকটা মারা গেলেও তারা নিজেরা বেশ বেঁচে আছেন। ভাবলেন, 'ও গেছে, যাক ; কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি।' তারপর ইলিচের বিধবা স্ত্রীকে শোকনিবেদন এবং অন্ত্যেষ্টির ক্লান্তিকর সামাজিকতার কথা মনে আসাতে বেশ বিরক্ত হলেন।

ইভান ইলিচের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ এবং পিওতর ইভানভিচের। আইন পড়ার সময় ইভানভিচ ইলিচের সহপাঠী ছিলেন, তাছাড়া তার কাছে তিনি নিজেকে যথেষ্ট ঋণীও মনে করতেন।

সেদিন নৈশাহারে বসে স্ত্রীকে ইভান ইলিচের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে শ্যালকের বদলির সম্ভাবনার কথাটা তুললেন। তারপর শুয়ে আরাম করার পরিবর্তে ফ্রক-কোট পরে ইভান ইলিচের বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

ইভান ইলিচের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়ানো একটা বড় এবং দুটো ছোট ঘোড়ার গাড়ি। একতলায় যেখানে টুপি আর কোট ঝুলিয়ে রাখা হয় সেখানেই কফিনের জরিদার ঢাকনাটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। কালো পোষাক পরিহিতা দুজন মহিলা ফার-কোট খুলছিলেন। তাদের একজন ইভানভিচের পরিচিতা—ইলিচের বোন ; অন্যজনকে তিনি এই প্রথম দেখলেন। একজন বন্ধু, ভার্‌স, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ইভানভিচকে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন, এবং এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন যে মনে হল তিনি বলতে চাইছেন, 'ইভান ইলিচ বোকার মত মারা গেলেন, তবে আমার আপনার কথা স্বতন্ত্র।'

ইংরেজদের মত জুলফিওলা, রোগা দেহে ফ্রক-কোট পরা ভার্‌সের চেহারায় বরাবরই একটা শালীন গাম্ভীর্য ছিল, আজ যেন সেটায় আরও বেশি ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে। অন্ততঃ পিওতর ইভানভিচের তাই মনে হল।

মহিলাদের আগে যেতে দেবার জন্য পথ ছেড়ে ইভানভিচ নিজে তাদের পেছনে পেছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ভার্‌স না নেমে সিঁড়ির মাথাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশ্য ইভানভিচ এর কারণটা মনে মনে আন্দাজ করে নিলেন। ভাবলেন, 'তাসের আড্ডাটা কোথায় বসবে সেটা ঠিক করার জন্যই ও ব্যস্ত।' ইলিচের পত্নীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মহিলা দুজন ঘরে ঢুকলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ভার্‌স ঠোঁট চেপে, চোখে চাপল্য এনে, ভ্রূভঙ্গিতে ইসারা করে ডানপাশে মৃত ইলিচের ঘরটা দেখালেন।

বরাবরের মতই, ঠিক কি করা উচিত তা না ভেবেই ঘরে ঢুকলেন পিওতর ইভানভিচ। এসব ক্ষেত্রে বুকে ক্রুশ করলে যে কোন অন্যায় হবে না সেটা তিনি ভাল করেই জানতেন। তবে নিচু হয়ে অভিবাদন জানানোটা ঠিক উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারলেন না। তাই দুটোর মাঝামাঝি একটা জিনিস করলেন: মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বুকে ক্রুশ আঁকলেন। সাথে সাথে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। দুটি অল্পবয়সী ছেলে, সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে একজন ইভান ইলিচের ভাইপো, বুকে ক্রুশ করে বেরিয়ে গেল। পাশে, পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন বৃদ্ধা, খুব নিচু গলায় কি যেন বলছেন, আর একটি পাদ্রী, দেখে মনে হয় বেশ দৃঢ়চেতা এবং চটপটে, বেশ জোর গলায় বকে চলেছেন। বাড়ির চাকর গেরাসিম ইভানভিচের সামনে দিয়ে মেঝের ওপর কি একটা ছড়াতে ছড়াতে গেল। সেদিকে তাকাতেই হঠাৎ মৃতদেহে পচন ধরার মৃদু গন্ধ তার নাকে এল। শেষবার যখন তিনি ইভান ইলিচের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন গেরাসিমকে দেখেছিলেন রোগীর দেখাশোনা করতে। ইলিচ তাকে খুব স্নেহ করতেন। পিওতর ইভানভিচ বারবার বুকে ক্রুশ করতে লাগলেন, আর কোণের টেবিলে রাখা মূর্তিগুলো, কফিন এবং পাদ্রীর মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য করে মাথা নুইয়ে চললেন। তারপর ক্রুশ করাটা বড় বেশিবার হয়ে যাচ্ছে মনে হওয়াতে থেমে গিয়ে মৃতদেহের দিকে চোখ ফেরালেন।

মৃতদেহটা শুয়ে আছে নিশ্চল পাথরের মত, সব মৃতদেহ যেমন থাকে, তেমনি কফিনের গদীতে শরীর ডোবা, বালিশের ওপর চিরকালের জন্য হেলানো মাথা, মোমের মত হলুদ কপাল; আর সব মৃতদেহই যেমন দেখা যায়—তেমনি বসে যাওয়া রগ ঠেলে বেরিয়ে আসা টাক, এবং ওপরের ঠোঁটে চাপ দেওয়া ঝুলে পড়া নাক। অনেক বদলে গেছেন ইভান ইলিচ। শেষবার যখন পিওতর তাকে দেখেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি রোগা; তবু মারা যাবার পর সকলের মতই তার মুখ জীবদ্দশার থেকেও সুন্দর হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে আরও অভিব্যক্তিপূর্ণ। তার প্রশস্ত মুখটা যেন জানিয়ে দিচ্ছে, যা করার ছিল তা করা হয়ে গেছে, এবং বেশ ভালভাবেই। তাছাড়া ও মুখ যেন আরও বলতে চাইছে, জীবিতদের প্রতি তার নিদারুণ ভর্ৎসনা রয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হুঁসিয়ারিও। কথাটা মনে হতেই ইভানভিচ ভাবলেন এই হুঁসিয়ারির সঙ্গে তার অন্ততঃ কোন যোগাযোগ নেই। সাথে সাথে, অতি দ্রুত একবার ক্রুশ করে নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে গেলেন। তার নিজেরই মনে হল, কাজটা ঠিক হল না।

পা দুটো ফাঁক করে পেছনদিকে ধরা টুপিটা দু হাত দিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে সদর ঘরে ইভানভিচের অপেক্ষায় ছিলেন ভাৎ'স। তার চটপটে চালাক-চতুর চেহারাটার দিকে চোখ পড়তেই নিজেকে বেশ চাঙ্গা মনে করতে শুরু করলেন পিওতর ইভানভিচ। বুঝতে পারলেন, ভাৎ'সকে এসব কিছু মোটেই স্পর্শ করে না, সে নিজেকে শোকের শয়তানের হাতে তুলে দিতে মোটেই রাজি নয়। তার হাবভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ইভান ইলিচের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সে তাদের প্রাত্যহিক জমায়েতকে বাতিল করে দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ বলে মেনে নিতে রাজি নয়। অর্থাৎ এ ব্যাপারটা সান্ধ্য-মিলনে নতুন প্যাকেট থেকে তাস বের করে ভাগবাঁটোয়ারায় মোটেই বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না; এমনকি সে সময় যদি

ইভান ইলিচের চাকর তার প্রভুর কফিনের চারধারে মোমবাতি জেলে দিতে ব্যস্ত থাকে, তবুও না। সাধারণভাবে বলতে গেলে তার দৃষ্টিতে ঘটনাটা এমন কিছু নয়, যে কারণে সান্ধ্য-ফুর্তি করাটা বন্ধ করে দিতে হবে। এবং আশ্চর্য, ইভানভিচ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাৎ'স তার কানে কানে ঠিক সে কথাটাই বলে তাকে ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের বাড়িতে যেতে বললেন।

কিন্তু সে সন্ধ্যায় তাস খেলা ইভানভিচের কপালে নেই। কারণ, ঠিক সেই সময়ই শোবার ঘর থেকে কয়েকজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা। যে ঘরে মৃতদেহটা রাখা ছিল সে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে বললেন, 'এখনই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু হবে; আপনারা সবাই ভেতরে আসুন।' ভদ্রমহিলা বেশ বেঁটে এবং মোটা। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কাঁধের থেকে নিচের অংশটাই বেশি চওড়া হয়ে আছে। তার সারা অঙ্গে কালো পোষাক; মাথায় লেসের ওড়না: কফিনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটির মত তারও ভ্রূ-জোড়া ওপরের দিকে ওঠা।

একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে, ঘরে ঢোকবার অনুরোধে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কিছুই না বলে বাইরেই দাঁড়িয়েই রইলেন ভাৎ'স। ইভানভিচকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা বললেন, 'আমি জানি, আপনি ওর সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন।' তারপর যেন কিছু একটা প্রত্যুত্তর পাবেন, এমনভাবে আশাপূর্ণ চোখে তাকালেন তার দিকে।

পিওতর বুঝলেন ঘরের ভেতর ক্রুশ করা যেমন তার কর্তব্য ছিল তেমনি কর্তব্য হচ্ছে ভদ্রমহিলার হাতে চাপ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলা, 'বিশ্বাস করুন!' এবং আশ্চর্য, তিনি তা-ই করলেন, আর করে বুঝলেন যে কাজটা ঠিকই হয়েছে। এতে তিনি নিজে যেমন অভিভূত বোধ করছেন, তেমনি ভদ্রমহিলাও।

সদ্যবিধবা মহিলাটি বললেন, 'প্রার্থনা শুরু হবার আগে একবার এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

ভদ্রমহিলার হাত ধরে ইভানভিচ ভেতরের ঘরে গেলেন; ভাৎ'সের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাৎ'স শুকনো মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখের দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি বলতে চাইছেন, 'তাহলে তাসখেলার বারোটা বাজল। এখন আপনার জায়গায় যদি অন্য কাউকে বসাই তখন যেন আবার রাগ করবেন না। তার থেকে বরং যখন ছাড়া পাবেন তখন না হয় পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবেই খেলতে বসবেন।'

আরও গভীর এবং বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পিওতর ইভানভিচ, এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার আবেগে হাতে চাপ দিলেন ফিওদরভনা। দুজনে বসার ঘরে প্রবেশ করলেন। ফিওদরভনা বসলেন শোফায়, আর ইভানভিচ বসলেন স্প্রিং-বিহীন গদী-আঁটা চৌকিতে। বসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা একপাশে একটু কাত হয়ে গেল। ফিওদরভনা তাকে অন্য চেয়ারে বসতে বলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তার সেই মানসিক অবস্থায় কাউকে সাবধান হতে বলাটা ঠিক উচিত হবে না ভেবে চুপ করে গেলেন। ইভানভিচের মনে পড়ে গেল, এ ঘরটা সাজাবার সময় সোফার কাপড়টা সম্পর্কে তার পরামর্শ চেয়েছিলেন ইভান ইলিচ। সোফায় বসতে গিয়ে ফিওদরভনার কালো ওড়নার একটা দিক টেবিলের কোনায় আটকে গেল। সেটা

ছাড়িয়ে দেবার জন্য চৌকি ছেড়ে উঠতেই পিওতর ইভানভিচকে আলগা স্প্রিংগুলো বেশ একটু ধাক্কা দিল। আটকে যাওয়া লেসটাকে নিজেই ছাড়িয়ে নিলেন ফিওদরভনা। ইভানভিচ আবার চৌকিতে বসলেন, এবং একরকম জোর করেই অবাধ্য স্প্রিংগুলোকে দাবিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল লেসটা তখনও পুরো মুক্ত হয়নি টেবিলের খাঁজ থেকে, তাই পিওতর ইভানভিচকে আবার উঠতে হল, এবং এবার বিদ্রোহীর কর্কশ স্বরে শব্দ করে উঠল গদি-আঁটা চৌকিটা। বিষয়টা শেষ হলে পর মিহি রেশমের রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন ফিওদরভনা। কিন্তু লেস এবং চৌকির যৌথ অবাধ্যতায় মনটা খিচড়ে গিয়েছিল পিওতরের—তাই তিনি মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন। এই অস্বস্তিকর পরিস্থির অবসান ঘটল ইভান ইলিচের চাকর সকোলভের আকস্মিক আগমনে। যে জায়গাটা ইলিচের কবরের জন্য পছন্দ করা হয়েছে, তার বাবদ দুশ রুবল দিতে হবে। কান্না বন্ধ করে ফিওদরভনা শহীদের দৃষ্টিতে ইভানভিচের দিকে তাকালেন, এবং ফরাসীতে বললেন, এটা তার পক্ষে সত্যই একটা দুঃসহ বোঝা। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ নীরব ভঙ্গি করে ইভানভিচ বুঝিয়ে দিলেন যে সে ব্যাপারে তিনিও নিঃসন্দেহ।

'ইচ্ছে হলে একটা সিগারেট খেতে পারেন।' ভদ্রমহিলা বললেন। তারপর কবরের খরচ-খরচা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন সকোলভের সঙ্গে। সিগারেট খেতে খেতে ইভানভিচ লক্ষ্য করলেন, ভদ্রমহিলা কবরখানার বিভিন্ন জায়গায় খরচ-খরচা সম্পর্কে বেশ খুঁটিনাটি খবর নিয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক যেটিকে সব থেকে সুবিধেজনক বলে মনে করলেন, সেটিই নিলেন। ব্যাপারটা মিটে গেলে শুরু হল অন্ত্যেষ্টি-গাইয়েদের সম্পর্কে আলোচনা। শেষে সেটাও মিটে গেলে সকোলভ চলে গেল।

টেবিলের ওপরকার ছবির অ্যালবামগুলো একপাশে সরিয়ে দিতে দিতে ফিওদরভনা বললেন, 'সবকিছু একা আমাকেই করতে হয়।' সিগারেটের ছাই টেবিলের ওপর পড়তে পারে বুঝে তাড়াতাড়ি একটা ছাইদানি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদি বলি যে প্রচণ্ড শোকের জন্য সংসারের কাজকর্ম করতে পারছিনা তবে সেটা একটু বাড়িয়েই বলা হবে। বরং কোন কিছু যদি আমাকে সান্ত্বনা দিতে সফল হয়, তাহল, ওর খাতিরে বিভিন্নরকম কাজ করা।' কাঁদার জন্য আবার রুমাল বের করেই হঠাৎ জোর করে নিজেকে সামলে নিয়েই মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা স্প্রিংগুলোকে বেশ কায়দায় জব্দ করে মাথা নোয়ালেন পিওতর।

'শেষের কটা দিন উনি সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।'

'খুব কষ্ট?' পিওতর জানতে চাইলেন।

'অসহনীয় কষ্ট।' ফিওদরভনা বললেন, 'শেষের দিকে তিনি ক্রমাগত চিৎকার করতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। শেষে তো একটানা তিনদিন চেঁচিয়ে ছিলেন এক-নাগাড়ে। সত্যি, কি করে যে তা সহ্য করেছি তা নিজেই বলতে পারব না। তিন তিনটে ঘরের দেওয়াল ডিঙিয়েও ওর আওয়াজ শোনা যেত। এবং আমাকেই তা সহ্য করতে হয়েছে দিনের পর দিন।'

'তার মানে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল?'

গলার স্বরটাকে একেবারে খাদে নামিয়ে ফিওদরভনা বললেন, 'হ্যাঁ, একেবারে

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যুর মাত্র পনের মিনিট আগে আমাদের কাছে বিদায় চাইলেন, তারপর বললেন ভলোদিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

নিজের এবং এই মহিলার ভণ্ডামির উপলব্ধি সত্ত্বেও অতি-পরিচিত একজন সুহৃদের শেষমুহূর্তের যন্ত্রণার কথা ভেবে মনে মনে খুব বিচলিত হলেন ইভানভিচ। মানুষটাকে সেই ছোটবেলা থেকে তিনি জানতেন—প্রথমে হাসিখুশি শিশু হিসেবে, তারপর স্কুলের ছাত্র হিসেবে, এবং সবশেষে একজন সহকর্মীরূপে। আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্ধুর কপাল, তার ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া নাক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'পুরো তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণা ; তারপর মৃত্যু ! যে-কোন মুহূর্তে আমারও তো তেমন হতে পারে।' কথাটা ভেবে নিজেই আঁতকে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার এও ভাবলেন যে না, 'ইভান ইলিচের বেলা যা ঘটেছে, আমার বেলা অন্ততঃ সেরকম কিছু ঘটবে না। এ ধরনের চিন্তা করাটাও খারাপ ; ওতে মেজাজ বিগড়ানো ছাড়া আর কোন লাভ হয়না। ভাং'স ঠিকই বুঝেছে।' নিজেকে সংযত করে পিওতর ইলিচের মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যি-কারের আগ্রহ দেখানো শুরু করলেন—মনে হল, যেন মৃত্যুটা কেবল ইভান ইলিচের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, তার নিজের ক্ষেত্রে নয়।

ইভান ইলিচের ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর যথাযথ বর্ণনা দেবার পর ফিওদর-ভনা কাজের কথা শুরু করবার ব্যাপারটা ভাবলেন। বললেন, 'সত্যি, ইভানভিচ, আমার কপাল কী খারাপ, কী খারাপ !' কথাটা শেষ না হতেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ইভানভিচ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কখন ফিওদরভনা নাক ঝেড়ে সামলে উঠবেন তারজন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শেষে যখন ব্যাপারটা ঘটল তখন ফিওদরভনা আবার শুরু করলেন, 'বিশ্বাস করুন...'

এবার একেবারে আসল কাজের কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর কিভাবে সরকারী অর্থসাহায্য পাওয় যায় বিষয়টা সেই সংক্রান্ত। যেন উনি এ ব্যাপারে পিওতরের পরামর্শ চাইছেন। কিন্তু তার কথাবার্তায় পিওতর পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে মহিলাটি এ ব্যাপারে তার থেকেও অনেক বেশি খুঁটিনাটি তথ্য জানেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ঠিক কত টাকা উনি পাবেন, তা-ও জানা ; শুধু খোঁজ করছেন আরও কিছু বেশি টাকা কোনভাবে পাওয়া যেতে পারে কিনা—তাই। সেটা কিভাবে সম্ভব পিওতর তা চিন্তা করলেন, কিছুক্ষণ পর বেশ সতর্কতার সঙ্গে সরকারের নির্দয়তার সমালোচনা করে জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থায় অতিরিক্ত আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয় বলেই তার মনে হচ্ছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা চিন্তা করতে শুরু করলেন, কিভাবে তিনি বর্তমান আলোচনাটাকে শেষ করবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পিওতর ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভদ্রমহিলার করমর্দন করে বাইরের ঘরে গেলেন।

খাবার ঘরে এখনও সেই ঘড়িটা ঝোলানো রয়েছে যেটা বহুদিন আগে পুরনো একটা দোকান থেকে কিনতে পেরে ইভান ইলিচ মহাখুশি হয়েছিলেন। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য আগত পাদ্রী, কয়েকজন পূর্ব পরিচিত লোক এবং ইভান ইলিচের সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলেন পিওতর। মেয়েটির পরনেকালো পোষাক, তাতে তার সরু কোমর যেন আরও সরু দেখাচ্ছে। মুখে

তার বিষণ্ণ অথচ ক্রুদ্ধ ভাব। সে এমনভাবে পিওতরকে অভিবাদন জানাল যে পিওতরের নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। মেয়েটির পেছনে দণ্ডায়মান যুবকটির মুখেও তেমনি ভাব।* যুবকটিকে চেনেন পিওতর—সে যথেষ্ট অবস্থাপন্ন এবং হাকিমের কাজ করে। বাইরে গুজব সে নাকি তরুণীটির বাগদত্তা। মাথা নামিয়ে শোকার্ত অভিবাদন জানিয়ে যে মুহূর্তে তিনি মৃতদেহ যে ঘরে রক্ষিত আছে সে ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, অমনি সিঁড়িতে দেখা গেল ইভান ইলিচের ছেলেকে। সে জিমনাসিয়ামের ছাত্র—বাপের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল। আইন পড়ার সময় পিওতর ইভান ইলিচকে যেমনটি দেখেছিলেন—অবিকল ঠিক তেমনি। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে—অনেকটা তের চোদ্দ বছরের ডেপো ছেলের মত। পিওতরকে দেখতে পেয়ে সে গম্ভীরমুখে সংকোচপূর্ণ ভুরু কোঁচকাল। পিওতর তার দিকে মাথা নেড়ে, মৃতদেহ যে ঘরে আছে সে ঘরে চলে গেলেন।

এবার শুরু হল অন্ত্যেষ্টি। মোমবাতি, ধূপ, কান্না, চোখের জল এবং গোঙানির সমবেত কলতান। ইভানভিচ ভুরু কুঁচকে, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৃতদেহের দিকে একবারও চোখ তুলে চাইলেন না, একবারও সমবেত শোকের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন না, এবং সবার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। কোট রাখার ঘরে কেউ ছিল না। চাকর গেরাসিম তাড়াতাড়ি এসে অতি দ্রুততার সঙ্গে তার কোটটা বের করে এগিয়ে ধরল।

এ অবস্থায় একটা কিছু না বললে বিশ্রী দেখায়, তাই পিওতর বললেন, 'গেরাসিম, খুব-ই খারাপ লাগছে, না?'

'সবই ওপরওলার ইচ্ছে,' গেরাসিম তার একপাটি শক্ত ঝকঝকে দাঁত বের করে বলল, 'সবাইকে তো একদিন মরতে হবেই।' তারপর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরজা খুলে কোচয়ানকে ডেকে পিওতরকে গাড়িতে তুলে দিয়েই এমনভাবে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে গেল যে মনে হল হঠাৎ একটা কিছু জরুরী কাজ করার কথা তার মনে পড়ে গেছে।

ধূপ, মৃতদেহ আর কার্বলিক এসিডের গন্ধের আওতা থেকে বাইরে এসে মুক্ত-বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে বেশ ভালই লাগল পিওতর ইভানভিচের।

কোচোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন বাবু?'

'চল, ফিওদর ভাসিলিয়েভিচের ওখানে।'

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখলেন তেমন দেরি হয়নি—সবে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। সুতরাং পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে বসে যেতে তার কোন অসুবিধেই হল না।

॥ ২ ॥

ইভান ইলিচের জীবন কাহিনী যদিও এমনিতে বেশ সহজ-সরল, তবে বেশ ভয়ানকও বটে। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে যখন দেহত্যাগ করেন তখন তিনি বিচারক-মণ্ডলীর সদস্য। তার বাবা ছিলেন সরকারী চাকুরিয়া। পিটার্সবুর্গে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তিনি এমন সব পদে কাজ করেছিলেন, যে পদে সাধারণতঃ একবার উন্নীত হতে পারলে আর তাকে সরানো সম্ভব হয় না। যদিও সকলেই জানে যে ওই সব পদে করার কিছুই নেই, তবু নিয়মিত ছ হাজার থেকে দশ হাজার রুবল

পর্যন্ত মাইনে পেয়ে তারা বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকেন।

এ রকমই একজন লোক ছিলেন ইলিয়া এফিমভিচ গালোভিন—বিভিন্ন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত সাধারণ সদস্য। তার তিনটি ছেলে—এরমধ্যে দ্বিতীয়টি হলেন ইভান ইলিচ। বড়জন বাপের মতই একটি মন্ত্রীদপ্তরে বেশ উঁচুদরের চাকুরি জোগাড় করে নিয়েছেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি সেই স্তরে উন্নীত হবেন, যে স্তরে পৌঁছলে কোন কাজ না করেই বেতন পাওয়া যায়। ছোট ছেলেটি এধরনের কোন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। বিভিন্ন চাকরিতে যথেষ্ট দুর্নাম সংগ্রহের পর বর্তমানে রেলওয়ে দপ্তরে বহাল হয়েছেন। বাবা এবং ভাই দুজন, বিশেষ করে বৌদিরা সবসময়ই তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা, এবং যদি সম্ভব হত তাহলে হয়ত তার অস্তিত্বটাই ভুলে বসে থাকতেন। তাদের বোনের বিয়ে হয়েছে সেন্ট-পিটার্সবুর্গে সরকারী চাকুরে ব্যারন গ্রেফের সঙ্গে।

ইলিচ ছিলেন কিছুটা ঢিলে ঢালা গোছের লোক। তিনি যেমন বড় ভাইয়ের মত প্রাত্যহিক রুটিন-বাঁধা জীবনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তেমনি ছোট ভাইয়ের মত বেপরোয়াও তাকে বলা চলে না। অন্য দুজনের মাঝামাঝি গোছের কিছু একটা—যেমন বুদ্ধিমান, নম্র, উৎসাহী, অথচ হুজুগবিহীন। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে একই স্কুলে আইন পড়তেন। ছোট ভাই তার পড়া শেষ করতে পারেননি, তারই আগে স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু ইভান ইলিচ যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইনের ছাত্র থাকাকালীন যেমন ছিলেন, সারাজীবন তিনি সেভাবেই কাটিয়ে যান—তেমনি দিলদরাজ, হাসিখুশি, উৎসাহী, অথচ কর্তব্য পালনে যথেষ্ট কড়া। উচ্চপদস্থ কেউ যেটাকে তার কর্তব্য হিসেবে বুঝিয়ে দিতেন সেটা সর্বদাই মেনে চলতেন। ছোটবেলা থেকেই কারও মোসাহেবী করাটা তিনি একেবারে অপছন্দ করতেন, তবে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চিরকালই তাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করত—অনেকটা আগুনে পোকাকে অগ্নিশিখা যেভাবে আকর্ষণ করে, ঠিক সেভাবেই। তাদের হাবভাব, চালচলন, মতামত—সবকিছুকেই বেশ দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ করে নিতেন তিনি। ফলে তাদের সঙ্গে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার। তাছাড়া শৈশব ও যৌবনের বিভিন্ন নেশা—আত্মাভিমান এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ছাত্রজীবনের শেষদিকের উদারপন্থা—সবকিছুই তার সহজাত গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—কখনও গণ্ডীকে অতিক্রম করেনি।

ছাত্রজীবনে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন যে কাজ তার নিজের কাছেই কদর্য বলে মনে হয়েছিল—যার জন্য তিনি আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন, তা-ও একদিন কেটে গেল, যখন তিনি দেখলেন যে সমাজের উচ্চপদস্থ লোকেরা ও-সব কাজকে মোটেই গ্লানিকর বলে মনে করেন না। অবশ্য সে কারণে যে সেগুলোকে ভাল বলে মনে করলেন—তাও নয়; তবে এরপর থেকে আর বিবেকদংশনে ভুগতেন না তিনি।

আইন পড়া শেষ হলে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেশ কয়েকটা সুট বানালেন; তারপর কোটের বুকে 'শেষ পর্যন্ত দেখো' লেখা একটা পদক পিন দিয়ে এঁটে স্কুলের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বেশ বড় রকমের খানাপিনা সেরে সৌখীন ব্যাগ, সুট, আণ্ডারওয়্যার গেঞ্জি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম এবং প্রসাধন-সামগ্রী নিয়ে রওনা দিলেন একটা

মহকুমা শহরের পথে। সেখানে আগে থেকেই তার বাবা রাজ্যপালের অধীনে বিশেষ কর্মাধ্যক্ষের একটা পদ জোগাড় করে রেখেছিলেন তার জন্য।

মহকুমা শহরে ছাত্র-জীবনের মতই অতি সহজেই বেশ গুছিয়ে বসে গেলেন ইভান ইলিচ। চাকুরিতে উন্নতির জন্য যথেষ্ট খাটতেন তিনি—অবশ্য তার সঙ্গে চলত তার সুসংযত ভদ্র অবসর বিনোদন। ওপরওলার নির্দেশে মাঝে মাঝে উয়েজদেহ যেতে হত তাকে। তখন নিম্ন এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে যথেষ্ট মর্যাদাদায়ক ব্যবহার করতেন তিনি এবং কোন রকম ঘুষ না নিয়েই বেশ সততার সঙ্গে নিখুঁতভাবে সব কাজ সম্পন্ন করতেন। এরজন্য যথেষ্ট গর্ব করার কারণ ছিল তার।

নিজের অল্পবয়স এবং আমোদ প্রমোদের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি সর্বদা বেশ সংযত, এমনকি যথেষ্ট কড়া প্রকৃতি বজায় রেখে চলতেন; আবার সামাজিক জীবনে হাসিখুশি, রসিকতা, খোশমেজাজ—এর কোনটারই অভাব ছিলনা তার। ওপরওলা এবং তার স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন বাড়ির লোকের মত। তারা তার সম্বন্ধে বলতেন—খাসা ছেলে।

বেশ সৌখিন নতুন ব্যবহারজীবী ভদ্রলোকটিকে দেখে অনেক মহিলাই মনে মনে পাগল হলেন। তাদের একজনের সঙ্গে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হল। তাছাড়া ছিল একটি টুপি-নির্মাতা মেয়ে; আর ছিল বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে মদের পার্টি এবং নৈশভোজের পর কিছুটা দূরের এক বাড়িতে যাতায়াত। ওপরওলা আর তার স্ত্রীরও কিছুটা তোষামোদ করতে হত। এবং এসব তিনি এমন মার্জিতভাবে করতেন যে কেউ তাকে সমালোচনা করবার কোন সুযোগই পেতনা।

পাঁচ বছর একই পদে বহাল থাকার পর ইভান ইলিচের পদ বদলি হল। আইনের নতুন নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হল নতুন নতুন লোকের। এইসব নতুন লোকদের মধ্যেই একজন হলেন ইভান ইলিচ।

তদন্তকারী হাকিমের পদ গ্রহণের প্রস্তাব এল তার কাছে। প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন তিনি—যদিও তার মনে ছিল অন্য কোন নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা; অর্থাৎ কিনা সমস্ত পুরনো সম্পর্কের চ্ছেদ এবং নতুন করে আবার সম্পর্ক পাতানোর শুরু। তবু ইভান ইলিচ তাই করলেন। আয়োজন হল বিদায়-ভোজের; বন্ধুদের কাছ থেকে রূপোর সিগারেটকেস উপহার পেয়ে তিনি নতুন চাকরিতে যোগ দিতে গেলেন।

• রাজ্যপালের কর্মাধ্যক্ষ থাকাকালীন ইভান ইলিচ যেমন ছিলেন, তদন্তকারী হাকিম হিসেবেও ঠিক তেমনি রয়ে গেলেন—আগের মতই ভদ্র, চাকরি ও ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা রাখা, এবং নিজের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা জাগানো ইত্যাদি। নতুন কাজটা আগের কাজের থেকে অনেক বেশি আকর্ষনীয় এবং আনন্দদায়ক বলে মনে হল তার। অবশ্য আগের চাকরিতে সুট পরে, বসবার ঘরে অপেক্ষারত উৎকণ্ঠিত উমেদার এবং কেরানিবৃন্দের ঈর্ষান্বিত চাউনিকে অতিক্রম করে সোজা বড়কর্তার ঘরে ঢুকে চা এবং ধূমপানের মধ্যে সত্যিই একটা আত্মপ্রসাদ ছিল। তবে এটাও ঠিক, সেখানে সরাসরি তার অধীনস্থ লোকের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না—শুধু ছিল থানার দারোগা আর বিরোধী খৃষ্টানেরা, যাদের সঙ্গে একমাত্র গ্রামে গেলেই দেখা হত তার। তবে তাদের সঙ্গে সেই মাপা ভদ্র ব্যবহার—যার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল: বন্ধুর মত ব্যবহার করলেও তাদের পিষে শেষ করে দেওয়ার

ক্ষমতা তার রয়েছে—এটা মোটেই ভাল লাগত না। তাছাড়া, সে ধরণের কটা লোকই বা তার অধীনে ছিল! কিন্তু এখন, তদন্তকারী হাকিম হিসেবে তার মনে হয় যে সবাই—সে যত বড় হোমড়া-চোমড়া মানুষই হোক না কেন—সবাই তার অধিকারের আওতায়। সরকারী কাগজে দু চারটে শব্দ লিখে দিলেই হল; তাহলেই, সে যত বড় ক্ষমতাবানই হোক না কেন, তাকে ছুটে আসতে হবে তার সামনে, এবং সে যতক্ষণ না তাকে অনুগ্রহ করে বসতে বলছে তখন দাঁড়িয়ে থেকেই তাকে তার সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইলিচ কোনদিনই এই ক্ষমতার এতটুকু অপব্যবহার করেননি, কখনও কোন সুযোগ নেননি; বরং সর্বদাই সেটাকে নরম করে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আর এই ক্ষমতার উপলব্ধি, এই মহৎ হওয়ার সুযোগ—এটাই ছিল তার নতুন চাকরির প্রতি অসম্ভব আকর্ষণের কারণ। শুনানির সময় যে সব বিষয়ে তার কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকত না, সেসব বিষয় বাদ দেওয়ার কৌশলটা খুব তাড়াতাড়িই তিনি রপ্ত করে নিলেন। এবং সবচেয়ে কঠিন মামলা-গুলোকে এমন কায়দায় পেশ করতে শুরু করলেন, যাতে দলিলে থাকত শুধু মূল বিষয়গুলো—কোনরকম ব্যক্তিগত মতামত নয়। এবং সব থেকে বড় কথা, সবরকম নিয়মকানুন মেনে চলা হত পদে পদে। ১৮৬৪ সালের বিচারবিধির বিভিন্ন সংস্কারকে যারা বাস্তবায়িত করেছিলেন তাদের মধ্যে ইভান ইলিচ ছিলেন অন্যতম।

তদন্তকারী হাকিম হিসেবে নতুন শহরে এসে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হল; কথাবার্তা, ব্যবহারে নতুন কায়দা, নতুন সুর আনলেন তিনি। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রেখে আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অভিজাতদের মধ্য থেকে বন্ধু-বান্ধব বাছাই করলেন। কথায়-বার্তায় উদার নীতি এবং সামাজিক চেতনার প্রকাশ ঘটাতেন; আবার সরকারকে অল্পসল্প সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না। অন্যদিকে সাজ-পোষাকের প্রতি যথেষ্ট নজর দিলেন, কিন্তু দাড়ি গোঁফ কামানো একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সেগুলো যথেচ্ছ বাড়ায় সুযোগ পেল।

নতুন শহরে তার জীবনযাত্রা বেশ আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। রাজ্যপালের বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠীটা তার প্রতি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন হল; ওদিকে আয়ও গেল বেড়ে। হুইস্ট খেলা শিখে নেওয়াতে মনোরঞ্জনের খোরাক পাওয়া গেল যথেষ্ট। আবার দ্রুত চাল দেওয়া এবং খোশমেজাজে তাস খেলার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি জিততে লাগলেন।

নতুন শহরে দু বছর কাটাবার পর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল ইলিচের। যে মহলে তিনি ঘোরাফেরা করতেন তারমধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমতী, চটপটে, মন-মুগ্ধকারী মহিলা ছিলেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা মিখেল। হাকিমের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর বিনোদনের মধ্যে মধ্যে একটা হালকা ধরণের হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক পাতালেন তিনি ফিওদরভনার সঙ্গে।

বিশেষ কর্মাধ্যক্ষের চাকরি করার সময় ইভান ইলিচ প্রায়ই নাচতেন; কিন্তু তদন্তকারী হাকিম নিযুক্ত হবার পর সেটা বেশ কিছুটা কমে গেল। তখন যেটুকু নাচতেন তা এটা দেখাবার জন্যই যে, উচ্চশ্রেণীর আইনবিদ হওয়া সত্ত্বেও নাচের ব্যাপারে তিনি কারও থেকে পিছে পড়ে নেই। আর নাচটা বেশির ভাগই নাচতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার সঙ্গে, এবং তারই ফলে ধীরে ধীরে তার মন জয় করে

নিতে সক্ষম হলেন। যদিও বিয়ে করার কোন পরিকল্পনাই ছিল না তার মনে, তবু নিজেকে প্রশ্ন করার একটা সুযোগ এল, 'সত্যিই তো, বিয়ে না করারই বা কি আছে?'

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা অভিজাত ঘরের মেয়ে, চেহারাটিও ভাল; তাছাড়া কিছু টাকাকড়ি ছিল তার। ইভান ইলিচ আরও ভাল বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু এটিও তো বেশ। নিজের মাইনে আছে, আর আছে মেয়েটির নিজের টাকা—সেটা তার মাইনের সমানই হবে আশা করলেন ইভান ইলিচ। উপযুক্ত শ্বশুরশাশুড়ী পাওয়া যাবে। মেয়েটি সুন্দর, অত্যন্ত মার্জিতা। তাকে ভালবাসেন বলে, তার সঙ্গে মনের মিল আছে বলে যে ইলিচ তাকে বিয়ে করলেন এটা বলা যেমন ভুল হবে, তেমনি নিজের দলের লোকেরা এই বিয়ের পক্ষপাতী বলেই যে বিয়ে করলেন একথা বলাও ঠিক হবে না। দুটো বিষয় ভেবে বিয়ে করলেন তিনি ঃ প্রথমতঃ, এই মেয়েটিকে ঘরে এনে নিজের মনের মত একটা কাজ করলেন, দ্বিতীয়তঃ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যেটা তার করা উচিত বলে মনে করতেন সেটাও করা হল।

বিয়ের কাজকর্ম, বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্ব, দাম্পত্য সোহাগ, নতুন আসবাবপত্র, নতুন বাসনকোসন, নতুন জামাকাপড়,—স্ত্রী প্রথম সন্তানসম্ভবা হওয়া পর্যন্ত সবকিছু বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হল, এবং সেটা এত ভালকরে হল যে ইভান ইলিচ ভাবতে শুরু করলেন সাধারণভাবেই জীবনের যা বৈশিষ্ট্য তেমন একটা খাসা, নিরুদ্বেগ, হাসিখুশি এবং প্রতিনিয়ত সভ্যভব্য ও সমাজ-অনুমোদিত জীবনের পথে বিয়েটা কোন বাধাই নয়, বরং সহায়ক। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসেই তিনি একটা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যেটা অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর, অভব্য এবং অসহনীয়; সেটা আগে থেকে জানার কোন উপায় ছিল না, আবার এড়ানোরও কোন উপায় নেই।

বিনা কারণে—ইভান ইলিচের মতে, শুধু খেয়ালখুশি মাফিক তার স্ত্রী জীবন-যাত্রার আনন্দ ও ভব্যতায় ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করলেন। একেবারে অকারণে হিংসে করতে লাগলেন তাকে, তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য জিদ ধরতে লাগলেন, যা কিছু ইভান ইলিচ করেন তাতেই খুঁত ধরা আরম্ভ হল; শুরু হল স্থূল, অপ্রীতিকর তুলকালাম কাণ্ড।

প্রথম জীবনে যে মার্জিত স্বচ্ছন্দ হাবভাব সাফল্য এনেছিল, প্রথম প্রথম সেটি বজায় রেখে অপ্রীতিকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার আশা ছিল ইভান ইলিচের। স্ত্রীর মেজাজ খারাপ হলে সেটা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতেন; দিন কাটাতে লাগলেন আগের মতই আনন্দে, তাস খেলতে ডাকতেন বন্ধুদের, নিজে যেতেন ক্লাবে বা বন্ধুদের বাড়িতে। কিন্তু তার স্ত্রী একবার তাকে এত কদর্য ভাষায় ধমকালেন এবং তারপর থেকে কথা না শুনলেই এত প্রবল গালিগালাজ চলতে লাগল যে ইভান ইলিচ ভয় পেয়ে গেলেন। তার মনে হল যে বিয়ে ব্যাপারটায়—অন্ততঃ ওর স্ত্রীর মত স্ত্রী হলে—জীবনের সুখ ও শালীনতা যে বাড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। তাই এ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে। কি করে সেটা করা যায় তা ভেবে দেখতে লাগলেন তিনি। একটি মাত্র বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা, সেটি হল স্বামীর কাজ; ফলে স্ত্রীকে প্রতিরোধ করার জন্য ইলিচ নিজের কাজ ও কাজ-সংক্রান্ত নানা দায়িত্বের

একটা আলাদা জগতে আশ্রয় নিলেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, তাকে খাওয়ানো নিয়ে গণ্ডগোল, শিশু ও মায়ের আসল ও কল্পিত নানা অসুখে দরদ দেখানো উচিত ইভান ইলিচের, কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না; ফলে সংসারের বাইরে অন্য এক পৃথিবীতে নিজেকে সরিয়ে নেবার প্রয়োজন হল তার।

স্ত্রীর মেজাজ যত খিটখিটে হতে লাগল, দাবিদাওয়া যত বাড়তে লাগল ততই ইভান ইলিচের জীবনের ভারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল অফিস। অফিসের প্রতি আর টান আরও বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল উচ্চকাঙ্খা।

বেশ তাড়াতাড়ি, বিয়ের মাত্র বছরখানেক পরে, ইভান ইলিচ বুঝতে পারলেন যে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা থাকলেও ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন; এক্ষেত্রে নিজের কর্তব্যপালনের জন্য, অর্থাৎ সমাজ-অনুমোদিত একটু ভদ্রগোছের দিনযাপনের জন্য, কয়েকটি নির্দিষ্ট রীতিনীতি তৈরি করা অবশ্যকর্তব্য, অনেকটা নিজের পেশার ক্ষেত্রে যেমন করা হয় তেমনি।

ইভান ইলিচ সে-রকম রীতিনীতি তৈরি করলেন। বিবাহিত জীবনে তার দাবি হল শুধু বাড়িতে খাওয়ার, স্ত্রীর ও শয্যার সুযোগ-সুবিধে যেটুকু পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, সমাজের মতামত নির্ভর বাহ্যিক ভব্যতাটা বজায় রেখে চলা। বাকি সব কিছুতেই আমোদ ফূর্তি চাইতেন তিনি। পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করতেন; না পেলে তৎক্ষণাৎ আশ্রয় নিতেন তার বেড়া-দেওয়া কাজের জগতে। সেখানেই ছিল তার সুখ।

ভাল চাকুরে বলে নাম ছিল ইলিচের, তিন বছরের মধ্যে পদোন্নতি হল, সহকারী অভিশংসক হলেন তিনি। বিভিন্ন নতুন কাজ, তাদের গুরুত্ব, লোকজনকে আদালতে আনার ও জেলে পাঠাবার অধিকার, জনসমক্ষে বাগ্মিতা এবং তার সাফল্য—এ সবকিছুর জন্যই কাজের প্রতি তার টান গেল আরও বেড়ে।

এরপর আরও বাচ্চা হল। স্ত্রী আগের থেকে আরও বেশি ঝগড়াটে আরও বদমেজাজী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইভান পারিবারিক জীবনের যে-সমস্ত রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে আর স্ত্রীর চিৎকার, চেচামেচিতে মোটেই গায়ে আঁচড় লাগত না তার।

এ শহরে সাত বছর কাজের পর অন্য অঞ্চলে অভিশংসকের পদে বদলি হলেন ইভান ইলিচ। সেখানে পয়সাকড়িতে টান পড়ল, তাছাড়া শহরটাও ভাল লাগত না তার স্ত্রীর। মাইনে অবশ্য আগের চেয়ে বাড়ল, কিন্তু খরচাও গেল বেড়ে। তাছাড়া পরপর দুটি সন্তান মারা যাওয়াতে ইভান ইলিচের পারিবারিক জীবন আরও অপ্রীতিকর হয়ে পড়ল।

নতুন শহরে তাদের সবকিছু মন্দভাগ্যের জন্য স্বামীকে দোষ দিতেন ফিওদরভনা। স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তায় প্রতিটি সময়, বিশেষ করে সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে, এমন সব প্রশ্ন উঠত যেগুলো নিয়ে কোন না কোন সময়ে ঝগড়া হয়েছে দুজনের মধ্যে; তাই সর্বদা আশঙ্কা থাকত হয়ত পুরনো ঝগড়াগুলো আবার নতুন করে বাধবে। দাম্পত্য অনুরাগের পালা আসত মাঝে মাঝে, কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। সেগুলো ছিল দ্বীপের মত—গুপ্ত আক্রোশের সমুদ্রে যাত্রা করার আগে দুজনের বিশ্রাম করার জায়গার মত, সে আক্রোশ প্রকাশ পেত দুজনের

সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি ভাবটায়। ছাড়াছাড়িটা যে ঠিক উচিত নয়, এবং তা ভেবে হয়ত কষ্ট পেতেন তিনি, কিন্তু তারই মধ্যে যে অবস্থাটাকে শুধু স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলেন তাই নয়, এটাকেই ভাবতেন তাঁর পারিবারিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য। এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে রেহাই পাবার চেষ্টায় ছিলেন, তিনি তবে চাইতেন যাতে এগুলো ক্ষতিকারক বা অভব্যগোছের না হয়। বাড়িতে ক্রমশ কম থেকে, এবং থাকতে বাধ্য হলে বাইরের লোকের উপস্থিতিতে আত্মরক্ষা করে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা হল তার কাজ। চাকরিই হল তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। নিজের ক্ষমতার বোধ, ইচ্ছে করলে যে-কারোর সর্বনাশ করার অধিকার, আদালতে ঢুকে অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে নিজের ভারিক্কি চেহারা, উচ্চপদস্থ এবং নিম্নপদস্থ প্রত্যেকের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা, মামলা পরিচালনায় নিজের দক্ষতা —এ সবকিছুই তার মনকে উৎফুল্ল করত; এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ, নিমন্ত্রণ, তাসখেলা—সবকিছু মিলিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলল তার জীবন। সে কারণে তার জীবনযাত্রা চলল ঠিক তেমনিভাবে, যেমনটা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

এভাবেই সাতটা বছর কাটল। বড় মেয়েটির বয়স এখন ষোলো, আরও একটি সন্তান মারা গিয়েছে, তারপর ছেলে একটি—তার স্কুলে-পড়া নিয়েই যত মনোমালিন্য। ইভান ইলিচ চেয়েছিলেন তাকে আইনের স্কুলে ভর্তি করতে, কিন্তু শুধুমাত্র আক্রোশের বশবর্তী হয়ে ফিওদরভনা তাকে জিমনাসিয়ামে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি বাড়িতে পড়াশোনা করে বেশ বাড়ছে; ছেলেটিও ছাত্র হিসেবে মন্দ নয়।

॥ ৩ ॥

ইভান ইলিচের বিবাহিত জীবনের সতেরোটি বছর কাটল এভাবে। ইতিমধ্যে তিনি প্রবীণ অভিশংসক, আরও ভাল চাকরি পাবেন এ আশায় কয়েকটি ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন. ঠিক সেই সময়ে এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল যাতে তার শান্ত জীবনযাত্রা একেবারে বিগড়ে গেল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে প্রধান বিচারকের গদীতে আসীন হওয়ার মনস্কামনা ছিল তার, কিন্তু গোপ্পে কায়দা করে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে পেল চাকরিটা. অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন ইভান ইলিচ, নানা দোষারোপ করে ঝগড়া বাধালেন গোপ্পে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তার প্রতি তাদের মনোভাব কঠিন হল, ফলে পরের চাকরির বেলাতেও পাত্তা দেওয়া হল না তাকে।

এটি ঘটেছিল ১৮৮০-তে। ইভান ইলিচের জীবনে সবচেয়ে কষ্টের বছর সেটা। একদিকে. দেখা গেল নিজের রোজগারে সংসার চলছে না; অন্যদিকে তাকে সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছে। যেটা তার মনে হত প্রচণ্ড ও নিষ্ঠুর অন্যায়, সেটা সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নিত অন্যেরা। এমনকি তার বাবা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করাটা দরকার মনে করলেন না। ইভান ইলিচ ভাবলেন সবাই তাকে ত্যাগ করেছে, ওদের ধারনা, তিনি যে ৩৫০০ রুবল করে পাচ্ছেন সেটা তার সৌভাগ্য। শুধু তিনি নিজেই জানতেন, যেসব অন্যায় তাকে সহ্য করতে হয়েছে, স্ত্রীর অবিরাম গঞ্জনা, আয়ের চেয়ে বেশি খরচের ফলে ঋণের বোঝা, এসব মিলিয়ে তার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

সে বছর গ্রীষ্মকালে খরচ কমাবার জন্য তিনি ছুটি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গেলেন

শ্বশুরবাড়িতে।

সেখানে, চাকরির কাজ না থাকায় জীবনে এই প্রথম ইভান ইলিচের শুধু যে একঘেয়ে লাগল তাই নয়, সেটা এত শোচনীয় লাগল যে তিনি ঠিক করলেন এভাবে থাকা চলে না, একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতেই হবে।

বারান্দায় পায়চারি করে একটি বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে মনস্থির করলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে গিয়ে ধরাধরি করে অন্য মন্ত্রিদপ্তরে বদলী হবেন; তাহলে তার কদর যারা বোঝে না তারা শায়েস্তা হবে।

পরের দিন, স্ত্রী ও শ্যালকের কোন অনুরোধে কান না দিয়েই রওনা হলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে।

যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য: পাঁচ হাজার রুবলের একটা চাকরি জোগাড় করা। কোন মন্ত্রিদপ্তর বা বিভাগ, কী ধরনের কাজ—তাতে তার কিছু এসে যায় না। যে কোন প্রশাসনিক সংগঠনে চাকরি হোক, ব্যাঙ্কে, রেলওয়েতে, সম্রাজ্ঞী মারিয়ার কোন প্রতিষ্ঠানে, এমনকি শুল্কবিভাগে; শুধু চাকরিটা হওয়া চাই পাঁচহাজার রুবলের এবং যে করেই হোক তার কদর না-বোঝা দপ্তর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবেই।

এই যাত্রার ফলেই এল তার জীবনে বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত সাফল্য। কুরস্কে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলেন ইলিন নামের একটি বন্ধু, বললেন এইমাত্র কুরস্কের রাজ্যপাল একটি টেলিগ্রাম পেয়েছেন; তাতে বলা হয়েছে যে মন্ত্রিদপ্তরে খুব বড় একটা পরিবর্তন হবে; পিওতর ইভানভিচের জায়গায় নিযুক্ত হবেন ইভান সেমিওনভিচ।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি রাশিয়ার কাছে অর্থপূর্ণ, তাছাড়া ইভান ইলিচের কাছেও এর বিশেষ তাৎপর্য ছিল। নতুন একটি লোক, পিওতর পেত্রভিচ ও স্পষ্টতই তার বন্ধু জাখার ইভানভিচের পদোন্নতি ইভান ইলিচের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। জাখার ইভানভিচ তার বন্ধু, তার সঙ্গেই পড়েছিলেন তিনি।

মস্কোতে জানা গেল খবরটা ঠিক। সেন্ট পিটার্সবুর্গে পৌঁছে ইলিচ দেখা করলেন ইভানভিচের সঙ্গে। ইভানভিচ কথা দিলেন যেখানে ইলিচ কাজ করেন সেই বিচারবিভাগীয় মন্ত্রিদপ্তরে তার যোগ্য কাজ তাকে জোগাড় করে দেবেন।

এক সপ্তাহ পরে ইভান ইলিচ টেলিগ্রাম করলেন স্ত্রীকে: 'মিলারের জায়গায় জাখার। প্রথম প্রতিবেদনের পরেই আমার চাকরি।'

পরিবর্তনের দৌলতে নিজেরই মন্ত্রিদপ্তরে অপ্রত্যাশিতভাবে সহকর্মীদের দুধাপ ডিঙিয়ে পাঁচ হাজার রুবলের একটি চাকরি পেয়ে গেলেন ইভান ইলিচ; তাছাড়া রাহাখরচ পাওয়া গেল সাড়ে তিন হাজার রুবল। আগের শত্রু এবং মন্ত্রিদপ্তরের ওপর তার মনের রাগ আর রইল না, মহা খুশি হলেন তিনি।

গ্রামে ফিরলেন বেশ খোশমেজাজে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এমন আনন্দ তার অনেকদিন হয়নি। ফিওদরভনাও বেশ চাঙা হয়ে উঠলেন, দুজনের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তাকে লোকে কেমনভাবে গ্রহণ করেছিল, তার শত্রুরা অপদস্থ হয়ে এখন কেমন তোষামোদ করছে, তার নতুন চাকরি, সেন্ট পিটার্সবুর্গে তার খাতির নিয়ে তাদের কী হিংসে, বিশেষ করে কারও কারও অতিরিক্ত ভালবাসা, এসবের বিশদ বর্ণনা দিলেন ইভান ইলিচ।

মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনে তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করার ভান করলেন ফিওদরভনা; কোন কথাতেই বাধা দিলেন না এতটুকু। যে শহরে বদলী হয়েছেন সেখানে কী করে সংসার পাতবেন তার পরিকল্পনায় লাগলেন উঠে পড়ে। স্ত্রীর সব পরিকল্পনা তারই মত, দুজনের মধ্যে মতের মিল, ছোট্ট একটু গণ্ডগোলের পর জীবন আবার হাসিখুশি হবে, হবে প্রীতিকর এবং ভব্য, ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত—এ ভেবে ইভান ইলিচের অত্যন্ত আনন্দ হল।

অল্প কদিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন ইভান ইলিচ। ১০ই সেপ্টেম্বর তাকে নতুন চাকরিতে যোগদান করতে হবে; তাছাড়া গুছিয়ে বসতে হবে নতুন জায়গায়। মফঃস্বল থেকে সব সরিয়ে আনতে হবে, কেনাকাটা আছে, ফরমায়েশ দিতে হবে অনেক কিছুর। এক কথায়, বুদ্ধি করে, বেশ গুছিয়ে বসতে হবে।

সবকিছুর ভারি সুব্যবস্থা হল। স্ত্রীর সঙ্গে হল লক্ষ্যের মিল; তাছাড়া দাম্পত্য জীবন তো তাদের ছিল খুব কম, তাই বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকটার পর এমন মিল আর হয়নি কখনও। ইভান ইলিচ ভেবেছিলেন পরিবারের সবাইকে একই সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তার পরিবারের সকলের প্রতি হঠাৎ বেশি মাত্রায় সদয় হয়ে ওঠা শ্যালকের অনুরোধে তাকে একাই রওনা দিতে হল।

নিজের সাফল্য ও স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তর মিটে যাওয়ায় খুশির ভাব নিয়ে চললেন ইলিচ। চমৎকার একটা ফ্ল্যাট পেলেন, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তিনি। পুরনো কায়দায় বেশ বড় ড্রয়িং-রুম, আরামদায়ক কাজের ঘর, স্ত্রী-মেয়ের নিজস্ব ঘর, ছেলের পড়াশোনার ঘর—সবকিছু যেন আগে থেকে তাদের জন্য ঠিক করা ছিল। বাড়ি সাজানো গোছানোর ভার তিনি নিজেই নিলেন। আসবাবপত্র কিনলেন বেশির ভাগ পুরনো, যা তার মনে হল বিশেষ আভিজাত্যপূর্ণ। সবকিছু ধীরে ধীরে বেড়ে নিজের মনের মত হয়ে দাঁড়াল। কাজটা অর্ধেক সমাপ্ত হতেই মনে হল জিনিসটা প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। একেবারে সাজানো হয়ে গেলে ফ্ল্যাট যে বেশ সুন্দর দেখাবে তাতে কোন সন্দেহই রইল না ইভান ইলিচের। লোকজনকে অভ্যর্থনা করার ঘরটা সাজানোর পর কেমন দেখাবে তা ভাবতে ভাবতে ঘুম এল তার। অসমাপ্ত ড্রয়িং-রুমের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ফায়ার-প্লেস, পর্দা, চেয়ার, দেয়ালে টাঙানো চীনেমাটির রেকাবি এবং ব্রোঞ্জের জিনিসগুলো। তার স্ত্রীর ও মেয়ের রুচিও এমনই; তারা এ দেখে কেমন খুশি হবে তা ভেবে বেশ ভাল লাগল তার। তারা এসে কি দেখবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না এখন। তার কপাল খুবই ভাল বলতে হবে, এমন কিছু পুরনো জিনিস পেয়ে গেলেন সস্তায়, যা সবকিছুরই জৌলুস বাড়িয়ে দেবে। ওরা এলে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য চিঠিপত্রে ইচ্ছে করেই তিনি এসব বিষয়ের কথা কম লিখতেন। বাড়ি গোছানোর কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তার পেয়ারের নতুন চাকরিটায় যতটা মন দেবেন ভেবেছিলেন ততটা আর দেওয়া গেল না; এজলাসে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন, কারণ তখন পর্দা টাঙাবার তাকটা এমনি থাকবে না কাপড় দিয়ে মোড়া হবে তা। এসব ব্যাপারে ভাবতেন তিনি এত উৎসাহী হয়ে পড়লেন যে মাঝে মাঝে নিজেই হাত লাগাতেন, আসবাবপত্র সরাতেন এদিক থেকে ওদিকে, নিজেই টাঙাতেন পর্দা। কি করে পর্দা ঝোলাতে হয় সেটা নির্বোধ মজুরদের দেখিয়ে দেবার জন্য একদিন মই বেয়ে উঠেছেন; সেখান থেকে হঠাৎ পা ফস্কে পড়ে গেলেন,

কিন্তু বলিষ্ঠ এবং চটপটে হওয়ায় নিজেকে সামলে নিলেন; ফলে শুধু জানলার ফ্রেমটাতেই ধাক্কা খেলেন। পাঁজরের চোট-টা কিছু দিন ব্যথা করে সেরে গেল। এ দিনগুলোয় ইভান ইলিচের বিশেষ সুস্থ মনে হল নিজেকে, মনে বেশ ফুর্তি এল। চিঠিতে লিখলেন: 'মনে হচ্ছে আমার বয়স পনেরো বছর কমে গিয়েছে।' তার আশা ছিল সেপ্টেম্বরের মধ্যে সবকিছু শেষ হবে, কিন্তু কাজ চলল অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফলটা হল চমৎকার। এটা যে শুধু তার একারই ধারণা তা নয়, যারা স্বচক্ষে দেখলেন তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করলেন।

প্রকৃতপক্ষে, যা হল সেটা ঠিক তাদের বেলাতেই হয় যারা সত্যিকার বড়লোক নন, কিন্তু বড়লোকের মত হতে চান; ফলে শেষ পর্যন্ত তারা কেবল পরস্পরের মত হন। পর্দা, আবলুস কাঠের আসবাব, ফুল, গালিচা আর ব্রোঞ্জের মূর্তি,—কালচে আর ঝকঝকে এমন সবকিছুই যা এক বিশেষ মহলের লোকেরা জোটায় সেই মহলের অন্যান্য লোকের মত হবার জন্য। আর ইভান ইলিচের ফ্ল্যাটটা দেখতে এত বেশি অন্যান্যদের ফ্ল্যাটের মত যে মনে কোন দাগই কাটে না। কিন্তু ইলিচের নিজের মনে হল যে তার ফ্ল্যাটটা সত্যিই অসাধারণ। স্টেশনে গিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যখন ফিরে এলেন ফ্ল্যাটটায়, এবং সাদা নেকটাই পড়া আর্দালি যখন ফুল দিয়ে সাজানো ঢোকবার ঘরটার দরজাটা খুলে দিল সসম্ভ্রমে তখন সবাই ঢুকলেন গিয়ে ড্রয়িং-রুমে, তারপর কাজের ঘরে আনন্দে প্রত্যেকেই নেচে উঠলেন। বেশ খুশি হয়ে ইলিচ সকলকে সমস্ত ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন, ওদের প্রশংসা শুনলেন বার বার; তার মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির জ্যোতি। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় চা খাবার সময়ে কথায় কথায় ফিওদরভনা কেমন করে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করাতে ইলিচ মৃদু হেসে কী করে তার পা ফস্কে গিয়েছিল, কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল মজুরটা তা বেশ অঙ্গভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'জিমন্যাস্ট তো আর এমনি এমনি হইনি। অন্য কেউ হলে প্রাণে মারা পড়ত, কিন্তু আমার পাঁজরে সামান্য চোটের ওপর দিয়েই গিয়েছে; ছুঁলে ব্যথা করে, তবে ত. ক্রমে কমে যাচ্ছে। সামান্য একটা কালশিটে রয়েছে।

শুরু হল নতুন ফ্ল্যাটে তাদের জীবনযাত্রা। বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার পর যেমন মনে হয় একটা মাত্র ঘর হলেই তো চলত, নতুন রোজগারে যেমনটা মনে হয়, আর একটু—মাত্র পাঁচ শ রুবল বেশি হলেই হয়ে যেত—তেমনি। সবকিছু মিলিয়ে মোটের ওপর ভালই চলল। বিশেষ করে শুরুতে, তখনও ফ্ল্যাট সাজানো একেবারে শেষ হয়নি, তখনও কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা, অর্ডার দেওয়া, সারানো, এদিক থেকে ওদিক সরানো ইত্যাদি বাকি রয়েছে। তখনও অবশ্য মাঝে মাঝে ছোটখাটো মনোমালিন্য হত, কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনেই এত খুশি আর নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে বড় রকমের ঝগড়া শুরু হওয়ার আগেই সব মিটে যেত। ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ সাজানো শেষ হয়ে গেলে কেমন যেন একঘেয়ে লাগত, মনে হত কী যেন একটা নেই; কিন্তু এরই মধ্যে আলাপ-পরিচয় শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে নতুন নানা অভ্যাস, এবং ক্রমে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল।

ইভান ইলিচের সকাল কাটত আদালতে, বাড়ি ফিরতেন খাবার সময়। প্রথম প্রথম সব সময়েই বেশ খোশমেজাজে থাকতেন, অবশ্য বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মনে অল্প স্বল্প বেদনা পেতেন। কিন্তু মোটের ওপর তার ধ্যানধারণায় জীবনযাত্রা

যেমনটা হওয়া উচিত ঠিক সে রকম হয়ে দাঁড়াল : সহজ, আনন্দময়, মার্জিত। ঘুম থেকে উঠতেন নটায়, কফি খেতেন, খবরের কাগজ পড়তেন, তারপর সরকারী পোষাক চাপিয়ে যেতেন আদালতে। সেখানে দৈনন্দিন কাজের স্রোতে ভেসে যেতেন। উমেদার, দলিলপত্র, অফিস, এজলাস—কাঁচা জীবন্ত যা কিছু সবসময় সরকারী কাজের সঠিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় তা সব সরিয়ে ফেলতে হবে ; সরকারী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না লোকজনের সঙ্গে, সম্পর্কের উপলক্ষ্যটাও হবে সরকারী কাজের প্রয়োজনে, এবং সম্পর্কটাও হতে হবে নিছক সরকারী। যেমন, কিছু একটা জানতে এলেন কেউ, নিজের সরকারী পদের বাইরে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন না ইভান ইলিচ ; কিন্তু আদালতের সদস্য হিসেবে যদি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে ইভান ইলিচের, তাহলে সে সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যে তার জন্য সবকিছুই করবেন তিনি। তার সঙ্গে মানবিক, বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করবেন, অর্থাৎ সৌজন্য দেখাবেন। কিন্তু সরকারী সম্পর্ক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে অন্য সবকিছু। সরকারী সম্পর্ককে দূরে রাখার, নিজের জীবন থেকে একেবারে আলাদা রাখার অসাধারণ গুণ ছিল ইভান ইলিচের। প্রতিভা ও অভ্যাসের ফলে সে গুণকে তিনি এমন এক পর্যায়ে তুলেছিলেন যে সরকারী সম্পর্কের সঙ্গে মানবোচিত সম্পর্ক মেশাবার সুযোগ মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে দিতেন মজা করে। এ সুযোগ তিনি নিজেকে দিতে পারতেন এজন্য যে দরকার হলে সরকারী সম্পর্ক আবার আলাদা করে নেবার, মানবোচিত সম্পর্ক ছাঁটাই করার মত ইচ্ছাশক্তি তার ছিল। শুধু যে সুষ্ঠভাবে তিনি এটা করতেন তা নয়, করতেন বেশ সাধারণভাবে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত ধূমপান, চা-পান, রাজনীতির বিষয়ে সামান্য কথাবার্তা। কিছুটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে, কিছুটা তাস নিয়ে, আর সবচেয়ে বেশি চাকরি-বাকরি নিয়ে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন, কিন্তু মনে থাকত সেই তৃপ্তি, যেটা অদ্ভুত খেলা দেখাবার পর বোধ করে ওস্তাদেরা। তার নিজের বেলায় খেলাটা ছিল অর্কেস্ট্রার প্রথম ভায়োলিনের মত। বাড়িতে হয় স্ত্রী কন্যা কোথাও বেড়াতে গেছেন, নয়ত কেউ এসেছেন ; ছেলে হয় স্কুলে নয়ত গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া তৈরি করছে, জিমনাসিয়ামে যা কিছু শেখানো হয় তারই অনুধ্যান আর কি। সবকিছুই মনোরম। খাবার পর অতিথি না থাকলে মাঝে মাঝে ইলিচ এমন একটা বই নিয়ে বসতেন যার কথা সকলের মুখে মুখে ফিরত। তারপর সন্ধ্যায় কাজে লাগতেন, অর্থাৎ দলিলপত্র পরীক্ষা করতেন, আইনের সূত্র বের করতেন, সাক্ষীর সাক্ষ্যকে খুঁটিয়ে সেটাকে আইনের ধারার মধ্যে আনতেন। কাজটা বিরস ছিল না, তেমনি প্রীতিকরও বলা চলেনা। তাসখেলা বাদ দিতে হলে কাজটা বিরস, কিন্তু তাসখেলা না থাকলে, একলা বা স্ত্রীর সঙ্গে বসে থাকার চেয়ে ভাল। ইভান ইলিচের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর ব্যাপার ছিল সমাজে যাদের খাতির তেমন সব মহিলা ও ভদ্রলোকদের ছোটখাটো নেমন্তন্নে ডাকা। এমনভাবে সময় কাটানো যা এই ধরনের লোকেরা চিরকাল কাটিয়ে থাকেন। যেমন ইলিচের ড্রয়িং-রুম অন্য সমস্ত ড্রয়িং-রুমেরই মত, অনেকটা তেমনি।

এমনকি একদিন তারা সান্ধ্যপার্টিও দিলেন যাতে নৃত্যের আয়োজন ছিল। ইভান ইলিচের বেজায় খোশমেজাজ, সবকিছু চমৎকারভাবে চলল, শুধু মিষ্টি আর পেস্ট্রি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা জোর ঝগড়া হল, এই পর্যন্তই। প্রাসকোভিয়া ফিওদর-

ওনার নিজের একটা পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ইলিচ গোঁ ধরলেম যে সবচেয়ে দামী মিষ্টির দোকান থেকে জিনিস আনাতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী প্রচুর পেস্ট্রি এল। ঝগড়াটা বাধল এই কারণে যে অনেকগুলো পেস্ট্রি পড়ে রইল, আর মিষ্টির বিল হল ৪৫ রুবল। ঝগড়াটা এত তীব্র ও কটু হয়েছিল যে ফিওদরভনা তাকে 'বোকা' ও 'ঘ্যানঘেনে' বলে গাল পাড়লেন, আর ইভান ইলিচ নিজের মাথা জোরে চেপে ধরে বিবাহবিচ্ছেদের ভয় দেখালেন। কিন্তু পার্টিটা হয়েছিল বেশ জমজমাট। সেরা লোকদের সমাগম হল, ইভান ইলিচ নাচলেন প্রিন্সেস ত্রুফনভার সঙ্গে, 'আমার দায়িত্ব তুমি নাও' নামের প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাত্রী ত্রুফনভার বোন যিনি। সরকারী কাজে তার যে আনন্দ সেটা ছিল, উচ্চাশা পূরনের আনন্দ, সামাজিকতার আনন্দ ছিল অহমিকা পরিতৃপ্তির আনন্দ; কিন্তু যেটাতে তিনি সবচেয়ে আন্তরিক আনন্দ পেতেন সেটা তাসখেলা। তিনি স্বীকার করতেন যে, যা কিছু হোক, জীবনে যত দুঃখের ঘটনাই ঘটুক, সবকিছু অতিক্রম করে প্রদীপের মত জ্বলে একটিই মাত্র আনন্দ, সেটি হল কয়েকটি ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে, যারা চেঁচায় না, এমন জুড়ি নিয়ে চার-হাতের 'ভিন্ট' খেলতে বসা; খেলাটা চলবে গভীর মনোযোগে বুদ্ধিমানের মত; তারপর নৈশাহার আর এক গ্লাস মদ্যপান। তাসখেলার পরে বিশেষ ভাল মেজাজে শুতে যেতেন বিছানায়, বিশেষ করে অল্পস্বল্প কিছু জিতলে।

এইভাবে চলল তাদের জীবনযাত্রা। সমাজের সেরা মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা; বাড়িতে প্রায়ই আসেন হোমরাচোমরা ও ছেলেছোকরার দল।

তাদের গোষ্ঠীর লোক কারা হবে সে বিষয়ে স্বামী স্ত্রী ও কন্যার মধ্যে কোন মতান্তর ছিল না। সাজসজ্জাহীন যেসব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাদের জাপানী প্লেট টাঙানো ড্রয়িং-রুমে খাতির জানাতে ছুটে আসত তাদের এড়াবার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী ও কন্যা পরস্পরকে জিজ্ঞেস না করেই সমান নৈপুণ্য দেখাতেন। বেশি দিন যেতে না যেতে এই সব অবাঞ্ছিত মানুষদের আসা বন্ধ হল, গলোভিনদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে রইলেন শুধু সমাজের সেরা ব্যক্তিরা। উদীয়মান তরুণেরা লিজার পাণিপ্রার্থী; দ.মত্রি ইভানভিচের পুত্র ও তার একমাত্র উত্তরাধিকারী, তদন্তকারী হাকিম পেত্রিশ্চেভ এত সোৎসাহে লিজার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হল যে ইভান ইলিচ কথাটা পাড়লেন ফিওদরভনার কাছে। বললেন ওদের নিয়ে একটা তিনঘোড়ার স্লেজ ভ্রমণ বা নাট্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত করলে কেমন হয়?

এভাবে জীবনযাপন করতে লাগলেন তারা। এভাবেই সবকিছু চলল অপরিবর্তিত, সবকিছু চমৎকার।

॥ ৪ ॥

সবাই বহাল তবিয়তে ছিলেন। মাঝে মাঝে মুখে একটা অদ্ভুত স্বাদ ও পেটের বাঁদিকে অস্বস্তির কথা নিয়ে অনুযোগ করতেন ইভান ইলিচ, কিন্তু সেটাকে কেউ অসুখ বলে মেনে নেয়নি।

কিন্তু অস্বস্তিটা দিনে দিনে বেড়ে চলল। যদিও সেটা তখনও পর্যন্ত আসল ব্যথায় দাঁড়ায়নি তবু পাঁজরে সবসময় ভারি একটা চাপ, একটা মনমরা ভাব তৈরি করল। সে ভাবটা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলল, শেষে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করল সেই সহজ সুষ্ঠু জীবনযাত্রার আনন্দে যা গলোভিন পরিবার ফিরে পেয়েছিলেন অতি

কষ্টে। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া আগের চেয়ে বেশি করে শুরু হল, এবং বেশি দিন যেতে না যেতে জীবনযাপনের সহজ আনন্দটা শেষ হয়ে গেল, শালীনতা টিকিয়ে রাখা হল কোনক্রমে। নিয়মিতভাবে ঝগড়া ঢুকতে লাগল দুজনের মধ্যে।

প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনা যথার্থই বলতে শুরু করলেন যে তার স্বামীর প্রকৃতি সত্যিই দুঃসহ। স্বভাবসুলভ অত্যুক্তি করে বলতেন, ওর প্রকৃতি চিরদিনই ওরকম সাংঘাতিক ; শুধু তার মত মেয়েই বিশ বছর সইয়ে থাকতে পারে। কথাটা সত্যি। এখন ঝগড়াটা শুরু করতেন ইভান ইলিচ নিজেই। ঠিক খেতে বসার আগে, বিশেষ করে সুপ দেবার সময়ে সাধারণতঃ দোষ ধরা শুরু হত তার। তার চোখে পড়ত, হয় বাসনে একটা কিছু খুঁত আছে, নয়ত খাবারটা খারাপ ; হয়ত ছেলে কনুই রেখেছে টেবিলে কিংবা মেয়ে ঠিক মত খোঁপা বাঁধেনি। আর এ সবকিছুর জন্যই তিনি দোষ দিতেন ফিওদরভ্‌নাকে। প্রথম প্রথম পালটা জবাব দিতে ছাড়তেন না ফিওদরভনা ; অপ্রিয় নানা কথা বলতেন স্বামীকে, কিন্তু দুবার ঠিক খেতে বসার পরই ইভান ইলিচ এত ভয়ঙ্করভাবে রেগে গেলেন যে ফিওদরভনা বুঝতে পারলেন, ওটা একটা রোগ, খাবার সময়ই তা দেখা দেয়। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে আর জবাব দিতেন না ; শুধু খাবার জন্যে তাড়া দিতেন। নিজের আত্মসংযমের খুব তারিফ করতেন ফিওদরভনা নিজেই। স্বামীর স্বভাবটা অসহ্যকর, তার জীবন অস্থির করে তুলেছেন তিনি, এই সিদ্ধান্ত করে নিজের প্রতি করুণা হতে লাগল তার। আর করুণা যতই বাড়তে লাগল ততই বাড়ল স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ। স্বামী মরুক এই কামনা করতে চাইতেন তিনি, কিন্তু সেটা তো আর করা যায় না, কেননা তাহলে যে অর্থাগমের কোন পথই থাকবে না। ফলে স্বামীর প্রতি আরও রাগ হল তার। ভাবলেন, ইলিচের মৃত্যুতেও তার পরিত্রাণ নেই ; উঃ কী দারুণ অসুখী তিনি ৮. কথাটা ভেবে বিরক্ত লাগল তার, কিন্তু সে বিরক্তিটা চেপে রাখলেন তিনি। আর সেই চেপে রাখা বিরক্তি ইন্ধন জোগাল তার স্বামীর বিরক্তিতে।

একটা ঝগড়ার পর মিটমাটের সময়ে নিজের খিটিমিটি ভাবের কথা স্বীকার করে ইভান ইলিচ বললেন যে অসুস্থতার দরুন এটা হয় ; উত্তরে ফিওদরভনা বললেন, যদি অসুখ হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসা করা দরকার ; নাম করা একজন ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে তাকে।

ইভান ইলিচ তাই করলেন। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন তাই হল, সচরাচর যেমনটা হয় তেমনি—সেই বসে থাকা, ডাক্তারের ভারিক্কি চালে চলাফেরা ; চালটা তার চেনা, কেননা আদালতে তিনি নিজে ঠিক এ রকম ভারিক্কি চালেই চলেন ; সেই ঠুকঠুক করে বুক পিঠ দেখা, সেই শোনা, সেইসব প্রশ্ন করা যার উত্তর দেওয়াটা নিরর্থক, কেননা সেগুলো সব বাঁধা-ধরা প্রশ্ন এবং বাঁধা-ধরা উত্তর। মুখে সেই অর্থবহ ইঙ্গিত যার মানে এই যে, ডাক্তারের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে সবকিছু একেবারে ঠিক হয়ে যাবে, কেননা এ অবস্থায় ঠিক কী করা উচিত তা কেবল তাদেরই জানা—রোগী নির্বিশেষে ডাক্তারের সেই একই আচরণ। আদালতে যেমন হয় সবকিছু ঠিক তেমনি। অভিযুক্তদের সামনে তিনি নিজে যেমন ভারিক্কি ভাব করতেন তার সামনে নামজাদা ডাক্তারটির ভাবটাও তেমনি।

ডাক্তার বললেন, সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে আপনার ভেতরে অমুক-অমুকটায় গড়বড়, কিন্তু যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় আমাদের রোগ নির্ণয় ঠিক নয়, তাহলে

ধরে নিতে হবে যে আপনার অমুক এই-এই রোগ হয়েছে। এবং তাই যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে···ইত্যাদি। কিন্তু ইভান ইলিচের কাছে শুধু একটি প্রশ্ন জরুরী ছিল; তা হচ্ছে তার অবস্থাটা বিপজ্জনক, কি না? কিন্তু সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন ডাক্তার। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে, এসব প্রশ্ন অনর্থক এবং বিবেচনার অযোগ্য। শুধু যেগুলো সম্ভব তেমনি কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভাবা চলতে পারে। যেমন কিডনির দোষ, দীর্ঘকালস্থায়ী শ্লেষ্মা কিংবা অন্ত্রের কোন ব্যাধি। ইভান ইলিচের জীবনটা কোন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না—ব্যাপারটা শুধু কিডনি ও অন্ত্রকে নিয়ে। তার সামনে তিনি আন্ত্রিক ব্যাধির স্বপক্ষে চমৎকার সমাধান দিলেন। শুধু বলে রাখলেন যে প্রস্রাব পরীক্ষার ফলে নতুন কোন সূত্র মিলতে পারে, তখন আবার হয়ত কেসটাকে নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। কাঠগড়ায় আসামীর সামনে ঠিক এই জিনিসটা, এবং ঠিক এমনি চমৎকারভাবেই, হাজার বার করেছেন ইভান ইলিচ নিজে। সুতরাং চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে আসামীর দিকে বিজয়গর্বে, এবং খুশিখুশি দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার ঠিক তেমনি চমৎকারভাবে একটি সংক্ষিপ্তসার দিলেন। ডাক্তারের মুখে বক্তব্য শুনে ইভান ইলিচ ঠিক করলেন তার অবস্থাটা খারাপ, কিন্তু তাতে ডাক্তারের কিছু এসে যায় না, এমনকি কারোই কিছু না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তিনি, নিজের প্রতি গভীর করুণা জেগে উঠল তার এবং ঠিক সমান আক্রোশ হল ডাক্তারের প্রতি, এমন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি এতটা উদাসীন এ কথা ভেবে।

কিন্তু কিছু না বলে ইলিচ উঠে পড়লেন, টেবিলে ফি-র টাকাটা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'রোগীদের কাছ থেকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শোনার অভ্যেস আপনার আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বলুন তো, সত্যি সত্যিই আমার অবস্থা বিপজ্জনক কি না?'

চশমার ওপর দিয়ে একটি চোখে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তার, মনে হল যেন বলতে চাইছেন, 'আপনাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, আসামী, তার বাইরে গেলে আদালত থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।'

কিন্তু ডাক্তার তা বললেন না, বললেন, 'যা বলা দরকার ও উচিত মনে করছি আপনাকে তো তা বলেছি। বাকি সব বিশ্লেষণে ধরা পড়বে।' কথাটা বলে ইলিচকে নমস্কার ঠুকলেন তিনি।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ইভান ইলিচ, গোমড়া মুখে স্লেজে বসে বাড়ির দিকে চললেন। সারাটা পথ ডাক্তার যা যা বলেছেন তাই নিয়ে বারবার ভাবলেন অস্পষ্ট গোলমেলে সব বৈজ্ঞানিক শব্দকে সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করে চাইলেন তার উত্তর: 'খারাপ—খুব খারাপ, না এখনও কিছু নয়?' আর তার মনে হল ডাক্তার যা বলেছেন তার সারার্থ এই যে অবস্থাটা বিশেষ খারাপ। রাস্তায় সবকিছু তার চোখে বেজার ঠেকতে লাগল; কোচওয়ানগুলো বেজার, বাড়িগুলো বেজার, পথচারীরা বেজার, দোকানগুলো—সবকিছু বেজার। সেই ব্যথাটা—সেই চাপা টনটনে ব্যথাটা এক মুহূর্ত যার বিরাম নেই—ডাক্তারের নানা অবোধ্য মন্তব্যের আলোয় আরও গুরুতর একটা রূপ গ্রহণ করল। নতুন একটা উৎকণ্ঠার বোধে তিনি মনোনিবেশ করলেন ব্যথাটায়।

বাড়িতে পৌঁছে যা ঘটেছে বলতে শুরু করলেন স্ত্রীকে। স্ত্রী শুনছিলেন কন্তু কথার মাঝখানে টুপি মাথায় ঘরে ঢুকল মেয়ে। মা মেয়ে বাইরে যাচ্ছেন।

জোর করে কিছুক্ষণ বসে মেয়ে বাপের বিরস কাহিনী শুনল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, আর স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত শুনলেন না।

স্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, এবার থেকে নিয়ম করে ওষুধ খেও। প্রেসক্রিপসনটা দাও। গেরাসিমকে ওষুধের দোকানে পাঠাই।' তারপর জামাকাপড় বদলাতে চলে গেলেন ভেতরে।

যতক্ষণ স্ত্রী ঘরে ছিলেন ততক্ষণ দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ছিলেন ইলিচ, এবার সেটা মোচন করলেন গভীরভাবে। মনে মনে বললেন, 'ব্যাপারটা হয়ত এমন কিছু নয়…'

ওষুধ খাওয়া শুরু হল আর শুরু হল ডাক্তারের সব নির্দেশ মেনে চলা; নির্দেশগুলো প্রস্রাব বিশ্লেষণের পর বদলে গেল। কিন্তু হয় বিশ্লেষণে নয় বিশ্লেষণের পর কী করা উচিত তা নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছিল; ডাক্তারকে ধরা যায়নি, কিন্তু কেন জানি না যা হবে তিনি বলেছিলেন সে রকমটা হল না। ডাক্তার হয় কিছু একটা ভুলে গিয়েছিলেন, নয়ত মিথ্যে বলেছিলেন, কিংবা হয়ত কিছু একটা তার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন।

যাহোক, ইভান ইলিচ অক্ষরে অক্ষরে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চললেন, এবং গোড়ার দিকে তাতে কিছু সান্ত্বনাও পেতেন।

ডাক্তারের কাছে যাবার পর থেকে ইলিচের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল তার সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা, ওষুধ খাওয়া, ব্যথা ও শারীরযন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়ার ওপর নজর রাখা। তার কাছে জীবনের প্রধান কথা হয়ে দাঁড়াল মানুষের রোগ ও মানুষের স্বাস্থ্য। তার সামনে কোন রোগ, মৃত্যু বা আরোগ্যলাভের কথা উঠলে, বিশেষ করে তার রোগের সঙ্গে মিল আছে এমন কোন ব্যাধির কথা, নিজের অস্থিরতা গোপন রাখার চেষ্টা করে একাগ্রচিত্তে তিনি তা শুনতেন, নানা প্রশ্ন করে নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতেন।

ব্যথাটা কমল না, কিন্তু ইলিচ জোর করে ভাবলেন আগের চেয়ে ভাল আছেন। অন্য কোন কিছুর দুশ্চিন্তা না থাকলে নিজেকে তিনি ঠকাতে পারতেন, কিন্তু যখনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হত তার, কিংবা অফিসে ব্যর্থ হতেন বা তাসে খারাপ হাত আসত তখনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতেন নিজের ব্যাধিটাকে। আগে বিপাক সইতে পারতেন; বিশ্বাস ছিল শিগগিরই উদ্ধার পাবেন, আর এখন যে-কোন দুর্বিপাকে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়, মনে গভীর হতাশা নেমে আসে। নিজেকে বলতেন, এই দেখ, সবেমাত্র একটু ভাল হতে শুরু করেছি, সবেমাত্র ওষুধ কাজ দিতে শুরু করেছে, অমনি এই বাজে ব্যাপারটা বিপাকটা না ঘটলে নয়…আর দুর্দশার ওপরে বা যেসব লোক তার দুর্ভাগ্য ঘটাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলতে চাইছে তাদের ওপরে রাগে গজরাতেন। টের পেতেন সেটা মৃত্যুর মুখে নিয়ে চলেছে তাকে, কিন্তু অন্য কোন পথও নেই। তার তো এটা বোঝা উচিত যে লোকজন এবং ঘটনার ওপর মনের ঝাল ঝাড়াতে অসুখটা আরও বেড়ে যাচ্ছে, কোন বাজে ঘটনার দিকে মনোযোগ দেওয়াটা তার মোটেই উচিত নয়। কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি চলল ঠিক উলটো রাস্তায়। তিনি বলতেন, তার প্রয়োজন শান্তিতে থাকা। শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন সব ব্যাপারেই তিনি হুঁশিয়ার; অথচ সামান্য আঘাত ঘটলেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়তেন। ডাক্তারী বই পড়ে আর ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবস্থাটা আরও খারাপ করে তুললেন ইভান ইলিচ

নিজেই। এত মাপা তালে অবস্থাটা খারাপের দিকে চলল যে একটা দিনের সঙ্গে পরের দিনটার তুলনা করে নিজেকে ঠকানো তার পক্ষে খুবই সহজ হত—পার্থক্যটা প্রায় ধরাই পড়ত না। কিন্তু ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শের পর মনে হত, অবস্থাটা যে শুধু খারাপের দিকে যাচ্ছে তাই নয়, যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তবু তাদের কাছে ধরনা দেওয়া তিনি ছাড়লেন না।

সে মাসেই গেলেন আর একজন নামজাদা ডাক্তারের কাছে। প্রথম ডাক্তারটি যা বলেছিলেন এই নতুন ডাক্তারটিও তাই বললেন, শুধু সমস্যাটা তুলে ধরলেন অন্যভাবে। তার সঙ্গে পরামর্শ করার পর ইলিচের ভয় আরও বেড়ে গেল। আবার অন্য একজন ডাক্তার, তার বন্ধুর বন্ধু—যা রোগনির্ণয় করলেন সেটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তিনি যদিও বললেন যে ইভান ইলিচ ভাল হয়ে উঠবেন, কিন্তু তার নানা প্রশ্ন ও অনুমানে তাকে আরও থতমত খাইয়ে দিল, ধোঁকার ভাবটা গেল বেড়ে। একজন হোমিওপ্যাথ আবার সম্পূর্ণ অন্য কথা বললেন; তিনি দিলেন একেবারে অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে সে ওষুধ খেলেন ইলিচ। কিন্তু সাতদিন পরেও অবস্থার উন্নতি না হওয়াতে সে চিকিৎসা এবং আগের চিকিৎসা, দুয়ের ওপরই তার বিশ্বাস চলে গেল, ফলে মনটাও আগের চেয়ে বেশি দমে গেল। মূর্তির দৈবগুণে সেরে ওঠার কথা একবার বললেন চেনাশোনা একটি মহিলা। ইভান ইলিচ নিজেই বুঝলেন যে তিনি খুব মন দিয়ে মহিলাটির কথা শুনছেন এবং এ ধরনের আরোগ্যের সম্ভাবনায় ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাচ্ছে তার। হঠাৎ বেশ ঘাবড়ে গেলেন তিনি। 'সত্যি সত্যিই এ রকম বেকুব বনে গেছি নাকি আমি?' নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন নিজে। 'যত সব বেকুবি! আমার উচিত রোগ-রোগ বাই নিয়ে অস্থির না হওয়া। বরং একজন ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলাই ভাল। হ্যাঁ, তাই করব। অনেক হয়েছে। আর অন্য কোন দিকে মাথা না ঘামিয়ে এবার থেকে ডাক্তারের কথামত চলব গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, তারপর দেখা যাবে। আর দোমনা করা চলবে না।…' সিদ্ধান্তটা করা সহজ, কিন্তু পালন করা অসম্ভব। পাঁজরার ব্যথাটা একেবারে কাহিল করে দিল তাকে। মনে হল দিনে দিনে সেটা বেড়েই চলেছে, একদণ্ড বিরাম নেই তার; মুখের স্বাদটা হয়ে দাঁড়াল আরও অদ্ভুত, মনে হল মুখে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ এসেছে; খিদে চলে গেল, আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেকে আর ধোঁকা দেওয়া চলে না। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে তার, বিচিত্র কিছু; সেটার গুরুত্ব এত বেশি যে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু কখনও ঘটেনি তার জীবনে। আর এ বিষয়টা জানেন কেবল তিনি একাই। আশেপাশের লোক হয় সেটা বোঝে না, নয়ত বোঝার কোন আগ্রহও নেই তাদের। তারা ভাবে পৃথিবীতে সবকিছু আগেকার মতই চলেছে। এটাতেই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেতে লাগলেন ইলিচ। তিনি দেখছিলেন যে তার বাড়ির লোকেরা, বিশেষ করে স্ত্রী ও মেয়ে, যাদের নিমন্ত্রণ-যাত্রার মরশুম লেগেছে তখন, তারা কিছু বোঝে না। তার মনমরা ভাব, তার দাবি দাওয়া নিয়ে বিরক্ত হয় তারা, যেন সব তারই দোষ। যত ওরা লুকোবার চেষ্টা করুক, কিন্তু তিনি বুঝলেন যে ওদের কাছে তিনি একটা আপদ। দেখলেন, তার স্ত্রী তার এই অসুখের ব্যাপারে একটা বিশেষ মনোভঙ্গি নিয়েছেন। তিনি মুখে যাই বলুন আর করুন না কেন সেটার কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই।

তিনি নিজের বন্ধুদের বলতেন, 'ইলিচ ডাক্তারের কথা পুরোপুরি মেনে চলতে পারে না, ভালমানুষদের যা হয় আর কি। আজ হয়ত নির্দেশমত ওষুধ খেল, খাওয়াদাওয়া করল, সময়মত শুল, কিন্তু কাল যদি ওকে একটু নজরে না রাখি, তবেই দেখব ওষুধের কথা ভুলে গিয়ে স্টার্জন মাছ খেয়ে বসেছে, আর রাত একটা পর্যন্ত বসে বসে তাস খেলেছে।'

একবার বিরক্ত হয়ে ইলিচ তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে এমন করেছি? সে তো একবারই শুধু হয়েছে ইভানভিচের ওখানে।'

'আর কাল রাত্রে শেবকের ওখানে?'

'তাতে কী হল, ব্যথায় ঘুম আসছিল না...'

'তা যে কারণেই হোক না, ওভাবে চললে কখনও রোগ সারবে না, বরং আমাদের জ্বালিয়েই খাবে।'

বন্ধুদের এবং ইলিচকে ফিওদরভনা যা বলতেন তা থেকে বোঝা যেত, স্বামীর রোগের ব্যাপারে তার মতামত হল এই যে তার স্বামী নিজের রোগের জন্য নিজেই দায়ী, এবং এই সবকিছুর মূল হল তাকে বিরক্ত করার একটা ছুতো মাত্র। ইলিচ বুঝতে পারতেন মনোভঙ্গিটা ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু তাতে জিনিসটা সহনীয় হয়ে উঠত না তার কাছে।

আদালতে নিজের প্রতি একটা অদ্ভুত মনোভঙ্গি লক্ষ্য করতেন ইলিচ। তিনি ভাবতেন লোকে তার দিকে এমনভাবে চোরা চাউনিতে দেখছে যেন শিগগিরই তিনি জায়গা খালি করে যাবেন। হঠাৎ বন্ধুরা তার রোগ-রোগ বাই নিয়ে এমন ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দিলেন যে মনে হল, যেন তার ভেতরে বেড়ে ওঠা, দিনরাত তাকে কুড়ে কুড়ে খাওয়া, অন্য কোথাও টেনে নিয়ে যাওয়া সেই ভয়াবহ, বীভৎস, অভূতপূর্ব জিনিসটা সত্যি সত্যিই হাসিতামাসার যোগ্য। বিশেষ করে ভাৎ'সের ওপর বিরক্ত হতেন তিনি। তার খুশি খুশি ভাব, সর্বক্ষণ ফুলবাবু হয়ে থাকবার ক্ষমতা ইভান ইলিচকে মনে করিয়ে দিত তার দশ বছর আগের দিনগুলোর কথা।

তাস খেলতে এসেছেন বন্ধুরা। টেবিলে নতুন তাস বিলি করা হল, হাতে এল একের পর এক মোট সাতটা রুইতন—অথচ পার্টনার 'তুরুপ নেই' বলে ঠেকালেন দুটো রুইতন। এর বেশি আর কী আশা করতে পারেন তিনি? অত্যন্ত আহ্লাদিত হওয়া উচিত তার এই ভেবে যে এবার তো 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম'। কিন্তু হঠাৎ ফিরে এল সেই কুড়ে কুড়ে খাওয়া ব্যথাটা; মুখে সেই বিস্বাদ.—মনে হল এ অবস্থায় 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম'এ খুশি হওয়াটা নিতান্তই পাগলামি।

চেয়ে দেখলেন তার পার্টনার, মিখাইল মিখাইলভিচ কী ভাবে চটপটে হাতে টেবিল ঠুকে, সৌজন্য বজায় রেখেও অনুকম্পার ভাব দেখিয়ে পিঠগুলো তুলে না নিয়ে ঠেলে দিচ্ছেন তার দিকে, যাতে কষ্ট করে হাতটা খুব একটা না বাড়িয়ে সেগুলো ঘরে তোলার আনন্দ পান ইলিচ। 'ও কি ভাবছে যে আমি এতই দুর্বল যে হাত বাড়াবার ক্ষমতাও নেই আমার!' কথাটা ভাবতেই ইলিচ ভুলে গেলেন তুরুপের কথা, নিজেদের পিঠেই মেরে বসলেন তুরুপ; ফলে মাত্র তিন পয়েন্টে ফসকে গেল 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম'টা। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, মিখাইল মিখাইলভিচ কতটা বিচলিত হয়েছেন টের পেলেও তার তাতে কোন পরোয়া নেই। আর কেন যে পরোয়া নেই সেটা ভাবতে যাওয়াটাও বোকামি।

তার অত্যন্ত অসুস্থ লাগছে বুঝতে পেরে সবাই বলতেন, 'আপনার ক্লান্ত লাগলে আমরা খেলা থামাই। একটু জিরিয়ে নিন।' জিরিয়ে নেওয়া? কেন, তার তো একটুও ক্লান্ত লাগছে না। সুতরাং পুরো খেলাই হল। ওরা সবাই গোমড়া মুখে চুপচাপ রইলেন। ওদের মুখভারের কারণ তিনি নিজে, সেটা বুঝলেন ইভান ইলিচ, কিন্তু সেটা কাটাবার ক্ষমতা তার নেই। নৈশাহার সেরে চলে যেতেন অতিথিরা; একা একা বসে ভাবতেন ইলিচ, নিজের জীবন তো বিষিয়ে গিয়েছেই, অন্যের জীবনও বিষিয়ে তুলেছেন তিনি; আর কমা তো দূরের কথা, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তাকে শুয়ে থাকতে হবে এই উপলব্ধি, এই শারীরিক ব্যথা নিয়ে; সঙ্গে থাকবে একটা বিভীষিকার ভার। রাত্রির বেশির ভাগ সময়টা কাটবে ব্যথায়, বিনিদ্রায়। তারপর আবার উঠতে হবে সকালে, জামাকাপড় চাপিয়ে যেতে হবে আদালতে, কথা বলতে হবে, লিখতে হবে; আর আদালতে না গেলে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হবে বাড়িতে, এক একটা ঘণ্টার মানে তো নরকযন্ত্রণা। এভাবে তাকে টিকে থাকতে হবে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত, একেবারে একলা; কেউ বুঝবে না তাকে, মায়ামমতা দেখাবে না কেউ।

॥ ৫ ॥

একটা মাস কাটল এভাবে, এবং তারপর আরও একটা নববর্ষের ঠিক আগে শ্যালক এলেন কিছুদিন কাটাতে। ইলিচ তখন আদালতে ছিলেন। কেনাকেটা করতে বেরিয়েছেন ফিওদরভনা। বাড়িতে এসে ইলিচ দেখলেন পড়ার ঘরে নিজের জিনিসপত্র খুলছেন শ্যালক, দিব্যি স্বাস্থ্যবান মানুষটি। ইলিচের পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে মুহূর্তখানেক কোন কথা না বলে চেয়ে রইলেন তার দিকে: সে দৃষ্টিতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ইলিচের কাছে। বিস্ময়ে হাঁ করতে গিয়ে শ্যালক চেপে গেলেন। তাতে সবকিছু আরও স্পষ্ট হল।

'কি, বদলে গেছি না কি?'

'তা, হ্যাঁ...বদলেছ বটে।'

এরপর অনেক চেষ্টা করেও ইলিচ নিজের চেহারার বিষয়ে শ্যালকের কাছ থেকে আর কোন কথা বের করতে পারলেন না। ফিওদরভনা আসাতে শ্যালক তার কাছে গেলেন। ইলিচ দরজায় চাবি দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন; প্রথমে সামনাসামনি, তারপর পাশ থেকে। স্ত্রীর সঙ্গে তোলা একটা ছবি এনে আয়নায় দেখা নিজের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। সাংঘাতিক বদলে গেছেন তিনি। কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে হাতটা দেখলেন একবার, তারপর সোফায় এলিয়ে পড়লেন, রাত্রির চেয়েও কালো হয়ে গেল তার মুখ।

'না, না, এটা ঠিক নয়,' নিজেকেই নিজে বললেন। তারপর উঠে গিয়ে বসলেন লেখার টেবিলে; মামলার ফাইল খুলে পড়তে শুরু করলেন, কিন্তু পারলেন না। দরজা খুলে হল ঘরে ঢুকলেন। ড্রয়িং-রুমের দরজা বন্ধ। পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন। শুনলেন, ফিওদরভনা বলছেন, 'যাঃ, তুমি বাড়িয়ে বলছ।'

'বাড়িয়ে বলছি মানে? নিজের চোখ নেই নাকি? ওকে তো মড়ার মত

দেখাচ্ছে। ওর চোখগুলো দেখ, একেবারে প্রাণহীন। কী হয়েছে ওর ?'

'কেউ জানে না। ডাক্তার নিকোলায়েভ কী যেন একটা বলেছেন, কিন্তু ঠিক কী বলেছেন তা বলতে পারি না...আবার ডাক্তার লেশ্চেতিৎস্কি বলছেন ঠিক উলটো কথা।'

সেখান থেকে ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে ইলিচ শুয়ে পড়লেন। তার ভাবনা শুরু হল, 'কিডনি, স্থানচ্যুত একটা কিডনি!' ডাক্তারদের বলা সব কথা আবার মনে করলেন, কী ভাবে কিডনিটা আলগা হয়ে গিয়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আর কল্পনায় সেটা ধরে ফেলে আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। মনে হল ব্যাপারটা কতই না সহজ।

'না, আবার পিওতর ইভানিচের সঙ্গে দেখা করতে হবে।' ঘণ্টা বাজিয়ে, গাড়ি আনতে বলে দেখা করার জন্য তৈরি হলেন ইলিচ।

বিষণ্ণ অথচ সহৃদয় সুরে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ, ইভান ?'

এই সহৃদয়তার সুর শুনে বিরক্ত লাগল তার। গোমড়া মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পিওতর ইভানভিচের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

যে বন্ধুটির ডাক্তার-বন্ধু আছেন তার কাছে গেলেন, তারপর দুজনে মিলে গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বাড়িতেই ছিলেন, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল তাঁর সঙ্গে।

ডাক্তারের মতে তার শরীরের ভেতর যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার বিশদ বিবরণ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল ইভান ইলিচের কাছে।

অন্ত্রে অত্যন্ত সামান্য কিছু একটা হয়েছে। সেটা সেরে যাবে। একটা শারীরযন্ত্রের প্রক্রিয়া জোরালো করতে হবে, আর অন্য একটার কমাতে হবে, তাহলে শোষণ-ক্রিয়া চলবে এবং সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

খাবার সময় একটু দেরিতে পৌঁছলেন তিনি। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন বেশ হাসি খুশিতে, তারপর পড়ার ঘরে গেলেন। কিন্তু কাজ শুরু করতে পারলেন না অনেকক্ষণ। অবশেষে একরকম জোর করেই শুরু করলেন কাজ। মামলা পড়লেন, খাটলেন, কিন্তু মনের পেছনে যে জরুরী ও গোপন ব্যাপারটা রয়ে গেছে, সেটাকে স্থগিত রেখেছেন বটে, কিন্তু কাজ শেষ হলেই যে আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে, এ খেয়ালটা বরাবর রয়ে গেল। কাজ শেষ করে মনে পড়ল সেই গোপন ব্যাপারটা; সেই অন্ত্র নিয়ে চিন্তা। কিন্তু তার হাতে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে চা খেতে গেলেন ড্রয়িং-রুমে, সেখানে অতিথিরা রয়েছে, চলেছে কথাবার্তা, পিয়ানো বাজানো, গান। তাদের মধ্যে ছিলেন তার মেয়ের প্রাণিপ্রার্থী তদন্তকারী হাকিমটি। ফিওদরভনা লক্ষ্য করলেন সকলের চেয়ে হাসিখুশিতে সারা সন্ধ্যাটা কাটালেন ইভান ইলিচ; কিন্তু ইলিচ কখনও মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি যে অন্ত্র নিয়ে বেশ জরুরী চিন্তাটা মুলতুবী রয়ে গেছে। এগারটা বাজলে সবার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন তিনি। অসুখ হবার পর থেকে পড়ার ঘরের লাগোয়া একটা ছোট ঘরে একা ঘুমোতেন ইলিচ। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে জোলার একটা উপন্যাস নিয়ে বসলেন, কিন্তু সেটা পড়া হল না, পরিবর্তে ভাবতে লাগলেন মনে মনে। কল্পনায় দেখলেন যেন অন্ত্রের সেই বাঞ্ছিত রোগমুক্তিটা ঘটে গেছে; শুষে নেওয়ার কাজটা শেষ হয়েছে, নিষ্কাশনও সমাপ্ত.

এবার ফিরে এসেছে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই ; অবশ্য প্রকৃতির কাজে সহায়তা করা দরকার।' মনে পড়ে গেল ওষুধের কথা, উঠে ওষুধটা খেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন সেটা কী উপকার দিচ্ছে, ব্যথাটা কেমন কমছে ইত্যাদি। 'শুধু নিয়ম করে এটা খেতে হবে, ক্ষতিকর জিনিস এড়িয়ে চলতে হবে। এরই মধ্যে ভাল লাগছে, অনেক ভাল লাগছে।' পাঁজরাটা টিপে দেখলেন তিনি। কষ্ট হল না। 'কিছুই তো লাগল না, সত্যি অনেক ভাল হয়ে গেছি।' মোমবাতিটা নিভিয়ে পাশ ফিরে শুলেন…অন্ত্রটা ভালর দিকে, শুষে নেবার কাজটা ঠিক মতই চলেছে। কিন্তু হঠাৎ যেন ফিরে এল সেই পুরনো পরিচিত চাপা ব্যথাটা—মন্থর অথচ কঠোর সেই ব্যথা, এবং মুখে সেই পরিচিত বিস্বাদ। বুকটা যেন দমে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল তার। বিড়বিড় করে বললেন, 'হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! আবার শুরু হল, এ কখনও সম্পূর্ণ কমবে না।' সঙ্গে সঙ্গে সেটা অন্য আলোয় দেখা দিল তার কাছে। মনে মনে বললেন, 'অন্ত্র! কিডনি! এটা অন্ত্র আর কিডনির ব্যাপার নয়, এটা জীবন আর মরণের ব্যাপার। সত্যি, জীবন ছিল বটে এককালে, কিন্তু এখন সেটা চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, তাকে ধরে রাখার সাধ্য নেই আমার। নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কী? আমি ছাড়া আর সকলের কাছেই তো এটা স্পষ্ট যে আমি মরতে চলেছি ; হয়ত সেটা কয়েক সপ্তাহ, কয়েকদিন, কিংবা এই মুহূর্তেরই ব্যাপার? আলো ছিল, এখন অন্ধকার। ছিলাম এখানে, যাচ্ছি ওখানে! কোথায়?' হিম হয়ে এল শরীর, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল। হৃৎস্পন্দন ছাড়া আর কিছু কানে এল না তার।

'আমার অস্তিত্ব আর থাকবে না। থাকবে কি? না, না, অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেলে কোথায় যাব আমি? সত্যিই কি তাহলে এটা মরণ? না, আমি তো মরতে চাই না।' মোমবাতিটা জ্বালাবার জন্য তিনি লাফ দিয়ে উঠে বসলেন, কম্পিত হাতে চারদিক হাতড়ালেন সেটার জন্য, ফলে বাতি আর বাতিদানটা পড়ে গেল মেঝেতে আর বালিশে ; ধপাস করে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, কী এসে যায় তাতে? সবই সমান। মৃত্যু? হ্যাঁ, মৃত্যুই। আর ওরা জানে না সেটা, জানতে চায় না, কারণ ওদের মনে মায়া নেই। এটা একটা খেলা চলছে। ওদের কাছে সবাই সমান এখন, কিন্তু ওরাও তো একদিন মরবে। বোকার দল কোথাকার। প্রথমে আমি বিদায় নেব, পরে ওরাও। অথচ কী আমোদ আহ্লাদ করছে সবাই! জানোয়ার কোথাকার!' রাগে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। অসহ্য খারাপ লাগছে। প্রত্যেকের কপালে একই বিভীষিকা লেখা। আর ভাবা যায় না সেটা। উঠে পড়লেন ইভান ইলিচ।

'কিছু একটা গড়বড় হয়েছে ; আমার উচিত শান্ত হয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবা।' ভাবা শুরু হল। 'হ্যাঁ, রোগের শুরুটা। পাঁজরে ঘা খেলাম, কিন্তু তখন তো ঠিক ছিলাম, তার পরেও। একটু ব্যথা হয়েছিল, পরে সেটা বেড়ে গেল, তারপর শুরু হল ডাক্তারদের কাছে আনাগোনা, ফলে মনটা গেল দমে, বিষণ্ণ একটা ভাব জাগল, আরও ডাক্তার ; এবং ক্রমশ যেন খাদের মুখে এগিয়ে যাওয়া। শরীরে শক্তি রইল না। এগিয়ে গেলাম খাদের আরও কাছে। আর এখন তো প্রায় ভেঙে-চুরে পড়েছি ; চোখে দেখতে পাচ্ছি না। এ যে মৃত্যু! অথচ আমি কিনা ভাবছি অন্ত্রের কথা! ভাবছি অন্ত্রের রোগটা সেরে যাবে, কিন্তু এ তো মরণ।

আচ্ছা, সত্যিই কি তাই ?' আবার আতঙ্কে মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ; শ্বাসরোধ হয়ে এল তার, নিচু হয়ে দেশলাই হাতড়াতে গিয়ে কনুই লাগল বিছানার পাশে রাখা ছোট আলমারিটায়। ফলে অসুবিধা হচ্ছিল, লাগছিল, তাই চটে গিয়ে আরও জোরে আবার ধাক্কা দিলেন সেটাতে, উলটে পড়ে গেল আলমারিটা। হতাশায়, রুদ্ধশ্বাসে, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ইভান ইলিচ।

অতিথিরা বিদায় নিচ্ছেন। তাদের এগিয়ে দিতে গিয়ে ফিওদরভনা কি একটা পড়ার শব্দ শুনে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন : জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল ?'

'কিছু না, হঠাৎ ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে।'

বেরিয়ে গিয়ে একটা মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলেন ফিওদরভনা। দেখলেন, ইলিচ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন : জোরে জোরে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার ; যেন অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে শুয়ে পড়েছে একটা মানুষ।

'কী হল, ইভান ?'

'কিছু না, পড়ে গেল।' ভাবলেন, 'কী বলব, ও তো বুঝবে না।'

আর সত্যি সত্যিই বুঝলেন না ফিওদরভনা। আলমারিটা তুলে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বাইরে ; অপেক্ষমান অতিথিদের বিদায় জানাতে হবে তো।

যখন ফিরে এলেন, তখনও দেখলেন চিৎ হয়ে শুয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছেন ইলিচ।

'কী হল, আরও খারাপ লাগছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ইভান, ভাবছি লেশ্চেতিৎস্কিকে ডেকে পাঠালে হয় না ?'

অমন নামী ডাক্তারকে ডেকে পাঠানোর মানে আবার অনেক টাকার গাঁট-গচ্ছা দেওয়া। তাই বেশ তিক্ত হাসি হেসে বললেন, 'না।' কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিওদরভনা কাছে গিয়ে তার কপালে চুমু খেলেন।

চুমু খাওয়ার সময়ে মনেপ্রাণে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা হল তার ; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলেন যাতে তাকে ধাক্কা না দিয়ে বসেন সেজন্য।

'শুভরাত্রি। ভগবানের দয়া হলে ঘুম এসে যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই।'

॥ ৬ ॥

ইভান ইলিচ বুঝলেন তিনি মরতে বসেছেন ; সবসময় এক হতাশার ঘোরে রইলেন।

অন্তরের গভীরে তিনি জানতেন যে মরতে চলেছেন, কিন্তু সেটা যে শুধু মেনে নিতে পারছিলেন না, তাই নয়, এমনকি বুঝতেও পারলেন না ; এবং বুঝতে চাইলেনও না।

কিজেওয়াটারের ন্যায়শাস্ত্র পড়ার সময়ে যে ন্যায়সূত্রটা তিনি শিখেছিলেন, সারা জীবন ধরে ভেবেছেন যে সেটা শুধু কায়ুসের বেলায়ই সত্য, নিজের বেলায় নয়। কায়ুস মানুষ ছিল, বিমূর্ত অর্থে মানুষ, তাই ন্যায়সূত্রটা কেবল তার বেলায়ই খেটেছিল। কিন্তু ইলিচ তো কায়ুস নন, বিমূর্ত অর্থে মানুষও নন ; সবসময় তিনি

অন্যান্য মানুষের থেকে একেবারে আলাদা। মা-বাবার কাছে, মিতিয়া ও ভালোদিয়া,—দুই ভাইয়ের কাছে, কোচম্যান, আয়া ও নিজের খেলনার কাছে এবং পরে কাতিয়ার কাছে তিনি ছিলেন শুধু ভানিয়া ; সেই ভানিয়া, যে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত আনন্দ বেদনা আর উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ পার হয়ে এসেছে। ফুটবলের চামড়ার গন্ধ এত ভাল লাগত ভানিয়ার, কিন্তু সে গন্ধ কি কখনও পেয়েছিল কায়য়ুস ? মার হাতে তার মত কি কখনও চুমু খেয়েছিল কায়য়ুস ? এত ভালবেসেছিল তার সিল্কের স্কার্টের খসখসানি ? স্কুলে মিষ্টি বিস্কুট নিয়ে কি কখনও সে মারামারি করেছিল ? কিংবা কখনও কি এত প্রেমে পড়েছিল ? অথবা এত চমৎকারভাবে এজলাসের কাজ চালিয়েছিল ?

সত্যি সত্যি কায়য়ুস ছিল মর, এবং সে যে মরবে সেটা তো তার জানাই ছিল, কিন্তু তিনি নিজে, ভানিয়া, আজকের ইভান ইলিচ, তার তো কত চিন্তা, কত অনুভূতি,—তার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই আলাদা। তার মরাটা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হবে না। সেটা এক প্রচণ্ড বিভীষিকাময় ব্যাপার।

এই ছিল তার মনোভাব।

'কায়য়ুসের মত মৃত্যু আমার ভবিতব্য হলে সেটা ধরা পড়ত আমার কাছে, মনের ভেতর কেউ বলে দিত সেটা। কিন্তু তেমন কিছু তো আমার মধ্যে নেই ; সবসময় জেনেছি আমি কায়য়ুসের মত নই, সে কথা আমার বন্ধুবান্ধবরাও জানে। আর এখন, কী আশ্চর্য !' মনে মনে বললেন, 'কিন্তু এটা তো হতেই পারে না। হতে পারে না, তবু তো হচ্ছে। কি করে সম্ভব হল তা ? কি করে বোঝা যায় ব্যাপারটা ?'

বুঝতে না পেরে চেষ্টা করলেন ভাবনাটাকে তাড়িয়ে দিতে : যেন ওটা মিথ্যে, ফালতু ; তার জায়গায় আনতে চেষ্টা করলেন সত্য আর স্বাস্থ্যকর সব চিন্তা। কিন্তু ভাবনাটা শুধু ভাবনাই নয়, ওটা যেন বাস্তব, তাই বারবার ফিরে আসতে লাগল মাথার মধ্যে।

একে একে অন্য সব চিন্তাকে আহ্বান জানালেন, যদি কিছু ভরসা পান সেই আশায়। একটা পুরনো চিন্তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলেন, যে চিন্তাটা আগে তার মৃত্যুর ভাবনাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিত। কিন্তু আশ্চর্য, যেসব জিনিস আগে মৃত্যুর চেতনাকে আড়াল, আচ্ছন্ন, বিলুপ্ত করত, সেগুলো যেন এখন শক্তিহীন হয়ে গেছে। মৃত্যুকে আড়াল করে রাখার জন্য একটা পুরনো চিন্তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ইদানিং ইভান ইলিচের অধিকাংশ সময় কেটে যেত। যেমন, নিজেকে তিনি বলতেন, 'সবসময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে ; বলতে গেলে এককালে ওটাই তো ছিল আমার মনপ্রাণ।' অমনি মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তাকে বিদেয় করে দিয়ে রওনা হতেন আদালতে। সেখানে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন, চেয়ারে বসতেন, আদালতে উপস্থিত লোকজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতেন একবার। অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তিতভাবে, রোগা হাতটা দিয়ে ওক কাঠের চেয়ারটার হাতল ধরে, পাশের লোকটির দিকে আগেকার মতই ঝুঁকে কাগজপত্র উলটে ফিসফিসিয়ে কথা বলতেন, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে চোখ তুলে শুনানি শুরু করার চিরাচরিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। কিন্তু শুনানির মাঝে হঠাৎ পাঁজরার সেই ব্যথাটা জেগে উঠত, শুনানি কতদূর এগিয়েছে

তার পরোয়া না করেই। তাতে বেশি মনোযোগ না দিয়ে জোর করে মন থেকে সে চিন্তাটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন তিনি ; কিন্তু ব্যথাটা তার নিজের কাজ করে যেত, মনে হত যেন সামনে এসে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন, তার চোখের আলো নিভে যেত, নিজেকে তিনি প্রশ্ন করতেন, তাহলে এটাই কি একমাত্র সত্য ?' আর ওদিকে সহকর্মী ও অধীনস্থ কর্মচারীরা বিস্ময়ে বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করত, যে মানুষটি আগে এত চমৎকার ও সূক্ষ্ম বিচারে পারদর্শী ছিলেন, এখন তার সবকিছুই তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ভুল করছেন তিনি পদে পদে। মাথাটা ঝাঁকড়ে তিনি চেষ্টা করতেন নিজেকে আবার ঠিক করে নিতে, এবং কোনক্রমে শুনানি সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরতেন। বুঝতেন যে আদালতের কাজ দিয়ে তিনি যেটা চেপে রাখতে চান, আগের মত সেটা আর চাপা যাচ্ছে না ; আইনের হাজার কাজও মৃত্যুর হাত থেকে তাকে মুক্তি দেবে না। আর সবচেয়ে খারাপ হল এই যে, মৃত্যু শুধু তার একান্ত মনোযোগই কামনা করছে, কিন্তু তাকে কিছুই করতে বলছে না ; শুধু চাইছে তিনি তার দিকে শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন, আর কিছুই না করে শুধু সইবেন অকথ্য যন্ত্রণা।

মনের এই অসহনীয় অবস্থা এড়াবার জন্য তিনি অন্য এক সান্ত্বনার অনুসন্ধান করতেন ; চাইতেন আর এক ব্যবধান, এবং কিছুক্ষণের জন্য তা পেতেনও। কিন্তু সেটা ঐ কিছুক্ষণের জন্যই। তারপরই সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে যেত ; মনে হত যেন যে-কোন আড়ালকে ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে কেবল ঐ মৃত্যুরই, আর কারও নয়।

শেষের দিকে, মনের এই অবস্থায়, এত কষ্ট করে সাজানো ড্রয়িং-রুমে, যে ড্রয়িং-রুমে পড়ে গিয়ে তিনি তার জীবনটাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে মনে করতেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেন। তিক্ত হাসি হেসে ভাবতেন—এখানেই তো তার রোগের শুরু, ওই চোট খাওয়া থেকেই। ড্রয়িং-রুমে একদিন লক্ষ্য করলেন পালিশ করা টেবিলটার ওপরে গভীর একটা দাগ। সেটার কারণ বের করতে গিয়ে দেখলেন, ওটা হয়েছে ব্রোঞ্জের কাজ করা অ্যালবামটার একটা ধার বেঁকে যাবার ফলে। সযত্নে সেটা তুলে নিয়ে কন্যা এবং তার বন্ধুবান্ধবীর আগোছালোপনার কথা মনে করে বেশ রেগে গেলেন। দেখলেন, কোন ছবি ছিঁড়ে গেছে, আবার কোনটা হয়ত উলটো করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোকে ঠিক করে সাজিয়ে চাপ দিয়ে ব্রোঞ্জের ধারটা সোজা করে দিলেন। তারপর ভাবলেন, ঘরের একটা কোণে, যেখানে টবের গাছগুলো রয়েছে, সেখানটায় টেবিলটা সরিয়ে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কথাটা চিন্তা করে চাকরকে ডাক দিলেন। ডাক শুনে স্ত্রী এবং মেয়ে দুজনেই এলেন, কিন্তু দুজনের সঙ্গেই তার তর্ক হল, কারণ, তারা ইলিচের মতের সঙ্গে সায় দিলেন না। ফলে ইলিচ চটে উঠলেন, তবে শেষ পর্যন্ত ভালই হল, কারণ এই ব্যাপারে নিজেকে নিয়োজিত রাখার ফলে সেই মৃত্যুর বিভীষিকা আর তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারল না।

কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। তিনি নিজে টেবিল সরাতে শুরু করলে। তার স্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, চাকররাই সরাক, তোমার তো আবার ক্ষতি হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সেই বিভীষিকা যেন পর্দার আড়াল থেকে তার দিকে

উঁকি দেওয়া শুরু করেছে। যদিও সেটা ছিল প্রথম ঝলক, তাই তিনি আশা করছিলেন, হয়ত অচিরেই ওটা সরে যাবে। কিন্তু তা হল না, পাঁজরের ব্যথাটা জেগে উঠল, সেটা এখানে সেখানে, যেখানে পারল কামড়ে চলল ; তাকে এড়ানো গেল না—সেটা টবের আড়াল থেকে স্পষ্ট চেয়ে রইল তার দিকে। তিনি ভাবলেন, তাহলে আর এ সবে লাভ কি ? মনে মনে বললেন এখানে, এই পর্দাটার জন্যই প্রাণটা হারালাম। এ যেন দুর্গে আক্রমণের সময় বিনা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন। কিন্তু তা কেন হবে ? না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না। না, না···অথচ হচ্ছেও তো !'

পড়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন, দেখলেন সেখানেও সেটা। একেবারে সামনাসামনি, তার আর করার কিছু নেই। শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকা, আর ধীরে ধীরে রক্ত হিম হয়ে যাওয়া।

॥ ৭ ॥

একথা বলা খুবই শক্ত যে কিভাবে তার রোগ শুরু হওয়ার ঠিক তৃতীয় মাসে ইভান ইলিচের কাছে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাকরবাকর আর ডাক্তারদের একটাই মাত্র ঔৎসুক্য ধরা পড়ল, এবং তা হল কখন তার চাকরিটা খালি হবে, আর কখন তারা তার উপস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। এটা ঘটল খুব সন্তর্পণে, ধীরে এবং সকলের অলক্ষ্যে।

ঘুম ক্রমশ কমে যেতে লাগল। তাকে আফিম খেতে দেওয়া হল, সঙ্গে মরফিয়া ইনজেকশন। কিন্তু কোন লাভ হল না তাতে। প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুটা আরাম পেতেন এই অর্থে যে জিনিসটা ছিল নতুন, কিন্তু শিগগিরই সেটা পুরনো হয়ে গেল, এবং ব্যথাও বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

ডাক্তারের নির্দেশে নতুন নতুন পথ্য দেওয়া শুরু হল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেগুলোও তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল, হল আরও বেশি তিক্ত।

পেট যাতে পরিষ্কার থাকে তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা হল। আর তার ফলে প্রতিবারই এক নিদারুণ যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হল তাকে ; কেননা ব্যাপারটা ছিল নোংরা, অশোভন, দুর্গন্ধপূর্ণ ; কারণ, তাতে সাহায্য করত অন্য একটি লোক।

এই বিরক্তিকর ব্যাপারটায় ইভান ইলিচ কিন্তু একটা সান্ত্বনা পেলেন—সেটা হল, ময়লা গামলা নিয়ে যাবার জন্য ভঁাড়ারের চাকর গেরাসিমকে আসতে হত সবসময়।

শহুরে খাবার খেয়ে দিনকে দিন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছিল এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চাষীর ছেলেটি। সে সব সময়ই থাকত বেশ হাসি-খুশি। তাই রুশী পোশাক পরে সে যখন একটা বিশ্রী কাজ করত তখন সত্যিই মনে মনে বেশ আনন্দ পেতেন ইভান ইলিচ।

একবার পট থেকে উঠে ধপাস্ করে বসে পড়লেন আর্মচেয়ারে, প্যান্ট পরবার শক্তিও তার ছিলনা। চেয়ারে বসে বিভীষিকার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ঝুলে পড়া থলথলে আনাচ্ছাদিত উরুর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল গেরাসিম তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। শীতের তাজা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়, তার সঙ্গে ভেসে এল বুটের তলার আলকাতরার গন্ধ। তার পরনে বাড়িতে তৈরি এ্যাপ্রণ, পরিষ্কার সুতির সার্টের হাতা গোটানো, তা থেকে বের হয়ে আছে বলিষ্ঠ দুটো হাত। ইভান ইলিচের দিকে না তাকিয়েই

সে পটের কাছে গেল।

দুর্বল স্বরে ইলিচ ডাক দিলেন, 'গেরাসিম।'

হয়ত বেফাঁস কিছু করে ফেলেছে এই ভয়ে সহজ ভাল মানুষের নিষ্পাপ চোখ নিয়ে চমকে উঠে সে ইলিচের দিকে চাইল ; তার মুখে নতুন গজানো দাড়ির আভাস স্পষ্ট। বলল, 'আজ্ঞে' ?

'এই নোংরা কাজটা করতে তোর নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে ? মাফ করিস, আমি নিজে নিজে তো করতে পারি না।'

তার ঝকঝকে জোয়ান দাঁতগুলো বের হল, চোখ দুটো যেন ঝলসে উঠল। বলল, 'কি বলছেন হুজুর ! আপনাকে সাহায্য করব না কেন বলুন ? আপনার তো অসুখ হয়েছে।'

সবল হাত দুটো দিয়ে অভ্যস্ত কাজ সেরে লঘু পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে ; মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এল ঠিক তেমনিভাবে।

ইভান ইলিচ তখনও আর্মচেয়ারে শুয়ে।

গেরাসিম পরিষ্কার পটটা রেখে দেবার পর তিনি বললেন, 'গেরাসিম, একবার এদিকে এসে' আমাকে একটু সাহায্য কর তো।' গেরাসিম কাছে এলে বললেন, 'আমাকে একটু তুলে ধর। নিজে উঠতে পারছি না, আবার দমিত্রিকেও বাইরে পাঠিয়েছি।'

ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত হালকাভাবে তাকে তুলে ধরে গেরাসিম অন্য হাতটা দিয়ে আলগোছে তার প্যান্টটাকে ওপরে টেনে দিল। তারপর আবার যখন চেয়ারে বসিয়ে দিতে যাচ্ছে তখন ইলিচ বললেন তাকে সোফায় বসিয়ে দেবার জন্য। বেশ আলতোভাবে, শরীরে কোনরকম চাপ না দিয়ে প্রায় কোলে করে নিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল তাকে গেরাসিম। ইলিচ বললেন, 'ধন্যবাদ ! তুই দেখছি সত্যি সত্যিই বাহাদুর ; সব কাজেই তোর হাত খোলে।'

মৃদু হেসে গেরাসিম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু সে কাছে থাকাতে ইলিচের এত ভাল লাগল যে তিনি চাইলেন না যে সে চলে যাক। বললেন, 'শোন, ওই চেয়ারটা নিয়ে আয়। না না, ওটা নয়, অন্যটা। এনে আমার পায়ের তলায় রাখ। চেয়ারে পা তুলে বসলে শরীরটা খুব হালকা লাগে।'

চেয়ারটা এনে কোনরকম শব্দ না করে সেটাকে সামনে রেখে তার ওপরে স্বচ্ছন্দভাবে ইলিচের পা দুটো তুলে রেখে দিল গেরাসিম। এমনভাবে পা তুলে ধরায় বেশ আরাম বোধ করলেন ইলিচ। বললেন, 'পা তুলে বসলে বেশ ভাল লাগে। বালিশটা এনে পায়ের তলায় রাখ তো।'

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল গেরাসিম। রুগীর পায়ের তলায় বালিশটা রাখল। পা-টা তুলে ধরাতে আবার আরাম লাগল ইলিচের ; পা-টা নামাতেই খারাপ লাগল তার। জিজ্ঞেস করলেন, 'গেরাসিম, তুই কি এখন কাজে ব্যস্ত ?'

গেরাসিম শহুরে লোকদের কাছ থেকে শেখা ভাষায় উত্তর দিল, 'না, হুজুর।'

'তোর আর এখন কি কাজ ?'

'না, কিছুই না ; সব কাজ সারা হয়ে গেছে, শুধু বাকি আছে কালকের জন্য কাঠ চেরা।'

'আমার পা দুটো কিছুক্ষণ তুলে ধরে রাখতে পারিস ?'

'কেন পারব না হুজুর?' পা দুটো উঁচু করে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে রইল গেরাসিম। ইভান ইলিচের মনে হল এভাবে পা দুটোকে উঁচু করে রাখলে ব্যথাটা একেবারেই চলে যায়।

'তাহলে তোর কাঠ চেরার কি হবে?'

'তা নিয়ে ভাববেন না হুজুর, পরে করব।'

গেরাসিম পা দুটো ধরে রইল, ইলিচ তার সঙ্গে কথা বলে চললেন। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ইলিচের মনে হল গেরাসিম পা ধরে রাখলে সত্যি সত্যিই আরাম লাগে।

এরপর নিয়মিত গেরাসিমকে ডেকে সামনে বসিয়ে তার কাঁধের ওপর পা দুটো তুলে রাখতেন ইলিচ, আর এক নাগাড়ে কথা বলে যেতেন। গেরাসিম এটা এত আগ্রহের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে করত যে ইভান ইলিচের মনে নাড়া না লেগে পারত না। লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও হাসিখুশি মেজাজ দেখলে তিনি বিরক্ত হতেন। কিন্তু গেরাসিমের স্বাস্থ্য, শক্তি আর হাসিখুশি মুখ তাকে মোটেই বিরক্ত করত না, বরং আনন্দ দিত।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতেন তিনি একথা ভাবলে যে সবাই তাকে শুধু এটাই বোঝাতে চাইছে যে, তিনি শুধুমাত্র অসুস্থই, মরণের মুখে নন, এবং ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চললে কিছুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি নিজে তো জানতেন, যা কিছুই করা হোক না কেন, অবস্থার কোন পরিবর্তনই হবে না; শুধু বেড়ে যাবে যন্ত্রণা, আর এগিয়ে আসবে মৃত্যুর দিন। প্রবঞ্চনা তাকে যন্ত্রণা দিত এ কারণে যে কেউ সত্যটা জেনেও তা স্বীকার করত না; তারা চাইত মিথ্যেটাকেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে, এবং চাইত যে তিনিও সেই মিথ্যের ভাগীদার হোন। আসন্ন মৃত্যুর আগে এই হীন প্রবঞ্চনা, যা তার মৃত্যুর ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যকে কলুষিত করে সাধারণ লোকজনদের নিতান্ত দেখতে আসার স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল, নামিয়ে দিয়েছিল দরজার পর্দা আর নৈশভোজে স্টার্জন খাবার স্তরে—তা তাকে সত্যিই অসহনীয় যন্ত্রণা দিত। আরও আশ্চর্য, সবাই যখন তাকে নিয়ে মিথ্যার মোহজাল বিস্তার করত, তখন তিনি আর একটু হলে প্রায় বলেই ফেলতেন যে, 'আমাকে আর ঠকাবার চেষ্টা কোরো না। তোমরাও জান যে আমি মরতে বসেছি, আর আমিও জানি তাই। অতএব বন্ধ কর এই ভণিতা।' কিন্তু একথা বলার মত সাহস তিনি কখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পারতেন যে তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ব্যাপারটাকে সকলে মিলে এমন একটা অপ্রীতিকর অবস্থার স্তরে নামিয়ে এনেছে, যে স্তরে তিনি নিজেই চিরকাল 'শালীনতা'র দাসত্ব করে গেছেন। সেই শালীনতার সুযোগ নিয়েই তারা সেটাকে এমন স্তরে টেনে নামিয়েছে যেন সেটা সামান্য শালীনতার ক্ষুণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি দেখলেন, তারজন্য কেউই এতটুকু দুঃখিত নয়, কেননা তার অবস্থা সঠিক অনুধাবনের চেষ্টাও কারও মধ্যে এতটুকু নেই। আসল ব্যাপারটা শুধু একজনই বোঝে, একজনই দুঃখ পায় তার জন্য, এবং সে হল গেরাসিম। আর সে কারণেই, শুধু গেরাসিমের সঙ্গই তার ভাল লাগত। মাঝে মাঝে গেরাসিম সারারাত তার পা দুটো ধরে বসে থাকত; তিনি আরাম পেতেন; গেরাসিম ঘুমোতে চাইত না, বলত, 'আমার ঘুম নিয়ে চিন্তা করবেন না হুজুর, পরে ঘুমোব।' আবার কখনও হয়ত 'তুমি' সম্বোধন করে

বলত, 'তোমার অসুখ করেছে, তোমাকে সেবা করব না কেন বল?' সত্যি, গেরাসিমই একমাত্র লোক যার মধ্যে প্রবঞ্চনার কোন চেষ্টা নেই। ওর সব কাজেই প্রমাণিত হয় যে, ওই একমাত্র সত্যিকার অবস্থাটা জানে, লুকোচুরির কোন প্রয়োজন বোধ করে না কখনও। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষটির জন্য মনে মনে দুঃখ পায় সে। একবার ইলিচ ওকে চলে যেতে বলাতে ও ইলিচের মুখের ওপর সোজাসুজিই বলে, 'একদিন তো আমাদের সবাইকেই মরতে হবে হুজুর, তাহলে কেন আমি আপনার সেবা করব না বলুন?' অর্থাৎ এটা বলে সে জানিয়ে দেয় যে, ইলিচের দেখাশোনার ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই বিরক্তিকর লাগে না এ কারণে যে, সে সেটা করছে একজন মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য এই আশায় যে একদিন তারও যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তখন নিশ্চয় কেউ না কেউ তার সেবা করবেই।

প্রবঞ্চনা এবং প্রবঞ্চনার আনুসঙ্গিক বিষয়গুলো ছাড়া আর যাতে তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতেন তা হল, যেভাবে তিনি চাইতেন সেভাবে কেউই তার জন্য এতটুকু দুঃখ বোধ করত না। এমন এক এক মুহূর্ত আসত, যখন তার প্রবল ইচ্ছে হত, দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসানে কেউ না কেউ তাকে আদর করুক, যেমনভাবে রুগ্ন শিশুকে করে, সেভাবে; যদিও সেটা স্বীকার করাটা ছিল সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। শিশুদের যেভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তেমনিভাবে তাকে লোকে চুমু খাক, আদর করুক, কাঁদুক—এটাই তিনি চাইতেন। অবশ্য তিনি নিজেও জানতেন যে আদালতের একজন জাঁদরেল সদস্য, যার দাড়িতে পাক ধরে গেছে, তার পক্ষে এতটা আশা করাটাই উচিত নয়। কিন্তু আশ্চর্য, তবু তিনি তা-ই চাইতেন। এবং গেরাসিমের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনেকটা এরকমেরই ছিল বলে তিনি মনে মনে আনন্দ পেতেন।

এদিকে তিনি যখন কাঁদতে চাইছেন, চাইছেন আদর আর কান্না কেড়ে নিতে ঠিক তখনই হয়ত এসে উপস্থিত হতেন আদালতের সহকর্মী শেবক। কিন্তু তার কাছ থেকে কেঁদে আদর আদায়ের কোন চেষ্টাই করতেন না ইলিচ; বরং মুখে গভীর চিন্তাশীল একটা ভাব এনে আপীল আদালতের রায়ের তাৎপর্য নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন, এবং জেদ করে সেই মত ধরে থাকতেন।

নিজের চারধারের এবং ভেতরকার এই প্রবঞ্চনাই তার জীবনের শেষ কটা দিনকে বিষিয়ে দিয়েছিল প্রবলভাবে।

॥ ৮ ॥

সকাল হয়েছে। এবং সেটা যে সত্যি সত্যিই সকাল হয়েছে সেটা বোঝা গেল গেরাসিমের চলে যাওয়ায় আর পিওতরের আগমনে। পিওতর মোমবাতি নিভিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে ঘর গোছানোয় ব্যস্ত। দিন কিংবা রাত্রি হোক, শুক্রবার কিংবা রবিবারই হোক—তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই—শুধু অবিরত সেই জ্বালিয়ে মারা ব্যথা; সেই অনুভূতি যার একমাত্র উত্তর: অনিবার্যভাবে সমাপ্তির পথে অগ্রসরমান জীবন এখনও চলছে, আবার মৃত্যুর এগিয়ে আসাও স্তব্ধ হয়নি। আর অতিরিক্ত হিসেবে রয়েছে সেই প্রতারণা। সুতরাং প্রহর, দিন, সপ্তাহ গুনে আর লাভ কি?

'চা খাবেন হুজুর?'

কথাটা শুনে ইভান ইলিচ ভাবলেন, 'সকালে বাড়ির লোক যে চা খাবে এ

নিয়মটা ওর মানা চাই-ই চাই।' বললেন, 'না।'

'হুজুর, সোফায় বসবেন কি?'

এবার ভাবলেন, 'ওকে তো ঘর গুছোতে হবেই ; আমিই বরং বাধা দিচ্ছি, নোংরা করছি।' বললেন, 'না, থাক।'

পিওতর বেশ কিছুক্ষণ কাজ করল। ইভান ইলিচ হাত বাড়ালেন ; পিওতর বাধ্যের মত কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি চান, হুজুর?'

'ঘড়িটা।'

হাতের কাছেই ছিল সেটা, পিওতর তুলে তার হাতে দিল।

'সাড়ে আটটা বাজে। সবাই কি উঠে পড়েছে?'

'না হুজুর, ভাসিলি স্কুলে গেছেন, আর মা বলে দিয়েছেন যে আপনি উঠলে যেন তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। তাকে ডাকব, হুজুর?'

ভাবলেন, 'চা খেলে হয় না?' বললেন, 'থাকগে, তুই চা নিয়ে আয়।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল পিওতর। একা থাকার কথা ভেবে ভয় পেলেন ইলিচ। ভাবলেন কিভাবে ওকে আটকে রাখা যায়। বললেন, 'পিওতর, আমার ওষুধটা দে তো।' এক চামচ ওষুধ খেলেন। আবার মুখে সেই বিস্বাদ জেগে উঠল। তিনি কাতরে উঠলেন। পিওতর ফিরে এল। বললেন, 'না, যা। চা নিয়ে আয়।'

পিওতর বেরিয়ে গেল। ইভান ইলিচ একা কাতরাতে লাগলেন, সেটা যতটা না ব্যথার জন্য তার থেকে অনেক বেশি দুঃখে। ভাবলেন, 'সেই একই জিনিস, দিন আর রাতের যেন কোন শেষ নেই। যদি একটু তাড়াতাড়ি হত? কিন্তু কোনটা তাড়াতাড়ি? মৃত্যু? না, না, মৃত্যুর চেয়ে অন্য সবকিছুই ভাল।'

পিওতর ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ইলিচ। লোকটা কে, তার কাছে কি চায় কিছুই বোঝার ক্ষমতা নেই তার। এভাবে তাকিয়ে থাকাতে অস্বস্তি বোধ করল পিওতর ; তার হাবভাবে হুঁশ ফিরে পেলেন ইলিচ। বললেন, 'ও, চা এনেছিস। ঠিক আছে, নামিয়ে রাখ। আমাকে হাত মুখ ধুতে একটু সাহায্য কর, আর একটা পরিষ্কার শার্ট দে।'

হাত মুখ ধুতে লাগলেন ইভান ইলিচ। মাঝে মাঝে থেমে হাতে মুখে জল দিলেন, দাঁত মাজলেন, চুল আঁচড়ালেন, আয়নায় দেখলেন নিজের চেহারাটা। ভীষণ ভয় লাগল তার, বিশেষ করে কপালের ওপর লেপটে থাকা চুলগুলো দেখে।

জামা বদলাবার সময় জানতেন যে নিজের শরীরের দিকে তাকালে ভয়টা আরও বাড়বে, তাই সেদিকে না তাকিয়েই জামাটা পড়লেন। অবশেষে পরিবর্তনের পাট সমাপ্ত হল। গায়ে ড্রেসিং গাউন পরে, পা দুটোর ওপর কম্বল চাপা দিয়ে চা খেতে বসলেন একটা আরামকেদারায়। মুহূর্তের জন্য নিজেকে তাজা লাগল, কিন্তু চা মুখে যেতেই সেই বিস্বাদটা বোধ হল, আবার জেগে উঠল ব্যথাটা। একরকম জোর করেই সমস্ত চা-টা গিলে শুয়ে পড়লেন বিছানায় ; পিওতরকে বললেন চলে যেতে।

আবার সেই একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি। মুহূর্তের জন্য সামান্য আশার ঝিলিক, তারপরই আবার হতাশার ঝঞ্ঝা। শুধু ব্যথা, ব্যথা আর ব্যথা ; এতটুকু বিরাম নেই তার। একা থাকলে ভয়ঙ্কর খারাপ লাগে, ইচ্ছে হয় কাউকে ডাক দেন, কিন্তু

এও জানেন যে কাউকে ডাকলে খারাপ লাগাটা আরও বেড়ে যাবে। ভাবেন, 'যদি আবার মরফিয়া দেয় তবে হয়ত এটা ভুলতে পারব। সত্যি, অন্য একটা উপায় বের করবার জন্য ডাক্তারকে বলতেই হবে। না, এ অসম্ভব, অসহ্য।'

একটা ঘন্টা কেটে যায়, তারপর আর একটা। ঘন্টা বাজে বাইরের হল ঘরে। হয়ত ডাক্তার—হ্যাঁ, ডাক্তারই বটে—তাজা, মোটা-সোটা, বেশ হাসিখুশি লোক; মুখের ভাবে যেন বলতে চাইছেন: মনে হচ্ছে খুব ঘাবড়ে গেছেন; আচ্ছা, দাঁড়ান, এক্ষুণি সব ঠিক করে দিচ্ছি। অথচ মুখের এ ভাব যে এখানে খাপ খায় না তা তিনি ভাল করেই জানেন, কিন্তু কি করবেন, ওটা যে চিরকালের জন্য তার মুখে চেপে বসে গেছে। সেটাকে কিছুতেই বদলানো সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সকালে বাড়ি যাবার জন্য গায়ে চাপানো ফ্রক-কোটটাকে বদলানো।

সান্ত্বনা দেবার জন্য বেশ জোরে হাতে হাত ঘষলেন ডাক্তার। বললেন, 'ঠাণ্ডায় জমে গেছি; বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। দাঁড়ান একটু গরম হয়ে নিই।' কথাগুলো এমনভাবে বললেন যে, মনে হল শুধু গরম হয়ে নিতেই যা মিনিট খানেক সময়ের দরকার, তারপর সবকিছু ঠিক করে দেবেন তিনি।

'তা, কেমন?'

ইভান ইলিচের মনে হল ডাক্তার যেন বলতে চাইছেন, 'হালচাল কেমন আছে?' কিন্তু সেটা বলাটা ঠিক হবে না ভেবেই যেন বললেন, 'রাতটা কেমন কাটালেন?'

ইলিচ এমন দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকালেন যে মনে হল তিনি বলতে চাইছেন, 'মিথ্যে কথা বলতে কি কখনও আপনার এতটুকু লজ্জা করে না?' কিন্তু ডাক্তার সেটা বুঝলেন না।

ইলিচ উত্তর দিলেন, 'ঠিক আগেকার মত বিভৎসভাবেই। ব্যথাটা কখনও যায় না, কমেও না। একটা কিছু যদি ব্যবস্থা করতেন।'

'আপনারা রোগীরা মশাই সবাই সমান। ঠিক আছে, এখন মনে হচ্ছে শরীরটা গরম হয়ে গেছে। এমনকি প্রাসকোভিয়া ফিওদরভনার মত কড়া মহিলাও আমার শরীরের উত্তাপে কোন খুঁত ধরতে পারবেন না। তাহলে সুপ্রভাত।' ডাক্তার ইলিচের করমর্দন করলেন।

ঠাট্টা তামাসা বন্ধ করে, মুখে বেশ গম্ভীর ভাব এনে ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করা শুরু করলেন। নাড়ী দেখলেন, উত্তাপ নিলেন, বুক ঠুকলেন।

ইভান ইলিচের ভাল করেই জানা ছিল যে এসবের কোন মানেই নেই; এ নিতান্ত প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ডাক্তার যখন হাঁটু মুড়ে বসে, সামনের দিকে ঝুঁকে কান রাখতেন কখনও নিচে, কখনও উঁচুতে, বেশ গম্ভীর মুখে পাকা জিমনাস্টের মত শরীরটা বিভিন্নভাবে মোচড়াতেন তখন তার সেই ফাঁদে ধরা দিতেন ইলিচ ঠিক তেমনিভাবে, যেভাবে উকিলদের ফাঁদে ধরা দিতেন তারা মিথ্যে কথা বলছেন জেনেও।

সোফার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে তখনও ইলিচের বুকে ঠুক ঠুক শব্দ করে চলেছেন ডাক্তার, এমন সময় দরজার কাছে শোনা গেল সিল্কের খস-খসানি, আর ডাক্তার আসার কথা তাকে জানানো হয়নি বলে ফিওদরভনার পিওতরকে বকুনি।

ঘরে এসে স্বামীর গালে একটা চুমু খেয়ে তিনি বলতে লাগলেন যে, অনেকক্ষণ

হল তিনি উঠেছেন, কিন্তু খবর না পাওয়ায় ডাক্তার আসার সময় রোগীর ঘরে উপস্থিত হতে পারননি।

স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন ইলিচ. দেখলেন শরীরের সব কিছু। শাদা রং, মুখের প্রফুল্ল ভাব, পরিষ্কার হাত আর গলা, চিকচিকে চুল, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চোখ। সবকিছুতেই যেন আক্রোশ হল তার। মনে প্রাণে ঘৃণা বোধ করলেন তিনি। স্ত্রী তাকে যতবার স্পর্শ করলেন ততবারই তার প্রতি ঘৃণা উথলে উঠল তার।

স্বামী এবং স্বামীর অসুখের ব্যাপারে ফিওদরভনার মনোভাব এতটুকু বদলায়নি। রোগীদের সম্বন্ধে ডাক্তার যেমন একটা মনোভাব গড়ে নেন, এবং যেটা আর তার পক্ষে বদলানো মোটেই সম্ভব হয় না, তেমনি ফিওদরভনাও তার স্বামীর সম্পর্কে একটা মনোভাব তৈরি করে নিয়েছেন, যার মূল বক্তব্য হল, ইলিচের ঠিক যা করা উচিত তা তিনি করছেন না এবং তার অসুখের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীকে মধুরভাবে তিরস্কার করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

'কিছুতেই উনি কোন কথা শুনতে চান না। কখনও নিয়মমত ওষুধ খান না। এবং সবথেকে খারাপ হল, জেদ করে এমনভাবে পা তুলে শুয়ে থাকেন যেটা ওর পক্ষে খুবই খারপ।'

গেরাসিমকে দিয়ে কিভাবে পা তুলিয়ে রাখেন সেটাও বলা হয়ে গেল ডাক্তারকে।

বেশ মিষ্টি অথচ অবজ্ঞার হাসি হেসে ডাক্তার বললেন, 'ও নিয়ে আর কি করা যাবে বলুন; রোগীরা সারাক্ষণ কিছু না কিছু অদ্ভুত ফন্দি বের করবেই; ওসব গায়ে মাখলে চলেনা।'

রোগী দেখা শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার। ফিওদরভনা ইলিচকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিলেন যে, তার পছন্দ হোক আর নাই হোক, তিনি একজন নামকরা ডাক্তারকে আজ বিকেলে তাকে দেখবার জন্য আসতে বলেছেন। তার সঙ্গে বর্তমান ডাক্তার মিখাইল দানিলভিচ পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেবেন। বললেন, 'দয়া করে কোন রকম আপত্তি কোরো না। এটা আমি করছি আমার নিজের জন্য।' অথাৎ সেটা যে ইলিচের ভালর জন্যই করা হচ্ছে ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে সে কথাটাই তিনি জানিয়ে দিলেন, যাতে ইলিচ আর কোন আপত্তি তুলতে না পারে। ভ্রূ-কোঁচকালেন ইলিচ, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। তিনি বুঝলেন, এমন মিথ্যার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন যে কোনটা কি, তাও আর বের করার ক্ষমতা নেই তার।

স্ত্রী তার নিজের জন্য যা করতেন সেটা এমনভাবে স্বামীকে বলতেন যাতে ইভান ইলিচ বাধ্য হতেন অর্থটাকে উলটোভাবে গ্রহণ করতে।

ঠিক সাড়ে এগারটার সময় সেই নামকরা ডাক্তারটি সত্যি সত্যিই এসে হাজির হলেন। শুরু হল আবার সেই বুক-পেট ঠোকা, পাশের ঘরে কিডনি এবং অন্ত্র নিয়ে গম্ভীর আলোচনা, প্রশ্ন আর উত্তর—যেন এটা সেই জীবন-মরণের প্রশ্ন নয়, শুধু ঠিকমত কিডনি ও অন্ত্র না চলার সাধারণ ব্যাপার, আর সে দুটো চালাবার ভার নিচ্ছেন ওই মিখাইল দানিলভিচ এবং নাম করা ডাক্তারটি।

নামকরা ডাক্তার গম্ভীর মুখেই বিদায় নিলেন, তবে একেবারে হাল ছেড়ে

দেবার মত ভাব করে নয়। ইভান ইলিচ যখন তাকে ভয় ও আশা মিশ্রিত ভীরু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন রোগমুক্তির কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, তখন তিনি জবাব দিলেন, কথাটা যদিও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, তবে সম্ভাবনা এখনও একটা আছে। ডাক্তার চলে যাবার সময় ইলিচ তার দিকে এমন মর্মান্তিক আশাভরা দৃষ্টিতে তাকালেন যে ফিওদরভনা ডাক্তারকে ফি দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

ডাক্তারের আশ্বাসে কিছুটা ভাল লাগল ইলিচের, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ নয়। আবার সেই ঘর, সেইসব ছবি, পর্দা, দেওয়ালের কাগজ, ওষুধের শিশিবোতল, আর যন্ত্রণা কাতর দেহ। ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন ইলিচ। একটা ইনজেকশন দেওয়া হল তাকে, ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘোর যখন কাটল তখন সন্ধ্যা। খাবার এল ; জোর করে কিছুটা মাংসের সুপ খেলেন তিনি। আবার সবকিছু আগেকার মত হল ; ধীরে ধীরে নেমে এল রাতের অন্ধকার।

নৈশাহারের পর সান্ধ্য পোষাকে ঘরে ঢুকলেন ফিওদরভনা ; সমুন্নত বুক, মুখে পাউডারের প্রলেপ। সকালেই স্বামীকে বলেছিলেন যে আজ তিনি থিয়েটারে যাবেন। সারা বার্ণহার্ড এসেছেন শহরে, তাই ইলিচের নির্দেশেই একটা বক্স নেওয়া হয়েছিল। অথচ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন ইলিচ, তাই স্ত্রীর সাজসজ্জা দেখে মনে মনে বেশ আহত হলেন। কিন্তু নিজের মনোভাব মোটেই প্রকাশ করলেন না, কারণ তার মনে পড়ল, নাটক দেখে ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করবে এ কথা তো একদিন তিনি নিজেই বলেছিলেন।

ফিওদরভনা ঘরে ঢুকেছিলেন বেশ আত্মপ্রসন্ন অথচ অপরাধী ভাব নিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, ইলিচের কেমন লাগছে। ইলিচ বুঝলেন শুধু জিজ্ঞেস করতে হয় বলেই ফিওদরভনা জিজ্ঞেস করছেন, কিছু জানতে হবে বলে নয় ; কারণ নতুন করে জানার তো আর কিছুই নেই। তারপর যা বলার ঠিক তাই বললেন ফিওদরভনা : নাটক দেখতে যাবার কথা তিনি একেবারেই ভাবতেন না, যদি না আগে থাকতে বক্সটা নেওয়া থাকত। এলেন, তাদের মেয়ে এবং তার ভাবী স্বামী তদন্তকারী হাকিম পেত্রিশ্চেভ যাচ্ছে ; ওদের একলা যেতে দেওয়া তো আর উচিত হবে না। অবশ্য বাড়িতে স্বামীর কাছে থাকতে পারলেই তিনি খুশি হতেন। তবু যতক্ষণ বাইরে থাকবেন ততক্ষণ ইলিচ যেন দয়া করে ডাক্তারের নির্দেশমত সবকিছু করেন।

'হ্যাঁ, ফিওদর পেত্রভিচ তোমাকে দেখতে চায় ; ওকে আসতে বলব ? লিজাও সঙ্গে আসতে চায়।'

'আসুক।'

ঘরে এল সুসজ্জিতা কন্যা ; তার যৌবন-প্রাপ্ত দেহের বেশ কিছুটা অনাবৃত— তা দেখে ইলিচ মনে ব্যথা পেলেন। লোক দেখানো শরীর। মেয়েটি সবল, স্বাস্থ্যবতী, প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে ; রোগ ভোগ আর মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মোটেই মানায় না—তার সুখে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে তা।

ফিওদর পেত্রভিচ সান্ধ্যপোষাকে ঢুকলেন, তার মাথার চুল ফরাসী অভিনেতা কাপুলের কায়দায় আচড়ানো। লম্বা শিরা বের করা গলা সাদা কলারে সম্পূর্ণ ঢাকা, চওড়া বুকের ওপর সাদা শার্ট ; সরু কালো প্যান্ট অাঁট হয়ে বসে গেছে

উরুর ওপর ; একটা হাত সাদা দস্তানায় ঢাকা, অন্য হাতে টপ-হ্যাট।

তার পেছনে সবার অলক্ষ্যে ঢুকল ইলিচের ছেলে। সে স্কুলের ছাত্র, তার গায়ে নতুন ইউনিফর্ম, হাতে দস্তানা ; তার চোখের কোণে কালি পড়েছে, যার অর্থ ইভান ইলিচের ভাল করেই জানা।

ছেলের প্রতি ইলিচের মায়া বরাবর। এই মুহূর্তে তার সহানুভূতিপূর্ণ চাউনি তার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। বুঝলেন, গেরাসিম ছাড়া একমাত্র ভাসিয়াই তাকে বুঝতে পারে, তার জন্য মমতা বোধ করে।

সবাই বসল ; আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি কেমন আছেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। অপেরা-গ্লাসটা কোথায় রেখেছে লিজা জানতে চাইল মার কাছে। এ নিয়ে মা-মেয়েতে কথা কাটাকাটি হল। সত্যিই, ব্যাপারটা অপ্রীতিকর।

পেত্রভিচ জানতে চাইলেন ইলিচ কখনও সারা বার্ণহার্ডকে দেখেছেন কিনা। প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলেন না ইলিচ ; তারপর বললেন, 'না দেখিনি। আপনি কখনও দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ দেখেছি, 'আদ্রিয়েন্না লেকুভরিয়ার'-এ।'

ফিওদরভনা বললেন, কোন একটা নাটকে যেন উনি খুব চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু মেয়ে মায়ের মন্তব্যে আপত্তি জানাল। তারপর শুরু হল তার অভিনয়ের মাধুর্য ও উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনা। এ ধরনের আলোচনায় প্রায়ই যেসব কথা বলা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই বলা হল।

আলোচনার মাঝে পেত্রভিচ হঠাৎ ইলিচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। আর সবাইও তাকেই অনুসরণ করল। বেশ জ্বলজ্বলে চোখে ইলিচ ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন, মনে হল সবার ওপর বেশ চটেছেন। সবাই বুঝলেন কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কেউ কিছু করলেন না। নিস্তব্ধতা ভাঙ্গার দরকার, সবাই অনুভব করলেন, কিন্তু ভাঙ্গার সাহস কারও হল না। সকলের ভয়, হয়ত হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে শালীনতার মিথ্যেটা, আর স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়বে সব সত্য। প্রথমে সাহস এল, লিজার—সে কথা বলল। সবার মনোভাবকে গোপন করার চেষ্টা করতে গিয়ে সেটাকেই সে প্রকাশ করে বসল। বাপের কাছে পাওয়া ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা যেতেই যদি হয় তবে তো এখনই ওঠা উচিত।' যুবকটির দিকে চেয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। কিন্তু হাসিটা যে কি কারণে তা সম্ভবতঃ তারা দুজনেই শুধু বুঝল। তারপর সিল্কের পোষাকে খসখসানি শব্দ তুলে উঠে পড়ল।

সকলেই উঠল ; ইলিচের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সবাই।

ইভান ইলিচের মনে হল, ওরা চলে যাবার পর তিনি যেন একটু ভাল বোধ করছেন। অন্ততঃ সেই প্রবঞ্চনাটাতো বিদায় নিয়েছে ওদের সাথেই। কিন্তু ব্যথাটা রয়ে গেল ; সেই পুরনো ব্যথাটা। রয়ে গেল সেই ভয়টা—যাতে সবকিছুই দুঃসহ বলে মনে হয় তার। মনে হয়, সবকিছুই যাচ্ছে খারাপের দিকে।

এভাবেই কাটল মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ; এর যেন কোন শেষ নেই, নেই কোন সমাপ্তি—শুধু ভয়ঙ্কর পরিণতি ছাড়া।

পিওতরের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে গেরাসিমকে।'

॥ ৯ ॥

স্ত্রী যখন ফিরলেন তখন রাত অনেক। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেও ইভান

ইলিচ টের পেলেন। চোখ দুটো খুলেই আবার বুজলেন। গেরাসিমকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বসতে চাইলেন ফিওদরভনা, কিন্তু ইলিচ বললেন, 'না, তুমি যাও।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?'

'তাতে কিছু যায় আসে না।'

'একটু আফিম খাও।'

রাজি হলেন ইলিচ ; আফিম খেলেন। স্ত্রী চলে গেলেন।

ভোর তিনটে পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণায় আধা-বেহুঁশ হয়ে রইলেন ইভান ইলিচ। তার মনে হল যেন একটা কালো সরু বস্তার মধ্যে তাকে জোর করে ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে ; যদিও সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ভেতরের দিকে ঠেলা হচ্ছে, তবু সম্পূর্ণ ঢোকানো যাচ্ছে না। আর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটায় অসম্ভব যন্ত্রণা পাচ্ছেন তিনি। মনে যদিও ভয়, তবু বস্তার ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছেন তিনি, আবার একই সঙ্গে বাধাও দিচ্ছেন। হঠাৎ হাতছেড়ে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও বিছানার পায়ের কাছে গেরাসিম বসে অসীম ধৈর্যে ঢুলছে। মোজা পরা লিকলিকে পা দুটোকে তার ঘাড়ে রেখে শুয়ে আছেন ইলিচ। ঢাকনার আড়ালে তখনও সেই একই মোমবাতি জ্বলে চলেছে ; তখনও সেই ব্যথাটা আঁকড়ে রয়েছে তাকে প্রবলভাবে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'গেরাসিম, তুই শুতে যা।'

'ঠিক আছে হুজুর : আরও কিছুক্ষণ থাকি।'

'না, শুতে যা।'

পা নামিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন তিনি, সাথে সাথে নিজের প্রতি দরদ শুরু হল। গেরাসিম পাশের ঘরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপরই কেঁদে উঠলেন শিশুর মত। কাঁদলেন নিজের অসহায়তার জন্য, নিজের অসহনীয় নিঃসঙ্গতার জন্য, লোকজন আর ঈশ্বরের হৃদয়হীন ব্যবহারের জন্য এবং বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।

'কেন তুমি আমার সাথে এ ব্যবহার করলে ? কেন আমাকে পৃথিবীতে আনলে ? আমি কি এমন করেছি যার জন্য আমাকে এমন অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছ ?'

জবাবের প্রত্যাশা তার ছিল না ; শুধু কাঁদলেন এইজন্য যে, কোন জবাব নেই, জবাব থাকতে পারে না। আবার শুরু হল সেই ব্যথা ; কিন্তু তিনি একটুকু নড়লেন না, ডাকলেন না কাউকে। শুধু মনে মনে বললেন, 'বেশ, যত খুশি আঘাত কর ! কিন্তু কেন ? কি করেছি আমি তোমার ?'

তারপর শুধু কান্নাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে শান্ত হয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন কারও মুখনিসৃত করা নয়, নিজেরই অন্তরের কথা ; নিজের মধ্যে প্রবাহিত চিন্তাস্রোত।

যা শুনলেন তার মধ্যে একটাই মাত্র তার কাছে স্পষ্ট হল : 'কি চাও তুমি ? কি চাও ?' তারপর নিজেকেই নিজে জবাব দিলেন, 'কিছুই চাইনা, শুধু চাই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ; চাই বাঁচতে।'

আবার একাগ্র মনোযোগে নিমগ্ন হলেন ; সে মনোযোগ এতই গভীর যে তার ব্যথাও তাকে অন্যমনস্ক করতে পারল না।

অন্তরের সেই স্বর তার কাছে জানতে চাইল, 'বাঁচতে চাও ? কিভাবে ?'

'যেভাবে আগে বেঁচেছিলাম, সেভাবে ; আরামে, ভাল করে।'

আবার সেই স্বর প্রশ্ন করল, 'আগে যেভাবে ছিলে, ভাল করে, আরাম করে, সেভাবে ?'

নিজের অতীত জীবনের শ্রেষ্ঠ আরামদায়ক মুহূর্তগুলোর কথা চিন্তা করলেন ইলিচ। কিন্তু আশ্চর্য, সেই সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো তেমন করে আর নাড়া দিল না তাকে ; সেগুলোকে সে রকম আর মনে হল না, যেমন মনে হত আগে শুধুমাত্র শৈশবের প্রথম দিককার স্মৃতিগুলো ছাড়া। মনে হল, শৈশবে সত্যি সত্যিই সুখের দিন ছিল, হায়, তা যদি আবার ফিরে আসে! কিন্তু সে সুখ ভোগ করেছিল যে সে তো আর নেই। এ যেন অন্য কারও স্মৃতি।

আজকের ইভান ইলিচ যেসব ঘটনার পরিণাম, সেগুলো যখন শুরু হয়েছিল, তখন তাকে যতটা আনন্দের বলে মনে হয়েছিল, এখন তার সবকিছুই গলে গিয়ে নিতান্ত নগণ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে, এমনকি মনে হচ্ছে সবকিছুই পাষণ্ডোচিত।

শৈশব ছেড়ে যত তিনি এগোলেন, যত কাছে এলেন বর্তমানের, ততই নগণ্য আর অনিশ্চিত বলে মনে হতে লাগল নিজের আনন্দকে। আইনের স্কুল থেকেই তার শুরু। তখনও কিছু কিছু ভাল জিনিস ছিল সেখানে ; ছিল আনন্দ, বন্ধুত্ব আর আশা। কিন্তু যতই ওপরের শ্রেণীতে উঠেছেন ততই তার ঘাটতি শুরু হয়েছে। পরে, কিছুদিনের জন্য, রাজ্যপালের অধীনে কাজের বছরগুলোতে, আবার ফিরে এসেছিল সেইসব সুন্দর মুহূর্তগুলো—নারীর প্রতি ভালবাসাকে ঘিরে। তারপর ধীরে ধীরে জীবন জটিল থেকে জটিলতর হল ; কমে গেল ভাল জিনিসের সংখ্যা। শেষে কমে কমে একেবারে নিঃশেষের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ বিয়ে হল, হল আশাভঙ্গ। স্ত্রীর নিঃশ্বাসেপ্রশ্বাসে তিনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার গন্ধ পেলেন, পেলেন ছলনার ইঙ্গিত। তারপর একঘেয়ে, প্রাণহীন জীবিকা—টাকা, টাকা আর টাকা—বছরের পর বছর, এক, দুই, দশ, বিশ বছর সেই একই জিনিস। যতদিন গেল ততই যেন নিস্প্রাণতার ক্রমবৃদ্ধি ঘটল। পাহাড় থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে নেমে চললেন ; অথচ ভাবছিলেন যেন উঠছেন! শুধু তিনি নন, সবারই তাই ধারণা ছিল। কিন্তু আজ? আজ তো সব শেষ···সুতরাং মৃত্যু···নিশ্চিত মৃত্যু!

'তাহলে আসলে ব্যাপারটা কি ? এটা তো হতে পারে না যে আমার জীবন ছিল নিতান্তই কুৎসিত আর অর্থহীন। আর যদি তাই হয় তবেই বা আমাকে মরতে হবে কেন এমন যন্ত্রণা পেয়ে ? নিশ্চয় কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।' হঠাৎ মনে হল, 'হয়ত যেভাবে বাঁচা উচিত ছিল সেভাবে আমি বাঁচিনি !' তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাই বা কি করে হয়! যখন যা করা উচিত ছিল সবই তো আমি করেছি।' সাথে সাথে জীবন-মরণের এই একমাত্র উত্তরটাকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এমনভাবে, যেন সেটা সত্যিই অসম্ভব।

'এবার তাহলে কি চাও ? বাঁচতে ? কিন্তু কিভাবে ? হ্যাঁ, যেভাবে আদালতে বেঁচেছিলে ; পেয়াদা যেভাবে চেঁচিয়ে বলত "বিচার বসেছে!" ঠিক সেভাবে। বিচার বসেছে, বিচার' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'এবার বিচার। কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই।' রাগে চিৎকার করে উঠলেন, 'কি অপরাধ আমার ?' কান্না থামিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চললেন নিজেকে, 'কেন, কোন অপরাধে আমাকে সইতে হবে এই ভয়াবহ বিভীষিকাকে ?'

অনেক ভাবলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন হদিস পেলেন না। যখনই মনে হল যে এগুলো ঠিক মত জীবনযাপন না করার পরিণাম, তখনই কেমন নিখুঁতভাবে বেঁচেছিলেন সে কথা চিন্তা করে অদ্ভুত ভাবনাগুলোকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

॥ ১০ ॥

আরও দুটো সপ্তাহ কেটে গেল। শোফা ছেড়ে আর ওঠেন না ইভান ইলিচ। বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না বলে শোফায় শুয়ে থাকেন। বেশির ভাগ সময় দেওয়ালের দিকে মুখ করে সেই অসহনীয় যন্ত্রণাটাকে একা একাই সহ্য করেন, আর একা একাই মনকে তোলপাড় করে জানতে চান, 'এটা কি? সত্যিই কি এটা মৃত্যু?' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সেই স্বর জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, মৃত্যু, মৃত্যু মৃত্যু।' প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু কেন এ যন্ত্রণা।' উত্তর আসে, 'এমনিই। কোন কারণ নেই।' তারপর—আর কি, কিছুই নয়।

অসুখের শুরু থেকে—প্রথম যেদিন ডাক্তারের কাছে যান, সেদিন থেকেই ইভান ইলিচের জীবন দুটো পরস্পরবিরোধী মনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে দুটো মনোভাব আসত পালা করে, একের পর এক। তার একটা হল হতাশা—ভয়াবহ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা; আর অন্যটা হল আশা—নিজের শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাগ্রহ পর্যবেক্ষণ। কখনও চোখের সামনে দেখতেন কিডনি বা অন্ত্র নিজেদের কাজ করতে চাইছে না, আবার কখনও দেখতেন শুধু মৃত্যু; ভয়াবহ, অবোধ্য, অবাধ্য মৃত্যু—যার হাত থেকে কোন মতেই নিস্তার নেই।

অসুখের শুরু থেকে এ দুটো চিন্তা পালা করে এসেছে, একের পর অন্য; কিন্তু যতই দিন গেল ততই কিডনি নিয়ে অদ্ভুত আর অসম্ভব কল্পনাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল, মনে হল মৃত্যুটাই বাস্তব।

তিন মাস আগে তিনি কি ছিলেন, আর আজই বা কি—কিভাবে ধীরে ধীরে অতলের দিকে এগিয়ে চলেছেন—এটা ভাবলেই আশার সমস্ত সম্ভাবনা তার ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোফায় শুয়ে জীবনের শেষ কটি দিনে, কোলাহলমুখর শহরের মধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের ভীড়ের মাঝে কল্পনাতীত নিঃসঙ্গতায়—জলে স্থলে, কোথাও যার থেকে বেশি নিঃসঙ্গতা থাকা সম্ভব নয়—তারমধ্যে ইভান ইলিচ বেঁচেছিলেন শুধু অতীতকে নিয়ে। একে একে মনে পড়ত অতীতের নানা স্মৃতি। সবসময় তার শুরু হত কাছের কোন ঘটনাকে নিয়ে—তারপর তা ধীরে ধীরে চলে যেত সেই সুদূর অতীতে—একেবারে শৈশবে। হয়ত মনে হত এখন তাকে খেতে দেওয়া সেদ্ধ কুলের কথা—সাথে সাথে স্মরণে আসত শৈশবের সেই ফরাসী বদরীর চটচটে অদ্ভুত স্বাদ, যার বিচি চাটলে মুখ থেকে লালা ঝরত; আর সঙ্গে সঙ্গে ভীড় করে আসত একটার পর একটা ঘটনা—আয়ার কথা, ভাইয়ের কথা, খেলনার কথা। তারপর নিজেই নিজেকে বলতেন, 'ওদের কথা ভাবা উচিত নয়, ওতে কষ্ট বাড়বে।' জোর করে চিন্তার মোড় ঘোরাতেন বর্তমানে। শোফায় মরক্কো চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। ভাবতেন, 'চামড়াটা যদিও দামী, কিন্তু বেশি দিন টেকে না। এই নিয়ে ফিওদরভনার সঙ্গে ঝগড়াও করেছিলাম। কিন্তু বাবার ব্যাগটা যখন ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, সে মরক্কো চামড়াটা অন্য রকমের ছিল, তখন আমাদের সাজা দেওয়া হয়েছিল; অবশ্য মা লুকিয়ে পেস্ট্রি

খেতে দিয়েছিলেন।' আবার চিন্তা চলে গেল সেই শৈশবে ; আবার কষ্ট পেলেন ইলিচ—চেষ্টা করলেন মন থেকে সে চিন্তাকে সরিয়ে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তা শুরু হল : কি করে অসুখটা ধীরে ধীরে বেড়েছে, এবং এখনও বেড়েই চলেছে। অতীতে যতদূর ফিরে যান ততই প্রাণবন্ত মনে হয় জীবনকে। আগে জীবনে সুখ ছিল আর জীবনটাও ছিল বড়। তিনি ভাবলেন, 'যন্ত্রণা যেমন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, তেমনি জীবনটাও ক্রমাগত খারাপের দিকে এগিয়েছে।' একটা আলোর রশ্মি ছিল জীবনের শুরুতে ; তারপর যত দিন কেটেছে ততই সেটা কালো থেকে আরও কালো হয়ে গেছে। ইলিচ ভাবলেন, 'মৃত্যু থেকে দূরত্বের ঠিক বিপরীত গতিতে...।' ক্রমশ দ্রুতগতিতে পতনশীল পাথরের উপমা মনে এল তার। তেমনি দ্রুতগতিতে তার যন্ত্রণা ভয়ঙ্করতম যন্ত্রণার দিকে এগিয়ে চলেছে। 'আমি পড়ে যাচ্ছি'...চমকে উঠে বেশ নড়েচড়ে সেটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন ইলিচ, কিন্তু বুঝলেন তা অসম্ভব। সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ তার অবসন্ন—অথচ সেখান থেকে যে চোখ ফেরাবেন সে ক্ষমতা নেই তার। তাই শ্রান্ত চোখেই তাকিয়ে রইলেন ; অপেক্ষা করে রইলেন ভয়াবহ পতনের জন্য, প্রতীক্ষা করলেন চরম আঘাতের, চূড়ান্ত বিনাশের। নিজেকেই নিজে বললেন, 'অসম্ভব, একে ঠেকানো অসম্ভব! কিন্তু কেন এমন হল, অন্ততঃ সেটুকুও যদি বুঝতে পারতাম! না, তাও অসম্ভব। ঠিক মত বেঁচে থাকলে অবশ্য কথাটার একটা মানে হত...কিন্তু সেটা স্বীকার করাও যে অসম্ভব। মনে পড়ল নিজের শালীন, সংযত, সঙ্গত জীবন-যাপনের কথা। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, যেন হাসি দেখিয়ে কাউকে প্রতারিত করা যাবে এমনভাবে বললেন, 'এটা তো আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। না, কোন অর্থ নেই! যন্ত্রণা, মৃত্যু ..কিন্তু কেন ?'

॥ ১১ ॥

এভাবে আরও দুটো সপ্তাহ কাটল। এরই মধ্যে তিনি এবং তার স্ত্রী যা আশা করেছিলেন, সেটা কাটল। পেত্রিশেচভ তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলেন। ব্যাপারটা ঘটল সন্ধ্যাবেলা। পরের সকালে, কিভাবে স্বামীকে খবরটা শোনাবেন ঠিক করতে করতে, ফিওদরভনা ইলিচের ঘরে ঢুকলেন। আগের রাতে ইলিচের অবস্থা বেশ খারাপের দিকে গিয়েছিল। তাকে শোফার ওপরই শুয়ে থাকতে দেখলেন ফিওদরভনা, তবে শোবার ধরনটা ছিল অন্য রকমের। উপুড় হয়ে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাতরাচ্ছিলেন তিনি।

ওষুধের কথা বলা শুরু করার সাথে সাথেই ইলিচ অন্যদিকে চোখ ফেরালেন। তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি আক্রোশ এমনিভাবে প্রকাশিত হল যে ফিওদরভনা আর তার কথা শেষ করতে পারলেন না।

ইলিচ বললেন, 'ভগবানের দোহাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।'

ফিওদরভনা চলে যেতে চাইছিলেন, এমন সময় মেয়ে ঘরে ঢুকে বাবার কাছে গেল সুপ্রভাত জানাতে। স্ত্রীর দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই মেয়ের দিকেও তাকালেন ইলিচ। মেয়ে যখন জানতে চাইল যে তিনি কেমন আছেন, তখন বললেন যে, চিন্তার কিছু নেই, খুব শিগগিরই তার হাত থেকে রেহাই পাবে সবাই। মা এবং মেয়ে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

লিজা মাকে বলল, 'আমাদের কি দোষ ? রোগটা যেন আমরাই ঘটিয়েছি ! বাবার জন্য দুঃখ হয় ঠিকই কিন্তু উনি আমাদের এমন যন্ত্রণা দিচ্ছেন কেন ?'

যথাসময়ে ডাক্তার এলেন। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে গেলেন ইলিচ। শেষে বললেন, 'জানেনই তো, আমার কিছুতেই কিছু হবে না ; শুধু অনুগ্রহ করে আমায় একলা থাকতে দিন।'

'আপনার যন্ত্রণাটাতো অন্ততঃ কিছুটা কমাতে পারি।' উত্তর দিলেন ডাক্তার।

'না, তা-ও পারেন না ; দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।'

ডাক্তার ড্রয়িং-রুমে অপেক্ষমানা ফিওদরভনার কাছে গিয়ে বললেন, ইলিচের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তিনি যে অসহনীয় যন্ত্রণা পাচ্ছেন, এতে কোন সন্দেহই নেই ; এটা কমাবার একমাত্র উপায় হল তাকে আফিম খেতে দেওয়া। তিনি আরও বললেন, ওর শারীরিক যন্ত্রণাটা অসহনীয় ঠিক-ই, তবে তার থেকেও অসহনীয় হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা ; এবং সেটাই হচ্ছে আসল।

নৈতিক যন্ত্রণার শুরু ঠিক রাত্রে, যখন গেরাসিমের ঘুমে বুঝে আসা চোখ, আর ভালমানুষীভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় : 'আমার সারাটা জীবন, আমার সজ্ঞান জীবন, ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত তেমনটা যদি না হয়ে থাকে, তবে ?'

যেটা আগে একেবারেই অসম্ভব ভেবেছিলেন, সে চিন্তাটাই এবার মনে এল। ভাবলেন, ঠিক মত যে জীবনধারণ করেননি তা-ও তো হতে পারে। মনে হল, গণ্যমান্য লোকেরা যা ভাল বলে বিবেচনা করেন তার বিরুদ্ধে লড়ারই তার সেই ক্ষীণ ইচ্ছে, যা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করেছিলেন—সেগুলোই হয়ত সঠিক, অন্য সবই ভুয়া। তার সরকারী কাজকর্ম, তার জীবনযাত্রার প্রণালী, তার পরিবার, সমাজ, চাকরির স্বার্থ—সবকিছুই নকল। তবু এগুলোর সাফাই গাইবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ মনে হল ওগুলোর সাফাই গাইবার মত কিছুই নেই।

নিজেকে বললেন, 'যদি সেটাই সত্য হয়, যা পেয়েছিলাম সবকিছু নষ্ট করেছি, করার আর কিছু নেই, এই উপলব্ধি নিয়ে যদি মরতে হয়, তাহলে ?' উপুড় হয়ে শুয়ে একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিজেকে যাচাই করতে শুরু করলেন। সকালে যখন একে একে চাকর, স্ত্রী, কন্যা এবং সবশেষে ডাক্তারকে দেখলেন তখন তাদের প্রতিটি চলন, প্রতিটি কথা রাতে তার কাছে উদ্ভাসিত ভয়াবহ সত্যটাকে সমর্থন করল। তাদের মধ্যেই তিনি নিজেকে দেখলেন ; দেখলেন জীবনে যা কিছু নিয়ে থেকেছেন—সব। বুঝলেন, এর কোনটাই সাচ্চা নয় ; সবটাই একটা ধাপ্পা—জীবন এবং মরণ যা শুধুমাত্র ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। এই উপলব্ধিটা তার শরীরের যন্ত্রণাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিল। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন, জামাকাপড় টেনে ছেঁড়বার চেষ্টা করলেন। মনে হল জামাকাপড়গুলো তাকে আঁকড়ে ধরে তার শ্বাসরোধের চেষ্টা করছে, তাই তাদের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা হল তার।

বেশ কিছুটা আফিম খাওয়াতে বিস্মৃতি এল, কিন্তু নৈশাহারের সময় আবার সেটা স্বমূর্তি ধারণ করল। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন ইভান ইলিচ।

স্ত্রী এসে বললেন, 'শুনছ, অন্ততঃ আমার জন্য এটা কর। এতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং এরফলে অনেক সময় ভালই হয়। এ আর এমন কি। অনেক সময়

সুস্থ লোকেরাও তো……'

বিস্ফারিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ইভান ইলিচ : 'কি ? স্বীকারোক্তি ? কেন ?'

স্ত্রী কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'করবে তো ? আমাদের পাদ্রীকে ডেকে পাঠাই। উনি এত ভাল লোক…'

'বেশ, ভাল কথা।'

পাদ্রী এলেন, তার কাছে পাপ স্বীকার করে মনটা বেশ হালকা হল ইলিচের, মনে হল সন্দেহের অবসান হয়েছে। ফলে যন্ত্রণা কমে গেল, এবং মুহূর্তের জন্য মনে একটা আশার ভাব জেগে উঠল। আবার ঘাটার কথা, সেটা সেরে যাবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলেন। সাক্রামেণ্ট করার সময় দু চোখ ভরে জল এল তার।

এরপর শুইয়ে দেওয়াতে কিছুক্ষণের জন্য তার বেশ ভাল লাগল, আবার আরোগ্যের আশায় আশান্বিত হয়ে উঠলেন। ডাক্তারের প্রস্তাবিত অস্ত্রোপচারের কথা ভাবতে শুরু করলেন। নিজেকেই নিজে বললেন, 'আমি বাঁচতে চাই ; হ্যাঁ, আমি বাঁচতেই চাই।' অভিনন্দন জানাতে এসে গতানুগতিকভাবে যা বলা হয়ে থাকে তাই বললেন স্ত্রী, 'সত্যিই ভাল লাগছে, তাই না ?'

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন ইভান ইলিচ, 'হ্যাঁ।'

স্ত্রীর পোষাক, দেহের গড়ন, মুখের ভাব, গলার স্বর—সবকিছুই তার সামনে এ সত্যকে উদ্ভাসিত করে দিল যে, 'এ সবই মেকি। যা কিছু নিয়ে সারাটা জীবন কাটালে, আজও কাটাচ্ছ, এর সবটাই মিথ্যে, সবটাই ধাপ্পা—শুধুমাত্র জীবন এবং মরণকেই তা ঢেকে রেখেছে তোমার কাছ থেকে অতিকৌশলে।' যে মুহূর্তে এ চিন্তা এল, সেই মুহূর্তেই হৃদয়ে জেগে উঠল তীব্র ঘৃণা ; সেই ঘৃণার সঙ্গে এল অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা, আর যন্ত্রণার সঙ্গে আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর উপলব্ধি। শুরু হল নতুন নতুন উপসর্গ : কী যেন একটা ভেতরে মোচড় দিতে আরম্ভ করল, বিঁধতে লাগল, চেষ্টা করল দম বন্ধ করে দিতে।

'হ্যাঁ' শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের ভাবটা ভয়াবহ রকমের হয়ে উঠল। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্বল শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে ; আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।'

॥ ১২ ॥

সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হল চিৎকার—ভয়াবহ, অসহনীয়। চলল টানা তিনদিন। সে চিৎকার এতই ভয়ঙ্কর যে দু দুটো ঘরের দেওয়াল অতিক্রম করার পরও যখন সেটা কারও কানে পৌঁছেছে তখনও মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, সবকিছু শেষ হয়ে গেল, আর ফিরতে পারবেন না কিছুতেই ; সমাপ্তি, চরম সমাপ্তির মুহূর্ত সমাসন্ন ; শুধু নিজের সন্দেহগুলো সন্দেহই থেকে যাবে—আর কখনও উত্তর মিলবে না তার।

বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে চললেন ইভান ইলিচ ক্রমাগত, এক নাগাড়ে—তিন তিনটে দিন। এ তিনটে দিন যেন অসীম ; তিনি ধস্তাধস্তি করলেন সেই অদম্য শক্তিটার সঙ্গে যেটা তাকে ঠেলে ঢোকাচ্ছিল কালো বস্তাটার ভেতরে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোক, মুক্তি পাবে না জেনেও যেমন জল্লাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে

চলে, সেভাবেই একনাগাড়ে লড়াই চালালেন ইভান ইলিচ। আর বুঝলেন যে যতই লড়াই চালান না কেন, ক্রমাগত সেই আতঙ্কগ্রস্ত করে দেওয়া জিনিসটার কাছেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। মনে হল সেই অন্ধকার গহ্বরটার মধ্যে তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলেই যেন যন্ত্রণা পাচ্ছেন, আবার সেটার মধ্যে সোজা ঢুকে পড়তে পারছেন না বলেও যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে আরও বেশি। নিজের জীবনটা ভালই ছিল—এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি সেটায় ঢুকতে পারছেন না। নিজের জীবনযাত্রার সাফাইয়ের কাছে তিনি আটকে যাচ্ছেন। সেটাই তাকে এগোতে দিচ্ছে না—এটাই হল তার কাছে বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

হঠাৎ কিসের একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন বুকে আর পাঁজরে, তার দম আরও বন্ধ হয়ে এল; ছিটকে গিয়ে পড়লেন সেই গহ্বরটায়, এবং দেখলেন, একেবারে শেষ প্রান্তে একটা আলো চিকচিক করছে। রেলের কামরায় বসে যেমন অনুভূতি হত সেরকমই একটা অনুভূতি হল। তিনি ভেবেছিলেন যে সামনের দিকে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে যাচ্ছিলেন পেছনের দিকে, এবং হঠাৎই সেটা ধরা পড়ে গেল তার কাছে।

মনে মনে বললেন, 'দেখছি সবই মেকি! অথচ এখনও, এখনও তো যেটা আসল সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু আসলটাই বা কি?' নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন।

ঘটনাটা ঘটল তৃতীয় দিনে, মৃত্যুর মাত্র ঘন্টাখানেক আগে। ঠিক সে সময়ই ছেলে চুপি চুপি ঘরে ঢুকে বাপের বিছানার কাছে এল। মুমূর্ষু মানুষটি তখনও চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়ছেন। তার একটা হাত পড়ল গিয়ে ছেলের মাথায়। হাতটা আঁকড়ে ঠোঁটে চেপে ধরে কাঁদতে লাগল ছেলেটি।

ঠিক সেই সময়ই ইলিচ পড়ে গিয়েছিলেন গহ্বরে: তখনই তার মনে হয়েছিল যে জীবনটা ঠিক মত কাটেনি বটে, তবে এখনও ভুল শোধরাবার সময় আছে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আসলটা কি?' এবং অপেক্ষা করছিলেন উত্তরের জন্য। ঠিক সে মুহূর্তে মনে হল কেউ যেন তার হাতে চুমু খাচ্ছে। চোখ খুলে চাইলেন তিনি ছেলের দিকে। দুঃখ হল তার জন্য। স্ত্রী কাছে এলেন। তার দিকে তাকালেন। দেখলেন, তার দিকে চেয়ে স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন; তার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, নাকে আর গালের ওপর চোখের জল, সারাটা মুখ জুড়ে হতাশা। স্ত্রীর প্রতি করুণা হল তার। ভাবলেন, 'ওদের বড্ড কষ্ট দিচ্ছি। আমার জন্য দুঃখ পাচ্ছে ওরা; কিন্তু আমি চলে গেলে ওদের ভালই হবে।' কথাটা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না। ভাবলেন, 'বলে কি লাভ। তার থেকে তো কাজেই দেখানো দরকার।' স্ত্রীর দিকে ফিরে ইশারায় দেখালেন ছেলেকে। বললেন, 'ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও···ওর জন্য কষ্ট হচ্ছে···তোমার জন্যও···' বলতে চাইলেন, 'আমার পাপ ভুলে যাও···' কিন্তু ভুলে বলে বসলেন, 'আমার পথ ছেড়ে দাও।' নিজেকে শুধরে নেবার আর ক্ষমতা ছিল না তার; তবু হাতটা নাড়লেন এই ভেবে যে, যার বোঝার সে ঠিক মানেটা বুঝে নেবে।

হঠাৎ উপলব্ধি করলেন, যা তাকে এতদিন ধরে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়েছে, চেষ্টা করেও যার হাত থেকে মুক্তি পাননি তিনি, সেগুলো এখন আপনা থেকেই ঝরে পড়ছে, পড়ছে সব দিক থেকে। দুঃখ হল ওদের জন্য; ভাবলেন, ওদের যন্ত্রণা লাঘব করার

অন্য কিছু একটা করা দরকার। এ যন্ত্রণার বোঝা থেকে মুক্ত করতে হবে ওদের, মুক্ত করতে হবে নিজেকেও। ভাবলেন, 'কী ভাল, কত সহজ!' তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'আর ব্যথাটা? ব্যথাটা কই? ওরে, কোথায় রে তুই?' কান পেতে রইলেন উত্তরের আশায়।

'ও, এই যে। কী আর এসে যায়? থাক গে।'

'আর মৃত্যু? কোথায় সে?'

মৃত্যুর সম্পর্কে আগেকার স্বভাবসিদ্ধ আতঙ্কে খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না তাকে। কোথায় মৃত্যু? মৃত্যু জিনিসটাই বা কি? কোন ভয়ই নেই; কারণ, আসলে তো মৃত্যুই নেই। মৃত্যুর বদলে আছে আলো।

'জিনিসটা তাহলে এই!' হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'কী আনন্দ!'

তার দিক থেকে এ সবকিছু ঘটল এক মুহূর্তে; কিন্তু সে মুহূর্ত চিরন্তন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের দৃষ্টিতে তার মৃত্যুযন্ত্রণা চলল আরও দু ঘণ্টা। বুকের মধ্যে কেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল; রোগা দেহটা উঠল মুচড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে কমে এল নাভিশ্বাস, গলার ঘড়ঘড়ানি।

'সব শেষ।' কে যেন বলে উঠল।

কথাগুলো তার কানে যেতে অন্তরের অন্তস্থলে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। নিজেকেই নিজে বললেন, 'মৃত্যুর শেষ; মৃত্যু আর নেই।'

গভীর একটা নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে অর্ধপথে আটকে গেল। গা-হাত-পা সোজা করে দেহ রাখলেন ইভান ইলিচ!

শৈশব

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ শিক্ষক কার্ল ইভানিচ

এই নিয়ে আমার দশ দশটা জন্মদিন কেটে গেল। তার তিন দিন পর ১৮শ'র ১২ই আগষ্ট এল যেন এক অপূর্ব উপহারের মত। অথচ সকালবেলায় সাতটা বাজতে না বাজতেই কার্ল ইভানিচ এসে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলেন। চিনির কাগজে বানানো ছড়ির সাথে লাগানো পাখনাটা দিয়ে আমার মাথার ওপরে মশা মারতে এমন এক ঝাপটা লাগালেন যে আমার ওক্ কাঠের খাটটার গায়ে লাগানো পরীর মূর্তিটাতে জব্বর ধাক্কা লাগল। মাছিটা সোজা এসে মাথার ওপর পড়ল। বিছানার চাদরের ভেতর থেকে মাথা বের করে মূর্তিটার দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলাম। ছবিটা তখন পর্যন্ত দুলে চলেছে। মরা মাছিটা মাথা থেকে ঝেড়ে মেঝেতে ফেলে দিলাম, আর রাগতভাবে অথচ ঘুম জড়ানো চোখে কার্ল ইভানিচের দিকে তাকালাম। ওর পরনে ছিল নানান রঙের একটা তুলোর ড্রেসিং গাউন; কোমরেও সেই একই জিনিসের বেল্ট বাঁধা; মাথায় লাল বুনুনির তুলোট টুপি। নরম ছাগলের চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে তিনি লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করে ঝাপটা মারতে মারতে এগোতে লাগলেন।

'না হয় আমি ছোটই' আমি ভাবলাম, 'তাবলে আমার পেছনে লাগবেন কেন তিনি? ভোলোদিয়ার বিছানার দিকে মাছি মারতে পারেন না? ওখানে তো গাদাখানেক রয়েছে। না, তা তিনি করবেন না, কারণ ভোলোদিয়া আমার থেকে বড়; আমি সকলের ছোট, আর তাই উনি আমাকেই খোঁচাবেন! উনি যেন জীবনে আর কিছুই জানেন না,' ফিসফিস করতে লাগলাম, 'খালি কি করে আমার পেছনে লাগা যায়। খুব ভালভাবেই জানেন যে তিনি আমার ঘুম চটিয়ে দিয়েছেন আর দিয়েছেন ভয় পাইয়ে; কিন্তু এমন ভান করছেন যেন দেখেনই নি—জঘন্য মানুষ কোথাকার। আর তার ড্রেসিং গাউনটা। টুপি আর রেশমী ফিতেটা—উঃ কী জঘন্য!'

মানসিকভাবে আমি যখন কার্ল ইভানিচের ওপর আমার রাগের ঝাল মেটাচ্ছি তখন তিনি বিছানার দিকে এগোলেন। এবং ওপরের তাকটাতে কাঁচের মালা দিয়ে কারুকাজ করা ঝুলন্ত ঘড়িটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে একটা পেরেকে পাখাটা ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর বেশ খোশমেজাজে আমাদের দিকে ফিরলেন।

'ওঠ শিশু মুখ ধোও……মা হল ঘরে চলে গেছেন' মমতা মাখানো স্বরে জার্মান ভাষায় তিনি গেয়ে উঠলেন; তারপর আমার ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পায়ের কাছটায় বসলেন; পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা বের করলেন। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। প্রথমে কার্ল ইভানিচ এক টিপ নস্যি নিলেন, তারপর নাক মুছলেন, আঙুল মটকালেন। এবার আমার দিকে মন দিলেন। হাসতে হাসতে আমার গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বললেন, 'আলসের বাদশা ওঠো, ওঠো বলছি।'

সুড়সুড়িতে আতঙ্কিত হয়ে আমি বিছানা থেকে তড়াক করে উঠেও বসলাম না, এমনকি কোন জবাবও দিলাম না, বরং বালিশের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে লাগলাম আর গায়ের জোরে পা ছুঁড়ে হাসির দমক আটকাবার নানা চেষ্টা করলাম।

'আহা, কী ভাল মানুষ, কী ভালই না বাসে আমাদের, আর আমি কিনা তার সম্পর্কে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা ভাবছিলাম!'

নিজের ওপর রাগ হল এবং কার্ল ইভানিচের ওপরেও। হাসতে আর কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু স্নায়ুগুলো একেবারেই অবশ হয়ে গিয়েছিল।

আমি কেঁদে ফেললাম। চোখদুটো জলে ভরে এল। বালিশের নিচ থেকে মাথাটা বাইরে টেনে আনলাম। বিস্ময়ে কার্ল ইভানিচ আমাকে সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ করলেন, আর উদ্বিগ্নভাবে খোঁজ নিতে শুরু করলেন কি হয়েছে আমার; কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছি কিনা ইত্যাদি? তার দয়ালু জার্মান মুখ এবং আমার চোখের জলের কারণটাকে স্বর্গীয় রূপ দেওয়ার মমতা মাখানো চেষ্টা—সব মিলে আমার চোখের জল ধারা আরও বেগে নেমে এল। লজ্জা লাগল আমার; এবং কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কিভাবে এক মুহূর্ত আগে এই কার্ল ইভানিচকেই আমি ঘৃণা করেছিলাম আর তার ড্রেসিং গাউন, টুপি, রেশমি ফিতে সব কিছুকেই বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছিল! অথচ এখন আমার সবকিছুই উলটো বলে মনে হল। মনে হল, ওগুলো কী সুন্দর! আর রেশমী ফিতেটা তো তার ভালমানুষীর একেবারে সহজ সরল একটা প্রমাণ। তাকে বললাম, আমি যে কেঁদেছি তার কারণ খুব বিচ্ছিরী একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি, আমার মা মারা গিয়েছেন, আর কারা যেন তাকে কবরের দিকে নিয়ে চলেছে। এগুলো সবই ছিল আমার নিজের বানানো। আসলে মনেই ছিল না আগের রাতে কি স্বপ্ন দেখেছি! কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার বানানো কাহিনী শুনেই কার্ল ইভানিচ দুঃখে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, তখন মনে হল যেন সত্যিই সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা আমি দেখেছিলাম; আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল এক ভিন্ন কারণে।

কার্ল ইভানিচ আমার কাছ থেকে উঠে গেলে পর আমি বিছানায় বসে আমার ছোট্ট পা দুটোকে মোজা পরাতে লাগলাম। কিভাবে যেন চোখের জল থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কল্পিত স্বপ্নের বিষণ্ণ চিন্তাটা তখনও আমার ওপর ভর করে আছে। এমন সময় দিয়াদকা নিকোলাই এলেন—পরিচ্ছন্ন চটপটে ছোট্ট একটি মানুষ; সব সময় গম্ভীর, নিশ্চিত শ্রদ্ধেয়, কার্ল ইভানিচের খুব প্রিয় বন্ধু। আমার জুতো জামা নিয়ে এলেন তিনি। ভোলোদিয়ার বুট ছিল কিন্তু আমার ভাগ্যে সে অসহ্য ফিতে আঁটা জুতোই। তার সামনে কাঁদতে বড্ড লজ্জা লাগছিল, জানলায় সকালের আনন্দমুখর সূর্য দেখা যাচ্ছিল। ওদিকে আর ভোলোদিয়া মারিয়া ইভানোভনাকে নকল করছিল (আমার বোনের গভর্নেস)। মুখ ধোয়ার বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে এত আনন্দে এত জোরে সে হাসছিল যে, গম্ভীরাচার্য্য নিকোলাই পর্যন্ত কাঁধে তোয়ালে, এক হাতে সাবান এবং আরেক হাতে বেসিন নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'অনেক হয়েছে ভলাদিমির পেত্রোভিচ; নাও, এখন মুখ ধুয়ে ফেল।' তার কথায় আমিও হেসে উঠলাম।

'তোমাদের হয়ে গেছে?' পড়ার ঘর থেকে ইভানিচের গলা ভেসে এল।

এবার তার গলার স্বর কর্কশ শোনাল; কিছুক্ষণ আগের দয়ার্দ্রতার এক ফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই, যা শুনে কিনা আমি চোখের জলে ভেসে গিয়েছিলাম। পড়ার ঘরে ঢুকলেই কার্ল ইভানিচ একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে যান। তখন তিনি শিক্ষক। ঝটপট জামা কাপড় পরে নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকলাম ভেজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে।

দরজা আর জানলার মাঝখানে রোজকার সেই জায়গাটায় কার্ল ইভানিচ নাকে চশমা লাগিয়ে হাতে একখানা বই ধরে বসেছিলেন। দরজার বাঁ দিকে দুটো বইয়ের তাক; একটা আমাদের—শিশুদের; অন্যটা কার্ল ইভানিচের নিজস্ব বিশেষ সম্পত্তি। আমাদের দিকটায় হরেক রকম বইয়ের মিশেল—স্কুলের বই এবং আরও সাত পাঁচ রকমের। কয়েকটা একেবারে সিধে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যগুলো কাত হয়ে; একমাত্র হিষ্টয়ার ডেজ ভয়েজেসের লালরঙে বাঁধাই করা বইয়ের দুটো খণ্ড দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঠিকভাবে রাখা হয়েছে। তারপরেই লম্বা, মোটা, বড় আর ক্ষুদে ক্ষুদে বই। কোনটা মলাটবিহীন কোনটা আবার পুরোপুরি বইবিহীন মলাট; সবগুলো মিলে একটা জগাখিচুড়ী। খেলাধূলোর সময়ের ঠিক আগে কার্ল ইভানিচ যখনই তাকটাকে গুছোতে বলতেন, তখনই ওলট পালটকরে আমরা সেগুলোকে সব গাদাগাদি করে সাজিয়ে রাখতাম। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই যদিও আমাদের বইয়ের মত গাদাখানেক ছিল না, তবে তাতে বহু বিচিত্র রকমের বই ছিল। তারমধ্যে তিনটের কথা আমার বেশ মনে আছে—বাঁধা কপির বাগানে সার দেওয়া সংক্রান্ত মলাটবিহীন একটা জার্মান চটি বই; সাত বছরের যুদ্ধের ইতিহাসের একটা খণ্ড চামড়ার কাগজে মোড়া, তার এক পাশ পুড়ে গিয়েছিল; আর তরল পদার্থের স্থিতি-বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সম্পূর্ণ খণ্ড। কার্ল ইভানিচের বেশির ভাগ সময়ই কাটত কাগজ পড়ে,—চোখের মাথা খেয়েছিলেন তিনি এভাবে। কিন্তু এই সব বই আর জনপ্রিয় পত্রিকাগুলো ছাড়া অন্য কোন বইই তিনি কখনও উলটেও দেখেননি।

কার্ল ইভানিচের তাকে যেসব জিনিসপত্র ছিল তার ভেতর একটাই আমাকে তার কথা বারবার মনে করিয়ে দিত; তা হল কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের ওপর কার্ড-বোর্ডের একটা আচ্ছাদন—কাঠের গোঁজের সাহায্যে যাকে ওপর-নিচ করা যেত। আচ্ছাদনের ওপর একটি মহিলা এবং একজন চুল বাঁধাইকারীর ব্যঙ্গ-চিত্র সাঁটা ছিল। এ ধরনের জিনিস বানাতে কার্ল ইভানিচ ছিলেন পোক্ত; ধারাল আলোর হাত থেকে তার দুর্বল চোখ দুটো বাঁচানোর জন্যে তিনি নিজেই এই আচ্ছাদনটা আবিষ্কার করেছিলেন।

আমার সামনে এখন যেন তার সেই দীর্ঘ শরীর—যা আচ্ছাদিত রয়েছে বিরাট ড্রেসিং গাউনটার ভেতরে। আর তার লাল টুপির তলা থেকে যেন পাতলা ধূসর চুলগুলো দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন বসে আছেন ছোট টেবিলটার কাছে, আর চুল বাঁধাইকারীর ছবিওলা আলো-ঢাকনিটা থেকে যেন তার মুখে একটা ছায়া এসে পড়েছে। তার একটা হাতে বই, অন্য হাতটা রাখা রয়েছে চেয়ারের হাতলে। সামনে রয়েছে শিকারীর ছবি আঁকা তার সেই ঘড়িটা, আর চেক কাটা রুমাল; গোলাকার কালো নস্যির ডিবে এবং সবজে চশমার খাপ। থালার ওপর মোমবাতির সলতে কাটা কাঁচি। খুঁটিনাটি সব ঠিকঠাক জায়গায় এমনভাবে

গোছানো রয়েছে যে তা থেকে যে কেউ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে কার্ল ইভানিচের বিবেক ছিল খুব পরিষ্কার এবং মনটাও ছিল শান্ত।

কখনও সখনও নিচ তলার সিঁড়ি দিয়ে ছুট লাগাতাম হলের দিকে, যতক্ষণ না ক্লান্ত হতাম। তারপর পা টিপে টিপে ওপর তলার সিঁড়ি বেয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢুকতাম। দেখতাম কার্ল ইভানিচ হাতলওলা চেয়ারটায় একা একা বসে তার মনের মত বই পড়ছেন। মুখে তার শান্ত গম্ভীরতার প্রলেপ। মাঝে মাঝে আবার এমন এক-এক মুহূর্তে তার কাছে পৌঁছে যেতাম যখন কিনা তিনি মোটেই পড়তেন না, নাকের ওপর চশমাটা ঝুলিয়ে এমনিই বসে থাকতেন। তার নীল বর্ণ আধ বোজা চোখ দুটো অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিয়ে সামনের দিকে স্থির হয়ে থাকত ঠোঁটের ওপর বিষন্ন একফালি হাসি ছড়িয়ে। শিকারী ঘড়ির টিক টিক আর তার শ্বাস নেওয়ার একটানা শব্দটা না থাকলে ঘরটা একেবারেই নৈঃশব্দে ভরাট হয়ে যেত।

প্রায়ই তিনি আমাকে খেয়াল করতেন না, আর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতাম, আহা বেচারী বুড়ো! আমরা তো অনেকেই এক সাথে মজা করে খেলাধুলো করতে পারি—কিন্তু তিনি, তিনি সব সময়ই একা। এমন একটা মানুষও এ তল্লাটে নেই যার কিনা তার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা আছে। তিনি নিজেই আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি অনাথ। এবং তার জীবনের কাহিনী ছিল সত্যিই দুঃখজনক। আমার মনে আছে নিকোলাইকে তিনি বলেছিলেন: এমনি অসহায়-ভাবে জীবন কাটানোটা সত্যিই সাংঘাতিক!

তার জন্যে আমার এত কষ্ট হত যে আমি তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলতাম, 'প্রিয় কার্ল ইভানিচ।' নিশ্চই আমার মুখে ও কথাটা তার বেশ লাগত, কারণ তিনি তখন আমার পিঠে হাত বুলোতেন, আর আমি পরিষ্কার বুঝতে পারতাম যেন তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

আরেকটা দেয়ালে মানচিত্রের সারি ঝুলত। প্রায় সবগুলোই ছিল ছেঁড়াকাটা কিন্তু কার্ল ইভানিচের নিপুণ হাতে সারানো। তৃতীয় দেয়ালে, যার ঠিক মাঝখান-টায় নিচের তলায় যাবার সিঁড়ির দরজাটা ছিল তাতে দুটো রুল ঝুলত তার একটা একেবারে আগাগোড়া খাঁজ কাটা,—ওটা ছিল আমাদের; আরেকটা, নতুনটা, ছিল একেবারে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ওটা আমাদের খাতায় সিধে লাইন টানার পরিবর্তে আমাদের 'সিধে' করার কাজেই বেশি ব্যবহৃত হত। দরজার আরেক দিকে ঝুলত একটা ব্ল্যাক বোর্ড, যেখানে আমাদের মারাত্মক কুকর্মগুলো বৃত্তাকারে আঁকা থাকত আর ছোটখাটোগুলোতে দেওয়া থাকত ক্রশ চিহ্ন। বোর্ডের ঠিক বাঁ দিকের কোণাটায় শাস্তিভোগকালীন আমাদের প্রত্যেককেই নীল ডাউন হয়ে থাকতে হত।

ঐ কোণার দিকটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে আমার! চুল্লীর ঢাকনা আর গরম বাতাস আসার জন্যে তাতে যে গর্তটা ছিল, সেটা সরিয়ে নিলে যে শব্দ হত, তার কথা এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে। আমি ঐ কোণটাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ না হাঁটু আর পিঠ ব্যথায় টনটন করে উঠত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতাম কার্ল ইভানিচ নিশ্চয় আমার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। তার পক্ষে হাতলওলা নরম চেয়ারে আরাম করে বসে তরল পদার্থের স্থিতি-বিজ্ঞানের বই পড়াটা খুবই মজার ব্যাপার ছিল, কিন্তু আমার হালটা? তাই বাধ্য হয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা তাকে

মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে খুব আলতোভাবে বারবার চুল্লীর ঢাকনাটা খুলতাম আর বন্ধ করতাম। কিংবা দেওয়ালের আস্তরণ খসিয়ে তাতে গর্ত করতাম। কিন্তু যদি কখনও হঠাৎ খুব বড় একটা টুকরো খসে পড়ত তাহলে আর রক্ষে ছিল না। তখন শাস্তির থেকে ভীতিটা হয়ে উঠত মারাত্মক। আমি বারবার কার্ল ইভানিচের চার দিকে উঁকি দিতাম, কিন্তু তিনি বইখানা হাতে নিয়ে এমনভাবে বসে থাকতেন যেন কিছুই তার খেয়াল হয়নি।

ঘরের মাঝখানটায় কালো রঙ। ছেঁড়া অয়েলক্লথে ঢাকা একটা টেবিল দাঁড় করানো থাকত, তার ফাক থেকে উঁকি দিত চারটে কোণা। কলমকাটা ছুরিতে কাটা নানা জায়গা দেখা যেত। টেবিলটার চার ধারে রঙচটা অনেকগুলো টুল দীর্ঘদিনের ব্যবহারে অনুজ্জ্বল দেখাত। পেছনের দেয়ালটা তিন তিনটে জানলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ওগুলো রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। প্রতিটি গর্ত, নুড়ি আর চাকার দাগ—সবকিছুই ছিল আমার কাছে অনেককালের চেনা এবং প্রিয়। রাস্তার অন্য পাড়ে মাথা ছাঁটা লাইম গাছের সারির ভেতর থেকে কঞ্চির বেড়াগুলো মুখ তুলে তাকিয়ে থাকত; লাইমকুঞ্জের পেছনে দেখা যেত তৃণভূমি। তার একদিকটা পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল, আর অন্যদিকটায় ছিল বন।

দূরে দেখা যেত পাহারাদারের ছোট্ট কুঁড়েঘর। ডান দিকের জানলা দিয়ে চোখে পড়ত নিচু সমতল ছাদের খানিকটা; বড়রা সেখানে বসে দুপুরে খেতেন। আর যদি ওদিকে তাকিয়ে থাকা যেত, যখন কার্ল ইভানিচ আমাদের শ্রুতিলিখনের পাতা দেখতেন, তখন মার কালো মাথাটাও আমাদের নজরে আসত, এবং অন্য কারও পেছনদিকটা; তাছাড়া হাসি আর কথার ক্ষীণ স্বরটাও শুনতে পেতাম, এবং সেখানে না থাকার জন্যে মনে মনে বিরক্ত হতাম। ভাবতাম 'কবে যে ভাই বড় হবে আর লেখাপড়া শিকেয় উঠবে! যাদের ভালবাসি তাদের সাথে কবে যে একসাথে বসে এইসব কথাবার্তা ভাল করে শুনতে পারব?' যার থেকে ক্রমে ক্রমে দুঃখ হত, আর অদ্ভুত সব চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করত, ফলে কার্ল ইভানিচ ভুলের জন্যে যখন বকতেন তখন তা কানেই ঢুকত না।

অবশেষে কার্ল ইভানিচ ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিলেন, নীল দোয়েল পাখির লেজের মত কোটটা গায়ে চাপিয়ে, ঝুঁটি আর ভাঁজগুলো কাঁধে ফেলে, আয়নার সামনে টাইটা ঠিক করে আমাদের নিয়ে নিচের তলায় আসলেন মাকে সুপ্রভাত জানানোর জন্যে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ মা

মা বারান্দায় বসে চা ঢালছিলেন। তার এক হাতে ছিল টি-পট, অন্য হাতে সামোভারের নলটা। তা থেকে ট্রে'তে এবং টি-পটের কানায় জল উপচে পড়ছিল। মা সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি; এমনকি আমরা যে ঘরে ঢুকেছি, তা-ও নয়।

একান্ত প্রিয় কারও চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলেই চোখের সামনে অতীতের যে স্মৃতি ভেসে ওঠে তা বেদনার অশ্রুতে সজল। আমার মাকে কেমন দেখতে ছিল এ কথা চিন্তা করলেই আমি দেখতে পাই তার স্নেহ আর মমতায় আপ্লুত দুটি চোখ; ঘাড়ের অাঁচিলের তলায় গজিয়ে ওঠা কোঁকড়া চুল; সূক্ষ্ম সুচিশিল্পে ভরপুর সাদা কলার, আর সেই শীতল নরম দুটি হাত—যা আমার সারা

গেছে এক অনির্বচনীয় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যেত ; যে হাতে আমি অগণিতবার চুমু খেয়েছি। অথচ কী আশ্চর্য, তার পূর্ণ প্রতিবিম্ব কখনোই আমাকে ধরা দেয় না।

মনে পড়ে, শোফার বাঁদিকে বিরাট বিলাতি পিয়ানো। আমার শ্যামবর্ণা বোন ওখানে বসে বেশ মন দিয়ে সঙ্গীত সাধনা করছে। সেইমাত্র ঠাণ্ডা জলে হাত ধোয়ায় তার ছোট আঙুলগুলো গোলাপী রঙ ধারণ করেছে। তার বয়স তখন মাত্র এগার। পরনে তার লিনেনের পোষাক, আর সাদা লেসের কাজ করা ঢিলে পাজামা। সঙ্গীত-বিদ্যার প্রথম পাঠ সবেমাত্র শিখেছে। তার পাশে বসে আছেন মারিয়া ইভানোভনা—তার গায়ে নীল জ্যাকেট আর মাথায় লাল ফিতে আঁটা টুপি। তার মুখখানা রাগে লাল—কার্ল ইভানিচ ঘরে ঢুকতেই সেটা যেন আরও কর্কশ হয়ে উঠল। তার দিকে কড়া চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, এবং তার নমস্কারের প্রত্যুত্তর না দিয়েই পায়ে তাল ঠুকে ঠুকে গুনতে লাগলেন—এক, দুই, তিন ; আগের চেয়ে আরও জোরে এবং আরও বেশি আদেশের ভঙ্গিতে।

যাই হোক, কার্ল ইভানিচ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে মার কাছে গেলেন, এবং বিশুদ্ধ জার্মানে তাকে অভিবাদন জানালেন। আকস্মিক অভিবাদনে মা চমকে উঠলেন, এবং এমনভাবে মাথা ঝাঁকালেন যে মনে হল তিনি যেন তাঁর মনের বেদনা-দায়ক ভাবনার বোঝাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। কার্ল ইভানিচের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, এবং ইভানিচ যখন তার হাতে চুমু খাচ্ছিলেন, তখন তিনিও ইভানিচের কপালে চুমু খেলেন। তারপর জার্মানে বললেন, 'ধন্যবাদ ইভানিচ, রাতে ছেলেদের ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?'

একেই ইভানিচের এক কান কালা, তার ওপর পিয়ানোর বিকট চিৎকারে মার কোন কথাই তার কানে গেল না। তিনি শোফার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, টেবিলের ওপর একটা হাত রেখে, এক পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে এমনভাবে হাসলেন যে আমার মনে হল তিনি যেন এক পবিত্রতার মূর্তি। তারপর মাথার টুপিটা উঁচু করে ধরে বিনীত স্বরে বললেন, 'নাতালিয়া নিকোলায়েভনা আমায় মাফ করবেন কি ?'

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ইভানিচ কখনও মাথা থেকে তার প্রিয় লাল টুপিটা খুলতেন না ; কিন্তু যখনই তিনি আমাদের বসার ঘরে আসতেন তখনই সেটাকে মাথা থেকে নামিয়ে রাখার জন্য অনুমতি চাইতেন।

ইভানিচের দিকে আরও কিছুটা সরে এসে মা বললেন, 'ওটা আপনি খুলে ফেলুন কার্ল ইভানিচ ; আমি জানতে চাইছিলাম ছেলেরা ভাল ঘুমিয়েছে তো ?' কিন্তু ইভানিচ এবারও কিছু শুনতে পেলেন না, এবং টাকমাথায় টুপিটা পরেই থাকলেন আর আগের চেয়েও অমায়িকভাবে হেসে চললেন। মা মারিয়া ইভানোভনাকে হেসে বললেন, 'মিমি, তোমার বাজনাটা একটু থামাও ; আমরা কিছু শুনতেই পাচ্ছি না।'

মার মুখ এমনিতেই সুন্দর ছিল, তখন যেন তা আরও জীবন্ত হয়ে উঠল। যদি আমার কষ্টের মুহূর্তগুলোতে আমি তার সেই অপরূপ সুন্দর মুখটা একবার কল্পনা করতে পারতাম, তা হলে আর দুঃখ কাকে বলে তা জানতামই না। আমার মনে হয়, সৌন্দর্য বলে যদি দুনিয়ায় কিছু থেকেথাকে তবে তা মানুষের হাসিতে ; অবশ্য যদি সেই হাসি কারও মুখের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে, তবেই। না হলে পরিবর্তনবিহীন

হাসি নিতান্তই সাদামাটা, এমনকি কখনও কখনও তা কুৎসিতও বটে।

আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর পর মা আমার মাথাটা তার দু হাতের মধ্যে টেনে নিলেন, এবং গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ সকালে কেঁদেছ?' আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না। তখন তিনি আমার চোখে চুমু খেয়ে জার্মানে বললেন, 'কেন কেঁদেছিলে?' যখনই তিনি খুশি থাকতেন তখনই জার্মানে কথা বলতেন। আসলে সেই ভাষাটার ওপর তার দখল ছিল বেশ ভাল রকমের।

আমার স্বপ্নের কথা চিন্তা করে বলে উঠলাম, 'ঘুমের ঘোরে কেঁদেছিলাম, মা।' এবং ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

কার্ল ইভানিচ আমার বক্তব্যকে সমর্থন করলেন, কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। মা আবহাওয়া সম্পর্কে দু চারটে কথা বললেন, মিমিও তাতে অংশগ্রহণ করলেন,—তারপর তিনি কোন চাকরের জন্য কিছুটা চিনি রেখে সেখান থেকে উঠে গেলেন এমব্রডারীর ফ্রেমটার দিকে। সেটা জানালার কাছে দাঁড় করানো ছিল। বললেন, 'এখন তোমরা তোমাদের বাবার কাছে যাও। তাকে গিয়ে বল, যে সরাইখানায় যাবার আগে তিনি যেন আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যান।'

সঙ্গীত, হিসেব-নিকেশ, কড়া-চাউনি—সবই বহাল রইল। আমরা বাবার কাছে গেলাম। যাবার জন্য ঠাকুরদার আমল থেকে চাকরদের ঘর বলে পরিচিত ঘরটা অতিক্রম করতে হল ঘরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বাবা

কতকগুলো খাম, কাগজপত্র আর ব্যাঙ্কনোটের বাণ্ডিলের দিকে মুখ করে দরজা আর ব্যারোমিটারের মাঝখানটাতে রোজকার মত পরিচিত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দেওয়ান ইয়াকফ মিখাইলভকে বাবা বেশ কাটা কাটা কথা বলছিলেন আর ইয়াকভ বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তার হাতদুটো পেছনে নিয়ে আস্তে আস্তে মোচড়াচ্ছিলেন।

বাবা যতই রেগে যাচ্ছিলেন ইয়াকভের আঙুলগুলোর ওঠানামাও ততই দ্রুততর হচ্ছিল। আবার তিনি যখন কথা বন্ধ করছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো থেমে যাচ্ছিল। কিন্তু ইয়াকভ নিজে যখন মুখ খুললেন তখন তার আঙুল সঞ্চালনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে বন্যার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমার সে সময় মনে হচ্ছিল, আঙুলের নড়াচড়া দেখে ইয়াকভের মনের সব গোপন চিন্তাই ধরে ফেলা সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার মুখখানা ছিল একেবারেই শান্ত। সেখানে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছিল মর্যাদা আর বশ্যতার ভাব! তিনি যেন বলতে চাইছিলেন, 'আমি ঠিকই করেছি; অবশ্য আপনি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারেন।'

বাবা আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়াও।' তারপর দরজাটা বন্ধ করার জন্য আমরা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে এগিয়ে এলেন।

দেওয়ানকে উদ্দেশ্য করে অভ্যাস মত কাঁধটা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'ওঃ ঈশ্বর! ইয়াকভ, তোমার আজ হলটা কি? আটশ রুবল ভর্তি এই খামটায়......'

ইয়াকভ তার গুনতি করার যন্ত্রটা নাড়িয়ে আটশ রুবল গুনে ফেললেন। তারপর উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এক অনির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে পরবর্তী বক্তব্য শোনার অপেক্ষায়।

'এটা আমার অনুপস্থিতিতে চাষের কাজ চালাবার জন্য, বুঝলে? তাছাড়া মিল থেকে তুমি পাবে এক হাজার রুবল; কি, ঠিক আছে তো? এছাড়া ভাঁড়ার থেকে ঘাস শুকোনো বাবদ ধার পাচ্ছ আট হাজারের মত, যার থেকে তোমার নিজের হিসেব অনুযায়ীই বিক্রি করতে পারবে সাত হাজার পুড—পঁয়তাল্লিশ কোপেক দরে। ধর তা থেকে পাচ্ছ আরও তিন হাজার রুবল। তা হলে সব মিলে তোমার হাতে কত দাঁড়াচ্ছে? বার হাজার রুবল। কি, ঠিক আছে তো?'

'আজ্ঞে বিলকুল ঠিক।' মুখ খুললেন ইয়াকভ। কিন্তু তার হাতের আঙুলের ওঠানামা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন, অথচ বাবা ঠিক সে মুহূর্তেই তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তা হলে শোন, এ থেকে দশ হাজার রুবল পাঠাবে কাউন্সিলে পেত্রোস্কোয়ার জন্য। বাকিটা আমার কাছে নিয়ে আসবে আজ থেকে খরচ-খরচা চালাবার জন্য।' বলে চললেন, (ইয়াকভ বার হাজার বার করে নিলেন এবং একুশ হাজার গুনে ফেললেন) আর এই খামের টাকাটা, ওটার ওপর যে ঠিকানা লেখা রয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দেবে।'

টেবিলের কাছটায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম; তাই একবার খামের ওপর লেখা নামটাতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম লেখা রয়েছে: 'কার্ল ইভানিচ মহাশয়।'

বাবা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন, কারণ হঠাৎ তিনি তার হাতটা আমার কাঁধের ওপর রাখলেন, এবং সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে ওখান থেকে আমার সরে যাওয়া উচিত। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ওটা আদর না তিরস্কার। যাই হোক, তার পেশীবহুল প্রকাণ্ড হাতটায় হঠাৎ একটা চুমু খেলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' ইয়াকভ বললেন, 'এবং খাবারোভকার টাকাটার ব্যাপারে আপনার নির্দেশটা কি?'

খাবারোভকা ছিল আমার মার মালিকানাধীন একটা গ্রাম। বাবা বললেন, 'ওটা কাছারির আওতাতেই থাকুক। আমার অনুমতি ছাড়া ওথেকে একটা রুবলও নেবে না।'

কয়েক মুহূর্ত ইয়াকভ চুপচাপ রইলেন, তারপর তার আঙুলগুলো দ্রুতলয়ে নাচতে লাগল। যে দাসসুলভ নির্বোধ চোখে তিনি তার মনিবের আদেশ শুনছিলেন, তার যেন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেল। ধূর্তের তীক্ষ্ণভাব জেগে উঠল তার চোখে। তিনি গুনতির যন্ত্রটা কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'মালিক, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সময় মত কাউন্সিলে টাকাটা জমা দেওয়া সম্ভব হবেনা। আপনি বললেন যে আমরা ধারের টাকা পাচ্ছি, মিল থেকে পাচ্ছি, এবং এমনকি ঘাস শুকানি বাবদও কিছু টাকা আসছে আমাদের হাতে।' কথাগুলো বলার সময় গুনতির যন্ত্রটার ওপর থেকে তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন, এবং বাবার ওপর ধারাল নজর বুলিয়ে একটু থেমে বললেন, 'আমার মনে হয়, আমরা বোধ হয় সব ঠিক ঠিক মনে করতে পারছিনা।'

'কেন?'

'অনুগ্রহ করে আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলতে দিন। যেমন, ঐ গমকলের ব্যাপারটা। দেরি হওয়ার জন্য গমকলের মালিক আমাদের কাছে দু দুবার এসে দিব্যি কেটে বলে গেছে যে তার কাছে একটা কপর্দকও নেই। সে এখনও এখানেই

আছে। আপনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলুননা।'

'কি বলছে ও?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন মাথাটা নাড়িয়ে। যার মানে তিনি, মোটেই তার সাথে কথা বলতে রাজি নন।

'সেই এক পুরনো কাসুন্দী। বলছে কোন কাজকর্ম নেই, হাতে সামান্য যা কিছু টাকাকড়ি ছিল তা নাকি বাঁধ দিতেই খরচ হয়ে গেছে। যদি ওকে বের করে দিই, তবে কি তাতে আমাদের কোন লাভ হবে? এই ধরুন না ধারের ব্যাপারটাই। আপনি তো বেশ খুশি হয়েই কথাটা বলছিলেন। আমার মনে হয় আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, সেক্ষেত্রে টাকাটা একেবারেই জলে গেছে। আর খুব শিগগির তা ফেরৎ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। দিন কতক আগে শহরে এক গাড়ি ময়দা পাঠিয়েছি; ইভান আফানসিচের কাছে এ সম্পর্কে একটা চিরকুটও দিয়ে দিয়েছি। সে জানিয়েছে যে সে আপনার উপকারে আসতে পারলে খুশি হত, কিন্তু ব্যাপারটা তো আর তার হাতে নয়; ফলে মাস দুয়েকের আগে আপনি নিস্কৃতি পাচ্ছেন না। খড়ের ব্যাপারেও আপনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। ধরেই না হয় নেওয়া যাক যে তিন হাজারেই আমরা সবটা বেচলাম…' গণনা-যন্ত্রে তিন হাজারের জায়গাটায় একটা দাগ কেটে বাবার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন কত সামান্য। তাছাড়া আমরা যদি এখন বিক্রি করি তাহলে যে খুব কম দামেই বেচতে হবে তা তো আপনি জানেন-ই…'

তার কাছে তখনও যে একটা বিরাট যুক্তির ভাণ্ডার জমা রয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল; তাই বাবা নিজে থেকেই বাধা দিয়ে বললেন, 'যে ব্যবস্থা করেছি তার কোন হেরফের আমি করব না। তবে সত্যি সত্যিই যদি খুব দেরি হয় তবে আমাদের করার কিছুই নেই; যা দরকার পড়বে তা খাবারোভকা তহবিল থেকেই নিয়ে নেবে।'

'যে আজ্ঞে!' ইয়াকভের মুখের ভাব আর তার আঙুল নাড়া দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে বাবার সর্বশেষ সিদ্ধান্তে তার মন ভরে গেছে।

ইয়াকভ আগে সার্ফ ছিলেন, এবং মনে মনে ছিলেন বেশ হিংসুটে আর প্রভুভক্ত। সব ভাল দেওয়ানের মতই তিনিও ছিলেন মনিবের ব্যাপারে হাড় কিপটে। মনিবের ভালর জন্য তার মাথায় যে কত অদ্ভুত পরিকল্পনা আসত! মনিবগিন্নীর সম্পত্তি বিকিয়ে মনিবের সম্পত্তি বাড়াবার ব্যাপারে তিনি চিরকালই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এবং সর্বদাই বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, জমিদারীর সমস্ত খাজনার টাকা পেত্রোস্কোয়েতে (যে গ্রামে আমরা বাস করতাম) পুনর্বিনিয়োগ করা দরকার। এবং এসব ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত তিনিই জয়ী হতেন; কারণ, তার কথাই সবসময় কার্যকরী হত।

ইয়াকভের সঙ্গে কথা শেষ করে বাবা আমাদের জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন যে আমাদের আলসেমি ঝেড়ে ফেলে পড়াশুনোয় মন দেওয়ার সময় হয়েছে, কারণ, আমরা তো আর সেই ছোট্টটি নেই।

তারপর বললেন, 'আজ রাতে আমি যে মস্কো যাচ্ছি তা তো তোমরা জানই। তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা তোমাদের দিদিমার সঙ্গে থাকবে, এবং মেয়েরা থাকবে এখানে—তোমাদের মার সাথে। তোমরা জান, তোমাদের মার একটাই মাত্র সান্ত্বনা থাকবে যখন তিনি শুনতে পাবেন যে তোমরা ভালভাবে

পড়াশুনো করছ এবং তোমাদের শিক্ষকেরা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট রয়েছেন।'

বেশ কিছুদিন ধরে যে প্রস্তুতি চলছিল তাতে যদিও আমরা অস্বাভাবিক কিছু একটা আশা করছিলাম, তবু এ খবরটা আমাদের সত্যিই মর্মাহত করল। ভোলোদিয়ার মুখটা লাল হয়ে গেল এবং মা যে কথাটা বলতে বলেছিলেন সেটা সে কাঁপা কাঁপা স্বরে পুনরাবৃত্তি করল।

'তা হলে স্বপ্নে যা দেখেছি, তাই হল!' আমি ভাবলাম। মার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে মনে বললাম, 'হে ভগবান, যেন খারাপ কিছু না হয়।' আবার সেই সঙ্গে বড় হয়েছি, এ কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে বেশ আনন্দ হল। ভাবলাম, 'যদি আজ রাতেই যেতে হয় তা হলে তো আর আজকে পড়তেই হবেনা।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্ল ইভানিচের জন্যও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, 'তাকে তো তাহলে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দেওয়া হবে; এবং সেজন্যই একটা খামের ওপর তার নাম লিখে রাখা হয়েছে।' তখন মনে হল, 'না, চিরদিন পড়াশুনো করাটাই ভাল। তাছাড়া দূরে চলে যাওয়াটাও মোটেই উচিত নয়। মার কাছ থেকে, মাস্টারমশাইর কাছ থেকে দূরে যাওয়া সত্যিই অন্যায়। বেচারি কার্ল ইভানিচ মনে বড় আঘাত পাবেন। লোকটা এমনিতেই বড় অসুখী।' এসব কথা মনে হতেই আমি পায়ের জুতোর কালো ফিতেটার দিকে নিস্পলক দৃষ্টি মেলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ব্যারোমিটারের পতন নিয়ে কার্ল ইভানিচের সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলে, জোয়ান শিকারী কুকুরগুলোকে বের হবার আগে যাতে পরখ করে দেখে নিতে পারেন সে কারণে ইয়াকভকে সেগুলোকে অভুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়ে বাবা আমার আশাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে আমাদের পড়তে পাঠিয়ে দিলেন এই সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে যে তিনি যখন শিকারে যাবেন তখন আমাদেরও সঙ্গে নেবেন।

ওপর তলায় ওঠার সিঁড়ি বেয়ে আমি দৌড়ে বারান্দায় গেলাম। সেখানে বাবার প্রিয় গ্রেহাউণ্ড, মাইকা, রোদ্দুরে শুয়ে চোখ পিটপিট করছিল। তার গায়ে হাত বুলিয়ে, নাকে একটা চুমু খেয়ে বললাম, 'মিলোচকা, আমরা আজ চলে যাচ্ছি, বিদায়। আর কখনও আমাদের দুজনের দেখা হবেনা।'

আবেগে আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ পড়াশুনো

কার্ল ইভানিচের শরীরটা সেদিন সুবিধের ছিলনা। তার কোঁচকানো ভুরু, তোষাখানায় কোটটা ছুঁড়ে ফেলার ধরণ, রাগে টং হয়ে বারবার বেলট বাঁধা, আর যে জায়গাটুকু মুখস্থ বলতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে কথামালা বইয়ের পাতায় নখ দিয়ে গভীর আঁচড় দেওয়া থেকেই সেটা বেশ বোঝা গেল। ভোলোদিয়া সেদিন বেশ খেটে পড়ছিল, কিন্তু আমি এত ভেঙে পড়েছিলাম যে কিছুতেই মন বসছিল না। অনেকক্ষণ বোকার মত কথামালা বইটার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকলাম। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে আমার চোখ দুটো এমনভাবে জলে ভরে এল যে আমি আর পড়তেই পারলাম না। নির্দিষ্ট অংশটাকে ইভানিচের কাছে পুনরাবৃত্তি করার পালা আসতেই, যিনি আধবোজা চোখে (খারাপ লক্ষণ এটা) শুনছিলেন, যেখানে একজন বলছে, 'কোত্থেকে এলে তুমি?' এবং তার জবাবে অন্যজন বলছে, 'আমি কফিহাউস থেকে এলাম' সেই জায়গাটা আসতেই আমার চোখের জল আর বাধা মানল না। হিক্কার জন্য মুখ ফুটে আর বলতেই

পারলাম না যে 'তুমি খবরের কাগজ পড়নি ?' তারপর সেটা যখন লেখার পালা এল তখন কাগজের ওপর চোখের জল ফেলে সেটাকে এমনভাবে চুবসে দিলাম যে মনে হল যেন চোখের জলেই উত্তরটা লিখব।

কার্ল ইভানিচ তো রেগে লাল। আমাকে একেবারে সেই কোণটাতে পাঠিয়ে দিলেন। বেশ বুঝিয়ে দিলেন যে এটা আমার গোয়ার্তুমি, পুতুলের মজা (এটা ছিল তার প্রিয় কথা)। রুল কাঠ তুলে আমাকে ভয় দেখালেন। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম; অথচ চোখের জলের জন্য একটাও শব্দ আওড়াতে পারলাম না, তাই রাগে নিকোলাইয়ের ঘরে গিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। নিকোলাইয়ের ঘরের কথাবার্তা পড়ার ঘর থেকে শোনা গেল। কার্ল ইভানিচ যেতে যেতে বললেন, 'নিকোলাই শুনেছ কি, ছেলেমেয়েরা সব মস্কো যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বেশ শ্রদ্ধার সাথে নিকোলাই জবাব দিল। নিশ্চয়ই সে উঠে বসার চেষ্টা করেছিল, নাহলে কার্ল ইভানিচ বলতে যাবেন কেন যে, 'না না, উঠো না নিকোলাই!' তারপর তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি কোণ থেকে দরজার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোলাম যাতে সব সব কথা শুনতে পাই।

• 'যতই লোকের ভাল করনা কেন, যতই তুমি তাদের সাথে নিজেকে জড়াওনা কেন, ভুলেও কৃতজ্ঞতা আশা কোরোনা, বুঝলে নিকোলাই।' কার্ল ইভানিচ আবেগের সাথে বললেন।

নিকোলাই তখন জানলার কাছে বসে জুতো সারাচ্ছিল। মাথা নাড়িয়ে সায় দিল ইভানিচের কথায়।

'বারোটা বছর আমি এ বাড়িতে আছি, ঈশ্বরের সামনে বলতে পারি, নিকোলাই,' চোখ দুটো আর নস্যির ডিবেটা সিলিং পর্যন্ত তুলে ইভানিচ একনাগাড়ে বলে চললেন, 'আমি ওদের ভালবেসেছিলাম, আমার নিজের ছেলে হলে তার প্রতি যতটা নজর দিতাম তার চেয়েও বেশি খেয়াল রাখতাম সবার। তোমার মনে আছে তো সেই যেবার ভোলোদিয়া জ্বরে পড়ল তখন কিভাবে আমি তার মাথার কাছে ন দিন সামনে বসে ছিলাম, একটা মুহূর্তের জন্যও দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। হ্যাঁ! তখন আমি ছিলাম "প্রিয় ভাল মানুষ কার্ল ইভানিচ" আর এখন নিতান্তই তিক্ত।' একঝলক হাসি হেসে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, এখন ওদের মন দিয়ে পড়াশুনা করা উচিত। যেন এখানে তারা পড়ছিলই না!'

'যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো বলি, তারা যতদূর সম্ভব পড়ুক।' নিকোলাই ছুঁচটা মাটিতে রেখে দু হাত দিয়ে সুতো টানতে টানতে বলল।

'হ্যাঁ, আমাকে আর দরকার নেই; এবার আমাকে বিদেয় নিতে হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রতিজ্ঞাটা কোথায় গেল? তাদের কৃতজ্ঞতার কি হল? নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে আমি ভালবাসি এবং জানিও ভালভাবেই,' বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করে বললেন, 'কিন্তু তিনি আর কে? এ বাড়িতে তার ইচ্ছের কোন দামই নেই!' কথাগুলো বলে লক্ষণীয়ভাবে একটুকরো চামড়া মেঝেতে ছুঁড়ে দিলেন। 'এসব কার কাণ্ড তা ঢের বুঝতে পারছি, কেন যে আর আমাকে দরকার নেই তাও; কারণ আমি মোসাহেবিও করিনা, তাছাড়া সকলের মত ভিখিরিও হতে পারিনা। সত্যি কথাটা সকলের সামনে বলাটাই আমার অভ্যাস।' বেশ গর্বিত-

ভাবে বললেন কথাটা। 'ঈশ্বরই তাদের বিচার করবেন। আমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে তারা তো আর বড়লোক হচ্ছেন না, আর ঈশ্বরের দয়ায় আমার রুটিও ঠিক জুটেই যাবে···বল যাবে কিনা নিকোলাই ?'

নিকোলাই মাথা তুলে কার্ল ইভানিচের দিকে তাকাল। যদিও তাকে নিশ্চিত করতে চাইছিল এই বলে যে তিনি ঠিকই চালিয়ে নেবেন কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

এ ব্যাপারে আরও অনেক কথা বললেন। বললেন যে যেখানে তিনি আগে থাকতেন সেই সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়িতে নাকি তার কাজ অনেক বেশি প্রশংসিত হয়েছিল, (এ কথা শুনে আমি ভীষণ দুঃখ পেলাম)। তিনি স্যাক্সনের কথা বললেন, বললেন বাবার কথা, মার কথা আর বন্ধু স্কনহেটের কথা। তাছাড়া দর্জি ও অন্যান্যদের কথাও বললেন।

তার দুঃখে আমি দুঃখিত হলাম ; আর ব্যথা পেলাম এই জন্য যে বাবা আর কার্ল ইভানিচ, যাদের আমি প্রায় একই রকম ভালবাসতাম, তারা কেউই একজন অপরজনকে বুঝছিলেন না। আমি আবার সেই কোণটায় ফিরে গেলাম। গোড়ালির ওপর পা ভেঙে বসলাম, আর ভেবে আকুল হলাম কি করে ওদের মধ্যে একটা সমঝোতা করা যায় তাই নিয়ে।

তখনকার মত কার্ল ইভানিচ পড়ার ঘরে ফিরে এলেন। আমাকে উঠেপড়ে শ্রুতি লিখনের খাতা ঠিক করার আদেশ দিলেন। সব ঠিক হলে হাতলওলা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে জার্মান ভাষায় এমনভাবে পড়ে চললেন যে মনে হল যেন কোন এক গভীর তলদেশ থেকে কথাগুলো উঠে আসছে।

' "সমস্ত রকম যন্ত্রণার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইল," লিখেছ ?' একটু থেমে ধীরেসুস্থে একটিপ নস্যি নিয়ে আবার সতেজ উৎসাহে 'বলে' চললেন, "সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইল অ-কৃ-ত-জ্ঞ-তা" হ্যাঁ, অকৃতজ্ঞতা ; বড় হাতের আই।'

শেষ শব্দটা লিখে আরও প্রত্যাশা নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। এক দুর্লভ হাসি হেসে তিনি বললেন 'ঘণ্টা।' আর আমাকে আমার খাতাটা তাকে দিতে বললেন।

অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সাথে তিনি মন্তব্যটা বারকতক পড়লেন। নানান সুরে এবং ভীষণ খুশিতে। তারপর আমাদেরকে ইতিহাসের পড়া দিয়ে নিজে গিয়ে জানলার ধারে বসলেন। তার মুখ আর তখন তেমন বিষণ্ণ নয় ; ততক্ষণে সেখানে এমন একজনের আনন্দ প্রতিফলিত হয়েছে যে কিনা তার সব আঘাতের আশ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছে।

তখন একটা বাজতে পনের মিনিট বাকি ; কিন্তু আমাদের ছুটি দেওয়ার কোন লক্ষণই কার্ল ইভানিচ দেখালেন না ; উলটে তিনি একের পর এক পড়া দিয়ে যেতে লাগলেন।

ওদিকে খিদে আর ক্লান্তি দুই-ই বেড়ে চলল সমানতালে। সাংঘাতিক অধৈর্যের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে খাবার দেওয়ার সব লক্ষণগুলোই দেখা যাচ্ছে। থালাবাসন ধোয়ার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে সেই মহিলাটি এল। তারপর পাটাতনের ওপর থালাবাসন রাখার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ পেলাম। টেবিল চেয়ার সরানোর শব্দও হল। এরপর বাগান থেকে লিউবোচকা আর কাতেনকাকে

সঙ্গে নিয়ে (কাতেনকা মিমির বারো বছরের মেয়ে) মিমি এসে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু যে প্রধান পরিচারকটি খাবার বাড়ার খবর জানিয়ে যেত সেই ফোকার টিঁকিরও দেখা নেই। সে এসে খবর দিলে তবেই না বইপত্তর সব একপাশে ঠেলে দিয়ে কার্ল ইভানিচের দিকে একবারও না তাকিয়েই আমরা নীচের তলায় ছুট লাগাতে পারতাম।

অবশেষে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু একি এতো ফোকা নয়! তার পায়ের শব্দ শুনলেই আমি চিনতে পারতাম। যাহোক, দরজাটা খুলে গেল, এবং একেবারে অচেনা একটি নতুন লোক এসে উপস্থিত হলেন আমার সামনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ পরিব্রাজক

মুখ ভর্তি ব্রনের দাগ, লম্বা ধূসর চুল, আর অল্প অল্প লালচে দাড়ি নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি লোক ঘরের ভেতর ঢুকলেন। তিনি এত লম্বা ছিলেন যে, দরজা দিয়ে ঢোকবার সময় শুধু মাথাটাই নয়, সম্পূর্ণ শরীরটাই তাকে বাঁকাতে হল। তার পরিধানে ছিল কাফতান আর কসাকদের মত ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, হাতে একটা লাঠি। ঘরে ঢুকেই গায়ের জোরে লাঠিটাকে একবার মেঝের ওপর ঠুকে নিলেন। তারপর ঠোঁটদুটো ফাঁক করে, ভুরু কুঁচকে অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠলেন। হাসার তালে তালে, তার একটা কানা চোখের ভেতরের সাদা ডিমটা অত্যন্ত কুৎসিতভাবে নড়ছিল।

'ওঃ, এই তো তোমাদের পেয়েছি।' বলেই তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ফেলে, ভোলোদিয়ার কাছে এগিয়ে গেলেন ; তার মাথাটা দু হাতের মধ্যে চেপে ধরে তালুটাকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করা শুরু করে দিলেন। তারপর ওকে ছেড়ে টেবিলটার সামনে গিয়ে অয়েলক্লথটার নিচ থেকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে,ওপরে ক্রুশ আঁকতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার চোখে জল এল ; ভোলোদিয়ার দিকে চেয়ে জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'উঃ, কী লজ্জা! কী দুঃখের! ওরা সব উড়ে যাবে!'

তার গলার স্বর ছিল থমথমে আর রুক্ষ ; চলাফেরা ছিল চটপটে অথচ ঝাঁকি-দেওয়া ; কথাবার্তা ছিল অর্থহীন তালগোল পাকানো ; কিন্তু তারই মধ্যে এক আশ্চর্য হৃদয়স্পর্শী সুর ছিল, আর তার কুৎসিত হলদেটে মুখটা মাঝে মাঝে এমন করুণ হয়ে উঠছিল যে তার কথা শুনতে শুনতে করুণা, ভীতি আর দুঃখের অনুভূতিকে দমন করা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে উঠল।

ইনিই হচ্ছেন পরিব্রাজক গ্রিশা।

কিন্তু কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন ? তার বাপ মা-ই বা কে ছিল ? আর পরিব্রাজকের জীবনই বা তাকে বেছে নিতে বলেছিল কে ? সেটা কেউই জানত না। আমি শুধু জানতাম, মাত্র পনেরো বছর বয়স থেকেই তিনি বোকার মত খালি পায়ে কী শীত, কী গ্রীষ্ম—মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছেন; তাকে যারা ও কাজ করতে নিষেধ করত তাঁদের কথা তিনি কখনও কানেই তোলেননি। সবসময়েই তার মুখ থেকে বের হত রহস্যময় বিচিত্র সব কথাবার্তা। লোকে বলত, সেগুলো নাকি ছিল ভবিষ্যদ্বাণী। অন্য কোন রূপে কেউ তাকে কোনদিন দেখেছে বলে কখনও শোনা যায়নি। তবে মাঝে মাঝে যে তিনি তার ঠাকুমার কাছে যেতেন এটা সবারই জানা ছিল। একদল লোক বলত, তার বাবা মা নাকি খুব বড়লোক ছিলেন, ছিলেন পবিত্র এবং

পুণ্যবান ; আবার অন্য এক দলের মত ছিল, তা নয়, তারা ছিলেন খুবই সাধারণ গেরস্ত চাষী।

কিছু পরেই সময়নিষ্ঠ ফোকা এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগালাম একতলার দিকে। গ্রিশা, তেমনি আজে বাজে বকতে বকতে, প্রত্যেকটা সিঁড়ি লাঠি দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে কম্পিত পদক্ষেপে আমাদের পেছন পেছন এল। মা এবং বাবাও ঘরে ঢুকলেন হাত ধরাধরি করে ; তারা খুব নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। ডিভানের দিকে সমকোণ করে রাখা হাতলওলা চেয়ারটায় বসে অত্যন্ত নিচু অথচ কম্পিত গলায় মেয়েদের উপদেশ দিচ্ছিলেন মারিয়া ইভানোভনা। কার্ল ইভানিচ ঘরে ঢুকতেই তিনি একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখটাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলেন যে মনে হল তিনি যেন বলতে চাইছেন, 'কার্ল ইভানিচ, আপনি আমার কাছে তাচ্ছিল্যের পাত্র।' মেয়েদের চোখ দেখে বুঝতে পারলাম যে আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনাবার জন্য তারা উসখুস করছে ; কিন্তু মিমির কাছ থেকে উঠে আসাটা ঠিক হবে না ভেবেই চুপ করে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী আমরা যদি তার কাছে গিয়ে বলি, 'সুপ্রভাত মিমি' এবং বিশ্রীভাবে পা মুড়ে তার সামনে বসে সেলাম জানাই, তাহলেই তিনি আমাদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার অনুমতি দেবেন।

উঃ, কী এক অসহ্য জীব এই মিমি! তার সামনে কোন কথা বলার যো ছিল না আমাদের ; সবকথাই নাকি তার কানে অপ্রয়োজনীয় বলে ঠেকত। তার ওপর প্রায়ই তিনি জেদ ধরতেন যাতে আমরা ফরাসী ভাষায় কথা বলি, সেজন্য। তাই, চালাকি করে আমরা যখন রুশ ভাষায় কথা বলা শুরু করতাম, কিংবা ধরা যাক নৈশাহারের সময়, হয়ত একটা ভাল খাবার চেটেপুটে খাচ্ছি, তখনই উনি বিশুদ্ধ জার্মানে বলে উঠতেন, 'রুটি খাও একটু' কিংবা 'কিভাবে কাঁটা ধরছ ?' মনে মনে ভাবতাম, 'তার এত মাতব্বরির দরকারটা কি ?' কিংবা নিজেকেই হয়ত বলতাম, 'আমাদের দেখার জন্য তো কার্ল ইভানিচই রয়েছেন, উনি ওনার মেয়েদের ওপরই মাতব্বরি করুন না কেন।' সে কারণেই কারও কারও প্রতি ইভানিচের ঘৃণায় আমি অংশীদার হতে চাইতাম।

আমার জ্যাকেটটা ধরে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে, ঠিক যখন বড়রা এসে খাবার ঘরে ঢুকল, তখন কাতানকা আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'মাকে বল না, আমাদেরও শিকারে নিয়ে যাবার জন্য।'

'ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করছি।'

গ্রিশাও খাবার ঘরেই খেলেন, তবে অন্য একটা টেবিলে বসে। খেতে খেতে একবারও তিনি থালা থেকে চোখ তুললেন না ; ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বারবার এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন, এবং নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে চললেন, 'এটা দয়া, নিশ্চিতই দয়া···সে উড়ে চলে গেল···স্বর্গে যাবে···উঃ কবরে শুধু একটা পাথরই পড়ে আছে।' এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকাল থেকেই মা যেন কেমন চিন্তামগ্ন হয়ে ছিলেন ; তার ওপর গ্রিশার উপস্থিতি, তার বিড়বিড় করা, অদ্ভুত সব আচরণ—মার উৎকণ্ঠাকে যেন বাড়িয়ে দিল। বাবাকে এক প্লেট সুপ দিতে দিতে তিনি বললেন, 'ওঃ, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কি কথা ?'

'তোমার ঐ ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখো। এই তো, বেচারা গ্রিশা যখন উঠোন দিয়ে আসছিলেন তখন তাকে প্রায় কামড়ে দিয়েছিল আর একটু হলে। তাছাড়া বাচ্চাদেরও তো যখন তখন কামড়াতে পারে।'

তার কথা বলা হচ্ছে শুনে, টেবিলের দিকে পেছন ফিরে গ্রিশা তার জামার ছেঁড়া কোণটা দেখিয়ে খাবার-ভর্তি মুখেই বলতে শুরু করলেন, 'একেবারে কামড়ে মেরে ফেলতে চাইছিল···ভগবান এটা সহ্য করবেন না···কুকুরকে ছেড়ে রাখাটা পাপ! ওদের মারবেন না···কেন মারতে যাবেন ? ভগবান ক্ষমা করুন···এখন দিনকাল পালটে গেছে।'

'ও বলছেটা কি ?' একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবা বললেন, 'ওর কথার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারছিনা।'

মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। উনি বলছেন কোন কোন শিকারী ইচ্ছাকৃতভাবে ওর ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয় এই উদ্দেশ্যে যাতে কুকুরগুলো ওকে কামড়ে মেরে ফেলতে পারে। এবং ও প্রার্থনা করছে, সেই অপরাধে তুমি যেন সেই সব মানুষদের কোন রকম শাস্তি না দাও।'

বাবা বললেন, 'ওঃ, তাহলে ব্যাপারটা হল গিয়ে এই। কিন্তু ও কি করে জানল যে আমি শিকারীদের শাস্তি দিতে চাই ? তুমি জান যে, আমি এই ভদ্র-লোকটির ওপর মোটেই খুশি নই।' তারপর ফরাসীতে বললেন, 'এবং একে দেখলে আমার পিত্তি একেবারে জ্বলে ওঠে, আর সেটাই হচ্ছে যথার্থ—'

কথাটা শুনে যেন মা আঁৎকে উঠলেন; বাবার কথার মাঝেই বাধা দিয়ে বললেন, 'নাগো, অমন কথা বোল না। তুমি ওনার সম্পর্কে আর কতটুকুই বা জান ?'

'আমি মনে করি, এ ধরনের লোকদের আমার ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। এরা গণ্ডায় গণ্ডায় তোমার কাছে আসে। এরা সবাই সমান। সবারই এক কাহিনী।'

বোঝা গেল, এ ব্যাপারে মার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণই আলাদা। কিন্তু তা নিয়ে তিনি কোনরকম তর্কাতর্কি করতে চাইলেন না। বললেন, 'আমাকে একটা পিঠে দাও। ওটা ভাল হয়েছে তো ?'

'এটা আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে. একটা পিঠে হাতে নিয়ে, সেটাকে মার নাগালের বাইরে ধরে রেখে বাবা বলে চললেন, 'আমার বিরক্ত লাগে এই জন্য যে রুচিশীল এবং শিক্ষিত মানুষরাও এই ফাঁদে ধরা দিচ্ছে।' এবং হাতের কাঁটাটা দিয়ে টেবিলে জোরে একটা ঘা মারলেন।

হাতটা বাড়িয়ে মা বললেন, 'আমি তোমাকে একটা পিঠে দেবার জন্য বলেছিলাম।'

বাবা হাতটাকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেই চললেন, 'এ ধরনের লোককে ওরা যখন পাকড়ায় তখন বলতে হবে বেশ ভালই করে। তাতে ক্ষতির মধ্যে শুধুমাত্র এই হয় যে কিছু ভাল লোকের স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটে।' মুচকি হেসে কথা শেষ করলেন তিনি। বুঝলেন মা রেগে গেছেন, তাই তার হাতটা এগিয়ে পিঠেটা দিয়ে দিলেন।

'আমার একটাই মাত্র কথা বলার আছে,' মা বললেন, 'এটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন যে, একজন মানুষ তার ষাট বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও শীত

নেই, গ্রীষ্ম নেই সারাটা বছর দু মণ ওজনের শেকল গায়ে জড়িয়ে, জামার আড়ালে তাকে ঢেকে, স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত হাতছানিকে উপেক্ষা করে খালি পায়ে মাঠ-ঘাট পার হয়ে হেঁটে চলেছে শুধুমাত্র আলসেমীর জন্য। ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে, মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি যে আমি তোমাকে বলেছিলাম, ফিরিউসা কেমনভাবে বাবার মৃত্যুর দিন এবং সময় পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন।

'উঃ, তুমি কি করলে বল তো!' বাবা আর্তনাদ করে একহাত মুখে দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে মিমির দিকে ঘুরে গেলেন। (যখনই তিনি এমন করতেন তখনই আমি মজাদার কিছু শোনার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠতাম)। তারপর বললেন, 'কেন তুমি ওর পা দুটোর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলে! এখন তো আমি আর খেতেই পারব না।'

খাওয়া প্রায় শেষই হয়ে এসেছিল। লিউবোচকা আর কাতেনকা তাদের চেয়ারে বসে অধৈর্য হয়ে উসখুস করছিল আর ক্রমাগত আমাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপছিল, যার সোজা মানে ছিল, 'কেন তোমরা ওদের জিজ্ঞাসা করছ না যে আমাদেরও শিকারে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা?' ভোলোদিয়াকে আমি কনুই দিয়ে ঠেললাম। প্রথমে সে খুব ভয়ার্ত গলায়, শেষে বেশ পরিষ্কার স্বরেই বুলল, যেহেতু আমরা সেদিনই চলে যাচ্ছি সেহেতু চাই যে মেয়েদেরও শিকারে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হোক। প্রস্তাবটা সম্পর্কে বড়রা নিজেদের মধ্যে সামান্য আলোচনা করে শেষে আমাদের পক্ষেই রায় দিলেন, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে, মা বললেন, তিনিও আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ শিকারের তোড়জোড়

খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ইয়াকভকে ডেকে গাড়ি, ঘোড়া এবং কুকুরগুলোর সম্পর্কে সবরকমের খুঁটিনাটি বলে, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম ধরে নির্দেশ দেওয়া হল। ভোলোদিয়ার ঘোড়াটা ছিল খোঁড়া—সে কারণে তাতে একজন শিকারীকে চড়তে বলা হল। এই 'শিকারী' শব্দটা সবসময়ই মার কানে খুব বিশ্রী বলে ঠেকত; তিনি মনে করতেন, ওটা যেন কোন বন্য প্রকৃতির প্রাণীর নাম—তাই ভোলোদিয়ার সঙ্গে তার যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুললেন এ কারণে যে সে হয়ত তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে শেষে খুন করে ফেলবে। বাবা এবং ভোলোদিয়ার সমস্ত রকম নিশ্চয়তা সত্ত্বেও মা বললেন যে, ভ্রমণে সারাটা সময়ই তিনি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবেন।

খাওয়া শেষ হল; বড়রা পাঠ-কক্ষের দিকে গেলেন কফি খেতে, আর আমরা ছুটলাম বাগানের পথে—হলুদ পাতার ওপর দিয়ে হাটবার জন্য, ভোলোদিয়ার সঙ্গে শিকারীর একত্রিত চড়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য, লিউবোচকা যে কাতেনকার মত দৌড়তে পারবে না সে কথা বলার জন্য, গ্রিশার শেকল দেখার মজা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য। কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে একটা কথাও হল না। গাড়িটা এসে যাওয়াতে আলোচনা থেমে গেল; দেখলাম গাড়ির প্রত্যেকটা স্প্রিংয়ের ওপর একজন করে বাচ্চা চাকর বসে। ভোলোদিয়ার জন্য নির্বাচিত ঘোড়ার সওয়ারি ইগন্যাটকে অনুসরণ করে কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে শিকারীর দল এল, তাদের একজনের হাতে আমার টাট্টু ঘোড়াটার লাগাম ধরা। এইসব আকর্ষণীয় বস্তুগুলোকে দেখার জন্য আমরা ঝড়ের বেগে বেড়ার দিকে দৌড়োলাম, তারপর

চিৎকার করতে করতে পায়ের দপাদপ শব্দ তুলে যতটা সম্ভব শিকারীর মত সাজ-পোষাক পরবার জন্য ওপরতলায় ছুটলাম। এই ধরনের সাজপোষাকের জন্য বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন ছিল প্যান্টের তলার দিকটাকে জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া। মুহূর্তের মধ্যে আমরা তা সেরে ফেললাম। তারপর দুবদাব শব্দ করতে করতে এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়; শিকারীদের সাথে ঠাট্টা ইয়ার্কি শুরু করলাম আর কুকুর এবং ঘোড়াগুলোকে যেন চোখ দিয়ে চাটতে লাগলাম।

দিনটা ছিল গরম। বিচিত্র সাদা মেঘের দল সকাল থেকেই সারাটা আকাশ জুড়ে মাতামাতি করছিল। খানিক পরে মৃদু বাতাস যেন তাদের আরও কাছে টেনে আনল। ফলে মাঝে মাঝেই সূর্যটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল তাদের আড়ালে। কিন্তু যেহেতু তাদের রঙ ছিল কালো, এবং ঘোরাফেরা ছিল এলোমেলো, সেহেতু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে বৃষ্টি নামাবার জন্য তারা মোটেই উৎসুক নয়। বিকেলের দিকে সেগুলো পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হওয়া শুরু করল, রঙও গেল বদলে—একেবারে ধূসর হয়ে গেল কালো মেঘগুলো। বাকি যেটুকু রইল, সেটুকুকে মনে হল যেন মাথার ওপরে চলমান একটা সাদা সিঁড়ি। শুধু পূব দিগন্তে একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘের অস্তিত্ব বজায় রইল অনেকক্ষণ। অন্যগুলো যে কোথায় চলে গেল তা আমরা জানতেই পারলাম না; কিন্তু কার্ল ইভানিচের সবই ছিল নখদর্পণে। তিনি ঘোষণা করলেন, সেগুলো নাকি যাত্রা করেছে মাসলোভকার পথে; এবং এও বললেন যে বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়েছে—এরপর আকাশ থাকবে স্বচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক।

বেশি বয়স হলে হবে কি, একেবারে জোয়ানের মত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সদর দরজাটার কাছে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ফোকা চিৎকার করে উঠল, 'চালাও।' গাড়ি এগিয়ে এল, মেয়েরা কে কোথায় বসবে, এবং কাকে ধরে থাকবে (যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না) তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটির পর সবাই গাড়িতে উঠে বসল। যে যার ছাতা খুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। মা কোচোয়ানকে শিকারীর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই ঘোড়াটাই কি ভলাদিমির পেত্রোভিচের জন্য?'

কোচোয়ান যখন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল তখন মা হাতে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে ফিরে গেলেন। আমি খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম; তাই দ্রুত ঘোড়ার ওপর উঠে বসলাম, তার খাড়া কান দুটোর মাঝখান থেকে সোজা সামনের দিকে তাকালাম এবং বাড়ির চত্বরেই এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে শুরু করলাম।

আমাকে অমন করতে দেখে একজন শিকারী বলে উঠল, 'দেখবেন, কুকুর-গুলোর ওপর থেকে যেন যাবেন না।'

আমি গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলাম, 'ভেবো না, এর আগেও আমি ঘোড়ার চড়েছি।'

ভোলোদিয়াও শিকারীর ঘোড়াটার পিঠে উঠল এবং তার সাহসী স্বভাব সত্ত্বেও বারবার ঘোড়াটার পিঠ চাবড়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা ঠিক আছে তো?'

ঘোড়ার পিঠে ওকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল যেন একজন বয়স্ক লোক বসে আছে। ওর উরু এমনভাবে জিনের ওপর বসে গিয়েছিল যে

মনে মনে ওর প্রতি আমার হিংসে হচ্ছিল ; বিশেষতঃ মাটিতে যখন নিজের ছায়া দেখতে পেলাম।

এরপর সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাচ্চা কুকুরগুলোর রক্ষী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে-থাকা শিকারী কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে এনে এক জায়গায় হাজির করল। তারপর শিকারীদের ডাকা হল, তারা নিজের নিজের গ্রে-হাউণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে এসে, ঘোড়ায় চড়ল। বাবার কুকুরটা, যেটা এতক্ষণ স্থিরচিত্রের মত মাটিতে শুয়েছিল, হঠাৎ স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে একেবারে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। এরপর এল মিলকা, গলার বকলস আর ঝিলমিলে টিনের টুকরোগুলো নাড়তে নাড়তে। সে যখনই বাইরে আসত, তখনই অন্য কুকুরদের আপ্যায়িত করত থাকত ; কারও গা চাটত, কারও সঙ্গে খেলত, আবার কাউকে বা তাড়া করত।

অবশেষে বাবা ঘোড়ায় উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আমাদের যাত্রা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।। শিকার

সবার আগে একটা কালচে ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপে চলল শিকারীদের সর্দার তুরকা। তার মাথায় লোমশ টুপি, কাঁধের ওপর বিরাট এক শিঙ আর কোমরের বেল্টে ঝোলানো একটা ছুরি। মানুষটার মুখের বিষণ্ণতা এবং কর্কশতা দেখে বাইরে থেকে যে কেউ ভেবে নেবে যে শিকারের পরিবর্তে সে যেন একটা জীবন মরণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চলেছে। তার ঘোড়ার পায়ের তালে তাল রেখে কম্পিত পদক্ষেপে ছুটছিল একদল শিকারী কুকুর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন কারণে একবার পিছিয়ে পড়ত তা হলে আর তার রক্ষা ছিল না। তাছাড়া নিজের সাথীকে এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোন কুকুর বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে এগোলেই ঘোড়ার পিঠে চড়া চাবুকওলা সপাসপ তার পিঠে কয়েকটা চাবুক বসিয়ে বলছিল, 'ফের তুই দলের সঙ্গে ভিড়েছিস !'

আমরা যখন দরজার সামনে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠলাম, তখন বাবা আমাদের এবং চাকরবাকরদের বললেন যে, তিনি মাঠের মধ্য দিয়ে যাবেন, তবে আমরা যেন বড় রাস্তা ধরেই যাই।

তখন পুরোদমে ফসল তোলার পালা। একদিকে উজ্জ্বল হলুদ ক্ষেত, দূরে, বহুদূরে চলে গেছে, অন্যদিকে সীমাহীন নীল বনাঞ্চলের সমারোহ—যা সেই বয়সে আমার কাছে সুদূর রহস্যময় অঞ্চলের শুরু বলে মনে হত, এবং যার সমাপ্তিতেই ছিল পৃথিবীর সমাপ্তি কিংবা এমন এক প্রান্তরের শুরু যেখানে একটিও মানুষ থাকার কথা ছিলনা, ছিলনা অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা। সারাটা মাঠ ভরে গিয়েছিল কাপিকলের ঘর্ষণে আর মানুষের পায়ের দাগে। তারই মাঝে শস্যের গাদা, বার বার মুখ উঁচিয়ে উঁকি মারছিল আর কৃষক রমণীদের দেখা যাচ্ছিল দু আঙুলের ফাঁকে শস্যকণা নিয়ে খেলা করতে। দূরে, লম্বা শার্ট গায়ে কৃষকের দল গরুর গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ; আর গাড়িগুলো শস্যদানায় ভর্তি হয়ে গেলেই সেগুলোকে নিয়ে ছুটছিল গোলা-ঘরের দিকে। উঁচু জুতো পায়ে, কাঁধের ওপর লম্বা কোটটা ঝুলিয়ে, মোটা-লাঠি হাতে নিয়ে, বাবাকে দূর থেকে আসতে দেখে চিনতে পেরেই মাথা থেকে ভেড়ার লোমের টুপিটা খুলে, তোয়ালে দিয়ে লালচে মাথা আর দাড়ি মুছে মেয়েদের দিকে চেয়ে চিৎকার করল ভারোস্তা। বাবার গেরুয়া রঙের ঘোড়াটা বেশ হালকা চালে চলছিল। থেকে থেকেই সে মাথা নোয়াচ্ছিল,

বস্তাটা টানছিল আর ভারী লেজটাকে সোঁ সোঁ করে ঘুরিয়ে মশামাছিগুলোকে এমনভাবে তাড়াচ্ছিল যেন সেগুলো শুধু তার পেছনেই তৃষ্ণার্তের মত ঘুরে মরছিল। কাস্তের মত ঝাঁকালেজওলা দুটো শিকারী কুকুর ঘোড়াটার তালে তাল দিয়ে ফসল-তোলা ক্ষেতের মাঝে মহানন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। ঝিলকা ছিল সবার আগে, কোন একটা কিছুর আশায় মাথাটাকে বাঁদিকে কাত করে। গুন্‌গুন্‌ গলার আওয়াজ, ঘোড়া আর গাড়ির শব্দ, বাতাসে ভাসমান ভরত পাখির শিষ্‌, গতিহীন পোকামাকড়ের ভনভনে গুঞ্জন; তেতো বুনোলতা, খড় আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধ; মরা হলুদরঙা ফসলকাটা মাঠে জ্বলন্ত সূর্যের হাজার রঙা আভা, সাদা আলোর পরদা,—সবকিছু আমি দেখলাম, শুনলাম এবং অনুভব করলাম।

কালিনোভো জঙ্গলে পৌঁছে দেখলাম আমাদের লটবহর সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে; এবং সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার বলে যেটা বোধহল সেটা হচ্ছে, একটি গরুর গাড়ির ওপর উপবিষ্ট আমাদের প্রবীন খানসামা ভদ্রলোকটি। তারই পাশে, খড়ের গাদার মধ্য থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে সামোভারটা, বরফের বালতি, আর নানা সাইজের ঝুড়ি। এসব দেখে বুঝতে পারলাম, মুক্ত বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে চা, আইসক্রিম আর ফল খাওয়ার খুব একটা বেশি দেরি নেই। ফলে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। কারণ, জঙ্গলে ঘাসের ওপর বসে চা খাওয়াটা আমাদের সবার কাছেই একটা দুর্দান্ত রোমহর্ষক ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল বিশেষতঃ এ কারণে যে, ঠিক ওইখানটায় এর আগে আর কেউ কখনও বসে চা খায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তুরকা এল, থামল, মন দিয়ে বাবার নির্দেশগুলো শুনল: কোনদিকে যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে (যদিও কখনও সে তা মেনে চলত না, এবং নিজে যা ভাল বুঝত তা-ই করত) ইত্যাদি। তারপর কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিল, চামড়ার মোড়কটাকে আলতোভাবে ঠিক করে নিল এবং ঘোড়ায় চড়ে কচি বার্চ পাতার ভেতরে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর শিকারী কুকুরগুলো ছাড়া পাবার আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল, গা ঝাড়া দিল, মাটি শুঁকতে শুঁকতে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি শুরু করল।

বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে একটা রুমাল আছে কি?'

আমি পকেট থেকে রুমালটা বের করে বাবাকে দেখালাম।

'ঠিক আছে, ধূসর কুকুরটার গলায় ওটা বেঁধে দাও।'

জানা থাকা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঝিরানের গলায়?'

'হ্যাঁ,' বাবা বললেন, 'আর রাস্তা ধরে ছুটে যাও। যেতে যেতে যখন একটা ছোট মাঠ মত পাবে, তখন দাঁড়িয়ে পড়বে। তারপর আশপাশের এলাকা খুঁজে যতক্ষণ না একটা খরগোশ ধরতে পারছ ততক্ষণ ফিরে আসবে না।'

বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ঝিরানের লোমশ গলায় আমার রুমালটা বেঁধে দিলাম। তারপর রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে শুরু করলাম। বাবা হেসে বললেন, 'জলদি, জলদি, না হলে দেরি হয়ে যাবে।'

দৌড়তে দৌড়তে ঝিরান কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ওকে টেনে চললাম, কিন্তু কিছুতেই ও নড়ল না। তারপর আওয়াজ করলাম, 'লু, লু, লু!' সঙ্গে সঙ্গেই ও ছুটল; আমি আর ওকে ধরে

রাখতে পারিনা। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার আগেই দু তিনবার হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। শেষে অসংখ্য ওকগাছের সারির মাঝখানে একটা ছায়াঘেরা সমতলভূমি বেছে নিয়ে সেখানে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। ঝিরানকেও শুইয়ে দিলাম পাশে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। এ অবস্থায় সর্বদাই যা হয়, তাই হল ; আমার কল্পনা বাস্তবকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। মনে মনে আমি তখন তৃতীয় খরগোশটাকে ধরার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময়, হঠাৎ ঝিরানের জিভে আওয়াজ হল। বনের ভেতর থেকে তুরকার গলার স্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। একটা শিকারী কুকুরও ডেকে উঠল ; তার আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল বারবার। এরপর অন্য একটা ভারী গলা যোগ হল, তারপর আর একটা, তারপর আরও, আরও। শেষে শুরু হল বিকট আওয়াজ। লোকে যেমন বলে, শিকারী কুকুরের চিৎকারে বনও কথা বলে, ঠিক তেমনি।

আমি নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বনের দিকে চোখ দুটোকে স্থির রেখে বোকার মত হেসে উঠলাম। সারা শরীর ঘেমে গেল। ঘামের ফোঁটা চিবুক বেয়ে নামছিল—তাতে বেশ আরাম লাগল। একবারও সেগুলো মুছলাম না ; মনে হল এর থেকে রোমহর্ষক মুহূর্ত আর জীবনে আসবে না। প্রত্যাশার মনোভাব এত তীব্র ছিল যে তার পরমায়ু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বনের সীমানা থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম ; ধীরে ধীরে তা দূরে সরে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, খরগোশের কোন পাত্তাই নেই। চারদিকে তাকালাম, কিছুই চোখে পড়ল না। ঝিরান আবার মরার মত হয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল।

ওক গাছের যে বিরাট শেকড়গুলোর নিচে আমি বসেছিলাম, সেখান থেকে সারি বেঁধে অসংখ্য পিঁপড়ে ধূসর পোড়ামাটির দিকে চলেছিল। ঝরা ওক পাতা, ওক ফল, শ্যাওলার ডাল, হলুদ রঙা শ্যাওলা আর পাতলা সবুজ ঘাসের মাঝে পথ করে তারা অতি দ্রুত এগোচ্ছিল। কেউ বোঝায় ভারাক্রান্ত, কেউবা একেবারেই ঝাড়া-গা। কি মনে হল, ছোট্ট একটা ডাল ফেলে তাদের রাস্তাটা আটকে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সবরকম বিপদকে তুচ্ছ করে কয়েকটা সাহসী পিঁপড়ে উঠে পড়ল ডালটার ওপর, আর পিঠে বোঝা নিয়ে চলছিল যেগুলো, সেগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্ব হয়ে। সত্যি, ব্যাপারটা দেখতে কী মজাটাই না লাগছিল! কিন্তু হঠাৎ আমার মনযোগ কেড়ে নিল হলুদ পাখনাওলা একটা প্রজাপতি। সেটা আমার চারপাশে উড়তে শুরু করল ; তারপর মাথা নোয়ানো একটা ঘাসের ডগার ওপরে গিয়ে বসল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সেটা সূর্যের উষ্ণ তাপে নিজেকে তাতিয়ে নিচ্ছিল, না ঘাসের ডগা থেকে মলিনতাকে মুছে ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। কিন্তু উচ্ছলতায় যে তার প্রাণে বন্যা ডেকেছিল, সে সম্পর্কে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ রইল না। সে বারবার পাখা মেলে ফুলের কাছে চলে আসছিল, শেষে একেবারে স্থির হয়ে একটার ডগায় বসে পড়ল। আমি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ ঝিরান চিৎকার করে এমন জোরে শিকলে টান দিল যে আমি পড়েই গেলাম। তারপরই চোখ তুলে দেখি, একটা খরগোশ ছুটে আসছে, তার একটা কান খাড়া, অন্যটা নেতানো। আমার মাথায় রক্ত চনমন করে উঠল, আমি চিৎকার করে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মুহূর্ত পরেই সারাটা মন আচ্ছন্ন

হয়ে গেল দুঃখে। দেখলাম, খরগোশটা একবার স্থির হয়ে বসল, তারপরই লাফ দিল। এরপর আর কিছুই চোখে পড়ল না।

কিন্তু আমার খুব বিরক্ত লাগল, যখন দেখলাম যে শিকারী কুকুরগুলো দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বনের সীমানায় চলে এল, এবং ঠিক সেই সময়ই একটা ঝোপের আড়াল থেকে তুরকা মুখটা বের করল। ও এতক্ষণ ধরে আমার ভুল ভ্রান্তিগুলো দেখছিল (আমার অধৈর্যই ছিল যার মূল কারণ); তাই বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'হায় খোকাবাবু!'

ব্যস, ঐ পর্যন্তই। ওতেই আমার মনে হল, এর থেকে ও যদি আমাকে ওর জিনটার সাথে খরগোশের মত লটকে দিত, তাহলে সেটাই হত ভাল।

প্রচণ্ড দুঃসাহসিকতার সঙ্গে একই জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কুকুরটাকেও ডাকতে পারলাম না। শুধু একনাগাড়ে উরু নাড়িয়ে বলতে লাগলাম, 'উঃ ভগবান, এ আমি কী করলাম!'

দূর থেকে কুকুরগুলোর ডাক কানে এল। বনের মধ্যে মহোৎসাহে চিৎকার করে করে তারা খরগোশ মেরে চলল। তুরকা চাবুক নাড়িয়ে তাদের চলে আসার জন্য ইঙ্গিত করল। কিন্তু আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, জায়গাটা থেকে এতটুকু নড়লাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।। খেলাধুলো

শিকার শেষ। কচি বার্চ গাছগুলোর ছায়ায় একটা কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হল। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। প্রধান পরিচারক গ্রাভিলো, কচি ঘাসগুলোকে নির্দয়ভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে, থালাগুলো মুছে, পাতায় ঢাকা কিসমিস আর পীচফলগুলো ঝুড়ি থেকে বের করে ফেলল। সূর্য তখন কচি বার্চের সবুজ ডালপালার ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে; তার উজ্জ্বল রশ্মি কার্পেটের নকসাগুলোর চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, ছিটকে এসে পড়ছে আমার পায়ের ওপর, এমনকি গ্রাভিলোর চকচকে টাক মাথাটাতে পর্যন্ত। একটা ঠাণ্ডা বাতাস, পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে, আমার ঘর্মাক্ত মুখ ছুঁয়ে চুলগুলোর ওপর দোলা খেয়ে গেল।

ফল আর আইসক্রিম খাওয়া শেষ হওয়ার পর, এমন আর কিছুই অবশিষ্ট রইলনা, যা কিনা আমাদেরকে কার্পেটের ওপর বসিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল। ফলে সূর্যের উষ্ণ বক্ররশ্মি সত্ত্বেও আমরা উঠলাম এবং খেলতে গেলাম।

সূর্যের আলোয় চোখ পিটপিট করে ঘাসের ওপর লাফাতে লাফাতে লিউবোচকা বলল, 'এখন আমরা তাহলে কি করব? চল, রবিনসন খেলা যাক।'

ঘাসের ওপর অলসভাবে গড়াতে গড়াতে ভোলোদিয়া বলল, 'না, ওটা বড্ড ক্লান্তিকর। আমরা তো সবসময়ই রবিনসন খেলি। তার থেকে বরং যদি নতুন কিছু খেলতে চাও তো এস, একটা কুঞ্জবন বানাই।'

ভোলোদিয়া ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল নিশ্চয় এই কারণেই যে, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে আসায় সে মনে মনে খুব গর্বিত হয়েছিল, এবং ভান করছিল যেন এরফলে সে কতই না ক্লান্ত। কিংবা এও হতে পারে যে তার বুদ্ধি ছিল খুবই বেশি, এবং রবিনসন খেলা উপভোগ করার জন্য যে সামান্য কল্পনার প্রয়োজন ছিল তা তার ছিল না। আসলে এ খেলাটা ছিল সুইস পরিবার রবিনসন,

যে বইটা আমরা কয়েকদিন আগে পড়েছিলাম, তা থেকে কয়েকটা দৃশ্যের অভিনয় করা।

'লক্ষ্মীটি, অন্ততঃ আমাদের খুশি করার জন্য!' মেয়েরা বলল। কাতেনকা তাকে জ্যাকেটের হাতা ধরে টেনে মাটি থেকে তোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তুমি চার্ল'স হও, কিংবা আর্নেস্ট, কিংবা বাবা—যা তোমার ইচ্ছে হয়, তাই।'

ভোলোদিয়া হাত পা ছড়িয়ে বেশ খোশ মেজাজে হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি, বিশ্বাস কর, এটা আমার কাছে প্রচণ্ড ক্লান্তিকর বলে মনে হয়।'

লিউবোচকা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'যদি খেলতেই না চাও তবে আজ বাড়িতে থাকলেই তো পারতে।'

বড্ড ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ে! বললাম, 'এস, দয়া করে কেঁদো না। আমি এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।'

ভোলোদিয়ার ব্যবহারে আমরা মোটেই খুশি হলাম না; বরং তার আলসে হাবভাব আমাদের খেলার মেজাজটাই দিল নষ্ট করে। যখন আমরা মাটিতে বসে মাছ শিকারের দৃশ্যের অভিনয় শুরু করলাম, সমস্ত শক্তি দিয়ে কল্পিত দাঁড়ের হাল টেনে চললাম, তখন ভোলোদিয়া হাত দুটো মুড়ে জেলের কায়দায় ঠায় বসে রইল। আমি তাকে ব্যাপারটা বললাম, কিন্তু সে বুঝিয়ে দিল যে যতই আমরা হাত নাড়াই না কেন, নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক চুলও এগোতে পারব না। বাধ্য হয়ে তার কথাই মেনে নিলাম। তারপর যখন মনে করছি যে কাঁধে লাঠি নিয়ে আমি শিকার করতে চলেছি, তখন ভোলোদিয়া ওর মাথার পেছনে হাত দুটো দিয়ে বলল, আমি যেন মনে করে নিই যে সেও আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই ধরনের কথাবার্তা আর ব্যবহারে আমাদের সবার মেজাজ গেল বিগড়ে, খেলায় আর কোন উৎসাহই রইল না। তাই এটা না ভেবে আর থাকা গেল না যে, ভোলোদিয়াই সঠিক।

আমি জানতাম, হাতের লাঠি দিয়ে গুলি চালিয়ে কোন পাখি মারা সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্যন্ত এমনিই মারব ঠিক করলাম। কারণ, ওটা তো ছিল নিতান্তই খেলা। তাছাড়া ওভাবে ভাবলে তো একটা চেয়ারের ওপর ওঠাও সম্ভব নয়। কিন্তু, আমার মনে পড়ল, ভোলোদিয়ার নিশ্চয়ই মনে আছে, এক দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায়, একটা হাতলওলা চেয়ারকে কাপড় দিয়ে ঢেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করেছিলাম। তার সামনের দিকটায় একজন বসেছিল কোচোয়ান হিসেবে, আর পেছনে একজন দাঁড়িয়েছিল তকমা-আঁটা রক্ষী সেজে। মাঝে বসেছিল মেয়েরা—পরপর তিনটে চেয়ারে, তিন ঘোড়ার গাড়ির সওয়ারি সেজে। তারপর শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা। আর চলার পথে সে কী উত্তেজক কাণ্ড-কারখানা! আনন্দ-উচ্ছল সেইসব শীতের সন্ধ্যাগুলো কত দ্রুত শেষ হয়ে গেছে! আর যদি শুধু বাস্তবের কথাই ভাবতে হয়, তাহলে সেখানে খেলার অবকাশ কই? এবং যদি খেলার অবকাশই না থাকল, তবে জীবনের মূল্যটা কোথায়?

নবম পরিচ্ছেদ ।। প্রথম প্রেমের পরশ

লিউবোচকা আমেরিকান ফল তোলার অছিলায় গুটিপোকা সমেত একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে ভয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে এমনভাবে পেছনে সরে গেল, যে মনে হল হয়ত এখনই ওটা থেকে ফিনকি

দিয়ে বিষ বেরিয়ে আসবে। ততক্ষণে আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেছে, তাই সবাই জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কি হল দেখতে লাগলাম।

কাতেনকা যখন একটা পাতা দিয়ে পোকাটার পথ আগলে সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল, তখন আমি ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তা দেখতে লাগলাম।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বহু মেয়েই, তাদের ছোট কলারওলা ফ্রকটাকে যথাস্থানে রাখার জন্য বারবার কাঁধ ঝাঁকাত। কিন্তু মিমি যখন কাউকে এমনটা করতে দেখত তখনই রেগে উঠে বলত, 'যতসব চাকরানীর লক্ষণ।' কাতেনকাও ঠিক তাই করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই পাগলা বাতাস ওর গলার রুমালটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন ওর কাঁধটা আমার ঠোঁটের ঠিক দু আঙুলের মধ্যে। আমি আর তখন পোকা দেখছি না, দেখছি ওর কাঁধ; এবং হঠাৎ-ই, আমার সমস্ত ইচ্ছাকে একত্রিত করে সেই নগ্ন কাঁধে চুমু খেয়ে বসলাম। অথচ আশ্চর্য, সে আমার দিকে তাকাল না, কিন্তু আমি নজর করলাম, তার গলা এবং কান একেবারে লাল হয়ে গেল। ভোলোদিয়া তার মাথা না তুলেই অবজ্ঞার সুরে বলল, 'কী মমতা!' তার কথা শুনে দুঃখে আমার চোখে জল এল।

আমি কাতানকার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। তার ছোট সুন্দর মুখটা আমার অনেক দিনের চেনা, অনেকদিন ধরেই তা আমাকে টানত। কিন্তু তখন যেন সেটাকে আরও গভীরভাবে দেখতে লাগলাম, এবং আরও বেশি করে ভালবাসলাম।

বড়দের সঙ্গে আবার যখন সবাই একত্রিত হলাম, তখন বাবা, আমাদের আনন্দকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, মার অনুরোধে আমাদের যাত্রা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রইল।

গাড়ির সাথে সাথে ঘোড়ায় চড়ে আমরা বাড়ির পথে রওয়ানা দিলাম। ভোলোদিয়া আর আমি, সাহস এবং ঘোড়ায় চড়ার কলাকৌশল প্রদর্শন করতে করতে এগিয়ে চললাম। আগের চেয়ে আমার ছায়া অনেক বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিল, ফলে তা থেকে ভেবে নিলাম যে, সত্যি সত্যিই আমি একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়ে গেছি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আত্মতৃপ্তির অবসান ঘটল দু-একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটে যাওয়াতে। গাড়িতে চড়ে যারা যাচ্ছিল, তাদের দেখার জন্য কিছুটা পেছিয়ে এসেছিলাম; তারপরই বাহাদুরি দেখাবার জন্য চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম বেপরোয়া গর্বে। ইচ্ছে ছিল, কাতেনকা যেদিকে বসেছিল, সেদিক থেকে ঝড়ের মত তাদের অতিক্রম করে যাব। কিন্তু যাওয়ার সময় চিৎকার করব না চুপচাপ থাকব সেটা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না; ফলে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। এবং সে কারণেই গাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে জিনের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে।

দশম পরিচ্ছেদ ।। আমার বাবা কি ধরনের মানুষ ছিলেন?

তিনি ছিলেন পুরোপুরি বিগত শতাব্দীর মানুষ। তার চরিত্রে মর্যাদাবোধ, উদ্যম, বীরত্ব এবং লাম্পট্য এমনভাবে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল যে তাকে কিছুতেই আলাদা করা সম্ভব ছিলনা। সে যুগে প্রায় প্রতিটি যুবকের মধ্যেই এ জিনিসগুলো ছিল। বর্তমান যুগের মানুষদের বাবা বেশ ছোটনজরে দেখতেন। অবশ্য এর আসল কারণ ছিল আত্মঅহঙ্কার এবং বর্তমানকালের ওপর কোনরকমের প্রভাব

বিস্তারে অপারগতা। তাস আর মেয়েমানুষের জন্যে উন্মাদনাই ছিল তার জীবনের চালিকা-শক্তি। সারা-জীবনে অন্ততঃ লাখোবার তিনি জুয়োয় জিতেছিলেন, আর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মেয়েমানুষের সঙ্গেই ফষ্টিনষ্টি করেছিলেন।

লম্বা, খজুদেহ, ঝুটা শালীনতাবোধ, কথায় কথায় কাঁধ ঝাকানি, সদা-হাস্যময় ছোট ছোট দুটো চোখ, ঈগলের মত খাড়া নাক, ভদ্রভাবে স্থাপিত বাঁকাচোরা এক-জোড়া ঠোঁট, আধো আধো কথা, আর টাক মাথা—আমার প্রথম স্মৃতি থেকে বাবাকে এভাবেই মনে পড়ে। সবকিছু মিলিয়ে তিনি যে শুধু ভাগ্যবান মানুষ হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন, তাই নয়—সত্যিকারের ভালবাসাও পেয়েছিলেন সবশ্রেণীর, সবস্তরের লোকের কাছ থেকে ; বিশেষতঃ তিনি যাদের খুশি করতে চাইতেন, তাদের কাছ থেকে তো বটেই।

কি করে সবার ওপর টেক্কা দিয়ে চলতে হয় তা তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন। যদিও উচ্চ সমাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না, তবু তাদের সঙ্গেই সর্বদা ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করতেন, এবং মনে মনে ভাবতেন যে সবাই বুঝি তাকে খুব সম্মান করছে। তার এটা ভালভাবেই জানা ছিল যে, কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে একজন মানুষের পক্ষে সমাজের সর্বোচ্চস্তরে ওঠা সম্ভব হয়।' সত্যি সাত্যিই তার মধ্যে মৌলিকতা ছিল, যদিও সবসময় তা নজরে পড়ত না, তবে সম্পত্তি বাড়াবার ব্যাপারে তাকে তিনি পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতেন। পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না, যা তাকে বিস্মিত করতে পারত। যে অবস্থার মধ্যেই তিনি থাকতেন, মনে হত যেন সে অবস্থাতেই তিনি জন্মেছিলেন। অপরের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, জীবনের খারাপ দিকগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাকে দূরে সরিয়ে রাখার যে আশ্চর্য ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল, তাকে হিংসে না করে থাকার উপায় ছিল না।

যাতে আনন্দ আর আরাম থাকত, এমন সববিষয়েই তিনি ছিলেন রসিক। কিভাবে সবটুকু রস পান করে নিতে হয় তা তার বেশ ভালই জানা ছিল। উচ্চ-সমাজের সঙ্গে কুটুম্বিতা থাকার ফলে তিনি মনে মনে বেশ গর্বিত বোধ—করতেন। মার সঙ্গে তার বিয়ে, এবং যৌবনের বন্ধুত্বের খাতিরেই এইসব সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এদের সবার বিরুদ্ধেই তার একটা গোপন আক্রোশ ছিল। কারণ, তারা প্রত্যেকেই বেশ ওপরে উঠে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাবা রক্ষীবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট ছাড়া আর কিছুই হতে পারেননি। ফলে অন্যসব প্রাক্তন অফিসারদের মত কিভাবে চটকদার পোষাক পরতে হয় তা তিনি জানতেন না। তবে এটা ঠিক—তার পোষাকের একটা মৌলিকতা ছিল, আর ছিল শালীনতা। সব সময়ই তিনি বেশ ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরতেন। সেগুলো ছিল ভাল কাপড়ে তৈরি আর তার লম্বা কলার সবসময়ই পেছনে টানা থাকত। যা কিছু তিনি পারতেন, তার পেশীবহুল লম্বা শরীর, টাক মাথা, এবং শান্ত গম্ভীর চালচলনের সঙ্গে তা বেশ ভালভাবেই মানিয়ে যেত। তিনি খুব অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন, এবং যখন তখন তার চোখে জল এসে পড়ত। প্রায়ই, যখন কোন করুণ কাহিনী পড়তেন তখনই তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করত, এবং দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যেত, ফলে বিতৃষ্ণায় বই পড়া বন্ধ করে দিতেন। গানের প্রতি তার ছিল প্রবল আকর্ষণ ; প্রায়ই পিয়ানো বাজিয়ে কোন এক বন্ধুর লেখা রোমান্টিক, জিপসি আর অপেরার

গান গাইতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তার বিন্দুমাত্র টান ছিল না, এবং লোকের মতামতের তোয়াক্কা না করে এ কথা তিনি বেশ খোলাখুলিভাবেই বলতেন যে বিটোভেনের মৃদু লয়ের বাজনা শুনে নাকি তার ঘুম আসে; এবং শ্রীমতী সিমিনোভার গলায় গাওয়া, 'ও মেয়ে ঘুমিও না' আর জিপসি মহিলা শ্রীমতী তানিউশার গাওয়া 'তুমি ছাড়া আর কেউ নয়' গান দুটোর থেকে ভাল গান নাকি জীবনে কখনও শোনেনেই নি। তার স্বভাব ছিল ঠিক সেইসব লোকেদের মত, যারা একগাদা লোকজন ছাড়া যে কোন ভাল কাজ করা যেতে পারে তা ভাবতেই পারেনা। এবং সকলে মিলে যেসব জিনিসের প্রশংসা করত তিনি কেবল মাত্র সেইসব জিনিসগুলোই পছন্দ করতেন। কোন রকম নৈতিক বিশ্বাস তার ছিল কিনা তা আমার পক্ষে সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। জীবনে তার এত বেশি সুখ এবং উত্তেজনা ছিল যে, ওসব ব্যাপার ভাবার কোন সময়ই তিনি পেতেন না, কিংবা বলা চলে ভাবার কোন প্রয়োজনই বোধ করতেন না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবন সম্পর্কে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিয়েছিলেন, যদিও সেটা ছিল ছকে বাঁধা, তবে যথেষ্ট বাস্তবানুগ। যেসব কাজ আর আচরণ তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এনে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল, সেগুলোকে তিনি যথেষ্ট সুনজরে দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে অন্যেরাও তাই মেনে চলবে। তিনি সর্বদাই বেশ স্বচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তার ফলে তার নীতির নমনীয়তাও বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। তিনি একই ঘটনাকে একবার বেশ জমকালো ভঙ্গিতে বলে, পরমুহূর্তেই আবার অত্যন্ত খেলোভাবে বলতে পারতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।। পড়ার ঘরে আর বৈঠকখানায়

যখন আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছলাম তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। মা পিয়ানোর সামনে বসলেন, আর আমরা, বাচ্চারা, এদিক ওদিক কাগজ, পেন্সিল আর রঙ খুঁজতে লেগে গেলাম। তারপর শুরু হল গোলটেবিলের চারধারে বসে ছবি আঁকা। আমার কাছে শুধু নীল রঙটাই ছিল; আমি তা দিয়েই শুরু করলাম শিকারের ছবি আঁকা। খুব দ্রুত নীল ঘোড়ার ওপর বসা একটা নীল ছেলে এঁকে, তার চারপাশে কয়েকটা নীল কুকুর চিত্রিত করে চিন্তা করতে লাগলাম সত্যি সত্যি একটা নীল খরগোশ আঁকতে পারব কিনা, এবং এক ছুটে লাইব্রেরীতে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাবা পড়ছিলেন; তাকে জিজ্ঞেস করলাম. 'আচ্ছা বাবা, খরগোশের রঙ কখনও নীল হয়?' তিনি বই থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, হয়।' আমি আবার গোল টেবিলটার কাছে ফিরে এলাম, এবং একটা নীল খরগোশ আঁকলাম, তারপর উপলব্ধি করলাম খরগোশটাকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখাটা একান্তই দরকার। কিন্তু ঝোপের ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হল না, তাই সেটাকে গাছে পরিবর্তিত করলাম: অবশেষে গাছটা হল খড়ের গাদা; এবং সবশেষে খড়ের গাদাটা হয়ে গেল একটা মেঘ। এভাবেই একসময় সারা কাগজটা নীল রঙে ভরে গেল। আর আমার মেজাজটাও গেল বিগড়ে। ফলে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে, ঘুমোবার মতলবে উঠে গিয়ে আরাম-কেদারাটায় শুয়ে পড়লাম।

মা তার শিক্ষক ফিল্ডের দ্বিতীয় কনসার্ট বাজাচ্ছিলেন। আমি স্বপ্ন

দেখছিলাম ; একটার পর একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন জেগে উঠল আমার কল্পনায়। তারপর তিনি যখন বিটোভেনের করুণ সুর বাজাতে শুরু করলেন তখন আমার মনটাও 'বিষণ্ণ এবং আর্দ্র হয়ে উঠল। যেহেতু মা এই দুটো সুর প্রায়ই বাজাতেন সেহেতু আজও আমার স্মৃতিতে তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এগুলো অনেকটা পুরনো স্মৃতিচারণের মত—কিন্তু সে স্মৃতি যে কিসের তা মোটেই জানি না। মনে হয়, সেগুলো যেন সেইসব অপূর্ণ কল্পনা, যা কোনকালেই বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

আমার ঠিক সামনেই পড়ার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল ; সেখান থেকে দেখলাম, ইয়াকভ এবং কাফতান গায়ে লম্বা দাড়িওলা কয়েকজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। সাথে সাথে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, 'তাহলে এবার কাজ শুরু হল।'

আমার কি রকম যেন একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, পড়ার ঘরে যেসব কথাবার্তা হয় তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আর দুনিয়াতে থাকতে পারেনা। আর এই ধারণার পিছে যেটা সবথেকে বেশি কাজ করেছিল তা হল, পড়ার ঘরে যারা ঢুকত, তাদের পা টিপে টিপে চলা আর ফিসফিসিয়ে কথা বলা। হঠাৎ দরজার ওপার থেকে বাবার গলার স্বর আর পোড়া চুরুটের গন্ধ—যা আমাকে কেন জানিনা উত্তেজিত করত—নাকে এল। আমি হাতলওলা চেয়ারে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ ভাড়ার ঘরে এক অতি পরিচিত বুটের মচমচ শব্দ শুনে স্থির হয়ে বসলাম। দেখলাম, কার্ল ইভানিচ অত্যন্ত নির্দয়দৃঢ় মুখে, হাতে বেশ কিছু কাগজপত্র নিয়ে, পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়তে শুরু করলেন। দরজা খুলে গেল, তিনি ভেতরে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটাবন্ধ হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, 'যদিও কার্ল ইভানিচ রেগে আছেন, এবং সবকিছু করার জন্যই প্রস্তুত ; তবু আশা করছি, শেষপর্যন্ত তেমন কিছু হবেনা।' কথাটা ভেবে আবার ঝিমোতে শুরু করলাম।

শেষ পর্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু ঘটলনা। প্রায় একঘন্টা পর আবার সেই পরিচিত বুটের মচমচ শব্দ কানে এল, আমি জেগে উঠলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম কার্ল ইভানিচ পড়ার ঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছেন। তারপর বিড়বিড় করতে করতে ওপরে চলে গেলেন। তার পেছন পেছন বাবা বেরিয়ে বৈঠকখানায় এলেন।

বেশ খোশমেজাজে মার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললেন, 'জান, এখনই কি ঠিক করলাম ?'

'কি ?'

'ছেলেদের সঙ্গে কার্ল ইভানিচকেও নিয়ে যাব। সেখানে তার থাকার একটা ঘরও আছে। ছেলেরা ওনাকে যেমন শ্রদ্ধা করে, উনিও তেমনি ছেলেদের যথেষ্ট ভালবাসেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাৎসরিক সাত শ রুবল খুব একটা কিছু বেশি নয়।'

বাবা কার্ল ইভানিচের সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধাব্যঞ্জকভাবে কেন কথা বলছিলেন, তা আমার কিছুতেই বোধগম্য হল না।

মা বললেন, 'খবরটা শুনে খুব খুশি হলাম। এতে ছেলেমেয়েরা যেমন আনন্দ পাবে, তিনিও তেমনি আনন্দিত হবেন। বেচারী সত্যিই খুব ভাল মানুষ।'

'হ্যাঁ। তুমি যদি দেখতে একবার, যখন আমি তাকে বললাম যে এককালীন উপহার হিসেবে এই পাঁচশটা রুবল আপনি রাখুন, তখন তিনি আবেগে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তবে সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই হিসেবটা, যেটা উনি এইমাত্র আমাকে দিলেন।' সামান্য হেসে বাবা কার্ল ইভানিচের হাতের লেখা একটা কাগজ মার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'সত্যিই চমৎকার!'

ফর্দটা ছিল এ ধরনের :

'ছেলেদের জন্য দুটো মাছ ধরার বড়শি—৭০ কোপেক।

'রঙিন কাগজ, গিলটি করা বর্ডার, উপহারের বাক্স বানাবার তক্তা এবং শিরীষ—৬ রুবল ৫৫ কোপেক।

'একটা বই এবং তীর ; ছেলেদের জন্য উপহার বাবদ—৮ রুবল ১৬ কোপেক।

'নিকোলাইয়ের জন্য পাজামা—৪ রুবল।

'আমার জন্য পিওতর আলেকজান্দ্রোভিচের প্রতিশ্রুত একটা সোনার ঘড়ি, যেটা তিনি মস্কো থেকে ১৮ তারিখে নিয়ে আসবেন—১৪০ রুবল।

'কার্লের মাইনে ছাড়া মোট পাওনা—১৫৯ রুবল ৭৯ কোপেক।'

এই ফিরিস্তি, যাতে কিনা তিনি নিজে উপহার দেবার জন্য যা খরচ করেছিলেন শুধু তাই নয়, তাকে উপহার দেওয়া হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তারও পর্যন্ত দাম ধরে নিয়েছিলেন—তা দেখলে যে কেউই তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং অহঙ্কারী বলে ধরে নেবে ; কিন্তু তাতে তাকে শুধু মাত্র ভুল বোঝা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না।

হাতে ফর্দ আর মাথায় তৈরি করা বক্তৃতার সম্ভার নিয়ে তিনি যখন বাবার ঘরে ঢুকে, এ বাড়িতে যে সব গঞ্জনা এতদিন তিনি সহ্য করেছেন, সে কথা বলার জন্য, অনেকটা আমাদের শ্রুতিলিখন দেবার সময় যেমন আবেগ তড়িত হয়ে বলতে থাকতেন তেমনিভাবে কথা বলতে গিয়ে 'শিশুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার যে বেদনা' কথাটা বলবার যেখানে দরকার ছিল সেখানে আবেগে অশ্রুরুদ্ধ হয়ে পড়লেন, তার গলা কাঁপতে লাগল, আর নিতান্তই বাধ্য হলেন পকেট থেকে রুমালটা বার করতে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি বললেন, 'পিওতর আলেকজান্দ্রোভিচ (কথাটা মোটেই তার তৈরি করা বক্তৃতার মধ্যে ছিল না), আমি ছেলেদের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছি যে এখন বুঝতেই পারছিনা তারা চলে গেলে আমি কি করব! অনুগ্রহ করে আমাকে বিনা মাইনেতেই ওদের সঙ্গে থাকতে দিন।' কথাটা বলেই একহাতে চোখ মুছতে মুছতে অন্যহাতে তিনি ফর্দটা এগিয়ে দেন।

কার্ল ইভানিচের হৃদয়টা আমার কাছে খুব পরিচিত বলেই তার আন্তরিকতার ব্যাপারে দিব্যি গালতে পারি, কিন্তু হিসেবপত্রের সঙ্গে কি করে যে তিনি তার কথাগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন তা আমার কাছে আজও বোধগম্য হয়নি।

তার কাঁধ চাপড়ে বাবা বলেছিলেন, 'যদি আপনার পক্ষে এটা বেদনাদায়ক হয়, তবে আমার পক্ষেও তাই। আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি।'

সান্ধ্যভোজনের আগে গ্রিশা ঘরে ঢুকলেন। এ বাড়িতে আসার মুহূর্ত থেকে

দীর্ঘশ্বাস এবং কান্না একবারের জন্যও তিনি বন্ধ করেননি। ফলে তার ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর যাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, তারা ধরে নিলেন যে নির্ঘাত কোন অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন এই বলে যে পরদিন সকালে অবশ্যই চলে যাবেন। এরপর আমি ও ভোলোদিয়াকে চোখ টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

'কি ব্যাপার?'

'যদি গ্রিশার শেকলটা দেখতে চাস তো ওপরে চল। দ্বিতীয় ঘরটায় তিনি শোবেন, আমরা চিলে-কুঠরি থেকে সব দেখতে পাব।'

'চমৎকার! এখানে দাঁড়া, আমি মেয়েদের ডেকে আনি।'

মেয়েরা দৌড়ে এল, আমরা সবাই মিলে ওপরতলায় গেলাম। কে আগে যাবে তাই নিয়ে সামান্য আলোচনা করে সবাই মিলে অন্ধকার কুঠরিটার মধ্যে ঢুকে মাটিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।। গ্রিশা

অন্ধকারে জড়াজড়ি করে আমরা সবাই চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে গ্রিশা ঘরে ঢুকলেন। তার এক হাতে ছিল সেই লাঠিখানা আর অন্য হাতে পেতলের মোমদানিতে বসানো মোম। আমরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত শব্দ বারবার আউড়ে যারা অভ্যস্ত তাদের মত ক্রমাগত তিনি বলে চললেন, 'হে প্রভু, হে ঈশ্বরের পবিত্র মাতা, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা!'

প্রার্থনা করতে করতেই তিনি তার হাতের লাঠিটা এক কোণায় রাখলেন, বিছানাটাকে ঠিকঠাক করে নিলেন এবং অবশেষে জামাকাপড় খুলে ফেললেন। কালো বেল্ট আর শতছিদ্রওলা সেমিজটা ভাঁজ করে চেয়ারের পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তার মুখ থেকে সেই অস্থিরতা আর বোকা-সোকা হাবভাবটা অন্তর্হিত হয়ে গেল; পরিবর্তে একটা বিষণ্ণতা, এমনকি গাম্ভীর্যের ভাব জেগে উঠল। তিনি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে এদিক ওদিক পায়চারি করা শুরু করে দিলেন।

বেশ সূক্ষ্ম দক্ষতার সঙ্গে শরীরে বাঁধা শেকলটাকে ঠিক করে নিয়ে, একটা আণ্ডারওয়ার পরে, দেহের চারধারে কয়েকবার ক্রুশ করে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর কাপড়ের বিভিন্ন ছেঁড়া অংশ পরখ করে, কি যেন মনে হতে, হাতে সেই মোমদানিটা তুলে নিয়ে, ঘরের কোণায়, যেখানে বিভিন্ন ধরণের কয়েকটা মূর্তি ছিল, সেদিকে উঠে গিয়ে মূর্তিগুলোর সামনে বসে বিড়বিড় করে কী সব বলে তারপর হঠাৎ মোমদানিটাকে উলটে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল।

পাশের গাছ-গাছালিকে অতিক্রম করে, প্রায় পূর্ণ চাঁদের আলো জানলার সীমানা টপকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তার মৃদু রূপোলি রশ্মিতে ছেয়ে গিয়েছিল ঘরের মেঝে, ওপরের ছাদ। গ্রিশার লম্বা সাদা ধবধবে শরীরটার একদিকে আলো আর অন্যদিকে অন্ধকার থাকাতে বাইরে থেকে তাকে বড় বিচিত্র দেখাচ্ছিল। ওদিকে ক্রমাগত পাহারাদারের চলাফেরার ঝন্‌ঝন্ শব্দ কানে আসছিল।

নিজের লম্বা হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে, মাথা নুইয়ে, মূর্তিগুলোর সামনে নীরবে বসে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গ্রিশা।

তারপর শুরু হল তার প্রার্থনা—প্রথমে ধীরে, কয়েকটা বিশেষ শব্দের ওপর সামান্য জোর দিয়ে, অবশেষে বেশ জোরে জোরে এবং অনেক বেশি সজীবতার সঙ্গে। এরপর নিজের কথা বলা শুরু করলেন। বেশ ছাড়া ছাড়া অথচ মর্মস্পর্শী দাসসুলভ ভাষায় দেবতার কাছে আবেদন জানালেন সেইসব মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে যারা তার উপকার করেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন আমার মা এবং আমরা। অবশেষে তিনি বললেন, 'হে ঈশ্বর, আমার শত্রুদের তুমি ক্ষমা কর।' তারপর মুখে একটা গোঙানির মত শব্দ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই আবার আছড়ে পড়লেন মাটিতে, আবার উঠলেন, আবার পড়লেন। তার এই ওঠা-পড়ার ফলে শেকলগুলোর সঙ্গে মেঝের ঘর্ষণের আওয়াজ হতে লাগল ক্রমাগত।

ভোলোদিয়া আমার কাঁধে একটা চিমটি কাটল, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধুমাত্র হাত দিয়ে জায়গাটা ঘষে গভীর দৃষ্টিতে ছেলেমানুষী বিশ্বাস আর ভক্তি নিয়ে গ্রিশার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

প্রত্যাশিত হাসি-ঠাট্টার পরিবর্তে চিলে কোঠায় ঢোকার সময়েই যে আমার হৃদয়ে এক গভীর অনুভূতি এবং নিমগ্নতা জেগেছিল তা আমি অনুভব করছিলাম।

বহুক্ষণ ধরে গ্রিসা তার ধর্মীয় সাধনা এবং পুনর্বিচারবিহীন প্রার্থনায় ডুবে রইলেন। বারবার নব নব পদ্ধতিতে, নব নব আবেগে সেই একই কথা বলে চললেন, 'হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর।' অথবা 'ক্ষমা কর প্রভু, আমাকে শিখিয়ে দাও, আমাকে শিখিয়ে দাও কি করতে হবে।' এমনভাবে তক্ষুনি কথাগুলো বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি তার উত্তর চাইছেন। আবার কখনও শুধু কখনও তার শোকার্ত বিলাপই শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বুকে ক্রুশ করলেন, নীরব হলেন।

নিঃশব্দে আমি আমার মাথাটাকে দরজার গায়ে ঠেকালাম এবং দম বন্ধ করে রইলাম। গ্রিশা নড়লেন না, তার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠল, কানা চোখের আবছা মণিটায় একফোঁটা জল দেখা গেল, চাঁদের আলোয় তা চিকচিক করতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এটা হচ্ছে।' এবং পরমুহূর্তেই মাটিতে পড়ে বাচ্চাছেলের মত আকুলিবিকুলি শুরু করে দিলেন।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে; ধীরে ধীরে অতীতের বহু স্মৃতিই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে মলিন স্বপ্নের মত; গ্রিশাও সমাপ্ত করেছেন তার সর্বশেষ তীর্থযাত্রা, কিন্তু আমার অনুভূতিতে তিনি যে ছাপ রেখে গেছেন তার কোনদিনও পরিসমাপ্তি ঘটবে না, কোনদিনও তা লুপ্ত হবে না আমার স্মৃতির মণিকোঠা থেকে।

মহান খৃষ্টান গ্রিশা। তার অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভব করা; তার ভালবাসা ছিল এত মহৎ যে যুক্তি দ্বারা শব্দকে বেঁধে রাখার কোন প্রয়োজনই তিনি কখনও উপলব্ধি করেননি। এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বকে তিনি এত বেশি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা হারিয়ে কেবল মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কেঁদেছেন।

যে আবেগে আমি গ্রিশার কথা শুনেছিলাম তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। প্রথমতঃ, আমার ঔৎসুক্য মিটে গিয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ, একভাবে বসে থেকে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছিল, এবং অন্ধকারের মধ্যে যে ফিসফিসানি চলছিল তার সঙ্গে নিজেকে একত্রিভূত করার একটা প্রবল ইচ্ছে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। এমন

সময় কেউ একজন আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার হাত?' যদিও গভীর অন্ধকার ছিল, তবু স্পর্শ এবং গলার স্বর শুনে বুঝলাম যে এ কাতেনকা।

হঠাৎই খেয়ালবশতঃ, কনুই পর্যন্ত গোটানো জামার আস্তিন সমেত তার হাতটাকে চেপে ধরে আমার ঠোঁটের কাছে টেনে আনলাম। সম্ভবতঃ কাতেনকা এতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, তাই সে হাতটাকে বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াতে গিয়ে ঘরের মধ্যে রাখা ভাঙ্গা চেয়ারটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। শব্দ শুনে গ্রিশা মাথা তুলে চারদিকে তাকালেন; তারপর ঘরের চারকোণায় ক্রশ করলেন। নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করতে করতে আমরা চিলে কোঠা ছেড়ে বের হয়ে এলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।। নাতালিয়া সাভিশনা

গত শতাব্দীর মাঝ বরাবর নাতাস্কা নামে একটি ছোট মেয়ে তার গোলাপী চিবুক আর খসখসে খালি পায়ে দুমদাম শব্দ করে সবসময় হাসিমুখে খাবরোভকা গ্রামে আমাদের বাড়ির আঙিনায় ঘুরে বেড়াত। আমার দাদু, মেয়েটির বাবা, আমাদের বাড়ির সার্ফ করোনেট বাজিয়ে সাভ্ভার কাজে খুশি হয়ে এবং তারই অনুরোধে মেয়েটিকে ওপর মহলে উন্নীত করেছিলেন, অর্থাৎ তাকে আমার দিদিমার পরিচারিকা পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিজের ভদ্র ব্যবহার ও রুচিশীলতার জন্য পরিচারিকাদের মধ্যে নাতাস্কা অচিরেই একটি বিশেষ স্বীকৃতির আসন দখল করে নিল, এবং আমার মার জন্মের পর যখন ধাত্রীর প্রয়োজন দেখা দিল, তখন সে ভার তার ওপরই অর্পিত হল। আর এই নতুন কাজেও সে খুব শিগগিরই সততা, বিশ্বাস এবং খুদে কর্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসার জন্য পুরস্কার ও প্রশংসা লাভ করল।

কিন্তু শক্তসমর্থ ঝগড়াটে মেজাজের জোয়ান চাকর ফোকা, তার কাজের দৌলতে প্রায়ই নাতালিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তার সহজ সরল প্রেমিক হৃদয়টাকে জয় করে নিল। ভালবাসার উত্তাপে সাহস সঞ্চয় করে নাতালিয়া একদিন সোজা আমার দাদুর কাছে গিয়ে ফোকাকে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করল। তার সেই অনুরোধকে নিতান্তই অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে ধরে নিয়ে দাদু শাস্তিস্বরূপ তাকে তার মালিকানাধীন স্তেপ অঞ্চলের এক অজপাড়াগাঁয়ে রাখালিনীর কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মাত্র ছ মাসের মধ্যেই, যেহেতু তার স্থানে উপযুক্ত কাজ করার মত অন্য কাউকে পাওয়া গেল না, সেহেতু তাকে আবার পুরনো পদে পুনর্বহাল করা হল। বাড়িতে ফিরেই সে দাদুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তার প্রতি যাতে আগের ভালবাসা এবং বিশ্বাস বজায় রাখা হয় তার প্রার্থনা জানাল! এরপর আর কোনদিনও সে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গেনি; সারা জীবন নিজের কথা রেখেছিল।

সেদিন থেকেই নাতাস্কা নাতালিয়া সাভিশনা হয়ে গেল আর মাথায় পরা শুরু করল একটা টুপি। তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার সম্পদ সে উজাড় করে দিল তার নবলব্ধ শিশু কর্ত্রীটির ওপর।

এরপর, যখন একটি গভর্নেস নিযুক্ত হল তার জায়গায়, তখন তার ওপর দায়িত্ব পড়ল পোশাক-আশাক আর ভাঁড়ার ঘরের। সেই একই উৎসাহ এবং ভালবাসার সঙ্গে সে এই নতুন দায়িত্ব পালন করে চলল। সে তখন থেকে বেঁচে রইল শুধুমাত্র তার মনিবের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই। অপব্যয়, ক্ষতি, ডাকাতি ছাড়া অন্য কিছু যেন তার চোখেই পড়ত না, এবং এগুলোকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য

বলে সে মনে করত।

মার যখন বিয়ে হল, তখন, নাতালিয়া সাভিশনার কুড়ি বছরের অক্লান্ত সেবা এবং ভালবাসার কথা স্মরণ করে তিনি তাকে ডেকে তার কৃতজ্ঞতাবোধ এবং মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর তার হাতে, সে এরপর কাজ করুক আর না-ই করুক, বাৎসরিক ৩০০ রুবল করে ভাতা পেয়ে যাবে এই শর্ত সম্বলিত এক মুক্তিপত্র তুলে দিলেন। নাতালিয়া নীরবে মার সব কথা শুনল, তারপর দলিলটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে, বেশ রাগতভাবে সেটাকে পরীক্ষা করে, মুখে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ দড়াম করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। তার এই অদ্ভুত আচরণে বেশ অবাক হয়ে মা তার ঘরে গেলেন। দেখলেন, নাতালিয়া তার সিন্দুকটার ওপর বসে রয়েছে, আর মুক্তিপত্রটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে। সেদিকে চেয়ে সে রুমালটা হাতে জড়াচ্ছে, আর তার দুচোখ বেয়ে ঝরে চলেছে অশ্রুধারা।

তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোমার, নাতালিয়া ?'

মার প্রশ্নের উত্তরে নাতালিয়া জবাব দিল, 'কিছুই হয়নি ; তবে তুমি যখন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ, তখন নিশ্চয়ই আমি কোন অন্যায় করেছি। ঠিক আছে, আমি চলেই যাব।'

সে মার মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, কোন রকমে কান্না চেপে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই, মা তাকে থামিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ; তারপর শুরু হল উভয়ের কান্না।

যেদিন থেকে স্মৃতিকে ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছি, সেদিন থেকে নাতালিয়া সাভিশনার ভালবাসা আর কোমলতা আমার মনকে ছুঁয়েছে ; যদিও আজ যা উপলব্ধি করতে পারছি, সেই অসাধারণত্ব এবং বিস্ময়করতা—সেদিন মোটেই বুঝতে পারিনি। সে যে শুধু নিজের কথা বলত না, তাই নয়, নিজের কথা কখনও ভাবতও না। তার সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল ভালবাসা আর আত্মত্যাগে পূর্ণ। তার কোমল নিঃস্বার্থ ভালবাসার সঙ্গে আমি এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম যে সে সম্পর্কে অন্য কোন রকমের চিন্তাই কখনও মাথায় আসেনি, এমনকি সে দুঃখী না সুখী সেটাও কখনও ভেবে দেখিনি।

প্রায়ই কোন না কোন বাহানায়, পড়াশুনা শিকেয় তুলে তার ঘরে গিয়ে বেশ উচ্চস্বরে একটার পর একটা স্বপ্নের জাল বুনতাম, তার উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত না হয়েই। কোন না কোন কাজ নিয়ে সে সর্বদা ব্যস্ত থাকতই। কখনও হয়ত একটা মোজা সেলাই করত, কখনও বা তার সিন্দুকগুলোকে ঝাড়পোঁছ করত, কিংবা হয়ত জামাকাপড়ের হিসেবনিকেশ নিত ; আর আমি যাই বলতাম না কেন, সব কথাই সে শুনত, যেমন, 'যখন আমি সেনাপতি হব তখন খুব সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করব, একটা ঘোড়া কিনব, একটা স্ফটিকের বাড়ি বানাব আর স্যাক্সনি থেকে কার্ল ইভানিচের প্রত্যেকটি আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আসব' ইত্যাদি ইত্যাদি, আর সে বলত, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তাই কোরো।' যখন আমি চলে আসার জন্য উঠে পড়তাম, তখন সে একটা নীল সিন্দুকের ডালা খুলত, যার মধ্যে তেলের বাক্স থেকে নেওয়া একটি সৈনিকের ছবি, আর ভোলোদিয়ার আঁকা একটা স্কেচ বেশ

ভালভাবে আঁটা ছিল, তার থেকে একটা ধূপকাঠি বের করে, সেটা জ্বালিয়ে নাড়াতে নাড়াতে বলত, 'এটা হল ওচাকোভের ধূপ। যখন তোমার স্বর্গীয় দাদু—ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন—তুর্কীদের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এটা সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন।'

নাতালিয়ার ঘরভর্তি সিন্দুকগুলোতে প্রায় সবরকমের জিনিসই সর্বদা মজুত থাকত। আমাদের কখনও কিছু দরকার হলে আমরা বলতাম, 'চল, নাতালিয়ার কাছে খোঁজ করা যাক।' এবং আশ্চর্য, একটু হাত বাড়ালেই সে-জিনিসটা সে পেয়ে যেত আর বলত, 'এটা সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই পাওয়া গেল।' সেই সিন্দুকগুলোতে এমন হাজারো জিনিস থাকত যা সে ছাড়া আর কেউ জানতও না।

একবার সে আমাকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিল। এটা হয়েছিল এভাবে: একদিন খেতে বসে বাটি থেকে ক্যাভাস নিতে গিয়ে সেটাকে উলটে ফেলে টেবিলের ঢাকনাটাকে নোংরা করে ফেললাম। মা বললেন, 'এবার নাতালিয়াকে ডাক; সে এসে দেখুক যে তার আদরের দুলাল কি করেছে।'

নাতালিয়া এসে নোংরা টেবিলটা দেখে মাথা নাড়াল, মা খুব নিচু স্বরে তাকে যেন কি বললেন, এবং সে আমার দিকে আঙুল নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল।

খাওয়া-শেষে আমি বেশ খোশমেজাজে একেবারে লাফাতে লাফাতে হল ঘরের দিকে চলেছি, এমন সময় দরজাটার পেছন থেকে একহাতে সেই টেবিল-ক্লথটা নিয়ে একেবারে স্প্রিংয়ের মত হঠাৎ ছিটকে এসে নাতালিয়া আমাকে ধরে ফেলল, এবং আমি তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করাতে সে সেই টেবিল-ক্লথটার ভিজে দিকটা আমার মুখের ওপর ঘসতে শুরু করে দিল, আর বলল, 'ভবিষ্যতে আর কখনও টেবিল-ক্লথ নোংরা করবে না, বুঝলে।' এ ব্যবহারে আমি এত বিরক্ত হয়েছিলাম যে রাগে প্রায় সিংহ গর্জন শুরু করেদিলাম।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চোখের জল ফেলে নিজের মনেই নিজে বলে চললাম, 'তার এতবড় সাহস হল যে ভিজে টেবিল-ক্লথটা সে আমার মুখে ঘসে দিল! কেন আমি কি একটা চাকর নাকি!'

যখন ভাবছিলাম যে কি করে নাতালিয়ার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, ঠিক তখনই আমাকে কাঁদতে দেখে বেশ ভয়ে ভয়ে সে ঘরের ভেতর ঢুকল এবং বিভিন্ন স্তোকবাক্যে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। বলল, 'কেঁদোনা লক্ষ্মীটি, ক্ষমা কর, জানই তো আমি একটা আকাট বুড়ী। এটা আমারই দোষ। আমি জানি, তুমি আমায় মাফ করে দেবে। করবে না? এই নাও, দেখ তোমার জন্য কি এনেছি।'

তার রুমালের ভেতর থেকে সে একটা কাগজের মোড়ক বের করল; তাতে ছিল দু টুকরো মিষ্টি আর একটা ডুমুর। কাঁপা কাঁপা হাতে সেগুলো সে আমাকে দিল। আমি আর সেই দয়াময়ী বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তার দেওয়া উপহারটা হাতে নিয়ে, মুখ ফিরিয়ে চোখের জলে ভেসে গেলাম—তবে এ রাগের অশ্রু ছিল না, ভালবাসা আর লজ্জার।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।। বিচ্ছেদ

যেদিনের ঘটনার কথা এতক্ষণ ধরে বললাম ঠিক তার পরদিনই আমাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। জুতোর মধ্যে প্যান্টের নিচের দিকটা ঢুকিয়ে, পুরনো কোটটাকে বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিকোলাই

আগে থাকতেই যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিল। ঘোড়ার গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে ওভারকোট আর ছোট্ট গদিটাকে সিটের তলে ঢুকিয়ে দিয়ে, যখন সে বুঝল যে সেটা বেশ উঁচু হয়েছে, তখন তার ওপর বসে বেশ জোরে জোরে চাপ দেওয়া শুরু করল।

বাবার খাস-বেয়ারা গাড়ির মাথা থেকে ঝুঁকে পড়ে কোনরকমে দম ছেড়ে বলল, 'নিকোলাই দিমিত্রিচ, বাবুর এই বাক্সটাকে কি এখানে রাখা যায় না? তেমন একটা বেশি জায়গা লাগবে না।'

গাড়ির মেঝেতে খুব জোরে একটা মোড়ক ছুঁড়ে ফেলে নিকোলাই বেশ রাগত কণ্ঠে ঝট্‌পট্ উত্তর দিল, 'এটা তোমার আগেই বলা উচিত ছিল ইভানিচ।' তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে রোদে পোড়া ভ্রূজোড়া থেকে একফোঁটা ঘাম ঝেড়ে বলল, 'হায় ভগবান, আমার একেই মাথা ঘুরছে তার ওপর তুমি আবার এলে বাক্স নিয়ে!'

টুপিবিহীন মাথায়, কোট, কাফতান আর জামা গায়ে পুরুষ-চাকরের দল, লম্বা দাগকাটা সেমিজ আর ব্লাউজ গায়ে শিশু কোলে মহিলারা, আর নগ্ন পা ছেলের দল বারান্দায় ভিড় করে আমাদের যাত্রার আয়োজন দেখছিল এবং নানাধরনের কথাবার্তা বলছিল। শীতকালীন টুপি মাথায় একজন কুঁজো বৃদ্ধ কোচোয়ান গাড়ির একেবারে মাথাটা ধরে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল, আর অন্য একজন, বেশ সুন্দর চেহারার একটি যুবক, মাথায় কালো ভেড়ার লোমের টুপি আর গায়ে ঢিলেঢালা জামা পরে, মাথার কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোতে বুলোতে, বাক্সের ওপর আর্মক আর বল্লটা ছুঁড়ে দিয়ে, চাবুকটায় কয়েকবার শব্দ করে, একবার নিজের বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে, পরক্ষণে গাড়িটায় চর্বি মাখাচ্ছিল যে লোকগুলো তাদের দিকে তাকাল। তাদের মধ্যে একজন প্রাণপণে চাকাটা তুলে ধরে রইল, আর অন্যজন সেটার শিকগুলোতে এমনভাবে চর্বি লাগাতে লাগল যাতে কাপড়ে লেগে থাকা এতটুকু চর্বিও নষ্ট না হয়। বেড়ার ধারে বিভিন্ন রঙের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল; তারই মধ্যে কয়েকটা আবার পাগুলো ফাঁক করে চোখ বুজে ঢুলছিল; বাদবাকিরা, কেউ এ ওর গা চাটছিল, আবার কেউ কেউ বারান্দার গায়ে গজানো সবজে ফার্ণ গাছের পাতা আর বোঁটা ছিঁড়ছিল। কয়েকটা শিকারী কুকুর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল, কেউ কেউ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, আবার কেউ কেউ বা চাকা থেকে চর্বি চেটে চেটে নিচ্ছিল। সারা পরিবেশটাই একধরনের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল; দিগন্ত ছেয়ে গিয়েছিল লাইলাক রঙে, তবে আকাশ যেমন আকার ধারণ করেছিল, তেমন নয়। দুরন্ত পশ্চিমী বাতাস ধুলোর স্তম্ভ তৈরি করে, লাইমগাছের মাথাকে নুইয়ে, হলুদ ঝরাপাতাদের উড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলেছিল। আমি জানলার ধারে বসে অত্যন্ত অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তির!

সবাই যখন বৈঠকখানার বড় গোলটেবিলটার চারপাশে একত্রিত হল শেষ-বারের মত কয়েকটা মিনিট কাটাতে, তখন কিন্তু আমার একবারও মনে হয়নি যে এক বেদনাদায়ক মুহূর্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তখনও আমি বিচিত্র সব ব্যাপার ভেবে চলেছি। ভাবছি, কোন্ কোচোয়ান গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে

যাবে, আর কার ওপরেই বা ভার পড়বে ঘোড়াদের নিয়ে যাওয়ার। বাবার সাথেই বা যাবে কে, আর কার্ল ইভানিচেরই বা সহযাত্রী হবে কারা কারা? তাছাড়া কেনই বা আমার গলায় মাফলার বেঁধে দেওয়া হল, আর কেনই বা গায়ে চাপানো হল ওভারকোটটা,—ইত্যাদি হাজার কথা। ভাবলাম, 'আমি কি এতই কোমল? আমি মোটেই জমে যাব না। ওরা যদি আর একটু তাড়াতাড়ি করত! আমার এখনই ইচ্ছে করছে গাড়িতে উঠে যাত্রা করতে।'

কান্নায় ফুলে ওঠা চোখে হাতে একটা ফর্দ নিয়ে নাতালিয়া এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেদের পোশাক-আশাকের হিসেবটা আমি কাকে দেব?'

'নিকোলাইকে দাও, এবং এস, বাচ্চাদের বিদায় জানাবে।'

বৃদ্ধা মহিলাটি কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, হঠাৎ রুমালটা দিয়ে মুখটা চেপে, হাতটা নেড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু যাত্রা করার অধৈর্য ছিল তার থেকেও অনেক বেশি, তাই মা ও বাবার মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা শুনতে লাগলাম। এমন সব বিষয় নিয়ে তারা কথা বলছিলেন যাতে কোন আকর্ষণই ছিল না। তারা বলছিলেন, বাড়ির জন্য কি কি কেনা দরকার, রাজকুমারী সোফিয়া এবং শ্রীমতী জুলিকে কি বলা হবে, আমাদের যাত্রা সুন্দর হবে কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফোকা এল, এবং যে সুরে সে নিয়মিত বলত, 'খাবার তৈরি,' ঠিক সে সুরেই বলল, 'গাড়ি প্রস্তুত।' এ ঘোষণায় মুহূর্তের মধ্যে মার চেহারার পরিবর্তন ঘটে গেল, তিনি কেমন যেন পাণ্ডুর হয়ে গেলেন। মনে হল, সম্ভবতঃ এরজন্য তিনি প্রস্তুতই ছিলেন না।

প্রাচীন রুশ রীতি অনুযায়ী ফোকাকে আদেশ করা হল ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য। আমি ভাবলাম, এ তো ভারী মজার, 'আমরা যেন কারও কাছ থেকে সব লুকিয়ে রাখতে চাইছি।'

সবাই যখন বসে পড়েছি, ফোকাও একটা চেয়ারের কানায় বসেছে, তখন হঠাৎ বন্ধ দরজাগুলোর একটাতে মৃদু শব্দ হল, এবং আমরা সবাই সেদিকে মুখ ফেরালাম। দেখলাম, বেশ হন্তদন্ত হয়ে নাতালিয়া ঘরে ঢুকল এবং চোখ না তুলেই দরজার কাছে যে চেয়ারটায় ফোকা বসেছিল, সেটাতেই বসে পড়ল। আজও আমি সেই দৃশ্য স্পষ্ট মনে করতে পারছি। টাক মাথা, কোঁচকানো কপাল, অনড় দয়ালু মুখ আর বাঁকা টুপির প্রান্তে সামান্য ধূসর চুলের রেখা নিয়ে ফোকা বসে আছে। একটা চেয়ারে দুজন আঁটছে না, এবং তারজন্য দুজনেই বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

আমি ক্রমাগত অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। দশটা সেকেণ্ড দরজা বন্ধ করে বসে থাকাটাই আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন এক ঘণ্টা। অবশেষে, বেশ কিছুক্ষণ পর, ক্রুশ করে উঠে বিদায় নেওয়া শুরু হল। বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেলেন। বললেন, 'অনেক হয়েছে; আমরা তো আর চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে যাচ্ছি না।'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মা বললেন, 'কিন্তু তবু যথেষ্ট বেদনাদায়ক।'

আমি যখন সেই কণ্ঠস্বর শুনলাম, যখন তার অশ্রুপূর্ণ চোখ আর কম্পিত

ঠোঁটদুটো আমার দৃষ্টিকে থমকে দিল, তখন, সেই অবর্ণনীয় মুহূর্তে হৃদয় বেদনায় এবং ভয়ে এত বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যে মনে হল 'বিদায়' না নিয়েই মার কাছ থেকে ছুটে বিদায় হয়ে যাই। তখন উপলব্ধি করলাম, যে মুহূর্তে মা বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছেন।

ভোলোদিয়াকে তিনি এতবার চুমু খেলেন এবং এতবার বুকে ক্রশ আঁকলেন যে বুঝলাম এবার আমার পালা, আর সেজন্যই কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ক্রমাগত একই ভাবে আশীর্বাদ করে চললেন। অবশেষে, আমি আর না থাকতে পেরে, তাকে জড়িয়ে ধরে বল্গাহীন বেদনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

যখন গাড়িতে ওঠার জন্য এগিয়ে গেলাম, তখন ক্লান্ত চাকরবাকরের দল মাঝখানের ঘরটায় এল বিদায় জানাতে। 'খোকাবাবু, তোমার হাতটা একটু দ. ওনা' বলে তারা যেভাবে আমার কাঁধে সশব্দ চুম্বন দেওয়া শুরু করল, যেভাবে তাদের মাথার চর্বির গন্ধ আমার নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করতে লাগল, তাতে আমার বিরক্তি চরম সীমায় উপস্থিত হল। ফলে, নাতালিয়ার টুপিতে অত্যন্ত হাল্কাভাবে চুমু খেলাম, যদিও সে আমাকে বিদায় জানল অবারিত অশ্রুর বন্যায়।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আজও আমি সেই চাকরবাকরগুলোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই, এমনকি তাদের চেহারার প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমার পক্ষে এঁকে ফেলা সম্ভব; কিন্তু আমার মার সেই মুখ আর ভাবভঙ্গি কিছুতেই আমি মনে করতে পারছি না; আর তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সেই অশ্রুসজল মুহূর্তে তার মুখের দিকে তাকাবার সাহসই আমি সেদিন সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এবং মনে হয়, তখন যদি আমি তা করতাম, তাহলে আমাদের দুজনের বেদনাই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে যেত।

সবার আগে ছুটে গিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পেছনের সিটটায় বসে পড়লাম। সেদিকটা উঁচু থাকাতে বাইরের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে অনুভব করছিলাম, মা যেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমি নিজেকেই নিজে বললাম, 'আমি কি আর একবার তাকে দেখব, না দেখব না? ঠিক আছে, শেষবারের মত একবার দেখে নিই।' তারপর যখন গাড়ির জানলা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লাম, ঠিক সেই সময় মা-ও একই উদ্দেশ্যে গাড়ির অন্য প্রান্তে এসে আমার নাম ধরে ডাকলেন। ডাক শুনে আমি এত দ্রুত ঘুরে গেলাম যে আমাদের দুজনের মাথায় মাথায় ঠোকর লেগে গেল। তিনি বিষণ্ণ হাসি হেসে শেষবারের মত আমাকে দীর্ঘ উষ্ণ চুম্বন দিলেন।

গাড়ি বেশ কয়েকগজ এগিয়ে যাবার পর তার দিকে তাকাবার সাহস হল আমার। দেখলাম তার মাথায় বাঁধা নীল রুমালটা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, আর মাথা ঝুঁকিয়ে, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন; ফোকা তাকে উঠতে সাহায্য করছে।

বাবা আমার পাশে চুপচাপ বসেছিলেন। কান্নায় আমার স্বর ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং গলার মধ্যে কি যেন একটা এমনভাবে দলা পাকিয়ে উঠল যে মনে হল হয়ত তমনই দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। গাড়ি বড় রাস্তায় পড়তেই চোখে পড়ল, আমাদের বাড়ির ঝুল বারান্দা থেকে কে যেন একটা সাদা রুমাল ওড়াচ্ছে। সঙ্গে

সঙ্গে আমিও আমার রুমালটা আন্দোলিত করতে লাগলাম, এবং মনে হল তাতে যেন মনটা কিছুটা শান্ত হল। তবু আমি কেঁদেই চললাম, এবং চোখের জলের মাধ্যমেআমার কোমল হৃদয়ের যে পরিচয়টা আমার কাছে উন্মোচিত হল তাতে মনে মনে বেশ স্বস্তি এবং শান্তি দুটোই পেলাম।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর অনেকটা শান্ত হলাম, এবং চোখের সামনাসামনি দর্শনীয় বস্তুগুলোকে দেখার দিকে মনযোগ দিলাম। দেখলাম, পথপ্রান্তে ডাকগাড়ির ঘোড়ার আস্তাবল। সেখানে একদল ঘোড়া লেজ নাড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনটা বা এক পা নুইয়ে, পরের পা-টা মুড়ে মাটিতে বসে পড়ছে, আবার কারও ঘাড়ে এসে পড়ছে ঘোড়াওলার চাবুক। লক্ষ্য করলাম, ঘোড়ার সাজটা কী ভাবে তার পিঠে লাফ দিয়ে উঠল! এবং যতক্ষণ না লেজের দিকটা গদী দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল ততক্ষণ তা দেখতে থাকলাম। এরপর দৃষ্টি ফেরালাম অন্য দিকে—রাইপের ক্ষেতে, বিস্তীর্ণ পতিত জমিতে, যার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লাঙ্গল কাঁধে কিংবা বাচ্চাঘোড়াসহ মাদীঘোড়ার লাগাম হাতে কৃষক। আর চোখে পড়ছিল মাইলস্টোনগুলো। এমনকি মাঝে মাঝে গাড়ি চালকের বসার জায়গাটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম, কোন্ কোচোয়ান গাড়িটা চালাচ্ছে সেটা দেখার জন্য। এবং যদিও আমি ততক্ষণে মার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলাম সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, তবু যখনই তার কথা মনে পড়ছিল তখনই দু চোখ ভরে আসছিল জলে। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেল দুদিন আগে পথের প্রান্তে দেখা শালুক ফুলগুলোর কথা—যা তোলা নিয়ে ঝগড়া লেগেছিল লিউবোচকা আর কাতেনকার মধ্যে; আর মনে পড়ল আমাদের থেকে আলাদা হবার সময় কী ভাবে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তাদের ছেড়ে আসতে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছিল; আর ঠিক সমান কষ্ট পাচ্ছিলাম নাতালিয়া সাভিশনা, ফোকা এবং বার্চের পথটাকে পেছনে ফেলে রেখে আসতে। এমনকি বিরক্তিকর মহিলা মিমিকে ছেড়ে আসতেও কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, এদের তো আর কখনই ফিরে পাব না। আর মা?

আবার চোখ ভরে এল জলে; তবে সে জল কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।। শৈশব

সুখ আর আনন্দে ভরা শৈশব, অনাবিল সুখের সেই দুর্লভ দিনগুলো কোথায় যে হারিয়ে গেল! সেই সব উষ্ণ স্মৃতিকে ভাল না বেসে থাকবই বা কি করে? তারা যে আমার আত্মাকে বিশুদ্ধতা এবং আনন্দে ভরিয়ে তোলে, এ সুখের তো কোন শেষ নেই।

ছুটোছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তাম চায়ের টেবিলের সামনে রাখা উঁচু চেয়ারটায়। যদিও আমার ভাগের দুধ ও চিনিটুকু অনেক আগেই খাওয়া হয়ে যেত এবং ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসত, তবু জায়গা ছেড়ে উঠতাম না—বসে থাকতাম, মার কথা শুনতাম। তিনি হয়ত তখন মধুর স্বরে কারও সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। সেই স্বর আমার হৃদয়ের গভীর তলদেশ ছুঁয়ে যেত। তন্দ্রায় চোখের পাতা বুজে আসতে চাইত, তবু আমি তার মুখটাকে মনে করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু হঠাৎ সেটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম রূপ ধারণ শুরু করত, এবং আমার মনে হত সেটা যেন একটা ছোট বোতামের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু তবু আমি

সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মধুর হাসি হেসে চলেছেন। সত্যি, তাকে তখন এত ছোট দেখাত যে কী ভীষণ ভালই না লাগত। আমি আমার চোখের পাতাকে একেবারে বন্ধ করে ফেলতাম। তখন তাকে মনে হত চোখের মণিকোঠায় প্রতিবিম্বিত অতি ক্ষুদ্র একটা ছায়ার মত। কিন্তু যেই একটু নড়তাম অমনি প্রতিচ্ছায়া অন্তর্হিত হত। সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ ঘোরাতাম, নাচাতাম, এবং সবরকমের চেষ্টা করতাম কিন্তু কিছুতেই সেই ছবিটাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারতাম না।

অবশেষে উঠতাম, ইজিচেয়ারে এসে আরাম করে শুতাম।

মা বলতেন, 'নিকোলেনকা, তুমি আবার ঘুমিয়ে পড়বে ; তার থেকে বরং ওপরতলায় যাও।'

আমি উত্তর দিলাম, 'না মা, আমি এখন ঘুমোতে চাই না।' ধীরে ধীরে কুয়াশাচ্ছন্ন মধুর স্বপ্নে আমার মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে যেত। শৈশবের বেলায় ঘুমে চোখের পাতা দুটো বুজে আসত, আমি ঘুমিয়ে পড়তাম ; মুহূর্তের মধ্যে আমার চৈতন্য লোপ পেত ; যতক্ষণ না কেউ এসে আবার জাগিয়ে দিত ততক্ষণ ঘুমিয়েই থাকতাম। স্বপ্নে দেখতাম কারও যেন কোমল হাত আমাকে স্পর্শ করছে ; আর এই স্পর্শ থেকেই বুঝতে পারতাম যে সে হাত কার। ঘুমের মধ্যেই হাতটাকে টেনে নিতাম ঠোঁটের কাছে, উষ্ণভাবে চেপে ধরতাম ঠোঁটের ওপর।

ইতিমধ্যে সকলেই হয়ত চলে গেছে, বৈঠকখানায় জ্বলছে কেবলমাত্র একটাই মোমবাতি। যে চেয়ারটায় আমি তখন শুয়ে আছি, হয়ত কিছুক্ষণ আগে সেটাতে বসেই আমার চুলে তার নরম হাত বোলাতে বোলাতে মধুর স্বরে মা বলেছিলেন যে আমাকে জাগিয়ে দেবেন।

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'উঠে পড় সোনামণি, ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে।'

তাকে জড়িয়ে ধরতে আমার মোটেই অসুবিধে হল না ; তিনি তার ভালবাসা এবং স্নেহকে আমার ওপর উজাড় করে দিতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। আমি উঠলাম না, আবেগে তার হাতে চুমু খেলাম।

'উঠে পড় সোনার চাঁদ।' তিনি বললেন।

ঘাড়ের পেছন থেকে একটা হাত গলিয়ে দিয়ে অন্য হাতের আঙুলে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন তিনি আমাকে। অন্ধকার ঘরে নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সুড়সুড়ি আর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। মা আমার পাশে এসে বসেছেন, আমাকে স্পর্শ করছেন, তার গায়ের সুগন্ধ আর গলার স্বর আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। হঠাৎ হাতখানা তার ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে, মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'মা, মাগো, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।'

তার সেই করুণ রহস্যময় হাসি হেসে, দুহাতে আমার মাথাটা চেপে ধরে, ভ্রূ-জোড়ায় চুমু খেয়ে আমাকে তার কোলের ওপর বসিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'তুই আমাকে খু-উ-ব ভালবাসিস, নারে?' তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তুই আমাকে চিরকাল ভালবাসবি ; চিরকাল ; যখন আমি থাকব না, তখনও। কখনও ভুলবি না তো নিকোলেনকা, বল?'

আরও কোমলভাবে তিনি আমাকে চুমু খেলেন।

আমি তার হাঁটুতে চুমু খেয়ে বললাম, 'অমন কথা বোলো না মা, বোলো না।' আমার দু চোখ বেয়ে ভালবাসা আর উচ্ছ্বাসের অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল।

এরপর ওপরে গেলাম, ড্রেসিং গাউনটা পড়লাম এবং দুহাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমার বাবা মার মঙ্গল কর।' মার কাছ থেকে শেখা এই প্রার্থনাবাণী আমার শিশু জিহ্বায় আধো আধো উচ্চারণে মন্দ শোনাল না। মার প্রতি ভালবাসা আর ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা—এই দুটো একত্রিত হয়ে হৃদয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করল।

প্রার্থনা শেষে আমার ছোট্ট কম্বলটায় নিজেকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। ফুরফুরে আনন্দের মেজাজে একটার পর একটা স্বপ্ন এসে চোখের পাতায় ভিড় করল। কিন্তু সেগুলো কি নিয়ে? তার কোনটাই আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না, তবে প্রতিটাই ছিল ভালবাসা আর সুখের আশায় পরিপূর্ণ। ঠিক তখনই আমার মনে পড়ল কার্ল ইভানিচের কথা, তার দুর্ভাগ্যের কথা। সত্যি, এমন দুঃখী মানুষ আমি জীবনে আর একটিও দেখিনি। তারজন্য দুঃখ পেলাম, তার প্রতি ভালবাসায় আমার দু চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল; নিজেকেই নিজে বললাম, 'হে ভগবান, ওকে সুখী কর; আমাকে তুমি এমন শক্তি দাও যাতে আমি ওর দুঃখ মোচন করতে পারি। আমি ওর সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।' তারপর হাত দিয়ে আমার প্রিয় চীনামাটির কুকুর আর খরগোশটাকে বালিশের এক কোণায় সরিয়ে দিয়ে এই ভেবে মনে মনে খুশি হলাম যে ওগুলো ওখানে বেশ আরামেই থাকবে। আবার প্রার্থনা করলাম, ভগবান যেন সবাইকে সুখে শান্তিতে রাখেন, সবাই যেন তৃপ্ত থাকে এবং আগামীকালের আবহাওয়া যেন এমন হয় যাতে বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়ান যায়। এরপর অন্য দিকে কাত হয়ে শুলাম, আমার স্বপ্ন আর কল্পনা একাকার হয়ে গেল; আমি ঘুমিয়ে পড়লাম অশ্রুতে ভেজা চোখের পাতা দুটোকে বন্ধ করে।

শৈশবের নির্মলতা, সরলতা, ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা, বিশ্বাসের শক্তি কি মানুষের জীবনে আর কখনও ফিরে আসে? নির্মল আনন্দ আর সীমাহীন ভালবাসার তৃষ্ণা—এ দুটো যখন মানুষের জীবনের চালিকা শক্তি থাকে তার থেকে আর ভাল সময় কি হতে পারে?

কোথায় গেল সেই সব জ্বলন্ত প্রার্থনাগুলো? কোথায় আজ সেই আবেগের অশ্রুজল—যা একদিন শ্রেষ্ঠতম উপহার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল? চোখ মুছিয়ে দিয়ে যেত যে সান্ত্বনার পরী—মিটি মিটি হেসে আর ভালবেসে, সে আজ কোথায়?

তবে কি জীবন আমার হৃদয়ের ওপর এমন এক ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে, যে কারণে অশ্রু আর উচ্ছ্বাস চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে? তাহলে কি শুধু স্মৃতিই অবশিষ্ট রইল?

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ।। একগুচ্ছ কবিতা

মস্কোতে পৌঁছবার একমাস পরে, একদিন দিদিমার বাড়ির দোতলায় বসে লিখছিলাম। টেবিলের উলটো দিকে বসেছিলেন আমাদের ড্রয়িং-মাস্টার। তিনি একটা তুর্কীর মাথার পেন্সিল-স্কেচের ভুলভ্রান্তিগুলো চূড়ান্তভাবে শুধরে দিচ্ছিলেন। ভোলোদিয়া তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর থেকে বকের মত মাথাটা এগিয়ে দিয়ে সেটা দেখছিল। এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম পেন্সিল-স্কেচ, এবং

সেটা সে সেদিনই, দিদিমার ব্রত উদ্‌যাপনের দিন উপলক্ষে তাকে উপহার দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল।

পায়ের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তুর্কীর ঘাড়ের কাছটা দেখিয়ে সে বলল, 'এখানে আর একটু ছায়া দিলে ভাল হত না কি?'

ড্রয়ারের ভেতর পেনসিল আর ড্রয়িং-পেনটাকে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে মাস্টার মশাই জবাব দিলেন, 'না, তার কোন প্রয়োজন নেই। যা আছে ঠিকই আছে, আর কিছু করতে হবে না।' তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, ছবিটার দিকে আলতোভাবে নজর করতে করতে বললেন, 'এবার তোমার কি ব্যাপার নিকোলেনকা, তোমার গোপন বস্তুটাকে আমাদের দেখাবে তো? তুমি তোমার দিদিমাকে কি দিচ্ছ? আমার মনে হয়, এ ধরণেরই আর একটা মাথা এঁকে উপহার দেওয়াটাই ঠিক হবে। আচ্ছা, তাহলে চলি।' কথা বলতে বলতেই খাতা আর টুপিটা উঠিয়ে রওয়ানা দিলেন।

আমি ভাবছিলাম, তখন থেকে বসে বসে যা করছি তার থেকে একটা মুণ্ডু এঁকে উপহার দিয়ে দেওয়াটাই ভাল হবে। যখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে দিদিমার নামকরণ-দিবস বার্ষিকী খুব নিকটবর্তী, এবং সেই উপলক্ষে আমাদেরকে কোন না কোন উপহার বানাতেই হবে, তখনই আমার মাথায় এসেছিল একটা কবিতা লেখার কথা, এবং প্রায় সাথে সাথেই দুটো লাইন লিখে ফেলেছিলাম আর আশা করছিলাম যে বাকিটাও খুব শিগগিরই হয়ে যাবে। আমি বুঝতেই পারি না, একটি শিশুর পক্ষে উদ্ভট, এমন একটা পরিকল্পনা কি করে আমার মাথায় গজিয়েছিল! তবে মনে আছে, যখন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমি দিদিমাকে কি উপহার দেব ঠিক করেছি, তখন সবাইকেই বলেছিলাম, উপহার একটা দেব ঠিকই— তবে সেটা কি তা আগে থাকতে কিছুতেই ফাঁস করছি না।

অকস্মাৎ যে দুটো লাইন লিখে ফেলেছিলাম, হাজার চেষ্টা করেও তার বেশি আর কিছুই লিখে উঠতে পারলাম না। ক্রমাগত আমার বইয়ের কবিতাগুলো পড়লাম, কিন্তু দিমিত্রিয়েভ কিংবা দেরজাভিন—কেউই আমাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করলেন না। বরং তারা যেন আমার অক্ষমতাকে আরও বেশি করে ধরিয়ে দিলেন। কার্ল ইভানিচ ভাল ভাল কবিতা টুকে রাখতেন জানতাম, তাই তার কাগজপত্র তল্লাশি শুরু করলাম, এবং তার ফলে রুশ ভাষায় লিখিত একটা কবিতা আবিষ্কার করলাম, আর সম্ভবতঃ সেটা ছিল তার নিজেরই লেখা। কবিতাটা হচ্ছে:

মাদাম ল'র প্রতি

মনে রেখো কাছে,
মনে রেখো দূরে,
মনে রেখো, মনে রেখো, মনে রেখো মোরে—
মনে রেখো হতভাগা কবরেতে আছে,
শুয়ে নিশ্চিতে অসময়—
যে সারা জীবন ভালবেসেছে তোমায়।

পেত্রোভস্কায়া, ১৮২৪, জুন ৩ — কার্ল মৌয়ার

পাতলা কাগজের ওপর, গোল গোল সুন্দর হাতের লেখায় নকল করা এই কবিতাটা, আমি যে আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়েছিলাম, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল

বলে, আমার মন ছুঁয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ভালভাবে বুঝে নিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম। তারপর সবকিছু দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই বার পঙক্তির একটা কবিতা তৈরি হয়ে গেল এবং পড়ার ঘরে বসে সেগুলোকে মোলায়েম কাগজের ওপর নকল করতে লাগলাম।

প্রথমেই দুটো কাগজ বরবাদ হয়ে গেল। কবিতার কোথাও কোন পরিবর্তন করবার চেষ্টা করছিলাম বলে যে এটা হল তা নয়, কারণ সেগুলো তো আমার কাছে অতি চমৎকার বলেই মনে হচ্ছিল ; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল, তৃতীয় লাইন থেকেই লেখাটা ক্রমাগত ওপরে চড়ে যাচ্ছিল, ফলে সেটাকে শেষের দিকে একেবারে বাঁকাচোরা দেখাচ্ছিল।

তৃতীয় লেখাটাও তেমনিই হল, কিন্তু আমি স্থির সিদ্ধান্ত করলাম যে কিছুতেই আর নতুন করে লিখব না। কবিতাটাতে দিদিমার সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করে, ধন্যবাদ জানিয়ে, এই বলে শেষ করেছিলাম যে,

'আমাদের যত উদ্যম সে তো তোমারই সুখের জন্য,
আর ভালবাসি ঠিক ততটাই, যত মাকে ভালবেসে ধন্য।'

কবিতাটা আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছিল, তবে শেষের লাইন দুটো যেন বারবার নিজেরই কানে বাজছিল।

'আর ভালবাসি···ঠিক ততটাই,···যত মাকে···ভালবেসে ধন্য।' নিজেই নিজের মনে বলে চলি 'তাহলে মার পরিবর্তে এখন কোন শব্দটা বসাব ? গ্রাহ্য করা ?···পালক ?···ঠিক আছে, কার্ল ইভানিচের কবিতার থেকে এটা শত গুণে ভাল হয়েছে।'

সুতরাং শেষ লাইনটা লিখে ফেললাম। তারপর শোবার ঘরে বেশ আবেগের সঙ্গে গলার স্বর উচ্চগ্রামে তুলে গোটা কবিতাটা পড়লাম। যদিও ছন্দ এবং পরিমিতি বোধের নিদারুণ অভাব ছিল কবিতাটাতে, কিন্তু আমি কোথাও থামলাম না ; তবু শেষ লাইনটা বারবার ঘুরে ফিরে বিরক্তিকরভাবে মনের মধ্যে নাড়া দিতে লাগল। তাই বিছানার ওপর বসে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করলাম।

'কেন আমি লিখব "যত মাকে ভালবেসে ধন্য ?" তিনি তো এখানে নেই, তাছাড়া এক্ষেত্রে তার নামের উল্লেখ করাটাই তো নিস্প্রয়োজন। দিদিমাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—সবই ঠিক, কিন্তু সে তো মার মত কিছুতেই নয়। তাহলে এটা কেন লিখলাম ? কেন একটা মিথ্যে কথা লিখলাম ? হোক না এটা কবিতা, তা বলে মিথ্যে লিখতে হবে ?'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজি আমার নতুন জ্যাকেটটা নিয়ে উপস্থিত হল।

'যাক গে,' ভীষণ বিরক্ত হয়ে কবিতাগুলোকে বালিশের তলায় গুঁজে রেখে নতুন জামাকাপড় পরার জন্য দৌড় লাগালাম।

সেগুলো দেখতে বেশ চমৎকার হয়েছিল। দারুচিনি রঙের ব্রোঞ্জের বোতামওলা হাফ-কোটটা এমনভাবে তৈরি করেছিল যে পরলে বেশ গরম লাগছিল—গাঁয়ের দিকে যেমন বানানো হত তেমন নয়। তাছাড়া কালো প্যান্টটাও বেশ আঁটোসাঁটো হয়েছিল। পরলে পেশীগুলো বেশ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল, অথচ জুতোটাও ছিল ঢাকা।

পাটাকে চারদিক থেকে দেখে নিয়ে মনে মনে বললাম, 'অবশেষে সত্যিকারের দাগকাটা একটা প্যান্ট পাওয়া গেল।' যদিও সেগুলো পরে নড়তে চড়তে বেশ কষ্ট

হচ্ছিল, তবে সে কথা কাউকে বললাম না ; বরং উলটে জানিয়ে দিলাম যে ওগুলো পরে চলাফেরা করতে বেশ আরামই লাগছে, আর যদি ওতে কোন খুঁতের কথা বলতেই হয় তো বলতে হবে, ওগুলো একটু বেশি রকমের ঢিলে হয়ে গেছে। অতঃপর আয়নার সামনে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, গন্ধ তেলমাখা চুলে চিরুনি চালালাম ; কিন্তু যতই চেষ্টা করলাম ফুলে ওঠা চুলগুলোকে কিছুতেই সোজা করতে পারলাম না। সেগুলো বাগ মেনেছে কিনা দেখার জন্য যখনই আঁচড়ানো বন্ধ করছিলাম তখনই আবার ওগুলো উঠে পড়ে আমার মুখটাকে নিতান্ত বোকার মত করে তুলছিল।

অন্য একটা ঘরে কার্ল ইভানিচ জামাকাপড় পরছিলেন। তার নীলরঙা দোয়েল পাখির লেজের মত কোটটা আর ভেতরে পরার জামাটা পড়ার ঘরের মধ্যে থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিচে যাবার সিঁড়ির মুখের দরজাটার কাছ থেকে দিদিমার একজন চাকরানীর গলা ভেসে এল। সে কি চাইছে তা দেখার জন্য আমি ঘরের বাইরে বের হলাম। দেখলাম তার হাতে একটা কড়কড়ে মার দেওয়া নতুন জামা। সে বলল, ওটা ইভানিচের, এবং ওটাকে প্রস্তুত করার জন্যই নাকি সে আগের রাতে ঘুমোয়নি। আমি সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য নিলাম, এবং দিদিমা ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা, তা জানতে চাইলাম।

চাকরানীটি বলল 'তিনি তো কখন উঠেছেন। এতক্ষণে তার কফি খাওয়া সারা হয়ে গেছে। আর যাজক মশাইও তো এসে গেছেন।' তারপর আমার নতুন জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'ওঃ, তোমাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!'

তার মন্তব্য শুনে আমার মুখ লাল হয়ে গেল। আমি নিজের আঙুল মটকালাম, একপায়ে ভর দিয়ে একটা চক্কর খেলাম, এবং বেশ বড় একটা লাফ দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, ও আমার সবকিছুরই প্রশংসা করলনা কেন। সত্যিই তো আমাকে চমৎকার দেখতে লাগছে।

জামাটা নিয়ে যখন ইভানিচের কাছে গেলাম, তখন বুঝলাম যে ওটার আর তার দরকার নেই, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি অন্য একটা জামা পরে ফেলেছেন, এবং টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট আয়নাটার সামনে ঝুঁকে পড়ে, দু হাত দিয়ে চকচকে নেকটাইয়ের ফাঁসটা ধরে মসৃণ করে কামানো চিবুকটা ওপর-নিচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন যে ফাঁসটা ঠিক মত এঁটেছে কিনা। তারপর আমাদের জামাকাপড় ঠিক করে টেনেটুনে দিয়ে, নিজেরটাও সে রকম করে দেবার জন্য নিকোলাইকে অনুরোধ করে, শেষে আমাদের নিয়ে চললেন দিদিমার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আমাদের তিনজনের মাথা থেকেই যে সুগন্ধি তেলের গন্ধ বের হচ্ছিল তার কথা ভাবলে আজও আমি না হেসে থাকতে পারি না।

কার্ল ইভানিচ নিজের হাতে বানানো একটা বাক্স নিয়ে গেলেন, ভোলোদিয়া নিয়ে গেল তার আঁকা ছবিটা, আর আমি নিয়ে গেলাম আমার কবিতাগুচ্ছ। সঙ্গে রইল জিভের ডগায় তৈরি করা শুভেচ্ছাবাণী, যা উপহার দেবার সাথে সাথে উচ্চারিত হবে। যে মুহূর্তে কার্ল ইভানিচ বৈঠকখানার দরজাটা খুললেন, অমনি দেখা গেল যাজক তার পরিচ্ছদ গায়ে চড়াচ্ছেন এবং পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল মন্ত্রোচ্চারণ।

ততক্ষণে দিদিমাও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ; একটা চেয়ারের হাতলে হাত

রেখে, দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে, মাথাটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তিনি প্রার্থনা করে চলেছেন ; তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, এবং এমনভাবে হাসলেন যে মনে হল আমাদের পেছন দিকে লুকিয়ে রাখা উপহারগুলো তিনি দেখে ফেলেছেন। ফলে যে চমক দেখাবার জন্য আমরা এতক্ষণ উসখুস করছিলাম সেটা একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল।

যখন এগিয়ে গিয়ে চুম্বন দেওয়ার সময় এল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা সংকোচ আমাকে পক্ষাঘাতের মত চেপে ধরল এবং আমি অনুভব করলাম আমার পক্ষে এ উপহার দেওয়ার সাহস সঞ্চয় কিছুতেই সম্ভব হবে না ; ফলে কার্ল ইভানিচ, যিনি তখন দিদিমাকে ভাল ভাল নির্বাচিত শব্দে গাঁথা শুভেচ্ছাবাণী শোনাচ্ছিলেন এবং তার হাতে উপহারের বাক্সটা তুলে দিয়ে ভোলোদিয়ার স্বপক্ষে কিছু কিছু কথার জাল বিছোচ্ছিলেন, তার পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। চারকোণায় গিল্‌টি করা কাগজে মোড়া বাক্সটা পেয়ে দিদিমা বেশ খুশি হলেন, এবং সেটা বোঝবার জন্য তৃপ্তির হাসি হাসলেন। বোঝা গেল, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না ওটাকে কোথায় রাখা যেতে পারে, তাই সেটাকে বাবার হাতে দিলেন এবং সেটা যে কী চমৎকার ভাবে তৈরি করা হয়েছে তা দেখতে বললেন।

কৌতূহল মিটে গেলে বাবা সেটা পুরুতের হাতে দিলেন, এবং পুরুতও তাতে বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি মাথা নাড়িয়ে একবার বাক্সটার দিকে দেখলেন, এবং পরক্ষণে তাকালেন সেই শিল্পীর দিকে, যার পক্ষে এমন অপরূপ সৃষ্টি সম্ভব। এরপর ভোলোদিয়া এগিয়ে গিয়ে তার ছবিটা দিল, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বর্ষিত হল প্রশংসাবাণী। এবার এল আমার পালা ; দিদিমা বিপুল উৎসাহের হাসি হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সংকোচের আবর্তে যারা ক্রমাগত ঘুরে মরেন, তাদের এ কথা ভালভাবেই জানা আছে যে, সময় অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে যে দ্রুতগতিতে তার বৃদ্ধি ঘটে, ঠিক তেমনি দ্রুতগতিতেই আবার কমে যাওয়ার সময় তা কমেও যায়। অর্থাৎ যত বেশিক্ষণ অনুভূতি টিঁকে থাকে, ততই তা অপরাজেয় হয়ে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ততই কঠিন হয়ে পড়ে।

কার্ল ইভানিচ এবং ভোলোদিয়ার উপহার দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেলে আমার দৃঢ়তা এবং উৎসাহের অবশিষ্টটুকু আমাকে অস্থির করে তুলল ; সংকোচ উত্তীর্ণ হল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। উপলব্ধি করলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত মাথায় গিয়ে আঘাত করছে ; মুখ একবার লাল, একবার পাণ্ডুর হয়ে উঠছে ; নাকের কোণ, আর কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ছেয়ে গেছে। কানদুটো যেন জ্বলে উঠল, সারা দেহে শিহরণ এবং শীতল ঘামের উপস্থিতি অনুভব করলাম ; একটার পর একটা পা ফেলতে লাগলাম, কিন্তু আশ্চর্য যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে এক পা-ও এগোতে পারলাম না।

বাবা বললেন, 'এগিয়ে এস নিকোলেনকা, ছবি না বাক্স—কি এনেছ আমাদের দেখাও।' আর কিছু করার ছিল না। কম্পিত হাতে দোমড়ানো-মোচড়ানো দুর্ভাগ্যজনক পাণ্ডুলিপিটা দিদিমার হাতে তুলে দিলাম ; আমার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বুজে গেল—নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার সামনে। একথা কিছুতে ভাবতেই পারলাম না যে প্রত্যাশিত ছবির পরিবর্তে আমার মূল্যহীন কবিতাটা সবার সামনে

পড়া যেতে পারে সেই শেষের লাইনটা সহ, যেখানে লিখেছি, 'যত মাকে ভালবেসে *ধন্য'*—অর্থাৎ কিনা যা থেকে সোজাসুজি প্রমাণ হয়ে যাবে যে আমি আমার মাকে কোনদিনই ভালবাসতাম না, এবং এখন তো একেবারে ভুলেই গেছি। কিভাবে আমি বর্ণনা করব সেই দুঃসহ বেদনার মুহূর্তকে, যখন দিদিমা আমার কবিতাটা জোরে জোরে পড়া শুরু করলেন, এবং শেষপর্যন্ত একটা লাইনের মাঝামাঝি এসে থেমে, মানে বুঝতে না পেরে, মুখে কোন রকম প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ না করেই দৃষ্টিশক্তির দোহাই দিয়ে বাবার দিকে কাগজটা এগিয়ে ধরলেন সেটাকে আবার প্রথম থেকে পড়বার জন্য। তিনি এমনভাবে হাসলেন যে আমার মনে হল তিনি যেন আমায় তাচ্ছিল্য করছেন। শুধু তাই নয়, কবিতাটা আবার প্রথম থেকে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশের একটাই মাত্র অর্থ আমার কাছে বোধগম্য হল, এবং তা হল এই যে তিনি বাবাকে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই শেষ লাইনটা পড়াতে চাইছেন-এ কারণে যে ওখানটাতে আমার অনুভূতির স্বল্পতা ধরা পড়ে যাবে। আর তাই, প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতে লাগলাম, এই বোধহয় বাবা আমার নাকে একটা ঠোক্কর মেরে বললেন, 'বজ্জাদ ছেলে, নিজের মাকেই তুমি ভুলে গেছ। দূর হ এটা নিয়ে।' কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছুই হল না। বরং কবিতাটা পড়া শেষ হলে দিদিমা বললেন, 'চমৎকার!' এবং আমার কপালে একটা চুমু খেলেন।

দিদিমা যে হাতলওলা চেয়ারটায় সবসময় বসতেন তার সঙ্গে সংযুক্ত টেবিলটার ওপর সাদা মিহি কাপড়ের দুটো রুমাল আর মার ছবি আঁকা একটা নস্যির ডিবের ঠিক পাশটাতে পরপর সাজিয়ে রাখা হল ছোট বাক্সটা, ছবিটা আর আমার কবিতাগুচ্ছ।

দিদিমার ঘোড়াগাড়িটাতে চড়ে যে দুজন চাপরাসি এসেছিল তাদের মধ্যে একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, 'রাজকুমারী ভারভারা ইলিয়ানিচনা।'

নস্যির ডিবের ওপর লাগানো কচ্ছপের ছবিটার দিকে দিদিমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। চাপরাসি আবার বলল, 'মহামান্যা কি তাকে অভ্যর্থনা করবেন?'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।। রাজকুমারী কোরানাকোভা

হাতলওলা চেয়ারটায় যুৎসই হয়ে বসে দিদিমা বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

রোগা, ছোটখাটো চেহারার মহিলাটির বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বছর। শুষ্ক চামড়া, বিরক্তিকর ধূসর সবুজ চোখ, চোখের দৃষ্টিতে অস্বীকৃত ঠোঁটের কোণে মৃদু সুখের হাসি। বেগুনী রঙের ওড়নায় ঢাকা উটের পালকে সাজানো হালকা লালচে চুল; মুখের ফ্যাকাশে রঙের তুলনায় ভুরু আর চোখের পাতা অতিরিক্ত লাল এবং উজ্জ্বল বলে মনে হল। তবু, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায়, ছোট দুটি হাত এবং সারা শরীরে এক বিচিত্র শুষ্কতা যে তার চেহারায় বেশ আভিজাত্য ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

রাজকুমারী এমনভাবে কথা বলে চললেন, যে মনে হল, তিনি সেই জাতের মানুষগুলোর অন্তর্ভুক্ত যারা কথা বলার সময় এমন ভান করে যে মনে হয় যেন কেউ তাদের বিরোধিতা করছে, কিন্তু আসলে কেউই তা করে না। তিনি একবার গলা সপ্তমে তুললেন, আবার পর মুহূর্তে তাকে নামিয়ে আনলেন খাদে।

তারপর, চারদিকে সবার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে, হঠাৎ নতুন উৎসাহে ঝড়ের মত বলে চললেন। এবং যারা সেই আলোচনায় অংশ নেয়নি, তাদের দিকে এমনভাবে চাইলেন যে মনে হল যেন তাদেরও সমর্থন পাওয়াটা তার কাছে খুবই জরুরী।

যদিও রাজকুমারী দিদিমার হাতে বারবার চুমু খাচ্ছিলেন, এবং বলছিলেন 'আমার চমৎকার কাকীমা' তবু লক্ষ্য করলাম দিদিমা তার ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নন। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকে তিনি শুনছিলেন, কী কারণে প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রাজকুমার মিখাইলো ব্যক্তিগতভাবে এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যেতে পারলেন না। রাজকুমারীর ফরাসীর উত্তরে তিনি জবাব দিচ্ছিলেন বিশুদ্ধ রাশিয়ানে।

তিনি বেশ কাটা শব্দে বললেন, 'আমার প্রতি তোমার এই ভালবাসার জন্য আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। দয়া করে আর রাজকুমার মিখাইলোর না আসার কথা তুলো না। সে সবসময়ই ব্যস্ত, তাছাড়া আমার মত এক অস্থিচর্মসার বৃদ্ধার কাছে সে আর আনন্দটাই বা পাবে কি?' এবং রাজকুমারীকে কোনরকম বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ না দিয়েই বললেন, 'তোমার বাচ্চারা ভাল আছে তো?'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, তারা ভালই আছে কাকীমা। ভালভাবেই বড় হচ্ছে; পড়াশুনো আর খেলাধূলো করছে—বিশেষতঃ ইটাইনী। ওই হচ্ছে সবার থেকে বড়, অথচ এমন দুষ্টু যে ভেবেই পাইনা কেমন করে সামলাব। তবে বেশ চালাক-চতুর আছে—এবং সম্ভাবনাপূর্ণও বটে। দেখ তো দাদা,' তিনি বাবার দিকে ফিরে বলতে চাইলেন, কারণ দিদিমা তার ছেলেমেয়ের সম্পর্কে কোন রকম ঔৎসুক্য দেখাবার পরিবর্তে নিজের নাতি-নাতনীদের নিয়ে গর্ব করার জন্য উন্মুখ হয়ে বাক্স থেকে আমার কবিতাগুলো বের করে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো খুলতে শুরু করে দিয়েছেন; তাই রাজকুমারী বাবার দিকে ঝুঁকে বললেন, 'একদিন সে কী এক কাণ্ড করে বসল!' তারপর একনাগাড়ে বলে চললেন সব বিচিত্র কাণ্ডকারখানা; এবং অবশেষে তার যখন সমাপ্তি ঘটল, যা আমি মোটেই শুনিনি, তখন বেশ জোরে হেসে তিনি বাবাকে বললেন, 'এ সম্পর্কে তুমি কি বল? ওকে চাবকানো উচিত; কিন্তু ও এমন সব মজার মজার দুষ্টুমি করে যে আমি শেষপর্যন্ত ক্ষমা না করে পারিনা।' এবং তারপর, কোন কথা না বলে দিদিমার দিকে তাকিয়ে তিনি একনাগাড়ে হেসে চললেন।

'তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের মারো?' বেশ অর্থপূর্ণভাবে ভ্রূ-জোড়া তুলে, 'মারো' শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন।

বাবার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে বেশ ভালমানুষির সুরে রাজকুমারী বললেন, 'হায় কাকীমা! এ সম্পর্কে আপনার মতামত তো আমার জানাই আছে। কিন্তু আমি দুঃখিত, আপনার সঙ্গে কিছুতেই আমি সহমত হতে পারবনা। বহু বই পড়ে, চিন্তা করে, উপদেশ শুনেও শেষ পর্যন্ত আমাকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়েছে যে, ছেলেমেয়েদের ভয় না দেখালে কিছুতেই তাদেরকে শাসনে রাখা যায় না। তাদের ঠিক পথে রাখতে হলে ভয় দেখাতেই হবে। তাই নয় কি, দাদা? তুমিই বলনা, ডাণ্ডা ছাড়া কি ছেলেমেয়েদের ঠিক রাখা যায়?' এই বলেই তিনি একবার আমাদের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, এবং আমার স্বীকার

করতে লজ্জা নেই, সেই মুহূর্তে আমি যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেছিলাম।

'আপনি যাই বলুন না কেন, বারো চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেদের নিতান্ত বাচ্চাই বলা যায়; অবশ্য ঐ বয়সের মেয়েদের কথা আলাদা।'

'কী ভাগ্য!' মনে মনে বললাম, 'ভাগ্যিস আমি ওর ছেলে নই।'

আমার কবিতার কাগজটা ভাঁজ করে বাক্সের নিচে রাখতে রাখতে দিদিমা বললেন, সবটাই বেশ চমৎকার হয়েছে।' তারপর, রাজকুমারীর মুখ থেকে যেন খুব একটা বিশ্রী কথা শুনেছেন, এমনভাবে বললেন, 'তা সবটাই বেশ ভাল; কিন্তু আমাকে বল তো, এসব কিছু ঘটবার পর তুমি কি করে আশা কর যে তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোমল অনুভূতি থাকবে?' এ প্রশ্নের তেমন কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাবেন না জেনেই যেন নিতান্ত আলোচনায় সমাপ্তি টানার উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাইহোক, প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার রয়েছে।'

রাজকুমারী এ কথার কোন উত্তর দিলেন না, তবে মৃদু হেসে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যেহেতু এ সংস্কারটা এমন একজনের, যাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাই কোন কথার প্রতিবাদ না করে চুপ করেই আছেন। তারপর বেশ আভিজাত্যপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, 'এবার বাচ্চাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন।'

আমরা উঠে দাঁড়ালাম, রাজকুমারীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ঠিক করতে পারলাম না, কি করে তাকে বুঝিয়ে দেব যে আমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে।

বাবা বললেন, 'রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা কর।'

ভোলোদিয়ার মাথায় চুমু খেয়ে রাজকুমারী বললেন, 'নিশ্চয়ই পিসিমাকে তোমরা ভালবাসবে, তাই না?' তারপর দিদিমাকে উদ্দেশ্য করে তির্যকভাবে বললেন, 'অবশ্য আমি নেহাতই দূর সম্পর্কের পিসি; তবে আমার কাছে রক্তের সম্পর্কের থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই বেশি মূল্যবান।'

দিদিমা তখনও তার ওপর বিরক্ত হয়েই আছেন। তাই বললেন, 'এ ধরণের সম্পর্ককে কি আজকাল আর কেউ দাম দেয় না?'

ভোলোদিয়াকে দেখিয়ে বাবা বললেন 'ও বড় হলে মস্তবড় বীর হবে' আর, আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ও হবে কবি।' আমি তখন রাজকুমারীর শুষ্ক হাতটাতে চুমু খাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি, এই হাতেই তো ডাণ্ডা থাকে, কঞ্চি থাকে, থাকে আরও কত কী!

আমার হাতটা ধরে রেখে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনটি?'

বাবা খুশির হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'মাথায় টেড়িওলা এই ছোট্ট বাবুটি।'

সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল বড় বিচিত্র। এমনকি কার্ল ইভানিচের মত মানুষকেও আমি দুনিয়ায় সব থেকে সুপুরুষ বলে মনে করতাম; তবে নিজের সম্পর্কে জানতাম যে দেখতে আমি মোটেই সুশ্রী নই। কিন্তু কেউ যদি আমার চেহারা নিয়ে বিন্দুমাত্র ঠাট্টা করত তাহলে মনে বড় আঘাত পেতাম।

আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন—তখন আমার বয়স মাত্র দু বছর—সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি, হঠাৎ আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা শুরু হল এবং মা আমার মুখে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করতে লেগে গেলেন। বললেন, আমার চোখ জোড়া নাকি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, তাছাড়া হাসিটাও বেশ মানানসই,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার যুক্তির ধাক্কায় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, না, আমাকে নিতান্ত সাদামাটাই দেখতে। অবশেষে, নৈশভোজের সমাপ্তিতে আমি যখন তাকে ধন্যবাদ জানালাম, তখন তিনি আমার চিবুকটা ধরে বললেন, 'মনে রেখো সোনা, তোমার মুখের জন্য তোমাকে কেউ ভালবাসবেনা। সুতরাং চেষ্টা করবে ভাল এবং চালাক হতে। কি হবে তো ?'

সেই কথাগুলো যে আমাকে শুধু এটুকুই বোঝাল যে আমি সুন্দর নই—তাই নয়, সে আমাকে এ সত্যও উপলব্ধি করতে বাধ্য করল যে ভবিষ্যতে আমাকে ভাল এবং চালাক—দুই-ই হতে হবে।

তবু মাঝে মাঝে বড্ড বেপরোয়া হয়ে যেতাম। মনে হত, সেই লোকের কপালে এ পৃথিবীতে মোটেই সুখ নেই যার নাকটা মোটা, ঠোঁট দুটো পাতলা, আর চোখ দুটো খুদে খুদে—ঠিক যেমন আমার ছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, যেন কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে তিনি আমাকে সুপুরুষে পরিণত করে দেন ; এবং তারজন্য আমি তাকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবকিছুই দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ রাজকুমার ইভান ইলিচ

কবিতা শোনার পর রাজকুমারী যখন লেখকের সুখ্যাতি করা শুরু করলেন, তখন দিদিমা তার ওপর এত সন্তুষ্ট হলেন যে রাশিয়ানের পরিবর্তে ফরাসীতে কথা বলতে লাগলেন এবং তাকে 'তুমি'র বদলে 'তুই' বলে সম্বোধন করলেন। বললেন, তিনি যেন আবার সন্ধ্যাবেলা তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। রাজকুমারী দিদিমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, এবং একটু পরেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দিদিমাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সেদিন এত মানুষের আগমন হল যে সারাদিনই বাড়ির সামনে ঘোড়ার গাড়ির ভিড় লেগে রইল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একজন বললেন, 'সুপ্রভাত বোনঝি।' তারপর দিদিমার হাতে চুমু খেলেন।

বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। লম্বা-চওড়া মানুষ, পরনে সামরিক পরিচ্ছদ, ঘাড়ের ওপর সৈন্যবাহিনীর বিশেষ কায়দার পোষাক, কলারের তলায় দৃশ্যমান ক্রুশ, আর মুখে অনাবিল শান্ত হাসি। তার সহজ স্বাধীন ভাবভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করল। মাথার চারপাশে সামান্য চুলের রেখা এবং ওপরের মাড়িতে দাঁতের যথেষ্ট ঘাটতি সত্ত্বেও তার মুখটা সত্যিই সুন্দর লাগছিল।

গত শতাব্দীর শেষদিকে, রাজকুমার ইভান ইলিচ যখন নিতান্তই যুবক, তখনই তিনি সৎচরিত্র, কন্দর্পকান্তি চেহারা, অসাধারণ সাহস, বলিষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী পরিবার এবং বিশেষতঃ সৌভাগ্যের জন্য যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হন। চাকরিতে বহাল থাকাকালীন মনের সমস্ত উচ্চাশা পুরোপুরি সফল হওয়ায় সে দিক থেকে আকাঙ্খা করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। ভাগ্য তাকে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, সেখানে আসার জন্য তিনি যৌবনেই নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। প্রতিটি উচ্চাকাঙ্খী জীবনেই যেমনটি হয়ে থাকে, তেমনি তার জীবনেও যে কখনও বিফলতা কিংবা নৈরাশ্য উপস্থিত হয়নি, তা নয় ; তবে তার শান্ত স্বভাব, চিন্তার বিশালতা, দৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে তিনি সে সবকিছুকেই অনায়াসে অতিক্রম করে সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন আপন দৃঢ়তা এবং সংহতি বোধের জন্য। তিনি এমন কিছু অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেননা, তবে

সেই অবস্থাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে হয়, যেখান থেকে জীবনের সব গোলমেলে ব্যাপারগুলোর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকানো সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে। তাছাড়া চরিত্রগতভাবেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং স্পর্শকাতর ; কিন্তু তার আচার ব্যবহারে তাকে কখনও মনে হত খুব ঠাণ্ডা আবার কখনও মনে হত বেশ কড়া। যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেখানে বহুলোকের সংস্পর্শে আসতে হত তাকে ; ফলে হাজার রকম সুযোগসন্ধানীর মোকাবিলাও করতে হত অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এবং সে থেকেই তার এই ঠাণ্ডামেজাজের উদ্ভব।

বেশ পড়ুয়া এবং কৃষ্টিবান মানুষ ছিলেন তিনি ; কিন্তু সেই কৃষ্টি অর্জন তার যৌবনেই, অর্থাৎ গত শতাব্দীর একেবারে শেষাশেষি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দর্শন এবং ভাষণ সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাষায় যত টিকা লেখা হয়েছিল, তার প্রায় প্রতিটিই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন ; তাছাড়া ফরাসী সাহিত্যের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার সঙ্গেই তার যোগাযোগ ঘটেছিল গভীরভাবে, ফলে কথায় কথায় তিনি রাসেঁ, কঁর্ণিল, বঁইলে, মঁলিয়ের, মন্টেগু এবং ফেনিলন থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন এবং তা দিতে ভালও বাসতেন। পৌরাণিক বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল চমৎকার। ফরাসী ভাষায় অনূদিত মহাকাব্যের প্রাচীন কীর্তিকাহিনীগুলো পড়ে তিনি সেগুলোকে বেশ কাজে লাগিয়েছিলেন ; তাছাড়া ইতিহাসেও যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন সেগারের বই পড়ে। কিন্তু গণিত, পদার্থবিদ্যা কিংবা সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই ছিলনা। গ্যেটে, শিলার এবং বায়রন সম্পর্কে ভদ্রভাবে চুপ করে থাকতেন, কিংবা বড়জোর দু চারটে চালু কথা বলতেন কিন্তু কখনও সেগুলো পড়েননি। ফরাসী এবং চিরায়ত সাহিত্য সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, যা প্রায় দেখাই যায় না, তিনি তাই করতেন—অথাৎ কখনও হামবড়া ভাব দেখাতেন না, আর তার ফলেই অনেক বিষয় সম্পর্কে যে তার অজ্ঞতা ছিল, তা কখনও ধরাই পড়ত না। তিনি সর্বদাই খামখেয়ালীপনাকে এজন্যই ঘেন্না করতেন যে ওটা ছিল নিতান্তই বাজেলোকদের অনুসৃত পন্থা। তাছাড়া সমাজের প্রয়োজনীয়তা ছিল তার কাছে অগাধ ; ফলে মস্কোতেই থাকুন কিংবা অন্য কোথাও —যেখানেই তিনি থেকেছেন সেখানেই জীবন কাটিয়েছেন সদাশয়ভাবে, এবং সে কারণেই যেখানেই গেছেন সেখানকার মানুষই তাকে আপন করে নিয়েছিল। সমাজে তার আসন ছিল এত উঁচুতে যে কেউ যদি কোনরকমে একবার তার কাছ থেকে কোন নিমন্ত্রণপত্র পেত তবে সেটা সে যে কারও বৈঠকখানায় ঢোকার ছাড়পত্র হিসেবে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হত না ; আর কত সুন্দরী যুবতী যে তাদের গোলাপী চিবুক তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল. এবং তাতে পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে চুম্বন করেছিলেন—তার কোন লেখাজোখা নেই। নানান ধরনের মানুষ, এমনকি বেশ হোমড়াচোমড়া লোকেরাও যদি তার পার্টিতে হাজির হওয়ার আমন্ত্রণ পেতেন, তাহলে তারাও মনে মনে খুশি না হয়ে পারতেন না।

দিদিমার মত একই বয়সী, একই শিক্ষাদীক্ষা, একই আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ তখন খুব একটা বেশি ছিল না। আর সে কারণে রাজকুমার তার বন্ধুত্বকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন, এবং শ্রদ্ধাও করতেন অগাধ।

রাজকুমারের দিকে আমি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারিনি। তাকে সবাই যে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাচ্ছিল, তার বিশাল স্কন্ধ-আবরণী. তাকে দেখামাত্র

দিদিমার খুশিতে উছলে ওঠা, এবং একমাত্র তিনিই যে তাকে ভয় করেননা এটা দেখাবার জন্য ঠাট্টা করে 'বুড়ো' বলে ডাকা—ইত্যাদি আমার মনে তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবকে জাগিয়ে তুলল। যদি তা বেশি নাও হয়, তবু দিদিমাকে আমি যতটা শ্রদ্ধাভক্তি করতাম ততটা তো বটেই। দিদিমা যখন তাকে আমার কবিতাগুচ্ছ দেখালেন, তখন তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, 'কে বলতে পারে যে এ-ই একদিন আর একজন দারজাভিন হয়ে উঠবে না?'

অতঃপর আমার চিবুকটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরলেন, এবং আমি তখন কেঁদে উঠলাম না শুধু এ কারণেই যে আমি বুঝলাম শুধুমাত্র আদর করার জন্যই তিনি অমনটা করছেন।

অতিথিরা চলে গেলেন, বাবা এবং ভোলোদিয়াও চলে গেল; শুধু রইলাম আমি, রাজকুমার আর দিদিমা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রাজকুমার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমাদের আদরের নাতালিয়া নিকোলায়েভনা এল না কেন?'

মাথা নুইয়ে, রাজকুমারের জামার আস্তিনে হাত দুটো রেখে দিদিমা বললেন, "নিশ্চয়ই সে আসত, যদি সে তার মর্জি মাফিক কাজ করার সুযোগ পেত। সে আমাকে জানিয়েছে, পিয়ারে নাকি তাকে আসার জন্য বলেছিল, কিন্তু সে আসতে অস্বীকার করেছে এ কারণে যে এ বছর তাদের কোন আয়ই হয়নি। সে লিখেছে, "সমস্ত ঘরগেরস্থালী সঙ্গে করে আমার মস্কো যাওয়ার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। লিউবোচকা এখনও খুবই ছোট, তাছাড়া ছেলেদের তোমার কাছে থাকাটা আমার নিজের কাছে থাকার থেকেও অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক।" বাঃ কী সুন্দর!' কথাটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি খুব খুশি নন। বললেন, 'ছেলেদের অনেক আগেই এখানে পাঠানো উচিত ছিল, তাতে তারা কিছু শিখতে পারত, এবং সমাজের সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত। গ্রামে সে সুযোগ কোথায়? ওদিকে বড়টার তো প্রায় তের বছর বয়স হতে চলল, পরেরটার এগার। দেখতেই পাচ্ছ এখনও কেমন গেঁয়ো; কিভাবে ঘরে ঢুকতে হয় তাও শেখেনি।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' রাজকুমার বললেন, 'সব সময় এই টানাটানির নালিশ জানানোর কারণটা কি? জামাইয়ের নিজেরই তো বেশ ভাল সম্পত্তি আছে, তাছাড়া নাতাশার খাবারোভকার সম্পত্তি, যেখানে তোমার সাথে একবার নাটক করেছিলাম, সেটা থেকে তো বেশ ভাল আয় হওয়ার কথা।'

দিদিমা দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বললেন, 'সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমার মনে হচ্ছে, এইসব কারণ আবিষ্কার করা হয়েছে শুধুমাত্র জামাইকে এখানে একা থাকার সুযোগ করে দেবার জন্য; সে যাতে ক্লাবে যেতে পারে, রেষ্টুরেন্টে যেতে পারে তারজন্য; এবং ভগবানই জানেন আর কী কী উদ্দেশ্যে! কিন্তু আশ্চর্য, সে কিছুতেই কিছু সন্দেহ করে না। তুমি তো জান, আমার মেয়ে কী ধরনের; জামাইকে সে অন্ধের মত ভালবাসে। জামাই তাকে বুঝিয়েছে যে ছেলেদের মস্কোতে নিয়ে আসাটা অতি জরুরী; আর তার গ্রামে সেই আকাট শিক্ষয়িত্রীটির কাছে থাকাটাই ঠিক; এবং আশ্চর্য, আমার মেয়ে তাই বিশ্বাস করেছে। যদি রাজকুমারী ভারভারার মত সে তাকে বলত যে ছেলেদের চাবুক দিয়ে মারাই ঠিক—তাহলে হয়ত সে তাও বিশ্বাস করে বসত।' দুঃখে মুখ

ভার করে, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে আবার বলে চললেন, 'আমি মাঝে মাঝেই ভাবি, সে আমার মেয়েকে বুঝতে তো পারেই না, এমন কি বোঝার চেষ্টাও করে না। তার সংগুণ ও ভালবাসা এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও—আমি ভালভাবেই জানি—সে কখনও তার স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে পারেনি। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তখন বোলো'—দিদিমা নিজের রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে নিলেন।

রাজকুমার তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, 'উঃ, দেখছি তোমার বুদ্ধি একটুও পাকেনি। তুমি সবসময়ই কিছু না কিছু একটা কাল্পনিক দুঃখে কষ্ট পাচ্ছই। তোমার নিজের এরজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। আমি তো তাকে বহুদিন ধরে চিনি। আমার তো মনে হয় স্বামী হিসেবে সে সত্যিই আদর্শ পুরুষ। তাছাড়া সব থেকে বড় কথা মানুষ হিসেবেও সে একজন সৎ এবং ভদ্রলোক।'

যে কথা আমার মোটেই শোনা উচিত নয়, তাই শুনলাম। শেষে পা টিপে টিপে—বেশ উত্তেজিত মনে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ইভিনরা

লোমশ কলারের নীল রঙের ওভারকোট গায়ে তিনটি ছেলেকে তাদের অল্পবয়সী ফুলবাবু মাস্টার মশাইটির সঙ্গে আসতে দেখে জানলার এধার থেকে চেঁচিয়ে বললাম, 'ভোলোদিয়া, ভোলোদিয়া, ওই দেখ ইভিনরা আসছে।'

ইভিনদের সঙ্গে আমাদের বেশ কুটুম্বিতা ছিল, তাছাড়া বয়সেও ওরা ছিল আমাদেরই সমবয়সী। মস্কোতে আসার পরই আমাদের সঙ্গে ওদের ভাব জমে ওঠে; তারপর তো রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে যায়।

ওদের মধ্যে দ্বিতীয়জন, সেরিওঝার মাথায় ছিল একরাশ কালো চুল, আর গায়ের রঙ ছিল ময়লা। লাল ঠোঁট দুটো দিয়ে সে সর্বদাই তার ওপরের পাটির উঁচু হয়ে থাকা দাঁতগুলোকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করত। তার চোখের রঙ ছিল বেশ নীলচে আর তাতে ছিল বেশ সতর্কতার ভাব। সে কখনও মিটমিটিয়ে হাসত না; হয় গম্ভীর থাকত, নয়ত আন্তরিকভাবে বেশ স্পষ্ট শব্দ করে হেসে উঠত। তার হাসিটা ছিল সত্যিই ছোঁয়াচে। তার অস্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি আমার মনে একটা দুর্বলতা জেগে ওঠে, তাকে দেখতে পেলেই আমি খুশি হয়ে উঠতাম। যদি কখনও একসঙ্গে তিন চারদিন তার সাথে দেখা না হত তাহলে এত বিশ্রী লাগত যে দুঃখে অনেক সময় কেঁদেই ফেলতাম। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে আমি যেন তাকেই দেখতাম। চোখ বুজলেই সে আমার কল্পনায় এসে উপস্থিত হত, এবং আমার এই অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে সে কথা কাউকে বিশ্বাস করে কখনও বলিওনি। অথচ সে যেন আমার থেকে ভোলোদিয়ার সঙ্গই কামনা করত বেশি। সম্ভবতঃ আমার চঞ্চল চোখের স্থিরদৃষ্টি তার কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর বলে বোধ হত। কিংবা এ-ও হতে পারে যে আমার প্রতি তার কোনরকমের মমতাই ছিলনা। কিন্তু তবু আমি তাকে দেখতাম, মনে মনে তৃপ্ত হতাম। কারণ, তার প্রতি তো আমার কোন কামনা ছিলনা, ছিলনা কোন বাসনা। বরং তারজন্য সবকিছুই আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম। যে উন্মত্ত আকর্ষণে সে আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা ছাড়াও তার উপস্থিতি আমার মনে একটা প্রচণ্ড ভয়ের সৃষ্টি করত—সে ভয় ছিল তাকে আঘাত করার, আহত করার, বিরক্ত করার। অবশ্য এই ভীতির সঙ্গে

ভালবাসার পরিমাণটাও ছিল প্রায় সমপর্যায়েরই। এবং এর কারণ সম্ভবতঃ ছিল এই যে, নিজের চেহারার প্রতি আমার মনে ছিল তীব্র অবজ্ঞা আর তার রাগী ভাবটার প্রতি আকর্ষণ। প্রথম যেদিন সে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল সেদিন আমি এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে তার কথার জবাবই দিতে পারিনি। কোন কিছু ভাবার সময় সে বিচিত্রভাবে চোখ মিটমিট করে নাক আর ভুরু কোঁচকাত। সবাই বলত অভ্যাসটা খুবই খারাপ; কিন্তু আশ্চর্য, কিছুদিনের মধ্যে আমি নিজেই তার অভ্যাসটাকে রপ্ত করে ফেললাম। ফলে কদিন যেতে না যেতেই দিদিমা জানতে চাইলেন, চোখে কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে কিনা, না হলে অমন করছি কেন? যদিও আমার মুখে কখনও কোন ভালবাসার শব্দ উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু সে যেন আমার দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়েছিল। ফলে শৈশবের নিশ্চিত সংঘর্ষে সে সেটাকে কাজে লাগাত। আমি তাকে সম্পূর্ণ হৃদয় উন্মুক্ত করে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তাকে মনে মনে এত ভয় পেতাম যে তার সামনে কখনও সহজ-ই হতে পারিনি। তবে মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে সমর্পণের ভঙ্গি করতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার ওপর তার প্রভাব শোষণের রূপ নিল, অথচ তা থেকে পালাবার ক্ষমতাই রইল না আমার।

সজীব, সুন্দর, স্বার্থহীন সেই অনুভূতির কথা মনে পড়লে আজও মনটা দুঃখে ভরে যায়। তাকে শুধু আমিই ভাল বেসেছিলাম, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই না পেয়ে আমার অনুভূতিও একদিন শুকিয়ে গেল।

যখন শিশু ছিলাম, তখন কেন যে বয়স্ক হতে চাইতাম, আর যখন বয়স্ক হয়েছি তখন কেন যে মন শিশু হতে চায়—তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা।

সেরিওঝার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনই ছেলেমানুষের মত ছিলনা। আমি তাকে অনুভূতির আকর্ষণে টেনে রাখতে চাইতাম। শুধু যে তাকে চুমু খাওয়ার ইচ্ছে হত তাই নয়, তার হাত ধরে বলতে পারলে খুশি হতাম যে, 'তোমায় দেখে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।' কিন্তু শেষপর্যন্ত তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি; এমনকি তাকে আমি তার পোশাকী নাম 'সের্গেই'এর পরিবর্তে সেরিওঝা বলেও কখনও ডাকতে সাহস পাইনি। তখনকার প্রতিটি অভিব্যক্তিই ছিল শিশুসুলভ, এবং সেগুলোর প্রকাশ সর্বদাই প্রমাণ করে দিত যে আমরা নিতান্তই শিশু। বড়রা একে অপরের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেন, সেই সতর্কতার নকল করতে গিয়ে আমরা তা তো পারিইনি, বরং মাঝখান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিলাম শিশুসুলভ কোমলতার আনন্দ লাভের হাত থেকে।

ছোট ঘরটাতে তাদের সঙ্গে দেখা করে, শুভেচ্ছার আদান-প্রদান সেরে দিদিমার কাছে গিয়ে তাদের আগমনের কথা এমন উৎসাহের সঙ্গে বললাম, যেন দিদিমা সে খবর পেয়ে আনন্দে নেচে উঠবেন। তারপর সেরিওঝার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই, তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার পিছু পিছু বৈঠকখানায় ঢুকলাম। এরপর দিদিমা যখন তাকে বললেন যে সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তখন আমি আমার অন্তরে সেই শিহরণ অনুভব করলাম, যা কিনা কোন চিত্রকর তার নিজের ছবির সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধাশীল বিচারকের মন্তব্য শোনার সময় করে থাকে।

ইভিনদের অল্প বয়স্ক শিক্ষকটি, দিদিমার অনুমতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বাগানে গিয়ে দুটো পায়ের মাঝখানে ব্রোঞ্জের মাথাওলা ছড়িটাকে দাঁড় করিয়ে সবুজ বেঞ্চিটায় বসে এমনভাবে সিগারেটে টান দিতে শুরু করলেন যে মনে হল তিনি সত্যি সত্যিই একজন সুখী মানুষ।

তার নাম হের ফ্রস্ট জাতিতে ছিলেন জার্মান ; তবে আমাদের শিক্ষক কার্ল ইভানিচের মত জার্মানদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, তিনি বিশুদ্ধ রাশিয়ান বলতেন, বাজে উচ্চারণে জোর দিয়ে ফরাসী বলতেন এবং ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতেই আনন্দ পেতেন বেশি, কারণ সেখানে তিনি বিদ্বান-হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তার লম্বা টাইতে লাগানো থাকত জ্বলজ্বলে টাই-পিন আর সেটা আটকে থাকত প্যান্টের ফিতেটার সাথে। প্যান্টটা ছিল বড় বড় দাগ-টানা। তৃতীয়তঃ, তিনি ছিলেন যুবক, তাছাড়া সুদর্শনও বটে। তার পেশীবহুল পা দুটো সত্যিই দেখবার মত ছিল, এবং এ কারণে তিনি যথেষ্ট গর্বও অনুভব করতেন। তিনি ভাবতেন ও দুটোর আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া কোন মহিলার পক্ষেই সম্ভব নয়, এবং সে কারণেই সে দুটোকে যতদূর সম্ভব প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। তাই যেখানেই বসতেন, কিংবা দাঁড়াতেন, সব সময়ই পা দুটোকে নাড়িয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন এমন এক রুশ-জার্মান যুবক, যিনি কিনা সর্বদাই হাসিখুশি এবং মেয়েদের মনের মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতেন।

বাগানে সময়টা বেশ আনন্দেই কাটালাম। এর আগে কোনদিনই ডাকাত ডাকাত খেলাটা তেমনটি আর জমেনি। কিন্তু ছোট্ট একটা ঘটনায় সবই বরবাদ হতে বসেছিল আর একটু হলে। সেরিওঝা ডাকাত সেজেছিল ; পথিকদের ধাওয়া করতে গিয়ে সে এমন জোরে ছুট লাগাল যে একটা গাছের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। আমি ভাবলাম বোধ হয় হাঁটুটাই গেল ভেঙ্গে। যদিও আমি ছিলাম সৈনিক, এবং তাকে ধরাই ছিল আমার কর্তব্য, তবু আমিই গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুব লেগেছে কিনা। আমার কথা শুনে সে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। হাতটা মুঠো করে পায়ের ওপর একটা ঘুসি মেরে চিৎকার করে উঠল, 'কি হয়েছে ? নির্বোধ কোথাকার, খেলাটাকেই মাটি করে দিলে ! এস, আমাকে ধর ! ধরছ না কেন ?' আড় চোখে ভোলোদিয়া আর বড় ইভিন, যারা পথিক সেজে ছুটে পালাচ্ছিল—তাদের দিকে তাকিয়ে সে বারবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে দৌড় লাগাল পথিকদের পেছনে।

তার সেই নায়ক-সুলভ আচরণে আমি যে সেদিন কী অসম্ভব মুগ্ধ হয়েছিলাম তা কিছুতেই ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে যে সেদিন শুধু কাঁদেইনি, তাই নয়, এমনকি সেটা কাউকে টের পেতেও দেয়নি ; বরং খেলাটার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

খানিক পরে ইলেনকা গ্রাপ যখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হল এবং খাওয়ার সময় পর্যন্ত খেলার জন্য আমরা দোতলায় গেলাম, তখন সেরিওঝা আবার এমন একটা বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার করল যে আমি আরও বেশি মুগ্ধ হলাম।

একদা আমার দাদুর কাছে যে বিদেশী মানুষটি আশ্রয় এবং উপকার পেয়েছিলেন, তারই ছেলে ছিল ইলেনকা। তিনি প্রায়ই ছেলেকে আমাদের কাছে পাঠানোটা একটা কর্তব্য বলে মনে করতেন। অবশ্য এরজন্য তিনি যদি এমন

কিছু ভেবে থাকতেন যে, আমাদের সঙ্গে মিশলেই তার ছেলের সম্মান বেড়ে যাবে তাহলে বলতে হয়, অবশ্যই তার ভুল হয়েছিল। কারণ, আমরা যে শুধু ইলেনকার সাথে বন্ধুত্ব করিনি, তাই নয়—বরং একমাত্র ঠাট্টা তামাসার মাধ্যম হিসেবেই তাকে সর্বদা ব্যবহার করেছি। তার বয়স ছিল বছর তের; লম্বা, রোগাটে চেহারা; পাখিদের মত পাণ্ডুর মুখ এবং তাতে একটা লাজুকতার ভাব থাকত সবসময়। যদিও তার পোশাক ছিল জীর্ণ, তবে মাথায় চুলের টেড়ির বাহার ছিল বেশ। তাকে দেখে আমরা বলতাম, রোদঝলমলে দিনে ওর মাথার সুগন্ধি তেল গলে গিয়ে জ্যাকেটের তলায় ঢুকে পড়ে। এখন বুঝতে পারি যে সে ছিল অত্যন্ত দয়ালু, ভদ্র এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিন তা বুঝিনি—তাই তাকে ভেবেছিলাম—ছোটলোক; এবং তাকে করুণা করা কিংবা তার কথা চিন্তা করাটাই মনে হয়েছিল অপ্রয়োজনীয়।

ডাকাত-ডাকাত খেলা শেষ হলে ওপরতলায় গিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের শারীরিক কসরত দেখানো শুরু করে দিলাম। মুখে প্রশংসার ভীরু হাসি হেসে ইলেনকা আমাদের সেই কসরত দেখতে লাগল। তারপর যখন বললাম যে, সেও এই কসরতে অংশ নিক, তখন সে আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এই বলে যে তার গায় তেমন জোর নেই। সেরিওঝাকে দেখাচ্ছিল বেশ চমৎকার। জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছিল সে। তার চিবুক আর চোখজোড়া বেশ চকচক্ করছিল। অফুরন্ত হেসে নানান নতুন কায়দা দেখাতে লাগল সে। একলাফে চেয়ারের ওপর উঠে গাড়ির চাকার মত গোল হয়ে গেল; মাথার ওপর তুলে নিল ভেতিশ্চেভের শব্দ কোষ—যেটা কিছুক্ষণ আগে ঘরের মাঝখানটাতে বেদীর মত করে রাখা ছিল। বারবার সে এমনভাবে লাফ মারছিল যে আমরা না হেসে থাকতে পারছিলাম না। তারপর কসরত বন্ধ করে, স্বভাবজ ভঙ্গিতে চোখ পিটপিটিয়ে বেশ ভদ্রমুখে এগিয়ে গেল ইলেনকার দিকে। তাকে বলল, 'আমি যেমনটি করলাম, তেমনটি কর দেখি। এটা খুব একটা অসুবিধের কিছু নয়।' তার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে গ্রাপের মুখ লাল হয়ে উঠল, সে ক্ষীণস্বরে বলল, তার পক্ষে ওটা করা সম্ভব নয়।

'ওর হলটা কি? ও কিছুই করতে চাইছে না কেন? তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ যে ও আগের জন্মে মেয়ে ছিল! ওর এখন উচিত মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো।' সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে হাত ধরে ওপর দিকে টান দিল।

ইলেনকাকে ঘিরে আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, 'হ্যাঁ, তোমাকে ওর মাথার ওপর দাঁড়াতেই হবে।' লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল, এবং সেই অবস্থাতেই আমরা তাকে টানতে টানতে শব্দকোষের দিকে নিয়ে গেলাম।

বলির পাঁঠার মত সে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমায় ছেড়ে দাও; যা করার আমি নিজেই করছি। তোমরা তো দেখছি আমার জ্যাকেটটা ছিঁড়েই দেবে!' কিন্তু তার সেই আর্তনাদ আমাদের আরও বেশি উৎসাহিত করে তুলল। আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম আর তার জ্যাকেটটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলাম।

ভোলোদিয়া আর বড় ইভিন তার মাথাটাকে নুইয়ে চেপে ধরল শব্দকোষের ওপর এবং আমি আর সেরিওঝা বেচারার রোগা পা দুটোকে তুলে ধরলাম শূন্যে। পা দুটো সে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ছিল। আমরা জোর করে তার প্যান্ট গুটিয়ে দিলাম হাঁটু পর্যন্ত এবং হো হো করে হাসতে লাগলাম। ছোট ইভিন পা দুটোকে শূন্যে ঝুলিয়ে সমতা রাখার চেষ্টা করে চলল।

হঠাৎ আমাদের হাসি থেমে গেল, সবাই চুপ করলাম, শুধু হতভাগ্য গ্রাপের নিঃশ্বাসের আওয়াজ হতে লাগল। আমি সেই মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না যে ওগুলোও আমাদের হাসি এবং মজা করার উপযুক্ত বিষয় কিনা।

সেরিওঝা ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'এখন বেশ খাসা আদমী হয়েছে।'

ইলেনকা চুপ করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় চারদিকে পা ছুঁড়ে চলেছিল। ফলে হঠাৎ সেরিওঝার চোখে একটা লাথি লেগে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে ইলেনকার পা ছেড়ে দিল, আর তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু এবং দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ইলেনকাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। যেহেতু আমরাও তখন আমাদের হাত সরিয়ে নিয়েছি, তাই সেরিওঝার ধাক্কা খেয়ে বেচারা ইলেনকা ছিটকে পড়ল মাটিতে, এবং সজল নেত্রে যেন বলতে চাইল, 'কেন তোমরা আমাকে এভাবে জ্বালাচ্ছ?'

বেচারা ইলেনকার করুণ চেহারা, মুখভর্তি অশ্রুরেখা, দোমড়ানো প্যান্টের নিচে দৃশ্যমান নোংরা বুট পরা পা যেন আমাদের সংযত করতে বাধ্য করল; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের কৃত্রিম হাসি হেসেই চললাম।

সেরিওঝাই প্রথমে নিজেকে সংযত করল। পা দিয়ে সামান্য ঠেলে বলল, 'এই হাঁদারাম ছিঁচকাঁদুনে, তুই ঠাট্টাও বুঝিস না? নে, অনেক হয়েছে, এবার ওঠ।'

বেশ রেগে, ঘুরে গিয়ে একটা প্রচণ্ড হেঁচকি তুলে ইলেনকা বলল, 'নোংরা, বদমাশ ছেলে কোথাকার!'

শব্দকোষটা হাতে নিয়ে, সেটাকে ইলেনকার মাথার ওপর দোলাতে দোলাতে সেরিওঝা চিৎকার করতে লাগল, 'কী! একে তো একবার লাথি মারলি, তার ওপর আবার এমন গালাগালি দিচ্ছিস!' ছেলেটা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে সে কথা না ভেবেই হাত দুটো তুলে নিজের মাথাটা ঢাকল। সেদিকে চেয়ে সেরিওঝা বেশ জোরে হেসে উঠে বলল, 'নে, ওগুলো তুলেনে। ওকে ছেড়ে দে। হাঁদারাম ঠাট্টাও বোঝে না।'

বেচারার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। শব্দকোষটার আড়ালে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে এমন ভাবে সে ফুঁপিয়ে কেঁপে কেঁপে কাঁদছিল যে আমার মনে হচ্ছিল হয়ত ও কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

'ওঃ সের্গেই,' আমি বললাম, 'তুমি অমন করছ কেন?'

'করছি, কারণ এটা করা ভাল। কৈ, আমি তো কাঁদিনি, কেঁদেছি কি, যখন আমার হাঁটুটা প্রায় হাড় পর্যন্ত কেটে গিয়েছিল?'

'সেটা ঠিকই,' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'ইলেনকা সত্যিই একটা ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলে। সেরিওঝা, এখন তোমার পেছনে রয়েছে একজন সাহসী অনুগামী।'

ইলেনকা সম্ভবতঃ ভয় এবং যন্ত্রণার জন্য যতটা না কাঁদছিল, তার থেকে বেশি কাঁদছিল এই ভেবে যে, যে পাঁচটি ছেলেকে সে মনে-প্রাণে ভালবেসেছে তারাই কিনা শেষে তাকে এমন হেনস্তা করল!

আমার ব্যবহারের নিষ্ঠুরতার কারণ আমি নিজেকেই বোঝাতে পারি না। ভেবেই পাই না, কেন আমি সেদিন তার কাছে এগিয়ে গেলাম না, কেন তাকে রক্ষা করলাম না, কেন তাকে সান্ত্বনা দিলাম না? যে মর্মস্পর্শী অনুভূতির জন্য

একদিন আমি রবিন পাখির ছানাকে তার ছোট্ট নীড় থেকে পড়ে যেতে দেখে কেঁদে উঠেছিলাম, কুকুর ছানাকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে চোখে জল এসেছিল, আর রান্নার জন্য মুরগি নিয়ে যেতে দেখে ব্যথা পেয়েছিলাম—সেই আমিই ইলেনকার দুর্ভোগ দেখে চুপ করে রইলাম কিভাবে? সেরিওঝার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাই কি ছিল এর কারণ? তার সামনে তার মত হয়ে থাকার ইচ্ছে থেকেই কি এর জন্ম নয়? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বলতে হয়, সেটা খুব দোষনীয় ছিল না। তবু, এগুলোই হচ্ছে আমার শৈশবের স্মৃতিতে সব থেকে উজ্জ্বল কলঙ্ক চিহ্ন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ আমাদের অতিথিরা

ভাঁড়ার-ঘরে অস্বাভাবিক কর্ম তৎপরতা, চারদিকে আলোর রোশনাই, বৈঠকখানায় নতুন নতুন বস্তুর সমাবেশ, এবং রাজকুমার ইভানিচ প্রেরিত বাদকবৃন্দের আগমনে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে সেই সন্ধ্যাতেই আমাদের বাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে।

বাড়ির সামনা দিয়ে অতিক্রমকারী প্রতিটি ঘোড়া গাড়ির আওয়াজে ছুটে গিয়ে কাঁচের জানলায় নাকটা চেপে ধরে বাইরের দিকে দেখতে লাগলাম অসীম কৌতূহলে। অন্ধকারে প্রথম প্রথম দৃষ্টি আটকে রইল, তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাস্তার পরপারে টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলা পরিচিত দোকানটা, নিচের তলার আলোকিত জানলা দুটো নিয়ে বিরাট বাড়িটা যেন ছোট হয়ে গেল, রাস্তার মাঝ বরাবর দুজন যাত্রীসহ, অথবা খালি গাড়ি এগিয়ে চলল অতি ধীরে ধীরে। অবশেষে একটা যাত্রী গাড়ি প্রবেশ করল আমাদের বাড়ির চত্বরে। ভাবলাম, এ নিশ্চয়ই ইভিনরা; কারণ ওরা আমাদের কথা দিয়েছিল যে, একটু তাড়াতাড়িই আসবে। তাই প্রবেশ পথেই ওদের সঙ্গে দেখা করব বলে ছুটে গেলাম। কিন্তু দেখলাম, এক তকমা আঁটা চাকরের পেছন পেছন দুজন অপরিচিতা ঢুকলেন। তাদের একজন বেশ লম্বা; পরিধানে ধূসর রঙের কলারওলা নীল জামা; অপর জন দেখতে ছোটখাটো—সর্বাঙ্গ সবুজ চাদরে ঢাকা—শুধু ফারের বুটে মোড়া পা দুটো দেখা যাচ্ছিল। যদিও আমি ভেবেছিলাম যে তাদের অভিনন্দিত করাটা আমার কর্তব্য, কিন্তু দেখলাম আমার প্রতি কোনরকমের ভ্রূক্ষেপ না করেই তারা এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর বড়জন ছোট জনের মাথার রুমাল, ওপরের জামা এবং জুতোজোড়া খুলে নিয়ে যখন চাকরের হাতে দিলেন তখন দেখলাম, এতক্ষণ ঐ সবে যে আচ্ছাদিত হয়েছিল, সে একটি নিতান্তই বার বছরের ফুটফুটে মেয়ে। তার পরনে ফ্রক, সাদা ঢিলে ইজের, পায়ে চপ্পল। ছোট্ট ধবধবে ঘাড়টার ওপর ঝুলছিল কালো ভেলভেটের ফিতে; আর মাথায় বাদামের গুচ্ছের মত এক ঝাঁক কালো চুল—তার সুন্দর মুখটার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। চুলগুলো পেছন দিকে ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে থাকাতে তাকে দেখাচ্ছিল যেন আরও সুন্দর। তখন যদি স্বয়ং কার্ল ইভানিচও আমাকে বলতেন যে, সকাল থেকেই গরম শিক দিয়ে ওগুলোকে কোঁচকাবার ব্যবস্থা করা হয় শুধুমাত্র 'মস্কো গেজেট'এ খবর হবার জন্য, তা হলেও আমি সে কথা বিশ্বাস করতাম না। আমার মনে হয়েছিল, ঐ কুঞ্চিত কেশদাম নিয়েই যেন সে জন্মেছে।

তার মুখমণ্ডলের মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল দুটো বড় বড় আধবোজা চোখ, যা তার ঠোঁটের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গিয়েছিল। তার ঠোঁটদুটো ছিল

পরস্পরে সংবদ্ধ, আর দৃষ্টি ছিল ভীষণ আকর্ষণীয়—এবং সবকিছু মিলে তার মুখে এমন একটা ভাব জেগে উঠেছিল, যে সহজে সেদিকে তাকানো সম্ভব ছিল না—ফলে তার মধুর হাসি আরও মধুর বলে মনে হচ্ছিল আমার।

অতিথিরা যে এসে গেছেন, সেটা যেন বুঝতেই পারিনি, এমন ভান করে বড় হলঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করা শুরু করে দিলাম। তারপর, তারাও সে ঘরে আসাতে, এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বললাম যে, দিদিমা বৈঠকখানায় রয়েছেন। সাথে সাথে শ্রীমতী ভালাখিনা হেসে আমাকে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। তার মুখের সঙ্গে তার মেয়ে সোনেচকার মুখের সাদৃশ্য থাকাতে তার হাসিমুখটা সত্যিই আমার কাছে খুব ভাল লাগল।

সোনেচকাকে দেখে দিদিমা বেশ খুশি হলেন। তিনি তাকে কাছে ডেকে, তার কপালে লুটিয়ে থাকা একগুচ্ছ চুলকে সরিয়ে দিয়ে, তার মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী চমৎকার মেয়ে!' সোনেচকা লজ্জিত হাসি হাসল, তা দেখে আমিও লজ্জা পেলাম।

দিদিমা তার চিবুকটা ধরে মুখটাকে উঠিয়ে বললেন, 'আশা করি, এখানে তোমার খারাপ লাগবে না। যেমন খুশি আনন্দ কর, নাচ।' তারপর আমার গায়ে হাত দিয়ে শ্রীমতী ভালাখিনার দিকে ফিরে বললেন, 'তা হলে ইতিমধ্যে এখানে দুজন ভদ্রমহিলা এবং একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হয়েছেন।' এভাবে আমাদের দুজনকে কাছাকাছি টেনে আনাতে আমি সত্যিই খুশি হলাম।

আমার লজ্জা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, বাইরে গাড়ি আসার শব্দ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। প্রবেশ পথের ঘরটায় রাজকুমারী কোরনাকোভা এবং তার ছেলে ও একগাদা মেয়েকে দেখতে পেলাম। তাদের প্রত্যেকেরই মুখের আদল একেবারে রাজকুমারীর মত—কুৎসিত; কারও দিকে মুখ ফিরে তাকাবার মত নয়। ওপরের জামা খুলে, ঘাগরা নাড়িয়ে ওরা নিজেদের মধ্যেই বেশ ফিসফাস করে, হেসে কথা বলা শুরু করে দিল। ইটেইনীকে দেখে মনে হল, তার বয়স হবে বছর পনের। লম্বা, মাংসল দেহ, রক্তহীন মুখ, ফোলা ফোলা নীল চোখ, আর বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত বড় সাইজের হাত পা। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল যে সে সেই ধরনের ছেলে যাকে নিয়মিত চাবকানো হয়।

আমরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অপরকে ভালভাবে পরখ করে নিলাম। তারপর নিজেই এগিয়ে গেলাম অভিনন্দন জানাতে, কিন্তু পরস্পরের চোখে চোখ রেখে হঠাৎ মনটা পালটে ফেললাম দুজনেই। পাশ দিয়ে স্কার্টের খসখসানির আওয়াজ তুলে মেয়েরা এবং মা চলে গেলেন। এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'গাড়িতে খুব ভিড় হয়েছিল নিশ্চয়?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল সে, 'আমি জানিনা; কারণ আমি কখনও গাড়ির ভেতর চড়িই না; কেননা তাতে আমার অস্বস্তি লাগে—মা তা জানেনও। যদি কোনদিন সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাইও, তাহলে আমি কোচোয়ানের পাশেই বসি। এতে মজা অনেক বেশি, কারণ সবকিছুই নজরে পড়ে। তাছাড়া প্রায়ই ফিলিপ আমাকে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয়, এমনকি চাবুকও। আবার রাস্তার লোকেরা হয়ত কখনও কখনও সেটাকে ধরেও ফেলে। সত্যিই, কী মজা!'

হঠাৎ গাড়ির চাপরাসি এসে বলল, 'বড় খোকাবাবু, ফিলিপ জানতে চাইছে,

চাবুকটা আপনি কোথায় রেখেছেন ?'

'কেন, সেটা তো আমি তার হাতেই দিলাম।'

'কিন্তু সে বলছে যে, আপনি নাকি তা দেননি।'

'তাহলে সেটা হয়ত বাতিটার ওখানে ঝুলিয়ে দিয়েছি।'

'ফিলিপ বলছে যে সেটা নাকি সেখানেও নেই। তার চেয়ে ভাল হয় যদি আপনি স্বীকার করেন যে ওটা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন ; না হলে ফিলিপকে নিজের গাঁটগচ্ছা দিয়ে আপনার ভুলের মাসুল গুণতে হবে।' বেশ রাগত স্বরে কথাগুলো বলল সে।

তাকে দেখে যথেষ্ট মান্যগণ্য অথচ বিষণ্ণ লোক বলে মনে হল আমার। বুঝলাম, সে ফিলিপের পক্ষ অবলম্বন করতে আগ্রহী এবং যেভাবেই হোক ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। যেন কোন কথা কানেই যায়নি, এমন ভান করে আমি ওদের কাছ থেকে দূরে সরে এলাম, কিন্তু চাকরবাকরের দল বেশ কৌতূহলী হয়ে ওদের চারপাশে জড়ো হল এবং সমর্থনের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ চাপরাসিটির দিকে চেয়ে রইল।

ইটেনী কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আমিই হারিয়েছি ; তাতে কি হল ? চাবুকটার আর এমন কি দাম—আমিই পয়সাটা দিয়ে দেব। বাঃ ভারী মজা তো !' তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলল।

'মাফ করবেন, তবু জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে পয়সাটা দেবেন কিভাবে ? আমার তো জানাই আছে, মারিয়া ভাসিলিয়েভনার মাত্র কুড়ি কোপেক কেমন-ভাবে শোধ করছেন গত আট মাস ধরে, সুতরাং আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হবে—আর পেত্রুস্কার ক্ষেত্রে তো প্রায় দু বছর হতে চলল—'

রাগে লাল হয়ে ছোট রাজকুমার চিৎকার করে উঠল, 'চোপরাও ; কিভাবে দেব সেটা আমিই বলব।'

মুখ বিকৃত করে চাপরাসি বলল, 'আপনি বলবেন !' তারপর আমরা যখন বৈঠকখানায় ঢুকছি তখন জামাকাপড়গুলো নিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'লজ্জার কথা !'

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন সায় দিয়ে বলল, 'সেই ভাল, সেই ভাল।'

দিদিমার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, দ্বিতীয় পুরুষের একবচন ও বহুবচন ব্যবহার করে মন্তব্য করার। আমরা সাধারণতঃ 'তুমি' এবং 'তোরা' শব্দ দুটো যে অর্থে ব্যবহার করি, তিনি কখনই তা করতেন না ; করতেন একেবারে বিপরীত অর্থে। তার ব্যবহারে ঐ শব্দগুলোও যেন এক বিশেষ অর্থ লাভ করেছিল। ছোট রাজকুমার তার সামনে যেতেই তিনি তাকে তুমি বলে এমন কয়েকটা শব্দে আপ্যায়িত করলেন, যে তার পরিবর্তে যদি আমি সেখানে থাকতাম তাহলে লজ্জায় আর মাথাই তুলতে পারতাম না। কিন্তু ইটেনী সে ধরনের ছেলেই ছিল না : সে যে শুধু দিদিমার কথা কানেই তুলল না, তাই নয়, বরং তার উপস্থিতিতেই সবাইকে বেশ আভিজাত্যপূর্ণভাবে না হলেও, অন্ততঃ যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবে অভিনন্দন জানাল।

সোনেচকা আমার সমস্ত মনযোগ কেড়ে নিয়েছিল। মনে আছে, ভোলোদিয়া ইটেনী এবং আমি ঘরের যে কোণটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম সেখান থেকে দেখতে

পাচ্ছিলাম, সোনেচকা আমাদের দেখছিল এবং কথা শুনছিল। আমি ইচ্ছাকৃত-ভাবেই বেশ জোরে জোরে কথা বলছিলাম, এবং হাসছিলাম যাতে সে তা শুনতে পায়—আর বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু দরজার কাছ থেকে সে সরে যেতেই আমার গলার স্বর স্বাভাবিকভাবেই নেমে গেল—কথাবার্তায় যেন আর কোন উৎসাহই পেলাম না।

বৈঠকখানা আর সাজ-কক্ষ ধীরে ধীরে অতিথিতে পূর্ণ হয়ে গেল। সব শিশুদের জমায়েতেই যেমন মনে হয়ে থাকে, তেমনি আমাদের সঙ্গেও বেশ কিছু বয়স্ক শিশু এসে জুটল, যারা নাচ, গান আর হৈ-হল্লা করার কোন সুযোগকেই হাতছাড়া করতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু তারজন্য এমন ভান করছিল যে মনে হচ্ছিল যেন নিমন্ত্রণকারীদের খুশি করার জন্যই তারা ও-সব করতে বাধ্য হচ্ছে।

তারপর ইভিনরা যখন এসে পৌঁছল, তখন সেরিওঝাকে দেখতে পেলে আগে যেমন আনন্দিত হতাম, তার পরিবর্তে তার প্রতি এই ভেবে বিরক্তি জাগল যে এখন সে সোনেচকাকে দেখবে, এবং সোনেচকাও দেখবে তাকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।। মাজুরকার আগে

বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এসে, পকেট থেকে একজোড়া নতুন দস্তানা বের করতে করতে সেরিওঝা বলল, 'মনে হচ্ছে তোমরা নাচতে যাচ্ছ। ঠিক আছে, আমি তাহলে দস্তানাটা পরে নিই।'

'এবার আমরা কি করি? আমাদের তো দস্তানা নেই;' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'ঠিক আছে, ওপরতলায় গিয়ে খুঁজে দেখি।'

আলমারির প্রত্যেকটা খুপরি খুঁজেও একটা সবজে মিটেন আর একটা ছোট দস্তানা ছাড়া অন্যকিছু চোখে পড়ল না। ও দুটোর কোনটাই আমার কাজে লাগার নয়। প্রথমতঃ, সেটা ছিল পুরনো, মুখ বন্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, সাইজে বিরাট, এবং বিশেষতঃ অনেকদিন আগে কার্ল ইভানিচের কাঁচি চালাবার ফলে একটা অঙ্গুলি বিহীন। তবু সেটাই পরে নিলাম; এবং যে আঙুলে সর্বদা কালি লেগে থাকত সে আঙুলটাই বের হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবলাম, 'যদি আজ এখানে নাতালিয়া থাকত, তাহলে সে যেভাবেই হোক, একটা না একটা দস্তানা আমাকে খুঁজে বের করে দিতই।' ওগুলো ছাড়া আমার পক্ষে নিচে যাওয়াটাই অসম্ভব বলে মনে হল; কারণ, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেন আমি নাচছিনা, তাহলে তাকে কি জবাব দেব? আবার ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও অসম্ভব বোধ হল। কারণ, তাহলেই আমাকে খোঁজা শুরু হবে। সুতরাং কি করব?

ভোলোদিয়া দৌড়ে ভেতরে এসে বলল, 'এখানে কি করছিস? ওদিকে তো নাচ শুরু হয়ে গেল। যার সাথে নাচবি ঠিক করে ফেল।'

নোংরা দস্তানাটার ভেতর থেকে বের হওয়া আঙুল দুটো সহ হাতটা দেখিয়ে বললাম, 'ভোলোদিয়া, তুমি তো এটা পড়তে ভুলেই গেছ।'

অধৈর্যভাবে সে বলল, 'কি? দস্তানা! ও। ঠিকই তো, আমাদের তো একটাও নেই। যাই, দিদিমাকে জিজ্ঞেস করি গিয়ে, তিনি এ ব্যাপারে কি ভাবছেন?' এবং তারপরই ছুট লাগাল নিচের তলায়।

এতবড় একটা বিষয়ে তার এমন উদাসীনতা দেখে আশ্চর্য হয়ে বৈঠকখানায়

গেলাম সেই ছেঁড়া আঙুলসহ দস্তানাটা পরে। সন্তর্পণে দিদিমার আরাম কেদারাটার কাছে গিয়ে, খুব হালকাভাবে তার ঢিলে জামাটায় টান দিয়ে বেশ ফিসফিসিয়ে বললাম, 'দিদিমা, এখন আমরা কি করব? আমাদের তো দস্তানা নেই!'

'কি, সোনা?'

দুটো হাত চেয়ারের হাতলে রেখে, তার দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে আবার বললাম, 'আমাদের দস্তানা নেই।'

হঠাৎ আমার বাঁ হাতটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে এটা কি?' তারপর শ্রীমতী ভালাখিনার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখ, দেখ, এই খুদে বাবুটি নিজেকে কেমনভাবে সাজিয়েছে তোমার মেয়ের সঙ্গে নাচবে বলে।'

দিদিমা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রইলেন, এবং গম্ভীরভাবে অতিথিদের নিরীক্ষণ করলেন যতক্ষণ না সবার কৌতূহল মিটল আর হাসিটা স্বাভাবিক হল।

সেরিওঝা যদি দেখে ফেলে সেই লজ্জায় আমি প্রাণপণশক্তিতে দিদিমার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, এবং সোনেচকা তাই দেখে চোখে জল না আসা পর্যন্ত যদিও হেসেই চলল মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলোকে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে কিন্তু তবু আমি তাতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করলাম না। কারণ, আমার মনে হল তার হাসিতে যে স্বাভাবিকতা রয়েছে, তা কিছুতেই ঠাট্টা হতে পারে না। বরং আমিও তার সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিলাম, ফলে দুজনেই যেন দুজনার আরও কাছাকাছি এলাম। যদিও এ ব্যাপারটা খারাপভাবে শেষ হতে পারত, কিন্তু আমার স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য তা তো হলই না, বরং যে বৈঠকখানা মহলটা আগে বেশ অস্বস্তিকর জায়গা বলে মনে হত, তা যেন আর মনেই হল না। এরপর যখন নাচ ঘরে গেলাম তখন বিন্দুমাত্র সংকোচও তার উপলব্ধি করলাম না।

অপরে তার সম্পর্কে কি ভাবছে, সেই চিন্তার অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষের মনে সাধারণতঃ সংকোচের উদ্ভব হয়। কিন্তু যখনই সেই মতামতটা, ভাল হোক কিংবা মন্দই হোক, স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন আর কোন সংকোচই থাকে না।

আমার ঠিক বিপরীত দিকে কুঁজো রাজকুমারটির সাথে ফরাসী কোয়াড্রিল নৃত্যরতা সোনেচকাকে সত্যি কী অপূর্ব দেখাচ্ছিল। পালাক্রমে আমার হাতে হাত দেবার সময় তার মুখের হাসির কোন তুলনাই ছিলনা। তার সোনালী চুলের সংযত দোলুনি, দুটো পায়ের মৃদুমন্দ মিলন—সে যেন এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। পঞ্চম মুদ্রায় আমার সঙ্গি যখন আমাকে ছেড়ে অপরপ্রান্তে চলে গেল, এবং আমি আমার তাল ঠিক রাখার জন্য ঠোঁট নাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, তখন দেখলাম ঠোঁট দুটো বন্ধ করে বেশ গম্ভীরভাবে সোনেচকা আশে পাশে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমার জন্য তার এই ভীতির কোন প্রয়োজনই ছিলনা। কারণ, আমি বেশ সাহসের সঙ্গেই সামনের দিকে তালে তাল দিয়ে এগোচ্ছিলাম, আবার সময় মত পেছনের দিকেও সরে আসছিলাম; এভাবে যখন তার কাছাকাছি চলে গেলাম, তখন খেলাচ্ছলে দস্তানার মধ্য থেকে বের হয়ে থাকা আঙুল দুটো তাকে দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে হাসিতে ফেটে পড়ল, আর তার ছোট্ট পা দুটো মোম লাগানো মেঝেতে আগের থেকে অনেক বেশি দ্রুত তালে নড়াচড়া শুরু করল। আজও মনে আছে, আমরা যখন হাত ধরাধরি করে বৃত্ত রচনা করলাম তখন, সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে

হাতখানা না ছাড়িয়েই সে কী চমৎকারভাবে দস্তানা দিয়ে তার নাকটাকে মুছে নিল! এসব যেন সেদিনের ঘটনা—এমনিভাবে এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আজও আমি শুনতে পাই সেই 'দানিয়ুব কুমারী' থেকে কোয়াড্রিল নাচের বাজনা—মনে হয় তা যেন এখনও বেজে চলেছে।

দ্বিতীয় কোয়াড্রিলটা আমি কেবলমাত্র সোনেচকার সাথেই নাচলাম। তবু বিরতির সময় আমরা যখন পাশাপাশি বসলাম, তখন খুব বিব্রত বোধ করলাম, এবং ঠিকই করে উঠতে পারলাম না যে তাকে কি বলব। যখন নীরবতাটা বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হল, তখন আমার নিজেরই ভয় করতে লাগল এই ভেবে যে সে হয়ত আমাকে নির্বোধ ঠাউড়ে বসবে; তাই সেই ভুলের গহ্বর থেকে তাকে তুলে আনার জন্য বললাম, 'তুমি কি মস্কোতেই থাক?' তার কাছ থেকে সম্মতিসূচক উত্তর পাবার পর বললাম, 'এখন পর্যন্ত রাজধানীটা তো আমার দেখাই হয়ে ওঠেনি।' এবং তার ওপর 'এখন পর্যন্ত' শব্দটার কি প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা দেখার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। যদিও বুঝলাম শুরুটা বেশ ভালই হয়েছে, এবং ফরাসী ভাষায় যে আমার দখল রয়েছে, সেটাও প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আমার পক্ষে ওভাবে কথা চালিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব হলনা। ওদিকে আবার নাচ শুরুও হচ্ছেনা কিছুতেই; ফলে আবার সেই কঠিন নীরবতা। আমার সম্পর্কে তার মনে কি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা জানার জন্য বেশ অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে চাইলাম তার দিকে। মনে হয় সেও ব্যাপারটা বুঝল, তাই হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'এ রকম অদ্ভুত একটা দস্তানা যোগাড় করলে কোথা থেকে?' তার প্রশ্নে আমি যেন নীরবতার কারাগার থেকে মুক্তি পেলাম। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললাম যে, ওটা আমার নয়, কার্ল ইভানিচের। আরও বললাম, কার্ল ইভানিচকে মাথার লাল টুপিটা খোলা অবস্থায় কেমন বিচিত্র দেখতে লাগে; কেমনভাবে তিনি একবার সবুজ ওভারকোটটা পরে থাকা অবস্থায় ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন খানাখন্দে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আমাদের অলক্ষ্যেই কোয়াড্রিল শেষ হয়ে গিয়েছিল। সব ব্যাপারটা সত্যি সত্যি বেশ আনন্দদায়ক ছিল, কিন্তু সেদিন কেন যে আমি কার্ল ইভানিচকে নিয়ে মজা করেছিলাম তা আমার আজও বোধগম্য নয়। তার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল, সেভাবে যদি তার বর্ণনা দিতাম তাহলে কি সোনেচকা আমাকে ভালবাসত না?

কোয়াড্রিল শেষ হওয়ার পর সোনেচকা আমাকে এমনভাবে ধন্যবাদ জানাল যে আমার মনে হল, যেন সত্যি সত্যিই তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য ছিল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম, এবং বুঝতেই পারলাম না যে কখন আমার হৃদয় অসীম সাহস এবং দৃঢ়তায় পূর্ণ হয়ে গেছে। এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে ভাবলাম, 'এরপর আর কোন কিছুতেই লজ্জা পাবনা, এখন থেকে সব কিছুর জন্যই আমি প্রস্তুত।'

সেরিওঝা আমাকে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে বলল। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমার কোন সঙ্গিনী নেই, তবে আমি একজনকে ঠিকই খুঁজে নেব।' তারপর ঘরের চারকোণায় দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম, একমাত্র বৈঠকখানায় ঢোকার দরজার কাছটায় দাঁড়ানো একটি যুবতী মেয়ে ছাড়া আর সবাই যে যার সঙ্গি বেছে নিয়েছে। তখন ঠিক করলাম, তাকেই আমার সঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান জানাব;

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বেশ জোয়ান একটি লোক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে তার সঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান জানালেন। যদিও আমি ছিলাম হলঘরের একেবারে অপর প্রান্তে, তবু মুহূর্তের মধ্যে মোম-ঘষা মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলাম, এবং আমার সঙ্গে নাচবার জন্য বেশ গম্ভীর স্বরে তাকে আহ্বান জানালাম। যুবতী মেয়েটি মৃদু সম্মতির হাসি হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, এবং যুবকটি হলেন সঙ্গিনীবিহীন।

নিজের ওপর আমার এত বেশি আত্মবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আশাহত যুবকটির মুখের দিকে একবার ফিরেও চাইলাম না। পরে শুনেছিলাম, সে নাকি খোঁজ করেছিল, যে বেয়াদব ছেলেটি তার সামনে অমনভাবে লাফ দিয়ে পড়ে তার সঙ্গিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, সে কে ?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।। মাজুরকা

যে যুবকটিকে আমি তার সঙ্গিনীলাভে বঞ্চিত করেছিলাম, তিনি প্রথম জুটিতে মাজুরকা নাচলেন। সঙ্গের মহিলাটির কোমরবেষ্টন করে, মাটি থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে, মিমি আমাদের মাজুরকা নাচ সম্পর্কে যেমনটি বলেছিলেন তেমনি এপাশ-ওপাশে না গিয়ে, সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এভাবে এগোতে এগোতে যখন ঘরের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন, তখন মুহূর্তের জন্য থেমে আবার ঘুরে গিয়ে উলটো দিকে লাফ দিয়ে দিয়ে এগোতে শুরু করলেন।

যেহেতু মাজুরকা নাচার মত আমার কোন সঙ্গিনী ছিল না, সেহেতু দিদিমার উঁচু চেয়ারটার পেছনে বসে আমি নাচ দেখতে লাগলাম।

মনে মনে ভাবলাম, 'উনি ওরকম করছেন কেন ? মিমি আমাদের যেভাবে শিখিয়েছিলেন, এ তো তেমন নয়। তিনি বলেছিলেন, পায়ের আগায় ভর দিয়ে ঘোরপাক খাওয়ার ভঙ্গিতে মাজুরকা নাচতে হয়। কিন্তু এখানে তো কেউই তেমন করে নাচছেন না। ইভিনরা এবং ইটেনী—ওরাও নাচছে, কিন্তু কেউই তো চারপাশে ঘুরছে না। এমনকি ভোলোদিয়াও এই নতুন কায়দায়ই নেচে চলেছে ! তবে এটা তেমন মন্দ নয়। ওঃ, সোনেচকাকে কী ভালই না দেখাচ্ছে ! ঐ তো সে যাচ্ছে !' খুশিতে আমার মনটা ভরে উঠল।

মাজুরকা প্রায় শেষ হয়ে এল। অনেক বয়স্ক মহিলা পুরুষ দিদিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বেয়ারারা নিপুনভাবে নাচিয়েদের মধ্য দিয়ে পথ করে ডিসগুলো পেছনের ঘরে নিয়ে গেল। দিদিমা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং মনে হচ্ছিল যেন কথা বলতেও তার মোটেই ভাল লাগছিল না, আর যাও বা বলছিলেন, তাও খুব আস্তে আস্তে। বাজিয়েরাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—ত্রিশতম বারেও তারা সেই একই সুর বাজাল। যে যুবতী মেয়েটি আমার সঙ্গে নেচেছিলেন তাকে দেখলাম একজনকে আড়াল করে এগোতে; তিনি দিদিমার দিকে ফিরে মৃদু অবিশ্বাসিনীর হাসি হাসলেন ; এবং সম্ভবতঃ দিদিমাকে খুশি করবার জন্য সোনেচকা ও অসংখ্য রাজকুমারীদের মধ্য থেকে একজনকে একেবারে আমার পাশটায় টেনে আনলেন। তারপর বললেন, 'গোলাপ না বিচুটি ?'

'ও, তুই তাহলে এখানে ?' দিদিমা চেয়ারে ঘুরে বসে আমাকে দেখে বললেন, 'যা যা, নাচ গিয়ে।'

যদিও উঠে আসার বদলে তখন দিদিমার চেয়ারের পেছনে মাথাটা লুকোতেই

আমি বেশি আগ্রহী, কিন্তু ভেবে পেলাম না, ওদের আহ্বান কি করে প্রত্যাখ্যান করব? তাই উঠে দাঁড়িয়ে ভীরু দৃষ্টিতে সোনেচকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'গোলাপ।' নিজেকে উদ্ধার করার আগেই, সাদা দস্তানা পরা ছোট একটা হাত আমার হাতটা ধরল. আর আমি যে ঠিক কি করব সেটা যে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছিনা—এটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করে, রাজকুমারী হাসিমুখে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলেন।

আমি জানতাম ইতস্ততঃ পা ফেলাটা মানাবে না, তাছাড়া তারজন্য যথেষ্ট অপদস্তও হতে হবে। কিন্তু মাজুরকার পরিচিত ধ্বনিগুলো আমার কানের মধ্যে প্রবেশ করে আমার স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। ধীরে ধীরে তা পায়ে সঞ্চারিত হল, এবং প্রতিটি দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে আমার পায়ের আগা প্রচণ্ড বেগে বৃত্ত রচনা করে চলল মোম-ঘষা মেঝেতে। যতক্ষণ সামনের দিকে এগোলাম ততক্ষণ নির্ধারিত ভঙ্গিতেই রইলাম, কিন্তু যে মুহূর্তে ঘুরলাম, সে মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, এবার যদি নিজেকে সংযত না করি তাহলে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠবে। তাই, ছোট ছোট পা ফেলা শুরু করলাম, যাতে প্রথম জোড়ার মানুষটির মত সুন্দরভাবে লাফ দিতে পারি। কিন্তু যে মুহূর্তে লাফ দেবার জন্য তৈরি হলাম, সে মুহূর্তে রাজকুমারী আমার চারপাশে এক চক্কর ঘুরে গিয়ে আমার পায়ের দিকে বোকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফলে আমি কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলাম; নাচার বদলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ঠুকে চললাম, শেষে তাও বন্ধ হল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, কেউ বিস্ময়ে, কেউ কৌতূহলে, কেউ সহানুভূতিতে, আবার কেউ বা নিতান্ত অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেবলমাত্র দিদিমার দৃষ্টিতেই দেখলাম উদাসীনতা।

বাবার রাগত স্বর কানে এল, 'কিভাবে নাচতে হয়, তা যদি তোমার জানা না থাকে তবে নাচার প্রয়োজন নেই।' তারপর সামান্য ধাক্কায় আমাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে, আমার সঙ্গিনীর হাত ধরে পুরনো কায়দায় একচক্কর নেচে দর্শকের উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনা দিয়ে তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন তার আসনে। সাথে সাথে মাজুরকারও সমাপ্তি হল।

ভাবলাম, হে ভগবান, তুমি আমায় এমন শাস্তি দিলে কেন?

* * * *

সবাই আমাকে তাচ্ছিল্য করছে, এবং চিরকালই তা করবে। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সম্মান—এর সবকটা পথই তো আমার সামনে রুদ্ধ। ভোলোদিয়া কেন আমাকে অমন ইশারা করেছিল, যা প্রত্যেকে দেখল, অথচ আমার নিজের কোন কাজে এল না? কেন সেই নির্বোধ রাজকুমারী অমনভাবে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন? আর সোনেচকা—মানছি সে সুন্দরী—তবু কেন সে ঠিক সেই-মুহূর্তে আমার দিকে চেয়ে হাসল? বাবা কেন রেগে আমার হাতটা ধরে টান দিলেন? তিনি কি আমার জন্য এতই লজ্জিত বোধ করছিলেন? ওঃ সবকিছুই ভয়ঙ্কর! যদি মা থাকতেন, তাহলে তিনি তার নিকোলেনকার জন্য মোটেই লজ্জা বোধ করতেন না। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্ন আমাকে সেই সুন্দর স্মৃতির রাজ্যে নিয়ে চলল। আমার মনে পড়ল, আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা, বাগানের সারি করা লাইমগাছগুলো, পরিষ্কার পুকুরে ভাসমান চাতক পাখির দল, নীল

আকাশে ভ্রাম্যমান স্বচ্ছ মেঘপুঞ্জ, খড়ের গন্ধ, এবং আরও কত কী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।। মাজুরকার পরে

প্রথম জুটিতে যে যুবকটি নেচেছিলেন, নৈশভোজের সময় তিনি আমাদের সাথে একই টেবিলে খেতে বসলেন, এবং আমার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেখানো শুরু করলেন। তিনি যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন আমাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য। আমাকে বিভিন্ন রকম বিশেষণে বিভূষিত করলেন এবং বড়রা যখন আমার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজনও অনুভব করলেন না, তখন তিনি বিভিন্ন বোতল থেকে মদ ঢেলে দিয়ে আমাকে পান করার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। খাওয়ার শেষে বেয়ারা যখন আমার ছোট্ট গেলাসটার চারভাগের একভাগ স্যাম্পেন ঢেলে দিল, তখন জোয়ান লোকটি জোর করে সেটাকে পূর্ণ করালেন এবং এক ঢোকে সবটা খেতে আমাকে বাধ্য করলেন। আমার সারা শরীর এক আরামদায়ক উষ্ণতায় ছেয়ে গেল, এবং সেই যুবকটির প্রতি জেগে উঠল এক বিচিত্র দয়ার ভাব। আমি খুশিতে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ নাচঘর থেকে 'ঠাকুরদা' নাচের শব্দ ভেসে এল, এবং অতিথিরা টেবিল ছেড়ে ওঠা শুরু করলেন। যুবকটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও শেষ হল সেই মুহূর্তে; তিনি বড়দের সাথে একত্রিত হবার জন্য এগিয়ে গেলেন, আর এদিকে আমি, শ্রীমতী ভালাখিনা তার মেয়েকে কি বলছেন, তা শোনার জন্য বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে এগোলাম।

সোনেচকা আবদার করল, 'আর আধঘণ্টা থাক না।'

'অসম্ভব।'

সে মিনতি করল, 'অন্ততঃ আমার জন্য থাক।'

একটুও না হেসেই শ্রীমতী ভালাখিনা বললেন, 'আমি যদি কাল অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে সেটা তোমার খুব ভাল লাগবে কি?'

সোচেনকা আনন্দে নাচতে নাচতে বলল, 'তাহলে তো নিশ্চয় থাকতে পারি? কি বল?'

তিনি বললেন, 'তাহলে এখন আমি কি করি? ঠিক আছে যাও।' তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বললেন, 'এই তো তোমার সঙ্গি; ওর সাথেই নাচো।'

সোনেচকা আমার হাত ধরল, আমরা নাচঘরের দিকে দৌড়ে গেলাম।

মদের নেশা, সোনেচকার উপস্থিতি এবং অঙ্গভঙ্গি আমার মন থেকে মাজুরকার দুর্ভাগ্যজনক স্মৃতিকে একেবারে মুছে দিল। আমি মহানন্দে পা ফেললাম, ঘোড়ার নকল করে কদম বাড়ালাম —তারপর এক জায়গায়, কুকুরের দ্বারা তাড়িত ভেড়ার মত পা ঠুকলাম, এবং বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে হেসে উঠলাম—দর্শকদের ওপর আমার কার্যাবলীর কি প্রতিক্রিয়া হবে তা না ভেবেই। সোনেচকাও আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। যখন বৃত্তাকারে ঘুরে চললাম তখনও সে হাসল; আবার এক বৃদ্ধ যখন অতি সন্তর্পণে পা তুলে রুমালের ওপর পা ফেলছিল তখনও হাসল। আর ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন ছাদ পর্যন্ত লাফ দিয়ে উঠলাম তখন তো তার মুখে হাসি আর ধরেই না।

দিদিমার পড়ার ঘরের সামনা দিয়ে যাবার সময় আয়নায় নিজেকে একপলক দেখে নিলাম। দেখলাম, সারাটা মুখ ঘামে ভরে গেছে, চুলগুলো এলোমেলো

মাথার টেড়িটা আগের থেকে আরও বিশ্রীভাবে খাড়া হওয়া। কিন্তু তবুও, সব মিলে নিজেকে বেশ খুশি এবং দয়ালু বলে মনে হল। মনে মনে ভাবলাম, 'যদি সবসময়ই এমন থাকতে পারি, তাহলেও তো ভালই হয়।'

কিন্তু যে মুহূর্তে সঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকালাম, অমনি নজরে এল, আনন্দ ছাড়াও তার রয়েছে স্বাস্থ্য, আর বন্ধনহীন স্বাধীনতা। এছাড়া আছে সৌন্দর্য আর নম্রতা। সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম এমন অপূর্ব সৃষ্টিকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করার চিন্তা মাথায় আসাও বাতুলতা।

প্রতিদানে ভালবাসা পাব, সে চিন্তা মাথায় এলই না; বরং এমনিতেই আনন্দের বন্যায় হৃদয় উছলে উঠল। কল্পনাও করতে পারলাম না, যে ভালবাসার অনুভূতি আমার হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে, তার থেকেও আনন্দদায়ক কোন কিছুর কথা ভাবা যেতে পারে। নিজেকে সুখী মনে হল। হৃদয়টাকে মনে হল ঘুঘুপাখি, অফুরন্ত রক্তে ধৌত—ইচ্ছে হল কেঁদে উঠি।

বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে, সিঁড়ির তলায় অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরটা অতিক্রম করার সময়, একবার সেদিকে চাইলাম, এবং ভাবলাম, যদি সবার অলক্ষ্যে এই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে তার সঙ্গে চিরটাজীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম।

ভীরু পদক্ষেপে, শান্ত কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'আজকের রাতটা খুব চমৎকার, না?' ভয় পেয়ে গেলাম, যা বললাম, তা ভেবে নয়, যা বলব ভেবেছিলাম তা ভেবে।

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই।' তার ছোট্ট মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে এমন সহজ দয়ালু ভঙ্গিতে সে কথাটা বলল যে আমার মনের সব সংশয় মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

'বিশেষতঃ খাওয়ার পরে। যদি বুঝতে পারতে, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ, এবং আর কখনও আমাদের মধ্যে দেখা হবেনা একথা ভেবে আমি যে কী ভীষণ দুঃখী (আসলে 'কী অসুখী' কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সাহসে কুলোল না)।'

চটির মাথার দিকটাতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকিয়ে থেকে, যে পর্দাটার পাশ থেকে আমরা এগোচ্ছিলাম তাতে আঙুল বোলাতে বোলাতে সে বলল, 'আমাদের আর দেখা হবেনা কেন? আমি আর মা প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবার তেভারস্কি বুলেভার্ডে বেড়াতে যাই। তুমি কি কখনও বেড়াতে যাও না?'

'আগামী মঙ্গলবার যাবার জন্য আমি অনুমতি চাইব। তবে তারা যদি আমাকে অনুমতি না দেন, তবু আমি যাবই; প্রয়োজন হলে টুপি ছাড়াই। রাস্তাটা আমার জানা।'

সোনেচকা হঠাৎ বলল, 'জান, আমি এখনই কি ভাবছিলাম?' ছোট্ট মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে সে বলল, 'ভাবছিলাম, আমাদের বাড়িতে যে-সব ছেলেরা আসে তাদের সবাইকেই আমি 'তুই' বলে ডাকি। তোমাকেও এখন থেকে তাই ডাকব; কি, রাজি তো?'

ঠিক সেই সময় আমরা নাচ-ঘরে ঢুকলাম; 'ঠাকুরদা' নাচের দ্বিতীয়ার্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে। বাজনার আওয়াজ এবং লোকজনের গলার স্বরে আমার কথা শোনা যাবেনা চিন্তা করেই বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

'বল তোর সঙ্গে।' আমার ভুল শুধরে দিল সে হাসতে হাসতে।

'ঠাকুরদা' নাচ শেষ হল, কিন্তু আমি কিছুতেই 'তুই' শব্দটা উচ্চারণ করতে

পারলাম না। বারবার চেষ্টা চালালাম সর্বনামের ব্যবহার করার। কিন্তু কিছুতেই সাহস হল না। আমার কানে 'তুই' শব্দটা বারবার বেজে চলল; মনের মধ্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি হল। সোনেচকা ছাড়া অন্য কিছু, অন্য কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। দেখলাম, চুলের গোছা তার কানের পেছনে লুটিয়ে পড়েছে; তার ভ্রূজোড়া, কপাল—এসবও আগে দেখিনি, কিন্তু এখন দেখলাম। আমি তাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন তার সারা দেহ ছিল সবুজ চাদরে মোড়া, শুধু বেরিয়ে ছিল ছোট্ট নাটক। তখন যদি সে তার ছোট্ট আঙুলগুলো দিয়ে মুখের কাছটাকে একটু ফাঁক করে না রাখত তাহলে হয়ত বেচারী দম বন্ধ হয়েই মারা যেত। দেখলাম, সে তরতর করে তার মার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, আমাদের দিকে মাথা ঝাঁকালো, এবং মুহূর্তের মধ্যে দরজা দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ভোলোদিয়া, ইভিন ভ্রাতৃত্রয়, ছোট রাজকুমার, এবং আমি—আমরা প্রত্যেকেই সোনেচকার প্রেমে পড়েছিলাম; সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই তার যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। যদিও বলতে পারব না, ঠিক কার দিকে তাকিয়ে সে তার মাথা নেড়েছিল, তবে সেই মুহূর্তে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল যে ও মাথা নাড়া আমাকে দেখেই।

ইভিনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বেশ হালকাভাবে কথা বললাম, এমনকি সেরিওঝার সঙ্গেও করমর্দন করলাম যথেষ্ট অনিচ্ছা সহকারে। ফলে সে যদি সেদিন এটা বুঝে গিয়ে থাকে যে আমার ওপর তার প্রভাব এবং তার প্রতি আমার ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল—অবশ্য বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটার প্রতি সে যেন সত্যিই উদাসীন।

জীবনে সেই প্রথম আমি আমার ভালবাসার প্রতি অবিশ্বস্ত হলাম, এবং সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম সেই অনুভূতির মধুরতা। সেই উপলব্ধিই আমাকে ভবিষ্যৎ জীবনে জীর্ণ অনুভূতির ভারালুতা কাটিয়ে উঠে রহস্য এবং অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ ভালবাসার স্বাদগ্রহণে প্ররোচিত করল। মোট কথা, ভালবাসায় ব্যর্থ হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেমে পড়া—আমার কাছে একই সাথে যেন দুটি ভালবাসার আঘ্রাণ গ্রহণের মত হয়ে দাঁড়াল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বিছানায়

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, 'এমন আবেগের সঙ্গে এতদিন ধরে কিভাবে আমি সেরিওঝাকে ভালবাসলাম? সে তো কোনদিনই আমাকে বুঝতে চায়নি; কোনদিনও আমার ভালবাসাকে এতটুকু মূল্য দেয়নি। কিন্তু সোনেচক? সত্যি, কী মিষ্টি মেয়ে! "তুই?" "এবার তুই-র পালা শুরু হবে।" '

চোখের সামনে তার সুন্দর মুখটা ভেসে উঠতেই, এক লাফে আমি বিছানায় উঠে বসলাম, চাদরটা দিয়ে মাথাটা ঢেকে নিচের দিকটা হাঁটুর তলে গুঁজে দিলাম, তারপর ধীরে ধীরে নিমগ্ন হলাম মধুর স্মৃতি-স্বপ্নের জগতে। চাদরের পাড়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, একঘণ্টা আগে দেখা মুখটা আবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে মনে তার সাথে কথা বললাম। যদিও সে কথাবার্তায় অর্থের কোন বালাই ছিল না, তবু হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করলাম। কারণ, সেই বাক্যালাপে 'তুই' 'তোকে' 'তোর' ইত্যাদি সর্বনামগুলো একনাগাড়ে

এল। আমি আবেগে এত আপ্লুত হলাম যে আমার চোখে ঘুমই এল না। মন চাইল, এই আনন্দের উচ্ছ্বাসকে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে।

'ও প্রিয়া!' হঠাৎ পাশ ফিরে বেশ জোরেই বলে উঠলাম। তারপর বললাম, 'ভোলোদিয়া, তুমি জেগে আছ?'

ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিল সে, 'না; কি হয়েছে?'

'আমি প্রেমে পড়েছি ভোলোদিয়া; আমি সোনেচকার প্রেমে পড়েছি।'

শরীরটাকে একটু খেলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি?'

'ও: ভোলোদিয়া, তুমি ভাবতেই পারবে না, আমার ভেতরটায় এখন কেমন করছে; আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে কথা বলছি; সত্যি, কী যে চমৎকার! জান, যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাঁদতে।'

ভোলোদিয়া নড়েচড়ে উঠল।

আমি বলে চললাম, 'আমার শুধু একটাই ইচ্ছে—তার সঙ্গে সারাটা সময় কাটাতে চাই, সারাটা সময় শুধু তাকেই দেখতে চাই—আর কিছু নয়। আচ্ছা, তুমিও কি প্রেমে পড়েছ? ভোলোদিয়া, সত্যি কথাটা আমাকে বল না।'

যদিও ব্যাপারটা বিশ্রী ছিল, তবু আমি চাইছিলাম, সবাই সোনেচকার প্রেমে পড়ুক, এবং সবাই তাই নিয়েই কথা বলুক।

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ভোলোদিয়া বলল, 'তাতে তোর কি?'

'তুমি ঘুমোতে চাইছ না, শুধুমাত্র ঘুমোবার ভান করছ।' তার উজ্জ্বল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম; তারপর গায়ের ঢাকনাটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে বললাম, 'এস, তাকে নিয়ে কথা বলা যাক। সত্যিই সে চমৎকার; তাই নয় কি? যদি সে আমাকে বলত, "নিকোলেনকা, জানলা দিয়ে লাফ দাও, কিংবা নিজেকে ছুঁড়ে দাও আগুনের মধ্যে।" দিব্যি কেটে বলছি, নির্দ্বিধায় আমি তবে তাই করতাম, এবং করতাম যথেষ্ট আনন্দের সঙ্গেই।' তারপর সেই আনন্দের অনুভূতিটুকু পাবার জন্যে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে মাথাটাকে ঠেসে ধরলাম বালিশের তলায়। চিৎকার করে বললাম, 'আমি গলা ফাটিয়ে কাঁদতে চাই ভোলোদিয়া।'

সে হেসে বলল, 'কী নির্বোধ!' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তোর মত আমারও একটু একটু বোধ হচ্ছে। তবে আমি ভাবছি, যদি সম্ভব হত, তাহলে তার পাশে বসে কথা বলতাম।'

আমি ওর কথার মাঝখানেই বললাম, 'তাহলে তুমিও প্রেমে পড়েছ?'

ভোলোদিয়া তেমনি হাসি মুখে বলে চলল, 'তারপর চুমু খেতাম তার ছোট্ট আঙুলে, চোখে, ঠোঁটে, নাকে, সরু পায়ে—তার সারা অঙ্গে।'

বালিশের তলা থেকেই আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, 'নির্বোধ কোথাকার।' বেশ বিরক্তির সঙ্গে ভোলোদিয়া মন্তব্য করল, 'তোর মত বোকা এর বুঝবেটা কি!'

আমি কাঁদতে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই বুঝি, বরং বোঝ না তুমিই। শুধুমাত্র বোকার মত একগাদা কথা বলে চলেছ।'

'ঠিক আছে, তারজন্য কান্নার কিছু নেই। কী ছিঁচ কাঁদুনে ছেলেরে তুই!'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ চিঠি

যেদিনের কথা এইমাত্র বললাম, তার ঠিক ছ মাস পর, ১৬ই এপ্রিল, আমরা যখন ওপরতলায় বসে পড়ছিলাম, তখন বাবা একটা চিঠি হাতে সেখানে উপস্থিত হলেন, এবং বললেন, সেই রাত্তেই আমাদের গাঁয়ের পথে রওনা দিতে হবে। খবরটা শুনেই মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, এবং সব চিন্তা মার দিকে কেন্দ্রীভূত হল।

আমাদের আকস্মিক যাত্রার কারণ ছিল নিচের এই চিঠিটা ঃ

পেত্রোভস্কায়া, ১২ই এপ্রিল

'তোমার ৩ তারিখে লেখা চিঠিটা আজই সন্ধ্যা ১০টার সময় আমার হাতে এসে পৌঁছেছে—এবং অভ্যাসমত সাথে সাথে তার উত্তর লেখা শুরু করেছি। ফিওদর গত রাতেই শহর থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু দেরি হয়ে যাবার দরুণ সেটা মিমির হাতে দিয়ে যায়। এবং যেহেতু আমি যথেষ্ট দুর্বল আর অসুস্থ—তাই মিমি সারাটা দিন ওটাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। সত্যি বলতে কি, গত চারদিন ধরে আমি জ্বরে শয্যাশায়ী।

'এরজন্য ভয় পেয়োনা ; এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি, এবং ইভান ভাসিলিচ যদি অনুমতি দেন তাহলে হয়ত কালই উঠে বসতে পারব।

'গত শুক্রবার শিশুদের ঘোড়ায় চড়াবার জন্য বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম ; কিন্তু বড় রাস্তার কাছে যে সেতুটাকে দেখে আমি ভয় পাই ঠিক সেখানটায় গিয়ে ঘোড়াগুলো কাদায় আটকে যায়। দিনটা ছিল সত্যিই সুন্দর, তাই ওরা গাড়ি বের করলে ভেবেছিলাম বড় রাস্তায় যতদূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব ততটা হেঁটেই যাব। গির্জার কাছটাতে আসতেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলাম ; এবং প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ, যতক্ষণ ধরে গাড়িটাকে কাদা থেকে তোলবার জন্য তারা লোকজনকে ডাকাডাকি করছিল, ততক্ষণ সেখানেই বসে রইলাম। আমি বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম, বিশেষতঃ পায়ে। কারণ আমার পায়ের জুতোর সোল ছিল বেশ পাতলা, ফলে সেগুলো একেবারে ভিজে গিয়েছিল। খাবার পর গায়ে বেশ জ্বর জ্বর বোধ হল, কিন্তু তবু শুতে গেলাম না। চা পানের পর যথারীতি লিউবোচকার সঙ্গে দ্বৈত-সঙ্গীত গাইলাম (তাকে দেখলে তুমি চিনতেই পারবে না—সে এতটা উন্নতি করেছে)। কল্পনা করে দেখ আমার তখনকার মনের অবস্থা, যখন আমি উপলব্ধি করলাম যে কিছুতেই আমি সময় কত তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। অনেকবার চেষ্টা করলাম হিসেব করতে, কিন্তু মাথাটা ভীষণ ঘুরতে লাগল—কানের মধ্যে এসে ধাক্কা দিল ভয়ঙ্কর সব আওয়াজ। গুনে চললাম এক, দুই, তিন ; তারপর একলাফে আট এবং পনের ; অথচ মজার ব্যাপার হল নিজেই বুঝতে পারছিলাম আবোল তাবোল বকছি—কিন্তু করতেও পাচ্ছিলাম না কিছুই। শেষে মিমি এগিয়ে এসে আমাকে ধরে একরকম জোর করেই শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর কি হল, তা বলছি ; তা হলেই বুঝতে পারবে অসুখে পড়ার জন্য আমি নিজেই কতটা দায়ী।

'পরের দিন জ্বর বেশ বেড়ে গেল ; খবর শুনে ইভান ভাসিলিচ এলেন ; আজও তিনি এখানেই আছেন। ঠিক করেছেন, আমাকে চাঙ্গা না করে ফিরবেন না। সত্যি বুড়ো মানুষটির গুণের তুলনা হয়না! জ্বরে যখন ভুল বকতাম তখন সারা রাত উনি আমার পাশে বসে থাকতেন। এখনও বসে আছেন—তবে আমার পাশে

নয়, মেয়েদের পাশে ; কারণ উনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি তোমায় চিঠি লিখছি। শুনতে পাচ্ছি, উনি মেয়েদের একটার পর একটা জার্মান গল্প বলে চলেছেন আর মেয়েরা তা শুনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

' "ফ্লেমেডের সুন্দরী মেয়ে" বলে তুমি যাকে ডাকতে সে গত দু সপ্তাহ ধরে আমার কাছেই রয়েছে। সে আমায় খুবই ভালবাসে এবং যত্নও নেয় যথেষ্ট। হৃদয়ের সব গোপন কথাই আমায় বিশ্বাস করে বলে। তার সুন্দর চেহারা, দয়ালু হৃদয় আর যৌবন নিয়ে সে যদি কোন ভাল লোকের হাতে পড়ত তাহলে সত্যিই সুখী হত। কিন্তু যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজে তা সম্ভব নয় বলেই তার ধারণা। যদি আমার নিজের এতগুলো সন্তান না থাকত, তাহলে আমিই তার দায়িত্ব নিতাম।

'লিউবোচকা নিজেই তোমাকে চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে তিনটে পাতাও তার নষ্ট হয়ে গেছে, এবং বলছে "আমি জানি বাবা কেমন রসিক লোক ; যদি কোন রকমে একটা ভুল হয়ে যায় তো সবাইকে তিনি সেটা দেখিয়ে বেড়াবেন।" কাতেনকা আগের মতই মিষ্টি আছে, এবং মিমিও ঠিক তেমনি—ভাল অথচ নিরস।

'এবার কিছু জরুরী কথা বলব। তুমি লিখেছ, এবার শীতে নাকি কাজকর্ম তেমন ভাল হয়নি, ফলে খাবারোভকার আয়টা নিতে তুমি বাধ্য হয়েছ। এটা আমাকে বিস্মিত করছে, কারণ এ ব্যাপারে আমার সামান্য সম্মতি নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করনি তুমি। অবশ্য, এটা ঠিক, আমার সম্পত্তিতে তোমারও সমানই অধিকার আছে।

'তুমি এত দয়ালু এবং ভালমানুষ যে, আমি যাতে কষ্ট না পাই সে কারণে আসল সত্যটাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়েই রেখেছ। তুমি জেনে রাখ, আমি জানি যে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা তুমি জুয়োতে হেরেছ, কিন্তু সে কারণে আমি তোমার ওপর মোটেই রাগান্বিত নই। দেখ, কোনভাবে একবার এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পার কিনা—কিন্তু তারজন্য মোটেই দুশ্চিন্তা কোরো না। ছেলেদের বেলাতেও যেমনি, তোমার বেলায়ও ঠিক তেমনি—লাভের হিসেব না করতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এমনকি (আমায় মাফ কোরো) তোমার জমিদারির বেলাতেও ঠিক তাই। তোমার ক্ষতি আমাকে যেমন সামান্য ব্যথা দেয় তোমার লাভও আমাকে তেমনি সামান্য আনন্দ দিয়ে থাকে। শুধুমাত্র একটা বিষয়ই আমাকে সবথেকে বেশি কষ্ট দেয়—তা হচ্ছে তোমার প্রচণ্ড জুয়াখেলার নেশা—যা আমার প্রতি তোমাকে আকর্ষণবিহীন করে তুলেছে। ফলে সেই অপ্রিয় সত্য কথাটাই আজ আমি বলতে বাধ্য হলাম ; এবং ভগবানই জানেন এজন্য নিজেই কতটা কষ্ট পাচ্ছি। ভগবানের কাছে আমি এ প্রার্থনা জানাব না যে তিনি আমাদের দারিদ্রতার হাত থেকে রক্ষা করুন (দারিদ্রতাটা কি ?), বরং বলব, সেই ভয়ঙ্কর দুর্দশা থেকে তিনি আমাদের মুক্ত রাখুন, যা কিনা ছেলেমেয়েদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তোমার আমার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবেই। এক্ষেত্রে দেখছি ঈশ্বর আমার কথাই শুনেছেন ; কারণ, এখনও তো তুমি তোমার অধিকারের সেই সীমা লঙ্ঘন করনি যা কিনা আমাদের সন্তানদের প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে বাধ্য করতে পারে। তবুও ভয়, এখনও সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা অন্তর্হিত

হয়নি। হ্যাঁ, এ হচ্ছে সেই বিরাট ক্রুশ যা কিনা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

'তুমি ছেলেদের সম্পর্কে লিখেছ, এবং আবার আমাদের সেই পুরনো মতানৈক্যকে খুঁচিয়ে তুলেছ, তাদেরকে কোনও শিক্ষায়তনে পাঠাবার জন্য আমার সম্মতি চেয়ে। তুমি তো জানই, এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় আমার মোটেই সমর্থন নেই।

'আমি জানিনা, তুমি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা—তবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব, এবং আমায় মৃত্যুর পরেও—তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে এ ধরনের কোন কাজ কখনও করবে না—অবশ্য একান্তই যদি ঈশ্বরের মর্জি না হয় এমনতর একটা কাজের দ্বারা আমাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর।

'তুমি লিখছ যে, আমাদের কাজকর্ম দেখার জন্য অতি-অবশ্যই সেন্ট পিটার্সবুর্গে যাচ্ছ। ভগবান তোমার সঙ্গি হবেন—তুমি সেখানে যাও, এবং যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এস। তুমি না থাকলে আমরা প্রত্যেকেই খুব ক্লান্তি অনুভব করি। বসন্ত চমৎকার সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বারান্দার প্রবেশপথ ফুলে ছেয়ে গেছে, গরম-ঘরে যাবার রাস্তাটা চারদিন আগে শুকিয়ে খটখটে হয়েছে আর পিচগাছে মুকুল ধরেছে ; শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটা স্থানেই তুষারের গতিবিধি সীমাবদ্ধ ; তাছাড়া দোয়েলদের আগমনও শুরু হয়ে গেছে। এবং এইমাত্র লিউবোচকা আমাকে একগুচ্ছ প্রথম বসন্তের ফুল এনে দিয়ে গেল ! ডাক্তার বলছেন তিনদিনের মধ্যেই আমি ভাল হয়ে উঠব ; তারপর তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া কিংবা বসন্তের সূর্যতাপে নিজেকে উষ্ণ করে তুলতে আমার মোটেই অসুবিধে হবেনা। সুতরাং আমার অসুখ নিয়ে কোনরকমের দুশ্চিন্তা কোরনা ; তাছাড়া তোমার যে ক্ষতি হয়েছে—তা নিয়েও বৃথা ভেবো না। বকেয়া কাজকর্ম শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলেদের নিয়ে এখানে চলে এস—সারাটা গ্রীষ্ম একত্রে কাটানো যাবে। গ্রীষ্মাবকাশকে আনন্দে ভরিয়ে তোলার জন্য বহু বিচিত্র পরিকল্পনা তৈরি করেছি—কিন্তু তুমি যতক্ষণ না আসছ ততক্ষণ সেগুলোকে কিছুতেই বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না।'

চিঠির বাকি অংশটুকু কাগজের অপর পৃষ্ঠায় এলোমেলো হস্তাক্ষরে ফরাসীতে লেখা ছিল। আমি এখানে তার আক্ষরিক অনুবাদ করে দিলাম :

'আমার অসুখ সম্পর্কে তোমাকে যা লিখেছি, তা মোটেই বিশ্বাস কোর না ; কেউই জানেনা আমি কি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছি। শুধুমাত্র আমিই জানি ইহজন্মে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না। আর এক মুহূর্তও দেরি কোর না—ছেলেদের নিয়ে আজই চলে এস, সম্ভবতঃ আর একবারই মাত্র তাদের জড়িয়ে ধরতে পারব, তাদের আশীর্বাদ করতে পারব—এটাই আমার শেষ ইচ্ছে। আমি জনি কী ভয়ঙ্কর আঘাত দিচ্ছি তোমাকে ; কিন্তু এটা তো ঠিক—আজই হোক, কিংবা কাল ; আমার কাছ থেকেই হোক, কিংবা অপরের কাছ থেকে—এ দুঃসংবাদ তোমাকে পেতেই হত। সুতরাং এস, দৃঢ়তার সঙ্গে এ দুর্ভাগ্যকে গ্রহণ করি—ঈশ্বরের ইচ্ছের ওপরই সবকিছু ছেড়ে দিই।

'ভেবো না, যা লিখলাম, তা শুধু আমার মানসিক উদ্ভট কল্পনার ফল। বরং এই মুহূর্তে আমার চিন্তাধারা একেবারে পরিষ্কার—স্বচ্ছ। বৃথা আশার স্তোকবাক্যে

নিজেকে ভুলিও না। এ ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিওনা যে, যা কিছু লিখলাম তা এক ভীত আত্মার অলীক নিরর্থক পূর্বাভাস। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরই আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিয়েছেন যে আর বেশিদিন আয়ু নেই আমার।

'তোমার প্রতি এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার যে ভালবাসা তা কি এ জন্মেই শেষ হয়ে যাবে ? আমি জানি, তা অসম্ভব। এই মুহূর্তে ভালবাসায় আমি এত পরিপূর্ণ যে ভাবতেই পারছি না, কোনদিন এ ভালবাসা শেষ হতে পারে। তোমার প্রতি ভালবাসা ছাড়া আমার আত্মার অস্তিত্বই আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি জানি এ প্রেম চিরকালের—তার বিনাশ কোনকালেই সম্ভব হবে না।

'জানি, তোমার সাথে আর বেশিদিন কাটাতে পারব না, কিন্তু তার সাথে এও জানি, আমার ভালবাসা কোনদিনও তোমাকে পরিত্যাগ করবে না। আর সেই তৃপ্তিদায়ক ভাবনাতেই আমি এত উৎফুল্ল যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসা মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র ভীত হচ্ছি না।

'আমি বেশ শান্তই আছি ; এবং ঈশ্বর জানেন, সারাটা জীবনই আমি মৃত্যুকে এক মহত্তর জীবনের পথে যাত্রার পাথেয় হিসেবে মেনে এসেছি, তবু বুঝতে পারি না, কেন আজ আমি আমার চোখের জলকে বেঁধে রাখতে পারছি না ? কেন আমার সন্তানেরা যে মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সেই মার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবে ? কেন তুমি এত বড় আঘাত পাবে ? যখন তোমার ভালবাসা আমার জীবনকে এমন সুখী করেছে, তখন আমিই বা মরতে যাব কেন ?

'তবু ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তিনি তাই করুন।

'চোখের জলের জন্য আমি আর লিখতে পারছি না। সম্ভবতঃ তোমাকে আর দেখতে পাব না। এ জীবনে সুখের যে প্রাবল্যে তুমি আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছ তার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে পুরস্কৃত করেন। বিদায় প্রিয়তম। মনে রেখো, আমি যেদিন থাকব না, সেদিন তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমার ভালবাসা তোমার সাথে সাথেই থাকবে। বিদায় আমার সোনার চাঁদ ভোলোদিয়া, বিদায় বেঞ্জামিন, বিদায় নিকোলেনকা।

'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব, ওরা আমাকে একদিন ভুলেই যাবে ?'

এই চিঠিটার সঙ্গে ফরাসীতে লেখা মিমির একটা চিরকুট ছিল, তাতে লেখা ছিল ঃ

'দুঃখদায়ক যে অনিষ্টের কথা তিনি লিখেছেন সে সম্পর্কে চিকিৎসক আরও পাকাপাকি রায় দিয়েছেন। কাল রাতে, তক্ষণ তক্ষণই চিঠিটাকে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেন। তিনি বিকারের ঘোরে রয়েছেন মনে করে আমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই, এবং সকালে মনঃস্থির করি এটাকে খুলে পড়বার। কিন্তু চিঠিটা খোলার সাথে সাথেই নাতালিয়া নিকোলায়েভনা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে চিঠিটা আমি কি করেছি, এবং বলেন, যদি সেটা তখন পর্যন্ত পাঠিয়ে না থাকি তবে যেন তা পুড়িয়ে ফেলি। এ ব্যাপারে তিনি কথা বলতে শুরু করেন এবং বলেন, চিঠিটা যদি আপনার কাছে পৌঁছয় তবে আপনার মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং দেরি করবেন না ; যদি তাকে শেষ দেখা দেখতে চান তবে অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে

আসুন। তিন রাত ধরে আমার চোখের পাতায় ঘুম নেই। আপনি তো জানেনই, আমি তাকে কী প্রচণ্ড রকমের ভালবাসি।'

নাতালিয়া সাভিশনা, যে ১১ই এপ্রিলের রাতটা মার ঘরে কাটিয়েছিল, তার মুখ থেকে শুনেছিলাম, চিঠিটার অর্ধেক লেখা হলে মা সেটাকে ছোট টেবিলটার ওপর রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

নাতালিয়া বলেছিল, 'আমি স্বীকার করছি, হাতলওলা চেয়ারটায় বসে আমি ঢুলছিলাম, এবং আমার হাতের মোজা দুটো হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাত একটা নাগাদ হঠাৎ স্বপ্নের ঘোরে শুনলাম সে যেন কারও সঙ্গে কথা বলছে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ; চেয়ে দেখলাম হাত দুটোকে এভাবে মুড়ে সে বিছানার ওপর বসে রয়েছে, আর তার দু চোখ বেয়ে একনাগাড়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। সে বলল, "তাহলে এখানেই সব শেষ?" তারপর হাতদুটো দিয়ে নিজের মুখটাকে ঢাকল। আমি তরাক্ করে লাফ দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি হয়েছে, দিদিমণি?" সে বলল, "ওঃ নাতালিয়া, তুমি যদি জানতে যে এইমাত্র আমি কী দেখলাম!" কিন্তু আমার হাজার অনুরোধেও সে সে-সম্পর্কে আর একটি কথাও বলল না। শুধু আদেশ করল ছোট্ট টেবিলটাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য। তারপর আরও কিছু লিখল, শেষে আমাকে বলল খামটার মুখ বন্ধ করে দিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পাঠিয়ে দিল। তারপর থেকেই তার অবস্থার দ্রুত ক্রমাবনতি শুরু হল।'

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গ্রামে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছিল

পেত্রোভস্কায়ার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম ১৮ই এপ্রিল। মস্কো থেকে যাত্রা করার সময়েই বাবা বেশ চিন্তিত ছিলেন, এবং ভোলোদিয়া যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মা অসুস্থ কিনা, তখন তিনি নীরবে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিলেন। পথে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ক্রমাগতই আরও বেশি ভেঙ্গে পড়ছিলেন, এবং অবশেষে আমরা যখন বাড়ির কাছাকাছি এসে গেলাম ততক্ষণে তার মুখে বেদনার ছায়া কালিমা লেপন করে দিয়েছে। তিনি গাড়ি থেকে নামতে নামতে ফোকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিকোলায়েভনা কোথায়?' সেই মুহূর্তে মনে হল এক্ষুণি হয়ত তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। ফোকা তার প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে, পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'এই নিয়ে ছদিন হল, তিনি তার ঘর ছেড়ে একবারও বের হননি।'

মিলকা (পরে শুনেছিলাম, মা যেদিন অসুস্থ হয়েছিলেন, সেদিন থেকে তার কান্না নাকি একবারের জন্যও থামেনি) আহ্লাদে বাবার দিকে লাফ দিল, কোলে চড়ে বসল, এবং হাত চাটতে শুরু করল। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বৈঠকখানার ভেতর থেকে মেয়েদের ঘরে যাবার রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলেন অন্দর মহলে। মার ঘরের দিকে যতই এগোচ্ছিলেন ততই যেন তার মনের উত্তেজনা বেড়ে চলছিল। স্পষ্টতই তার প্রতিটি ভঙ্গিমাতেই সেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটছিল। নিঃশব্দে তিনি মেয়েদের মহলে প্রবেশ করলেন, এমনকি নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ দরজার হাতলে হাত দেবার আগে বুকে ক্রুশ আঁকলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এলোমেলো চুলে, চোখে জল নিয়ে মিমি ছুটে এলেন সেখানে। ফিসফিস করে বললেন, 'ওঃ, পিওতর আলেকজান্দ্রোভিচ ; ওখানে নয় ; ও দরজাটা

বন্ধ ; পরিচারিকাদের ঘরের ভেতর দিয়ে চলুন।'

উঃ কী ভয়ঙ্করভাবেই না এইসব ঘটনা আমার শিশুসুলভ কল্পনাকে আশঙ্কার দুঃখের আঘাতে জর্জরিত করে ফেলেছিল!

আমরা পরিচারিকাদের ঘরে গেলাম। যে লোকটা সর্বদা ভেংচি কেটে আমাদের আনন্দ দান করত, সেই আকিমের সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়ে গেল ; কিন্তু তার মুখে আর মস্করার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখলাম না, পরিবর্তে দেখলাম ভাবলেশ-হীন শুষ্কতা—যা আমার মনকে সবথেকে বেশি নাড়া দিয়ে গেল। পরিচারিকাদের ঘরে যে দুজন চাকরানী বসে বসে সেলাইয়ের কাজ করছিল, তারা আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে অভিবাদন জানাল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বাবা এগিয়ে গিয়ে মিমির পাশের ঘরের ভেতর দিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজাটা খুলে দিলেন এবং আমরা তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। দরজার ডানদিকের জানালাদুটোয় দুটো শাল ঝুলছিল। সেই জানালাদুটোর একটায় বসেছিল নাতালিয়া ; সে আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল এবং চশমার ফাঁক দিয়ে সোজা তাকাল আমাদের মুখের দিকে। তবে অন্য সময় যেমন এগিয়ে এসে চুমু খেত, এবার কিন্তু মোটেই তা করল না। দেখলাম, তার চিবুক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আগে যাদের সবসময় শান্ত এবং গম্ভীর দেখেছি, তারা হঠাৎ আমাদের দেখে কাঁদতে শুরু করে দেওয়াতে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

দরজার ঠিক বাঁ দিকটায় একটা পর্দা ঝুলছিল ; তার পেছনে ছিল বিছানা, ছোট একটা টেবিল, ওষুধ ভর্তি একটা ছোট আলমারি এবং বিরাট আরাম কেদারাটা —যাতে বসে ডাক্তারবাবু প্রায়ই ঝিমোতেন। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দরী একটি মেয়ে—মাথাভর্তি একরাশ চুল নিয়ে। তার সকালবেলার সাদা পোশাকের আস্তিন ঝুলছিল পেছনের দিকে ; মার মাথায় ধীরে ধীরে বরফের ব্যাগ ঘষছিল সে—কিন্তু আমি মাকে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। এই মেয়েটিই ছিল মার বর্ণিত সেই 'ফ্লেমেডের সুন্দরী মেয়ে'—যে পরবর্তীকালে আমাদের পরিবারের জীবনে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র সে মার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিল, এবং নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওনার জ্ঞান নেই।'

সেই মুহূর্তে নিজেকে মনে হল দুর্ভাগা—কিন্তু তবু আমি প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করে চললাম। ঘরের ভেতরটা তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং গরম ; তার ওপর ওডি কোলন, ক্যামোমিল আর বিভিন্ন ওষুধের গন্ধে ভরপুর। সেই গন্ধ আমাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছিল যে, যখনই আমি অন্য কোথাও সেই গন্ধের বিন্দুমাত্র আভাষ পাই কিংবা যখনই সেই গন্ধের কথা চিন্তা করি তখনই আমার স্মৃতিতে জেগে ওঠে সেই অন্ধকার ঘর, সেই বিশেষ মুহূর্তটা আর সেইসব ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো।

মার চোখদুটো খোলাই ছিল, কিন্তু তবুও তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেই মারাত্মক চাহনীর কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। প্রচণ্ড কষ্টে পরিপূর্ণ ছিল তা।

তারা আমাদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। পরে আমি যখন নাতালিয়ার কাছে মার শেষমুহূর্তের কথা জানতে চেয়েছিলাম তখন সে আমাকে

বলেছিল, 'তোমাদের বার করে নিয়ে আসার পরও বহুক্ষণ যাবৎ কী যেন একটা অস্থিরতায় ভুগছিল সে—তারপর বালিশে মাথাটা রেখে স্বর্গের পরীর মত ঝিমোতে শুরু করে দিল। আমি বাইরে এলাম দেখতে যে কেন ওরা তারজন্য জল আনতে এত দেরি করছে। যখন ফিরলাম, তখন দেখলাম, সে জেগে উঠে তোমার বাবাকে কাছে ডাকছে। ডাক শুনে তোমার বাবা তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়েছেন—কিন্তু সে হাজার চেষ্টা করেও যা বলতে চাইছিল তা কিছুতেই বলতে পারছিল না; শুধু মুখ থেকে গোঙানির মত বেরিয়ে এল, "হে ভগবান, আমার সন্তানরা! আমার সন্তানরা!" আমি তখন তোমাদের ডাকবার জন্য বাইরে আসছিলাম, কিন্তু তোমার বাবা বাধা দিয়ে বললেন, "যাওয়ার দরকার নেই, ওতে ওর উত্তেজনা আরও বাড়বে।" তারপর তার হাতখানা একবার উঠল, পরমুহূর্তেই আবার পড়ে গেল। এ থেকে সে যে কি বোঝাতে চাইল, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। আমার ধারণা তোমাদের অনুপস্থিতিতেই সে তোমাদের আশীর্বাদ করেছিল। ঈশ্বর তাকে বিদায়ের আগে শেষবারের মত নিজের সন্তানদের একবার চাক্ষুষ দেখার অনুমতিও দিলেন না। তারপর সে গলা চড়িয়ে, হাত নাড়িয়ে এক অবর্ণনীয় স্বরে বলল, "হে ঈশ্বর, ওদের বঞ্চিত কোরো না।" এরপর সম্ভবতঃ ব্যথাটা তার হৃদপিণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝতে পারছিলাম কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে ও। তারপর আবার মাথাটা এলিয়ে পড়ল বালিশে, দাঁত দিয়ে বিছানার চাদর কামড়ে ধরল সে, এবং অজস্র ধারায় বয়ে চলল অশ্রুধারা।'

'তারপর?' আমি জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নাতালিয়া আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেনি; শুধু মুখ ঘুরিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছে। বুঝেছিলাম প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ শোক

সেদিন পড়ন্ত সন্ধ্যায় তাকে আর একবার দেখতে চাইলাম। অনিচ্ছাকৃত ভীতির অনুভূতিকে অতিক্রম করে, খুব ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে পায়ের আগায় ভর দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলাম।

কফিনটা ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল; তার চার পাশে রূপোর মোমদানিতে জ্বলছিল কয়েকটা মোম। একটু দূরে, একটা কোণায় বসে একঘেয়ে নিচু গলায় একদল স্তোত্রপাঠকারী আবৃত্তি করে চলেছিল।

দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে আমি ভেতরটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু ক্রমাগত কেঁদে কেঁদে চোখ এবং স্নায়ুমণ্ডলী এমনভাবে শিথিল হয়ে পড়েছিল যে ভেতরের কিছুই নজরে এল না। মনে হচ্ছিল, সবকিছু যেন বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে—আলো, ফুল, রেশমী কাপড়, ঝাড়লণ্ঠন, লেসওলা গোলাপী বালিশ, ফিতেওলা টুপি, এবং মোমের মত স্বচ্ছ কি একটা বস্তু। আমি একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালাম মার মুখটা একবার দেখব বলে; কিন্তু সেই মোমের মত জিনিসটা আবার আমার দৃষ্টিকে আবৃত করে ফেলল। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না যে সেটাই তার মুখ। তবে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সেই পরিচিত মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল। ভাবলাম, তার বন্ধ করা চোখদুটো অমন ফোলাফোলা কেন? চিবুকের নিচেই বা অমন কালচে দাগটা এল কোত্থেকে? তাছাড়া সারাটা মুখেই

বা বিষণ্ণতা এবং ক্লান্তির ছাপ পড়ল কিভাবে? কেন তার ঠোঁট দুটো অমন শুষ্ক অথচ বাইরের রেখাগুলো দেখতে সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং অপার্থিব রকমের শান্ত? কথাটা মনে হতেই কী একটা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আমার পিঠ বেয়ে মাথার চুলকে অতিক্রম করে চলে গেল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি অনুভব করলাম, এক অবাধ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমার চোখ দুটোকে সেই নিস্প্রাণ মুখের ওপর যেন চেপে ধরেছে। আমি তা থেকে আমার চোখ না সরিয়ে মনে মনে কল্পনা করে চললাম অতীতের আনন্দঘন সুখী দিনগুলোর কথা। ভাবতে ভাবতে ভুলেই গেলাম যে আমার সামনে যে বস্তুটা পড়ে রয়েছে, এবং যার দিকে আমি নির্বোধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি, তারসঙ্গে আমার কল্পনার কোন মিলই নেই। মনে হল আবার যেন তাকে সেই আগের মতই জীবন্ত, কল্লোলিত, হাস্যজ্জ্বল দেখছি। তারপর হঠাৎ-ই সেই পাণ্ডুর মুখ, যার ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, আমাকে নাড়া দিল। আমি ভয়ঙ্কর বাস্তবের কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠলাম, কিন্তু পলকের জন্যও তা থেকে দৃষ্টি সরালাম না। এরপর আবার বাস্তবের সচেতনতা অন্তর্হিত হল; কিন্তু মুহূর্তপরে সেই বাস্তবই আবার ফিরে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে কল্পনা ভারাক্রান্ত হয়ে আমাকে প্রতারণার চেষ্টা করল; আমার বাস্তববোধ অন্তর্ধান করল; আমি জ্ঞান হারালাম। আমি জানিনা, কতক্ষণ এভাবে ছিলাম, কিংবা কেন এমন হল; শুধু জানি, কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে ভুলে গিয়েছিলাম, আর অনুভব করেছিলাম এক অদম্য বর্ণনাতীত সুখ-দুঃখের ঔজ্জ্বল্য।

আমার মার পবিত্র আত্মা সম্ভবতঃ এখান থেকে অন্য এক জগতে যাত্রার আগে শেষবারের মত ফিরে তাকিয়েছিল সেদিকে, যেখানে তিনি আমাদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে রেখে যেতে বাধ্য হলেন এবং সম্ভবতঃ আমার দুঃখ উপলব্ধি করে, করুণায় বিগলিত হয়ে, তার অনুকম্পা মিশ্রিত স্বর্গীয় হাসিতে বিমোহিত করে আশীর্বাদ বর্ষণ করে গেলেন আমার ওপর।

দরজায় শব্দ হল; একজন নতুন স্তোত্রপাঠকারী ঢুকল, প্রথম স্তোত্রপাঠকারীকে কিছুটা বিশ্রাম দেবার জন্য। শব্দে আমি জেগে উঠলাম, এবং প্রথমেই যে চিন্তাটা আমার মনে এল তা হল, যেহেতু আমি একবারও কাঁদিনি, আর প্রথম থেকেই বেশ সোজা হয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাই হয়ত সবাই আমাকে ভাবছে আমি হৃদয়হীন; এবং শুধুমাত্র কৌতূহল কিংবা দয়াপরবশ হয়েই বোধ হয় ওখানে দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা মনে হতেই বুকে ক্রুশ করে মাথাটা নুইয়ে নিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলাম।

সেদিনকার সেই স্মৃতি যখন আজ মনে জাগে, তখন বুঝি যে আত্ম-বিস্মৃতির সেই বিশেষ মুহূর্তটাই ছিল প্রকৃত দুঃখের মুহূর্ত। মাকে কবর দেবার আগে কিংবা পরে কখনোই আমার কান্না এতটুকু থামেনি—সবসময়ই আমি দুঃখে কাতর হয়ে ছিলাম। কিন্তু আজ যখন সেই দুঃখের কথা ভাবি তখন এই ভেবে লজ্জা লাগে যে, সেদিনকার সেই দুঃখের প্রধান কারণ ছিল আমার নিজের প্রতি ভালবাসা, আর তার মৃত্যুতে আমিই যে সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছিলাম সেটা দেখাবার ইচ্ছা। তাছাড়া অন্যদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি ধারণা হচ্ছে তাও ভাবছিলাম, আবার কখনও বা অবাক হয়ে দেখছিলাম মিমির মাথার টুপিটা কিংবা উপস্থিত

অন্যান্যদের মুখমণ্ডল। আমার নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছিল এ ভেবে যে, আমার মধ্যে যে অনুভূতির জন্ম হয়েছিল তা শুধুমাত্র দুঃখের নয়, এবং চেষ্টা করছিলাম অন্য গুলোকে লুকিয়ে রাখতে। সে কারণেই আমার দুঃখ যে শুধু আন্তরিকতাহীন ছিল তাই নয়, ছিল অস্বাভাবিকও। তার ওপর, আমি যে দুঃখী এটা ভেবেও বেশ একটা মানসিক আনন্দ পাচ্ছিলাম। তাই বারবার চেষ্টা করলাম দুঃখের সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলতে, এবং তার ফলে অন্যগুলোর তুলনায় দুঃখের প্রকৃত অনুভূতিতে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল।

বিরাট দুঃখের পর যা হয়, শান্ত গভীর ঘুমে রাতটা কাটিয়ে, শুকোনো চোখের জল আর চনমনে স্নায়ু নিয়ে জেগে উঠলাম। মৃতের প্রতি শেষ কর্তব্য পালনের জন্য বেলা দশটা নাগাদ আমাদের ডাকা হল। মনিবাণীর কাছ থেকে শেষবিদায় নেবার জন্য সমবেত ক্রন্দনরত চাকরবাকরে সারাটা ঘর ভরে গিয়েছিল। মন্ত্রোচ্চারণের সময় আমি কেঁদে কেঁদে ক্রুশ করলাম, এবং মাটির প্রতি অর্ঘ দিলাম; কিন্তু সে প্রার্থনায় কোনই আত্মীকতা ছিল না, আর রক্তও হয়ে গিয়েছিল হীম শীতল। নিজের নতুন কোটটার জন্য বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম, কারণ সেটা হাতের কনুইয়ের কাছটায় বেশ আঁটোসাঁটো লাগছিল। প্যান্টেও যাতে বেশি ময়লা না লাগে সেদিকেও নজর ছিল বেশ তীক্ষ্ণ, এবং আশপাশের লোকদের প্রতি বেশ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাবা দাঁড়িয়েছিলেন কফিনটার ঠিক মাথার কাছটাতে। তার হাতের রুমালটার মতই তিনিও একেবারে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিলেন, এবং বেশ কষ্ট করে চোখের জলকে ধরে রেখেছিলেন। তার কালো কোটে ঢাকা দীর্ঘ দেহ, ভাবাকুল পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, চলাফেরায় সংযত পদক্ষেপ, আগের মতই সেই মহীয়ান এবং সুনিশ্চিতভাব, ক্রুশ করার সময় মাথা নোয়ানো, একহাত মাটিতে ঠেকিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে মোমবাতি নেওয়া, ধীরে কফিনের দিকে এগিয়ে যাওয়া—এ সবকিছুই মনে হচ্ছিল অসামান্য। যদিও আজও আমি জানিনা সেদিন বাবার সেই কর্মচঞ্চলতা, সেই অসামান্য ভাবভঙ্গি কেন যেন আমার মোটেই ভাল লাগেনি। দেওয়ালের দিকে মুখ করে মিমি কোনরকমে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পোশাকে বেশ ভাঁজ খেয়ে গিয়েছিল, এবং দাগও লেগেছিল কয়েক জায়গায়; মাথার টুপিটা কাত হয়ে পড়েছিল একদিকে, এবং চোখ দুটো ফুলে গিয়েছিল লাল হয়ে; মাথাটা নড়ছিল ক্রমাগত। তার ফোঁপানি কখনোই থামছিল না, এবং বারবার রুমাল আর হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখটাকে ঢাকছিলেন। এটা দেখে আমার মনে হয়েছিল, নিজের মুখটা অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে এবং ফোঁপানির মাঝখানে কিছুটা নিঃশ্বাস নেবার উদ্দেশ্যেই যেন উনি এমনটা করছিলেন। সেই মুহূর্তে, আগের দিন বাবাকে বলা মিমির কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, মার মৃত্যু তাকে এমনই আঘাত দিয়েছে যে তার আর বাঁচার মোটেই ইচ্ছে নেই; তিনি সবকিছুতেই হতাশ হয়ে পড়েছেন; মৃত্যুর আগে মা তার কথা বারবার স্মরণ করেছিলেন, এবং তার ও কাতেনকার জীবনকে নিশ্চিত করার বাসনা জানিয়েছিলেন। আর যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। হতে পারে, তার দুঃখ হয়ত সত্যিই খাঁটি ছিল, কিন্তু কোনক্রমেই তা অপবিত্র এবং নিঃস্বার্থ ছিলনা। লিউবোচকা, শোকের কালো পোশাক পরে, অশ্রুধৌত মুখে, মাথা নিচু করে শিশুসুলভ ভীতির দৃষ্টিতে

বারবার কফিনটার দিকে তাকাচ্ছিল। আর কাতেনকা, মুখে দুঃখের ছাপ সত্ত্বেও তেমন গোলাপী মুখ করে তার মার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবং ভোলোদিয়া, দুঃখের মাঝেও নিজেকে তেমনি স্বচ্ছন্দ রেখেছিল। মাঝে মাঝে, কোন একটা বিশেষ বস্তুর ওপর চিন্তিত দৃষ্টি রেখে হঠাৎ তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত ক্রুশ করে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে নিচ্ছিল। শোকযাত্রায় সমবেত সবাইকেই কেন জানি আমার অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তারা যে-সব কথা বলছিলেন, যেমন, মা যেখানে গেছেন সেখানে ভালই থাকবেন, তিনি এ জগতে থাকবার জন্য আসেননি—ইত্যাদি আমার মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করছিল।

তার সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলার, কিংবা তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার কি অধিকার ছিল তাদের? আমাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কে যেন বলল যে আমরা নাকি অনাথ। যেন ওদের সাহায্য না নিয়ে আমরা জানতেই পারতাম না যে, যেসব ছেলেমেয়েদের মা নেই তাদেরকে অনাথ বলে ডাকা হয়। আমাদের ওপর ব্যাপারটা চাপিয়ে দিয়ে তারা স্পষ্টতই খুশি হচ্ছিল—অনেকটা কুমারী মেয়ের বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই তাকে 'শ্রীমতী' বলে সম্বোধন করার মত আর কি।

হল ঘরের একেবারে কোণে, ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার দরজাটার আড়ালে ধূসর কেশের একজন মহিলা নতজানু হয়ে বসে হাত দুটো জুড়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র কাঁদছিলেন না। তিনি বলছিলেন, যাকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর থেকেও বেশি ভালবাসতেন, তিনি যেখানে চলে গেছেন তাকেও যেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়; এবং আশা প্রকাশ করছিলেন যে অতি শীঘ্রই তা হবে।

আমি ভাবলাম, 'এখানে মাত্র ঐ একজনই আছেন, যিনি সত্যি সত্যিই আমার মাকে ভালবাসতেন।' সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পর্কে লজ্জা বোধ করলাম।

শবযাত্রা শুরুর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এল। মার মুখের ঢাকনা সরিয়ে দেবার পর আমরা ছাড়া উপস্থিত অন্য সবাই একে একে কফিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাতে চুমু খেল।

শেষের দিকে যারা তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তাদের মধ্যে ছিল একজন কৃষক-রমণী। তার সঙ্গে ছিল বছর পাঁচেক বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ে; কিন্তু কি কারণে যে তাকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তা একমাত্র ভগবানই জানতেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতের নোংরা রুমালটা মাটিতে পড়ে গেল, এবং সেটাকে তুলে নেবার জন্য আমি ঝুঁকে পড়লাম। কিন্তু কোমরটা ভাঙতে না ভাঙতেই এক ভীত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমাকে চমকে দিল। এটা এত বেশি ভয়ার্ত ছিল যে আমি যদি একশ বছরও বাঁচি তবুও তা কখনও ভুলব না। এবং যখনই আমার সে কথা মনে পড়ে, তখনই মনে হয়, যেন প্রচণ্ড একটা শীতল বাতাস আমার সারাটা শরীরকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি মাথাটা তুললাম; দেখলাম, কফিনের পাশে রাখা একটা ছোট চৌকিতে দাঁড়িয়ে সেই কৃষক-রমণীটি মেয়েটির হাতটা অতি কষ্টে ধরে রয়েছে, এবং মেয়েটি বারবার হাত নেড়ে, ভীত চকিত নয়নে আমার মৃতা মার মুখের দিকে চেয়ে, ক্রমাগত আর্তনাদ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, এবং নিমেষের মধ্যে ঘর থেকে বের

হয়ে এলাম।

সেই মুহূর্তেই আমি বুঝলাম যে, ঐ জঘন্য গন্ধটা ধূনোর গন্ধের সাথে মিশে একাকার হয়ে সারাটা ঘরকে ভরিয়ে তুলেছে ; এবং ঐ মুখটা, যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সৌন্দর্য ও দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল, যাকে আমি পৃথিবীর অন্য যে কোন বস্তুর থেকে অনেক বেশি ভালবাসতাম, সেটাই এখন শুধুমাত্র ভয়ের জন্ম দিচ্ছে। কথাটা ভাবতেই আমার মন তিক্ততায় ভরে গেল, এবং আত্মা নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ শেষ দুঃখের স্মৃতি

মা আর আমাদের মধ্যে ছিলেন না, তবু আমাদের জীবন বয়ে চলেছিল স্বাভাবিক ধারায়। আমরা আগেকার মতই সেই একই ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে যেতাম এবং নির্দিষ্ট সময়েই উঠতাম ; সকাল এবং বিকেলের জলখাবার, দুপুরের ভোজ, রাতের আহার সব আগের মতই চলছিল ; টেবিল চেয়ার আগেও যেখানে ছিল সেখানেই রইল। কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটল না, না বাড়িতে, না আমাদের জীবনযাত্রায়—শুধু সেখানে অনুপস্থিত রইলেন একজন—আমাদের মা।

আমার মনে হয়েছিল, এমন একটা দুঃখজনক ঘটনার পর সবকিছু নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আমার কাছে মার স্মৃতির প্রতি অপমানকর বলে মনে হয়েছিল ; এবং তার অনুপস্থিতি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল।

পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের আগের দিন সন্ধ্যায়, খাবার শেষে আমি ঘুমোতে চাইছিলাম এবং সেই উদ্দেশ্যে, কারুকাজ করা গরম কম্বল মুড়ি দিয়ে পালকের বিছানায় শোব বলে নাতালিয়ার ঘরে গেলাম। নাতালিয়া তখন বিছানায় শুয়ে, এবং সম্ভবতঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু আমার পায়ের শব্দ পেয়েই সে কম্বলের তলা থেকে মাথাটা বের করে, তাতে টুপিটাকে ঠিক মত খসিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

খাবার পর এক চোট ঘুমিয়ে নেবার জন্য আমি প্রায়ই তার ঘরে যেতাম, এবং ঘরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারত আমার মতলবটা কি। বলত, 'তাহলে একটু বিশ্রাম করতে এসেছ, তাই না ? ঠিক আছে, শুয়ে পড়।'

এবারও তাই বলল। আমি বললাম, 'না, না, তা নয় ; এমনিই এলাম। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তুমিই ঘুমোও।'

সে বলল, 'আমি অনেক ঘুমিয়েছি (আমি জানতাম তিন রাত্রি সে চোখের পাতা মোটেই বন্ধ করেনি), তাছাড়া ঘুমের কথা এখন কে ভাবতে পারে বল।'

আমি তার সাথে আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করতে চাইছিলাম। জানতাম, সে মাকে কী প্রচণ্ড রকমের ভালবাসত। তাই তার সঙ্গে বসে যদি একত্রে কাঁদতে পারতাম তাহলে মনটা একটু হালকা হত।

বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নাতালিয়া, তুমি কি এটা আশংকা করেছিলে ?'

সম্ভবতঃ কেন আমি তাকে এমন প্রশ্ন করছি তা বুঝতে না পেরে, বৃদ্ধা মহিলা আমার দিকে বিস্ময় এবং কৌতুকে তাকিয়ে রইল।

আমি পুনরাবৃত্তি করলাম, 'কে-ই বা তা ভাবতে পেরেছিল ?'

আমার দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'উঃ সোনা, আমি

এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি একজন বুড়ি, আমার অথর্ব দেহটাকে উচিত ছিল অনেক আগেই শান্তিতে শুইয়ে দেওয়া। কিন্তু তার বদলে কবরে পাঠানো হল তোমার দাদু নিকোলাই মিখাইলোভিচকে আর আমার দু ভাই এবং বোন অনুশকাকে—যারা প্রত্যেকেই আমার থেকে বয়সে ছোট ছিল। তার ওপর এখন কেড়ে নেওয়া হল তোমার মাকে। আর কেড়ে নেওয়া হল এ কারণেই যে স্বর্গে ভাল আত্মারই প্রয়োজন বেশি—এবং তোমার মা ছিল সত্যিকারের ভাল আত্মার অধিকারিণী।'

এই সহজ চিন্তায় আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম, সরে বসলাম নাতালিয়ার গা ঘেঁষে। সে হাত দুটোকে বুকের কাছে জড়ো করে ওপর দিকে তাকাল; তার ফোলাফোলা জলভরা চোখ দুটোতে প্রকাশ পেল শান্ত বেদনার অভিব্যক্তি। মনে হল, দৃঢ়তার সঙ্গে সে একথা বিশ্বাস করে যে, যার প্রতি তার হৃদয়ের সমগ্র ভালবাসাকে সে উজাড় করে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে ভগবান কিছুতেই তাকে তার কাছ থেকে আর খুব বেশিদিন দূরে সরিয়ে রাখবেন না।

সে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। আমি তাকে দেখা-শোনা করতাম, তার পোশাক পরিয়ে দিতাম, আর সে আমাকে আধো আধো স্বরে ডাকত "নাশা" বলে। ছোট ছোট পা ফেলে আমার কাছে ছুটে এসে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু খেয়ে বলত, "আমার সুন্দর নাসিক।" আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলতাম, "না খুকুমণি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। দাঁড়াও, আগে বড় হও, বিয়ে হোক—তারপর দেখবে নাশাকে একেবারে ভুলে গেছ।" সে বলত, "না, যদি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারি তবে কিছুতেই বিয়ে করব না। আমি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না।" অথচ এখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল, আমার জন্য আর একটুও অপেক্ষা করতে পারল না। তাহলেই বোঝ, সে আমাকে কেমন ভালটা বাসত! আর সত্যি কথা বলতে কি, কাকেই বা সে কম ভালবেসেছিল? তুমি কখনও তোমার মাকে ভুলে যেওনা; সে কোন সাধারণ মহিলা ছিল না, ছিল স্বর্গের দেবদূতী। যখন তার আত্মা স্বর্গে পৌঁছবে তখনও সে তোমাকে ঠিক আগের মতই ভালবাসবে, আগের মতই তোমাকে নিয়ে আনন্দ করবে।'

আমি বললাম, 'তুমি কেন বলছ যে সে যখন স্বর্গে পৌঁছবে? আমার তো মনে হয় সে এখন সেখানেই।'

আমার কাছে আরও বেশি সরে এসে বেশ নিচু স্বরে নাতালিয়া বলল, 'না সোনামণি, তার আত্মা এখন এখানেই রয়েছে।' কথাটা বলে সে ওপর দিকে দেখাল। আবেগ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে এমন ফিসফিসিয়ে কথা বলল যে কিছু একটা দেখার আশায় আমিও অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ তুলে এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। সে বলল, 'এক্ষুণি যে আত্মা স্বর্গের পথে যাত্রা করল তাকে চল্লিশটা বাধা অতিক্রম করতে হবে; এবং সে কারণে চল্লিশ দিন সে এ বাড়িতেই থাকতে পারে।'

এই একই সুরে অনেকক্ষণ ধরে এমন সরলতা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সে কথা বলে গেল যে মনে হল যেন নিত্যকার কোন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছে। এতে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগতেই পারে না। তার কথা শোনার সময় আমি

প্রায় দম বন্ধ করেছিলাম, এবং যদিও সে ঠিক কি বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না, তবে তার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করেছিলাম।

অবশেষে সমাপ্তি টেনে বলল, "হ্যাঁ সোনা, এখন সে এখানেই আছে। সে আমাদের দেখছে, এবং সম্ভবতঃ এখন আমরা যা বলছি, তা শুনছে।'

সে মাথাটা ঝুঁকিয়ে নীরব হল। চোখের জল মোছার জন্য একটা রুমাল চাইল, তারপর মুখ তুলে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আবেগপূর্ণ কম্পিত স্বরে বলল, 'ভগবান এভাবেই আমাকে অনেকটা কাছে টেনে নিলেন। আর এখানে এখন আমার জন্য রইলটাই বা কি? কার জন্য আমি বেঁচে থাকব? কাকেই বা ভালবাসব?'

চোখের জল কোন রকমে আটকে রেখে ক্ষোভপূর্ণ স্বরে বললাম, 'তাহলে কি তুমি আমাদের মোটেই ভালবাসনা?'

'ভগবান জানেন আমি তোমাদের কতটা ভালবাসি। তবে এটা ঠিক, তাকে যতটা ভালবাসতাম তেমন আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি, ভবিষ্যতে কখনও পারবও না।' এরপর আর একটা কথাও তার মুখ থেকে বের হল না; দূরে সরে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

আমি আর ঘুমোবার কথা মোটেই ভাবলামনা; নীরবে পরস্পরের বিপরীতে বসে কাঁদতে লাগলাম।

ফোকা ঘরে ঢুকল; আমাদের অবস্থা দেখে, সম্ভবতঃ আমাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না ভেবে, নীরবে অস্পষ্টে তাকিয়ে দরজার দিকে এগোল।

'কি চাইছ ফোকা?' কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করল নাতালিয়া।

'দেড় পাউণ্ড কিসমিস, চার পাউণ্ড চিনি আর তিন পাউণ্ড চাল—পায়েসের জন্য।'

ঝট্‌তি একটিপ নস্যি নিয়ে, দ্রুত পায়ে বাসন রাখার তাকগুলোর দিকে এগোতে এগোতে নাতালিয়া বলল, 'দাঁড়াও, এক্ষুণি দিচ্ছি।' তার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যা কিনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম বলে সে মনে করেছিল, আমাদের কথাবার্তায় এতক্ষণ ধরে যে শোক বিরাজ করছিল, তা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

পাল্লায় চিনি মাপতে মাপতে সে বলল, 'চার পাউণ্ড চিনি দিয়ে তুমি করবেটা কি? সাড়ে তিন পাউণ্ডেই যথেষ্ট।' কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা চিনি তুলে নিল পাল্লা দিয়ে, 'আর এতটা চালই বা লাগবে কিসে? কালই তো আট পাউণ্ড দিলাম। জানি তোমার এতে কোন দোষ নেই, তবে আমি আর দিতে পারছি না। ভানকা তো দেখছি বেশ ফুর্তিতেই আছে, কারণ বাড়িটা এখন একেবারে কর্ত্রীবিহীন। ও ভাবছে, দেখবার তো আর কেউ নেই। না, এভাবে আমি মালিকের সম্পত্তি নিয়ে কাউকেই ছিনিমিনি খেলতে দেব না। আট পাউণ্ড! এমন কথা জন্মেও কেউ শুনেছে!'

'কি করা যাবে! ও তো বলছে সবটাই খরচ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, তাহলে নিয়ে যাও। এটা তবে সেই নিক।'

যে কোমল আবেগের সঙ্গে সে আমার সাথে কথা বলছিল, তা থেকে হঠাৎ এমন হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে চলে যাওয়ায় আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

পরে এ সম্পর্কে ভেবে বুঝেছি, মনের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সত্ত্বেও সে সবসময়ই নিজেকে কর্তব্যকর্মে জড়িয়ে রাখার কথা ভাবছিল, এবং তার প্রথাগত অভ্যাসই ছিল এ ব্যাপারে প্রধান সহায়ক। তাছাড়া তার দুঃখ ছিল এত গভীর এবং খাঁটি যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারে মন না দিতে পারার কোন ভান করতে হয়নি তাকে, এমনকি এ ব্যাপারে যে কেউ কিছু ভাবতে পারে সেটাও তার মনে আসেনি কখনও।

প্রকৃত দুঃখের কাছে গর্বের অনুভূতির কোন স্থানই নেই, তবু অনেক সময় দেখা যায়, অনেকেই তার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা গর্বকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারে না; দুঃখের সময় তা শোক, অ-সুখ বা দৃঢ়তার প্রকাশ হয়ে ফুটে ওঠে। এবং এইসব তুচ্ছ বাসনা, যা আমরা মুখে স্বীকার করতে চাই না, অথচ যার দ্বারা সর্বদা তাড়িত হই, ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যেও তা অনেক সময় আমাদেরকে শক্তি, মর্যাদা এবং সত্য থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু নাতালিয়া তার দুঃখে এত বেশি আঘাত পেয়েছিল যে, তার হৃদয়ে আর কোন বাসনাই অবশিষ্ট ছিলনা, সে বেঁচেছিল শুধু মাত্র অভ্যাসের বশেই।

ফোকার চাহিদা মিটিয়ে, পুরোহিতদের খুশি করার জন্য পিঠে বানাবার কথা স্মরণ করিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে, মোজাটা হাতে তুলে নিয়ে সে আবার এসে বসল আমার পাশে। আগের মত সেই একই বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হল, এবং আমরা আবার কাঁদতে শুরু করলাম।

নাতালিয়ার সাথে একই কথার পুনরাবৃত্তি হত প্রতিদিন; তার শান্ত চোখের জল, অচঞ্চল ভাব আর ভক্তিপূর্ণ কথা আমাকে স্বস্তি এবং সান্ত্বনা দিত।

কিন্তু অবশেষে একদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের তিনদিন পরে আমাদের গোটা সংসারটা মস্কোতে স্থানান্তরিত হল, এবং এরপর আর কখনও তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

আমরা পৌঁছবার পর দিদিমা সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটা পেলেন এবং বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমাদের কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না, এবং পুরো একটা সপ্তাহ তিনি অচৈতন্য হয়ে রইলেন। ডাক্তাররা তার জীবনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। এ সময় তিনি যে শুধু ওষুধ খেতেন না তাই নয়, এমনকি কারও সঙ্গে কথা বলা, ঘুমানো কিংবা সেবাশুশ্রূষা গ্রহণ করা—কিছুই করতেন না। কখনও কখনও নিজের ঘরে হাতলওলা চেয়ারটায় বসে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়তেন, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন এক ফোঁটা চোখের জলও না ফেলে; আবার কখনও বা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করতেন, অসংলগ্ন কথা বলতেন কিংবা ভিরমি খেতেন। এটাই ছিল তার জীবনে প্রথম প্রকৃত দুঃখের অনুভূতি এবং এটা তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল এ ভয়াবহ নৈরাশ্যের জগতে। তিনি যেন ব্যাপারটার জন্য কাউকে দোষ দিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন, এবং প্রায়ই কোন অশরীরীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করতেন, উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতেন, সারা ঘরে পায়চারি করতেন এবং সবশেষে একসময় জ্ঞান হারাতেন।

একবার কি যেন একটা কারণে আমি তার ঘরে ঢুকেছিলাম। তিনি তখন তার হাতলওলা চেয়ারটায় বসেছিলেন এবং তাকে দেখে আমার বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখদুটো পূর্ণ খোলা ছিল, কিন্তু দৃষ্টিটা মনে হচ্ছিল ঘূর্ণায়মান এবং শূন্য; তিনি

আমাকে না দেখেই যেন আমার প্রতি সোজা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। তার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, এবং অত্যন্ত সংযত স্বরে বললেন, 'এদিকে আয়, সোনা, এদিকে আয়।' আমি ভাবলাম তিনি নিশ্চয় আমাকেই ডাকছেন এবং সে কারণে তার কাছে গেলাম; কিন্তু দেখলাম তিনি আমার দিকে ফিরেও দেখছেন না। বললেন, 'উঃ তুই যদি বুঝতিস, কী কষ্টটাই না আমি পেয়েছি, আর এখন তুই আসাতে কী আনন্দটাই না হচ্ছে!' তখন বুঝলাম উনি মাকে কল্পনা করছেন, এবং ভাবছেন যে তিনি এসে গেছেন। তাকে উদ্দেশ্য করে ভ্রূকুঁচকে তিনি বলেই চললেন, 'ওরা আমাকে বলেছে যে তুই নাকি মারা গেছিস। কী নির্বোধ, আমার আগে তুই মারা যাবি-ই বা কী করে?' তারপরই হঠাৎ তিনি বিকট হাসিতে ফেটে পড়লেন।

গভীরভাবে ভালবাসতে যারা সক্ষম, তারা দুঃখও পায় তেমনি গভীর। অবশ্য সেই ভালবাসাই আবার তাদের মনের দুঃখের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাকে সারিয়ে তোলে। সে কারণে মানুষের নৈতিক প্রকৃতি শারীরিক প্রকৃতির থেকে অনেক বেশি দৃঢ় এবং সেজন্যই দুঃখ তাকে কখনও খতম করতে পারে না।

এক সপ্তাহ পর দিদিমা প্রাণ খুলে কাঁদলেন, এবং তার অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হল। প্রকৃতিস্থ হবার পর তার প্রথম চিন্তা হল আমাদের নিয়ে, এবং আমাদের প্রতি তার ভালবাসাও বেড়ে গেল অনেক গুণ। তার হাতলওলা চেয়ার ছেড়ে আমরা কখনও নড়তাম না; তিনি মৃদু সুরে কাঁদতেন, মার কথা বলতেন, এবং আমাদের আদর করতেন।

এমন কারও কথা আমি ভাবতে পারি না, যে কিনা মনে করত যে দিদিমা তার দুঃখকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করছিলেন, এবং সত্যি বলতে কি তার দুঃখের প্রকাশ ছিল সত্যিই মর্মস্পর্শী; তবু কেন জানিনা, আমার আজও মনে হয়, নাতালিয়ার থেকে পবিত্র এবং আন্তরিকভাবে আর কেউই মাকে ভালবাসেনি।

মার মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার শৈশবের সুখের দিনের অবসান হল, এবং শুরু হল এক নতুন পর্ব—কৈশোর। আর যদিও নাতালিয়ার স্মৃতি আমার শৈশবের দিনগুলোর সঙ্গে একাত্ম এবং যদিও তারপর আর কখনোই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি—তবু তার জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে আমি দু চারটে কথা বলব।

আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর সে গ্রামেই থেকে যায়, এবং হাতে কোন কাজ না থাকায় তার সময় যেন আর কাটতেই চাইত না। একটা না একটা কাজ সে সবসময়ই করবার চেষ্টা করত, কিন্তু অল্পবয়স থেকে যে ব্যবস্থার সঙ্গে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ কর্তার উপস্থিতি, চারদিকের গোলমাল—এসব আর তখন ছিল না। পরিবর্তে দুঃখ, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পরিবর্তন, দায়িত্বভারের অনুপস্থিতি—ইত্যাদি তার মধ্যে এক অদ্ভুত অভিযোগপূর্ণ মানসিকতার জন্ম দিল। মার মৃত্যুর বছরখানেক পর তার পেটে উদরী হয়, এবং সে শয্যা নিতে বাধ্য হয়।

আমার মনে হয়, নাতালিয়ার পক্ষে জীবনধারণ করাটাই কঠিন হয়ে পড়েছিল, আবার তার ওপর বন্ধুবান্ধবহীনভাবে পেত্রোভস্কোয়ার বিরাট বাড়িটায় একা একা থাকাটা হয়ে ওঠেছিল আরও কঠিন। যদিও সে-বাড়িতে প্রত্যেকেই তাকে যথেষ্ট ভালবাসত এবং শ্রদ্ধাও করত কিন্তু নাতালিয়া কখনও কারও সঙ্গে কোনরকমের বন্ধুত্ব পাতায়নি, আর সেজন্য সে নিজেও মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করত। সে ভেবে নিয়েছিল, ঘরগেরস্থালীর দায়িত্ব নিয়ে, একই সঙ্গে কর্তার

বিশ্বাসভাজন হওয়া আবার অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মোটেই সম্ভব নয়, কারণ তাতে কারও না কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব জন্মে যেতে পারে, এবং তার ফলে নিন্দনীয় হীনমন্যতার সৃষ্টি হতে বাধ্য। সে কারণে, এবং অন্যান্য চাকরবাকরদের সঙ্গে আর স্বভাবের কোন সাদৃশ্য না থাকায় সে সর্বদা আলাদা থাকত আর বলত, তার কেউ শত্রুও নেই আবার মিত্রও নেই ; তবে কর্তার ক্ষতির ব্যাপারে সে কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয় মোটেই।

নিজের অনুভূতিকে প্রার্থনা মারফত ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরে সে সান্ত্বনা খুঁজত এবং তা পেতোও। তবুও কখনও কখনও কোন দুর্বল মুহূর্তে, যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এসে থাকে, এবং যে সময় আমরা চোখের জলে কারও না কারও সাহচর্য কামনা করি, সে সময় সে তার ছোট্ট কুকুরটাকে নিজের বিছানায় ঢুকিয়ে নিত এবং সেটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিঠ চাপড়াত আর কাঁদত (কুকুরটা তার হাত চাটত এবং হলদে চোখ দুটো দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। তার দিকে)। তারপর সেটা যখন করুণ সুরে ডাকা শুরু করে দিত তখন সে বলত, 'খুব হয়েছে, আর কাঁদতে হবে না। তুই না বললেও আমি জানি, আমার সময় হয়ে এসেছে।'

মৃত্যুর মাসখানেক আগে একদিন তার সিন্দুকটা থেকে কিছুটা সাদা কাপড়, কিছুটা সাদা মসলিন এবং কিছুটা গোলাপী ফিতে বের করল সে। পরিচারিকাদের সাহায্যে একটা পোশাক আর একটা সাদা টুপি বানাল, এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করল। সিন্দুকের ভেতরে রাখা মালিকের জিনিসপত্র আলাদা করে তার একটা তালিকা বানিয়ে সব কিছু দেওয়ানকে বুঝিয়ে দিল। অবশেষে নিজের জন্য যা অবশিষ্ট রইল তা হল, দুটো সিল্কের পোষাক, দিদিমার দেওয়া একটা পুরনো শাল, দাদুর সামরিক পরিচ্ছেদ— যেটা তিনি তাকেই দিয়েছিলেন। তার যত্নের সত্যিই কোন তুলনা ছিলনা। এতদিন পরেও দাদুর পোশাকের ঝালর ... রে ছুঁচের কাজ বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি।

মৃত্যুর আগে সে বলে গিয়েছিল, ঐ পোশাকগুলোর মধ্যে গোলাপী রঙের পোষাকটা যেন ভোলোদিয়াকে দেওয়া হয় ...লে জামা বা জ্যাকেট বানাবার জন্য আর বাদামীটা যেন দেওয়া হয় আমাকে ...ই একই উদ্দেশ্যে, এবং শালটা যেন দেওয়া হয় লিউবোচকাকে। তাছাড়া এ-ও বলে গিয়েছিল যে, আমাদের মধ্যে যে আগে অফিসার হতে পারবে সেই পাবে দাদুর সামরিক পোশাকটা। এছাড়া শ্রাদ্ধের জন্য ৪০ রুবল বাদে বাকি সবকিছুই সে দিয়ে গিয়েছিল তার ভাইকে। তার ভাই বেগার-প্রথা থেকে মুক্তি পেয়ে দূরে কোথায় লম্পটের জীবনযাপন করছিল, ফলে তার সঙ্গে নাতালিয়া জীবৎকা... কোন যোগাযোগই রাখেনি।

নাতালিয়ার ভাই যখন তার প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝে নিতে এসে শুনল যে তার দিদি মরবার আগে তার সারাজীবনের সঞ্চয় মাত্র পঁচিশ রুবল নগদ রেখে গেছে, তখন সে সেকথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না এবং বলল, যে একটি বিত্তবান পরিবারে ভাঁড়ার-ঘরের সর্বময়কর্ত্রী হয়ে জীবনের ষাটটা বছর কিপটের মত কাটিয়ে গেল, এবং যা পেত তাই জমাত, সে মরার সময় কিছুই রেখে যায়নি এটা মোটেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনাটা ছিল সত্যিই তাই।

মৃত্যুর আগে নাতালিয়া দু মাস রোগে ভুগেছিল, এবং যথার্থ খ্রীষ্টীয় ধৈর্যের

সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। সে কখনও গোঙাত না, এবং কারও কাছে অনুযোগও করত না—শুধু প্রার্থনা জানাত। শেষমুহূর্ত ঘনিয়ে আসার একঘণ্টা আগে স্বীকারোক্তি ও স্যাক্রামেন্ট সেরে ফেলে শান্তচিত্তে সে দেবানুগ্রহের লাভ করেছিল।

যদি কখনও নিজের অজান্তে কাউকে কোনরকম আঘাত দিয়ে থাকে তারজন্য বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যাজক ভাসিলিকে বলে যায়, তিনি যেন আমাদের জানান যে, আমাদের অনুগ্রহের জন্য কিভাবে যে ধন্যবাদ জানাতে হবে তা সে নিজেই ঠিক করে উঠতে পারেনি, এবং কখনও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাউকে সে আঘাত দিয়ে থাকে তারজন্য যেন তাকে ক্ষমা করা হয়, এবং বলে, 'আমি কখনও চোর ছিলাম না, আর জোর দিয়েই বলতে পারি কোনদিন ভুলেও আমি আমার মালিককে এতটুকু প্রতারণা করিনি।' এটাই ছিল তার মধ্যে সবথেকে মহৎ গুণ—যাকে সে নিজেও মূল্য দিত।

নিজের তৈরী পোশাক আর টুপি পড়ে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল, এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাজকের সঙ্গে কথা বলায় তিলমাত্র ক্লান্তি দেয়নি। সে সময় সে উপলব্ধি করেছিল যে গরিবদের জন্য সে কিছুই রেখে যাচ্ছে না; এবং সে কারণেই যাজকের হাতে দশটা রুবল দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল, সেই সামান্য অর্থ যেন সেই এলাকার গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এরপর ক্রুশ করে সে শেষবারের মত পেছনদিকে এলিয়ে পড়ে এবং বেশ আনন্দপূর্ণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে।

বিনা অনুশোচনায় সে জীবনকে ছেড়ে গেল এবং মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় না করে বরং দেবতার আশীর্বাদ হিসেবেই তাকে গ্রহণ করল। যদিও কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটাকে মেনে নিতে পারে কজন? তবে নাতালিয়া তা মেনে নিতে পেরেছিল এ কারণেই যে, সে বিশ্বাস করত জীবনের প্রতিটি কর্তব্যই সে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিল। আর সত্যি সত্যিই তার জীবন ছিল পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগে পূর্ণ।

যদি তার বিশ্বাস আরও প্রশস্ত হত, যদি তার জীবন আরও উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত হত, তাহলে কি হত? কিন্তু সেরকমটি ছিল না বলে কি তার আত্মা সেইসব মহৎ আত্মার থেকে বিন্দুমাত্র কম ভালবাসা কিংবা কম প্রশংসা পাবার যোগ্য? সে তো জীবনের মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম কার্য সমাপন করে গিয়েছিল—মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিল ভীতিহীন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

তার ইচ্ছা অনুযায়ী, মার স্মৃতিসৌধের কিছুটা দূরেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা, বিচুটি আর ভাটুই গাছের ঝোপের আড়ালে উঁচু ঢিবিটার নিচে সে শুয়ে আছে; মার স্মৃতি সৌধের কাছে যখনই গেছি, তখন সেই বেড়ার কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেই মহৎ আত্মাকে প্রণতি জানিয়ে আসতে কখনও ভুলিনি।

কখনও কখনও মার স্মৃতিসৌধ আর সেই কালো বেড়াটার মাঝ পথটায় নীরবে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মনে জেগে উঠেছে বহু বেদনাদায়ক পুরনো স্মৃতি। মনে হয়েছে; এই দুটি আত্মার মধ্যে কি ভগবান আমাকে যোগসূত্র রচনা করতে দেবেন, যাতে কিনা চিরকাল আমি তাদের জন্য বিলাপ করে যেতে পারব?

॥ সমাপ্ত ॥

কৈশোর

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ বিরামবিহীন যাত্রা

পেত্রোভস্কোয়ার বাড়ির চত্বরে আবার দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল। তার প্রথমটায় বসে মিমি, কাতেনকা, লিউবোচকা. চাকরানী আর ইয়াকভ, এবং দ্বিতীয়টায় আমি, ভোলোদিয়া আর চাপরাসি ভাসিলি—যাকে সদ্য সদ্য আবার কাজে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।

বাবা, যিনি আর কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সাথে একত্রিত হবার জন্য মস্কো যাবেন, তিনি টুপিবিহীন মাথায় বাইরে দাঁড়িয়ে জুড়ি আর ছেকড়া—দুটো গাড়ির জানলার ওপরেই ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিলেন।

'যত দূরেই যাও, প্রভু যিশু যেন সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকেন।' ইয়াকভ এবং কোচোয়ান (আমরা আমাদের নিজস্ব গাড়িতেই ভ্রমণ করছিলাম) তাদের মাথায় টুপি নামিয়ে ক্রুশ করে বলল, 'ভগবান আমাদের সহায় হোন; চল্ চল্, হট্…'

আমাদের গাড়ি বেশ ধীর কদমে এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে চলতে লাগল—মনে হল বার্চের সারিও যেন উলটো দিকে ঠিক সেই একই গতিতে একটার পর একটা ছুটে চলল। তখন আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই, পেছনে কি ফেলে যাচ্ছি তার জন্য এতটুকু চিন্তা নেই, বরং সামনে কি দেখতে পাব তারজন্যই সর্বদা উন্মুখ। যে সব বেদনার স্মৃতি মনের মধ্যে জমে থেকে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, সেগুলো একে একে সরে যেতে মনটা বেশ হালকা বোধ হল, এবং সেই ফাঁকটুকু ভরে গেল আশা, উদ্যম আর শক্তিতে।

একটানা যাত্রার দিনগুলো য শুধু আনন্দেই কাটিয়েছি তা বলব না—কারণ তখনও আমার মনে আনন্দ সম্পর্কে একটা খুঁতখুঁতে ভাব বিরাজ করছিল—তাই একথা বলাটাই ঠিক হবে যে, সে চারটে দিন কেটেছিল স্বস্তি আর আরামে।

তখন আমার চোখের সামনে মার ঘরের সেই দরজাটা, যেটা পেরোতে গেলেই সারাটা গা শিরশির করে উঠত—সেটা আর ছিল না। পিয়ানোটা—যার দিকে তাকাতে সকলেই ভয় পেত, খোলা তো দূরের কথা—সেটাও অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। শোকের পোশাক (আমরা সবাই সাধারণ পোশাক পরে ভ্রমণ করছিলাম) কিংবা জীবনের ভয়াবহ ক্ষতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারত যে-সব বস্তু তার কোনটাকেই আর আমাকে দেখতে হচ্ছিল না। তার পরিবর্তে দেখছিলাম ছবির মত সুন্দর বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর; আর বসন্তের আমেজ আমার হৃদয়ে জাগরিত করছিল ভবিষ্যতের তৃপ্তি ও উজ্জ্বল আশাকে।

একেবারে কাক-ডাকা ভোরে, নতুন চাকরিতে লাগা অত্যুৎসাহী লোকেদের মত ভাসিলি আমাদের কম্বল ধরে টানাটানি করতে করতে বলল যে যাত্রার সময় হয়ে গেছে এবং সব প্রস্তুতি সমাপ্ত। এ সময়ে কেউ যদি আরও অন্ততঃ পনেরটা মিনিটও একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করে এবং তারজন্য জেদ করে কিংবা রাগ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকে, তবু কম করেও ভাসিলি সে কম্বলে বারকুড়ি টান

দেবেই। ফলে, তাকে বাধ্য হয়েই উঠে মুখ ধুতে যেতে হবে।

মাঝের ঘরটায় সামোভারটা ততক্ষণে ফুটতে শুরু করেছে, এবং মিটকা, যে গাড়ির পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে যায়, সে তাতে ফুঁ দিতে দিতে নিজের মুখটাকে একেবারে গলদা চিংড়ির মত লাল করে ফেলেছে। দরজার বাইরের সেঁতসেঁতে ভাব আর কুয়াশায় মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট আবর্জনার স্তূপে আগুন লেগেছে। ঘুম ভাঙ্গা সূর্যের কিরণে সারাটা পূর্বাকাশ রঞ্জিত, আর শিশিরভেজা ঘরের ছাউনিতে তার উজ্জ্বল প্রতিফলন। এ সত্ত্বেও আমাদের নজরে পড়ল, নিচে দানা-পানির গামলাটার সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো, আর বারবারই কানে এল তাদের গলা-ছাড়া ডাক।

শুকনো সারের স্তূপের ওপর একটা কালোরঙা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল অলসভাবে; ভোর হবার সাথে সাথেই আলমোড়া ভেঙ্গে সে পায়চারি করা শুরু করে দিল বাড়ির চত্বরে। চাকরানী বেশ কঁ্যাচ কঁ্যাচে শব্দে দরজা খুলে গরুর পালকে বার করে দিল রাস্তায়, আর সেগুলো সমবেত হাম্বা রবে ডেকে চলল। তারপর সে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দু চারটে কথা বলল। ওদিকে ফিলিপ তার জামার হাতা গুটিয়ে পাতকুয়া থেকে বালতি বালতি জল তুলে ভর্তি করল ওককাঠের তৈরি বিরাট গামলাটা, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতিহাঁসগুলো তাতে ডুব দিয়ে স্নান সেরে নিল; আর আমি ওপর থেকে তাকিয়ে রইলাম তার ঘন চাপদাড়িতে পরিপূর্ণ সুন্দর মুখ এবং পেশীবহুল হাত দুটোর দিকে।

গতকাল সন্ধ্যায় আমরা যেখানে বসে গল্প করেছিলাম, এবং রাতে মেয়েদের সাথে নিয়ে মিমি যেখানে শুয়েছিলেন, সেই দেওয়ালের ওপাশ থেকে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল। আমাদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য ওদের চাকরানী মাশা কাপড়ের তলায় ঢেকে কী সব জিনিস নিয়ে বারবার যাওয়া-আসা করছিল। অবশেষে সে দরজা খুলে চা খাওয়ার জন্য আমাদের ভেতরে যেতে আহ্বান জানাল।

ভাসিলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বারবার ঘর-বার করছিল, এবং আমাদের দিকে তির্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে এক একবার একা একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল আর মারিয়া ইভানোভাকে তাগাদা দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি করবার জন্য। ঘোড়া-জোতা হয়ে গিয়েছিল এবং বারবার ঘন্টা বাজিয়ে তারা যেন তাদের অস্থিরতাকে প্রকাশ করছিল। বাক্স-প্যাটরা, জামাকাপড়ের সুটকেস সবকিছু তোলা হয়ে গেলে আমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসলাম। বসবার পর প্রতি দিনই মনে হত এত মাল কোথা থেকে, আর আগের দিন ওগুলো ছিলই বা কোথায়? বিশেষতঃ আমার পায়ের নিচে আখরোট কাঠের চায়ের বাক্সটা রাখাতে আমার খুব রাগ হল। কিন্তু ভাসিলি বলল ওটা নাকি ঠিক ধরে যাবে; ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে সেটা মেনে নিতে হল।

পূবদিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মেঘের পাহাড় টপকে সূর্য মুখ বাড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোর পরশে ঝিলমিলিয়ে উঠল চতুর্দিক। আমার চোখে সবকিছুকেই মনে হল চমৎকার, আর হৃদয় ভরে উঠল আনন্দে। শিশিরভেজা ঝলমলে সবুজ ঘাস আর ফসলকাটা হলুদ ক্ষেতকে পাশে ফেলে এগিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা চওড়া রাস্তাটা, তার দু ধারে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে উইলো গাছ, আবার কোথাও হয়ত ছোট ছোট পাতায় ভর্তি একটা বার্চ তার প্রশস্ত ছায়া মেলে দিয়েছে নুয়ে পড়া সবজে ঘাস আর কাদার বুকে আঁকা গাড়ির চাকার দাগের ওপর। গাড়ি চলার একঘেয়ে শব্দ আর ঘণ্টাধ্বনিকে অতিক্রম করে কানে এসে পৌঁছচ্ছিল লার্ক পাখির মধুর সঙ্গীত। পোকামাকড়ে কাটা পুরনো কাপড় আর গাড়ির ভেতরকার ভ্যাপসা গন্ধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল নির্মল প্রভাতের মধুর পরশে, আর আমি আমার মনের গভীরে উপলব্ধি করছিলাম এক অস্বস্তিকর আনন্দ—যা কিছু একটা করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম, এক কথায় বলা যেতে পারে আমার মনে জেগে উঠল প্রকৃতিকে উপভোগের ইচ্ছা।

ডাক-বাংলোয় থাকাকালীন আমি আমার প্রার্থনা সেরে নিতে পারিনি, কিন্তু আগে প্রায়-ই দেখেছি এ ধরনের ভুল হলে পরেই কোন না কোন একটা বিপদ ঘটেই—তাই ভুলটা শুধরে নেবার জন্য চেষ্টা করলাম। গাড়ির এক কোনায় বসে মাথার টুপিটা খুলে, জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, বুকে এমনভাবে ক্রুশ করলাম যাতে কেউ তা দেখতে না পায়। তবু হাজার রকম বাইরের বস্তু আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল, এবং আমি প্রার্থনার বিশেষ কয়েকটা শব্দই বারবার আউড়ে যেতে লাগলাম।

রাস্তার দুপাশের সরু পায়েচলা পথটা ধরে বেশ কিছু লোককে ধীর হেঁটে যেতে দেখলাম—তারা তীর্থযাত্রী। তাদের মাথায় রুমাল জড়ানো, পেছনে বার্চ-গাছের বাকলে তৈরি ঝোলা, আর পায়ে নোংরা কাপড়ে মোড়া জুতো। তারা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই এগিয়ে চলল। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, ওরা কোথায় যাচ্ছে, এবং কেন? এ যাত্রা কি খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হবে? রাস্তায় ওদের যে ছায়া পড়ছে, তাকি পথের পাশে দণ্ডায়মান উইলো গাছের ছায়ার সঙ্গে মিশে যাবে? ঠিক এই সময় চার ঘোড়ার একটা জুড়ি গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে এল আমাদের দিকে; এবং মাত্র দু সেকেণ্ডের মধ্যে, তার যাত্রীরা কৌতূহল মিশ্রিত হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে, আমাদের গাড়ি থেকে মাত্র এক হাত দূর দিয়ে অতিক্রম করে গেল। সেই মুহূর্তে এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর বলে বোধ হল যে, ওই মুখগুলো এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি, এবং ভবিষ্যতেও আর কখনও দেখব না।

এরপর এল এক জোড়া রোমশ ঘর্মাক্ত ঘোড়া—রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে। তার পিছে পিছে অন্য একটা ঘোড়ায় চড়ে, গলা ছেড়ে বেশ বিষণ্ণ সুরে গান গাইতে গাইতে, ভেড়ার লোমের টুপিটাকে মাথার একধারে হেলিয়ে দিয়ে, লম্বা পা দুটোকে জিনের দু পাশে ছড়িয়ে রেখে, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এল একটি ডাক-হরকরা। তার মুখের হাবভাবে তাকে একটু বেশি আলসে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে হল আমার যে ভাবলাম, ওর মত ঘোড়ায় চড়ে বিষণ্ণ সুরে গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ফেরার থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আর কিছুতেই হতে পারে না। দেখলাম, দূরে নীল আকাশের দিকে উদ্ধত মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবজে চুড়োওলা একটা গ্রাম্য গির্জা; আর অন্যদিকে লাল ছাদওলা গৃহস্থ বাড়ি, সামনে সবুজ বাগান। মনে মনে ভাবলাম, ও বাড়িটায় কে থাকে? ওখানে কি ছেলেরা থাকে, তাদের বাবা, মা, শিক্ষক? কেন আমরা গাড়িতে করে ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করছিনা? হঠাৎ বেশ মোটাসোটা নধর চেহারার তিনটে ঘোড়ায় টানা একটা মালগাড়ি এল, এবং আমরা তাকে চলে যাবার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

ভাসিলি প্রথম গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করল, 'ওটাতে কি আছে গো ?' উত্তরে গাড়ির মাথা থেকে ঝুলে থাকা পা দুটো নাড়িয়ে, চাবুকটাকে ঘুরিয়ে কী যেন বলল সে, কিন্তু আমরা তার একটা বর্ণও শুনতে পেলাম না, কারণ গাড়িটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। তখন ভাসিলি পরের গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করল, 'এটাতে কি আছে গো ?' উত্তরে কেউ কিছু বলল না ; শুধু খড়ের গাদার ভেতর থেকে একটা মানুষের সোনালী মাথা বের হয়ে এল। তার মুখখানা লাল—দাড়িগুলোও তাই। সে আমাদের দিকে বেশ অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার সেই খড়ের গাদায় সেঁধিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল ওরা নিশ্চয়ই জানেনা যে আমরা কারা, এবং কোথায় চলেছি।

বিভিন্ন জিনিস দেখতে দেখতে আমি এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ কোথাও একটা মাইলস্টোন চোখেই পড়েনি। কিন্তু এরপর রোদ্দুরে আমার মাথা পিঠ পুড়ে যেতে শুরু করল, রাশি রাশি ধুলোয় রাস্তাঘাট অন্ধকার হয়ে এল, চায়ের বাক্সটার ওপর বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল, ফলে বারবার জায়গা বদল করলাম। বিশ্রী গরম আর অস্বস্তিতে সবকিছু একঘেয়ে বোধ হতে লাগল। আমি মাইলস্টোনে নিজের মনযোগ নিবদ্ধ করলাম। কতক্ষণ পরে পরবর্তী বিশ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হব মনে মনে সেই হিসেব করে চললাম। যেমন, 'বার ভার্স্ট হল ছত্রিশ ভার্স্টের তিন ভাগের এক ভাগ ; আর লিপেটস হল এখান থেকে একচল্লিশ ভার্স্ট। তাহলে আমরা যাত্রাপথের তিন ভাগের এক ভাগের কিছুটা বেশি চলে এসেছি ?' ইত্যাদি।

আমি যখন দেখলাম যে ভাসিলি গাড়োয়ানের বাক্সের ওপর বসে ঢুলছে, তখন বললাম, 'ভাসিলি, আমাকে একটু ওখানে বসতে দাও না।' সে রাজি হল, এবং আমরা পরস্পরের জায়গা বদলে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকা শুরু করে দিল ; ফলে গাড়িতে আর জায়গাই রইল না। ওদিকে বাক্সের ওপর বসে আমার বেশ ভালই লাগল ; দেখলাম আমাদের চারটে ঘোড়া-নেরুচিনস্কায়া, ডিকন, লিয়েভায়া আর অ্যাপথেকারী—যাদের সম্পর্কে সব খুঁটিনাটিই আমার জানা ছিল—তারা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আমি শান্ত স্বরে জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা ফিলিপ, ডিকনকে আজ ডানদিকের বদলে বাঁদিকে জোতা হয়েছে কেন ?'

'ডিকন ?'

'আর নেরুচিনস্কায়া তো আজ দৌড়চ্ছেই না।'

আমার শেষ মন্তব্যের প্রতি কোন রকমের ভ্রূক্ষেপ না করেই সে বলল, 'ডিকনকে কিছুতেই ডানদিকে জোতা উচিত হবে না, কারণ সে সেরকমের ঘোড়াই নয়। ওরজন্য প্রয়োজন একটা সত্যিকারের তেজী ঘোড়া।' এই বলেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে লাগাম টেনে ধরে বেচারা ডিকনের পায়ে আর লেজের কাছটায় চাবুক মেরে চলল। চাবুক খেয়ে ডিকন যদিও পেশীগুলো শক্ত করে সর্বস্ব শক্তিতে দৌড়ল এবং তারফলে গাড়ির একটা দিক কাত হয়ে পড়ল তবু ফিলিপ তার চাবুক চালিয়েই চলল যতক্ষণ না তার নিজেরই ক্লান্তি এল এবং টুপিটা মাথায় ঠিক করে বসিয়ে নেবার প্রয়োজন দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সুযোগটা নিলাম, এবং তাকে অনুরোধ করলাম, আমাকে চালাতে দেবার জন্য। সে রাজি-

হয়ে প্রথমে একটা রাশ, পরে আর একটা এবং শেষ অবধি ছটাই, এমনকি চাবুকটাও আমার হাতে তুলে দিল। তখন আমার মনের আনন্দ আর ধরে না, আমি সবদিক থেকেই চেষ্টা করলাম ফিলিপকে নকল করতে, এবং জিজ্ঞাসা করলাম সেটা ঠিক মত হচ্ছে কিনা। কিন্তু সে আমার প্রশ্নে খুশি হল না। বলল, একটা ঘোড়া নাকি অতিরিক্ত জোরে ছুটছে, অন্য একটা নাকি টানছেই না—এবং অবশেষে আমার হাত থেকে সবকটা রাশ নিয়ে সে নিজেই চালাতে লাগল। ওদিকে রোদ ক্রমাগতই চড়ে যাচ্ছিল, আর পশমের মত সাদা মেঘের রাশি, সাবানের ফেনার মত বুদবুদ তুলে, ওপরে উঠতে উঠতে কালো রঙের সাথে একত্রিভূত হয়ে গেল। গাড়ির জানলা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল—তাতে একটা বোতল আর একটা ছোট মোড়ক। চলতি গাড়িতেই অদ্ভুত কায়দায় ভাসিলি আমাদের কাছে পৌঁছে দিল কেক আর পানীয়।

খাড়া ঢাল বেয়ে নামার সময়, আর সেতুতে ওঠার পথে আমরা গাড়ি থেকে নেমে এলাম, এবং ভাসিলি ও ইয়াকভ দুপাশ থেকে সেটাকে এমনভাবে ধরে রাখল যাতে কোন মতে তা উলটে যেতে না পারে। এরপর মিমির নির্দেশে কখনও আমি আবার কখনও ভোলোদিয়া উঠে এসে বসলাম জুড়ি গাড়িটাতে; আর ওদিকে লিউবোচকা কিংবা কাতেনকা উঠল ছেকড়া গাড়িটায়। জায়গার এই পরিবর্তনে মেয়েরা মনে মনে বেজায় খুশি হল। কারণ, ওদের ধারণা ছিল জুড়ি গাড়ি অপেক্ষা ছেকড়া গাড়িতে চড়তেই নাকি মজাটা বেশি। এবং সত্যি বলতে কি, ওদের ধারণাটাই ছিল ঠিক। কখনও কখনও, যখন খুব বেশি গরম লাগছিল এবং আমরা বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন গাড়ির বাইরে হাত বাড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে তা দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করছিলাম, আর সেই আচ্ছাদনের ছায়া যখন অতিক্রম করে যাচ্ছিল মেয়েদের গাড়ির গা ঘেঁষে তখন লিউবোচকা তার মিহিগলায় চিৎকার করে উঠছিল অধীর আনন্দে।

অবশেষে সেই গ্রাম এল, যেখানে আমরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারব, এবং বিশ্রাম নেব। ইতিমধ্যেই আমাদের নিঃশ্বাসে গ্রামের নির্যাস, ধোঁয়া কাঠ-কয়লা আর রুটি সেঁকার গন্ধ প্রবেশ করেছে। কানে এসেছে মানুষের গলার আওয়াজ, পায়ের শব্দ আর চাকার ঘর্ঘর। খোলা মাঠে ঘোড়ার গলার ঘন্টির যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, তা আর রইল না। আমাদের চলার পথে চোখে পড়ল খড়ের ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর, কাঠের বাঁকানো বারান্দা, লাল, সবুজ কপাটওলা জানলা আর তার মধ্য থেকে উঁকি দেওয়া কৌতূহলী মহিলার মুখ। চাষীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ঢিলে জামা পরে বিস্ময়মিশ্রিত চোখে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, কিংবা খালি পায়ে ধুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটোছুটি করে, ফিলিপের হাজার তাড়া সত্ত্বেও গাড়ির পেছনে উঠে বসবার চেষ্টা করছিল। চারদিক থেকে সরাইখানার মালিকরা ছুটে এসে, বিভিন্ন লোভনীয় কথাবার্তা বলে পরস্পরের কাছ থেকে খদ্দের ছিনিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। ইতিমধ্যে গাড়ি দাঁড়াল একটা বাড়ির দরজার সামনে, আর আমরা নেমে ভেতরে ঢুকলাম। এরপর চার ঘণ্টার ছুটি আর বিশ্রাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ অশনি-ঝঞ্ঝা

পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্য তার প্রখর উত্তাপে আমার ঘাড় আর পিঠ

পুড়িয়ে দিচ্ছিল। গাড়ির গায়ে হাত দেওয়া পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। রাস্তার ধুলোয় বাতাস ভরে গেল। অথচ সে বাতাসকে বয়ে নিয়ে যাবে এমন হাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই। ওদিকে বিরাট জুড়ি গাড়িটার ধুলোয়-ঢাকা দেহটা আমাদের পাশে পাশে দুলকি চালে ছুটে চলেছে ; আর মাঝে মাঝে নজরে পড়ছে কোচোয়ানের উদ্ধত চাবুক, টুপি আর ইয়াকভের মাথার আচ্ছাদন। সেই মুহূর্তে কি যে করব তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না ; আমার পাশে বসে থাকা ভোলোদিয়ার ধুলোমাখা ঝিমিয়ে পড়া মুখটা, ফিলিপের পেছন ফিরে নড়াচড়া কিংবা আমাদের ছুটে চলা গাড়ির বাঁকা ছায়া—কোনকিছুই আর আমাকে তেমন আকর্ষিত করছিল না। ফলে আমার সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পথপার্শ্বের মাইলস্টোন আর দিগন্ত ঘিরে ধীরে ধীরে জমে ওঠা কালো মেঘপুঞ্জের দিকে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল। আর এই সর্বশেষ পরিস্থিতির জন্যই আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল কোন নিকটবর্তী সরাইখানায় পৌঁছবার ইচ্ছায়। প্রবল বজ্রের-ধ্বনি আমার মধ্যে এক অসহনীয় ভীতি আর দুঃখের সঞ্চার করল।

একেবারে কাছের গ্রামটা থেকেও তখন আমরা কমপক্ষে দশ ভার্স্ট দূরে রয়েছি। ওদিকে এতটুকু হাওয়া না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে যেন, চারদিক থেকে মেঘ এসে জড়ো হল আমাদের ঠিক ওপরে। তখনও সূর্যকে দেখা যাচ্ছে, চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তার ধূসর-রশ্মি, আর হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের চমক দিয়ে আওয়াজ তুলে শব্দটা ছুটে গিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল স্বর্গটাকে। ভাসিলি কোচোয়ানের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছেকড়া গাড়ির ছাউনিটাকে টেনে দিল। গাড়োয়ান গায়ে একটা লম্বা কোট পড়ল, এবং যখন যখন বাজ পড়ছিল ঠিক তখন তখনই মাথার টুপিটা খুলে বুকে ক্রশ আঁকছিল। ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে, ঝোড়ো বাতাস থেকে যথাসম্ভব নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে যত জোরে পারল গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল। সারাটা মন আমার আশঙ্কায় ভরে উঠল ; মনে হল শিরার রক্ত চলাচল যেন বেড়ে গেল। তারপর শেষবারের মত উঁকি দিয়ে সূর্যটা মিলিয়ে গেল একটা ছুটন্ত মেঘের আড়ালে। চারপাশটা বদলে গেল—প্রকৃতিতে নেমে এল একটা থমথমে ভাব। শুরু হল বনের গাছগাছালির কাঁপন, পাতার রঙের পরিবর্তন, আর ধূসর মেঘের ছায়ায় ডালপালার আর্তনাদ। বার্চগাছের লম্বা মাথা এদিক ওদিক দুলে চলল, শুকনো পাতার ঝড় উঠল চতুর্দিকে। বুকে সাদা দাগওলা এক ঝাঁক দোয়েল অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের গাড়ির মাথায় চক্কর দিল, ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর বুকের তলায় এমনভাবে ডানা ঝাপটালো যে মনে হল তারা যেন তখনই থামিয়ে দেবে আমাদের, তারপর আবার গা ভাসাল বাতাসে। গাড়ির ঢাকনিটা দুলে দুলে উঠছিল, আর তার ভেতর থেকে ভিজে বাতাস এসে আছড়ে পড়ছিল আমাদের গায়ে। হঠাৎ মনে হল যেন গাড়ির ভেতরই বিদ্যুৎ চমকে উঠল ; ধূসর ঢাকনাটা আলোয় চিকচিক করে উঠল এবং ভয়ে ভোলোদিয়া এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়, প্রচণ্ড এক আওয়াজ হল আমাদের মাথার ওপরে আর মনে হল সে আওয়াজ যেন ক্রমে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল এবং অবশেষে বিকট চিৎকারে বিস্ফোরিত হল আর আমরা বাধ্য হলাম নিঃশ্বাস বন্ধ করে কেঁপে উঠতে। সত্যি, 'ভগবানের রোষ' কথাটার মধ্যে কী নিদারুণ কাব্যই না রয়েছে।

গাড়ির চাকা দ্রুত থেকে দ্রুততম গতিতে ঘুরে চলল। আমি দেখতে পেলাম বেশ ভয়ার্তভাবে ভাসিলি আর ফিলিপ ঘোড়ার রাশ টেনে রেখেছে। ছেকড়া গাড়িটা প্রচণ্ড গতিতে পাহাড়ি পথ বেয়ে বজ্রের মত শব্দ করে কাঠের সেতুটার ওপর গিয়ে পড়ল। আমি আর ভয়ে নড়তে চড়তে পারছিলাম না; মনে হচ্ছিল, হয়ত যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস নেমে আসবে।

হঠাৎ রাশটা ছিঁড়ে গেল, এবং প্রচণ্ড বিদ্যুৎচমক আর বজ্রগর্জন সত্ত্বেও আমরা থেমে পড়তে বাধ্য হলাম সেতুটার ওপরে।

গাড়ির দেওয়ালের গায়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে হেলান দিয়ে বসে রইলাম, আর যখন ফিলিপের কালো মোটা আঙুলটার ওঠা-নামা চোখে পড়ল তখন ভয়ে বুক দুরদুর করে উঠল। সে আস্তে একটা গেড়ো নিয়ে, রাশটাকে সোজা করে নিয়ে, ঘোড়াটার গায়ে চাপড়ে, চাবুকের বাঁটটা দিয়ে খোঁচা দিল।

হাওয়ার দাপাদাপি যত বাড়ছিল ততই যেন আমার মন ভয় আর বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠছিল; কিন্তু বজ্রপাতের পূর্বমুহূর্তের নিস্তব্ধতা আমার হৃদয়কে এমন আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল যে মনে হল, আর যদি পনেরটা মিনিটও এমনভাবে কাটে তবে উত্তেজনায় আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, হঠাৎ সেই সেতুটার নিচ থেকে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট নোংরা, ছেঁড়া জামা গায়ে, ন্যাড়া মাথা, ভাবলেশহীন মুখ, অশক্ত পা-ওলা একটা দেহ উঠে এল। তার হাতে ছিল লাল রঙের একটা লাঠি; সেটা সে আমাদের গাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর খ্যানখ্যানে গলায় কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'খ্রীষ্টের নামে খোঁড়া মানুষটাকে কিছু সাহায্য করুন।' কথাগুলো বলবার সময়, প্রতিটা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নুইয়ে ক্রুশ করল।

সেই মুহূর্তে আমি যে কী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। অদ্ভুত এক আতঙ্ক আমার চুলগুলোকে খাড়া করে দিল; আর আমি সমাহিতের মত তাকিয়ে রইলাম ভিখিরিটার দিকে।

যাত্রাকালীন পথে ভিক্ষে-টিক্ষে দেওয়ার ভার ছিল যার ওপর সেই ভাসিলি তখন রাশটাকে আরও শক্ত করে কিভাবে বাঁধা যায় সে সম্পর্কে ফিলিপকে নির্দেশ দিচ্ছিল; এবং সবকিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল, আর ফিলিপ গিয়ে বসল স্বস্থানে, তখন সে তার পকেটে হাত ঢোকাল। কিন্তু যাত্রা শুরুর জন্য যে মুহূর্তে প্রস্তুত হলাম সবাই, অমনি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল, আর ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে বজ্রধ্বনি হল, আর ভয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাতাসের বেগ আরও বেড়ে গেল; ঘোড়ার লেজ আর কেশর, ভাসিলির ঢিলে জামা, গাড়ির ওপরের আচ্ছাদন—সবকিছু উড়তে লাগল পতপত করে। প্রথমে এক ফোঁটা, তারপর আর এক ফোঁটা, তারপর আরও, আরও, আরও—ঢোল পেটাবার আওয়াজের মত বৃষ্টি পড়ার শব্দ হতে লাগল; দিগন্ত ভরে উঠল সেই আওয়াজে। আমি ভাসিলির কনুইয়ের নড়াচড়া দেখে বুঝলাম যে সে পয়সা বের করার জন্য ব্যাগ খুলছে; এবং সেই ভিখিরিটি তখন চলন্ত গাড়ির গা ঘেঁষে এমনভাবে দৌড়চ্ছিল যে মনে হচ্ছিল হয়ত এখনই ও পিষে যাবে চাকার তলায়। ও বলছিল, 'যিশু আপনার মঙ্গল করবে।' ঠিক সেই সময় দেখলাম একটা তামার পয়সা পড়ল

আমাদের পাশ থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিখিরিটা থেমে গেল ; রাস্তার মাঝখানটায় ইতস্ততঃ দেখতে লাগল। তখন বাতাস ওকে দোলা দিয়ে চলেছে, আর ওর নোংরা জামাকাপড়গুলো ভিজে জবজবে হয়ে গায়ে লেপটে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি থেকে সে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

বাতাসের দাপটে বৃষ্টির ঝাপটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ভাসিলির কোটের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে বৃষ্টির জল পড়ছিল অ্যাপ্রনের ওপর জমে থাকা নোংরা জলে। রাস্তায় জমে থাকা ধুলোবালিতে জল পড়ে প্যাচপ্যাচে কাদার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মাঝ দিয়ে দাগ কেটে ছুটে চলেছিল আমাদের গাড়ি। তখন আর তত ঝাঁকুনি লাগছিল না। ওদিকে বিদ্যুতের ঝলকানিও কমে এসেছিল অনেকটা ; তাছাড়া বৃষ্টির শব্দে বাজের ডাকও আর শোনা যাচ্ছিল না তেমন।

বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমে আসছিল ; বিদ্যুতে-মেঘ সরে যাচ্ছিল মন্থর গতিতে, আর আকাশের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি। সাদা মেঘের বুক চিড়ে বেরিয়ে পড়েছিল এক ফালি নীল আকাশ। কিন্তু তবু যেন কিছুটা দেরি ছিল। তারপরই সূর্যের ভীরু আলোর রেশ এসে পড়ল রাস্তার খানাখন্দে ; বৃষ্টির ঝিরঝিরে ছাঁট দেখে মনে হল যেন তা ছাঁকনিতে ছাঁকাই হয়ে আসছে,' আর সদ্যধৌত তরতরে ঘাসের ডগায় চিকচিক করে উঠল রামধনুর রঙ।

আকাশের অপর প্রান্তের কালো বিদ্যুতে-মেঘ যে খুব একটা কম ভয়ের বস্তু ছিল তা নয়, তবে আমি তাতে মোটেই ভয় পেলাম না। ভয়ের অনুভূতিকে দমন করে আমার হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রকৃতির মত উচ্ছলতায় সতেজ আনন্দে আমি হেসে উঠলাম।

ভাসিলি কোটের কলার নামিয়ে মাথার টুপি খুলে ঝেড়ে নিল। ভোলোদিয়া অ্যাপ্রনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বুক 'ভরে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করলাম। ঝকঝকে তকতকে সদ্য ধৌত জুড়ি গাড়িটা আমাদের চোখের সামনে বেশ দুলকী চালে এগিয়ে চলল। ঘোড়াগুলোর পিঠ, তাদের সাজ, চাকার আবরণ,—সবকিছু ভিজে গিয়েছিল, আর তার ওপরে সূর্যকিরণ পড়াতে মনে হচ্ছিল যেন ওগুলোকে মোম দিয়ে ঘষা হয়েছে। রাস্তার এক পাশে শীতকালীন গমে ভর্তি বিস্তৃত প্রান্তর; দূর থেকে দূরন্তে মিলিয়ে গিয়েছিল। তারই মাঝে কোথাও কোথাও সামান্য জল—তার ওপর সূর্যকিরণ পড়াতে এক অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেছিল। আর অন্য ধারে আসপেন গাছের সারি, তার নিচে বাদাম আর বুনো-চেরির ঝোপঝাড়—যেন কী এক অসীম ধৈর্যে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে স্বচ্ছ বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছিল গতবছরের শুকনো পাতার ওপর। চারদিকে এক ঝাঁক লার্ক পাখি, মধুর আনন্দ সঙ্গীত গাইতে গাইতে কখনও উঠে যাচ্ছিল উর্ধাকাশে, আবার কখনও নেমে আসছিল একেবারে মাটির কাছাকাছি ; আর নিচের ঝোপ থেকে শোনা যাচ্ছিল ক্ষুদে পাখিদের কিচিরমিচির—ওদিকে বনের অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিল কোকিলের কুহুরব। বসন্তকালীন ঝড়ের পর বনের গন্ধ যে কী মধুর আবেশ সৃষ্টি করেছিল তা সত্যিই বর্ণনাতীত। বার্চ, ভায়োলেট, শুকনো পাতা, আগাছা আর বুনো চেরীর গন্ধে আমি আর গাড়িতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না, এক লাফে নেমে ছুটে গেলাম ঝোপগুলোর কাছে, এবং বৃষ্টির ঝরণাধারা সত্ত্বেও বার্ড-চেরির অঙ্কুর ছিঁড়ে নিয়ে সেগুলোকে মুখের ওপর বুলিয়ে

তার সুগন্ধ পান করলাম।

জুতোর কথা চিন্তা না করে, কাদায় মাখামাখি হয়ে, আগে থাকতে ভিজে যাওয়া মোজাজোড়ার খেয়াল না করেই কাদার ভেতর পা ফেলে পা ফেলে এগিয়ে এলাম জুড়ি-গাড়ির জানালার কাছে। কয়েকটা চেরিফুলের ডাল তুলে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, 'লিউবোচকা! কাতেনকা! দেখ, কী চমৎকার এটা!'

মেয়েরা চমকে গিয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। মিমি চিৎকার করে আমাকে সরে যেতে বললেন, না হলে আমি নিশ্চিত চাপা পড়তাম।

তবু চেঁচিয়ে উঠলাম, 'একটু শুঁকেই দেখনা, কী মিষ্টি গন্ধ!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ নতুন ধারনা

কাতেনকা আমার পাশে বসেছিল, এবং একদৃষ্টে ঘাড় কাত করে দ্রুত অপসৃয়মান ধূলোভরা রাস্তা দেখছিল। আমি তার দিকে নীরবে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম যে তার মুখে আর সেই শিশুর সরলতা নেই, সেখানে ছেয়ে রয়েছে এক বেদনার ছায়া। আমি বললাম, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মস্কো পোঁছে যাব; আচ্ছা, বলত জায়গাটা কেমন দেখতে?'

অনিচ্ছার সঙ্গে সে উত্তর দিল, 'আমি জানি না।'

'তবু বল না, সেটা সারপুকভের থেকে বড় না ছোট?'

'কি?'

'না, কিছু না।'

কিন্তু যে সহজাত অনুভূতি দিয়ে একজন অন্যজনের ভাবনাকে বুঝতে পারে, এবং কথাবার্তার সময় যা নির্দেশকের মত কাজ করে, সেই বোধ দিয়েই কাতেনকাও বুঝতে পারল যে তার উদাসীনতা আমাকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে; তাই সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'তোমার বাবা নাকি বলেছেন যে আমাদেরও তোমার দিদিমার ওখানেই থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ, দিদিমা আমাদের তার কাছে থাকার জন্যই জোরাজুরি করেছেন।'

'আমরা সবাই সেখানে থাকব?'

'নিশ্চয়। ওপরের তলায় অর্ধেকটায় থাকব আমরা আর বাকি অর্ধেকটায় থাকবে তোমরা। বাবা থাকবেন বারান্দার দিকটায়। তবে খাবার সময় আমরা সবাই একতলায় দিদিমার সাথে একই সঙ্গে খেতে বসব।'

'মা বলেছেন তোমার দিদিমা নাকি বেশ গম্ভীর এবং বদ মেজাজের মহিলা।'

'না, তিনি মোটেই তেমন নন। প্রথম প্রথম অবশ্য তাকে অমনিই মনে হয়। তিনি গম্ভীর ঠিকই, তবে মোটেই বদ-মেজাজের মহিলা নন; বরং বলা চলে বেশ দয়ালু এবং হাসিখুশি। যদি তার জন্মদিনে থাকতে তবে দেখতে পেতে কী বল-নাচের ফোয়ারা ছুটেছিল সেদিন।'

'তবু যাই বল, আমার এখনও খুব ভয় করছে; ভগবান জানেন, তাছাড়া আমরা যদি…' হঠাৎ কাতেনকা থেমে গিয়ে আবার আগের মত চিন্তা করা শুরু করল।

আমি খুব অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কি?'

'কিছুই না।'

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তুমি বললে, ভগবান জানেন—'

'আর তুমি বললে, "দিদিমার জন্মদিনে বল নাচের কী ফোয়ারা ছুটেছিল।"'

'সত্যি, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে তুমি সেদিন সেখানে ছিলে না। যদি থাকতে দেখতে কত অতিথি এসেছিল—প্রায় কয়েক শ হবে; তাছাড়া গান-বাজনা, সামরিক অফিসার,—এবং আমি নেচেছিলাম।' হঠাৎ আমি আমার বর্ণনার মাঝখানে ছেদ টেনে বললাম, 'কাতেনকা, তুমি কিছুই শুনছ না।'

'হ্যাঁ, শুনছি; তুমি বলছিলে, তুমি নেচেছিলে।'

'এমন মনমরা লাগছে কেন তোমাকে?'

'সবসময় একজনের মেজাজ ভাল থাকতে পারে না।'

'কিন্তু মস্কো থেকে ফিরে আসার পরই দেখছি, তুমি যেন কেমন পালটে গেছ। বল ত, ব্যাপারটা কি?' তারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে বললাম, 'কি কারণে তোমার এমন পরিবর্তন ঘটল?'

'আমি বদলে গেছি?' কাতেনকা এমন ব্যস্ততার সঙ্গে বলল যে বুঝলাম আমার কথাটা ওর মনে লেগেছে। 'না, আমি মোটেই বদলাইনি।'

আমি বললাম, 'আগে যেমন ছিলে, তেমনিটি আর মোটেই নও। আগে বেশ বোঝা যেত যে আমরা যেমন চিন্তা ভাবনা করতাম, তুমিও ঠিক তেমনটিই করতে। আমাদের নিজের লোক ভাবতে, ভালবাসতে—যেমন আমরা তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন তুমি এত বেশি গম্ভীর হয়ে গেছ, এত বেশি আনমনা হয়ে পড়েছ যে—'

'না, আমি তা মোটেই হইনি…'

'আমাকে আগে শেষ করতে দাও,' তাকে বাধা দিলাম। ইতিমধ্যে নাকের ভেতর কি রকম যেন সুড়সুড় করতে শুরু করে দিল। সাধারণতঃ চোখে জল আসার আগেই এরকমটা হয়। কোন বুক চাপা কথা বলতে গেলেই আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। বললাম, 'আজকাল তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক, মিমি ছাড়া আর কারও সাথে কথাই বলনা; মনে হয় যেন আমাদের এড়িয়ে চলতে চাও।'

'তুমি চিরকাল একই রকম থাকবে না, একদিন না একদিন তোমার পরিবর্তন হবেই।' কাতেনকা বলল। এটাই ওর স্বভাব—যুৎসই কোন উত্তর না থাকলে কিছু না কিছু একটা বলে ও বুঝ দেবেই।

বেশ মনে পড়ে, একদিন লিউবোচকা যখন ঝগড়ার সময় ওকে 'বোকা কোথাকার' বলেছিল, তখন ও জবাব দিয়েছিল, 'সবাই তো আর চালাক হতে পারে না; কাউকে না কাউকে তো বোকা হতে হবেই।' কিন্তু এবারকার এই উত্তর, অর্থাৎ 'কখনও না কখনও তুমি বদলাবেই'—এটা আমাকে মোটেই খুশি করতে পারল না: তাই আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি প্রয়োজনটা আছে বদলাবার?'

'কেন, আমরা তো আর চিরটা কাল একসাথে থাকব না,' ঈষৎ লজ্জিতভাবে ফিলিপের পিঠের দিকে তাকিয়ে কাতেনকা জবাব দিল, 'আমার মা তোমার মার সঙ্গে একসাথে কাটাতে পেরেছিলেন, কারণ তারা দুজন বন্ধু ছিলেন; কিন্তু ভগবান জানেন, তোমার দিদিমার সঙ্গে তা সম্ভব হবে কিনা; কারণ, লোকে বলে তিনি

নাকি বড় বদমেজাজী। আর তাছাড়া, একদিন না একদিন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তো আসবেই। তোমরা বড়লোক, তোমাদের পেত্রোভস্কোয়ার জমিদারী আছে; আর আমরা হলাম গরিব, আমাদের কিছুই নেই।'

তোমরা বড়লোক, আর আমরা গরিব! এই শব্দগুলো এবং এর অর্থ আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার ছিল না। আমি জানতাম কেবলমাত্র ভিখিরি আর চাষাভুষোদেরই গরিব বলা হয়ে থাকে; এবং দারিদ্রের এই সংজ্ঞার সাথে কোনভাবেই কাতেনকার মত একটি সুন্দরী মেয়েকে এক পঙক্তিতে ফেলতে পারছিলাম না। আমার ধারণা ছিল মিমি আর কাতেনকা যেমন আমাদের সঙ্গে আছে, চিরকাল তেমনিই থাকবে, এবং আমরা যেখানে যাই, যা কিছুই করি না কেন তাতে তারাও সমান ভাগ পাবে। এছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। কিন্তু ওদের বর্তমান অবস্থার কথা মনে আসাতে হাজার রকম অদ্ভুত চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করল। তারা যে গরিব আর আমরা বড়লোক—একথা মনে হতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম এবং কাতেনকার দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত চাইতে পারলাম না।

নিজের মনেই নিজে ভাবলাম, 'আমরা বড়লোক আর ওরা গরিব—এর মানে কি? আর তা থেকে কিভাবেই বা প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের ছাড়াছাড়ি অবধারিত? আমাদের যা আছে তা কি আমরা সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না?' কিন্তু সে কথাটা যে কাতেনকাকে বলা উচিত হবে না তা ঠিকই বুঝেছিলাম; আর যুক্তিতর্কের বিপরীত এক বাস্তববোধ দিয়ে উপলব্ধি করলাম যে কাতেনকার কথাটাই ঠিক: সুতরাং আমি মনে মনে কি চিন্তা করছি, সেটা ব্যাখ্যা করে তাকে বোঝালে কোন লাভই হবে না। বললাম, 'তাহলে এটা কি সত্য যে তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? আমরা কিভাবে পরস্পরকে ছেড়ে থাকব?'

'এ ব্যাপারে আমাদের কি করার আছে বল? কষ্ট তো আমারও হবে; তবে সত্যি সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে কি করব, তা আমি ঠিকই করে রেখেছি।'

'তুমি অভিনেত্রী হবে! কী বিশ্রী!' ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠলাম, কারণ জানতাম যে অভিনেত্রী হওয়ার সখ ওর অনেক দিনের।

'না. সে তো যখন ছোট ছিলাম তখন বলতাম।'

'তাহলে কি করবে?'

'আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে থাকব; আর কালো গাউন ও বেগুনী রঙের টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াব।' কাতেনকা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পাঠক, আপনার জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটেছে যে, হঠাৎ একদিন দেখলেন, আপনার পুরনো সমস্ত ধারণাই আকস্মিকভাবে পালটে গেল এবং পরিচিত সব বস্তুই একেবারে বিপরীত এক রূপ ধারণ করল—যে সম্পর্কে আপনার আগে কোন ধারণাই ছিল না। আমার মধ্যে এ ধরণেরই একটা নৈতিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল আমাদের ভ্রমণকালে। সেদিনটাকেই আমি আমার কৈশোরের শুরু বলে নির্দিষ্ট করেছি।

এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে শুধুমাত্র আমরা—আমাদের পরিবারই এই পৃথিবীতে একমাত্র বস্তু নয়, কেবলমাত্র আমাদের ঘিরেই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে না। এ জগতে আরও অনেকেই আছে—যাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই, যারা আমাদের কথা মোটেই ভাবছে না—এমনকি আমাদের অস্তিত্ব

সম্পর্কেও তারা ওয়াকিবহাল নয়। সন্দেহ নেই, এসব তথ্য আগেও আমার জানা ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে যেমনভাবে জানলাম তেমনভাবে কখনও উপলব্ধি করিনি।

একটা ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হয় কেবলমাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই, এবং প্রায়শই তা বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। কাতেনকার সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে আমার হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত হল, এবং আমি যে বাধ্য হলাম তার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতেই—এটাই ছিল আমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পথ। গাড়িতে করে যাবার সময় আশপাশে যে সব বাড়িঘর পড়ছিল তার প্রত্যেকটাতেই কমপক্ষে একটা পরিবার ছিলই, আর সেইসব বাড়ির জানলা দিয়ে মেয়ে আর বাচ্চার দল কৌতূহলী দৃষ্টিতে গাড়িটাকে একঝলক দেখেই চিরকালের জন্য আমাদের দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যাচ্ছিল; এবং চাষী ও দোকানীর দল, পেত্রোভস্কোয়ায় তাদের যেমন দেখেছি আমাদের দেখলেই সেলাম ঠুকতে, এখানে তেমন তো করলই না, এমনকি আমাদের দিকে একবারের জন্য চোখ তুলেও তাকাল না। ফলে সেই প্রথম আমার মনে প্রশ্ন জাগল: ওরা যদি আমাদের গ্রাহ্যই না করে তবে ওদের সময় কাটছে কি করে? সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রশ্ন এল: কিভাবে ওরা বেঁচে আছে? কেমন করে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করে চলেছে? ওরা কি তাদের পরিচালনা করে নাকি অবাধে খেলতে দেয়? কিভাবে তাদের শাস্তি দেয়? ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ মস্কোয়

মস্কোয় পৌঁছবার পর মানুষ এবং বস্তু সম্পর্কে আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়ে আরও স্পষ্ট হল। দিদিমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যখন দেখলাম যে তার শরীর আরও বেশি রোগা, মুখের চামড়া কুঞ্চিত এবং চোখ দুটো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তখন মনের মধ্যে এতদিনের সঞ্চিত আতঙ্ক এবং ভীতির পরিবর্তে সহানুভূতির উদ্রেক হল। তারপর যখন লিউবোচকার মাথায় মুখ চেপে এমনভাবে ফুঁপিয়ে উঠলেন যে মনে হল তিনি যেন তার মৃতা কন্যাকে ফিরে পেয়েছেন, তখন আমার হৃদয়ের সহানুভূতি একেবারে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়াতে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, তার দৃষ্টিতে তখন আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই—শুধুমাত্র স্মৃতির যোগসূত্র হিসেবেই আমরা ব্যবহৃত। তার প্রতিটি চক্ষুই যেন সেই একই কথা বলছে, 'সে নেই, সে চলে গেছে, আর কোনদিনই আমি তাকে দেখতে পাব না।'

মস্কোতে বাবার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কেই রইল না; সবসময়ই তাকে মনে হত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একমাত্র খাবার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তার পরনে থাকত কালো রঙা কোট কিংবা সাজের পোশাক। তিনি যেন ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন—যেমন চলে গিয়েছিল তার জামার লম্বা কলার, ড্রেসিং গাউন, দেওয়ান, কেরানির দল, ধানমাড়াইয়ের চত্বরে পদাচারণা, এবং শিকার। কার্ল ইভানিচ, যাকে দিদিমা 'দিয়াদেকা' বলে ডাকতেন, হঠাৎ তার মাথায় কি ঢুকল তা ভগবানই জানেন, তিনি তার আভিজাত্যপূর্ণ পরিচিত বিরাট টাকমাথায় মাঝখানে সিঁথিকাটা একটা লাল পরচুলো এঁটে বসালেন, যা দেখে আমি অবাক তো হলামই, এবং ভেবেই পেলাম না যে এমনটা হল কি করে!

আমাদের এবং মেয়েদের মধ্যে এক অদৃশ্য বেড়া গড়ে উঠল। যার যার

নিজস্ব গোপনীয়তা রইল। ওরা ওদের পেটিকোটের ঝুল বাড়ার জন্য অহঙ্কার করত, আর আমরা গর্ব বোধ করতাম আমাদের লম্বা প্যান্টের জন্য। এবং প্রথম রবিবারের ভোজসভায় মিমি চমৎকার গাউন আর মাথায় বিভিন্ন রঙের ফিতে লাগিয়ে এমনভাবে এসে উপস্থিত হলেন যে সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে বাধ্য হলাম যে, আমরা আর গ্রামে নেই, এবং এখন থেকে সবকিছুই ভিন্ন গতিতে চলবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ বড়দা

আমি ভোলোদিয়ার থেকে এক বছর কয়েক মাসের ছোট ছিলাম; দুজনেই এক সাথে বেড়ে উঠেছিলাম; খেলাধুলো কিংবা পড়াশুনো কোন ব্যাপারেই একে অপরের থেকে আলাদা থাকিনি। বড় ছোটর ভেদাভেদ আমাদের মধ্যে কখনোই ছিল না। কিন্তু ঠিক যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম যে বয়স, প্রবৃত্তি কিংবা ক্ষমতা—এর কোনটাতেই আমি তার সমকক্ষ নই। এমনকি অনুভব করতে লাগলাম যে সে নিজেও তা জানে, এবং তারজন্য যথেষ্ট গর্ব বোধও করে। হয়ত আমার এ বিশ্বাস খুবই ভ্রান্ত ছিল, তবু তার ফলেই অন্তরে জন্ম নিল আত্মপ্রীতি এবং ওর সঙ্গে যে কোন ঠোকাঠুকুতেই তা আহত হত। সে সর্বক্ষেত্রেই আমার থেকে এগিয়ে ছিল—খেলাধুলো, পড়াশুনো, ঝগড়া, ব্যবহার—সবকিছুতেই। ফলে কেমন একটা মানসিক বিচ্ছেদের সৃষ্টি হল আমার মনে—এবং তারজন্য অন্তরে ব্যথাও পেতাম; কিন্তু কেন যে সেটা হত তা কিছুতেই বুঝতাম না। যেমন, প্রথম দিন সে যখন লিনেনের জামা পড়ল, সেদিনই যদি আমি সোজাসুজি বলে দিতাম যে ওরকম একটা জামা না পাওয়ার জন্য আমি মনে মনে রেগে আছি, তাহলে আমার মনটাও যেমন হালকা হত, তেমনি বারবার তার জামার কলার তোলায় আমি কিছুতেই ভাবতাম না যে শুধুমাত্র আমাকে আঘাত দেবার জন্যই সে অমনটা করছে।

আমাকে সব থেকে বেশি যা রাগিয়ে দিত তা হল, আমি জানতাম, ভোলোদিয়া আমার সবকিছুই জেনে ফেলেছে, অথচ বাইরে এমন ভান করছে যে, যেন কিছুই জানে না।

নীরব হাসিতে প্রকাশমান বিচিত্র সম্পর্ক, সর্বদা আমরা যাদের সাথে কাটাচ্ছি—ভাই, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য—বিশেষতঃ যখন একে অপরের কাছে মোটেই স্পষ্ট নই—তখন সে ব্যাপারটা কার না চোখে পড়ে। কত অব্যক্ত বাসনা, চিন্তা এবং ভীতি—মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দুটি চোখের আকস্মিক দৃষ্টি-বিনিময় ঘটে যায়!

অত্যধিক স্পর্শ-কাতরতা এবং বিশ্লেষণী মনোভাবের জন্যই সম্ভবতঃ আমি এক্ষেত্রে প্রতারিত হয়েছিলাম; আর মনে হয় ভোলোদিয়া আমার মত অতশত ভাবতও না। সে ছিল উচ্ছল, সরলসোজা, অসঙ্গতিপূর্ণ স্বভাবের। বৈচিত্র্যপূর্ণ কোন ব্যাপার হলেই সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তার সঙ্গে সে গা ভাসিয়ে দিত।

একবার ছবি আঁকার প্রচণ্ড ঝোঁক চাপল তার। নিজেই ছবি আঁকত; হাতে পয়সা-কড়ি যা থাকত সব খরচ করে হাত পাতত ড্রয়িং-মাস্টারের কাছে, বাবার কাছে, দিদিমার কাছে। তারপর ঝোঁক চাপল টেবিল সাজাবার; সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে জিনিসপত্র যোগাড় করে সাজিয়ে ফেলল সেটাকে। এরপর শুরু হল উপন্যাস পড়ার ঝোঁক; কোথা থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে সেগুলো এনে দিনরাত

পড়ে চলল মুখ গুঁজে। ওর খেয়ালে আমিও তাল দিতাম, ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলতাম; তখন এত ছোট এবং অপরের ওপর এমন নির্ভরশীল ছিলাম যে আলাদাভাবে কিছু ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু ভোলোদিয়ার সুখী, উজ্জ্বল মুখ, আর খোলামেলা উদার স্বভাবকে হিংসে না করে কিছুতেই থাকতে পারতাম না; আর এটা বেশি করে প্রকাশ পেতো, যখন আমাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগত। বেশ বুঝতাম যে ওর আচার ব্যবহার সত্যিই চমৎকার, কিন্তু কিছুতেই তা নকল করতে পারতাম না।

টেবিল সাজাবার ঝোঁক যখন ওর মাথায় পুরোপুরি চেপে বসেছে, তখন একদিন সেই টেবিলটার কাছে গেলাম, এবং হঠাৎ আমার হাতের ধাক্কা লেগে বিচিত্র বর্ণের একটা গন্ধ-দানি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

ঘরে ঢুকেই টেবিলের ওপরের জিনিসপত্র ছত্রাখান অবস্থায় দেখে ভোলোদিয়া বলল, 'আমার জিনিস ধরার অধিকার তোকে দিল কে? আর ছোট গন্ধ-দানিটাই বা গেল কোথায়? তুই সবসময়—'

'হঠাৎ আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। তাতে হয়েছেটা কি?'

ভাঙ্গা বোতলের টুকরোগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে করুণ সুরে সে বলল, 'দয়া করে আমার জিনিসে আর কখনও যেন হাত দেবার সাহস না হয়।'

তখন আমিও বললাম, 'আর দয়া করে তুমিও আমাকে হুকুম দিওনা। ওটা ভেঙ্গে গেছে, ব্যাস। তাতে অত মেজাজ দেখাবার কি আছে?' এবং আমি হাসলাম, যদিও হাসবার কোন ইচ্ছেই ছিল না।

বাবার কাছ থেকে শেখা কায়দায় কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ভোলোদিয়া বলল, 'তোর কাছে এটা কিছু নয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এর অনেক দাম। সব সময় আমার জিনিস ভাঙ্গিস, আবার এখন হাসা হচ্ছে! খুঁদে নচ্ছার কোথাকার!'

'হ্যাঁ, আমি হচ্ছি খুদে নচ্ছার, আর তুমি হচ্ছ গিয়ে বড় আকাট মূর্খ।'

আমাকে আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে সে বলল, 'আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না; বেরিয়ে যা এখান থেকে।'

'আমাকে ধাক্কা দেবে না বলছি।'

'বেরিয়ে যা।'

'খবরদার ধাক্কা দিও না বলেদিলাম।'

ভোলোদিয়া আমার হাত ধরে টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল; তখন আমি রাগে ফুঁসছি। হাত দিয়ে শক্ত করে পায়াটা ধরে একটানে ওপরের কাঁচের জিনিসপত্র ফেলে দিলাম মাটিতে। বললাম, 'এই নাও।'

পতনোন্মুখ দু একটা জিনিস বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল, 'হতচ্ছাড়া শয়তান!'

'আমাদের সম্পর্কের এই শেষ', ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ভাবলাম, 'জন্মের মত আড়ি।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বললাম না। নিজেকে অপরাধী বুঝতে পেরে সংকোচে ওর দিকে তাকাতেই পারলাম না এবং সারাদিন কোন কাজে মন বসল না। ওদিকে ভোলোদিয়া কিন্তু বেশ ফুর্তির সঙ্গেই দিনটা কাটাল; লেখা-

পড়া করল মন দিয়ে, আবার খাবার পর বসে বেশ মৌজ করে হাসি তামাসা করল মেয়েদের সঙ্গে।

যেই একটা পড়া শেষ হচ্ছিল অমনি আমি বাইরে যাচ্ছিলাম। ভয়, অস্বস্তি এবং বিবেকের তাড়নায় কিছুতেই দাদার সাথে একত্রে থাকতে পারলাম না। সন্ধ্যায় ইতিহাসের পড়া শেষ হতেই, খাতাপত্র হাতে নিতে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। যদিও ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল মনে মনে, তবু ভোলোদিয়ার পাশ থেকে যাবার সময় মুখে বেশ রাগের ভাব ফুটিয়ে তুললাম। ঠিক সেই সময় মাথা তুলে, দুষ্টুমীর হাসি হেসে, সোজা আমার চোখে চোখ রাখল সে। দুজনের চোখাচুখি হতেই বুঝলাম যে ও আমার মতলব ধরে ফেলেছে, এবং আমি যে তা বুঝতে পেরেছি, সেটাও ও বুঝে গেছে। তবু, প্রচণ্ড এক অনুভূতির তাড়নায় মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

কোনরকম আবেগ ছাড়াই বেশ সহজ গলায় সে বলল, 'নিকোলেনকা, তুই অনেকক্ষণ থেকে রেগে আছিস। আমি যদি তোকে দুঃখ দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা করে দে।' এবং সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

হঠাৎ কী যেন একটা ব্যথা বুক চেপে নিচ থেকে ওপরে উঠতে লাগল—যতক্ষণ না আমার দম আটকে এল, ততক্ষণ। তারপরই চোখ বেয়ে নেমে এল প্রবল অশ্রুধারা—আমি যেন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। তার হাত ধরে বললাম, 'আমি দুঃখিত, ভোলোদিয়া!'

কিন্তু ভোলোদিয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে মনে হল সে যেন বুঝতেই পারছেনা হঠাৎ আমার চোখে জল আসার কারণটা কি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ মাশা

আর কখনও কোন ধারণাই আমার মনে ততটা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেনি, যতটা পেরেছিল, ঝি ভাবতে অভ্যস্ত একজন মহিলার সম্পর্কে ধারণার আকস্মিক পরিবর্তনে—যার ওপর আমার শান্তি এবং স্বস্তি অনেকটাই নির্ভর করছিল।

সুদূর অতীতের যত গভীরেই তাকাই না কেন, আমাদের বাড়ির মাশার কথা আমার মনে পড়েই। অথচ সেদিনকার সেই ঘটনার আগে পর্যন্ত, যে ঘটনা আমার পূর্ববর্তী সব ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, এবং আজও আমি যা বিশ্বাস করি—তার দিকে কখনও ফিরে তাকাবার প্রয়োজনও অনুভব করিনি। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন মাশার বয়স পঁচিশ। তাকে দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল। কিন্তু যথাযথ রূপ বর্ণনা করতে ভয় লাগছে এই কারণে যে, হয়ত তার সেই সম্মোহনী রূপের নেশায় মত্ত দিনগুলোর স্মৃতি আমার মাঝে আবার সেই উন্মাদনা সৃষ্টি করবে। কোন রকম ভুল না করেই শুধু এটুকু বলতে পারি যে, তার গায়ের রঙ ছিল অসম্ভব রকমের ফর্সা, দেহ ছিল বেশ সুগঠিত আর মনটা ছিল সত্যিকারের নারীর। তখন আমি মাত্র চৌদ্দ বছরের।

ধরা যাক, কোন এক মুহূর্তে, ঘরের ফাটা মেঝের দাগে পা মিলিয়ে বই হাতে পড়া মুখস্ত করতে করতে পায়চারি করছেন, অথবা হাওয়ার তালে তালে গুন্ গুন্ করছেন, কিংবা অযথা কালি ঘষে চলেছেন টেবিলের একটা ধারে; নয়ত, যান্ত্রিকভাবে পুনঃপুনঃ বলে চলেছেন একই কথা—অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সেইরকম একটা মুহূর্ত, যখন মস্তিষ্ক মোটেই কাজ করতে চায় না, শুধু ভেসে চলে

কল্পনার রথে—এমনিই এক পরিস্থিতিতে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম সিঁড়ির মুখটায়—কোনরকম উদ্দেশ্য ছাড়াই।

হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ এল কানে। স্বভাবতঃই জানতে চাইতাম সে কে। কিন্তু অকস্মাৎ সে শব্দ থেমে গেল এবং তারপরই কানে এল মাশার কণ্ঠস্বর, 'চলে যাও এখান থেকে। মারিয়া ইভানোভনা দেখতে পেলে কী ভাববেন?'

'না, তিনি দেখতে পাবেন না।' ভোলোদিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, এবং তারপরই কিছু একটা নড়াচড়ার শব্দ পেলাম ; মনে হল ভোলোদিয়া তার পেছনটা ধরবার চেষ্টা করছে।

'হাত সরাও, অসভ্য কোথাকার।' তারপরই মাশা আমার পাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার গলার রুমাল তখন একপাশে সরানো, আর ফাঁক থেকে দেখা যাচ্ছে তার দুগ্ধসফেদ ঘাড়।

এই নতুন আবিষ্কারে সেদিন যে কী খুশি হয়েছিলাম তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। কিন্তু সাথে সাথে ভোলোদিয়ার প্রতি কেমন যেন সহানুভূতি জাগল। সেটা এ কারণে নয় যে, সে যা করেছিল তাতে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, বরং সেটা এ কারণে যে, সে যা করেছিল তা করলে যে আনন্দ পাবে, সেটা সে ভেবেছিল কি করে—তাই ভেবে। এবং সাথে সাথে তাকে অনুকরণ করার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল আমার মনে।

কিছু না ভেবেই কতদিন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেছি সেই সিঁড়ির গোড়াটায়; উন্মুখ হয়ে কান খাড়া করে রেখেছি ওপরের দিকটায় সামান্য খসখসানির শব্দ শোনার অপেক্ষায় ; কিন্তু কখনোই সাহস হয়নি ভোলোদিয়াকে নকল করবার—যদিও পৃথিবীতে অন্য সব কিছুর তুলনায় সেটাকেই কামনা করতাম বেশি করে। কখনও কখনও বেশ অপরাধীর মত দরজার ফাঁক থেকে চাকরানীদের কথাবার্তা শুনতাম, আর ভাবতাম, যদি আমিও ওপর তলায় গিয়ে ভোলোদিয়ার মত মাশাকে চুমু খাই, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে? আমার এই মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল আর চওড়া নাক নিয়ে তাকে কি জবাব দেব, যখন সে জানতে চাইবে যে তার কাছে আমি কি চাই? কখনও কখনও শুনতাম মাশা ভোলোদিয়াকে বলছে, 'উঃ কী দুষ্টু! কেন এভাবে আমাকে বিরক্ত কর? যাও, ভাগো, নচ্ছার কোথাকার। কই নিকোলাই তো কখনও এখানে আসে না এমন নষ্টামী করার জন্য?' সে জানত না যে নিকোলাই তখন সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে, এবং নচ্ছার ভোলোদিয়ার জায়গা দখলের জন্য সে দুনিয়ার সব কিছুই ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত।

এমনিতেই আমার স্বভাব ছিল অত্যন্ত বিনয়ী, কিন্তু নিজের কুৎসিত চেহারার কথা ভালভাবে উপলব্ধি করার পর সেই বিনয় বেড়ে গিয়েছিল আরও বহুগুণ। এবং আমি নিশ্চিত, মানুষের চেহারার মত তার জীবনের গতিপথে এমন নির্ধারক প্রভাব আর কোন কিছুই ফেলতে সক্ষম নয় ; অবশ্য এটা ঠিক, চেহারা অপেক্ষা চেহারা সম্পর্কে তার ধারণাই এ ব্যাপারে বেশি কাজ করে, অর্থাৎ সেটা আকর্ষণীয় না, অনাকর্ষণীয়—এই চিন্তাটাই হচ্ছে প্রধান।

আমার মধ্যে আত্ম-অহংকার এত বেশি মাত্রায় ছিল যে, নিজের প্রতি কখনোই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই সব সময় মনে হত যে আঙুর ফল টক ; অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে সুন্দর হওয়ার যে আনন্দ সেটা ভোলোদিয়াই সবটা করায়ত্ত

করেছিল, আর সে কারণে হিংসায় বুকটা আমার জ্বলে যেত। ফলে সেইসব আনন্দকে মনে মনে ঘৃণা করা শুরু করলাম; আর এক গর্বিত উদ্ধত সান্ত্বনা পাবার চেষ্টায় মন এবং কল্পনাকে পীড়ন করতে লাগলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ বাজি

'হে ভগবান, বারুদ!' আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন মিমি, 'কি করছ? বাড়িতে আগুন দিয়ে কি সবাইকে পুড়িয়ে মারতে চাও?'

বেশ দৃঢ় কণ্ঠে সবাইকে সরে যাবার আদেশ দিয়ে, দৃপ্ত পদক্ষেপে পটকার টুকরোগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং হঠাৎ ফেটে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে জেনেও সেগুলোকে পা দিয়ে চেপে চেপে নেভাতে লাগলেন। তারপর যখন বুঝলেন যে বিপদ কেটে গেছে, তখন মিখেইকে ডেকে যত দূরে সম্ভব বারুদগুলো ফেলে দিয়ে আসতে বললেন, অথবা সম্ভব হলে সেগুলোকে জলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে বেশ গর্বের সঙ্গে মাথার টুপিটাকে ঠিক করতে করতে বসার ঘরে গেলেন গজরাতে গজরাতে, 'খুব ভালভাবেই মানুষ হচ্ছে সবাই!'

বাবা আসার পর তার সঙ্গে দিদিমার ঘরে গেলাম; দেখলাম জানলার কাছটায় মিমি বসে আছেন দরজার দিকে বেশ কটমটে চোখে তাকিয়ে। তার হাতে কাগজে মোড়া কি যেন একটা বস্তু। আমি অনুমান করলাম, ওটা বাজি। অর্থাৎ কিনা, দিদিমা ইতিমধ্যে সবকিছুই জেনে গেছেন।

মিমির পাশে বসেছিল চাকরানী গাশা। তার লালচে রাগী মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে বেশ ভাল রকমের চটে গেছে। আর ডাক্তার ব্লুমেন্থাল, মুখ ভর্তি বসন্তের দাগওলা বেঁটে লোকটি—মাথা আর চোখ নাড়িয়ে তাকে শান্ত করার জন্য কী সব যেন বোঝাচ্ছিলেন।

দিদিমা অনেকটা ভ্রমনকারীর ভঙ্গিতে, রেগে গেলে যেভাবে বসতেন, তেমনিভাবে চেয়ারের একদিকে কাত হয়ে বসেছিলেন। সসম্ভ্রমে তার হাতে চুমু খেয়ে বাবা বললেন, 'আজ কেমন বুঝছেন? রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?'

'বেশ ভাল; আমার বিশ্বাস, যে তুমি জান আমি সবসময়ই বেশ ভাল থাকি।' এমন স্বরে দিদিমা কথাগুলো বললেন যে বোঝা গেল বাবার প্রশ্ন তার কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং অপমানসূচক বলে মনে হচ্ছে। তারপর গাশার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কি আমাকে একটা পরিষ্কার রুমাল দেবে?'

চেয়ারের হাতলে রাখা সাদা ধবধবে একটা রুমালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গাশা বলল, 'ঐ তো দিয়েছি।'

'ঐ নোংরা রুমালটা সরিয়ে ভাল একখানা দাও।'

গাশা আলমারির কাছে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে সেটাকে আবার এত জোরে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিল যে, ঘরের ভেতরের সবকটা কাচের জিনিস ঝন্‌ঝন্ করে নড়ে উঠল। দিদিমা আমাদের সবার ওপর একবার তার গম্ভীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, এবং চাকরানীর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর সে যখন তাকে সে রকমই আর একটা রুমাল এনে দিল, অবশ্য আমার দৃষ্টিতে তাই মনে হল, তখন দিদিমা বললেন, 'আমার নস্যি কখন গুঁড়ো করবে?'

'সময় হলেই করব।'

'কি বললে?'

'আজই করব।'

'আমার কাছে কাজ করতে যদি তোমার ভাল না লাগে, সে কথা আগেই বলতে পারতে, তাহলে অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে দিতাম।'

বেশ নিচু গলায় সে বিড়বিড় করল, 'তা যদি করেন, তবে কেঁদে ভাসাব না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তার তার দিকে চোখ ইশারা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ডাক্তারের দিকে এমন কটমটে দৃষ্টিতে তাকাল যে ডাক্তার তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে নজর দিলেন।

বিড়বিড় করে নিজের মনে বকতে বকতে গাশা ঘর ছেড়ে যাবার পর দিদিমা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখছ তো বাবা, আমার বাড়িতেই আমার সঙ্গে লোকেরা কিভাবে কথা বলে!'

এমন বিশ্রী ব্যবহারে বাবা বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি বললেন, 'যদি অনুমতি দেন, তবে আমিই আপনার নস্যি গুঁড়ো করে দিতে পারি।'

'না ধন্যবাদ। ও মেজাজ দেখাচ্ছে কারণ ও জানে যে একমাত্র ও-ই আমার মনোমত নস্যি গুঁড়ো করে দিতে পারে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুমি কি জান যে তোমার ছেলেরা আজ আর একটু হলেই এ বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল?'

সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি নিয়ে বাবা দিদিমার দিকে তাকালেন।

মিমির দিকে ফিরে দিদিমা বললেন, যা নিয়ে ওরা খেলছিল, সেটা দেখাও তো।'

বাবা পটকাটা হাতে নিয়ে না হেসে আর থাকতে পারলেন না। বললেন, 'আরে এটা তো পটকা; এতে মারাত্মক কিছু নেই।'

'তোমার প্রতি আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, তবে এ বয়সে আর জ্ঞান দিতে এসো না।'

ডাক্তার বেশ নিচু গলায় বললেন, 'উত্তেজিত হবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "এগুলো কোথা থেকে পেলে? এগুলো নিয়ে খেলা করার সাহস হল কি করে তোমাদের?'

'ওদের জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ হবে না, জিজ্ঞেস কর গিয়ে ওদের দিয়াদকাকে।' 'দিয়াদকা' শব্দটার ওপর বেশ জোর দিয়ে দিদিমা বললেন, দেখ, 'তিনি কেমন মানুষ করে তুলছেন ওদের।'

মিমি বললেন, 'ভোলোদিয়া বলেছে, ইভানিচ নিজেই ওকে বারুদ দিয়েছেন।'

'তা হলেই দেখ, কী চমৎকার মানুষ তিনি,' দিদিমা বলে চললেন, 'তিনি কোথায়, সেই দিয়াদকা, কি যেন নাম তার? তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

বাবা বললেন, 'কার সঙ্গে যেন তিনি দেখা করতে যাবেন, তাই ছুটি দিয়েছি।'

'ওসব মোটেই চলবে না; তাকে সবসময়ই এখানে থাকতে হবে। ছেলেপুলে আমার নয়, তোমার; আর আমার কোন অধিকারও নেই তোমাকে উপদেশ দেবার, কারণ, তুমি আমার থেকে অনেক বেশি জানো,' দিদিমা বলে চললেন, 'কিন্তু যদি আমার মতামত চাও তো বলি, ওদের জন্য একজন শিক্ষক রাখার সময় হয়েছে —একটা চাকর নয়, একটা জার্মান চাষা একটা—হ্যাঁ, নির্বোধ চাষা কোথাকার, ওর পক্ষে ছেলেদের ইতরামি আর টাইরোলিশ গান শেখানো ছাড়া অন্য কিছু শেখানো সম্ভবও নয়। আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি, ছেলেদের টাইরোলিশ গান শেখাটা কি একান্তই প্রয়োজন? যাকগে, এসব নিয়ে কেই বা ভাবছে। এখন

তোমার যা খুশি তাই কর।'

'এখন' শব্দটার পরিষ্কার অর্থ হল, আমাদের মা নেই, আর সেটাই দিদিমার হৃদয়ে ব্যথার স্মৃতি হয়ে বাজল। তিনি নস্যির ডিবের দিকে চোখ নামালেন, তাতে আঁকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

বাবা বেশ দ্রুততার সঙ্গে বললেন, 'অনেক দিন ধরে আমিও ব্যাপারটা ভাবছিলাম। এবং ঠিক করেছিলাম এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইব। দুপুর বেলা ওদের যিনি পড়ান সেই সেন্ট জেরোমিকে বলব কি?'

বেশ খুশি মাখা স্বরে দিদিমা বললেন, 'তাহলে তো ভালই হয়। তিনি অন্ততঃ এটুকু জানেন যে অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কিভাবে আদব কায়দা শেখাতে হয়। ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্যকোন কাজই যার জানা নেই তেমন চাকর-মার্কা লোক অন্ততঃ তিনি নন।'

বাবা বললেন, 'কালই তাহলে আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

এবং বাস্তবিক পক্ষে তার দুদিন পরেই কার্ল ইভানিচকে তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে যেত হল একটি নব্য ফরাসী ফুলবাবুকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ কার্ল ইভানিচের ইতিবৃত্ত

বিদায়ের ঠিক আগের দিন, পড়ন্ত সন্ধ্যায়, গায়ে ওভারকোট আর মাথায় লাল টুপি চড়িয়ে, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বাক্সের দিকে ঝুঁকে জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করলেন কার্ল ইভানিচ।

শেষের দিকে আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি বেশ কর্কশ হয়ে উঠেছিলেন, এবং সবসময় চেষ্টা করতেন আমাদের এড়িয়ে যাবার। সেদিনও, আমি ঘরে ঢুকলে, আলগোছে একবার আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি নিজের কাজ করে চললেন। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আগে হলে তিনি অবশ্যই আমাকে বাধা দিতেন, কিন্তু সেদিন একটা কথাও বললেন না। আর কোনদিন তিনি আমাদের বকবেন না, এখন আমাদের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই নেই—একথা মনে হতেই আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় বুকটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে এল। ইচ্ছে হল, এই সহানুভূতির কথাটুকু তাকে বলি। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে একটু সাহায্য করি না।' তিনি আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। সেই মুহূর্তের চোখাচোখিতে বুঝলাম, তার নির্লিপ্ততার যে কারণ নির্দেশ করেছিলাম আমি, তা ঠিক নয়; তিনি আসলে সত্যিকারেরই গভীর দুঃখে পতিত হয়েছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভগবান সবই দেখতে পাচ্ছেন, সবই বুঝছেন; তার ইচ্ছেতেই সবকিছু চলুক।' তারপর আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আমার চোখের গভীর সমবেদনার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, 'হ্যাঁ, নিকোলেনকা, আমার ভাগ্যটাই এরকম; শৈশব থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। মানুষের জন্য যতটুকু ভাল কাজ করেছি, তারজন্য সর্বদাই পেয়েছি খারাপ প্রতিদান; আসলে আমার পুরস্কার এখানে নয়, ওখানে।' স্বর্গের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন। 'আমার জীবনের ইতিহাস যদি জানতে, কী ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়েই যে সময় কেটেছে। একসময় মুচির কাজ করতাম, তারপর সৈনিকের কাজ, সেখান থেকে পালিয়ে এসে মজুরের কাজ

করেছি ; তারপর হলাম শিক্ষক, আর এখন—কিছুই নই। ভগবানের বিরাট দুনিয়ায় আমার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই।' তিনি তার কথা শেষ করে চোখ বুজে একটা চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন।

শ্রোতার কথা না ভেবেই যে অবস্থায় মানুষ নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য চিন্তার কপাট উন্মুক্ত করে দেয়—কার্ল ইভানিচ সেই স্তরে পৌঁছে গেছেন এটা উপলব্ধি করেই আমি বিছানায় নীরবে বসে তার দয়ার্দ্র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'এখন আর তুমি বাচ্চা নও, সবকিছুই বুঝতে পার। আমার নিজের কাহিনী তোমাকে বলব—এ জীবনে যত ব্যথা সহ্য করেছি, সব। একদিন এই বৃদ্ধের কথা তোমাদের মনে হবেই, কারণ, এ তোমাদের হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল।'

পাশে রাখা টেবিলটার ওপর কনুইটাকে রেখে, নাকে এক টিপ নস্যি নিয়ে, স্বর্গের দিকে চোখটা ঘুরিয়ে, যেমন ভারী গলায় আমাদের শ্রুতিলিখন দিতেন তেমনি ভারী গলায় নিজের কাহিনী বলা শুরু করলেন কার্ল ইভানিচ। বললেন, 'জন্মের আগে থাকতেই আমি দুঃখী।'

যেহেতু কার্ল ইভানিচ তার জীবন-কাহিনী একই ভাষায়, একই স্বরে বহুবার আমাকে শুনিয়েছিলেন, তাই আশা করছি, সেই কাহিনী আজ আমি ঠিক তেমনি-ভাবেই হুবহু বর্ণনা করতে সক্ষম হব। সত্যিই এটা তার জীবন কাহিনী, নাকি আমাদের বাড়িতে নিঃসঙ্গ থাকার সময়ের মানসিক কল্পনার ফল, অথবা সত্য ঘটনার ওপর রঙ চড়ানো, তা আজ পর্যন্ত আমার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। একদিকে, জীবন্ত অনুভূতির প্রাচুর্যে ভরিয়ে তিনি তার কাহিনীকে এমন পারম্পর্য-ভাবে বলেছিলেন যে সে ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগতেই পারে না ; আবার অন্যদিকে সে বর্ণনা এত কাব্যিক ঘটনাবহুল ছিল যে তাতে সন্দেহ জাগা অবধারিত।

'আমার শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে কাউন্ট অব সামারব্লাটের রক্ত। মার বিয়ের ঠিক ছমাস পরেই আমার জন্ম হয়। তার স্বামী সামারব্লাটের অধীনে চাষবাসের কাজ করতেন। তাকে আমি বাবা বলেই ডাকতাম। তিনি আমার মার অপরাধকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেননি, এবং তাকে এতটুকুও ভালবাসতেন না। জোহান নামে আমার একটি ভাই ছিল, আর ছিল দুটি বোন ; কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে আমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। মনে হত, আমি যেন সেখানে আগন্তুক। যদি জোহান কখনও কোন দুষ্টুমি করত তো বাবা বলতেন, "কার্লের জন্য এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকার জো নেই!" এবং বকা আর শাস্তিই ছিল আমার পাওনা। যখন বোনেরা একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করত তখন বাবা বলতেন, "কার্ল কোনদিনই মানুষ হবে না।" এবং আমাকে বকতেন আর শাস্তি দিতেন।

'আমার মা কিন্তু আমাকে ভালবাসতেন আর গায়ে হাত বুলিয়ে প্রায়ই বলতেন, "কার্ল, আমার ঘরে আয় তো।" তারপর গালে চুমু খেতেন আর দুঃখ প্রকাশ করতেন, "অভাগা ছেলে, কেউই তোকে ভালবাসে না ; কিন্তু আমি তো আছি রে। তোর মা তোর কাছে একটা ভিক্ষে চাইছে, ভালভাবে পড়াশুনো করে, ভবিষ্যতে সৎমানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা কর, দেখিস, ভগবান ঠিক তোর সাথে থাকবেনই।" আর আমিও তাই চেষ্টা করতাম। যখন আমার বয়স মাত্র চোদ্দ, এবং গির্জায় যাওয়া শুরু করেছি তখন একদিন মা বাবাকে বললেন, "গুস্তাফ,

কার্ল এখন বড় হয়েছে, ওরজন্য একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হয়।" উত্তরে বাবা বললেন, "আমি কিছু জানি না।" মা বললেন, "ওকে তাহলে শহরে হের স্কুলংজের কাছে পাঠানো যাক, সেখানে ও জুতো বানানো শিখবে।" বাবা বললেন, "ঠিক আছে, তাই হোক।" এরপর একটানা দু বছর সাত মাস আমি হের স্কুলংজের কাছে রইলাম। তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি বলেছিলেন, "কার্ল খুব খাটিয়ে ছেলে, কিছুদিনের মধ্যেই ও আমার সহকারী হয়ে যাবে।" কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় অন্য। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদেশ হল ; আঠার থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত সুস্থ দেহের প্রতিটি মানুষকেই যেতে হল শহরে।

'বাবা এবং ভাই জোহানও শহরে এল, আর সবাই মিলে গেলাম ভাগ্য পরীক্ষা করতে—কাকে সৈনিক হতে হবে, আর কাকে হবে না। জোহান খুব বাজে নম্বর পেল—ফলে তাকে যেতেই হবে ; আর আমি পেলাম ভাল নম্বর—ফলে আমার যাওয়া না যাওয়াটা হল ইচ্ছাধীন। তখন বাবা বললেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, আজ তাকেও হারাতে হচ্ছে !"

'আমি তার হাত দুটো ধরে বললাম, "অমন কথা কেন বলছ বাবা ? আমার সাথে এস, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।" বাবা এলেন, এবং আমরা সামনের একটা হোটেলে গিয়ে বসলাম। বেয়ারাকে হুকুম করলাম, "আমাদের দু বোতল বিয়ার দাও।" সাথে সাথে বিয়ার এল। আমরা দুজন এবং ভাইও কিছুটা বিয়ার খেল।

'আমি বললাম, "বাবা, এমন কথা কখনও বোলো না যে তোমার একটিই ছেলে, এবং তাকেও হারাতে হচ্ছে। তোমার একথা শুনলে ব্যথায় আমার বুকটা ফেটে যায়। জোহানকে সৈন্যদলে যেতে হবে না, আমিই যাব। আমাকে এখানে কেউই পছন্দ করে না, সুতরাং আমিই সৈনিক হব।"

'বাবা আমার গালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, "সত্যিই তুমি সাচ্চা ছেলে।" এবং সেদিন থেকে আমি একজন সৈনিক হলাম।'

নবম পরিচ্ছেদ ॥ পূর্বকাহিনীর ক্রমকথন

কার্ল ইভানিচ বলে চললেন, 'সত্যিই সেটা একটা ভয়ঙ্কর সময় গেছে নিকোলেনকা। নেপোলিয়ন তখন বেঁচে। তিনি চাইছিলেন জার্মানীকে দখল করতে, আর আমরা চেষ্টা করছিলাম শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাকে রক্ষা করতে।

'আমি আলসে ছিলাম, অস্টারলিজে ছিলাম, আর ছিলাম ওয়াগ্রামে।'

বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি নিজেও যুদ্ধ করেছিলেন ? নিজের হাতে মানুষ মেরেছেন ?'

মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমার কৌতূহলের অবসান ঘটালেন। বললেন, 'একবার একটি ফরাসী সৈন্য দল-ছুট হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল ; আমি তাকে দেখতে পেয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে গিয়ে মারতে উদ্যত হয়েছি ; অমনি সে হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "দয়া কর, মেরোনা আমায়।" তখনি আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

'ওয়াগ্রামে নেপোলিয়ন আমাদের তাড়া করে একেবারে দ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, এবং এমনভাবে ঘিরে ফেললেন যে আমাদের আর পালাবার পথই রইল না। একনাগাড়ে তিনদিন একটা দানাও জুটল না ; আমরা হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। শয়তান আমাদের বন্দীও করলনা, আবার যেতেও দিলনা।

'চারদিনের দিন, কপাল ভাল বলতে হবে, আমাদের গ্রেপ্তার করে একটা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল। আমার পরনে ছিল নীল প্যান্ট, ভাল কাপড়ের তৈরি সামরিক পোশাক, পনেরটা মুদ্রা আর বাবার দেওয়া একটা রূপোর ঘড়ি। একজন ফরাসী সৈনিক সে সবকিছুই আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। মা জামার ভেতর সেলাই করে তিনটে মোহর দিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু সেগুলো কেউই খুঁজে পেল না।

'ঠিক করলাম, বেশিদিন দুর্গে থাকব না, পালাব। একটা বেশ বড় উৎসবের দিন, আমাদের পাহারা দিচ্ছিল যে রক্ষী, তাকে ডেকে বললাম, "দেখুন, এই পবিত্র উৎসবের দিনটা আমি পালন করতে চাই। অনুগ্রহ করে দু বোতল মাদেইরা আনুন, দুজনে মিলে তা পান করা যাবে।' রক্ষী বললেন, "ঠিক আছে।" তারপর তিনি মাদেইরা নিয়ে এলে আমরা দুজনেই তার থেকে দু গেলাস খেলাম এবং তার হাত ধরে বললাম, "আপনার বাবা মা আছেন তো?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আছেন।" তখন আমি বললাম, "আমার বাবা মা আমাকে আট বছর দেখেননি; এমনকি আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি, তা-ও তারা জানেন না। ভাই, আমার কাছে দুটো মোহর রয়েছে, অনুগ্রহ করে সে দুটো নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। তাহলে আমার বাবা মা দুজনেই সারাজীবন ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করবেন।"

'রক্ষী আরেক পাত্র মাদেইরা পান করে বললেন, "ভাই, আমি আপনাকে খুবই ভালবাসি, এবং আপনার জন্য যথেষ্ট কষ্টও হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আপনি হচ্ছেন বন্দী, আর আমি হচ্ছি একজন সৈনিক।" তখন আমি তার হাত ধরে বললাম, "বন্ধু আপনার হাতেই সব, ইচ্ছে করলে আপনি এটুকু অন্ততঃ করতে পারেনই।"

'তখন সার্জেন্ট বললেন, "আপনি একজন গরীব লোক, আমি আপনার কাছ থেকে পয়সা নেবনা, তবে আপনাকে সাহায্য করব ঠিকই। যখন আমি শুতে যাব, তখন এক ঝুড়ি ব্রান্ডি এনে সৈনিকদের দেবেন; ওরা তা খেয়ে শুয়ে পড়বে; আর সেই সুযোগে আপনি সরে পড়বেন।"

'সত্যিই তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন। আমি এক ঝুড়ি মদ আনিয়ে সৈনিকদের দিলাম, এবং যখন তারা তা পান করে মত্ত হয়ে উঠল তখন জুতো পরে, গায়ে লম্বা কোটটা চাপিয়ে দরজার বাইরে চলে এলাম। দেওয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়বার উদ্দেশ্যে দেওয়ালের কাছটায় গেলাম, কিন্তু সেখানে জল থাকাতে আমাকে সিদ্ধান্ত বদল করতে হল। কারণ আমি চাইছিলাম না যে আমার শেষ সম্বল পোশাকটুকুও কাদায় মাখামাখি হয়ে নষ্ট হয়ে যাক, তাই আবার দরজার দিকে ফিরে এলাম।

'রক্ষী বন্দুক হাতে এদিক ওদিক পায়চারি করছিল এবং হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "কে যায়?" আমি তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না; ফলে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কে যায়?" এবারও কিছু বললাম না। ফলে তৃতীয়বার সে জানতে চাইল, "কে যায়?" সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালাম; জলে লাফ দিয়ে, দেওয়াল টপকে ছুটতে শুরু করে দিলাম।

'সারা রাত ধরে দৌড়লাম, কিন্তু সকাল হয়ে আসতেই ভয় হল হয়ত ওরা আমায় চিনে ফেলবে; তাই লম্বা শর্ষে গাছের ক্ষেতে লুকিয়ে রইলাম। নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

'সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙল, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। হঠাৎ দুটো কালো ঘোড়ায় টানা একটা ভাড়াটে জার্মান গাড়ি আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। গাড়িটায় পাইপ মুখে বেশ ভদ্রচেহারার একজন জার্মান বসে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। গাড়িটা যাতে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সেজন্য আমি খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম, কিন্তু আশ্চর্য, গাড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে তার গতি কমাল, এবং ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে আমি রাস্তার ধারে বসে পড়লাম। তখন ভদ্রলোকটি তার ঘোড়া থামিয়ে দিলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাতে যাচ্ছ কোথায়?" আমি বললাম, "ফ্রাঙ্কফুর্ট যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "গাড়িতে ওঠ, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।" তার কথা মত গাড়িতে উঠে বসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাথে মালপত্র কিছু নেই কেন? তাছাড়া দাড়ি কামাওনি কেন? জামা কাপড়ই বা এত ময়লা কেন?" তার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "আমি একজন গরিব লোক। কাজের খোঁজে যাচ্ছি; হঠাৎ রাস্তায় পড়ে গিয়ে জামাকাপড়ে কাদা লেগে গেছে।" তিনি বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ; সারাটা রাস্তাই এখন শুকনো রয়েছে।"

'তখন আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আমায় সত্যি কথা বল। তোমার পরিচয় কি, কোথা থেকে আসছ? তোমাকে আমার বেশ ভালই লাগছে; যদি তুমি সত্যিকারের সৎ হও তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

'তখন আমি তাকে সব কথাই বললাম। শুনে তিনি বললেন, "খুব ভাল; তুমি আমার দড়ি তৈরির কারখানায় চল। আমি তোমাকে কাজ, জামাকাপড়, টাকাপয়সা সব দেব; এখন থেকে তুমি আমার সাথেই থাকবে।"

'আমি তখন বললাম, "ঠিক আছে, তাই হবে।"

'আমরা দড়ির কারখানায় গেলাম, এবং ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বললেন, "এই ছেলেটি তার দেশের জন্য লড়েছিল আর আজ জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। এর ঘরবাড়ি, জামাকাপড়, খাবারদাবার কিছুই নেই। ও এখন থেকে আমাদের সাথেই থাকবে। ওকে পরিষ্কার জামাকাপড় দাও আর খেতে দাও।

'দেড় বছর আমি সেই দড়ি-তৈরির কারখানায় কাটালাম, এবং আমার মালিক আমাকে এত বেশি ভালবাসতেন যে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। ততদিনে আমি একজন সুদর্শন যুবক হয়ে উঠেছি; লম্বা চেহারা, নীল চোখ আর রোমানদের মত টিকালো নাক। ওদিকে আমার মালিকের যুবতী স্ত্রী শ্রীমতী এল (তার নাম বলতে পারব না) ততদিনে আমার প্রেমে পড়ে গেছেন।

'যখনই তিনি আমাকে দেখতেন তখনই বলতেন, "তোমার মা তোমাকে কি বলে ডাকতেন?" আমি বলতাম, "কার্লচেন।"

'আমি তার পাশে বসলে তিনি বলতেন, "কার্লচেন, আমায় চুমু খাও।"

'আমি তাকে চুমু খেতাম এবং তিনি বলতেন, "কার্লচেন, আমি তোমায় এত ভালবেসে ফেলেছি যে আর সহ্য করতে পারছি না।" কথা বলতে বলতে তার দেহ থরথরিয়ে কাঁপত।'

এতটা বলে কার্ল ইভানিচ থামলেন; তারপর কোন সুখদায়ক স্মৃতির কথা মনে এলে মানুষ যেমন করে তেমনিভাবে ঘাড় নাড়ালেন এবং হাসতে শুরু করলেন।

ড্রেসিং-গাউনটাকে কাছে টেনে নিয়ে আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে

তিনি আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, জীবনে ভালমন্দ অনেক কিছু পেরিয়ে এলাম, তবে একমাত্র উনিই তার সাক্ষী।' একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'কেউই বলতে পারবে না যে কার্ল ইভানিচ একজন অসৎ লোক। আমার প্রতি মাননীয়া "এল" যে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন তার ঋণ পরিশোধ করার মত অকৃতজ্ঞতা আমার ছিলনা; তাই আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় যখন সবাই ঘুমোতে গেল, তখন আমি আমার মালিকের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে, জামাকাপড় আর তিনটে টাকা নিয়ে, নিঃশব্দে পা ফেলে রাস্তায় চলে এলাম। কেউ আমাকে দেখতে পেল না; একা একা আমি হেঁটে চললাম পথ ধরে।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ ধারাবাহিক

'দীর্ঘ ন বছর আমি আমার মাকে দেখিনি; তিনি জীবিত না মৃত তা-ও জানতাম না। দেশে ফিরে নিজেদের শহরে পৌঁছে যখন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানতে চাইলাম যে কাউন্ট সামারব্লাটের ঠিকা-চাষী গুস্তাফ মৌয়ের এখন কোথায় আছেন, তখন তার উত্তরে তারা বললেন, "কাউন্ট সামারব্লাট মারা গেছেন আর গুস্তাফ মৌয়ের বড় রাস্তায় একটা মদের দোকান খুলেছেন।" বেশ পরিপাটি হয়ে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে আমি গিয়ে হাজির হলাম বাবার মদের দোকানে। আমার বোন মেরিয়েচেন সেখানে বসে ছিল, সে জানতে চাইল আমার কি চাই? আমি বললাম, "এক গেলাস মদ পেতে পারি কি?" সে বলল, "বাবা, একজন লোক এক গেলাস মদ চাইছেন।" এবং বাবা বললেন, "ওনাকে এক গেলাস মদ দাও।" আমি টেবিলে বসে মদের গেলাসটা শেষ করে, একটা পাইপ ধরিয়ে বাবার দিকে, মেরিয়েচেন এবং জোহানের দিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। আমার সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে বাবা বললেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন, বর্তমানে আমাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় রয়েছে?" আমি বললাম, "আমি নিজেই তো সৈন্যবাহিনী থেকে আসছি; তারা এখন ভিয়েনার কাছে রয়েছে।" বাবা বললেন, "আমাদের ছেলেও সৈন্যবাহিনীতেই ছিল; তাই শেষ চিঠি আসার পর নটা বছর কেটে গেছে; আজ আমরা জানিও না যে সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। আমার স্ত্রী সবসময় তার জন্য চোখের জল ফেলছে।" পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, "আপনার ছেলের নাম কি, আর কোন বাহিনীতেই বা সে আছে? হয়ত আমি তাকে চিনতেও পারি।" বাবা বললেন, "তার নাম কার্ল মৌয়ের, অস্ট্রিয়ার জাগের বাহিনীতে সে ছিল।" মেরিয়েচেন তার সাথে যোগ করল, "আপনার মতনই বেশ লম্বা চওড়া সুন্দর দেখতে ছিল তাকে।"

'আমি বললাম, "আপনাদের কার্ল'কে আমি চিনি।" সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "আমালিয়া, এদিকে এস, এখানে একজন ভদ্রলোক এসেছেন যিনি আমাদের কার্ল'কে চেনেন।" সাথে সাথে পেছনের দরজা দিয়ে আমার মা বেরিয়ে এলেন; এক পলকেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বেশ কাঁদতে কাঁদতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের কার্ল'কে চেনেন?" উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ, তাকে দেখেছি।" তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হলনা আমার, বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল ব্যথায়। মা বললেন, "কার্ল বেঁচে আছে! হে ঈশ্বর। আমার কার্ল কোথায়?

আমি যদি একবারের জন্যও তাকে দেখতে পেতাম তাহলেই শান্তিতে মরতে পারতাম, কিন্তু ভগবানের বোধহয় তা ইচ্ছে নয়।" কথা শেষ না হতেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "মা, আমিই কার্ল।" একথা শুনে তিনি আমার বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

কার্ল ইভানিচ তার চোখ বন্ধ করলেন, এবং ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল। চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা ; তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে চললেন, 'হ্যাঁ, এই হল তার ছেলে, তার কার্ল ; আর তার ছেলের বাহুতে মাথা রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।'

'কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না যে দেশেই আমি আমার জীবনটা অতিবাহিত করি। অসুখী হওয়াটা যেন ছিল আমার ভাগ্যলিপি। দুর্ভাগ্য প্রতি পদে আমাকে ধাওয়া করে চলল। মাত্র তিনটে মাস থাকতে পেরেছিলাম দেশে। এক রবিবারের সন্ধ্যায় একটা কফি হাউসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার পান করতে করতে রাজনীতির আলোচনা করছিলাম। সম্রাট ফ্রাঞ্জ, নেপোলিয়ন এবং যুদ্ধ নিয়ে যে যার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করছিল। আমাদের খুব কাছে বসে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক নীরবে কফি পান করছিলেন। চৌকিদার যখন "রাত দশটা বাজল" বলে হাঁক দিল তখন টুপিটা হাতে তুলে পয়সা মিটিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। প্রায় মধ্যরাতে কে যেন দরজায় টোকা দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" উত্তর এল, "দরজা খুলুন।" আমি বললাম, "আগে নাম বলুন, তারপর দরজা খুলব।" তিনি বললেন, "আইনের নির্দেশ. দরজা খুলুন।" আমি দরজা খুললাম। দেখলাম, দুজন সৈনিক বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কফি হাউসে দেখা সেই ভদ্রলোকটি হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি একজন গুপ্তচর ছিলেন। বললেন, "আমার সঙ্গে চলুন।" আমি বললাম, "ঠিক আছে, চলুন।" জামা জুতো পরে, পদকগুলো এঁটে ঘরের মধ্যে দু একবার এদিক-ওদিক পায়চারি করলাম। মনে মনে বললাম, "এটা একটা শয়তান।" তারপর দেওয়ালের কাছে গিয়ে হঠাৎ তলোয়ারটাকে তুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "একটা গুপ্তচর কোথাকার, এবার এস, নিজেকে রক্ষা কর।" মুহূর্তের মধ্যে তার দেহের ডানে, বাঁয়ে মাথায় আঘাত করলাম ; এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুটকেসটা হাতে নিয়ে জানলা থেকে লাফ দিলাম। দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম রাষ্ট্রদূত দপ্তরে, সেখানে দেখা করলাম জেনারেল সাজিনের সঙ্গে। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে রাশিয়ায় আসার একটা ছাড়পত্র যোগাড় করে দিলেন ; এবং আমাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলেন তার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ভার নেবার জন্য। তারপর তার মৃত্যু হলে তোমার মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "কার্ল ইভানিচ, আমি আমার ছেলেদের দেখাশুনোর ভার আপনাকেই দিতে চাই। আপনি ওদের দায়িত্ব নিন, কথা দিচ্ছি, কোনদিনই আপনাকে বরখাস্ত করা হবে না। আপনার বৃদ্ধ বয়সের দায়দায়িত্বও আমার ওপরই রইল।" কিন্তু তিনি এখন মারা গেছেন, আর তাই সবকিছুই ভুলে যাওয়া হয়েছে। কুড়ি বছর চাকরিতে থাকার পর আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে রাস্তায়—একটুকরো শুকনো রুটির খোঁজে। ভগবান সবকিছুই দেখতে পাচ্ছেন ; তিনিই এর বিচার করবেন। শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই যা দুঃখ হচ্ছে

আমার!' কার্ল ইভানিচ তার কথা শেষ করে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় সস্নেহে চুম্বন করলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ খারাপ ফল

শোকের বৎসর শেষ হল, দিদিমা ততদিনে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন, এবং অতিথি অভ্যাগতদের আসা-যাওয়াও শুরু হয়েছে—বিশেষতঃ আমাদের বয়সের ছেলেমেয়েদের।

লিউবোচ্‌কার জন্মদিনে, ১৩ই ডিসেম্বর, রাজকুমারী কোরনাকোভা, তার মেয়েরা, ভালাখিনা, সোনেচকা, ইলেনকা গ্রাপ এবং ইভান ভ্রাতৃদ্বয় ডিনারের আগেই এসে উপস্থিত হল।

যদিও পড়ার ঘরে বসেই আমরা তাদের হাসিঠাট্টা, দৌড়-ঝাঁপ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সকলের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছিলাম না। আমাদের সময় নির্দেশিকায় লেখা ছিল; সোমবার ২টো থেকে ৩টে—ইতিহাস আর ভূগোলের শিক্ষক। অর্থাৎ তিনি না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে; তার কথা শুনতে হবে, এবং তিনি শেষ করলে তবেই আমরা ছুটি পাব। এদিকে ঘড়ির কাটায় ২টো বেজে ২০ মিনিট, অথচ তার দেখাই নেই। এমনকি রাস্তার দিকে তাকিয়েও দেখলাম, কিন্তু তাকে মোটেই নজরে পড়ল না।

স্মারাগদোভের যে বইটা দেখে পড়া মুখস্থ করছিল, তা থেকে চোখ তুলে ভোলোদিয়া বলল, 'আমার মনে হয় না যে লেবেদফ আজ আর আসবেন।'

আমি বললাম, 'ভগবান করুন, যেন না আসেন; কারণ ওনার কোন পড়াই আমার মুখস্থ হয়নি।' তারপর হতাশ সুরে বলে উঠলাম, 'হে ভগবান, ঐ তো তিনি আসছেন!'

ভোলোদিয়া উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'না, তিনি নন, অন্য একজন ভদ্রলোক।' তারপর হাত পা ছড়িয়ে মাথা চুলকে বলল, 'আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, তার মধ্যে যদি না আসেন তবে সেন্ট জেরোমিকে বলল, বই-খাতা তুলে রাখছি।'

কইদানভের বইটাকে মাথার ওপর তুলে বিরক্তিভরা স্বরে আমি বললাম, 'আমি বুঝতেই পারছি না, ওনার আজ আসাটার দরকারটাই বা কি!'

কোন কাজ না থাকাতে অগত্যা বইটা খুলে পড়ার জায়গাটায় চোখ বোলাতে শুরু করলাম। সেটা বড্ড লম্বা আর কঠিন অধ্যায় ছিল। আমি তার কিছুই জানতাম না, এবং বুঝতে পারলাম যে ওটা মনে রাখা আমার সাধ্যাতীত, কারণ, তখন মনের অবস্থা এমন যে ওসব কিছু মাথায় ঢুকছিলই না।

আমাদের ইতিহাস পড়ার একেবারে শেষ পর্বে (এটা আমার কাছে সবসময়ই রসকষহীন নিরর্থক বলে মনে হত) লেবেদফ আমার বিরুদ্ধে সেন্ট জেরোমির কাছে অভিযোগ করলেন এবং আমাকে সাকুল্যে মাত্র দু নম্বর দিলেন। জেরোমি বললেন, যদি পরের বার অন্ততঃ তিন নম্বর না পাই তবে উনি আমাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর এটাই ছিল সেই বিশেষ অধ্যায়টা; এবং আমি স্বীকার করছি, সেদিন আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

এমন তন্ময়তার সঙ্গে আমি পড়াটা মুখস্ত করছিলাম যে পাশের ঘরে হঠাৎ জুতো খোলার আওয়াজে একেবারে চমকে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই পিত্তি

জ্বালানো মুখখানা। পাণ্ডিত্য জাহির করা বোতাম বসানো নীল কোটটা পরে তিনি দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারপর এগিয়ে এসে টুপিটা জানালার ওপর রাখলেন, খাতাগুলো রাখলেন টেবিলের ওপর ; আর কোটের একটা দিককে এমন কায়দায় ঘুরিয়ে নিলেন যে মনে হল সেটা যেন কত প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। অবশেষে ফুঁ দিয়ে চেয়ারের ওপরটা পরিষ্কার করে বেশ আরামে বসলেন।

একটা হাতের ওপর অন্য একটা হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'তাহলে আজ প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক, শেষবার আমরা কি পড়েছিলাম ; তারপর আমি তোমাদের মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বলব।' অর্থাৎ, তোমাদের পড়া বল।

ভোলোদিয়া যখন বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার পড়া মুখস্থ বলছিল, তখন আমি উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টিতে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম ; এবং যেহেতু নিচে যাওয়ার কোন হুকুম ছিল না, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করলাম একটা কোণে লুকোতে। কিন্তু যে মুহূর্তে দরজার পিছে লুকোতে যাব, অমনি, আমার চিরদিনের দুর্ভাগ্যের কারণ মিমি এসে একেবারে ঘাড়ের মধ্যে পড়লেন। আমার দিকে রোষকম্পান্বিত দৃষ্টি হেনে বললেন, 'তুমি এখানে!'

দুটি কারণে আমার নিজেকে বেশ অপরাধী বলে মনে হল। প্রথমতঃ, আমি পড়ার ঘরে ছিলাম না ; দ্বিতীয়তঃ এমন এক জায়গায় ছিলাম যেখানে আমার থাকার কোন কারণই ছিল না। সুতরাং, মুখ বন্ধ করে, মাথা নুইয়ে হাবে-ভাবে চেহারার মধ্যে এক মর্মস্পর্শী করুণভাবে ফুটিয়ে তুললাম। তবু মিমি বললেন, 'এটা খুবই খারাপ, এখানে কি করছিলে?' আমি কোন উত্তর দিলাম না। সিঁড়ির রেলিঙে আঙুল ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তিনি বলে চললেন, 'না, এ চলতে পারে না ; আমি কাউন্টেসকে সব কথা বলব।'

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে আমি পড়ার ঘরে ফিরে এলাম। মাস্টার মশাই তখন ভোলোদিয়াকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, এবং আমি যে এতক্ষণ ঘরে ছিলাম না, তা তার খেয়ালই হয়নি। পড়ানো হয়ে গেলে তিনি খাতাপত্র গোছাতে লাগলেন এবং ভোলোদিয়া পাশের ঘরে গেল নাম্বারের টিকিট আনতে। এ সব দেখে আমি স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে যাক তাহলে আজকের মত রেহাই পাওয়া গেল, কারণ উনি তো আমার কথা ভুলেই গেছেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি আমার দিকে মুচকি হাসি হেসে তাকালেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'আশাকরি তুমি তোমার পড়া তৈরি করেছ।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ স্যার।'

নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বেশ দুলে দুলে বলেন, 'সেন্ট লুইয়ের ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান বলতো।' তারপর ভ্রূ-কুঁচকে, কালির দোয়াতটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আচ্ছা, আগে বলতো, ফরাসী সম্রাট কি কারণে ক্রুশ গ্রহণ করেছিলেন ; তারপর না হয় বোলো সমুদ্রাভিযানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি।' কথা বলতে বলতে কিছু যেন একটা লুফে নিলেন এমন ভঙ্গি করলেন। শেষে খাতাগুলো দিয়ে টেবিলের ওপর একটা আওয়াজ তুলে বললেন, 'তারপর ইউরোপের ওপর সেই ধর্মযুদ্ধের কি ফলাফল, এবং বিশেষতঃ ফ্রান্সের ওপর তার কি প্রভাব পড়েছিল সেটা ব্যাখ্যা কোরো।' অবশেষে টেবিলের ডানদিকটায় একটা শব্দ করে

মাথাটাকে ডানদিকে হেলিয়ে দিয়ে তিনি তার কথা শেষ করলেন।

আমি বারকয়েক ঢোক গিলে, কেশে, মাথাটাকে এক দিকে হেলিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর টেবিলের ওপরে রাখা পালকের কলমটা তুলে নিয়ে তা থেকে একটা একটা করে পালক ছিঁড়তে লাগলাম, মুখে কোন কথা বললাম না।

হাতটা বাড়িয়ে মাস্টার মশাই বললেন, 'কলমটা আমায় দাও, এটা কাজের জিনিস। এবার বল।'

'লুর...রাজা...সেন্ট...লুই...ছিলেন...একজন বেশ ভাল জ্ঞানী জার।'

'কি?"

'একজন জার। তিনি জেরুজালেম যেতে মনস্থ করেছিলেন এবং দেশের শাসনভার মার হাতে অর্পণ করেছিলেন।'

'তার মার নাম কি ছিল?'

'ব...ব...লনকা।'

'কি? বুলানকা?'

অতি কষ্টে আমি আমার হাসি চেপে রাখলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন' 'হুঁ, আর কিছু জান?'

এরপর আর আমার কোন ভয় রইল না; সুতরাং বেশ গলা কেশে মনে যা এল তাই বলতে শুরু করে দিলাম। শিক্ষক মশাই পালকের কলমটা দিয়ে টেবিলের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আমার কানের পাশ দিয়ে সোজা তাকিয়ে বারবার বললেন, 'বাঃ চমৎকার, খুব চমৎকার।' আমি জানতাম যে আমার কিছুই জানা নেই, আর যা বলার ছিল তার কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না। ওদিকে শিক্ষক মশাইও আমার ভুল শোধরানো তো দূরের কথা, আমাকে থামতে পর্যন্ত না বলাতে মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

আমার কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন, 'কেন তিনি জেরুজালেমে যাবার জন্য মনস্থির করেছিলেন?'

'কারণ—যাতে—এই উদ্দেশ্যে—কারণ' অসহায়ভাবে খাবি খেতে শুরু করলাম, নতুন আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। মনে হল, মাস্টার মশাই যদি পুরো একটা বছরও মুখ বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন তবু আমি নতুন করে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারব না। এবং এভাবেই তিনটে মিনিট কেটে গেল; তারপর তার সারাটা মুখে নেমে এল বেদনার ছায়া; সদ্য ঘরে ঢোকা ভোলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকে মন্তব্য-লেখার খাতাটা দাও তো।'

ভোলোদিয়া খাতাটা এগিয়ে দিয়ে টিকিটগুলোকে সতর্কভাবে তার পাশে রেখে দিল।

মাস্টার মশাই খাতাটা খুলে, দোয়াতে কলমটাকে চুবিয়ে নিয়ে, ভোলোদিয়ার নামের পাশে আবৃত্তি আর আচরণের নির্দিষ্ট অংশটায় সুন্দর হাতের লেখায় ৫ নম্বর লিখলেন। তারপর আমার নামের পাশটায় কলমটা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে কী যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

হঠাৎ তার হাতটা নড়ে উঠল; একটা কিছু লিখে দাড়ি টানলেন। আবার সেটা চলে গেল আচরণের অংশটায়; সেখানে আবার কি একটা লিখে দাড়ি টানলেন।

আমি তাকে কি বলতে চাইছি সেটা বুঝে নিয়েই তিনি বললেন, 'না, ওভাবে পড়াশুনো হয় না। ওরা কি আমায় এমনি এমনি মাইনে দেবেন?' তারপর জুতো পরে, কোটটাকে গায়ে চাপিয়ে, টাই এঁটে নিলেন। আমার ওপর থেকে যে বিরাট ঝড়টা বয়ে গেল তারপরও কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব এমন তুচ্ছ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া! তার কাছে তো ব্যাপারটা শুধু কলমের চালনা, কিন্তু আমার পক্ষে যে সেটাই একটা বিরাট দুর্ভাগ্য।

সেন্ট জেরোমি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়া শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'মাস্টার মশাই তোমাদের ওপর খুশি হয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ।' ভোলোদিয়া জবাব দিল।

'কত নম্বর পেয়েছ?'

'পাঁচ।'

'আর নিকোলাস?'

আমি কোন কথাই বললাম না। ভোলোদিয়া বলল, 'আমার মনে হয় চার।'

ও জানত যে অন্ততঃ সেদিনের জন্য আমাকে রক্ষা করাটা একান্ত প্রয়োজন। কারণ সেদিন যদি আমি সাজা পেতাম, তবে সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হত, কেননা সেদিন আমাদের বাড়ি ভর্তি অতিথি এসেছিলেন যে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ছোট্ট একটা চাবি

নিচে গিয়ে সবে আমরা আমাদের অতিথিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করেছি এমন সময় খাবারের ঘন্টা বেজে উঠল। বাবা তখন বেশ খোশমেজাজে ছিলেন (খানিক আগেই তিনি তাসের বাজি জিতেছিলেন); লিউবোচকাকে হঠাৎ একপ্রস্থ রূপোর কাঁটা-চামচ উপহার দিয়ে বসলেন, আর খাবার শেষে তার মনে পড়ল যে বাড়িতে একটা মিষ্টির বাক্স আছে, এবং সেটাও তিনি ওকেই দেবেন বলে মনস্থ করলেন।

'চাকরকে পাঠাবার দরকারটা কি?' তিনি আমাকে বললেন, 'তার থেকে বরং তুমিই যাও। জানই তো, বড় দেরাজটায় চাবিগুলো থাকে, তার থেকে সবচেয়ে বড় চাবিটা নিয়ে দ্বিতীয় দেরাজটা খুলবে। সেখানে দেখতে পাবে সেই বাক্সটা আর কাগজে মোড়া কিছুটা মিঠাই রয়েছে; ওর সবটাই এখানে নিয়ে এস।'

'তোমার চুরুটগুলোও নিয়ে আসব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম'; কারণ, জানতাম খাবার পর ওগুলো তাকে এনে দিতেই হয়।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আনবে; তবে অন্য কিছুতে হাত দিও না যেন।'

বাবা যেখানে বলেছিলেন ঠিক সেখানটায়ই চাবির গোছাটা পেয়ে গেলাম। সেটা নিয়ে যখন দেরাজটা খুলতে যাব, তখন হঠাৎ মনে ইচ্ছে হল জানার যে সেই চাবির গোছার সব থেকে ছোট চাবিটা কিসের?

দেরাজটা বিভিন্ন রকম জিনিসপত্রে ভর্তি ছিল; তার মধ্যে একটা ব্যাগ ছিল, তাতে ঝুলছিল একটা ছোট্ট তালা। হঠাৎ মনে হল, দেখাই যাক না, ছোট চাবিটা দিয়ে সেটা খোলা যায় কিনা! সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করলাম এবং সাফল্যলাভও হল হাতে হাতে। দেখলাম ব্যাগটার ভেতরে কাগজ ঠাসা। আমার মধ্যে এমন তীব্র ইচ্ছা জাগল যে দেখতে লাগলাম কাগজগুলোতে কি আছে।

গুরুজনের প্রতি আমার যে প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা ছিল, বিশেষতঃ বাবার প্রতি, তাতে মন কিছুতেই বাবার সম্পর্কে নতুন কোন ধারনা গড়তে রাজি হলনা। আমি অনুভব করলাম, বাবা তার নিজস্ব জগতেই অবস্থান করবেন,—সে জগতের সঙ্গে আমার কোন তুলনা করাই উচিত নয়—এবং তার জীবনের কোন গোপন ব্যাপার জেনে ফেলাটা হবে আমার পক্ষে একটা মহা অপরাধ।

ফলে, একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে তার ব্যাগ ঘেঁটে যা-কিছু দেখেছিলাম, তাতে কোন কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি, বরং নিজের মনে এই ভাবনাই বারবার জাগছিল যে কাজটা ঠিক হয়নি। এ কারণে মনে মনে বেশ লজ্জিত এবং অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

এই ভাবনাতেই চেষ্টা করলাম দ্রুত ব্যাগটাকে বন্ধ করে ফেলতে, কিন্তু সব-রকমের দুর্ভাগ্যই যেন সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ব্যাগটার তালাটার চাবি উলটো দিকে ঘুরিয়ে ভেবেছিলাম যে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং সে কারণে দ্রুত চাবিটাকে টেনে বের করতে গেলাম, কিন্তু আশ্চর্য, কেবলমাত্র মাথাটাই বেরিয়ে এল, গোড়ার দিকটা রয়ে গেল তালাটার মধ্যে। তারপর অনেকটা যাদুর মতই কাণ্ড ঘটাবার চেষ্টায় সেই অর্ধেকটাই আবার ঢুকিয়ে দিলাম তালার ভেতরে এই আশায় যে যদি ওটা আবার জোড়া লেগে যায়। কিন্তু তা হল না। ফলে হতাশা আর অপরাধবোধে মনটা ভরে গেল ; কারণ জানতাম, ব্যাপারটা সেদিনই আবিষ্কৃত হয়ে যাবে, যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবা এ ঘরে আসবেন।

মিমির নালিশ, বাজে নম্বর এবং ছোট্ট চাবিটা। এর থেকে খারাপ আর কি-ইবা হতে পারত। মিমির নালিশ শুনে দিদিমা, বাজে নম্বর দেখে সেণ্ট জেরোমি এবং চাবির হাল দেখে বাবা—এই তিনজনে একই সঙ্গে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগেই আমার ওপর লাফিয়ে পড়বেন।

পড়ার ঘরের নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে ভাবলাম, 'আমার কী হালটা হবে ? উঃ, এ কী করলাম ?' তারপর মিষ্টি আর চুরুট নিয়ে যাবার সময় নিজেকেই নিজে বললাম, 'ঠিক আছে, যা হবার হবে,' এবং এক দৌড়ে হাজির হলাম উৎসব-গৃহে।

ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণের কথা ছোটবেলা নিকোলাইয়ের কাছে শুনেছিলাম ; এটা আমার জীবনে সব বিপদের সময়ই অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও বেশ অভয় দিয়েছে। তাই যখন বড় ঘরটায় ফিরে এলাম তখন মানসিকভাবে কিছুটা উত্তেজিত এবং অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও বেশ উচ্ছ্বাসপূর্ণই রইলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।। বিশ্বাসঘাতিনী

খাওয়া-দাওয়ার পর খেলা শুরু হল, তাতে আমিও অংশ নিলাম। বেড়াল বেড়াল খেলার সময় কোরনাকোভদের শিক্ষয়িত্রী, যিনি আমাদের সঙ্গেই খেলছিলেন, তার জামাটা আমার পায়ের চাপে ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ গম্ভীর মুখে, সেটাকে সেলাই করে নেবার জন্য, তিনি পরিচারিকাদের ঘরে গেলেন ; কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, মেয়েরা, বিশেষতঃ সোনেচকা এতে বেশ খুশি হল ; ফলে তাদেরকে আবার এ ধরনের একটা আনন্দ দেবার ইচ্ছে জাগল আমার মনে। তাই, দিদিমণি খেলায় ফিরে এলে তাকে ঘিরে আমি পাক খেতে শুরু করলাম, এবং বেশ কিছুক্ষণ পাক খাওয়ার পর সুযোগ পাওয়া মাত্রই তার জামার সেই বিশেষ জায়গাটা পা

দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে সেটা আবার ছিঁড়ে গেল। এমন কাণ্ডে সোনেচকা এবং রাজকুমারীরা হেসে লুটোপুটি খেল, আর আমিও মনে মনে বেশ তৃপ্ত হলাম। কিন্তু সেন্ট জেরোমি দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন; এবার তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, যদি আমি এরপর নিজেকে সংযত না করি তবে উৎসবের দিন বলে তিনি আমাকে রেহাই দেবেন না।

তখন আমার মনের অবস্থা অনেকটা সেই পাকা জুয়াড়ীর মত, যে কিনা পকেটে যা আছে তার থেকে অনেক বেশি বাজি ধরে বসেছে, অথচ ভয় পাচ্ছে হিসেব করতে, আবার খেলেও যাচ্ছে উন্মাদের মত, একটা কপর্দকও ফেরৎ পাবার আশা নেই জেনেও। তাই মৃদু হেসে আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।

বেড়াল বেড়াল খেলা শেষ হতেই কে যেন ওদিকে লম্বা-নাক খেলাটা শুরু করে দিল। মুখোমুখি করে দু সারি চেয়ার পাতা হল; ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার দল যে-যার সঙ্গি-সঙ্গিনীকে বেছে নিয়ে বসে গেলেন।

সব থেকে ছোট রাজকুমারীটি প্রতিবারই ইভানদের ছোট ছেলেটিকে সঙ্গি হিসেবে বেছে নিতে লাগল; কাতেনকা বেছে নিল ভোলোদিয়া কিংবা ইলেনকাকে; আর সোনেচকা বাছল সেরিওঝাকে। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ না করেই সেরিওঝা প্রতিবারই তার সামনে গিয়ে বসতে লাগল। এবং সোনেচকাও এমন মিষ্টি ভঙ্গিতে হাসতে লাগল যে মনে হল সে যেন বোঝাতে চাইছে, সেরিওঝা ঠিক পথই বেছে নিয়েছে। একবারের জন্যও কেউ আমাকে গ্রহণ করলনা, ফলে আমার আত্মাভিমানে প্রচণ্ড ঘা লাগল, মনে হল আমি যেন অবাঞ্ছিত। প্রতিবারই তারা বলছিল, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত কে বাকি রইল? ওঃ নিকোলেনকা? ঠিক আছে, ওকে নিয়ে নাও।'

তারপর যখন ভাবতাম যে কে আমাকে পছন্দ করল—তখন সোজা চলে যেতাম হয় আমার বোনের কাছে, নয়ত সেই কুৎসিতদর্শণা রাজকুমারীদের কারও পাশে। আর এ ব্যাপারে দেখতাম কখনোই ভুল হত না। সোনেচকা সেরিওঝাকে নিয়ে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকছিল যে মনে হচ্ছিল তার কাছে যেন আমার কোন অস্তিত্বই নেই। মনে মনে কেন যে আমি তাকে 'বিশ্বাসঘাতিনী' বলেছিলাম তা জানিনা; কারণ সে তো কখনোই একথা বলেনি যে সেরিওঝার বদলে আমাকেই সে তার সঙ্গি করবে; কিন্তু তবু আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে সে আমার প্রতি একেবারে বিপরীত ব্যবহার করেছিল।

খেলার শেষে দেখলাম সেই 'বিশ্বাসঘাতিনী', যার ওপর থেকে পলকের জন্যও চোখ সরাতে পারিনি, সে ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে সেরিওঝা এবং কাতেনকার সঙ্গে কী যেন গুজগুজ ফুসফুস করছে। ওদের গোপন ব্যাপারটা আবিষ্কারের জন্য আমি পিয়ানোটার পেছনে গুটি-গুটি মেরে রইলাম। দেখলাম, কাতেনকা একটা রুমালের দুটো কোন ধরে সোনেচকা আর সেরিওঝায় মাথার ওপর একটা পর্দার মত তৈরি করেছে। সেরিওঝা বলল, 'তুমি গো হারান হেরেছ, সুতরাং তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে।' অপরাধীর মত মুখ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে হাত দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে সোনেচকা বলল, 'না, আমি হারিনি; বলনা ক্যাথারিন, হেরেছি?' কাতেনকা বলল, 'আমি সত্যি কথা বলতেই পছন্দ করি, তুমি হেরে গেছ সোনেচকা।'

কাভেনকা তার কথা শেষ করার সাথে সাথেই সেরিওঝা সোনেচকার দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাকে চুমু খেল। চুমুতে তার গোলাপী ঠোঁট দুটো ভরিয়ে দিল সে; এবং সোনেচকা তাতে এমনভাবে হেসে উঠল যে মনে হল সেটা যেন কোন ব্যাপারই নয় কিংবা হয়ত খুবই মজার ব্যাপার। সত্যি, কী বিশ্বাসঘাতিনী!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ রাহুগ্রাস

অকস্মাৎ সমগ্র মেয়ে জাতটার ওপরেই আমার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠল, বিশেষতঃ সোনেচকার ওপর তো বটেই। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম এই বলে যে এ খেলায় কোন আনন্দ নেই—এটা নিতান্ত মেয়েদেরই খেলা; তাই চেষ্টা করলাম এমন কিছু করতে যাতে সবাই অবাক হয়ে যায়। সে রকম একটা সুযোগ এসে যেতে খুব বেশি দেরিও হল না।

সেন্ট জেরোমি মিমির সাথে কথা বলার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ কানে এল, তারপর বুঝলাম তিনি আমাদের পড়ার ঘরের দিকেই আসছেন। আমি ভাবলাম, মিমি নিশ্চয়ই তাকে বলেছেন যে পড়ার সময় তিনি আমায় কোথায় দেখেছিলেন, এবং সে কারণেই তিনি আমাদের রেজিস্টার দেখবার জন্য গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া সেন্ট জেরোমির জীবনে যে অন্য কোন আকাঙ্খা থাকতে পারে সেটা আমি ভাবতেই পারলাম না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, যাদের বয়স বারো থেকে চোদ্দ বছরের ভেতর, অথাৎ সবে যারা কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে, তাদের মনে নাকি সে সময় আগুন লাগানো, এমনকি খুন করার ইচ্ছা পর্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। নিজের কৈশোরের কথা মনে পড়লে মনে হয়, বিশেষতঃ সেই অলক্ষণে দিনটায় আমার মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, কাউকে আঘাত দিতে না চাইলেও, শুধুমাত্র খেলাচ্ছলেই হয়ত মারাত্মক অপরাধ করে বসতে পারতাম। কখনও কখনও মানুষের সামনে ভবিষ্যত এমন ভয়ঙ্কর আকার নিয়ে হাজির হয় যে মানুষ তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পায়না; তখন বাধ্য হয়েই সে নিজেকে এই বলে বুঝ দেবার চেষ্টা করে যে তার ভবিষ্যত বলে কিছুই নেই, আর অতীত বলেও কিছুই ছিল না। এমন মুহূর্তে, সবদিক ভেবে চিন্তে ঠিক করার আগেই, হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে যায়; এবং সেক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিটাই একমাত্র কাজ করে। আমি বুঝতে পারি, নিজের অভিজ্ঞতার দরুন একটি বালক কিভাবে অমন একটা মানসিক পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকে। সে অবস্থায় যে বাড়িতে তার ভাইবোন, বাবা-মা—যাদেরকে সে প্রাণদিয়ে ভালবাসে, এবং যারা নির্দ্বিধায় শুয়ে আছে বিন্দুমাত্র সন্দেহগ্রস্ত না হয়ে, সেটাতেই সে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। ঠিক সেই একই বিচারবুদ্ধি-হীনতার জন্য সতের বছরের একটি ছেলে তার কুড়ুলের ধার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কাঠের বেঞ্চির পরিবর্তে বেঞ্চির একপাশে শায়িত বৃদ্ধ পিতার গলাটাকেও ব্যবহার করতে পারে, আর নির্বোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারে ফুটন্ত ফোয়ারার মত রক্তধারার দিকে। আবার সেই একই ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে কোন উঁচু টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ হয়ত একথা ভেবে রোমাঞ্চ অনুভব করে যে, 'যদি এখান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ি তাহলে কেমন হয়?' কিংবা গুলিভর্তি পিস্তল মাথায় ঠেকিয়ে হয়ত ভাবে, 'যদি এটার টিগারে চাপ দিই তবে কি হবে?' অথবা, সমাজের কোন গণ্যমান্য লোককে দেখে হয়ত তার মনে ইচ্ছে জাগে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার

নাকটা টেনে ধরে বলে, 'চল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

এই ধরনের মানসিক ও বোধশক্তিহীন অবস্থায় সেন্ট জেরোমি যখন নিচে এসে আমাকে বললেন যে, সেই সন্ধ্যার উৎসবে থাকার কোন অধিকার আমার নেই, কেননা আমি অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছি, এবং পড়াশুনোও করিনি, সুতরাং আমাকে তৎক্ষণাৎ ওপরে যেতে হবে, তখন আমি জিভ বের করে তাকে ভেংচে বললাম যে আমি যেখানে আছি সেখান থেকে এক পা-ও নড়ব না।

বিস্ময় এবং রাগে সেন্ট জেরোমি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'এতদিনে আমি তোমাকে সিধে করে ফেলতাম বদমাশ, শুধুমাত্র দিদিমার জন্যই বেঁচে গেছ। এখন দেখছি লাঠি ছাড়া তোমার অন্য কোন দাওয়াই নেই, আর আজই সেটার প্রয়োজন।'

তিনি এত জোরে কথাগুলো বললেন যে সবাই তা শুনতে পেল। আমি অনুভব করলাম, আমার বুকে রক্ত টগবগ করে ফুটছে; উত্তেজনায় মুখের রঙ পালটে গেল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। সেই মুহূর্তে নিশ্চয় আমাকে খুব ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। সেন্ট জেরোমি, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে, দ্রুত এগিয়ে এসে হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরলেন; মুহূর্তের মধ্যে আমি এক ঝটকায় তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করলাম।

আমার এমন অদ্ভুত ব্যবহারে, সাংঘাতিক অবাক হয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ভোলোদিয়া, 'কী হল তোর?'

চোখ বেয়ে তখন দরদর করে জল পড়ছে; সে অবস্থায় চিৎকার করে উঠলাম, 'আমার কাছ থেকে সরে যাও বলে দিচ্ছি; তোমরা কেউ আমায় ভালবাস না, কেউ বুঝতে চাও না আমার দুঃখ। তোমরা সবাই বদমাশ, শয়তান কোথাকার।'

ইতিমধ্যে সেন্ট জেরোমি বিবর্ণ মুখে এগিয়ে এসে খপ করে আমার হাত দুটো ধরে ফেলে সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। রাগে আমার মাথাটা তখন দুলছে। শুধু মনে আছে মাথা আর হাতের কনুইয়ের সবটুকু জোর দিয়ে আমি তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলাম। মনে পড়ছে, বারবার আমার নাকটা কারও কোমরে ঘষা খাচ্ছিল, কারও কোটের আগাটা মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল হঠাৎ হঠাৎ, আর কারও ধুলোভর্তি পা-টা চারপাশে ঘোরপাক খাচ্ছিল অবিরত—এবং সেটা ছিল সেন্ট জেরোমির-ই।

মিনিট পাঁচেক পর আমার পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরই শোনা গেল বাজখাঁই গলার আওয়াজ, 'ভাসিলি, বেতটা নিয়ে এস।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ উদ্ভট কল্পনা

সেদিন কি স্বপ্নেও একথা ভাবতে পেরেছিলাম যে অমন সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবার পরও আমি বেঁচে থাকব এবং একদিন সেই ঘটনাগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে সক্ষম হব?

যখন বুঝলাম যে কী করেছি, তখন আর ভাবতেও পারলাম না যে আমার জন্য কী দুর্গতি অপেক্ষা করে আছে—শুধু মনে হল ভয়ঙ্কর সর্বনাশের সময় খুবই নিকটবর্তী।

প্রথমে আমার চারপাশে এবং নিচতলায় সীমাহীন এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল—অন্ততঃ আমার সে রকমই মনে হচ্ছিল; কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলো বিভিন্ন

রকম শব্দে পরিণত হল। ভাসিলি ওপরে এসে জানলা গলিয়ে ঝাঁটার মত দেখতে কি যেন একটা ভেতরে ফেলে দিল, তারপর বেশ জোরে একটা হাই তুলে বাইরে রাখা কাঠের বাক্সটার ওপরে শুয়ে পড়ল। নিচের তলায় সেণ্ট জেরোমির গলা শোনা যাচ্ছিল (সম্ভবতঃ তিনি আমার সম্পর্কেই বলছিলেন), তারপর শোনা গেল বাচ্চাদের আওয়াজ, তারপর হাসি এবং দৌড়াদৌড়ির শব্দ, অবশেষে সবকিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। মনে হল, আমি যে অন্ধকার চিল-কুঠুরিটায় পড়ে রয়েছি সে কথা যেন সবাই ভুলেই গেছে।

আমি মোটেই কাঁদলাম না, কিন্তু মনে হল আমার বুকের ওপর পাথরের মত কী যেন একটা চেপে বসেছে। খণ্ডিত চিন্তা আর স্বপ্নগুলো মনের মধ্যে উঁকি দিয়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। থেকে থেকেই ভেঙ্গে পড়ছিলাম সেই ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের কথা ভেবে—কি জানি, আজ কী সীমাহীন দুর্ভাগ্যই না অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

এরপর মনে হল, আমাকে লোকে সহ্য করতে পারে না, এবং মনে মনে ঘৃণা করে—এর পেছনে নিশ্চয় কোন না কোন কারণ রয়েছেই (সেই মুহূর্তে আমার মনে স্থিরভাবে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে দিদিমা থেকে কোচোয়ান পর্যন্ত সবাই আমাকে ঘৃণা করে এবং আমার হেনস্তাতে সকলেই খুশি হয়)। ভাবলাম, আমি আমার বাবা মার সন্তান নয়, ভোলোদিয়ারও ভাই নই—এবং সম্ভবতঃ একজন অনাথ, যাকে কিনা অনুগ্রহ করে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আর এই অবাস্তব কল্পনাই আমার মনে স্বস্তির ভাব এনে দিল; এটাই তখন নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হল আমার কাছে। এ ভেবে আনন্দ পেলাম যে আমার নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমি বিন্দুমাত্রও দায়ী নই—যত দায় সবই আমার ভাগ্যের; আর সে ভাগ্যটা হচ্ছে অনেকটা কার্ল ইভানিচের ভাগ্যের মতই।

নিজেই নিজেকে বললাম, 'এটা যখন আজ বুঝতেই পেরেছি, তখন আর এটাকে লুকিয়ে রেখে লাভ কি? কালই বাবার কাছে গিয়ে বলব, "বাবা, তুমি আমার কাছ থেকে আমার জন্ম-রহস্যের ব্যাপারটা যেভাবে লুকিয়ে রেখেছিলে, সেটা আমি জেনেই গেছি।" আর তৎক্ষণাৎ তিনি বলবেন, "ও, তাহলে তুমি তা জেনেই গেছ—অবশ্য আজ হোক, কাল হোক, একদিন না একদিন এটা জানতে পারতেই। এটা ঠিক, তুমি আমার ছেলে নও, তবে তোমায় আমি পুষ্যি নিয়েছি—এবং যতদিন তুমি আমার ভালবাসার যোগ্য থাকবে ততদিন আমি তোমায় কিছুতেই ত্যাগ করব না।" তখন আমি তাকে বলব, "বাবা, যদিও তোমায় এনামে ডাকার কোন অধিকারই আমার নেই, তবু আজ শেষবারের মত ডেকেই বলছি, চিরদিন আমি তোমায় ভালবেসে এসেছি, চিরকাল ভালবাসব, এবং কোনদিনই তোমার দয়ার কথা ভুলব না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আর মুহূর্তের জন্যও তোমার বাড়িতে আমি থাকব না।" এখানে কেউ-ই আমায় ভালবাসে না; আর সেণ্ট জেরোমি তো আমায় শেষ না করে ছাড়বেনই না; সুতরাং হয় তিনি, নয়ত আমি—এ দুজনের একজনকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবেই। আমি ও লোকটাকে এত বেশি ঘৃণা করি যে ওকে খুন করতে পর্যন্ত আমার হাত এতটুকু কাঁপবে না।" আমি বাবাকে বলব, "বাবা, আমি ওকে খুন করব।" সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন, এবং আমি তখন তার হাত সরিয়ে দিবে বলব, "না, তা

হয় না; আমরা দুজনে একসঙ্গে কিছুতেই এক জায়গায় থাকতে পারব না; আমায় তুমি যেতে দাও।" তারপর দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফরাসীতে বলব, "বাবা, আমার জীবনদাতা, আমাকে শেষবারের মত আশীর্বাদ কর; এরপর ভগবানই আমায় দেখবেন।" সেই অন্ধকার চিলেকুঠুরিতে বসে এ ধরনের চিন্তায় হৃদয় শোকাকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল; তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সেই ভয়ার্ত শাস্তির কথা। ফলে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে স্বপ্ন অন্তর্হিত হল।

এরপর মনে হল, আমি যেন মুক্ত হয়ে গেছি—বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি অনেক দূরে। অশ্বারোহী বাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছি; শত্রুদল চরপাশ দিয়ে আমায় ঘিরে ধরেছে; আমি তরবারি বের করে একের পর এক তিনটে শত্রুকে হত্যা করলাম। শেষপর্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত অবসন্ন শরীরে মাটিতে লুটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'জয়, জয় আমাদের।' তখন সৈন্যাধ্যক্ষ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'যার জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেলাম, সে কোথায়?' তারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিল; তিনি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করে আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুপূর্ণ স্বরে বলে উঠলেন, 'জয়, জয় আমাদের।' আমি কিছুটা সেরে উঠে, কালো কাপড়ে হাতটা জড়িয়ে তাভরস্কি বুলেভার্ডে পায়চারি করা শুরু করলাম। এখন আমি নিজেই একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই আহত যুবকটি কে?' তাকে বলা হল যে এ হচ্ছে সেই প্রখ্যাত বীর নিকোলাই। সম্রাট আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কি চাও বল, তাই দেব।' তরবারির ওপর ভর দিয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'মহামান্য সম্রাট, নিজের পিতৃভূমির জন্য রক্ত ঝরাতে পেরেই আমি আনন্দিত; যদি দেশের জন্য আমি জীবন দিতে পারি তাতে আরও খুশি হব; তবু আপনার মহত্ব যখন এতই, তখন অনুগ্রহ করে আমায় অনুমতি দিন, আমার শত্রু, বিদেশী সেন্ট জেরোমিকে আমি হত্যা করব।' তারপর সেন্ট জেরোমির সামনে গিয়ে বললাম, 'আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছ, এবার হাটু গেড়ে বস।' কিন্তু হঠাৎ মনে হল, আসল সেন্ট জেরোমি বেত হাতে যে-কোন মুহূর্তে এসে উপস্থিত হতে পারেন। ফলে আমি আর সেই কল্পনার সৈন্যাধ্যক্ষ রইলাম না, মুহূর্তের মধ্যে একজন ক্রন্দনরত হতভাগায় পরিণত হলাম।

এরপর ঈশ্বরের চিন্তা মনে এল এবং বেশ মরিয়া হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি আমায় এমন শাস্তি দিচ্ছেন? 'আমি তো কোনদিনই সকাল কিংবা সন্ধ্যায় প্রার্থনা জানাতে ভুলিনি, তবে কেন এভাবে কষ্ট পাচ্ছি?' নিঃসন্দেহে আজ একথা বলতে পারি, আমার সারাটা কৈশোর জুড়ে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল তার সূত্রপাত কিন্তু ঐ বিশেষ দিনটিতেই। আর এর কারণ এই নয় যে দুঃখ আমার মনকে অবিশ্বাসী করে তুলেছিল, বরং আসল কারণটা ছিল এই যে ভগবান আমার প্রতি নিদারুণ একটা অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন, এবং সেই বিশ্বাসটাই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে থাকে—যেমন বর্ধিত হয় সদ্যভেজা উর্বর মাটিতে পড়া বীজ। এরপর মনে হল, আমি যেন মরে যাচ্ছি। কল্পনায় দেখলাম আমার জায়গায় একটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, আর সেন্ট জেরোমি তা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ন্যাতালিয়ার বলা সেই কাহিনীটা,

অর্থাৎ মৃতের আত্মা চল্লিশ দিন ধরে নিজের বাড়িতেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়, মনে হতেই কল্পনায় দেখলাম, আমার আত্মা অদৃশ্য হয়ে দিদিমার বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে ঘোরাফেরা করছে; চেয়ে চেয়ে দেখছি লিউবোচকার অকৃত্রিম চোখে জল, দিদিমার শোক আর সেন্ট জেরোমির সঙ্গে বাবার কথাবার্তা। অশ্রুপূর্ণ চোখে বাবা বলছেন, 'ও সত্যিই খুব ভাল ছেলে ছিল।' উত্তরে সেন্ট জেরোমি বলছেন, 'হ্যাঁ, তবে পাজির শিরোমণি!' বাবা বললেন, 'মৃতের সম্পর্কে সম্মান দিয়ে কথা বলুন; আপনার জন্যই সে মারা গেছে; তাকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। তা ওর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়। আপনি এখান থেকে চলে যান, শয়তান কোথাকার!'

এখন সেন্ট জেরোমি নতজানু হয়ে কান্নাকাটি করে বাবার কাছে ক্ষমা চাইছেন। চল্লিশদিন অতিক্রান্ত হলে আমার আত্মা স্বর্গের পথে যাত্রা শুরু করল; সেখানে দেখলাম অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, শুভ্র এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি, এবং বুঝলাম ইনিই আমার সেই মা। সেই শুভ্র ছায়াটা চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরে আদর করতে লাগল; কিন্তু তাকে ঠিক মত চিনে উঠতে না পারায় মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ হল। তাকে বললাম, 'যদি তুমি সত্যিই আমার মা হও, তবে আরও স্পষ্টভাবে আবির্ভূত হও; আমি তোমায় দেখতে চাই, তোমায় আদর করতে চাই।' সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'এখানে আমরা সবাই সমান। এর থেকে ভালভাবে আমি তোকে আদর করতে পারব না। তুই কি এতে আনন্দিত নস?' 'হ্যাঁ, আনন্দিত। কিন্তু তুমি তো আমায় সুড়সুড়ি দিতে পারছনা, তাছাড়া আমিও তো তোমার হাতে চুমু খেতে পারছি না।' তিনি বললেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না, এখানে এমনিতেই তো সবকিছু সুন্দর।' এবং আমিও অনুভব করলাম, কথাটা সত্যি; আর উড়ে যেতে লাগলাম ওপরে, আরও ওপরে। তারপর হঠাৎ কল্পনা ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল; আমি নিজেকে আবার সেই অন্ধকার চিলেকোঠার মধ্যে আবিষ্কার করলাম। তখন আমার দু চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা আর উদ্‌ভ্রান্তের মত আবৃত্তি করে চলেছি সেই একই কথা, 'আমরা উড়ে চলেছি উঁচুতে, আরও উঁচুতে।' একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে, কিন্তু অসীম শূন্যতা, দুঃখব্যঞ্জক অনুভূতি আর দুরতিগম্য অন্ধকার ছাড়া অন্য কিছু চোখেই পড়ল না। হঠাৎ বাস্তববোধ জেগে ওঠাতে যে স্বপ্নের তার ছিঁড়ে গেল তাকে আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করলাম যে সে পথে এগোন আর মোটেই সম্ভব নয়; এবং তার থেকেও বেশি বিস্মিত হলাম যখন বুঝলাম যে সেই স্বপ্ন আমাকে আর আগের মত অনাবিল আনন্দদানে সক্ষম হচ্ছে না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।। ধান না ভানলে খাওয়া নেই

সারাটা রাত আমি চিলে-কুঠুরিতে কাটালাম, একজনও আমার কাছে এল না; পরদিন, অর্থাৎ রবিবার পড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় নিয়ে গিয়ে আমায় আবার বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি আশা করতে শুরু করলাম, এই বন্দীত্বেই সম্ভবতঃ আমার শাস্তির অবসান হবে। রাতের নিটোল ঘুমে শরীর মন দুই-ই বেশ চাঙ্গা লাগছিল; তারপর জানলার জাফরির ভেতর থেকে সূর্যের আলোর আনাগোনায় এবং দিনের শুরুতে পথঘাটের স্বাভাবিক সাড়াশব্দে মেজাজটা বেশ

খুশি খুশি লাগল। তবু, ঘরের ভেতরকার একাকীত্ব মনে হল অসহ্য। ইচ্ছে হল, জোরে জোরে পায়চারি করে কাউকে জানিয়ে দেই আমার মধ্যে কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু কোন জীবিত প্রাণীর সাড়াশব্দ পেলাম না আশেপাশে। তার ওপর আরও বেশি অসহ্য লাগতে লাগল এইজন্য যে সেন্ট জেরোমি নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে বারবার শিস্ দিচ্ছিলেন, আর তা আমার কানে অসহ্য লাগা সত্ত্বেও আমি শুনতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে শিস্ দিতে তার মোটেই ভাল লাগছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যই তিনি শিস্ দিচ্ছিলেন।

ঠিক দুটোর সময় সেন্ট জেরোমি ও ভোলোদিয়া নিচে নেমে গেল, আর নিকোলাই আমার জন্য খাবার বয়ে নিয়ে এল এবং যখন আমি তাকে বললাম যে আমি কি করেছি আর আমার ভাগ্যে কি দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে তখন সে বলল, 'দুঃখ কোরো না খোকাবাবু, ধান না ভানলে তুমি খাবার পাবে না।'

এই প্রবাদ, যা পরবর্তী জীবনে অনেকবার আমার চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, সেদিন সেটাই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল; কিন্তু সেই বিশেষ ঘটনাটা অর্থাৎ শুধু রুটি আর জল নয়, কেক সহ পূর্ণ ভোজের আয়োজন— আমাকে ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশেষ করে ভাবতে বাধ্য করেছিল। যদি তারা খাবারের সঙ্গে কেক না পাঠাত, তাহলে আমি একথা ভাবতে পারতাম যে শুধুমাত্র আটক রেখেই ওরা আমাকে শাস্তি দিতে চাইছে, কিন্তু কেক পাঠানোতে মনে হল, যে শাস্তির ব্যাপারটা এখনও পাওনাই রয়ে গেছে, আসলে এভাবে আটকে রাখার কারণ হচ্ছে অন্য সবার থেকে আমাকে আলাদা করে রাখা, যাতে আমার খারাপ স্বভাবের প্রভাব অন্য কারও ওপর না পড়ে। এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের কথা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ বন্দীশালার দরজার তালার চাবিটা একপাক ঘুরে গেল এবং বেশ গম্ভীর মুখে সেন্ট জেরোমি ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেন।

আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি বললেন, 'নিচে চল, দিদিমাকে দেখবে।'

ঘর থেকে বের হবার আগে, জামার হাতার ভেতরে জমে থাকা চকের গুড়োগুলো আমি ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম, কিন্তু সেন্ট জেরোমি তাতে বাধা দিয়ে বললেন, ওর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমার যে বিরাট নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তাতে আর বাহ্যিক সাজসজ্জায় কিছু এসে যাবে না।

প্রতি সোমবার আমাদের বাড়ির সামনা দিয়ে বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দিকে যে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমরা তাকিয়ে থাকতাম, আমাকে সেন্ট জেরোমি যখন হাত ধরে হল ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কাতেনকা, লিউবোচকা আর ভোলোদিয়াও তখন আমার দিকে ঠিক তেমনি দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইল। এবং দিদিমার হাতে চুমু খাবার জন্য যখনই তার চেয়ারের কাছে আমি হাজির হলাম অমনি তিনি তার হাতটা ওরনার তলায় ঢেকে নিলেন।

তারপর নীরবে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমন এক অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন যে আমি বুঝেই উঠতে পারলাম না কোনদিকে তাকাব আর হাত দুটোই বা লুকোব কোথায়। অবশেষে বেশ টেনে টেনে বললেন, 'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি আমার ভালবাসার যথার্থই প্রতিদান দিচ্ছ। আমার অনুরোধে মঁসিয়ে সেন্ট জেরোমি তোমাদের পড়াশুনোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আর এক মুহূর্তও এ বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। এবং তা কিসের

জন্য ? না, তোমার জন্য। আমি ভেবেছিলাম, ওনার এই খাটুনির জন্য তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে,' একটু থেমে দিদিমা এমন এক ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন যে মনে হল বক্তৃতাটা তিনি আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছিলেন, 'এবং তার খাটুনির যথার্থ মর্যাদা দেবে, কিন্তু তার পরিবর্তে, তোমার মত একটা পুঁচকে ছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত তার গায় হাত তুললে! এ দুঃসাহস তোমার হল কি করে! আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভাল ব্যবহারের মর্ম তুমি বোঝ না, এবং তা বোঝার ক্ষমতাও তোমার নেই। এই মুহূর্তে ওনার কাছে ক্ষমা চাও।' সেন্ট জেরোমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বেশ কঠিন স্বরে তিনি বললেন, 'কি কথাটা কানে গেল ?'

দিদিমার হাতের নির্দেশিকা লক্ষ্য করতেই সেন্ট জেরোমির কোটটা নজরে এল ; সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, এবং নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়লাম না ; পুনরায় অনুভব করতে শুরু করলাম যে আমার বুকের ভেতরটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

'কি হল, যা বলছি শুনতে পাচ্ছ না ?'

সারাটা শরীর কেঁপে ওঠা সত্ত্বেও আমি এক পা-ও নড়লাম না।

'কোকো!' সম্ভবতঃ তিনি আমার মনের বেদনা উপলব্ধি করতে পারছিলেন, তাই আদেশের ভঙ্গির বদলে বেশ কোমল সুরে বললেন, 'কোকো, তুমি তো এমনটি ছিলে না!'

আমি বললাম, 'দিদিমা, আমি কিছুতেই ওনার কাছে ক্ষমা চাইব না।' তারপর হঠাৎ থেমে গেলাম এ ভেবে যে আর যদি একটা শব্দও উচ্চারণ করি, তাহলেই বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা বেদনা চোখের হয়ে অশ্রু বন্যার বেগে নেমে আসবে।

'আমি তোমাকে আদেশ করছি, আমি বলছি, এখনই।'

'আমি…আমি…করবনা,…পারবনা' কথা বলতে বলতে হেঁচকি তুললাম, এবং এতক্ষণ ধরে যে অশ্রুকে বেঁধে রেখেছিলাম, তা বন্যার বেগে দু চোখ বেয়ে নেমে এল।

সেন্ট জেরোমি তখন করুণ সুরে ফরাসীতে বলে উঠলেন, 'এভাবে তোমার মায়ের মাকে অমান্য করাটা উচিত হচ্ছে কি ? এই কি ওনার স্নেহের প্রতিদান ?'

আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে দিদিমা বললেন, 'হে ভগবান, আজ যদি সে এ দৃশ্য দেখত! যদি সে থাকত—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই—না, কিছুতেই সে এ দুঃখ সহ্য করতে পারত না।'

দিদিমার কান্না ক্রমাগতই বেড়ে চলল। আমিও কাঁদছিলাম, তবে কিছুতেই ক্ষমা চাইব না—সে ব্যাপারে স্থির রইলাম।

সেন্ট জেরোমি বললেন, 'অনুগ্রহ করে শান্ত হোন।'

দিদিমা কিন্তু তার কথায় কোন কানই দিলেন না ; হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফোঁপানিটা হেঁচকির টানে পর্যবসিত হল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মিমি আর গাশা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল এবং তার নাকের কাছে ওষুধ ধরল। মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়িতে দৌড়োদৌড়ি পড়ে গেল।

আমাকে ওপর তলায় নিয়ে যেতে যেতে সেন্ট জেরোমি বললেন, 'হ্যাঁ, গর্ব করার মত একটা কাজ করলে বটে।'

'হে ভগবান, এ আমি কি করলাম! কী শয়তান ছেলে আমি!'

আমাকে আমার ঘরে যেতে বলে সেণ্ট জেরোমি দিদিমার কাছে ফিরে যেতেই, কি করছি এ কথা চিন্তা না করেই রাস্তার দিকের সিঁড়িটা ধরে দৌড় দিলাম।

এখন আর মনেই নেই, সেদিন কি ভেবে দৌড় দিয়েছিলাম—পালিয়ে যাব বলে, নাকি জলে ডুবে মরবার জন্য; তবে এটুকু মনে আছে, যাতে কাউকে দেখতে না পাই সেই উদ্দেশ্যে দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামছিলাম।

হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ? তোমাকেই তো এতক্ষণ খুঁজছিলাম।'

একপাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বাবা খপ্ করে আমার হাতটা ধরে টানতে টানতে ছোট বসার ঘরটায় নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আমার সাথে চল; কোন সাহসে তুমি আমার ব্যাগে হাত দিয়েছ?' তারপর কান ধরে জানতে চাইলেন, 'কি হল, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

আমি বললাম, 'আমি দুঃখিত; তখন মাথায় কি যে চেপেছিল জানি না।'

'তোমার মাথায় কি চেপেছিল তুমি তা জান না? তাহলে জানই না, তাই না? জান না, অ্যাঁ? সত্যিই জান না?' প্রতিটি কথা বলার সময় তিনি আমার কানটা একবার করে মলে দিচ্ছিলেন। 'ভবিষ্যতে আর কখনও যাতে কাজ নেই তাতে নাক গলাতে যাবে? বল, যাবে? যাবে?'

আমার কানে প্রচণ্ড ব্যথা লাগছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একবারও কাঁদিনি; বরং সেটা যেন আমার মনে বেশ কোমল প্রলেপের কাজ করছিল। বাবা আমার কানটা ছেড়ে দেবার সাথে সাথেই আমি তার হাতটা ধরে চোখের জল আর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'আমায় আবার মারো। মেরে ফেল; আমি একটা পাজি, নচ্ছার, হতচ্ছাড়া ছেলে।'

'একি, কি হল তোর: সামান্য ঠেলা দিয়ে বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

তার কোটের কোণা ধরে ঝুলে পড়ে বললাম, 'না, আমি যাব না। আমি জানি, এখানে সবাই আমাকে ঘৃণা করে। ভগবানের দিব্যি, আমার কথা শোন, আমাকে বাঁচাও, না হলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি ওনার সঙ্গে থাকতে পারব না; উনি সব সময় চেষ্টা করেন আমাকে অপদস্থ করতে। ওনার সামনে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে রাখেন; পিটিয়ে লাস করতে চান। এসব আর কিছুতেই সহ্য করব না; আমি আর এখন ছোট্ট ছেলেটি নই। আর সইতে পারছি না—আমি মরে যাব; আমি আত্মহত্যা করব। উনি দিদিমাকে বলেছেন যে আমি নেহাতই একটা বাজে ছেলে; তাই দিদিমা এখন অসুস্থ; এবং আমার জন্যই তিনি মারা যাবেন। আমি···ভগবানের দিব্যি, আমায় মারো! কেন ওরা সবাই মিলে আমার ওপর অত্যাচার করবে?'

কান্নায় আমার গলা ভেঙ্গে এল। আমি চৌকিটার ওপর বসে পড়ে বাবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম যে মনে হল হয়ত সেই মুহূর্তেই মারা যাব।

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশ স্নেহার্দ্র গলায় বাবা বললেন, 'কি হয়েছে তোর, অমন কাঁদছিস কেন?'

'উনি একটা যমদূত। আমি মরে যাব ; কেউ আমায় ভালবাসে না।' আর কথা বলতে পারছিলাম না, শেষে খিঁচুনি শুরু হল।

বাবা আমাকে দু হাত দিয়ে তুলে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম তখন দেখি বেশ রাত হয়েছে। আমার বিছানার পাশে একটা ছোট মোমবাতি জ্বলছে, আর ডাক্তার বাবু, মিমি ও লিউবোচকা ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে। তাদের মুখ দেখে বুঝলাম, আমার স্বাস্থ্যের জন্য তারা সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন ; কিন্তু বারো ঘন্টা একটানা ঘুমের পর শরীরটা এত হালকা লাগছিল যে তৎক্ষণাৎ এক লাফে উঠে পড়তে পারতাম ; কিন্তু উঠলাম না, কারণ, আমি যে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি—ওদের এই ধারণাটাকে ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছে হল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ ঘৃণা

হ্যাঁ, এটা ছিল সত্যিকারের ঘৃণা। উপন্যাস কিংবা নাটকে যে ধরনের ঘৃণার কথা লেখা হয়ে থাকে, যে ঘৃণা মানুষকে অসততার পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে সে ধরনের কোন ঘৃণায় আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু যার চুল, গ্রীবা, চলার ভঙ্গি, গলার স্বর, প্রতিটি ব্যঞ্জনা মনের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, অথচ তাকেই আবার না দেখেও থাকা যায় না, সেন্ট জেরোমির প্রতি তেমনি এক আশ্চর্য ঘৃণার মনোভাব জেগে উঠেছিল আমার মনে।

প্রায় দেড় বছর তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আজ যখন ঠাণ্ডা মাথায় তার কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় তার মত ভদ্রলোক সত্যিই দুর্লভ ; মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের ফরাসী। তার মধ্যে কোন রকমের নিবুর্দ্ধিতা ছিল না ; আর শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল যথেষ্ট ; এবং আমাদের প্রতি সর্বদা তিনি বিশেষ যত্ন সহকারেই নজর রাখতেন ; তবু বলতে হয় স্বজাতীয় সব গুণাবলীই তার মধ্যে পুরো মাত্রায় ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলো ছিল আমাদের, অর্থাৎ রুশীয়দের একেবারে বিপরীত। যেমন, ভুয়ো আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা, স্পর্ধিত ভঙ্গি, নিজের প্রতি বিশ্বাসের আতিশয্য ইত্যাদি ইত্যাদি ; আর এ গুলোই আমাকে তার ওপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল।

যদিও দিদিমা তাকে ছেলেমেয়ের বেত মারার ব্যাপারে নিজের মতামত জানিয়ে দেবার ফলেই তিনি আমাদের বেত মারতে পারতেন না, তবে প্রায়ই বেত হাতে নিয়ে আমাদের, বিশেষতঃ আমাকে ভয় দেখাতেন এই বলে যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বেত মারবেন। আর এ কথাটা এমনভাবে বলতেন যে মনে হত যেন আমাকে বেত মারতে পারলেই ওনার স্বর্গবাস নিশ্চিত হয়ে যাবে।

শাস্তির যন্ত্রণা সম্পর্কে আমার মনে কখনও এতটুকু ভয় জন্মায়নি, তাছাড়া তেমন অভিজ্ঞতাও হয়নি কোনদিন ; কিন্তু তবু তিনি যে আমায় মারতে পারেন এ কথাটা মনে হলেই চাপা রাগ আর হতাশায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়তাম।

কার্ল ইভানিচও কখনও কখনও রুলকাঠ কিংবা বেত দিয়ে আমাদের মারবার ভয় দেখাতেন, কিন্তু সে কথা মনে পড়াতে তো কোনদিনও এতটুকু রাগ হয়নি! এমনকি যে সময়ের কথা বলছি (তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর), তখনও যদি তিনি আমাকে মারতেন তবু আমি তা মুখ বুজেই সহ্য করতাম। কারণ, জ্ঞান হওয়া অবধি তাকে দেখেছি, এবং তাকে আমি আমাদের পরিবারের একজন বলেই মনে করতাম। কিন্তু সেন্ট জেরোমি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্ধিত এবং আত্মম্ভরি চরিত্রের

মানুষ; ফলে গুরুজন হিসেবে বাইরে যতটুকু শ্রদ্ধা না দেখালে নয়, তাকে ঠিক ততটাই শ্রদ্ধা দেখাতাম, কিন্তু তার জন্য হৃদয়ে কোনরকম টান অনুভব করতাম না। কার্ল ইভানিচ ছিলেন বিচিত্র চরিত্রের বৃদ্ধ—অনেকটা পুরনো চাকরের মত; ফলে তাকে মনে প্রাণে ভালবাসলেও আমার মত শিশুর চোখেও তিনি ছিলেন নিতান্তই নিচু সামাজিক মর্যাদার লোক।

এদিক থেকে সেন্ট জেরোমি ছিলেন একেবারে উলটো; তিনি দেখতে যেমন, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও ছিলেন তেমনি; সব সময় চেষ্টা করতেন মাথা উঁচিয়ে সবার সাথে পা মিলিয়ে চলতে।

কার্ল ইভানিচ আমাদের বকাঝকা কিংবা শাস্তি দেওয়া—সবকিছুই করতেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। তিনি মনে করতেন, ওটা একটা প্রয়োজনীয় বিষয়, তবে বেশ বেদনাদায়ক কর্তব্যও বটে। কিন্তু সেন্ট জেরোমি সর্বদাই চেষ্টা করতেন আমাদের ওপর কর্তৃত্ব জাহির করার। তিনি যখনই আমাদের শাস্তি দিতেন তখনই সেটা করতেন নিজের খুশির জন্য; আমাদের শুধরোবার উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। নিজের মহত্বে যেন নিজেই মশগুল হয়ে থাকতেন। কঠিন কঠিন ফরাসী শব্দের শেষটা বেশ বিচিত্র ভঙ্গিতে জোর দিয়ে উচ্চারণ করতেন এমনভাবে যে শুনে আমার গা জ্বলে যেত। কার্ল ইভানিচ যখন রেগে যেতেন তখন তিনি বড়জোর হয়ত বলতেন, 'সাক্ষীগোপাল, ডাকাতে ছেলে, মাকাল ফল' ইত্যাদি; কিন্তু সেন্ট জেরোমি রেগে গেলে বলতেন, 'পাজির পা ঝাড়া, হাড়-বজ্জাত, হতচ্ছাড়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা শুনে আমার নিজেকে বড় অপমানিত বোধ হত।

কার্ল ইভানিচ আমাদের দেওয়ালমুখো করে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখতেন; এবং তার শাস্তির উদ্দেশ্যই ছিল শারীরিক কিছুটা কষ্ট দেওয়া। কিন্তু সেন্ট জেরোমি বুকটাকে সোজা করে রাজকীয় ঢঙে হাতটাকে তুলে বেশ জোরে জোরে বলতেন, 'একটা নচ্ছার, পাজি কোথাকার।' আর আমাদের বাধ্য করতেন তার সামনে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপমান করাটাই ছিল আসল শাস্তি।

সে ব্যাপারে আমাকে আর কোন শাস্তি পেতে হয়নি, এবং কেউ সে-সম্পর্কে আর একটা কথাও তোলেনি—তবু আজও আমি ভুলতে পারিনি সেই ভয়াবহ দিন দুটোর কথা—যে দুটো দিন হতাশা, লজ্জা, ভয় আর ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেদিন থেকে সেন্ট জেরোমি আমার সম্বন্ধে সব আশাই ত্যাগ করেছিলেন, এবং আমাকে নিয়ে আর কোন রকম মাথাই ঘামাতেন না, তবু আমি তার সঙ্গে ব্যবহারে কিছুতেই নির্লিপ্ত হতে পারলাম না। যখনই আমাদের দুজনের চোখাচোখি হত তখনই আমার চোখে শত্রুতার দৃষ্টি এসে যেত, আর আমি চেষ্টা করতাম উদাস হতে. কিন্তু সাথে সাথেই বুঝতে পারতাম আমার এই উদাসীনতার ভান তার চোখে ধরা পড়ে গেছে—ফলে লজ্জায় লাল হয়ে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিতাম তাড়াতাড়ি।

এক কথায়, তার সংস্পর্শে আসতে মনে মনে আমি এত বেশি কুণ্ঠিত হতাম যে সে কথা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ পরিচারিকার ঘর

ক্রমাগত সাংঘাতিক একাকীত্ব অনুভব করতে লাগলাম; ফলে চুপ করে নিরালায় বসে আশপাশে কি ঘটছে সেটা দেখাই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

আসল লক্ষ্য থাকত অবশ্য পরিচারিকাদের ঘরের দিকেই, কারণ, সেখানে ধীরে ধীরে একটা গভীর প্রেমের ব্যাপার গড়ে উঠছিল, আর তাতে আমি নিজেও যথেষ্ট আনন্দ আর আকর্ষণ বোধ করছিলাম। মাশা ছিল এই প্রেমের নাটকের নায়িকা; ভাসিলিকে সে ভালবাসত। কাজে যোগ দেবার আগে থাকতেই তার সাথে পরিচয় ছিল ভাসিলির, আর ভাসিলিও তখন তাকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে বলে। কিন্তু ভাগ্য ওদের দুজনকে পুরো পাঁচটা বছরের জন্য আলাদা করে রাখল, পর ওদের আবার মিলন হয় দিদিমার বাড়িতে। কিন্তু এখানেও এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। ওদের দুজনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মামা নিকোলাই; সে কিছুতেই ভাসিলির সঙ্গে তার ভাগ্নীর বিয়ে দিতে রাজি হয় না; বলে, ভাসিলি নাকি নিতান্তই উজবুক, লম্পট।

এই বাধার ফলেই একান্ত নির্লিপ্ত স্বভাবের ঠাণ্ডামেজাজী ভাসিলিও শেষ পর্যন্ত মাশার প্রেমে এমনই হাবুডুবু খেতে শুরু করে যে তাকে দেখলে মন হত সে যেন একজন সার্ফ দর্জি, যে কিনা গোলাপী জামা পরে চুলে গন্ধ তেল মেখে ঘুরে বেড়ায়।

যদিও ওর ভালবাসা দেখাবার পদ্ধতি ছিল খুবই বিচিত্র, এবং সময় অসময়ের কোন বালাই-ই ছিল না (যেমন, যখনই সে মাশার সাথে দেখা করত, তখনই চেষ্টা করত কোন না কোন ভাবে, চিমটি কেটে, চড় মেরে কিংবা দম বন্ধ হয়ে আসার মত জাপটে ধরে তাকে ব্যথা দিতে), তবু একথা ঠিক যে সে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং এর প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন থেকে, যেদিন নিকোলাই সোজাসুজি তাকে বলে দিল যে কিছুতেই সে তার ভাগ্নীকে তার হাতে তুলে দেবে না। এই সিদ্ধান্ত জানার পরই মনের দুঃখ ভোলার জন্য ভাসিলি মদ্যপান শুরু করে দেয়, এবং যখন তখন গিয়ে বিভিন্ন মদ্যশালায় এমন হামলা করতে থাকে যে, তারজন্য বেশ কয়েক-বার পুলিশের হাতে গুঁতো খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এমন বিচিত্র হাবভাবে মাশার চোখে ওর মর্যাদা বেড়ে যায় অনেকগুণ, এবং মাশা ওকে আগের থেকে আরও বেশি ভালবাসতে শুরু করে। ভাসিলি যে-কদিন হাজতে আটকা ছিল সে-কদিন মুহূর্তের জন্যও মাশার চোখের জল শুকোয়নি; সে গাশাকে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে ক্রমাগত বিলাপ করেছে (এই হতভাগা প্রেমিক যুগলের প্রতি গাশার একটা আন্তরিক টান ছিল), এবং বুড়ো মামার শত গালাগাল মারধোর সহ্য করেও লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে ভাসিলির সঙ্গে দেখা করে এসেছে থানায়।

পাঠক, যে সমাজের সঙ্গে আপনার পরিচয় করাচ্ছি, তাদের অবজ্ঞা করবেন না। যদি আপনার আত্মায় ভালবাসা এবং সহানুভূতির সুর হারিয়ে গিয়ে না থাকে তবে এই পরিচারিকাদের ঘরেই আপনি খুঁজে পাবেন সে সুরের মূর্চ্ছনা। আমাকে অনুসরণ করুন কিংবা নাই করুন, তবু আমি নিজেকে সিঁড়ির মুখের ঠিক সেইখানটাতে নিয়ে যাবই, যেখান থেকে পরিচারিকাদের ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে একটা বেঞ্চি রয়েছে, তার ওপর রয়েছে একটা ইস্ত্রী, নাকভাঙ্গা একটা কাগজের পুতুল, একটা ছোট গামলা, আর একটা হাত ধোবার পাত্র; তার পাশে জানলার তাক, তার ওপর বোঝাই করা রয়েছে একগাদা কালো মোম, একটা সিল্কের সুতোর বাণ্ডিল, একটা আধ-খাওয়া কচি শশা আর কিছুটা মিঠাই; এছাড়া রয়েছে একটা লাল টেবিল, তারওপর পড়ে আছে অসমাপ্ত একটা ছুঁচের কাজ, আর তারই পেছনে আমার পছন্দসই গোলাপী

রঙের পোষাক পরে, হাতে নীল রুমালটা জড়িয়ে বসে আছে মাশা। সে সেলাই করছে, মাঝে মাঝে আবার হাতের ছুঁচের ডগাটা দিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে, অথবা বাতির পোড়া সলতেটুকু কেটে ফেলছে ; আর আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি, এমন উজ্জ্বল নীল চোখ, প্রচুর সোনালী চুল, এবং অমন উন্নত বুক নিয়ে সে কেন ভদ্রঘরে জন্মাল না ? কি এমন ক্ষতি হত যদি সে লাল টুকটুকে একটা গাউন পরে, মাথায় গোলাপী ফিতে লাগানো একটা টুপি এঁটে, মিমির মত নয়, ভাভরস্কি বুলেভার্ডে দেখা সেই মহিলাটির মত, বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকত ? তখন অবশ্য ও ছুঁচের কাজ করত ফ্রেমে এঁটে, আর আয়নার ভেতর থেকে আমি তা দেখতাম, এবং সে যা চাইত তাই করতাম ; তার পোশাক, খাবার সবকিছু এগিয়ে দিতাম হাতের কাছে।

সেই তুলনায় আঁটোসাঁটো কোট পরিহিত, ভেতর থেকে গোলাপী সার্ট বেরিয়ে থাকা মাতাল-মুখো ভাসিলির বেয়াড়া চেহারাটা কী বিশ্রী। যেন ভয়ঙ্কর শাস্তির চিহ্ন বহন করে চলেছে সে।

গদীর মধ্যে হাতের ছুঁচটাকে বিঁধিয়ে রেখে মাশা বলল, 'ওঃ, ভাসিয়া, আবার!' কিন্তু মাথা তুলে স্বাগত জানাল না।

উত্তেজিত স্বরে ভাসিলি বলল, 'হ্যাঁ, তাতে হয়েছেটা কি? তার কাছ থেকে আর কি ভালটা তুমি আশা করতে পার? উঃ, যদি কোনরকমে একবার ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলত। কত রকমের তো চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওকে তো কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না।'

অন্য একটি চাকরানী, নাদেঝদা জিজ্ঞেস করল, 'একটু চা খাবে?'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, তোমার ঐ শয়তান মামাটা আমাকে দেখতে পারে না কেন বলত? কারণ আমি কারও কাছে ধার করে পোশাক পরি না, কাউকে তোষামোদ করি না, সবসময় মাথা উঁচু করে চলি—এই জন্য তো? ওতে আমার বয়েই গেল ভারী।' হাতটা নেড়ে ভাসিলি তার কথা শেষ করল।

দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে মাশা বলল, 'গুরুজনদের মান্য করা উচিত, কিন্তু তুমি সবকিছুতেই এমন—'

'আর সহ্য করতে পারছি না, সেজন্যেই তো!'

ঠিক সেই মুহূর্তে দিদিমার ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং শোনা গেল গাশা গজগজ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে।

গাশা হাত নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'কাণ্ড দেখ। যতই বুড়িকে তোয়াজ করনা কেন, আসলে সে যে কি চায় তা সে নিজেই জানে না। উঃ কী ভয়ঙ্কর জীবন, খাটতে খাটতে শেষ হয়ে গেলাম। ইচ্ছে করে—হে ভগবান, আমায় ক্ষমা কর।'

ভাসিলি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল, 'নমস্কার, আগাফাই মিখাই-লোভনা।'

বেশ গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে গাশা বলল, 'ওঃ, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না, যাও, দূর হও এখান থেকে। এখানে আস কেন? জাননা এটা মেয়েদের ঘর?'

ভাসিলি মিনমিনে গলায় বলল, 'এই এলাম, তুমি কেমন আছ তা দেখতে।'

সর্বোচ্চ গ্রামে গলা চড়িয়ে তেমনি রাগতঃ স্বরেই আগাফাই বলল, 'কেমন

আছি, না ? চিন্তা কোরো না, খুব তাড়াতাড়িই পটল তুলছি।'

তার কথা শুনে ভাসিলি হেসে উঠল।

'এর মধ্যে হাসার কিছু নেই ; এবং আমি যদি এখন তোমায় বলি যে, ওহে, এবার এখান থেকে বিদেয় হও, তবে তোমাকে তা-ই করতে হবে, বুঝলে ? সোনার-চাঁদের দিকে একবার তাকাও ! উনি নাকি মাশাকে বিয়ে করবেন ! নচ্ছার বদমাশ কোথাকার ! বেরোও, বেরোও এখান থেকে!' তারপর সে দুপদাপ করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা এমনভাবে দড়াম করে বন্ধ করে দিল যে জানলার কাঁচগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

এরপর দেওয়ালের ওপার থেকে তার গলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি মানুষ, এমনকি নিজেকেও সে শাপশাপান্ত করল, এলোপাথাড়ি জিনিসপত্র ছুঁড়ল, এবং পোষা বেড়ালটার কান ধরে মোচড় দিল। তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে, লেজ ধরে ছুঁড়ে দিল বাইরে ; সেটা করুণসুরে কেঁদে উঠল।

ভাসিলি তখন ফিসফিসিয়ে বলল, 'দেখছি, আর এক সময় এসে চা খেয়ে যাওয়াটাই ভাল হবে ; তবে এখন চলি, আবার দেখা হবে।'

আড়চোখে তাকিয়ে নাদেঝদা বলল, 'কিছু মনে কোরো না, আমি দেখছি জলটা গরম হয়েছে কিনা।'

নাদেঝদা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই ভাসিলি মাশার গা-ঘেঁষে বসে পড়ে বলল, 'আমি ঠিক করেছি, এ ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব ; এক নয় সোজাসুজি কাউন্টেসের কাছে গিয়ে বলব যে, "দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে এই," নয়ত সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চিরকালের মত গৃহত্যাগ করব। সত্যি, দেখে নিও।'

'তাহলে আমি এখানে একা একা থাকব ?'

'তোমার জন্যই তো যত কষ্ট। যদি তুমি না থাকতে তবে কবেই সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যেতাম !'

একটু চুপ করে থাকার পর মাশা বলল, 'আচ্ছা, তুমি আর তোমার জামা-গুলো আমার কাছে কাচার জন্য নিয়ে আসনা কেন ?' তারপর তার জামার কলারটা ধরে বলল, 'দেখ তো এটা কী ময়লা হয়েছে !'

ঠিক সেই মুহূর্তে নিচে দিদিমার ঘণ্টি বেজে উঠল, এবং তাই শুনে গাশা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ভাসিলিকে দেখতে পেয়েই তাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে গেল এবং বলল, 'পাজি, নচ্ছার, এরপর তুমি ওর কাছ থেকে আর চাওটা কি ? মেয়েটার এমন হাল করে তুলেছ, তবু এখনও ওর পিছু ছাড়ছ না। ওকে কাঁদতে দেখলে মনে মনে খুব মজা পাও, না ? হতচ্ছাড়া, নির্লজ্জ, বেহায়া ! বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও !' তারপর হঠাৎ মাশার দিকে ফিরে বলল, 'ওর মধ্যে তুই কী দেখেছিস, অ্যাঁ ? ওর জন্যই আজ তোকে তোর মামার হাতে মার খেতে হয়নি ? তবু তুই তোর নিজের রাস্তা কিছুতেই ছাড়বি না ; সেই একই কথা বলবি, "ভাসিলি গুসকভকে ছাড়া আর কাউকেই আমি বিয়ে করব না।" গাধা কোথাকার।'

হঠাৎ মাশা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'না, আমি পারব না। আমাকে যদি মেরেও ফেলা হয় তবু আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না, করব না,

করব না। আমি শুধু ওকেই ভালবাসি।'

আমি একদৃষ্টে মাশার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সের ওপর শুয়ে পড়ে ও রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে চলল। আমি ভাসিলি সম্পর্কে আমার ধারণা পালটাবার চেষ্টা করলাম; ভাবলাম, ওর মধ্যে এমনকি বিশেষগুণ আছে, যার জন্য এত নির্যাতন সহ্য করেও মাশা ওকেই ভালবাসছে! কিন্তু, তার দুঃখের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না যে, তার মত অমন সুন্দরী একটি মেয়ে কী কারণে মাশার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

নিজের ঘরের দিকে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজের মনেই ভাবলাম, 'যখন আমি বড় হব, যখন পেত্রভোস্কোয়ার জমিদারির মালিক হব, তখন মাশা আর ভাসিলি হবে আমার খাস চাকর-চাকরানী। আমি পড়ার ঘরে বসে পাইপ টানব, আর মাশা তখন রান্না ঘরে যাবে ইস্ত্রি গরম করতে। সে সময় আমি বলব, "মাশাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" সে আসবে, এবং তখন ঘরে আর কেউই থাকবে না। হঠাৎ ভাসিলি সেখানে উপস্থিত হবে, এবং দেখবে যে মাশা সেখানে রয়েছে, তখন বলবে, "উঃ, আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না।" সে কথা শুনে মাশা কেঁদে উঠবে, আর আমি বলব, "ভাসিলি, আমি জানি যে তুমি ওকে খুবই ভালবাস, এবং সেও তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসে। এই নাও হাজার রুবল; যাও, ওকে বিয়ে কর; ভগবান তোমাদের সুখে রাখবে।" তারপর চলে যাব বসার ঘরে।'

মানুষের মনে চিহ্নমাত্র না রেখে কত যে স্বপ্ন, কত যে কল্পনা অদৃশ্য হয়ে যায় তার কোন হিসেব লেখা থাকে না। আবার কিছু স্বপ্ন, কিছু কল্পনা এমন আছে যা মনের মধ্যে গভীর হয়ে গেঁথে বসে; হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে ছাড়ানো যায় না; এবং সেগুলো প্রায়ই হৃদয়কে পুলকিত করে। প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটেছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আর মনে থাকে না, শুধু মনে থাকে সেই ঘটনার মধুরতম স্মৃতিটুকু। সে রকমই একটি ঘটনা হচ্ছে এটি। ভাসিলিকে বিয়ে করে মাশা যে মধুর সুখ অনুভব করতে পারত, নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সে কথা যে আমি কতবার ভেবেছি, তার আর কোন লেখা-জোখা নেই। বহুদিন পরেও সেই একই চিন্তা বারবার আমার মনে রিনঝিন করে বেজে উঠেছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ।। কৈশোর

আমার কৈশোর জীবনে সবসময় আমি কি চিন্তা করতাম, কি ভালবাসতাম সে কথা বললে সম্ভবতঃ পাঠকেরা তা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কারণ, সেগুলো ছিল সত্যি সত্যিই সে বয়সে চিন্তা করার অযোগ্য। কিন্তু আমার মতে, একজন মানুষের অবস্থা এবং তার মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে যখন ভারসাম্য থাকে না— তখন সেটাই হয় তার আন্তরিকতার চূড়ান্ত প্রমাণ।

সে সময় পুরো একটা বছর, নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। সবসময় শামুকের মত ভেতরে গুটিয়ে থেকে চিন্তা করতাম, মানুষের ভবিতব্য কি, জীবনের ভবিষ্যতটাই বা কি, আর আত্মার অমরত্বই বা বলে কাকে? এবং আমার কাঁচা মনের অনভিজ্ঞ ভাবনা দিয়ে সেই গুরুগম্ভীর প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা আমাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেত যেখানে কিনা মানুষ তার সমগ্র চেষ্টা দ্বারা উপনীত হয়েও কোন সমাধান না পেয়েই ফিরে

আসতে বাধ্য হয়।

আমার ধারণা, সমগ্র মানবজাতি যে ধারায় চিন্তা করে, একজন একক মানুষও ঠিক সেই ধারাতেই চিন্তা করতে বাধ্য; কারণ, প্রতিটি দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি, যা মানুষের মাথা থেকেই নির্গত হয়েছে, সে সম্পর্কে মানুষ পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের আগেই, নিজের মন থেকেই কম-বেশি কিছু না কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে থাকে।

এই চিন্তা আমার মাথায় এমন পরিষ্কার আবির্ভূত হয়েছিল যে, আমি তাকে নিজের জীবনের ওপরই প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি; এবং মনে করেছি সেটা যেন আমার নিজেরই আবিষ্কৃত একটা নতুন বিষয়।

যখন বুঝলাম যে বাইরের কোন কিছুর ওপর আমাদের মনের সুখ নির্ভর করছে না, বরং তার প্রতি আমাদের মনোভাবটা কি, সেটার ওপরই এটা নির্ভরশীল, এবং কষ্ট সহ্য করতে যে প্রস্তুত সে কখনোই অসুখী হতে পারে না—তখন কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য হাত টন্‌টন্ করে ব্যথা করা সত্ত্বেও প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ মিনিট তাতিশ্চেভের অভিধানটা হাতের ওপর রেখে দিতাম, এবং চিলেকোঠায় গিয়ে একটা দড়ি দিয়ে সপাসপ্ পিঠের ওপর এত জোরে মারতাম যে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল নেমে আসত।

আবার কখনও কখনও, আকস্মিকভাবে মনে হত যে হয়ত যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে আমায় গ্রাস করবে, আর এ অবস্থায় অন্যের কথা চিন্তা না করে নিজে নিজেই ভাবতাম, মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়ে বর্তমানের আনন্দটুকুকে আহরণ করা, এবং এই চিন্তার প্রভাবে, টানা তিনদিন ধরে নির্ধারিত পড়ার বইয়ের বদলে বিছানায় শুয়ে হয়ত উপন্যাস পড়তে লেগে যেতাম, আর শেষ জমানো পয়সাটুকু দিয়ে আদার রসে চোবানো রুটি এবং মধু কিনে এনে খেতাম।

আবার এক সময়, হয়ত তখন চকখড়ি দিয়ে বোর্ডের ওপর হাবিজাবি ছবি এঁকে চলেছি, হঠাৎ মনে হল, সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস দেখতে এমন ভাল লাগে কেন? সামঞ্জস্য ব্যাপারটা তাহলে কি?

নিজেই নিজেকে উত্তর দিলাম, এটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এটার ভিত্তি কি? জীবনের সবকিছুতেই কি সামঞ্জস্য রয়েছে? এই ধরা যাক না এই জীবনটা। হঠাৎ একটা ডিম্বাকৃতি বস্তু এঁকে ফেললাম বোর্ডে। জীবন বিনষ্ট হওয়ার পর আত্মা চলে যায় অমরলোকে। এবং ডিম্বাকৃতি বস্তুটার একপাশ থেকে সোজা একটা রেখা টেনে দিলাম বোর্ডটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। তাহলে উলটো দিকেও ঠিক ওরকমই আর একটা রেখা হবে না কেন? এবং চিন্তা করে দেখলাম, এটা কি ধরনের অমরত্ব যেটার শুধু একটা দিকই রয়েছে? তাহলে নিশ্চয় এ জগতে আসার আগে আমাদের আর একটা জীবন ছিল; যদিও সে জীবনের স্মৃতি আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

এ ধরনের একটা যুক্তি নতুনত্বে এবং চমৎকারিত্বে একেবারে অদ্ভুত লেগেছিল আমার কাছে—তবে ব্যাপারটা আজ আর তেমন পরিষ্কার মনে নেই; অবশ্য চেষ্টা করলে তার একটা সূত্র নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মনে আছে, বিষয়টা

মনে রাখার জন্য একটা কাগজ নিয়েছিলাম তাতে লিখে রাখব বলে ; কিন্তু লিখতে বসে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। যখন জানলার কাছে গেলাম, তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটা ঘোড়ার ওপর—সেটাকে কোচোয়ান তখন গাড়ির সাথে জুড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিন্তা জড়ো হল গিয়ে একটা প্রশ্নে—যখন এই ঘোড়ার আত্মা মুক্তি পাবে, তখন সে কোথায় যাবে ? আবার সেই দেহেই নাকি মানুষের শরীরে ? সে সময় ভোলোদিয়া সেখান থেকেই যাচ্ছিল ; আমি একটা কিছু ভেবে বের করার চেষ্টা করছি বুঝতে পেরেই ও আমার দিকে চেয়ে হাসল, আর সেই হাসিতেই আমার কাছে এটা একেবারে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এতক্ষণ ধরে যা ভেবে চলেছি, সেটা নিতান্ত বোকার চিন্তা ছাড়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করলাম শুধু এ কারণেই যে, পাঠক এ থেকেই বুঝতে পারবেন সে সময় কী ধরনের চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেত।

কিন্তু এতসব দার্শনিক চিন্তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে নাস্তিকতাবাদ প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল, এবং এক সময় সেটা প্রায় পাগলামিতে পর্যবসিত হয়েছিল। কল্পনায় মনে হত একমাত্র আমি ছাড়া জগতে আর কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই ; সবকিছুই ছায়া, কেবলমাত্র তাদের প্রতি যখন আমি দৃষ্টিপাত করি তখনই তারা আকার ধারণ করে, আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এক কথায়, আমি সেলিঙের সেই তত্ত্বেই বিশ্বাস করতাম যা কিনা বলছে যে, নিরপেক্ষভাবে বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই, শুধু আমার সঙ্গে সম্পর্কেই তাদের যা কিছু অবস্থিতি। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মাঝে মাঝে এমন ক্ষেপে উঠতাম যে, আচমকা পিছনে ফিরে আমার পশ্চাতের শূন্যতাকে চমকে দিতে চাইতাম।

সত্যি, মানুষের মাঝে অর্থহীন চিন্তার জাল বোনার যেন কোন শেষই নেই।

আমার দুর্বল মন কিছুতেই এ বিরাট সমুদ্রের কুল খুঁজে পেত না ; অথচ সেই ক্ষমতা বহির্ভূত চেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে মনের সব বিশ্বাস, যা আমার মানসিক শান্তির জন্য একান্তই জরুরী ছিল, তা আমি হারিয়ে বসলাম।

এইসব মানসিক মেহনতির ফলে, মনের সামান্য সূক্ষ্মতা ছাড়া,—যা আমার সঙ্কল্পের তেজকে কমিয়ে, প্রতিটি বিস্ময়ের চুলচেরা হিসাবে প্রণোদিত করে, অনুভূতির সজীবতাকে বিসর্জন দিয়ে, নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছিল —আর কোন লাভই হল না।

কোন এক বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মন নিজের আত্মার অবস্থাটা যেভাবে উপলব্ধি করে ঠিক সেভাবেই তার মস্তিষ্কের ঐ আজগুবী ভাবনা চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করে আশ্রয় নেয় স্মৃতির গোপন-কক্ষে। অসম্ভব সব জল্পনা-কল্পনার জাল বোনাটা আমার কাছে এমন মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল, এবং মনের অবস্থাটাও এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে সাদা-মাটা কোন ব্যাপার ভাবতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত এমন এক জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে যেতাম যে আসলে শুরুর ব্যাপারটা যে কি ছিল তা আর মনেই থাকত না। আর যা মনে থাকত, তা হচ্ছে আমার নিজস্ব চিন্তার সাম্রাজ্য। তখন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম ; একি করছি আমি ? আর জবাবও দিতাম নিজেই : ভাবছি তো নিজেরই ভাবনাগুলো। এবং কি ভাবছি ?

ভাবছি, যা ভাবছিলাম তাই ; এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার যুক্তির ভেতর কোন কারণই খুঁজে পেতাম না।

আমার আবিষ্কৃত দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আমার আমিত্বকেই সবসময় প্রশ্রয় দিত। আমি ভাবতাম, আমি হচ্ছি সেই জাতের একজন মহৎ মানুষ যে-কিনা সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলার্থে নিত্য নতুন আবিষ্কার করে চলেছে অবিচলিতভাবে, এবং অন্য সবাইকেই ভাবতাম আমার করুণার পাত্র ; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই সব সাধারণ মানুষদের কারও সংস্পর্শে এলেই লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে যেতাম আমি। নিজের মনে নিজেকে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাই না কেন, অন্য কারও কাছে নিজেকে জাহির করার যে ক্ষমতা তা ক্রমাগত আমার মধ্যে হ্রাস পাচ্ছিল। যতই মামুলি হোক না কেন, নিজের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণের জন্য আমি নিজেই জড়োসড়ো হয়ে উঠতাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।। ভোলোদিয়া

এই সময়ের বর্ণনা দিতে দিতে যতই এগোচ্ছি ততই যেন ব্যাপারটা আমার কাছে কষ্টসাধ্য এবং কঠিন হয়ে উঠছে। আমার জীবনের শুরুর স্মৃতি যেমন মধুর উষ্ণ অনুভূতিতে উজ্জ্বল ছিল, পরবর্তীকালের স্মৃতিতে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। তাই অতি দ্রুত পেরিয়ে যেতে চাই কৈশোরের মরুভূমি ; এক লাফে গিয়ে হাজির হতে চাই সেই সুখময় দিনগুলোতে—যা কিনা বন্ধুত্বের মধুরতার কোমল অনুভূতিতে পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যের কাব্যিকতার আলোকে উদ্ভাসিত—আমার ভালবাসার যৌবনে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্মৃতির জাবর কাটতে চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না অসাধারণ সেই মানুষটির কথায় পৌঁছচ্ছি, যার সান্নিধ্য, আমার মানসিক গঠন এবং বিকাশের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, ততক্ষণ কেবলমাত্র বড় বড় ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব।

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ভোলোদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কথা। তখন বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা তাকে পড়াতে আসতেন ; এবং একান্ত অনিচ্ছাকৃত শ্রদ্ধা ও ঈর্ষার সঙ্গে আমি শুনতাম ভোলোদিয়া কালো বোর্ডটার ওপর চক দিয়ে টকাটক শব্দ করে কী সব লিখছে, আর মুখে উচ্চারণ করছে অদ্ভুত সব দাঁত ভাঙ্গা শব্দ—যা কিনা আমার কাছে মনে হত অসাধারণ জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ বলে। অবশেষে এক রবিবারে, খাবার শেষে, প্রতিটি শিক্ষক এবং দুজন অধ্যাপক এসে মিলিত হলেন দিদিমার ঘরে। বাবা এবং অন্য বহু অতিথির সামনে ভোলোদিয়ার একটা নকল পরীক্ষা গ্রহণ করা হল ; এবং ভোলোদিয়াও তাতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিল। দিদিমা তা দেখে মহাখুশি হলেন। তারপর আমাকেও বেশ কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হল, কিন্তু তার কোনটাতেই আমি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারলাম না। অধ্যাপকেরা খোলাখুলিভাবেই চেষ্টা করছিলেন দিদিমার কাছ থেকে আমার অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখতে, কিন্তু তার ফলে ব্যাপারটা যেন আরও বেশি গোলমেলে হয়ে গেল আমার কাছে। যাই হোক, আমার প্রতি কেউ তেমন বিশেষ নজর দিলেন না ; তাছাড়া তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো, অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে তখনও একটি বছর বাকি। ভোলোদিয়া একমাত্র খাবার সময়ই নিচে নামত, আর দিনের বাকি সময়টা কাটাত পড়ার ঘরে। এতক্ষণ

পড়াশুনো করার খুব যে একটা দরকার ছিল তা নয়, তবে সে নিজের ইচ্ছেতেই তা করত। অহঙ্কার তো আর তার কম ছিল না, তাই চেষ্টা করছিল পরীক্ষায় শুধুমাত্র উত্তীর্ণ নয়, প্রথম সারির মধ্যে যাতে থাকা যায় তারজন্য।

অবশেষে পরীক্ষা শুরুর দিন উপস্থিত হল। পেতলের বোতাম বসানো নীল কোট, হাতে সোনার ঘড়ি এবং এক চামড়ায় তৈরি জুতো পড়ে ভোলোদিয়া তৈরি হল; বাবার ফিটন গাড়িটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। নিকোলাই সেটাতে পা রাখার চর্ম-আচ্ছাদন বিছিয়ে দিল, আর ভোলোদিয়া এবং সেন্ট জেরোমি তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। মেয়েরা, বিশেষতঃ কাতেনকা, জানলা দিয়ে আনন্দিত মুখে তাকিয়ে রইল ভোলোদিয়ার সুন্দর চেহারাটার দিকে। বাবা বললেন 'মঙ্গল হোক।' আর দিদিমা, যিনি অতি কষ্টে শরীরটাকে জানলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি ভোলোদিয়াকে আশীর্বাদ করে সজল চোখে তাকিয়ে রইলেন তার যাত্রাপথের দিকে—যতক্ষণ না গাড়িটা গলির মুখ থেকে বাঁক নিয়ে অন্তর্হিত হল, ততক্ষণ বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

ভোলোদিয়া ফিরে এল। সবাই ওকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে চলল, 'কি, কেমন হল? ভাল তো? কত পাবি?' কিন্তু এই সবকটা প্রশ্নের একটাই মাত্র উত্তর ছিল—তার উজ্জ্বল মুখখানা। সে পুরো নম্বরই পেয়েছিল। পরের দিনও ঠিক সেই একই রকম দুশ্চিন্তা ও শুভেচ্ছার মধ্যে তার যাত্রা শুরু হল, এবং ফিরে এলে পর দেখা গেল সেই একই আগ্রহপূর্ণ সম্বর্ধনা। এভাবে নটা দিন কেটে গেল। সব থেকে কঠিন বিষয়টা অপেক্ষা করছিল দশম দিনের জন্য—সেটা ছিল ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। আমরা সবাই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অধীর ধৈর্যে অপেক্ষা করছিলাম। এভাবে দুটো বেজে গেল, কিন্তু তবু ভোলোদিয়ার পাত্তা নেই।

জানলার কাচের ওপর মুখটাকে চেপে ধরে লিউবোচকা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ঐতো, ঐতো ওরা আসছে।'

সত্যিই তাই। ফিটনের ভেতর সেন্ট জেরোমির পাশে বসে আছে ভোলোদিয়া; তার গায়ে আগের সেই নীল কোটও নেই; আর ধূসর টুপিটাও যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এখন এমব্রয়ডারী করা নীল কলারওলা ছাত্রদের পোশাক পরনে, মাথায় তেকোনা টুপি আর পাশে রয়েছে গিলটি করা একটা ছুরি।

ছাত্রদের পোশাক-পড়া ভোলোদিয়াকে দেখে দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর, আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকত!' কথাটা বলেই তিনি মূর্চ্ছা গেলেন।

ভোলোদিয়া দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল হাসি মুখে; আমাকে, লিউবোচকাকে, মিমিকে, কাতেনকাকে—সবাইকে চুমু খেল: লজ্জায় কাতেনকার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। ভোলোদিয়া তো আনন্দে ফেটে পড়ল। আর সত্যিই, নতুন পোশাকে ওকে কী চমৎকারই না দেখাচ্ছিল। সদ্য গজানো গোঁফের রেখার সঙ্গে নীলরঙের কলারটা মানিয়ে গিয়েছিল বেশ সুন্দর! তার লম্বাটে সরু কোমরটার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ চলার ভঙ্গি ছিল সত্যিই অপূর্ব। সেই বিশেষ দিনটাতে আমরা সবাই একত্রে দিদিমার ঘরে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। প্রত্যেকের চেহারাতেই যেন আনন্দ উছলে পড়ছিল। খাওয়ার শেষে প্রধান খানসামা তোয়ালে জড়ানো এক বোতল স্যাম্পেন নিয়ে বেশ অভিজাত ঢঙে হাসি মুখে এসে উপস্থিত হল। মার মৃত্যুর পর দিদিমা এই প্রথম স্যাম্পেন পান করলেন; ভোলোদিয়াকে অভিনন্দন জানাবার জন্য পুরো

এক গেলাস শ্যাম্পেন মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

সেই থেকে ভোলোদিয়া একা একাই গাড়ি চালিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেত, অতিথিদের নিজের ঘরে আপ্যায়িত করত, সিগারেট খেত আর বল নাচত; এবং একবার দেখেছিলাম, কয়েকজন বন্ধুর সাথে ও নিজের ঘরে বসে দু বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছিল। প্রথমে তারা সবাই মিলে গেলাস ঠেকিয়ে স্বাস্থ্য পান করে, শেষে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দেয় কে সব থেকে সুন্দরীকে পাবে—তাই নিয়ে। কিন্তু তখনও ও নিয়মিত ঘরেই খাবার খেত, আর বিকেলবেলা বসার ঘরে বসে আগের মতই কাতেনকার সঙ্গে কী সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলত। কিন্তু আমি যতদূর জানি,—অবশ্য আমি ওদের আলোচনায় কখনও যোগদান করিনি—ওরা সবসময়ই ওদের পড়া উপন্যাসগুলোর নায়ক-নায়িকাদের প্রেম, ঈর্ষা ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বলত। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না, ওসব কথায় ওরা কি মজাটা পেত, আর অমন অর্থপূর্ণভাবে হাসতই বা কেন, আবার মাঝে মাঝে তর্কই বা করত কেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ছোটবেলার সেই সাধারণ বন্ধুত্বের সম্পর্কের বাইরেও ওদের মধ্যে কেমন একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, আর তার ফলে ওরা দুজনেই আমাদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কাতেনকা ও লিউবোচকা

কাতেনকার বয়স তখন ষোল। সে বড় হয়েছে। শৈশব থেকে কুমারীত্বে উত্তীর্ণ হবার সময় মেয়েদের দেহে ভীরুভাব আসে, চলায়-বলায় লাজুকতা আর মাধুর্যের প্রকাশ ঘটে, সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত প্রাণবন্ত সৌন্দর্য আর কোমলতার ছোঁয়া লাগে, এবং সবদিক থেকেই সে বদলে যায়। কিন্তু কাতেনকার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন এল না। সেই একই উজ্জ্বল চক্ষু আর হাস্যময় চাহনি, ভ্রু-জোড়ার সাথে একই রেখায় লম্বমান ছোট নাক, নাকের নিচের দিকটা ফোলা, পাতলা ঠোঁটের উজ্জ্বল হাসি, গোলাপী গালের ওপর টোল আর সেই একই ফর্সা ছোট ছোট দুটো হাত—সব মিলিয়ে তাকে আগের মত সেই ছোট মেয়েটিই মনে হত। নতুনত্বের মধ্যে ছিল শুধু তার সোনালী চুলে নতুন কায়দায় বাঁধা খোপা, যা বয়স্ক মেয়েদের নকল করে সে বাঁধত; আর উন্নত বুক, যা তাকে লজ্জা দিত।

যদিও লিউবোচকা ওর সঙ্গে একই সাথে বড় হয়ে উঠেছিল, লেখাপড়া শিখেছিল, তবু সে ছিল একেবারে অন্য ধাতের মেয়ে। তার চেহারাটা ছিল খুবই ছোটখাটো; তার ওপর ছোটবেলায় রিকেট রোগ হওয়াতে তাকে তখনও পা বাঁকিয়েই হাঁটতে হত—এক কথায় সে ছিল বড়ই কুৎসিত। তবে তার মধ্যেই তার চোখ দুটো ছিল সত্যিকারের সুন্দর—বেশ ডাগর আর কালো; এবং তাতে এমন একটা আভিজাত্য ও সরলতার ভাব ছিল যে তার দিকে না তাকিয়ে থাকা যেত না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লিউবোচকা ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক, কিন্তু কাতানকাকে দেখলেই মনে হত সে যেন অন্য কাউকে অনুকরণ করে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে। লিউবোচকা সব সময়েই সোজাসুজি তাকাত, এবং কখনও কখনও কারও দিকে হয়ত এমনভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত যে পরে তারজন্য বকা খেতে বাধ্য হত, কেননা, ওভাবে কারও দিকে তাকিয়ে থাকাটা ঠিক রীতিসম্মত ছিল না।

অন্যদিকে কাতেনকা, অতি দ্রুত চোখের পাতা নামিয়ে ফেলত, বাঁকা চোখে

তাকাত এর ওর দিকে, আর বলত, ও নাকি চোখে তেমন ভাল দেখতে পায় না ; কিন্তু আমি জানতাম, ওর দৃষ্টিশক্তি ছিল একেবারে স্বচ্ছ। লিউবোচকা অপরিচিত লোকদের সামনে সেজেগুজে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করত না, এবং কখনও যদি কেউ ওকে বহুলোকের মাঝখানে চুমু খেত তবে ও সাফসাফ তাকে বলে দিত যে ও ধরনের আবেগ সে মোটেই পছন্দ করে না। অন্যদিকে কাতেনকা, অতিথি অভ্যাগতদের দেখলে মিমির কাছে আরও বেশি আবদার জানাতে শুরু করে দিত, এবং মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে হাতে হাত দিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে লেগে যেত। যে কোন তুচ্ছ কারণেও লিউবোচকা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ত, আর কখনও কখনও হাত-পা নেড়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করত। কিন্তু কাতেনকা যখন কোন কারণে হাসত, তখন সে অতি অবশ্যই রুমাল দিয়ে মুখ চাপা দিত। লিউবোচকা সবসময় সোজা হয়ে বসত, আর যখন হাঁটত তখন হাত দুটো ঝুলিয়ে দিত দুপাশে ; কিন্তু কাতেনকা মাথাটা একদিকে হেলিয়ে হাত দুটোকে জোড়া করে চলত। কোন বয়স্ক লোকের সঙ্গে যখন লিউবোচকা কথা বলত, তখন বেশ খুশি হত, আর স্পষ্টই বলত যে সে অতি অবশ্যই একজন অশ্বারোহীকে বিয়ে করবে ; কিন্তু কাতেনকা বলত, প্রতিটি পুরুষই নাকি সাংঘাতিক, তাই সে কোনদিনই বিয়ে করবে না ; আর যখনই কোন পুরুষ তার সাথে কথা বলত, তখনই সে এমন ভঙ্গি করত যে মনে হত সে যেন কতইনা ভয় পেয়েছে। লিউবোচকা সবসময়ই মিমির ওপর ক্ষেপে থাকত ; কারণ তিনি ওকে এমনভাবে অন্তর্বাস পরিয়ে দিতেন যে ওর নাকি তাতে মনে হত যে দম বন্ধ হয়ে আসছে, তাছাড়া খাওয়ার প্রতিও ওর লোভ ছিল যথেষ্ট ; কিন্তু অন্যদিকে কাতেনকা বারবার জামার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দেখাত যে তার অন্তর্বাসটা বেশ ঢিলে হয়ে গেছে, আর তাছাড়া খেতও সে খুবই কম। লিউবোচকা মানুষের মুখ আঁকতে ভালবাসত, কিন্তু কাতেনকা আঁকত ফুল আর প্রজাপতি। লিউবোচকার দক্ষতা ছিল ফিল্ডের ঐকতান আর বিটোভেনের সঙ্গীত বাজানোতে ; কিন্তু কাতেনকা বাজাত ওয়াল্জ আর বিভিন্ন সুর। বাজাবার সময় সে তার স্বরলিপিটা বেশ দূরে রাখত, চাবিটাকে খুব জোরে মোচড় দিত, আর পাটাকে চালনা করত মুহুর্মুহু ; এবং বাজনা শুরুর আগে অন্ততঃ বার তিনেক ঝঙ্কার তুলত পিয়ানোটায়।

সেদিন থেকে ভাবলাম, কাতেনকা সত্যিই সাবালিকা হয়েছে, আর সে কারণে সে আমাকে আনন্দও দিত যথেষ্ট।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।। বাবা

ভোলোদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর থেকেই বাবা বেশ ফূর্তিতে ছিলেন, এবং দিদিমার সঙ্গে একত্রে খাবার জন্য প্রায়ই আসতেন। তবে তার ফূর্তির আসল কারণ সম্পর্কে পরে নিকোলাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে তিনি নাকি তখন জুয়োতে বেশ ভাল পয়সা কামিয়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে ক্লাবে যাবার আগে মাঝে মাঝেই তিনি আমাদের দেখতে আসতেন ; আমরা সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াতাম এবং তিনি পিয়ানোতে জিপসী গান ধরতেন, আর তাল দিতেন পায়ের জুতোয় (হিল তোলা জুতো তার ভীষণ অপছন্দ ছিল ; তিনি কখনও তা পড়তেনও না)। লিউ-বোচকাকে বাবা সব থেকে বেশি ভালবাসতেন, তাই তখন আর তার আনন্দ যেন ধরতই না। কখনও কখনও তিনি আমাদের পড়ার ঘরে এসে উপস্থিত হতেন,

এবং বেশ গম্ভীর মেজাজে আমার পড়া শুনতেন; কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন আমার ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে উনি জানেনই না আমি কি পড়ি। দিদিমা যখন কোন কারণ ছাড়াই সবার ওপর রেগে বক্‌বক্‌ করতেন তখন বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু ছেলের মত চোখ টিপে ইশারা করতেন। বলতেন, 'তাহলে আমরা এটা পেলাম।' এক কথায়, আমার শিশুসুলভ কল্পনায় তিনি যে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা থেকে অনেকটাই নেমে এসেছিলেন। যদিও আগের মতই শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সঙ্গে তার বিরাট ফর্সা হাতটাতে চুমু খেতাম, তবু মনে মনে ভাবতাম, তার সম্পর্কে চিন্তা করবার, তার কাজকর্ম সম্পর্কে মতামত দেবার একটা অধিকার যেন আমার ওপরে বর্তেছে, এবং এরফলে এমন সব উদ্ভট চিন্তা আমার মাথায় এসে জমা হত যে আমি মাঝে মাঝে বেশ ভয় পেয়ে যেতাম। এধরনেরই একটা ঘটনা চিরদিন আমার মনে থাকবে, যার জন্য বেশ মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল আমাকে।

একদিন সন্ধ্যায়, ভোলোদিয়াকে এক নাচের আসরে নিয়ে যাবার জন্য, কালো কোট আর সাদা ওয়েস্ট-কোট পরে বাবা বৈঠকখানা ঘরে এলেন। ভোলোদিয়া তখন নিজের ঘরে সাজগোজ করছিল, আর দিদিমা নিজের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ভোলোদিয়া এলে পরে তাকে দেখবেন বলে (প্রতিটি বলনাচের আগে ভোলোদিয়াকে কাছে ডেকে, তার পোশাকের পারিপাট্য যাচাই করে, তাকে আশীর্বাদ এবং উপদেশ দান করাটা দিদিমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল)। মিমি আর কাতেনকা তখন হল-ঘরটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছে; একপাশে শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে আর লিউবোচকা পিয়ানোতে বাজিয়ে চলেছে তার প্রিয় বাজনা ফিল্ডের দ্বিতীয় ঐকতান।

আমার মা আর বোন লিউবোচকার মধ্যে যে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল, এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য জীবনে আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি। এই সাদৃশ্য তাদের মুখে কিংবা শারীরিক গঠনের মধ্যে ছিল না, ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, হাত দুটোয়, হাঁটাচলার ভঙ্গিতে, গলার স্বরে আর কিছু কিছু বাচনে। যেমন, যখন লিউবোচকা রেগে যেত তখন বলত, 'সারা জন্মেও এটা করতে দেওয়া হবে না।' ও 'সারা জন্মে' কথাটা ঠিক তেমনিভাবে উচ্চারণ করত, যেমনটি মা প্রায়ই বলতেন। ফলে মনে হত যেন মা-ই আবার সে কথাটা বলছেন। তবে পিয়ানো বাজাবার সময় সাদৃশ্যটা আরও বেশি করে নজরে পড়ত, কারণ ও ঠিক মার মত ভঙ্গিতে বসে মার মতই ওটা বাজাত। মা যেমন বসার সময় গাউনটা ঠিক করে নিতেন, ও-ও তেমনিভাবেই গাউনটা ঠিক করত, যেভাবে বাঁ হাত দিয়ে পাতা ওলটাতেন সেভাবেই পাতা ওলটাত, আর কোন কঠিন সুর আয়ত্ব করতে না পারলে বিরক্তিতে যেভাবে চাবিগুলো জোরে জোরে টিপতে টিপতে বলে উঠতেন 'হা কপাল!' ও-ও ঠিক সেভাবেই বলত 'হা কপাল। একেবারে মার মতই ওর হাতও মিষ্টি সুর তোলাতে বেশ ওস্তাদ ছিল। ফিল্ডের যে সুর আজও মানুষের মনে অনুরণিত হয়, সে সুর মার মতই চমৎকার দক্ষতায় ও আয়ত্ব করে নিয়েছিল।

নিঃশব্দে দ্রুত পা ফেলে বাবা ঘরে ঢুকে লিউবোচকার কাছে চলে গেলেন। লিউবোচকা বাবাকে দেখে পিয়ানো বাজানো বন্ধ করল।

লিউবোচকাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'না, লিউ,

বাজিয়ে যাও, জান তো আমি তোমার বাজনা কেমন পছন্দ করি।'

লিউবোচকা বাজিয়ে চলল, আর বাবা হাতের ওপর মাথাটা কাত করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন তার সামনে, তারপর হঠাৎ কাঁধটা নাড়িয়ে উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। আর পায়চারি করতে করতে যতবার পিয়ানোর কাছটায় এসে পড়ছিলেন, ততবারই বেশ গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন লিউবোচকার দিকে। তার চলাফেরা দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, মনে মনে তিনি বেশ উতলা হয়ে উঠেছেন। বেশ কয়েকবার ঘোরপাক খাবার পর লিউবোচকার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার কালো চুলে চুমু খেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর লিউবোচকা যখন বাজনা শেষ করে তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভাল লেগেছে?' তখন নীরবে তিনি দুহাতের মধ্যে লিউবোচকার মাথাটা ধরে তার ভ্রূ আর চোখের পাতায় বারবার এমন আবেগের সঙ্গে চুমু খেতে লাগলেন যা তার আগে আর কোনদিন আমি দেখিনি।

বাবার হাতের ঘড়ির চেনটা খুলতে খুলতে ডাগর চোখ দুটো তার মুখের ওপর স্থির রেখে লিউবোচকা বলে উঠল, 'একি বাবা, তুমি কাঁদছ কেন! আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওটা মার খুব প্রিয় বাজনা ছিল।'

আবেগ কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, 'না সোনা, মাঝে মাঝে এটা বাজিও; তুমি তো জানই তোমার সাথে একত্রে কাঁদতে পারলে মনটা কত হাল্কা হয়ে যায়।'

তিনি আর একবার তাকে চুম্বন করলেন; তারপর নিজেকে সামলে নেবার জন্য জোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারান্দার দিকের দরজা পেরিয়ে সোজা চলে গেলেন ভোলোদিয়ার ঘরের দিকে।

বারান্দার মাঝামাঝি গিয়ে থেমে জোরে হাঁক দিলেন, 'ওয়াল্ডমার, তৈরি হতে দেরি আছে নাকি?' আর ঠিক সে সময়ই, সেখান থেকে যেতে যেতে মাশা মনিবকে দেখতে পেয়ে চোখ নামিয়ে নীরবে চলে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাকে থামিয়ে, তার দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, দিনকে দিন তো তোমার রূপ বেশ খুলছে দেখছি।'

লজ্জায় মাথা নুইয়ে নিচু স্বরে মাশা বলল, 'অনুগ্রহ করে যাবার অনুমতি দিন।'

মাশা চলে গেলে বাবা আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁক দিলেন, 'ওয়াল্ডমার, হল?'

বাবাকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম; কিন্তু মানুষের মন তো আর সবসময় হৃদয়ানুগভাবে চলে না—কতবার এমন ধারার সব চিন্তা মনে উঁকিঝুঁকি মারে যে হৃদয়কে আঘাতে-অপমানে জর্জরিত হতেই হয়। আবার সবসময় যে এর কারণ বুদ্ধি দিয়ে বার করা সম্ভব হয় তাও নয়। যতবারই চেষ্টা করি না কেন ওগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার, কিন্তু বারবার সেগুলো ঘুরে ফিরে এসে মনের জানলা দিয়ে হৃদয়ের দিকে উঁকি দেবেই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ দিদিমা

দিনকে দিন দিদিমা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন; প্রায়ই তার ঘরের মধ্যে থেকে শোনা যেত ঘন্টা-ধ্বনি, গাশার গজগজ আর দরজা বন্ধ করার দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ; তখন আর তিনি পাঠ-কক্ষে বিরাট আরাম কেদারাটায় বসে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না; পরিবর্তে শোবার ঘরে লেসের কাজ করা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে কথাবার্তা বলতেন সবার সাথে। যখন তার সঙ্গে দেখা

করতে যেতাম তখন দেখতাম তার হাতটা কেমন ফেকাসে হলুদবর্ণ, একটু ফোলাফোলা আর চকচকে ; তাছাড়া তার ঘরের মধ্যে সেই গন্ধ নাকে আসত যে গন্ধ অনুভব করেছিলাম দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে—মার ঘরে। তবে তার সেই উদ্ধত ব্যবহার, যা তিনি বাড়ির সবার সাথে, বিশেষতঃ বাবার সাথে করতেন, তাতে কিন্তু কোন ঘাটতিই দেখা দেয়নি। তিনি আগের মতই হাত নেড়ে, ভ্রূ কুঁচকে, বিশেষ উচ্চারণে 'আমার প্রিয়' শব্দটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যথাযথ।

এরপর কটা দিন আমাদের আর তার ঘরে যেতে দেওয়া হল না ; এবং হঠাৎ একদিন সকালে, সেন্ট জেরোমি আমাকে এসে বললেন, পড়ার সময়টা আমি যেন কাতেনকা আর লিউবোচকাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাই। যদিও গাড়িতে ওঠার সময় দেখলাম, দিদিমার ঘরের জানলার সামনের রাস্তাটা খড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, এবং দরজার কাছটায় বেশ কিছু লোক নীল কোট গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এমন অসময়ে কেন আমাদের বেড়াতে পাঠানো হচ্ছে। যাই হোক, বেড়াবার সময় সারাটা রাস্তাই আমি আর লিউবোচকা বেশ ফূর্তিতে গল্প করে হেসে কাটিয়ে দিলাম।

একজন ফেরিওলা মাথায় বাক্স চাপিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল, তা দেখে আমরা হেসে উঠলাম। আবার একজন গাড়োয়ান যখন চাবুক দোলাতে দোলাতে আমাদের অতিক্রম করে চলে গেল তখনও খুব শব্দ করে হেসে উঠলাম। এরপর ফিলিপের চাবুকটা গাড়ির পাদানিতে পেচিয়ে যাবার সাথে সাথে সে যখন বলে উঠল 'ধুৎ, ছাই' অমনি আমাদের শুরু হয়ে গেল হাসি! তখন মিমি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'একমাত্র বোকারা ছাড়া আর কিউই এমন অকারণে হাসে না।' কথাটা শুনে হাসির বেগ চাপতে চাপতে লিউবোচকা আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হতেই এমন বিকট হাসিতে আমরা ফেটে পড়লাম যে দুজনের চোখেই জল এসে গেল ; তারপর সেটা একটু কমতেই, আমি লিউবোচকার দিকে চেয়ে, আমাদের মধ্যে কিছুদিন ধরে প্রচলিত বিশেষ একটা শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই আবার শুরু হয়ে গেল সেই দম ফাটা হাসি।

বাড়ির দরজা দিয়ে ঢোকার মুহূর্তে আমি লিউবোচকাকে হাসাবার জন্য একটা বিশেষ মুখভঙ্গি করতে যাব, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল ঠিক দোরগোড়াটায় একটা কালো কফিন-বাক্স রাখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি শিউরে উঠলাম।

সেন্ট জেরোমি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমাদের দিদিমা মারা গেছেন।'

যতক্ষণ দিদিমার দেহটা বাড়িতে রাখা ছিল, ততক্ষণ এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-ভয়ে আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল মৃতদেহটা যেন জীবন্ত, আর ভয় হচ্ছিল এ ভেবে যে একদিন আমাকেও তো ওভাবেই মরতে হবে। দিদিমার জন্য আমার এতটুকুও দুঃখবোধ হচ্ছিল না, এবং সত্যি বলতে গেলে, সারাটা বাড়ি যদিও লোকে গিজগিজ করছিল, কিন্তু কারও মুখেই এতটুকু শোকের চিহ্ন ছিল না, শুধু একজন ছাড়া। সে হচ্ছে গাশা। সত্যি, তার দুঃখ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সে চিলেকোঠায় দরজা বন্ধ করে ক্রমাগত কাঁদছিল, নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিল, আর বারবার বলছিল, 'আমার মনিবানীই যখন মারা গেলেন তখন আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি!' তাই আবার একথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, অনুভূতির

কোন সীমা নেই, আর সেটাই হচ্ছে মানবমনের সভতার সব থেকে বড় পরিচয়।

যদিও দিদিমা আর আমাদের মধ্যে ছিলেন না, তবু বাড়িতে সবসময়ই তার স্মৃতিচারণ চলত। বিশেষতঃ কথাবার্তা হত তার উইল সম্পর্কে, যা তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন, এবং যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একমাত্র তার তত্ত্বাবধায়ক রাজকুমার ইভান ইভানিচ ছাড়া আর কারও কিছুই জানা ছিল না। দেখতাম, দিদিমার আত্মীয়দের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব ছিল, তবে প্রায়ই শুনতাম, আলোচনা হচ্ছে, কার ভাগে কি পড়বে তাই নিয়ে। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমিও মনে মনে এ ভেবে পুলকিত হতাম যে আমাদের ভাগেও কিছু না কিছু জুটবেই।

ঠিক দু সপ্তাহের শেষে নিকোলাই, যাকে বলা যেতে পারে আমাদের বাড়ির বিশেষ সংবাদদাতা, সে এসে খবর দিল যে দিদিমা নাকি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে গেছেন লিউবোচকার নামে, এবং তার সাথে এ শর্তও জুড়ে দিয়ে গেছেন যে লিউবোচকার বিয়ের আগে পর্যন্ত এ সম্পত্তির দেখাশুনো করবেন রাজকুমার ইভান ইভানিচ—বাবা নন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ আমি

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। খুব ভালভাবে লেখাপড়া করছি। শিক্ষকদের দেখলে তখন আর মোটেই ভয় পাই না, বরং পড়াশুনো করতে বেশ ভালই লাগে।

যে পড়াটা ঠিক মত আয়ত্ব করতে পারতাম, সেটা মুখস্থ বলতে বলতে মনে মনে খুব আনন্দ হত। আমি গণিত বিভাগে প্রবেশ করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম; এবং সত্যি কথা বলতে কি, এটা আমি বেছে নিয়েছিলাম শুধুমাত্র এই কারণে যে, সাইনাসেস, ট্যানজেন্টস, ডিফারেনসিয়ালস্, ইনিটিগ্রালস্ প্রভৃতি শব্দগুলোর ওপর আমার একটা বিশেষ মোহ জন্মে গিয়েছিল।

উচ্চতায় আমি ভোলোদিয়ার থেকে বেশ ছোট ছিলাম; তার ওপর ঘাড়টা ছিল আগের মতই চওড়া আর সোজা; ফলে সব সময়ই ইচ্ছে হত নতুন কিছু একটা করার। তবে তার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল শুধুমাত্র এটুকুই যে বাবা একবার বলেছিলেন আমার মুখের মধ্যে নাকি বেশ বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে; আর সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও মনে মনে তাই বিশ্বাস করতাম।

সেন্ট জেরোমি তখন আমার ওপর বেশ খুশি; এবং আমিও তাকে আর মোটেই ঘৃণা করি না; বরং, তিনি যখন মাঝে মাঝে বলতেন যে আমার মত বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে এটা কিংবা ওটা না করাটা সত্যিই লজ্জার ব্যাপার তখন মনে মনে তাকে আরও বেশি ভাল লাগত।

পরিচারিকাদের ঘরের দিকে উঁকি মারার অভ্যাসটা অনেক আগেই ত্যাগ করেছিলাম। ওভাবে দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকতে লজ্জা হত, তাছাড়া আসলে, মাশা যে ভাসিলিকে ভালবাসত এই বিশ্বাসটা আমাকে অনেকটা নিরুৎসাহ করে তুলেছিল। ভাসিলির অনুরোধে বাবার কাছ থেকে ওর বিয়ের অনুমতি আমিই আদায় করে দিয়েছিলাম, ফলে সেই অস্বাভাবিক উত্তেজনা আমার মধ্যে একেবারে স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

একটা থালায় করে মিষ্টি নিয়ে নব-বিবাহিতা দম্পতি যখন বাবার কাছে

এল আশীর্বাদ চাইতে, এবং নীল ফিতের টুপি মাথায় দিয়ে মাশা যখন এগিয়ে এসে আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে চুমু খেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, তখন আমার মনে বিন্দুমাত্র আবেগের সঞ্চার হল না, শুধু তার মাথায় লাগানো সুগন্ধী তেলের গন্ধ গ্রহণ করতে লাগলাম প্রাণ ভরে।

ক্রমে ক্রমে আমার মধ্য থেকে ছেলেবেলার দোষত্রুটিগুলো অন্তর্হিত হতে লাগল। শুধু রয়ে গেল একটা, এবং সেটাই ছিল সব থেকে বড়, অর্থাৎ সেই দার্শনিক ব্যাখ্যার অভ্যাসটা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ভোলোদিয়ার বন্ধুবর্গ

ভোলোদিয়ার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার অবস্থানটায় আমি নিজেই ব্যথা পেতাম, কিন্তু তবু ওর বন্ধুরা যখন ওর ঘরে আসত তখন সেখানে চুপচাপ বসে থেকে প্রতিটি বিষয় লক্ষ্য করতে আমার খুবই ভাল লাগত।

ভোলোদিয়ার অতিথিদের মধ্যে সব থেকে বেশি যাতায়াত ছিল দুবকোভ নামে একজন সামরিক কর্মচারী এবং রাজকুমার নেখল্যুদভ নামের একজন ছাত্রের। দুবকোভকে দেখতে ছিল ছোটখাটো, গাট্টাগোট্টা, গায়ের রং কালো; প্রথম যৌবন অতিক্রম করলেও দেখতে খুব একটা খারাপ ছিল না, আর থাকতও সবসময় হাসিখুশি। একদলের লোকই আছে যাদেরকে সবাই পছন্দ করে তাদের দোষত্রুটির জন্যেই। তারা চারদিক ভেবে চিন্তে কোন কিছু বিচার করতে পারে না, সব সময় ভেসে চলে উত্তেজনার বশে। এদের বিচারের ব্যাপারটা সর্বদাই একপেশে এবং ত্রুটিযুক্ত, কিন্তু মনটা বেশ খোলামেলা; ফলে সহজেই তারা মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়, এবং প্রত্যেকেই এদের হীন আত্মম্ভরিতাকেও ক্ষমার চোখে দেখে থাকে আর মনে মনে এদের পছন্দও করে বেশ। দুবকোভও ছিল ঠিক এই ধরনেরই মানুষ। ভোলোদিয়া এবং আমি দুজনেই তাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতাম। প্রথমতঃ ছিলেন সৈনিক, দ্বিতীয়তঃ তার বয়সটা ছিল এমনই যে মনে এমনিতেই সম্ভ্রম জাগত। শুধু একটা ব্যাপার আমার ভাল লাগত না; তা হল, সে এলে ভোলোদিয়া আমার যে-কোন নির্দোষ কাজের জন্যও নিজেকে যেন খুব অপরাধী বলে মনে করত, এবং তার জন্য যথেষ্ট লজ্জাও পেত।

নেখল্যুদভকে দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না। সামান্য কটা চোখ, ছোট উঁচু কপাল, বেমানান গোছের লম্বা হাত-পা—এক কথায় একেবারেই আকর্ষণীয় চেহারা নয়। একমাত্র দেখার বস্তু ছিল তার লম্বা গড়ন, মুখের বিচিত্র বর্ণ আর চমৎকার দাঁতগুলো। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে চকচকে চোখ জোড়া আর ঠোঁটের হাসি যেন ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাত; হঠাৎ দেখতাম বেশ রাগত মুখ, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত চোখে পড়ত মধুর হাসি; ফলে আমাদের শিশুমনে তা দোলা না দিয়ে পারতনা।

তাকে এমনিতেই বেশ লাজুক বলে মনে হত; কথায় কথায় কান লাল হয়ে উঠত, তবু বলতে হবে সে আমার মত লাজুক ছিল না। যতই লজ্জা পেত, ততই যেন তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠত। নিজের দুর্বলতার জন্য সে নিজের ওপরই রেগে উঠত।

যদিও দুবকোভ এবং ভোলোদিয়ার সঙ্গে তার যথেষ্টই বন্ধুত্ব ছিল, তবু এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যেত যে নিতান্ত ঘটনাচক্রেই সে ওদের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। ওদের মধ্যে কোন ব্যাপারেই কোন মিল ছিলনা। ভোলোদিয়া

আর দুবকোভ কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের ছায়া দেখতে পেলেই যেন ভয় পেয়ে যেত ; কিন্তু নেখল্যুদভ এসব ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করত। প্রায়ই সে নানা-রকম দার্শনিক তত্ত্ব আর অনুভূতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চালাত ; এবং তারজন্য কোনরকমের ঠাট্টা-ইয়ার্কিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। ভোলোদিয়া আর দুবকোভ নিজেদের ভালবাসার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে কথা বলতেই পছন্দ করত বেশি (তারা প্রায়ই প্রেমে পড়ত এবং অনেক সময় একই সাথে দুজনে একজনকেই ভালবাসত) ; কিন্তু নেখল্যুদভ, প্রায়ই রেগে উঠত, যখন তারা ওকে কোন একটি লাল চুলওলা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলে ইঙ্গিত করত।

ভোলোদিয়া আর দুবকোভ প্রায়ই নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত ; কিন্তু নেখল্যুদভের কোন একজন বিশেষ আত্মীয়া সম্বন্ধে ওরা কোন মন্তব্য করলে সে প্রচণ্ড রেগে যেত, কারণ সেই আত্মীয়ার সম্পর্কে তার মনে ছিল ভীষণ শ্রদ্ধা। প্রতিদিন খাওয়ার পর নেখল্যুদভকে ছাড়াই ভোলোদিয়া আর দুবকোভ বেড়াতে যেত, এবং নেখল্যুদভকে ঠাট্টা করত 'রুচিশীলা মহিলা' বলে।

চেহারা আর কথাবার্তা—উভয় দিক থেকেই নেখল্যুদভ প্রথম দিনই আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু যদিও আমি বুঝেছিলাম যে অনেক বিষয়েই তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট মিল রয়েছে, তবু প্রথমদিন তাকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। হয়ত এও হতে পারে যে সেই অতিরিক্ত সাদৃশ্যটাই হচ্ছে তাকে মেনে না নেওয়ার প্রধান কারণ।

আমি তাকে অপছন্দ করতাম তার চটুল দৃষ্টিপাত, দৃঢ় গলার স্বর, স্পর্ধিত-ভঙ্গি এবং বিশেষতঃ আমার প্রতি উদাসীনতার জন্য। প্রায়ই কথাবার্তার সময় চেষ্টা করতাম জুতসই একটা উত্তর দিয়ে ওর গর্বকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে, এবং এটা প্রমাণ করতে যে আমার মধ্যেও কিছুটা গভীরতা আছে। কিন্তু আমার কুণ্ঠিত স্বভাবের জন্য তা আর কখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ আলোচনা

সন্ধ্যার পড়াশুনা শেষ করে অভ্যাসমত ভোলোদিয়ার ঘরে গিয়ে দেখি যে সে ডিভানের ওপর পা তুলে দিয়ে কনুইতে ভর রেখে একটা ফরাসী উপন্যাস পড়ছে। আমাকে দেখে পলকের জন্য চোখ তুলেই আবার সে তার পড়ায় মন দিল ; যদিও ব্যাপারটা ছিল খুবই সাধারণ—কিন্তু তাতেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। তার পলকের দৃষ্টিপাত যেন আমার কাছে জানতে চাইল, কি চাই এখানে ? আর পর-মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নেবার অর্থ হল—সেই চাহনির মানেটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা (যদিও ব্যাপারটা ছিল খুবই সাধারণ, তবু তারই মধ্যে একটা মানে খোঁজার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার সেই বয়সে)। আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা বই তুলে নিলাম। কিন্তু যখন সেটা পড়তে গেলাম, তখন হঠাৎ মনে হল, আমাদের দুজনের মধ্যে সারাদিনে একবারও দেখা হয়নি, সুতরাং এখন কোন কথা না বলাটা খুবই বিশ্রী ব্যাপার হবে। তাই বললাম, 'আজ সন্ধ্যায় বাড়িতেই থাকছ তো ?'

'ঠিক জানিনা, কেন ?'

'কিছু না এমনিই বলছিলাম।' কোন কথা শুরু করতে পারছি না বুঝতে পেরে চুপ করে বই পড়তে শুরু করলাম।

হঠাৎ বাইরে দুবকোভের গলা শোনা গেল, 'ভোলোদিয়া বাড়িতে আছ নাকি?'

পা দুটো নামিয়ে, বইটা টেবিলে রেখে ভোলোদিয়া উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আছি।'

কোট আর টুপি পরিহিত দুবকোভ ও নেখল্যুদভ ঘরে এসে ঢুকল।

'তুমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছ তো?'

ভোলোদিয়া বলল, 'না, আমার হাতে সময় নেই।'

'কী আশ্চর্য! চল চল।'

'তাছাড়া আমার তো টিকিটও নেই।'

'হলে গেলে যত খুশি টিকিট চাও, পাবে।'

'ঠিক আছে, দাঁড়াও, আসছি' বলে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ভোলোদিয়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি জানতাম ভোলোদিয়ার থিয়েটারে যাবার খুবই ইচ্ছে আছে, কিন্তু পকেটে পয়সা নেই বলে বিভিন্ন ওজর আপত্তি তুলছে; আর এখন গেল খানসামার কাছে পাঁচটা রুবল ধার পায় কিনা তা দেখতে।

'কেমন আছ, কূটনীতিবিদ?' বলে দুবকোভ আমার দিকে হাতটা বাড়াল।

ভোলোদিয়ার বন্ধুরা আমাকে কূটনীতিবিদ বলে ডাকত, কারণ একদিন খাওয়ার শেষে আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে বলতে দিদিমা বলেছিলেন যে বড় হলে ভোলোদিয়া হবে একজন সৈনিক আর আমি হব একজন কূটনীতিবিদ; আমার গায়ে থাকবে কালো কোট আর মাথায় এলোমেলো চুল—এটাই তার আশা।

নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল, 'ভোলোদিয়া গেল কোথায়?'

'আমি বলতে পারছিনা।' ভোলোদিয়ার ঘর ছেড়ে যাবার কারণটা সম্ভবতঃ ওরা অনুমান করতে পেরেছে এটা ভেবে আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

'মনে হচ্ছে ওর কাছে পয়সা নেই। কি কূটনীতিবিদ, তাই না?' আমার হাসিকে সম্মতিসূচক ধরে নিয়ে সে বলল, 'আমার কাছেও নেই। আর দুবকোভ, তোমার কাছে আছে?'

'দেখাই যাক।' বলেই দুবকোভ পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে অতি-সাবধানে কয়েকটা খুচরো পয়সা গুনতে লাগল। 'এই একটা পাঁচ কোপেক, আর এই হল একটা কুড়ি কোপেক—ছোঃ।' হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল সে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ভোলোদিয়া এসে ঘরে ঢুকল।

'তাহলে আমরা যাচ্ছি?'

'না।'

'কী আশ্চর্য লোক তুমি।' নেখল্যুদভ বলল, 'কেন স্বীকার করছ না যে তোমার হাতে পয়সা নেই? যদি চাও তো আমার টিকিটটা নিতে পার।'

'তারপর তোমার হবেটা কি?'

দুবকোভ বলল, 'ও ওর ভাইয়ের টিকিটে যাবে।'

'না, আমি যাব না।'

'কেন?'

'তুমি তো জান, আমি বক্সে বসে থিয়েটার দেখতে পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগে না; অস্বস্তি বোধ করি।'

'আবার সেই পুরনো ব্যাপার। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা,

যেখানে তোমাকে পেলে সবাই খুশি হবে সেখানে যেতে তোমার এত আপত্তি কেন? এটা একেবারেই অর্থহীন।'

'যদি আমার লজ্জা লাগে তো কি করব বল?' বেশ লজ্জিত হয়েই সে বলল, 'আমি জানি, তুমি জীবনে কখনও লজ্জা পাওনি, কিন্তু আমি সামান্য লজ্জাতেই লাল হয়ে যাই।'

ভুবকোভ বেশ মাতব্বরির স্বরে বলল, 'তোমার লজ্জার কারণটা কি জান? আসলে তুমি অত্যন্ত গর্বিত।'

'ঠিকই বলেছ, অহঙ্কারের আতিশয্যই বটে।' নেখল্যুদভ বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা আসলে একেবারেই উলটো—আমার মধ্যে অহঙ্কারের ছিঁটে ফোঁটাও নেই। সত্যি বলতে কি, আমার নিজেকে সবসময় মনে হয়, অন্যের পক্ষে আমি খুব বিরক্তিকর, অসহ্য—'

ভোলোদিয়ার কাঁধটা ধরে কোটটাকে টেনে খুলতে খুলতে ভুবকোভ বলল, 'জামাকাপড় বদলে নাও ভোলোদিয়া। ইগনেট তোমার মনিবকে সাজিয়ে দাও।'

তখনও নেখল্যুদভ বলে চলেছে, 'আর এরকম প্রায়ই আমার হয়—'

ভুবকোভ তার কথা আর শুনছে না। উলটে গলায় সুর ভাঁজতে শুরু করেছে, 'লা, লা, লা...'

'ওসব করে আমায় এড়িয়ে যেতে পারবে না,' নেখল্যুদভ বললে, 'আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেব যে লাজুকতা শুধু আত্মম্ভরিতা থেকেই আসে না।'

'এটা তুমি তখনই প্রমাণ করতে পারবে, যদি আমাদের সাথে যাও।'

'আমি বলেইছি তো, আমি যাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, তাহলে থাক, ঃ আর কূটনীতিবিদের কাছেই তা প্রমাণ কর; এবং আমরা যখন ফিরে আসব তখন ওর কাছ থেকেই না হয় ব্যাপারটা শুনে নেব।'

'হাঁ, তা-ই করব।' বাচ্চা ছেলের মত নেখল্যুদভ বলল. 'তোমরা তাড়াতাড়ি যাও, আবার ফিরে এস।' তারপর আমার পাশে বসে পড়ে বলল, 'তুমি কি মনে কর, আমি অহঙ্কারী?'

যদিও এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা মতামত ছিল, কিন্তু তার আকস্মিক প্রশ্নে এমন ঘাবড়ে গেলাম যে তার কথার উত্তর দিতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল।

এ কথা চিন্তা করে গলার স্বর কাঁপতে লাগল আর মুখ লাল হয়ে উঠল যে, এই হচ্ছে একটা চরম সুযোগ নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করার। তাই বললাম, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। আমি মনে করি মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী এবং এই অহঙ্কারবোধ থেকেই সে সব কাজ করে থাকে।'

নেখল্যুদভ বলল, 'তোমার মতে অহঙ্কারের সংগা কি?'

আমি বললাম, 'অহঙ্কার হচ্ছে একজনের এমন একটি বিশ্বাস যাতে কিনা সে মনে করে যে অন্য সবার থেকে তার জ্ঞান এবং ভালত্ব অনেক বেশি।'

'কিন্তু প্রত্যেকেই তা কি করে মনে করবে?'

'সত্যি মিথ্যে জানিনা, তবে দেখেছি, কেউই এটা স্বীকার করতে চায় না। যেমন, আমি ভাবছি দুনিয়ায় আর সবার থেকে আমার জ্ঞান অনেক বেশি, তেমনি এ কথাও জানি, তুমি ভাবছ, তুমিই হচ্ছ জগতে সব থেকে জ্ঞানী।'

নেখল্যুদভ বলল, 'না, অন্ততঃ আমি বলতে পারি, আমার জীবনে আমি

এমন অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, যারা আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী

আমি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'অসম্ভব।'

বেশ গভীর দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে নেখল্যুদভ বলল, 'তুমি কি সত্যিই তাই ভাব নাকি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটাকে প্রকাশ করে ফেললাম।

'আমি তোমাকে প্রমাণ দিচ্ছি। কেন আমরা নিজেকে অন্য সবার থেকে বেশি ভালবাসি? কারণ আমরা নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় উন্নত মনে করি, বেশি ভালবাসার যোগ্য বলে ভাবি। যদি আমরা অপরকে নিজেদের থেকে বেশি মূল্যবান বলে ভাবতাম, তবে তো তাদেরকেই বেশি ভালবাসতাম; কিন্তু তা তো কখনও হয়নি। আর তা যদি কখনও হয়ও, তবু আমার সিদ্ধান্তটাই হচ্ছে সঠিক।' বেশ আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে কথাটা শেষ করলাম।

নেখল্যুদভ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর অসাধারণ মিষ্টি হেসে বলল, 'আমি কখনও ভাবতেই পারিনি যে তুমি এতটা বুদ্ধিমান।' তার কথায় আমার মন আনন্দে নেচে উঠল।

প্রশংসা শুধু মানুষের অনুভূতিতেই নয়, মাথাতেও এমন ক্রিয়া করে যে তার প্রভাবেই সেদিন আমার মনে হল যে আমি যেন আরও বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, এবং সে কারণে আমার মাথায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একটার পর একটা চিন্তা উদয় হতে লাগল। অহঙ্কারের আলোচনা থেকে একসময় নিজেদের অজান্তেই আমরা চলে গেলাম প্রেমের আলোচনায়; এবং তাতে এমন নিমগ্ন হয়ে গেলাম যে অন্য কিছু খেয়ালই রইল না। অবশ্য অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি আমাদের সে আলোচনা শুনত তাহলে সে নিশ্চয়ই এটাকে নিতান্ত ফালতু ব্যাপার বলেই মনে করত। কারণ সেগুলো ছিল সত্যিসত্যিই একপেশে এবং অবাস্তব। কিন্তু তবুও তা আমাদের কাছে তখন মনে হয়েছিল অসাধারণ; সে মুহূর্তে আমরা চিন্তায় এমনভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে, কেউ একটু অন্য ধরনের কথা বললেই অন্যের বুকে তা ঝঙ্কার তুলছিল। একই সুরে কথা বলতে গিয়ে দুজনেই আনন্দ পাচ্ছিলাম। তবু মনে হচ্ছিল ভাষা এবং সময় যেন আমাদের সব কথাকে যথাযথ বলতে দিচ্ছিল না—পদে পদেই সে বাধা সৃষ্টি করছিল অভিব্যক্তির দুয়ার আটকে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বন্ধুত্বের শুরু

সেই সময় থেকে দিমিত্রি নেখল্যুদভের সঙ্গে আমার এক বিচিত্র মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। বাইরের মানুষজনদের সামনে সে আমাকে একেবারেই উপেক্ষা করত, কিন্তু যখনই দুজনে এক হতাম, তখনই কোন নির্জন জায়গায় বসে আলোচনা শুরু করতাম। তখন সময় পারিপার্শ্বিকতার দিকে নজরই থাকত না।

আমরা আলোচনা করতাম ভবিষ্যত জীবন, শিল্প, সরকারী চাকুরি, বিয়ে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে, আর কখনোই একথা মনে হত না যে আমরা যা কিছুই আলোচনা করছি, সেগুলো নিতান্ত প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাগুলো শুনতে লাগত বেশ চমৎকার, ফলে কোনদিনই মনে হয়নি যে ওগুলো অর্থহীন। যৌবনে প্রতিটি মানুষই জ্ঞানের মূল্য দেয় বিশ্বাস করে। সে সময় সবকিছুই ভবিষ্যতমুখী, আর তা এত বেশি আশা ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ থাকে যে

কেউই অতীতের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হয় না, চালিত হয় ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নের চিন্তায় বিভোর হয়ে। খলমলে ভবিষ্যতের কল্পনা অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করলে মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয় তা সত্যিই তুলনাহীন। আমাদের আলোচনার প্রধান দিকটাই ছিল বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান। কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে দুজনের আকাশে ভেসে যেতে কী ভালই না লাগত! বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্রুতবেগে একের পর এক নতুন চিন্তা আসত মাথায়। আর ক্রমান্বয়ে সেগুলো ভাবতে ভাবতে এমন আকারে পরিবর্তিত হয়ে যেত যে সবকিছুই মনে হত অস্পষ্ট। যা ভাবতাম তা বলতে পারতাম না, অথচ মনে হত যেন তা-ই বলছি—কিন্তু বলছি হয়ত তখন অন্য কথা। বলতে বলতে যখন সেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেত, তখন তার অসীমত্ব আর বিরাটত্বের কথা ভেবে মনে মনে খুবই আনন্দ পেতাম; এবং স্বীকার করতে বাধ্য হতাম তার অসম্ভবতাকে।

একবার কার্নিভালের সময় নেখল্যুদভ এমন আমোদ প্রমোদে মেতে উঠল যে কয়েকবার আমাদের বাড়িতে আসা সত্ত্বেও আমার দিকে একবারের জন্য নজর করারও সময় হল না তার; এবং এতে আমি এত বেশি রেগে গেলাম যে মনে হল সে আবার সেই পুরনো স্পর্ধিত অহঙ্কারী মানুষটিতেই পরিণত হয়ে গেছে। তখন মনে মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই সুযোগটার জন্য যখন কিনা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারব যে সে আমার দৃষ্টিতে খুব একটা কেউকেটা কিছু নয়, এবং তার সাহচর্য লাভের জন্যও আর আমি তেমন লালায়িত নই।

কার্নিভাল শেষ হয়ে গেলে প্রথম যেদিন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এল, সেদিন আমি তাকে বললাম যে আমাকে এখন পড়াশুনো করতে হবে, এবং সাথে সাথে ওপরে চলে গেলাম। কিন্তু মিনিট পনের পরেই দেখলাম যে পড়ার ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং নেখল্যুদভ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সে জানতে চাইল, 'আমি কি তোমার অসুবিধে ঘটাচ্ছি?'

যদিও বলতে চেয়েছিলাম যে আমি এখন খুবই ব্যস্ত, তবু বললাম, 'না।'

'তাহলে কেন তুমি ভোলোদিয়ার ঘর থেকে চলে এলে? কতদিন আমাদের দুজনের মধ্যে কথা হয়নি। আর এ ব্যাপারে আমি এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে মনে হচ্ছে কী যেন হারিয়ে ফেলছি।'

মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের বিরক্তি অন্তর্হিত হল, এবং দিমিত্রি আমার কাছে আবার সেই আগেকার মত দয়ালু এবং আকর্ষণীয় মানুষ রূপেই আবির্ভূত হল। আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে কেন আমি চলে এসেছি।'

আমার পাশে বসতে বসতে সে জবাব দিল, 'সম্ভবতঃ জানি। তবে সঠিক কিছু বলতে পারছি না; শুধু তোমার পক্ষেই তার জবাব দেওয়া সম্ভব।'

'বলছি; চলে এসেছি কারণ তোমার ওপর আমার রাগ হয়েছে—না, ঠিক রাগ নয়, বিরক্তি বলতে পার। সত্যি কথা বলতে কি, সবসময়ই আমার মনে হয় বয়সে তোমার থেকে অনেক ছোট বলে তুমি আমাকে যেন নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখ।'

আমার স্বীকারোক্তিতে খুব খুশি হয়ে মিষ্টি হেসে সে বলল, 'তুমি কি জান, কেন আমি তোমার সাথে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি? যাদের সঙ্গে আমার বেশি পরিচয়, বেশি মিল রয়েছে, তাদের ছেড়ে কেন তোমার কাছে বারবার আসি? জবাবটা আমি নিজেই পেলাম এইমাত্র। আর সেটা হচ্ছে তোমার এই

অসাধারণ গুণ—সরলতা।'

আমি স্বীকার করলাম, 'মনে মনে যে কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা পাই সেটাই আমি বাইরে বলে ফেলি অকপটে—তবে একমাত্র তাদের কাছেই, যাদের বিশ্বাস করি।'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করতে হলে তার আগে তো তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত; অথচ আমরা তো এখনও একে অপরের বন্ধু নই নিকোলাস। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, বন্ধুত্ব ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা একদিন আলোচনা করেছিলাম; যদি সত্যিকারের বন্ধুত্ব পাতাতে হয় তবে আগে পরস্পরকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন।'

আমি বললাম, 'এ বিশ্বাসটা অন্ততঃ থাকা দরকার যে আমি তোমাকে যে কথা বলব, তুমি কখনোই সে কথা অন্য কাউকে বলবে না। কিন্তু সব থেকে জরুরী, সব থেকে মজার চিন্তা হল সেগুলো—যেগুলো আমরা কেউই কাউকে বলতে পারি না।'

সে বলল, 'কী বিচিত্র চিন্তা! কিছু ভাবনা আছে, যা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই অথচ তা চিন্তা করতে সাহস হয় না মনে।' তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত দুটো ঘষতে ঘষতে মৃদু হেসে বলল, 'জান নিকোলাস, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়? একটা কাজ করা যাক, দেখবে এতে দুজনেরই উপকার হবে। আমরা দুজনেই দুজনকে কথা দিই যে একে অপরকে মনের সব কথা বলব; একে অপরকে জানব, এবং তারজন্য মোটেই লজ্জা পাব না। আর বাইরের কেউ কিছু জেনে ফেলছে, এ ভয় যাতে কারও মনে না থাকে সেজন্য এস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, "নিজেদের সম্পর্কে আমরা কখনও কাউকে কোন কথা বলব না।" আর এটাই এখন থেকে দুজনে করব।'

বাস্তবিকপক্ষে আমরা তাই করলাম, এবং তার ফলশ্রুতি কি হল তা বলছি।

কার বলেছেন প্রতিটি আকর্ষণেরই দুটো দিক রয়েছে: একজন ভালবাসে, অন্যজন সে ভালবাসা গ্রহণ করে; একজন চুমু খায়, অন্যজন গাল পেতে দেয় তারজন্য। কথাটা একেবারে খাঁটি; এবং আমাদের বন্ধুত্বে আমিই চুমু খেতাম আর দিমিত্রি এগিয়ে দিত তার গালখানা, তবে সেও তৈরি ছিল আমাকে চুম্বন করার জন্য। আমরা দুজনে সমানভাবে ভালবাসতাম, কারণ আমরা একে অপরকে জানতাম এবং সম্মান করতাম। কিন্তু তারজন্য আমার ওপর তার কর্তৃত্ব খাটানো এবং তার প্রতি আমার বশ্যতার মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

একথা সত্য, নেখলুদভের প্রভাবে পড়ে আমি নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে তার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিলাম। সে চিন্তাধারার মূল বক্তব্য ছিল, মানুষের চরিত্রের গুণই হচ্ছে আসল বস্তু; আর সে কারণে মনে করতাম যে, প্রতিটি মানুষেরই সবদা উচিত নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা; এবং সেই চেষ্টার মাধ্যমেই একদিন মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। মনে হত মানুষের সমস্ত দুঃখ, সব পাপ চিরকালের জন্য দূর করা সম্ভব, এবং এটা খুবই সহজ একটা ব্যাপার বলে বিশ্বাস করতাম।

একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, যৌবনের সেই উচ্চ আদর্শ সত্যিসত্যিই হাসির ব্যাপার ছিল কিনা, আর তা অপূর্ণ থাকার দায়দায়িত্বই বা কার ওপর বর্তাবে।

॥ সমাপ্ত ॥

পুনরুজ্জীবন

সেন্ট ম্যাথিউ, অষ্টাদশ অধ্যায়, একবিংশ খণ্ড : অতঃপর পিটার তাঁহার নিকট আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু, আর কতবার আমার ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধে পাপকার্য সংঘটিত করিলে, আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে? আরও সাতবার কি?

দ্বাবিংশ—যীশু তাঁহাকে বলিলেন : 'আমি তোমাকে সাতবার পর্যন্ত বলি নাই—বরং সত্তর গুণ সাতবার বলিয়াছি।'

সেন্ট ম্যাথিউ, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড : তুমি নিজ চোখের আলোকরশ্মি নিরীক্ষণ না করিয়া অযথা কেন ভ্রাতার চোখে ধূলিকণা দেখিতেছ?

সেন্ট জন, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তম খণ্ড : যিনি তোমাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্পাপ তিনিই সর্ব্বপ্রথম নারীর প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করুন।

সেন্ট লিউক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চত্বারিংশৎ খণ্ড : কদাচ শিষ্য প্রভুর ঊর্দ্ধে নহে, কিন্তু যিনি সত্য তিনিই তাহার প্রভু।

।। এক ।।

যদিও ছোট্ট এক টুকরো জমিকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টায় হাজার লোক জড়ো হয়ে, কচি ঘাসের ডগা উপড়ে, পাথরের চাঁই দিয়ে মাটির বুক ঢেকে, গাছ পালা কেটে, পশুপক্ষী তাড়িয়ে, কয়লা আর তেলের ধোঁয়ায় বাতাস ভরিয়ে তুলেছিল কিন্তু তবু সেখানে বসন্ত এল, এবং এল শহরেও।

কবোষ্ণ সূর্যের রশ্মি, মৃদুমন্দ বাতাস ; যেখানে একেবারে উপড়ে ফেলা হয়নি সেখানে গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট ঘাস,—পাথরের টুকরো আর পথের মাঝখানের জায়গাটুকুতে। বার্চ, পোপলার, আর বার্ড-চেরিগাছ মেলে ধরেছে তাদের আঠালো সুগন্ধি পত্রগুচ্ছ। লাইম গাছে বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির দল যেন ফেটে পড়তে চাইছে। বসন্তের আনন্দে মশগুল চড়ুই, কাক আর পায়রা—যে যার নীড় গড়াতে ব্যস্ত। মাছিগুলো পর্যন্ত সূর্যের আলোয় উষ্ণ হয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে ভনভন্ করে ঘুরে ফিরছে। সকলেই আনন্দে আত্মহারা— গাছগাছালি, পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ আর শিশুর দল। কিন্তু আশ্চর্য বয়স্ক মানুষেরা কিন্তু তাদের স্বভাব একটুও বদলাতে পারেনি ; তারা এখনও ঠকানো আর শাসনের কাজেই ব্যস্ত। বসন্তের এই পবিত্র সকাল তাদের কাছে মোটেই পবিত্র নয়, নয় তেমন গুরুত্বপূর্ণও। এমনকি সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই যে সৌন্দর্যের সমারোহ এরও কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। হৃদয়কে শান্তি, ঐক্য আর ভালবাসার পরশে রাঙিয়ে দেয় যে বসন্ত তার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তারা এখনও সেই ফন্দি-ফিকিরই এঁটে চলেছে, যে ফন্দি-ফিকিরে প্রভুত্ব খাটানো যায় অপরের ওপর।

পবিত্র বসন্তের এই যে মাধুর্য আর আনন্দ, তা কিন্তু গুবেনিয়া জেলে বন্দী মানুষ আর পশুদের জন্য মোটেই স্বাকৃতি পায়নি—বরং সেখানে উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো একটা রেজিস্ট্রি খামে ভরে এই আদেশই এসেছে যে, আজ ২৮শে এপ্রিল, সকাল নটায় জেলে আটক দুজন নারী এবং একজন পুরুষ (দুজন নারীর মধ্যে

একজন, যিনি প্রধান আসামী, তারসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করা হবে) বন্দীকে আদালতে হাজির করা হবে। তাই এখন, ২৮শে এপ্রিলের সকাল ৮টায়, দুর্গন্ধময় অন্ধকার প্রকোষ্ঠটা পেরিয়ে বড় জমাদার এসে ঢুকল জেনানা-ফটকে। তার মাথার চুল সাদা কোঁকড়ানো, মুখে ক্লান্তির ছাপ, ইউনিফর্মের হাতায় সোনালী ফিতে আঁটা, আর বেল্টে লাগানো রয়েছে নীল চুমকি।

ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ করে, লোহার তালা টেনে, সেলের দরজা খুলল জমাদার; আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাপটা বাতাস এসে আছড়ে পড়ল সেখানে। সে চিৎকার করে বলল, 'মাসলোভা, আজ আদালতে যেতে হবে।' তারপরই আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

এমনকি জেলের মধ্যেও মাটির বুক থেকে বিশুদ্ধ সঞ্জীবনী বাতাসকে বয়ে এনেছে বায়ু প্রবাহ। কিন্তু দরদালানে প্রথমবার যে আসবে, জীবাণুময় বাতাসে বয়ে নিয়ে আসা মল-মূত্র, আলকাতরা আর পচানির গন্ধে তাকে অতি অবশ্যই হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে হবেই। যদিও এই পচাটে গন্ধের সঙ্গে মেয়ে সিপাইটি অনেকদিন ধরেই পরিচিত তবু তার পক্ষেও যেন এটা অসহ্য বোধ হচ্ছে। কারণ এইমাত্র সে বাইরে থেকে ফিরেছে; তাই দালানটা পেরোতে গিয়েই তার মাথায় একেবারে ঝিম ধরে এল।

সেলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ব্যস্ততা, গলার স্বর আর হনহন করে চলাফেরার আওয়াজ।

মেয়ে সেপাই হাঁক দিল, 'এই, তাড়াতাড়ি কর।' এবং তার একটু পরেই একটি মাঝারি গড়নের যুবতী মহিলা, শরীরের ওপরের দিকটা সোজা রেখে, ধীর স্থির পদক্ষেপে দরজা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল জেল-অধিকর্তার সামনে। তার পরনে সাদা জ্যাকেট, ধূসর ঢিলে জামা আর ঘাগরা। পায়ে কয়েদির জুতো আর কাপড়ের মোজা; মাথায় বাঁধা রয়েছে সাদা একটা রুমাল; তার তল থেকে কয়েক গুচ্ছ চুল এসে ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর। দীর্ঘকাল যারা জেলের মধ্যে কাটাচ্ছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই এই মহিলাটির মুখের শুভ্রতা সত্যি এক বিস্ময়ের বস্তু। এ থেকে যেন এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, যত অন্ধকার কুঠুরিতেই আলুকে লুকিয়ে রাখা হোক না কেন, তার অঙ্কুর ঠিকই গজাবে। তার ছোট চওড়া হাত দুটো, চওড়া কলারে ঢাকা কোমল ঘাড়—সেই একই ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল; আর ঈষৎ তেরচা কালো চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি তার নির্জীব পাণ্ডুর মুখটার সাথে কেমন যেন বেমানান মনে হয়। বুকটাকে সোজা রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল সে; জেল-অধিকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাইল তার মুখের দিকে। এবার অপেক্ষা শুধু আদেশের।

সিপাই যখন দরজা বন্ধ করতে গেল, তখন সারা মুখে বয়সের বলিরেখা নিয়ে সাদা চুল ভর্তি মাথাটা দরজার মধ্য থেকে গলিয়ে দিয়ে এক বৃদ্ধা মাসলোভার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। কিন্তু সিপাইটি তার মাথাটাকে ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে দরজাটাকে আটকে দিল। সেল থেকে ভেসে এল একটি মহিলার হাসির শব্দ; সেদিকে তাকিয়ে মাসলোভাও হাসল। সেই বৃদ্ধা মহিলাটি দরজার ফুটোর মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে বেশ ভাঙ্গা গলায় বলল, 'মনে রেখ, ওরা যখনই তোমাকে জেরা করা শুরু করবে, তখন এক কথাই বারবার বলবে; যা প্রয়োজন নেই তেমন

কোন কথা বলবেই না।'

'ঠিক আছে, এখন যেমন আছি তার থেকে তো আর খারাপ কিছু হবার নেই। আমি শুধু চাই ব্যাপারটার যে ভাবেই হোক একটা ফয়সালা হয়ে যাক।'

বড় জমাদার বেশ হোমড়া চোমড়ার ভঙ্গিতে ঠাট্টার সুরে বলল, 'নিশ্চয়ই; তবে সেটা খালি একভাবেই মিটতে পারে। এবার চল তো।'

দরজার ফুটো থেকে বৃদ্ধা মহিলাটির চোখ দুটো অন্তর্হিত হল, এবং মাসলোভা বারান্দার মাঝখানটা ধরে এগিয়ে চলল। তার সামনে সামনে চলেছে বড জমাদার। বড পাথরের সিঁড়ি ভেঙে, বিশ্রী চিৎকার-চেঁচামেচিতে পরিপূর্ণ পুরুষদের সেল পেরিয়ে, দরজার ফুটো থেকে তাকিয়ে থাকা লোলুপ দৃষ্টির নাগাল অতিক্রম করে সে এসে অফিসে ঢুকল। অফিসের দরজার কাছটায় অপেক্ষা করছিল দুজন সিপাই, তাকে নিয়ে যাবে বলে। একজন কেরানি সেই সিপাই দুজনের একজনের হাতে তামাকের গন্ধওলা একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

সৈনিকটি নিঝ্‌নি নোভগোরোদের একজন কিষাণ; তার লালচে মুখে বসন্তের গুটিগুটি দাগ, সে কাগজটা কোটের আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বন্দিনীর দিকে এক পলক দৃষ্টিপাত করে সঙ্গিকে চোখ টিপল। সঙ্গিটির বাড়ি চুভাসে; তার গালের হাড দুটো বিশ্রী রকমের উঁচু। তারা দুজনে মিলে বন্দিনী মহিলাটিকে নিয়ে জেলের দরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল শহরের পথে।

গাডোয়ান, ব্যাপারী, রাঁধুনী, মজুর আর সরকারি কেরানির দল পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বন্দিনীর দিকে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কেউ কেউ মাথা নেড়ে মন্তব্য করল, 'একেই বলে পাপের ফল—একেবারে আমাদের উলটো, কোন চুলোয় যে নিয়ে যায়!' শিশুরাও থমকে দাঁড়িয়ে বেশ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ডাকাতিনীর দিকে চেয়ে রইল; সে যাতে কারও ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য তো সঙ্গে পাহারাই রয়েছে—এ কথা ভেবে মনে মনে বেশ স্বস্তিও পেল। একজন কিষাণ, কাঠকয়লা বেচে শহরে চা খেয়ে বাড়ি ফিরছিল, সে এমন দৃশ্য দেখে, বন্দিনীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিল। বন্দিনী লজ্জায় লাল হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

সবাই তাকেই দেখছে এটা বুঝতে পেরে, মাথাটাকে বিন্দুমাত্র না ঘুরিয়ে, আড়চোখে প্রত্যেককে সে একবার করে দেখে নিচ্ছে। এতে মনটাও বেশ খুশি হল। তাছাড়া তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও খুব ভাল লাগল। কিন্তু অনেকদিন ধরে পা দুটোর হাঁটায় অনভ্যস্থতা, তদুপরি রুক্ষ পাথরের ওপর জেলের পাতলা জুতো পায়ে চলতে হচ্ছে বলে সে সত্যিই খুব অসুবিধে বোধ করছে। তাই যতটা সম্ভব ধীরে, পাথর দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলছে। এক সরষে ব্যবসায়ীর দোকানের সামনা দিয়ে যাবার সময় তার পায়ে একটা পায়রার ছোঁয়া লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ডানা ঝাপটে তার কানের পাশে উডতে উডতে বাতাস করতে শুরু করল। তা দেখে সে হাসল, তারপর নিজের অবস্থার কথা মনে হতেই বেশ জোরে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

॥ দুই ॥

মাসলোভার জীবন কাহিনী খুবই সাধারণ। তার মা ছিল একজন পাড়াগেঁয়ে মহিলার অবিবাহিতা কন্যা। সে কাজ করত দুজন কুমারী জমিদারনীর মালিকানাধীন

একটি দুগ্ধশালায়। প্রতি বছরই তার একটি করে বাচ্চা হত। আর পাড়াগেঁয়ে লোকেদের যেমন হয়ে থাকে—এইসব অবৈধ সন্তানদের একবার ধর্মে দীক্ষিত করবার পর তাদের মা আর তাদের দিকে ফিরেও তাকায়না। এভাবেই তার পাঁচ পাঁচটি সন্তান মারা যায়। তারা প্রত্যেকেই ধর্মে দীক্ষিত হবার পর নিতান্ত খাদ্যের অভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং ষষ্ঠটিও, যার বাবা ছিল জিপসি, তাকেও প্রায় সেভাবেই মরতে হত; যদি না সে-সময় হঠাৎ একদিন সেই দুগ্ধশালার অধিকারিনী দুজনের একজন সেখানে আসত গন্ধযুক্ত মাখন পাঠাবার জন্য তার কর্মচারিনীদের বকাঝকা করতে। যুবতী মহিলাটি তখন তার সদ্যজাত চমৎকার স্বাস্থ্যবতী কন্যাটিকে নিয়ে গোয়াল ঘরে শুয়েছিল। এতে মালিকানীটি অন্যান্য কর্মচারিনীদের এই বলে বকাঝকা করল যে, যার এখনও আঁতুর চলছে তাকে কেন ওভাবে গোয়ালঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে। এটুকু বলেই সে বিদেয় হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ শিশুটির দিকে চোখ পড়ে যাওয়াতে মনে কেমন যেন মায়া জাগল : এগিয়ে গিয়ে প্রস্তাব করল, সে ওই মেয়েটির ধর্ম-মা হতে চায়। তারপর তার খাওয়া-দাওয়ার জন্য নিয়মিত কিছুটা দুধ আর খরচ-খরচা বাবদ কয়েকটা রুবল দিল, যাতে সে বেঁচে যেতে পারে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বয়স্কা মহিলারা বলল, 'তাহলে এটা বেঁচেই গেল।'

যখন বাচ্চাটির বয়স মাত্র তিন বছর তখন তার মা অসুখে ভুগে মারা গেল। এরপর তার দায়িত্ব নিল সেই ধর্ম-মা। ফলে তার দিদিমার দুশ্চিন্তাও কমল।

ছোট্ট কাজল-নয়না মেয়েটি ধীরে ধীরে অসামান্যা সুন্দরীতে পরিণত হল, এবং সাথে সাথে জয় করে নিল সেই মহিলা দুজনের হৃদয়। তাদের মধ্যে ছোট বোন, মেয়েটির ধর্ম-মা সোফিয়া ইভানোভনার স্বভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কোমল; কিন্তু বড় বোন মারিয়া ইভানোভনা ছিল একটু কাটখোট্টা ধরনের। সোফিয়া তাকে সব সময় সাজিয়ে গুজিয়ে রাখত, এবং সে যাতে ভবিষ্যতে একজন ভদ্ররমণীতে পর্যবসিত হতে পারে সেজন্য তাকে নিয়মিত লেখাপড়া শেখাতে লাগল। কিন্তু মারিয়া এটা পছন্দ করত না; সে চাইত মেয়েটিকে কাজকর্ম শিখিয়ে পুরোদস্তুর চাকরানী তৈরি করা হোক। সে কারণে সর্বদাই সে মেয়েটিকে অতিরিক্ত শাসন করত, এবং রেগে গেলে মাঝে মাঝে মারধোর করতেও মোটেই কসুর করত না। পরস্পরবিরোধী এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে বর্ধিত হতে হতে মেয়েটি শেষ অবধি আধা-চাকরানী আর আধা-ভদ্রমহিলায় পর্যবসিত হল। তাকে তারা কাত্যুসা বলে ডাকত; সেটা যদিও কাতেনকার মত শোনাত না, তবে কাতকার থেকে ভালই ছিল। সেলাই করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, চক দিয়ে আইকনের বাক্স পালিস করা, আর টুকিটাকি এটা ওটা করা—এই ছিল তার কাজ। তবে মাঝে মাঝে সেই মহিলা দুজনকে বই থেকে আবৃত্তি করেও শোনাত সে।

যদিও তার দু চারটে সম্বন্ধ এল কিন্তু কিছুতেই সে বিয়ে করতে রাজি হল না। কারণ, সে এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, যে-সব মেহনতি মানুষ আড়ালে আবডালে তাকে প্রেম নিবেদন করে তাদের কাউকে যদি সে বিয়ে করে তবে জীবনে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না।

এভাবে ষোলটা বছর কেটে গেল। অবশেষে একদিন তার ধর্ম মার ভাইপো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এক ধনী রাজপুত্র, পিসিমার কাছে বেড়াতে এল, এবং কাত্যুসা,

যদিও নিজের কাছেই একথা স্বীকার করতে ভয় পেল, তবু এটা সত্যি যে সে মনে মনে তাকে ভালবেসে বসল।

দু বছর পর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার পথে সেই ভাইপোটি আবার তার পিসিমার কাছে এসে চারদিন রইল, এবং যাবার আগের দিন রাতে, কাত্যুসার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তার হাতে এক শ রুবলের একটা নোট দিয়ে বিদায় নিল। এরপর পাঁচটা মাস কাটতে না কাটতেই কাত্যুসা বুঝতে পারল যে সে গর্ভবতী।

ধীরে ধীরে সব ব্যাপারেই তার বৈরাগ্য দেখা গেল; তখন শুধু একটা-ই তার চিন্তা মাথায় গিজগিজ করছে—কিভাবে এই লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঘরের কাজকর্মেও তার মনোযোগ কমে গেল, এমনকি মালিকানীর প্রতি ব্যবহারেও সে বেশ রুক্ষ হয়ে উঠল। শেষে একদিন অবস্থা বেশ চরমে পৌঁছল, এবং যদিও তার জন্যে পরে মনে মনে সে খুবই অনুতাপ বোধ করেছিল, কিন্তু তবু মনস্থ করল যে সে বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে, এবং তারজন্য মালিকানীদের কাছে প্রার্থনাও জানাল। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। এরপর সে এল এক পুলিশ কর্মচারীর বাড়িতে—চাকরানীর কাজ করতে। কিন্তু সেখানে তিনমাসের বেশি টিঁকতে পারল না—কারণ, পঞ্চাশ বছরের পুলিশ-কর্মচারীটি এরমধ্যেই তার পিছে লাগা শুরু করে দিয়েছে। শেষে তার বাড়াবাড়ি যখন চরম মাত্রায় পৌঁছল তখন কাত্যুসা একদিন তাকে 'নির্বোধ' 'বুড়ো শয়তান' বলে গাল দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে; ফলে তাকে ছাঁটাই হতে হল চাকরি থেকে। এরপর আর কোন কাজের খোঁজ করাটাও ছিল অর্থহীন—কারণ ওদিকে তখন তার প্রসবের সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। তাই সে গিয়ে আশ্রয় নিল এক চোলাই মদের কারবারি গ্রাম্য ধাইয়ের কাছে। সেখানে প্রসব-কর্ম সহজেই সমাধা হল, কিন্তু ধাইয়ের গায়ে কালাজ্বর থাকায় তার ছোঁয়ায় কাত্যুসা এবং তার বাচ্চাটিও আক্রান্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে শহরের হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু যে বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সে এসে খবর দিল যে বাচ্চাটিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

ধাইয়ের কাছে যাবার সময় কাত্যুসার কাছে ছিল মোট একশ সাতাশ রুবল। এরমধ্যে সাতাশ রুবল সে নিজে রোজগার করেছিল আর বাকি একশ রুবল পেয়েছিল তার সতীত্ব-হননকারীর কাছ থেকে। কিন্তু যখন সে ধাইয়ের বাড়ি ছেড়ে এল তখন তার হাতে রয়েছে মাত্র ছ রুবল। কিভাবে অর্থ সঞ্চয় করতে হয় তার বিন্দু-বিসর্গও সে জানত না; কেউ হাত বাড়িয়ে চাইলেই হল—অমনি কাত্যুসার হাত উপুড়। দু মাসের থাকা-খাওয়া আর দেখাশোনার জন্য ধাই নিল চল্লিশ রুবল, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে ভর্তি করা বাবদ গেল পঁচিশ রুবল, আর ধাই একটা নতুন গরু কিনবে বলে ধার নিল চল্লিশ রুবল, তাছাড়া আরও কুড়ি রুবল খরচ হয়ে গেল কাপড় চোপড়, মিষ্টি আর এটা-সেটা কিনতে। ফলে হাতে আর তার কিছুই রইল না; সুতরাং আবার তাকে বেরোতে হল কাজের সন্ধানে, এবং এক বন-অধিকর্তার বাড়িতে কাজ জুটেও গেল। যদিও ভদ্রলোক বিয়ে-থা করা ঘর-সংসারী মানুষ ছিল তবু সেও প্রথম দিন থেকেই কাত্যুসার পেছনে লাগতে শুরু করে দিল, আর কাত্যুসাও চেষ্টা করল তাকে এড়িয়ে চলবার। অবশ্য মনিব হিসেবে তার অধিকার ছিল কাত্যুসাকে যে-কোন জায়গায় পাঠাবার,

কিন্তু সে তা করল না, বরং একদিন ঘরের মধ্যেই তাকে ধর্ষণ করল। ব্যাপারটা লোকটির স্ত্রীর নজরে এল; সঙ্গে সঙ্গে সে এবং অন্যান্যরা মিলে ক্যাতুসা ও সেই লোকটিকে একটা ঘরে বন্ধ করে পিটতে শুরু করে দিল। ক্যাতুসা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল; ফলে তাকে একমাসের মাইনে না নিয়েই বিদায় হতে হল। এবার গিয়ে সে উঠল তার এক মাসীর কাছে—শহরে। তার মেসোর একসময় বই বাঁধাইয়ের কারবার ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা খদ্দেরের অভাবে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে তিনি সারাদিন মদ্যপান করে কাটান, আর এদিক-ওদিক করে যা-ও দু চার পয়সা পান, তা-ও উড়িয়ে দেন জুয়োতে।

মাসীর ছোট্ট একটা কাপড়-কাচার ব্যবসা ছিল, তা থেকে যা সামান্য আয় হত তাতেই কোন রকমে চলে যেত তাদের দিন। সে কাত্যুসাকে ধোপানীর কাজ দিতে চাইল, কিন্তু তার অধীনস্থ অন্যান্য ধোপানীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে কাত্যুসা তাতে রাজি হল না, এবং কর্মসংস্থান দপ্তরে চাকরির দরখাস্ত করল। সেখান থেকে এক মহিলার কাছে কাজ পাওয়া গেল; মহিলাটি তার দুটি ছেলেকে নিয়ে থাকেন—তারা দুজনেই জিমনাসিয়ামের ছাত্র। কাত্যুসা একসপ্তাহ পরে কাজে যোগদান করল; আর সাথে সাথে ভদ্রমহিলার বড় ছেলেটি, যার সারা মুখ জুড়ে ছিল বিরাট গোঁফ, সে পড়াশুনো চুলোয় তুলে রেখে কাত্যুসার পেছন পেছন ঘোরা শুরু করে দিল। ফলে অচিরেই তাকে আবার চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হল।

এরপর বহু চেষ্টা চরিত্রের পরও কোন কাজ যোগাড় করে উঠতে না পারায় সে আবার গিয়ে হাজির হল সেই কর্মসংস্থান কেন্দ্রে। সেখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার আলাপ হল। মহিলাটির নিরাবরণ হাতে ছিল ব্রেসলেট আর সবকটা আঙুলেই একটা করে আংটি। কাত্যুসার কাজের খুবই প্রয়োজন শুনে সে তাকে তার বাড়িতে আসতে বলল। কাত্যুসা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলে পর মহিলাটি তাকে বেশ খাতির যত্ন করল; কেক, মিষ্টি আর মদ দিল; শেষে চাকরের হাতে একটা চিরকুট লিখে কার কাছে যেন পাঠাল। সন্ধ্যা বেলা ধূসর চুল আর সাদা দাড়িওলা বেশ লম্বা একজন মানুষ এসে ঢুকল ঘরে, এবং সোজা এসে বসল কাত্যুসার একেবারে ঠিক পাশটাতে আর তার দিকে চিক্‌চিকে চোখে তাকিয়ে বেশ হাসিমস্করা শুরু করে দিল। মহিলাটি এরপর তাকে নিয়ে ভেতরের ঘরে গেল, এবং কাত্যুসা শুনল সে তাকে বলছে, 'একেবারে গ্রাম থেকে আসা তাজা মাল।' তারপর মহিলাটি কাত্যুসাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলল যে সেই লোকটি একজন লেখক, পয়সাকড়িও আছে প্রচুর, এবং একবার যদি তাকে তার মনে লেগে যায় তবে আর কোনকিছু দিতেই সে কার্পণ্য করবে না। সত্যিসত্যিই তাই হল; লোকটা প্রথম দেখাতেই তাকে পঁচিশটা রুবল দিল, এবং বলল যে মাঝে মাঝেই সে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যাবে। তা থেকে কাত্যুসা মাসীকে কিছুটা দিল খাওয়া থাকার জন্য, বাকিটা খরচ হয়ে গেল পোশাক-আশাক আর টুপি কিনতে। এর কিছুদিন পরেই সেই লেখকটি আবার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পঁচিশটা রুবল দিয়ে আলাদা থাকার প্রস্তাব করল।

লেখকটি কাত্যুসার জন্য যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল তার ঠিক পাশের ঘরটাতেই থাকত একটি বেশ হাসিখুশি যুবক দোকান-কর্মচারী—কদিনের মধ্যেই কাত্যুসা তার প্রেমে পড়ে গেল। সে ব্যাপারটা লেখককে বলল, এবং কদিন পরেই

নিজস্ব একটা ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে উঠল। সেই দোকান কর্মচারীটি, যে তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে কি একটা ব্যবসায়ের ছুতো দিয়ে কাত্যুসাকে একেবারে কিছু না বলেই নিঝ্নি নোভগোরোদে চলে গেল, আর কাত্যুসা পড়ল একেবারে অগাধ জলে। তবু সে স্থির করল, এবার থেকে একাই থাকবে এ বাড়িতে; কিন্তু পুলিশ এসে জানাল একা থাকতে হলে অতি অবশ্যই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে পতিতাদের ছাড়পত্র নিতে হবে। ফলে বাধ্য হয়েই সে আবার ফিরে গেল তার মাসীর কাছে। তার পরিধানে এমন সুন্দর পোশাক-আশাক দেখে মাসী আর তাকে ধোপানীর কাজ দিতে রাজি হল না। কারণ, তার ধারণা হল যে তার বোনঝি বেশ বড়লোক হয়ে গেছে, সুতরাং তাকে আর ওসব কাজে মানাবে না। ধোপানীর কাজ করবে কি করবে না, তা নিয়ে কাত্যুসা আর মোটেই মাথা ঘামাল না, কারণ, সে দেখেছিল কী অগাধ পরিশ্রম করতে হয় ধোপানীদের। যে ঘরে তারা কাজ করত সেটা ছিল ভয়ঙ্কর গরম, ময়লা আর অস্বাস্থ্যকর। ধোপানীদের অনেকেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিল। সে ভাবল, ও কাজ করলে তার ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি হবে।

সেই চরম দুর্দিনে কাত্যুসাকে রক্ষা করবার জন্য কেউই এগিয়ে এল না, অবশেষে একজন যোগানী এসে তাকে বাঁচাল।

বেশ কিছুদিন ধরেই কাত্যুসা সিগারেট টানা শুরু করেছিল, কিন্তু সেই দোকান কর্মচারীটি তাকে ছেড়ে যাবার পর সে মদ খাওয়া ধরল। অবশ্য মদ তাকে মোটেই আকৃষ্ট করত না, কিন্তু যেহেতু তা দুঃখ ভুলে যেতে সাহায্য করত, নিজেকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবার সুযোগ দিত, এবং নিজের ওপর বিশ্বাস জাগাত, তাই সে তা খেত। সাধারণ অবস্থায় কখনোই সে এ সুখ অনুভব করতে পারত না। মদ ছাড়া তার নিজেকে মনে হত দুঃখী আর ধিক্কৃত।

সেই যোগানীটি তাকে বিভিন্ন রকমের রসানো খাবার এনে দিত। কাত্যুসা যখন মদ গিলত তখন সে তাকে এই বলে লোভ দেখাত যে তার জন্য বিরাট একটা প্রতিষ্ঠানে সে কাজ যোগাড় করে দেবে, আর সেই প্রতিষ্ঠানের নানান সুযোগ সুবিধেগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করত বেশ বসিয়ে বসিয়ে। কাত্যুসার সামনে তখন শুধুমাত্র দুটোই পথ খোলা রয়েছে। হয় চাকরিতে ঢুকে, পুরুষদের আকর্ষণে তিতিবিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে অবৈধ মিলনে অংশগ্রহণ করে মর্যাদাহানীকরভাবে জীবন যাপন করা, নয়ত, খোলাখুলিভাবে আইনসিদ্ধ পথে মোটা টাকার বিনিময়ে সোজাসুজি ব্যভিচার। এবং সে দ্বিতীয় পথটাকেই নিজের জীবিকা হিসেবে বেছে নিল। আর মনে মনে ভাবল এভাবেই তার পক্ষে সেই ধর্ষণকারী, প্রতারক দোকান কর্মচারী, এবং অন্য যারা তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে তাদের প্রত্যেকের ওপরই প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। তাছাড়া যোগানীর বিভিন্ন লোভ-জাগানো কথা-বার্তাতেও সে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করল। কল্পনায় দেখল, কালো ভেলভেটের কারুকরা হলুদ সিল্কের ছোট হাতা, ছোট কলারওলা পোশাক পরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপর আর নিজেকে সংযত রাখা তার পক্ষে সম্ভব হল না; এবং নিজের ছাড়পত্রটাকে সে জমা দিয়ে দিল। ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই যোগানী একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল, এবং কাত্যুসাকে নিয়ে গিয়ে তুলল মাদাম কিতায়েভার কুখ্যাত বেশ্যালয়ে।

সেদিন থেকেই মানবীয় এবং স্বর্গীয় কানুনের বিরুদ্ধে পরিচালিত, এমন এক জীবন কাত্যুসা মাসলোভাকে মেনে নিতে হল, যা শুধু তাকেই নয় আরও হাজার হাজার নারীকে মেনে নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, আর সরকারকেও তা বাধ্য করেছে তার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য মেনে নিতে। এ হচ্ছে এমন এক জীবন, যার ফল হিসেবে প্রতি দশটি নারীর মধ্যে নজনকেই মারা যেতে হয় জঘন্য রোগের কবলে পড়ে।

রাতের ব্যাভিচারে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয়। তারপর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সোডা আর কফিতে নোংরা হওয়া বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয় অতি অবশ্যই; এরপর শুরু হয় গাউন আর জ্যাকেট গায়ে সারা ঘর জুড়ে পায়চারি, পর্দা ঘেরা জানলার ফাঁক থেকে পথের দিকে আলগোছে দৃষ্টিপাত, আর এর ওর সঙ্গে অকারণে ঝগড়া। অবশেষে আবার সেই সাজগোজ পোশাক-আশাক পরা, গায়ে আর চুলে তেল ঘষা, নিজেদের ব্যাপার নিয়ে বাড়ি-য়ালীর সঙ্গে ঝগড়া, আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মুখে রঙ মাখা, ভ্রূ আঁকা আর গুরুপাক মিষ্টি খাওয়া। তারপর চটকদার সিল্কের পোশাক পরে শরীরের যতটা অংশ নগ্ন করে রাখা যেতে পারে, তার চেষ্টা করা; এবং সে চেষ্টা সমাপন হলে বৈঠকখানা ঘরে এসে জমায়েত হয়ে নাগরদের জন্য প্রতীক্ষা করা। একে একে তাদের আসা শুরু হবে। তারপর জমবে নাচ-গানের আসর—শেষে কোনরকম বাছবিচার না করে যার-তার সাথে শোয়া—বুড়ো, মাঝ-বয়সী, ছোকরা, বিবাহিত, অবিবাহিত, ব্যবসায়ী, কেরানি, আর্মেনীয়, ইহুদি, তাতার, বড়লোক, গরিব, রোগা, মোটা—সবার সঙ্গে। হিসেবী, বেহিসেবী, মাতাল, চোয়াড়ে, নরম, সৈনিক, নাগরিক, ছাত্র, আবার স্কুলের বাচ্চা ছেলে—সব শ্রেণীর, সব বয়সের, সব ধরনের, সব চরিত্রের লোক। আর এর সঙ্গে রয়েছে চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোর, ঝগড়া-মারামারি, বাজনা, মদ আর তামাকের গন্ধ। সেই সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকালের আগে পর্যন্ত এতটুকুও বিশ্রাম নেই। তারপর শুরু হয়—ঘুম, অসাড় ঘুম। সারা সপ্তাহ এই একই রুটিন। শেষে সরকারি কানুন অনুযায়ী সপ্তাহ শেষে একদিন গিয়ে হাজিরা দিতে হয় পুলিশ চৌকিতে। সেখানে নিয়ম মেনে, কিংবা অনিয়মেই ডাক্তার আর পুরুষ কর্মচারীর দল পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেয়। এই পরীক্ষার সময় মানুষ তো দূরের কথা, জন্তুদেরও সম্ভ্রম রক্ষার যে অধিকার আছে, সেটুকুও পর্যন্ত গ্রাহ্য করা হয়না। তারপর আবার শুরু হয় সেই সাপ্তাহিক কর্মসূচি। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, কাজের দিন নেই, ছুটির দিন নেই—শুধু আছে সেই একঘেয়ে জঘন্য রাত, রাত আর রাত।

এভাবেই কাত্যুসা মাসলোভার জীবনের সাত সাতটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যেই সে দু একবার ডেরা পালটেছে—কখনও একটু সামনে, কখনও একটু পেছনে, আর একবার গিয়েছিল হাসপাতালে। বেশ্যালয়ে সাতটা বছর কাটবার পর, তার ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য তাকে যেতে হল জেলে। দমবন্ধ হয়ে আসা জেলে চোর আর খুনীদের সঙ্গে তিন তিনটে মাস অতি-বাহিত করার পর আজ সেই অপরাধের বিচারে জন্যই তাকে যেতে হচ্ছে আদালতে।

॥ তিন ॥

দুজন সৈনিকের পাহারায়, একটানা হেঁটে এসে, মাসলোভা যখন বিরাট আদালত-গৃহে উপস্থিত হল, তখন ওদিকে তার সতীত্ব-হননকারী রাজকুমার দিমিত্রি

ইভানভিচ নেখল্যুদভ যদি আঁটা প্রিংয়ের খাটের ওপর পালকের বিছানায় শুয়ে ঘোপ ভাঙ্গা রাতের পোশাক পরে সিগারেট হাতে নিয়ে ভেবে চলেছে আজ তাকে কি কি করতে হবে, আর গতকালই বা সে কি করেছে।

ধনী অভিজাত পরিবার কোরচাগিনদের সঙ্গে গতকালের সন্ধ্যাটা কিভাবে কেটেছে সে কথা তার মনে পড়ল। সবাই ভাবছে, সে নাকি ওদের বাড়ির একটি মেয়েকে বিয়ে করবে। কথাটা মনে হতেই সে তার হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপোর বাক্সটা থেকে আর একটা সিগারেট বার করতে গেল। কিন্তু কি মনে হতে হঠাৎ মোলায়েম চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে, মাংসল কাঁধের ওপর সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা ফেলে দ্রুত গিয়ে ঢুকল সাজঘরে। সেখান থেকে ও ডি কোলোন আর চুলের তেলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। দামী মাজন দিয়ে দাঁত মেজে, গন্ধওলা তোয়ালেতে মুখ মুছে, সুগন্ধী সাবানে হাত ধুয়ে, নখগুলো সাফ করে, মার্বেল পাথরের বেসিনে মুখ আর গর্দান ভিজিয়ে যে কামরাটায় ফোয়ারার ব্যবস্থা আছে সেখানে গেল। ফর্সা সুগঠিত শরীরটা ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে একেবারে শুকনো করে মুছে, ভেতরের জামাকাপড় পরে, পায়ে জুতো গলিয়ে, আয়নার সামনে বসে ছোট কালো দাড়ি আর কোঁকড়া চুলগুলো, যা কপালের দিকে বেশ পাতলা হয়ে গেছে—সেগুলো বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ে নিল।

যতরকমের জিনিস সে ব্যবহার করে—প্রসাধন, পোশাক, জুতো, টাই, কারুকার্য করা জামার বোতাম—সবকিছুই উঁচুদরের মার্জিত অথচ সাদাসিধে; টেকসই আবার দামীও বটে।

দশ রকম টাই আর পিনের যেটাতেই তার প্রথম হাত পড়ল সেটাই সে টেনে নিয়ে পরল। অথচ এক সময় ছিল যখন সে সবকিছু বেশ বাছাই করে তারপর পরত, কিন্তু এখন এ-ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন।

চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা সুগন্ধী আতর লাগানো পরিষ্কার পোশাকটা নেখল্যুদভ তার গায়ে চড়িয়ে নিয়ে সোজা চলে গেল খাবার ঘরে। এই পোশাকে তাকে যতটা তাজা দেখাবার কথা ততটা কিন্তু মোটেই দেখাল না। খাবার ঘরের মেঝেটা আগের দিনই তিন তিনটে লোক মিলে পালিশ করেছে; তার মাঝখানটায় রয়েছে সিংহের থাবার মত পায়াওলা একটা চমৎকার টেবিল; আর লম্বাটে ঘরটার সম্পূর্ণ একটা পাশ জুড়ে রয়েছে একটা সাইড-বোর্ড। বিরাট কারুকার্য করা দামী কাপড়ে ঢাকা টেবিলটার ওপরে রয়েছে একটা কফি ভর্তি রূপোর পাত্র, একটা চিনির পেয়ালা, একটা গরম ক্রিমের বাটি, আর একটা পাউরুটির ঝুড়ি—তাতে সাজানো রয়েছে রোল, রাস্ক আর বিস্কুট। তার ঠিক পাশটাতে রয়েছে সেদিনকার খবরের কাগজটা আর একগুচ্ছ চিঠি।

নেখল্যুদভ সবে চিঠিপত্রগুলো দেখতে যাবে, এমন সময়, শোকের পোশাক পরে, মাথার লম্বাটুপিতে সিঁথি ঢেকে, একটি মধ্যবয়স্কা বেশ বলিষ্ঠ শরীরের মহিলা সে ঘরে ঢুকল। এ হচ্ছে নেখল্যুদভের মার প্রাক্তন চাকরানী আগ্রাফেনা পেত্রোভনা। কিছুদিন আগে তার মনিবানীর মৃত্যু ঘটেছে এবং তারপর থেকে সে তার ছেলের গৃহকর্ত্রী হয়েই এ বাড়িতে রয়ে গেছে।

আগ্রাফেনা বিভিন্ন সময়ে নেখল্যুদভের মার সাথে প্রায় দশবছর বিদেশে কাটিয়েছে; তাকে দেখতে-শুনতে এবং আচার-ব্যবহারে একেবারে ভদ্রঘরের

মহিলাদের মতই। তার ছোটবেলা থেকেই সে নেখল্যুদভের সঙ্গে রয়েছে, এবং দিমিত্রি ইভানোভিচকে যখন মিতেনকা বলে ডাকা হত তখন থেকে সে তাকে চেনে।

'সুপ্রভাত, দিমিত্রি ইভানোভিচ।'

'সুপ্রভাত আগ্রাফেনা পেত্রোভনা; এটা কি?' নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল।

'রাজকুমারীদের চিঠি—হয় মা লিখেছে, কিংবা তার মেয়ে। ওদের চাকরানী কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে এসেছে, এবং এখন আমার ঘরে অপেক্ষা করছে।' বেশ অর্থব্যঞ্জক হাসি হেসে আগ্রাফেনা চিঠিগুলো তার হাতে দিল।

আগ্রাফেনার হাসি লক্ষ্য করে দিমিত্রি ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে দেখছি।'

এ হাসির অর্থ, এ চিঠিটা লিখেছে ছোট রাজকুমারী কোরচাগিনা, যাকে কিনা দিমিত্রি বিয়ে করবে বলে আগ্রাফেনা বিশ্বাস করে। আগ্রাফেনার এমন বিশ্বাসে নেখল্যুদভ মনে মনে বেশ বিরক্ত।

'তাহলে ওকে অপেক্ষা করতে বলি গিয়ে।' বলে আগ্রাফেনা ব্রাসটা যথাস্থানে তুলে রেখে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নেখল্যুদভ চিঠিটা খুলে পড়তে বসল। ধূসর রঙের কাগজের ওপর বাঁকা বাঁকা অক্ষরে সেটা লেখা; তার ধারগুলো বেশ খসখসে। তাতে লেখা হয়েছে:

'তোমার স্মৃতি-শক্তি হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার এই অধিকারটুকু নিচ্ছি যে, আজ ২৮শে এপ্রিল আইন আদালতে জুরি হিসেবে তোমার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এর ফলে তোমার পক্ষে কোন মতেই আমাদের এবং কোলসভের সঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনীতে যাওয়া সম্ভব হবে না—যদিও তোমার চপলমতিত্বের অভ্যাসবশতঃ গতকাল সেই শপথই করেছিলে। কিন্তু আদালতে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ার অপরাধে তোমার ওপর ৩০০ রুবল পর্যন্ত জরিমানার আদেশ হতে পারে—গতকাল তুমি চলে যাবার পরই আমার এ কথাটা খেয়াল হয়েছে, সুতরাং যেতে ভুলো না।

রাজকুমারী ম. কোরচাগিনা'

পেছনের পাতায় পুনশ্চ দিয়ে লেখা হয়েছে:

'মার জন্য তোমাকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এবং আসার সময় অতি অবশ্যই সতর্ক হয়ে আসবে।' ম. ক'

নেখল্যুদভ মুখ বাঁকাল। গত দুমাস ধরে যেসব নিপুন কায়দায় তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর জালে জড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয় বাঁধনে বাঁধবার জন্য প্রয়াস চালিয়ে চলেছে রাজকুমারী কোরচাগিনা এটা হল তারই মধ্যে অন্যতম একটা। গভীর প্রেমে না পড়লে পুরুষেরা যৌবন পেরিয়ে বিয়ে করতে ইতস্ততঃ করে যেসব কারণে, নেখল্যুদভ বিয়ে করবেন ঠিক করেও যে সে প্রস্তাব এখনও পাঠাচ্ছেন না, তার পেছনেও রয়েছে এমনই কিছু কারণ। তবে সে কারণ এ নয় যে দশ বছর আগে মাসলোভার সতীত্বনাশের স্মৃতি এখনও তার অন্তরকে নাড়া দিচ্ছে; বরং বলা চলে ওসব কথা সে ভুলেই গেছে। তবে আসল কারণ যেটা তা হচ্ছে একটি বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়। অবশ্য সে নিজে মনে করে যে সেসব সম্পর্ক অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, মহিলাটি তা কিছুতেই মেনে নিতে চাইছে না।

মেয়েদের সংস্পর্শে এলে নেখল্যুদভ বেশ লাজুক হয়ে পড়ত; আর এই লাজুকতার জন্যই সেই বিবাহিতা মহিলাটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহিলাটির স্বামী ছিল মার্শাল দ্য নেবেল—যাকে সরাবার জন্য নেখল্যুদভ বিপক্ষে মতদান করেছিল। সেই নেবেলের স্ত্রীই তাকে ক্রমাগত কাছে টানে, এবং সে-ও নিজেকে তার সঙ্গে দারুণভাবে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু পরে ব্যাপারটা তার নিজের কাছেই বেশ বিরক্তিকর বলে বোধ হতে থাকে, সে নিজেকে ভাবতে থাকে অপরাধী হিসেবে। অথচ তার সাথে কথা না বলেই যে সবকিছু চুকিয়ে দেবে সে সাহসও তার হয় না। আর এ কারণেই, যথেষ্ট ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে রাজকুমারী কোরচাগিনের কাছে কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাব করে উঠতে পারছে না।

চিঠিগুলোর মধ্যে একটা সেই মহিলাটির স্বামীর কাছ থেকে এসেছে। হাতের লেখা আর ডাকঘরের ছাপ দেখেই নেখল্যুদভ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হল তার দেহের শক্তি যেন বেড়ে গেল; সাধারণতঃ কোনরকম বিপদের আভাস পেলেই তার এরকমটা হয়ে থাকে।

কিন্তু এই উত্তেজনা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। যে জেলায় তার জমিদারি রয়েছে সেখানকার শাসক মার্শাল দ্য নেবেল নেখল্যুদভকে চিঠি লিখেছেন একথা জানিয়ে যে মে মাসের শেষ দিকে সেখানে বিশেষ সভা বসবে, এবং সে সভায় বিদ্যালয় ও পাঠাগার নিয়ে যে বিতর্ক হবে তাতে যেন সে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে, কারণ, প্রতিক্রিয়াশীল দলের কাছ থেকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্শাল একজন উদারনৈতিক চরিত্রের মানুষ, নিজের মতে বিশ্বাসী লোকজনদের নিয়ে তিনি তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে যে প্রতিক্রিয়ার শাসন চলছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন; এবং সে সংগ্রামে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন যে, নিজের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেননি।

নেখল্যুদভের মনে পড়ল এই মানুষটার সংস্পর্শে থেকে কী সব মারাত্মক দিন কাটাতে হয়েছে তাকে। মনে পড়ল, একদিন সে নিজে ভেবেছিল যে ওই ভদ্রলোক হয়ত তাকে দেখে ফেলেছে, এবং তা মনে করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে যাচ্ছিল, এবং ঠিক করে ফেলেছিল কীভাবে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে তাকে ভয় দেখাবে। আবার আর একদিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন মহিলাটি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল পুকুরে গিয়ে ডুবে মরবে বলে—এবং সে নিজেও ছুটে চলেছিল তার পিছু পিছু।

নেখল্যুদভ ভাবল, 'আমি এখন যেতে পারব না, এবং যতক্ষণ না তার কাছ থেকে জানতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করতে পারব না।' এক সপ্তাহ আগে সে তাকে একটা মীমাংসাসূচক চিঠি লিখে, নিজের পাপ স্বীকার করে জানিয়েছে যে এরজন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত। আর তাতে এ-ও লিখেছে যে এরপর আর তাদের দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্কই থাকছে না এবং এটা সে করছে 'তার ভালর জন্যই।' কিন্তু এখন পর্যন্ত সে চিঠির কোন জবাব আসেনি। নেখল্যুদভ ভাবল, এটা ভাল লক্ষণ। যদি সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে সে অরাজি হত তবে এতদিনে নিশ্চয় একটা জবাব আসতই—যেমন আগের বারগুলোতে এসেছিল। নেখল্যুদভ কানাঘুষোয় শুনেছে, কোন একজন সামরিক কর্মচারীর ওপর নাকি এবার তার নজর

পড়েছে ; তাই সে আশা করছে, হয়ত এতদিন পরে এই মিথ্যার জাল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

পরের চিঠিটা এসেছে তার দেওয়ানের কাছ থেকে। সে লিখেছে যে, তাকে অতি অবশ্যই জমিদারির সত্ত্ব বজায় রাখার জন্য সেখানে পরিদর্শনে যেতে হবে, এবং গিয়ে ঠিক করতে হবে, এরপর থেকে জমিদারি চালানর দায়িত্ব কার ওপরে থাকবে —তার নিজের ওপর, নাকি পরলোকগতা রাজকুমারীর জীবদ্দশায় দেওয়ান নিজে যেমন তার প্রতিনিধিত্ব করতেন তেমনিভাবেই চলবে। দেওয়ান তাকে আরও পরামর্শ দিয়েছে যে, এরপর আর জমির পরিমাণ বাড়ানোটা ঠিক উচিত হবে না ; কৃষকরা খাজনার ভিত্তিতে যে জমি রেখেছে তা ফেরৎ নিয়ে চাষ করাটাই হবে লাভজনক। সে লিখেছে, সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে এটাই হল সবথেকে লাভজনক পদ্ধতি। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়েছে যে, এক তারিখে বকেয়া তিন হাজার রুবল না পাঠাতে পারায় সে খুবই দুঃখিত ; সেটা পরের ডাকে পাঠিয়ে দেবে। আর দেরির কারণ হিসেবে লিখেছে, চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় না হওয়াতেই তার পক্ষে যথাসময়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এমনকি এ কারণে বহু চাষীর নামে আদালতে মামলা রুজু করতে হয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু নেখলুদভের কাছে অংশত আনন্দদায়ক এবং অংশত বিরক্তিজনক বলে বোধ হল। আনন্দ লাগল এই ভেবে যে সে এতবড় একটা সম্পত্তির মালিক। আর বিরক্তি জাগল এ কারণে যে, সে নিজেকে হার্বার্ট স্পেনসারের একজন গোঁড়া সমর্থক বলে মনে করে, এবং স্পেনসারের 'সামাজিক মতবাদের' দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কারও ব্যক্তিগত জমিকে দখল করে নেওয়াটা খুবই ন্যায়বিরোধী। ছাত্রজীবনে সে 'জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দেখা উচিত নয়'—এ বিষয় নিয়ে বহু তর্ক করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকাতে এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখেছে। শুধু তাই নয়, সে তার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজও করেছে। 'জমিদারি রাখাটা অন্যায়'—এই মতবাদে বিশ্বাস করে সে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত পাঁচশ একর জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছে ; এবং আজ মায়ের জমিদারির উত্তরাধিকারী হবার পর, সে নিজে যখন একজন জমিদার হয়ে গেছে, তখন, তার সামনে খোলা দুটো পথের যে কোন একটা পথ তাকে বেছে নিতে হবে। হয়, দশবছর আগে সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া জমিদারি যেভাবে ছেড়ে দিয়েছিল এবারও সেভাবেই মায়ের জমিদারিও ছেড়ে দিতে হবে, নয়ত তাকে স্বীকার করতে হবে যে তার আগের ধারণাগুলো সবই ছিল মিথ্যে, বুজরুকি।

তারপক্ষে প্রথম পথটা মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। কারণ, জমিদারি ছাড়া তার তো আয়ের অন্য কোন পথও নেই (সে সরকারি চাকুরি করার কথা ভাবতেও পারে না)। তাছাড়া তার মধ্যে এমন অনেক বিলাসী অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যা পরিত্যাগ করা মোটেই আর সম্ভব নয়। এর ওপর তার আগের সেই প্রবৃত্তিগুলো— যেমন, কঠোর পরিশ্রম করা, যৌবনের দৃঢ়তা, অসাধারণ কিছু করার প্রবণতা—এসব এখন একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পথের ব্যাপারে, অর্থাৎ স্পেনসারের 'সামাজিক মতবাদ' পড়ে সে যা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং পরবর্তীকালে হেনরী জর্জের লেখায় যার সমর্থন পেয়েছিল—সেই জমি রাখার অন্যায় রীতির বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় প্রমাণগুলোর দিকে সে চোখ বন্ধ রাখারই সিদ্ধান্ত নিল। এবং এ কারণেই তার মনে হল যে দেওয়ানের লেখা চিঠিটা যথেষ্ট বিরক্তিজনক।

।। চার ।।

কফি শেষ করেই নেখল্যুদভ পড়ার ঘরে ঢুকল সমনে কটার সময় আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা দেখতে, আর ঠিক করল রাজকুমারীর চিঠিরও একটা জবাব লিখে ফেলবে। চিত্রশালার ঘরটা অতিক্রম করতে করতে ইজেলের দিকে মুখ করে রাখা অসম্পূর্ণ একটা ছবি আর দেওয়ালে ঝুলন্ত বৃহত্তর আলেখ্যের জন্য অপেক্ষমান প্রাথমিক ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে শিল্পে নিজের অগ্রগতি সম্পর্কিত অক্ষমতা আর অযোগ্যতার এক অনুভূতি তাকে গ্রাস করল। অতীতেও অনেকবার তার এমন মনে হয়েছে; এবং উন্নাসিক নন্দনতাত্ত্বিক রসবোধের দ্বারা সে তার ব্যাখ্যাও করেছে, কিন্তু তবু এ এক ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক অনুভূতি।

সাত বছর আগে সে সৈন্যবাহিনীর চাকরি ছেড়েছিল এই নিশ্চিত অনুভূতিতে যে শিল্পে তার প্রতিভা রয়েছে, এবং সেই শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চতা থেকে অন্যসব কাজকে সে অসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এসব করার কোন অধিকারই তার নেই। ফলে সবকিছুতেই সে অতৃপ্তি বোধ করল; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিত্রশালার বিলাসবহুল সাজসরঞ্জামগুলো দেখতে লাগল। আজকাল সে মোটেই আর এই আরামদায়ক চিত্রশালায় অবসর বিনোদনের জন্য আসে না।

লেখার বড় টেবিলের দেরাজটা খুলতেই 'জরুরী' ছাপমারা সমনটা সে পেয়ে গেল। তাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে এগারটার সময় আদালতে হাজির হতে হবে।

নিমন্ত্রণ করার জন্য রাজকুমারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মধ্যাহ্ন ভোজে উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেখল্যুদভ চিঠি লিখল। কিন্তু চিঠির ভাষাটা বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে গেছে মনে হওয়াতে সে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আর একটা লিখল, কিন্তু সেটার ভাষা আবার নিরুত্তাপ বোধ হওয়াতে সেটাকেও ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটার বোতাম টিপল। পরিষ্কার করে দাঁড়ি গোঁফ কামানো, গায়ে অ্যাপ্রন পরা, মুরদের মত দেখতে একজন বেশ বয়স্ক মানুষ এসে ঘরে ঢুকল।

'একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন।'

'যাচ্ছি হুজুর।'

'আর কোরচাগিনদের বাড়ি থেকে যে মেয়েটি এসেছে তাকে বলে দাও যে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং চেষ্টা করব যথাসময়ে যেতে।'

'ঠিক আছে।'

'ব্যাপারটা মোটেই ভদ্রোচিত হল না; কিন্তু কি করব, লিখতে পারছি না; আজ যেভাবেই হোক তার সাথে দেখা করবই—' নেখল্যুদভ ভাবল, এবং গায়ের ওভারকোটটা নেবার জন্য এগোল।

বাড়ির বাইরে আসার সময়েই সে জানত যে দরজার কাছে রবারের চাকাওলা ঘোড়ার গাড়ি তার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে আসতেই গাড়ির চালক বলল, 'কাল যখন আপনি রাজকুমার কোরচাগিনের ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তখন একটুর জন্য আমি আপনাকে ধরতে পারিনি। দারোয়ানটা আমাকে বলল যে, "উনি এইমাত্র গেলেন।" '

'তাহলে দেখছি, ঘোড়ার গাড়ির গারোয়ান পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোরচাগিন-

দের খাতিরের ব্যাপারটা জানে।' নেখল্যুদভ মনে মনে ভাবল। রাজকুমারী কোরচাগিনকে বিয়ে করাটা উচিত হবে কিনা সে কথাটা আবার তার মনে এল। কোনভাবেই এ প্রশ্নটার একটা যথাযথ উত্তর বার করতে পারল না সে; অর্ধ দশটা প্রশ্নের থেকে এটাই তার মনে নাড়া দিল বেশি করে।

সাধারণভাবে বিয়ে করার পেছনে ঘর সংসারের সুখ ছাড়াও আর একটা প্রবল যুক্তি থাকে এই যে, তা মানুষের নৈতিক জীবনযাপনকে সম্ভব করে তুলতে সাহায্য করে। এবং বিশেষতঃ পরিবার আর সন্তানের প্রতি আকর্ষণ—এটাই নেখল্যুদভের শূন্য জীবনে একটা আশার আলো জাগিয়ে তোলে। কিন্তু বিয়ের বিপক্ষে যা বলা হয়, তা হল স্বাধীনতা হারানোর আশংকা, এবং সেই রহস্যজনক সৃষ্টির প্রতি ভীতি—যা প্রতিটি যৌবন অতিক্রান্ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে মিশিকে (তার নাম ছিল মারিয়া, কিন্তু বিশেষ একটি সমাজে যা হয়ে থাকে, তাকে একটা ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল) বিয়ে করার পক্ষে বিবেচনার বিষয় হল সে আসছে এক সুপরিচিত পরিবার থেকে এবং তার সবকিছুই সাধারণ লোকজনের তুলনায় (ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, বরং 'জন্মসূত্রে'—এই গুণটাকে সম্বোধন করার জন্য সে অন্য কোন শব্দ খুঁজে পেল না, যদিও এটাকে সে খুবই মূল্য দিয়ে থাকে) অন্যরকম—হাঁটায় চলায়, হাসিতে, কথা বলার ভঙ্গিতে—সবকিছুতেই একটা ব্যতিক্রম রয়েছে। তাছাড়া অন্য কারও তুলনায় তার কথাই সে বেশি ভাবে—ফলে তাকে বুঝতেও পারে অতি সহজে। আর এই বুঝতে পারাটাই হল শ্রেষ্ঠতরের মূল্য সম্পর্কে তার স্বীকৃতি। নেখল্যুদভের কাছে এটা তার সঠিক বিচার ক্ষমতা এবং সুবুদ্ধির প্রমাণ। মিশিকে বিয়ে করার বিপক্ষে বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হল যে সবদিক থেকেই তার চেয়েও উচ্চতর গুণসম্পন্ন পছন্দসই মেয়ে পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া তার বয়স সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে, এবং সম্ভবতঃ নেখল্যুদভই তার প্রথম প্রেমিক নয়। শেষের এই ধারণাটা তার কাছে খুবই বেদনাদায়ক বলে মনে হল; তার গর্ব কিছুতেই এ চিন্তার সাথে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারল না যে সে অন্য আর কাউকে ভালবেসেছে; এমনকি তা যদি অতীতেও হয়ে থাকে তবুও। অবশ্য এটাও তো ঠিক, সে তো জানত না যে ভবিষ্যতে তার সঙ্গেই তার দেখা হবে। কিন্তু তবুও, সে যে আর কাউকে কখনও ভালবাসতে পেরেছিল এটা মনে হতেই নেখল্যুদভের মন রাগে জ্বলে উঠল।

সুতরাং তাকে বিয়ে করা এবং না করার পক্ষে সমান সমান যুক্তি রয়েছে। তা যে মাপেরই হোক না কেন, নেখল্যুদভের কাছে তার ওজন একই। সে নিজেকেই নিজে উপহাস করল, নিজেকেই নিজে তুলনা করল নীতিকথার সেই গাধাটার সঙ্গে যে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেনি যে কোন খড়ের গাদাটায় মুখ দিলে ভাল হবে।

'যেভাবেই হোক, মারিয়া ভাসিলিয়েভনার (মার্শালের স্ত্রী) কাছ থেকে জবাব না পাওয়া পর্যন্ত, এবং যতক্ষণ না ব্যাপারটা একেবারে মিটে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি কিছুই করতে পারব না।' মনে মনে আওড়াল নেখল্যুদভ। সে যে তার সিদ্ধান্তকে আরও কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এতেই খুব খুশি হল। 'ঠিক আছে, সবই পরে ভেবে দেখব।' অ্যাসফেল্টের রাস্তা ধরে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আদালত পর্যন্ত যেতে যেতে সে নিজেকেই নিজে বলল, 'এখন আমি

যথাযথ ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করব—এটাই আমার স্বভাব, এবং এটা করাটাই আমি সঠিক বলে মনে করি; তাছাড়া প্রায়ই এগুলো মজার বলে আমার মনে হয়।' তারপর দারোয়ানকে অতিক্রম করে সে ঢুকে গেল আদালত ভবনে।

॥ পাঁচ ॥

আদালত কক্ষ ততক্ষণে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে; সমবেত মানুষজনের পা মেঝের ওপর এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে; সামনে পেছনে নানান খবরাখবর আর কাগজ-পত্রের আনাগোনা চলেছে; পেয়াদা, উকিল, অ্যাটর্নির দল এধারে ওধারে যাচ্ছে। হাজতের বাইরের ফরিয়াদি আর আসামীরা বিষণ্ণ মুখে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা অপেক্ষা করছে।

নেখল্যুদভ একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'আইনের আদালতটা কোন দিকে।'

'কোনটা? ওটা হচ্ছে দেওয়ানি আর ফৌজদারি আদালত।'

'আমি একজন জুরি।'

'তার মানে আপনি বলছেন ফৌজদারি আদালত। এই ডানদিকে গিয়ে বাঁদিকে তিনতলায়।'

নেখল্যুদভ নির্দেশিত রাস্তা ধরল।

নির্দিষ্ট দরজায় দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বেশ লম্বাটে মোটা চেহারার, পেশায় ব্যবসায়ী, আনন্দে খানাপিনা সেরে খুশি খুশি মেজাজে রয়েছে; অন্যজন একজন ইহুদী দোকান-কর্মচারী। দুজনেই উলের দর নিয়ে কথা বলছিল, এমন সময় নেখল্যুদভ এসে তাদের কাছে জানতে চাইল এটা জুরিদের ঘর কিনা?

'হ্যাঁ, এটাই। নিশ্চয় আমাদেরই একজন? জুরিদের মধ্যে আছেন?' খুশিতে চোখ পিটপিট করে ব্যবসায়ীটি বলল। নেখল্যুদভ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে পর সে বলে চলল, 'ভালই হল, এক সাথেই কাজ করা যাবে। আমি হলাম বাকলাসোভ, দ্বিতীয় গিল্ডের ব্যবসায়ী।' তারপর তার অনিচ্ছুক প্রশস্ত হাতটা ধরে বলল, 'ঠিক আছে, যা পারি করব!...কিন্তু মহাশয়ের নাম?'

নেখল্যুদভ নাম বলে জুরিদের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের মধ্যে দশজন লোক বসে, প্রত্যেকেই সবেমাত্র এসেছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে, অন্যেরা পায়চারি করছে; পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, কথা বলছে। এদের মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলও রয়েছে। এদের কারও গায়ে ফ্রক-কোর্ট, কারও গায় এমনি কোট আবার একজনের গায়ে একেবারে কৃষকের পোশাক। তবে প্রত্যেকের মুখেই বেশ খুশি খুশি ভাব। অবশ্য প্রত্যেকেই আবার পরস্পরের কাছে অভিযোগ করছে এই বলে যে জনসাধারণের কাজ করতে গিয়ে তাদের নিজেদের কাজের খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

জুরিরা নিজেদের মধ্যে আবহাওয়া, নববসন্ত, আর ব্যবসার ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছে; এদের মধ্যে অনেকেরই পরিচয়পর্ব সমাধা হয়ে গেছে, বাকিরা অনুমান করছে কে কি। নেখল্যুদভের সঙ্গে যারা পরিচিত নয় তারা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য বেশ ব্যগ্র হয়ে পড়ল, আর নেখল্যুদভও সেটাকে নিতান্ত পাওনা সম্মান হিসেবেই গ্রহণ করল—যেমনটা অপরিচিত লোকদের ক্ষেত্রে সে সবসময়ই করে থাকে।

অবশ্য তাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন সে নিজেকে সবার থেকে উন্নত মনে করছে, তাহলে তার পক্ষে কোন যুৎসই উত্তর দেওয়া মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ, তার জীবনে তেমন কোন সফলতার ইতিহাস নেই। আর এ কথাও তার ভালভাবেই জানা আছে যে ইংরেজি, ফরাসী কিংবা জার্মান ভাষা জানা, অথবা ভাল কাপড়ের তৈরি জামা, টাই এবং কারুকার্যকরা দামী বোতাম ব্যবহার করাটা মোটেই শ্রেষ্ঠতর হওয়ার গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবুও সে নিজেকে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেই দাবি করে থাকে। এবং যে সম্মান পায় তা তার একান্ত প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করে, এমনকি না পেলে তারজন্য মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়। জুরিদের মধ্যে একজন তার পূর্ব পরিচিত—তার বোনের ছেলেমেয়েদের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক পিওতর গেরাসিমোভিচ। নেখল্যুদভ তার ডাকনামটা জানত না, এবং তারজন্য মনে মনে বেশ গর্বও অনুভব করত। এ লোকটা এখন একটা সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করে। নেখল্যুদভ তার গায় পড়া আচরণ মোটেই সহ্য করতে পারছে না, সহ্য করতে পারছে না তার আত্ম-তৃপ্তির হাসিটাকে; এক কথায় বলতে গেলে অসহ্য লাগছে তার কুৎসিতপনাকে।

'ওঃ তাহলে আপনিও শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদে পড়েছেন' এই কটা কথা আর প্রচণ্ড জোরে একটা হাসি দিয়ে নেখল্যুদভকে আপ্যায়ন জানিয়ে পিওতর গারাসিমোভিচ বলল, 'তা কোন মন্ত্রেই আর ফাঁক গলে বের হতে পারলেন না?'

বিষণ্ণ অথচ কর্কশ স্বরে নেখল্যুদভ উত্তর দিল, 'গলে বেরোবার তো কোন চেষ্টাই করিনি।'

'আমি একে বলে থাকি জনসাধারণের শুভার্থী। ঠিক আছে, যতক্ষণ না খিদে আর ঘুম পাচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকুন, দেখবেন তখন গলা থেকে অন্য সুর বের হচ্ছে।'

'পাদ্রীর ব্যাটা আর একটু পরেই আমার কাঁধে হাত দিয়ে বসবে.' নেখল্যুদভ ভাবল, এবং মুখে এমন একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল যে মনে হল হয়ত এক্ষুণি সে খবর পেয়েছে যে তার সব আত্মীয়-স্বজনরাই একসাথে মারা গেছে। সে এগিয়ে গেল সেদিকটায়, যেখানে বেশ কিছু লোক একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কারভাবে দাড়ি কামানো লম্বা চেহারার একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষের কাছ থেকে জীবন্ত কোন কিছুর বর্ণনা শুনছিল। লোকটি তার জানা একটা দেওয়ানি মামলার কাহিনী বলছিল, আর বারবার উচ্চারণ করছিল একজন বিচারক এবং একজন প্রখ্যাত আইনজীবির নাম। সে বলছিল, সত্যিকারেরই এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে সেই আইনজীবিটি অসাধারণ চালাকির সাহায্যে গোটা মামলাটাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে যে, একজন বৃদ্ধা মহিলা ন্যায়ের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার বিরোধী পক্ষকে প্রচুর টাকা খেসারত দিতে বাধ্য হয়েছে। সে বলল, আইনজীবিটি সত্যিই অসামান্য প্রতিভাধর।'

সশ্রদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শ্রোতারা এই কাহিনী শুনল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করল মুখ খুলতে, কিন্তু লোকটি প্রত্যেকের কথাতেই এমনভাবে বাধা দিল যে মনে হল একমাত্র সে ছাড়া আর কেউই কিছু জানে না।

যদিও নেখল্যুদভ বেশ দেরি করেই এসেছে। কিন্তু তবুও তাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ, জুরিদের একজন সদস্য এখনও এসে

পৌঁছয়নি, এবং তার জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।

।। ছয় ।।

আদালতের সভাপতি বেশ তাড়াতাড়িই এসেছেন। লম্বা ধূসর গালপাট্টা জড়ানো দীর্ঘকায় শক্ত সমর্থ মানুষ। বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও খুব ঢিলে-ঢালা জীবন কাটান, আর তার স্ত্রীটিও তথৈবচ। ফলে কেউই কারও পথের কাঁটা নন। আজ সকালে একটি সুইস মেয়ের চিঠি পেয়েছেন, মেয়েটি আগে তার বাড়িতে গভর্ণেসের কাজ করত। সে লিখেছে, দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পিটার্সবুর্গের দিকে যাত্রা করেছে; আজ বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত 'হোটেল ইতালিয়া'য় সে তার জন্য অপেক্ষা করবে। তাই তিনি চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালতের কাজ শুরু করে আবার তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্য, যাতে যথাসময়ে গিয়ে নতুন প্রেমিকা লোহিত-কেশী ক্লারা ভাসিলিয়েভনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

নিজের ঘরে ঢুকে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, আলমারির ওপর থেকে ডাম্বেল-জোড়া তুলে নিয়ে তিনবার হাত দুটো কখনও সামনে কখনও ওপরে-নিচে ঘোরাতে লাগলেন, তারপর মাথার ওপর সে দুটো তুলে আলতো করে হাঁটু থেকে শরীরটা তিনবার বাঁকালেন।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাইসেপটা মেপে মনে মনে বললেন, 'ঠাণ্ডা জলে স্নান আর ব্যায়াম ছাড়া অন্য কিছুই একটা মানুষকে সুস্থ রাখতে পারে না।' তার বাঁ হাতের তৃতীয় আঙুলটায় রয়েছে একটা আংটি; এখনও তাকে পেশীর কসরত চালিয়ে যেতে হচ্ছে (কারণ, সবসময়ই, কোন দীর্ঘ মামলা শুরু হওয়ার আগে তিনি এই দুটো ব্যায়াম করে থাকেন), যতক্ষণ না দরজায় ধাক্কা শোনেন ততক্ষণ এটা চলবে। তারপর দরজায় আওয়াজ হতেই তিনি দ্রুত ডাম্বেল দুটো যথাস্থানে রেখে দিয়ে দরজা খুলে বললেন, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেবার জন্য দুঃখিত।'

চওড়া কাঁধ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, অতৃপ্ত চেহারার একজন সদস্য ঘরে ঢুকলেন। বেশ বিরক্তির সুরে বললেন, 'মাতভেই নিকিতিচ আজও আসেননি।'

'এখনও আসেননি?' গায়ে কোটটা চাপাতে চাপাতে সভাপতি বললেন, 'উনি সব সময়েই দেরি করে আসেন।'

চেয়ারে বসে, একটা সিগারেট ধরিয়ে করে বেশ রাগত স্বরে সদস্যটি বললেন, 'আমি ভেবেই পাই না, নিজের জন্য তার কি একটুও লজ্জা করে না?'

ভদ্রলোক কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠ মানুষ। আজ সকালেই স্ত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেছে তার। স্ত্রী মাসের বরাদ্দ টাকা আগেই খরচ হয়ে যাওয়াতে আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থের দাবি জানিয়েছিলেন, আর সে কারণেই ঝগড়াটা। অবশ্য স্ত্রী পরিষ্কারই বলে দিয়েছেন, এরপর তিনি যেন আর দুপুরে বাড়িতে খাওয়ার আশা না করেন, কারণ তারজন্য খাবার রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এত দূর এগোবার পর ভদ্রলোক রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন। কারণ তিনি তার স্ত্রীকে ভালমতই চেনেন—তার পক্ষে করা সম্ভব নয় এমন কোন কাজই নেই দুনিয়ায়। ভদ্রলোক দৃপ্ত উচ্ছল, দয়ালু সভাপতির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, 'তাহলে এটাই হল এক ভদ্র-চারিত্রিক জীবন।' আর সভাপতি এখন তার সুন্দর হাত দুটো দিয়ে, এমব্রয়ডারি করা কোটের কলারের ওপর ধূসর গালপাট্টাটা ঠিক মত বসিয়ে নিচ্ছেন। সদস্যটি ভাবলেন, 'উনি সব সময়ই মনে মনে বেশ তৃপ্ত এবং খুশি,

অথচ আমি কী নিদারুণ কষ্টই না পাচ্ছি।'

কর্মসচিব দলিল কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সভাপতি বললেন, 'ধন্যবাদ, কোন মামলাটা আমরা আগে শুরু করব?'

কর্মসচিব উদাসীন সুরে জবাব দিলেন, 'সেই বিষ-প্রয়োগের মামলাটাই আগে শুরু করা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, তাই হোক।' এই ভেবে সভাপতি কথাটা বললেন যে, তাহলে চারটের মধ্যেই আদালতের কাজ সমাপ্ত করে তিনি চলে যেতে পারবেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'মাতভেই নিকিতিচ এসেছেন কি?'

'না, এখনও আসেননি।'

'আর ব্রেভে?'

কর্মসচিব জবাব দিলেন, 'তিনি এখানেই আছেন।'

'আপনি যদি তাকে দেখতে পান তবে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন যে আমরা বিষ-প্রয়োগের মামলাটাই আগে শুরু করব।'

ব্রেভে সরকারি উকিল, বিষ-প্রয়োগের মামলাটা তারই হাতে রয়েছে।

দরদালানে কর্মসচিব ব্রেভের দেখা পেলেন। তিনি কাঁধ দুটো উঁচু করে, এক হাতের বগলে একটা পোর্টফোলিও চেপে, অন্য হাতটা বেশ জোরে দোলাতে দোলাতে, জুতোর গোড়ালিতে খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে দরদালান ধরে দ্রুত সামনের দিকে এগোচ্ছিলেন। কর্মসচিব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিখাইল পেত্রভিচ জানতে চাইছেন মামলা শুরু করার জন্য আপনি প্রস্তুত কিনা?'

'নিশ্চয়, আমি সব সময়েই প্রস্তুত,' সরকারি উকিল জবাব দিলেন। 'তাহলে কোন মামলাটা প্রথমে শুরু হচ্ছে?'

'বিষ-প্রয়োগের মামলাটা।'

সরকারি উকিল মুখে বললেন, 'সেই ভাল।' কিন্তু মনে মনে কিছুতেই ভাল বলে মেনে নিতে পারলেন না। গতকাল এক বন্ধুর দেওয়া বিদায় ভোজে যোগদান করার জন্য তিনি একটা হোটেলে গিয়েছিলেন, সেখানে তার সারাটা রাত কেটেছে শুধু মদ খেয়ে আর তাস খেলে; ফলে এই বিষ-প্রয়োগের মামলাটার নথিপত্রে তিনি একবারের জন্যও চোখ বোলাতে পারেননি, এবং ভেবেছিলেন এখন দেখে নেবেন। আর কর্মসচিবও সেটা জেনেই সভাপতিকে পরামর্শ দিয়েছেন মামলাটা শুরু করার জন্য। কর্মসচিবটি মতামতের দিক থেকে বেশ উদারনৈতিক, এমনকি প্রগতিশীলও। কিন্তু ব্রেভে হচ্ছেন রক্ষণশীল এবং রাশিয়ায় বসবাসকারী প্রতিটি জার্মানের মতই গোঁড়ামীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। কর্মসচিবটি মনে মনে তাকে ভীষণ অপছন্দ করেন।

কর্মসচিব জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মামলাটার কি হল?'

'আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে সাক্ষী ছাড়া কাজ করতে পারব না; এবং আদালতেও ঠিক তা-ই বলব।'

'কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

ব্রেভে হাত তুলে বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

যদিও একটা অত্যন্ত গুরুত্বহীন সাক্ষীর অনুপস্থিতির অজুহাতে তিনি বারবার

মামলাটা সরিয়ে রাখছিলেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, যদি কোন শিক্ষিত জুরি তাদের বিচার করে তবে তারা অভিযোগ থেকে অবধারিতভাবে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। তাই সভাপতির সাথে ব্যবস্থা হয়েছে যে আগামী মরসুমে কোন একটা পাড়াগেঁয়ে শহরে এই মামলার বিচার হবে—যাতে কিনা কৃষক জুরিদের পরিষ্ঠের মতামতে তাদের শাস্তি পাবার সম্ভাবনাই বেশি।

দরদালানে উত্তেজনা বেড়ে গেছে। দেওয়ানি আদালতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আইন-আদালত সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন লোক একটা বিশেষ মামলার কথা বলছে, সবাই তাই শুনছে বেশ মনোযোগ দিয়ে।

বিচারকার্যে বিরতি হল; আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল সেই বৃদ্ধা মহিলাটি যার সম্পত্তি একজন অসামান্য প্রতিভাবান আইনজীবির কূট কৌশলে অন্য একজন ব্যবসায়ীর করায়ত্ব হয়ে গেছে। বিচারক ব্যাপারটা সবই জানতেন, এবং আইনজীবি ও তার মক্কেল জানত আরও ভাল করে। কিন্তু আইনজীবিটি এমন এক অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যে বিচারক বাধ্য হলেন বৃদ্ধার সমস্ত সম্পত্তি সেই ব্যবসায়ীটির হাতে তুলে দিতে।

বৃদ্ধা মহিলাটির দেহ বেশ ঋজু, পরনে দামী পরিচ্ছদ আর মাথার ওড়নায় ফুলের কাজ করা। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, মাংসল হাতটা তুলে বারবার তিনি তার আইনজীবিকে বলতে লাগলেন, 'এ সবের মানে কি? কি ভেবেছেন? কি করে সম্ভব হল এটা?'

আইনজীবিটি তার মক্কেলের মাথার ফুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্পষ্টতঃ এখন তার মাথায় অন্য চিন্তা, তিনি মোটেই মহিলাটির কথা শুনছেন না।

মহিলাটির পেছনে পেছনে, কেতাদুরস্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে চলেছেন সেই অসামান্য প্রতিভাবান আইনজীবিটি, যিনি একটু আগে মাত্র দশহাজার রুবল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার মক্কেলকে পাইয়ে দিয়েছেন লক্ষ রুবলেরও বেশি মূল্যের সম্পত্তি। তার দৃপ্ত মুখে তৃপ্তি আর আত্মসন্তুষ্টির হাসি; তিনি বেশ অনুভব করছেন যে আশে পাশের প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি তার ওপরেই নিবদ্ধ। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন বলতে চাইছেন, 'অমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।'

॥ সাত ॥

অবশেষে মাতভেই নিকিতিচ এসে পৌঁছলেন; আর পেয়াদা, যার লম্বা চেহারাটার সঙ্গে ঘাড়টাও পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়েছে, সে একপাশে কাত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঠোঁটটাকে বেশ প্রসারিত করে এসে ঢুকল জুরিদের ঘরে। লোকটা খুবই সৎ, এমনকি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোও করেছে। কিন্তু তার মদের নেশা এমনই যে কোন কাজেই সে একনাগাড়ে বেশিদিন লেগে থাকতে পারে না। মাত্র তিনমাস আগে, তার স্ত্রীকে স্নেহ করে এমন একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার সাহায্যে সে বর্তমান কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পেরেছে, এবং একই কাজে একনাগাড়ে এতদিন টিকে থাকতে পারায় সে নিজেও মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করে।

চোখে চশমা লাগিয়ে, চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, প্রত্যেকেই এখানে উপস্থিত আছেন কি?'

খোশমেজাজী ব্যবসায়ীটি উত্তর দেয়, 'মনে হয়, সকলেই উপস্থিত হয়েছেন।'

'ঠিক আছে, এক্ষুণি দেখছি,' বলেই সে পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে কখনও সোজা, কখনও বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক এক করে নাম ডেকে যায়।

'প্রদেশকর্তা আই, এম, নিকিফোরোভ।'

আদালতের ব্যাপার-স্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি জবাব দিলেন, 'এই যে আমি।'

'অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ইভান সেমিওনোভিচ ইভানভ।'

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীর পোশাক পরিহিত একজন রোগা লোক জবাব দিলেন, 'এখানে।'

'দ্বিতীয় শ্রেণীর গিল্ডের ব্যবসায়ী পিওতর বাকলাসভ।'

প্রশান্ত হাসি হেসে সেই সুরসিক ব্যবসায়ীটি জবাব দিল, 'এই যে আমরা এখানে, সবাই প্রস্তুত।'

'প্রহরীদের লেফটেন্যান্ট রাজকুমার দিমিত্রি নেখল্যুদভ।'

'এই যে আমি।' নেখল্যুদভ জবাব দিল।

চশমার ফাঁক দিয়ে পেয়াদা তার দিকে এমন নম্রভাবে তাকাল এবং মাথা নাড়ল যে মনে হল সে যেন তাকে অন্যসবার থেকে একেবারে আলাদা করে দেখছে।

'ক্যাপ্টেন ইউরি দিমিত্রিয়েভিচ দানচেনকো, ব্যবসায়ী গ্রিগোরি ইয়েভিমোভিচ কুলেসভ।' ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখা গেল, শুধুমাত্র দুজন ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত রয়েছে।

দরজার দিকে বেশ মোলায়েমভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পেয়াদা বলল, 'অনুগ্রহ করে এবার সবাই আদালত-কক্ষে প্রবেশ করুন।'

প্রত্যেকে এগিয়ে এল দরজার দিকে, তারপর বারান্দাটা অতিক্রম করে উপস্থিত হল আদালত-কক্ষে।

বিচার কক্ষটা বেশ বড় আর লম্বা। তার একদিকে রয়েছে সিঁড়ির তিনটে ধাপ, তা বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপর অর্থাৎ উঁচু মত একটা বেদি ; সেই বেদির ওপরে রয়েছে কালচে পাড়ের ঝালর লাগানো সবজে কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল। টেবিলের পেছনে বসানো আছে কারুকাজ করা ওক কাঠের তিনটে চেয়ার। তার উলটো দিকের দেওয়ালে ঝুলছে উজ্জ্বল রঙে আঁকা সম্রাটের একটা ছবি। সে ছবিতে হাতে তলোয়ার নিয়ে একটা পা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সম্রাট দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডানদিকের কোণে ঝুলছে কাঁটার মুকুট মাথায় খ্রীষ্টের একটা মূর্তি, তার নিচে খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত পাঠমঞ্চ, আর সেদিকেই রয়েছে সরকারি উকিলের আসন। তার সামনে বাঁ দিকে কর্মসচিবের টেবিল ; আর টেবিলটার উলটো দিকে ওক কাঠের তৈরি বন্দীর কাঠগড়া। সেটা এখনও খালি রয়েছে। বেদির ডান দিকে সার দেওয়া জুরিদের উঁচু পেছনওলা চেয়ার, আর মেঝেতে রয়েছে উকিলদের জন্য টেবিল। দুটোর মাঝখানে খাড়া করা আছে কাঠের রেলিং ; এটাই হচ্ছে বিচারকক্ষের সম্মুখভাগ।

পেছনের দিকটায় সারি সারি চেয়ার বসানো রয়েছে। তার প্রথম সারিতে বসে আছে চারজন মহিলা—হয় ওরা চাকরানী, নয়ত কারখানায় কাজ করে ; আর বসে আছে দুজন মেহনতি মানুষ। তারা সকলেই ঘরটার চাকচিক্যে এমন ঘাবড়ে গেছে যে, ফিসফিস করার চেয়ে বেশি জোরে কথা বলার সাহসই পাচ্ছে না।

জুরিরা ঘরে এসে ঢোকা মাত্র, পেয়াদা তার ঘাড় কাত করে সামনের দিকে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আদালত শুরু হচ্ছে।' তার বলার ভঙ্গিতে মনে হল উপস্থিত সবাইকেই যেন সে ঘাবড়ে দিতে চাইছে।

প্রত্যেকে উঠে দাঁড়াল, এবং আদালতের সদস্যরা বেদির দিকে এক এক করে এগিয়ে এলেন। প্রথমে এলেন সভাপতি, তার পেশী আর চমৎকার গালপাট্টা সহ। তারপর এলেন সেই বিষণ্ণ সদস্যটি, তাকে এখন আরও বেশি বিষণ্ণ দেখাচ্ছে; কারণ এইমাত্র সে তার শ্যালকের কাছ থেকে খবর পেয়েছে যে তার বোন (সদস্যটির স্ত্রী) তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল, এবং বলে দিয়েছে যে আজ বাড়িতে কোন রকম খাওয়ার আয়োজন হবে না।

শ্যালকটি হাসতে হাসতে তার সাথে যোগ করল, 'তাহলে স্পষ্টতঃই আজ আমাদের কোন হোটেলে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।'

বিষণ্ণ সদস্যটি আরও বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'এতে হাসির কিছু নেই।'

তারপর সবার শেষে এলেন মাতাভেই নিকিতিচ। তিনি সবসময়েই দেরি করে আসেন। তার থাকার মধ্যে আছে গালভর্তি দাড়ি আর দুটো প্রশস্ত দয়ালু চোখ। তার পাকস্থলীর একটা জটিল রোগ রয়েছে, এবং ডাক্তারের পরামর্শে আজ সকাল থেকেই নতুন পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে, ফলে অন্যান্য দিনের তুলনায় তাকে আজ আরও বেশি সময় ঘরে থাকতে হয়েছে। এখন বেদিতে উঠতে উঠতে মুখটাতে বেশ গাম্ভীর্যের ভাব আনলেন। এটা তার অভ্যাস; প্রায়ই মনে মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন তৈরি করে নানান অদ্ভুত উপায়ে তার উত্তর খোঁজেন। এক্ষুণি তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলেন এই নতুন পদ্ধতির চিকিৎসাতে তার সর্দি সেরে যাবে কিনা, এবং ঠিক করেছিলেন দরজা থেকে তার চেয়ার পর্যন্ত যেতে যতবার পা ফেলতে হবে সে সংখ্যাটা যদি তিন দিয়ে ভাগ করার উপযুক্ত হয় তবে তার সর্দি সারবে বলে ধরে নিতে হবে। তিনি একে একে ছাব্বিশটা ধাপ অতিক্রম করলেন, শেষে চেয়ারে বসাটাকে একটা ধাপ ধরে নিয়ে সংখ্যাটাকে সাতাশ হিসেবে মেনে নিলেন।

সভাপতি এবং সদস্যদের চেহারা সোনার কাজকরা কলারওলা কোট গায়ে খুবই কৃত্রিম দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, তারা নিজেরাও যেন ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছেন। তাই সম্ভবতঃ অতি দ্রুততার সঙ্গে যে যার চেয়ারে বসে পড়লেন। সামনের সবুজ চাদর-ঢাকা টেবিলটার ওপর রয়েছে একটা ত্রিভুজ, ত্রিভুজের মাথায় একটা ঈগল, দুটো কাঁচের জার—অনেকটা রেল স্টেশনের জলখাবারের দোকানে মিষ্টি রাখার জারের মত দেখতে, একটা দোয়াতদানি, কয়েকটা কলম, কিছু সাদা কাগজ, আর নানান ধরনের সদ্যকাটা পেন্সিল।

সরকারি উকিলও বিচারকদের সাথেই প্রবেশ করলেন। এক হাতে কাগজ-পত্র আর অন্য হাতটা এমনিই দোলাতে দোলাতে তিনি চলে গেলেন নিজের সংরক্ষিত আসনটার দিকে। এক মুহূর্তও দেরি না করে দেখতে শুরু করে দিলেন কাগজপত্রগুলো; আশা, কাজ শুরু হওয়ার আগেই ওগুলো দেখে প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবেন। মাত্র কিছুদিন হল তিনি সরকারি উকিলের চাকরি পেয়েছেন, এবং এ নিয়ে মাত্র চারবার সরকারি উকিল হিসেবে আদালতের সম্মুখীন হচ্ছেন। ভদ্রলোক খুবই উচ্চাকাঙ্খী এবং দৃঢ়ভাবে মনস্থির করেছেন, যে-করেই হোক জীবনে

তিনি উন্নতি করবেনই। সুতরাং যখনই মামলা চালান তখনই চেষ্টা করেন আদালতের বিশ্বাস অর্জন করার। বিষ প্রয়োগ সংক্রান্ত মামলার রূপলেখাটা তার মোটামুটি জানাই আছে; ইতিমধ্যে তার বৃত্তান্ত তৈরি করে ফেলেছেন, তবু এখনও কিছু তথ্য খুঁজছেন এবং সে কারণেই নোট নিচ্ছেন তন্ন তন্ন করে।

কর্মসচিব বসেছেন বেদির ঠিক উলটো দিকে। প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র গুছিয়ে নেবার পর এখন তিনি খবরের কাগজে প্রকাশিত একটা লেখা দেখছে; লেখাটা বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এ ব্যাপারে দাড়িওলা সভ্যটির সঙ্গে তিনি একবার কথা বলে নিতে চান, কারণ ঐ সভ্যটিও এ বিষয়ে তার সঙ্গে একমত। কিন্তু তার আগে লেখাটা আর একবার ভালভাবে পড়ে নিতে চাইছেন।

॥ আট ॥

সভাপতি কাগজপত্র দেখে পেয়াদা এবং কর্মসচিবকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তার যথাযথ উত্তর পাবার পর বন্দীদের নিয়ে আসার হুকুম দিলেন।

রেলিংয়ের পেছনের দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় টুপি আর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দুজন প্রহরী বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। বন্দীদের একজন পুরুষ, অন্য দুজন মহিলা। পুরুষ বন্দীটির চুলগুলো লাল আর মুখ ভর্তি দাগ। তার পরনে বিরাট ঢিলেঢালা কয়েদির পোশাক। হাতের আঙুল ছাড়িয়ে যাওয়া বিরাট আস্তিনটাকে ধরে রাখার জন্য বুড়ো আঙুল দিয়ে হাতটাকে চেপে রেখেছে। বিচারকের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চের একেবারে কোণায় বসে পড়ল, অন্য বন্দীদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে রেখে। তারপর সভাপতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গালের পেশী নেড়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। এরপর এল মহিলা বন্দিনীর একজন। তার পরনেও সেই কয়েদিদেরই পোশাক; আর মাথায় বাঁধা একটা রুমাল। দেখে মনে হল বেশ বয়স হয়েছে। তার চোখ দুটো লাল, মুখ বিষণ্ণ আর চোখের পাতা এবং ভ্রূ একেবারে কেশবিহীন। এগোতে গিয়ে কিসে যেন জামাটা আটকে গেল। বেশ সংযতভাবে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে এসে বসল প্রথম কয়েদির পাশে।

তৃতীয় বন্দিনীই হচ্ছে মাসলোভা।

সে ঘরে ঢোকামাত্র আদালতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের চোখ গিয়ে পড়ল তার ওপর। তার শুভ্র মুখমণ্ডল, কালো উজ্জ্বল চোখজোড়া আর উন্নত বুকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল একগাদা লোক। যাদের অতিক্রম করে এল তারা তো বটেই, এমনকি প্রহরী দুজনের একজন তার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাল না—যতক্ষণ না সে নিজের আসনে এসে বসল। তারপর, সম্ভবতঃ লজ্জাতেই, হঠাৎ ঘুরে গিয়ে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বন্দীরা যথাস্থানে না বসা পর্যন্ত সভাপতি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন; এবার তিনি কর্মসচিবের দিকে ফিরলেন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই শুরু হল কাজকর্ম: জুরির গণনা, যারা আসেনি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য, জরিমানা ধার্যকরণ—যা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে, যারা অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংরক্ষিত জুরি নিয়োগ, কিছু কাগজের টুকরো ভাঁজ করে কাঁচের সুদৃশ্য পাত্রটার মধ্যে

রাখা ইত্যাদি। তারপর, নিজের সোনালী ফুলতোলা কোটটার আস্তিনটা একটু টেনে দিয়ে সভাপতি যাজককে অনুরোধ করলেন জুরিদের শপথবাক্য পাঠ করাতে। হলদে-ফুলো-বিষণ্ণ মুখে, বাদামী গাউন, সোনার ক্রুশ আর ছোট্ট মেডেল সহ বুড়ো যাজক অতি কষ্টে তার পা দুটো যাজকের পোশাকের আড়াল থেকে নামিয়ে পাঠমঞ্চের নিচে রাখা মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসুন।' মাংসল হাতে বুকের ওপর থেকে ক্রুশটাকে নামিয়ে নিয়ে যাজক ক্রমাগত বলে চললেন যতক্ষণ না জুরিরা এগিয়ে এলেন।

ছেচল্লিশ বছর ধরে এই একই যাজক এখানে কাজ করে চলেছেন, এবং তিন বছর পরে ঠিক সেইভাবেই রজতজয়ন্তী পালনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন—যেভাবে মাত্র কিছুদিন আগে আর্কডিয়াগন তার রজতজয়ন্তী পালন করেছিলেন। ফৌজদারি আদালত খোলার দিন থেকেই তিনি কাজ করে চলেছেন, এবং আজ পর্যন্ত যে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাতে পেরেছেন, যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও যে চার্চের, পিতৃভূমির, পরিবারের—যাদের জন্য, তিনি আশা করেন বাড়ি ছাড়াও অন্ততঃ তিরিশ হাজার রুবলের সুদের কাগজ রেখে যেতে পারবেন—উপকার করে চলেছেন, তারজন্য মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করেন। একথা তার কখনও মনেই হয়নি যে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সে পদে থেকে খ্রীষ্টের বাণীতে মানুষকে দিয়ে শপথ করানো উচিত হচ্ছে না—কারণ, খ্রীষ্টীয় নীতিকথা শপথ করানোর বিপক্ষে। বরং তিনি তার বিরুদ্ধাচরণই করছেন; আর তার আসল কারণ হল এ পদে থাকলে বহু গণ্যমান্য লোকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা তারপক্ষে খুব একটা কম খুশির কথা নয় যে সেই বিখ্যাত আইনজীবিটির সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে, যিনি কিনা সেই মাথায় ফুলের কাজ করা ওড়না পরিহিতা বৃদ্ধা মহিলাটির বিরুদ্ধে মাত্র একটা মামলা লড়েই পারিশ্রমিক পেয়েছেন দশ হাজার রুবল।

বেদির সিঁড়ি বেয়ে সবাই ওপরে ওঠার পর যাজক তার টাক মাথাটাকে উত্তরীয়ের তৈলাক্ত ফাঁকটার মধ্য দিয়ে বেশ কাত করে গলিয়ে দিয়ে মাথার পাতলা সামান্য চুল কটাকে বিন্যস্ত করে নিয়ে জুরিদের দিকে ফিরলেন। তারপর হয়ত কোন কিছু খামচে তুলে নিলেন এমন ভঙ্গিতে বুড়ো আঙ্গুল এবং অন্য দুটো আঙ্গুলকে একত্রিত করে, মোটা কোঁচকানো হাতটাকে ওপর দিকে তুলে বয়স্কের কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এখন আপনার ডান হাতটা এভাবে তুলুন এবং আঙ্গুলগুলোকে এভাবে জড়ো করুন। এবার আমার কথার পুনরাবৃত্তি করুন। "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে, তার পবিত্র প্রতিমূর্তির নামে এবং আমাদের প্রভুর জীবন উৎসর্গকরা ক্রুশের নামে শপথ করে বলছি যে, তার কাছে"—' প্রতিটি বাক্যাংশের শেষে বিরাম দিয়ে তিনি বলে চললেন। একটি কম বয়সী লোকের হাতটা কিছুটা নেমে যাওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'আপনার হাতটা ওভাবে নামতে দেবেন না, ধরে থাকুন।' তারপর বললেন, ' "যে, তার কাছে যা"—'

গালপাট্টাওলা সম্মানিত ব্যক্তিটি, কর্ণেল, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যেরা যাজকের নির্দেশ মত আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে হাতটাকে ওপরে তুলে রাখছেন এমনভাবে যে মনে হচ্ছে যেন কাজটা করতে তাদের বেশ ভালই লাগছে। অন্যান্যেরা অনিচ্ছা এবং অযত্নে কাজটা সমাধা করলেন। আবার কেউ কেউ বেশ অবাধ্য সুরে অতিরিক্ত

জোরে জোরে এমনভাবে উচ্চারণ করছেন কথাগুলো যে মনে হচ্ছে তারা যেন বলতে চাইছেন, 'সবকিছু সত্ত্বেও আমি অবশ্যই কথা বলব।' তাছাড়া কারও কারও গলা এত নিচু এবং ধীর লয়ে উচ্চারিত হচ্ছে যে শোনাই যাচ্ছে না তারা কি বলছেন; অবশেষে হঠাৎ যেন যাজকের সুরে সুর মেলাবার জন্য দৌড় শুরু হয়ে গেল—হুবহু করে তারা বলে চলেছেন কথাগুলো। কেউ কেউ আবার আঙুলগুলো এত জোরে টিপে রেখেছেন যে মনে হচ্ছে তারা যেন ভয় পেয়ে গেছেন এই ভেবে যে যদি আঙুলগুলো খুলে যায় তবে হাতের মুঠোর ভেতর থেকে গোপন কিছু বের হয়ে পড়বে। আবার কেউ কেউ আঙুলগুলো খুলছেন এবং বন্ধ করছেন। একমাত্র যাজক ছাড়া প্রত্যেকেই ব্যাপারটায় অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু যাজকটি মনে করছেন যে তিনি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

শপথ-গ্রহণ পর্ব সমাধা হবার পর সভাপতি জুরিদেরকে একজন মুখপাত্র নির্বাচন করতে বললেন। জুরিরা দল বেঁধে এগিয়ে গিয়ে দরজা অতিক্রম করে বির্তকের ঘরে ঢুকে প্রায় সকলেই সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করে দিলেন। কে যেন সেই বিশিষ্ট মানুষটিকে মুখপাত্র হবার জন্য অনুরোধ জানালেন, এবং সকলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা মেনে নিলেন। তারপর সবাই সিগারেট ফেলে দিয়ে ফিরে এলেন আবার আদালত কক্ষে। সেই বিশিষ্ট মানুষটি বললেন যে তাকেই মুখপাত্র নির্বাচিত করা হয়েছে; তারপর যে-যার আসন গ্রহণ করলেন।

সবকিছুই এগিয়ে চলল মসৃনভাবে অতি দ্রুত গতিতে, অথচ যথেষ্ট পবিত্রতার সঙ্গে। এবং বিশুদ্ধতা, আদেশ ও পবিত্রতা স্পষ্টতই খুশি করল তাদের যারা এতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মনে এ ধারণা আরও বেশি বদ্ধমূল হল যে সত্য সত্যই তারা জনসাধারণের উপকারের জন্য এক মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ কথাটা অনুভব করল নেখল্যুদভ।

জুরিরা আসন গ্রহণের সাথে সাথেই সভাপতি তাদের অধিকার, কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। কথা বলতে বলতে তিনি বারবার তার বসার ভঙ্গি পালটে নিলেন। কখনও ডানদিকে ঝুঁকলেন, কখনও বাঁ দিকে; কখনও পিছনদিকে হেলে পড়লেন, আবার কখনও সামনের দিকে; একবার চেয়ারের হাতলটা ধরছেন, তারপর মেলে ধরছেন কাগজটা; এই পেন্সিলটা ঘোরালেন, আবার এই তুলে নিলেন ছুরিটা।

তিনি তাদের বললেন, ইচ্ছে করলে সভাপতির মাধ্যমে তারা আসামীকে জেরা করতে পারেন; কাগজ, পেন্সিল ব্যবহার করতে পারেন, এবং সাক্ষী-সাবুদ হিসেবে যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে তার সবকিছু পরখ করে দেখতে পারেন। তাদের কর্তব্য হচ্ছে যথাযথ বিচার করা, মিথ্যাচার নয়। তাদের দায়িত্বের অর্থ হল—তাদের আলোচনার গোপনীয়তা যদি লঙ্ঘন করা হয়, কিংবা বাইরের লোক যদি তা কোনভাবে জানতে পারে—তবে তারা শাস্তি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রত্যেকে সশ্রদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনলেন। শুধু সেই ব্যবসায়ীটি, চারপাশে মদের গন্ধ ছড়িয়ে, বারবার হেঁচকি তুলে সভাপতির প্রত্যেকটি কথায় মাথা নাড়ল।

॥ নয় ॥

ভাষণ শেষ করে সভাপতি বন্দীর দিকে ফিরে বললেন, 'সিমন উঠে দাঁড়াও।'

সিমন একেবারে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার গালটা আরও জোরে নড়তে লাগল।

'তোমার নাম?'

'সিমন পেত্রোভিচ কারতিনকিন।' ভাঙা গলায় সে দ্রুত জবাব দিল। বোঝা গেল উত্তর আগে থাকতেই তৈরি ছিল।

'কোন শ্রেণীর লোক তুমি?'

'কৃষক।'

'কোন প্রদেশ, কোন জেলা, কোন যাজকের এক্তিয়ারে?'

'তুলা প্রদেশ, কারপিভেনস্কি জেলা, কুপাইনাস্কি যাজকের এলাকা, বোর্কি গ্রাম।'

'বয়স কত?'

'তেত্রিশ। এক হাজার আট সালে জন্মেছি।'

'ধর্ম কি?'

'গোঁড়া রুশ ধর্ম।'

'বিয়ে করেছ?'

'না, ধর্মাবতার।'

'পেশা কি?'

'মৌরিতানিয়া হোটেলে খানসামার কাজ করতাম।'

'এর আগে আর কখনও তোমার বিচার হয়েছিল?'

'না, আগে কখনও হয়নি—কারণ, আগে আমি যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতাম—'

'তাহলে আগে কখনও তোমার বিচার হয়নি?'

'ঈশ্বর রক্ষা করুন! কখনও নয়।'

'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ-পত্রের একটা নকল পেয়েছ কি?'

'পেয়েছি, হুজুর।'

পরবর্তী বন্দিনীর দিকের ফিরে সভাপতি বললেন, 'ইয়েভফিমিয়া ইভানোভনা বোচকোভা।'

কিন্তু সিমন বোচকোভার সামনে দাঁড়িয়েই রইল।

'কারতিনকিন, বসে পড়।'

কারতিনকিন তবুও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কারতিনকিন, বসে পড়।'

চোখজোড়া বড় বড় করে, মাথাটাকে একপাশে হেলিয়ে পেয়াদা তার কাছে এগিয়ে এসে বেশ চাপা গলায় যখন বলল যে 'বস, বসে পড়', তখনই সে বসল; এবং ঠিক তেমনি দ্রুততার সঙ্গে, যেমনটি করেছিল দাঁড়াবার সময়। তারপর ঢিলে পোশাকটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার আগের মতই ঠোঁট নাড়তে লাগল।

সামনের একটা কাগজে চোখ রেখে, বন্দিনীর দিকে না তাকিয়েই, বেশ ক্লান্তির শ্বাস ফেলে সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম?' নিজের কাজে তিনি এতই অভ্যস্ত যে একই সঙ্গে দু দুটো কাজ করছেন—শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য।

বোচকোভার বয়স তেতাল্লিশ, সে কোলমনা থেকে এসেছে : কারতিনকিনের মত সে-ও মৌরিতানিয়া হোটেলেই কাজ করত।

'এর আগে আর কখনও আমার বিচার হয়নি, এবং আমার বিরুদ্ধে অভি-যোগপত্রের একটা নকল পেয়েছি।' প্রতিটি উত্তর সে সাহসের সঙ্গে এমন স্বরে বলছে যে মনে হচ্ছে যেন অতিরিক্ত হিসেবে বলতে চাইছে, 'হ্যাঁ, আমিই হচ্ছি ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা ; আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রের নকলও পেয়েছি, এবং এ ব্যাপারে কে কি ভাবছে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না ; আর জানবেন, কোন রকমের বেআদবিকেই বরদাস্ত করব না।'

কারও বলার অপেক্ষা না করেই, শেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার নিজের আসনে বসে পড়ল।'

নারী-প্রেমি সভাপতিটি তৃতীয় বন্দিনীর দিকে ফিরে সে এখনও তার আসনে বসে রয়েছে দেখে অতিরিক্ত ভদ্রতা-মিশ্রিত গলায় বললেন, 'তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।'

মাসলোভা দ্রুত উঠে দাঁড়াল, এবং বক্ষ প্রসারিত করে, প্রস্তুত থাকার ভঙ্গিতে হাস্যোজ্জ্বল কালো চোখ দুটো সভাপতির মুখের ওপর নিবদ্ধ করল।

'তোমার নাম কি ?'

'লিউবোভ।' সে দ্রুত উত্তর দিল।

নেখলুদভ চশমা পরে, বন্দীদের প্রশ্ন করার সময় তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল। বর্তমান বন্দিনীর দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সে মনে মনে ভাবল, 'না, এ হতে পারে না।' বন্দিনার উত্তর শুনে নিজের মনেই বলল, 'লিউবোভ! তা কি করে হয় ?'

সভাপতি প্রশ্ন চালিয়ে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু চশমা-পরা সদস্যটি রাগতঃস্বরে কিছু একটা বলে বাধা দিলেন। সভাপতি মাথা নেড়ে বন্দিনীর দিকে ফিরে বললেন, 'এটা কি ? তোমাকে তো এখানে লিউবোভ নামে আনা হয়নি।'

বন্দিনী চুপ করে রইল।

'আমি তোমার আসল নামটা জানতে চাইছি।'

ক্রুদ্ধ সদস্যটি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ধর্মীয় নাম কি ?'

'আগে আমাকে কাতেরিনা বলে ডাকা হত।'

'না, এ হতেই পারে না.' নেখল্যুদভ নিজের মনে বলল ; যদিও সে এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হল যে এই সেই মেয়ে, সেই আধা-ভদ্র, আধা-চাকরানী, যাকে সে একদিন ভালবেসেছিল ; ভালবেসে উন্মত্ত আবেগে যার সতীত্ব নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এসে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণে যে সে-স্মৃতি তার মনে প্রচণ্ড বেদনা দিতে পারত, তাকে ধরে চাবকাত. আর প্রমাণ করে দিত যে, নিজের সাধুতা সম্পর্কে যে এত গর্বিত, সেই মানুষটিই একটি মেয়ের সঙ্গে এমন জঘণ্য ব্যবহার করেছিল, করেছিল এমন নীচ-কাজ।

হ্যাঁ, সেই। সে তার মুখে পরিষ্কার দেখতে পেল সেই আশ্চর্য অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্ব যা অন্য সবার মুখ থেকে একজনের মুখকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ; এটা একমাত্র তারই নিজস্ব, বেশ বিচিত্রও—অন্য কোথাও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অসুস্থতার ছাপ সারাটা মুখকে গ্রাস করে রাখলেও শুধুমাত্র এখানেই আছে

সেই সুমধুর প্রাণমাতানো ব্যক্তিত্ব ; ঐ ঠোঁটে, চোখের সামান্য তির্যক দৃষ্টিতে, স্বরে, মধুর হাসিতে আর সদা-প্রস্তুত মুখ এবং শরীরে।

আবার তেমনি ভদ্রসংযত স্বরে সভাপতি বললেন, 'তুমি তাই বলবে। তোমার পৈত্রিক নাম কি ?'

'আমি অবৈধ সন্তান।'

'ঠিক আছে, তোমাকে কি তোমার ধর্ম-পিতার নামে ডাকা হত না ?'

'হ্যাঁ, মিখাইলোভনা।'

নেখল্যুদভের স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে মনে মনে ভাবল, 'এর সঙ্গে দোষী হওয়ার সম্পর্কটা কি ?'

'তোমার পারিবারিক নাম—মানে তোমার পদবী কি—'সভাপতি বলে চললেন।

'তারা আমায় মায়ের পদবী অনুযায়ী মাসলোভা বলে ডাকত।'

'কোন শ্রেণী ?'

'নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে শ্রেণী।'

'ধর্ম—গোঁড়া ?'

'হ্যাঁ।'

'বৃত্তি ? মানে কি পেশা ছিল ?'

মাসলোভা চুপ করে রইল।

'কি কাজ করতে ?'

'আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম।'

চশমা-চোখে ভদ্রলোকটি রুক্ষস্বরে বললেন, 'কি ধরণের প্রতিষ্ঠানে ছিলে ?'

মৃদু হেসে সে বলল, 'তা আপনারাই ভাল জানেন।' তারপর দ্রুত একবার ঘরের চারদিক দেখে নিয়ে সভাপতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

তার মুখের ভঙ্গিমাতে এক অস্বাভাবিক ব্যঞ্জনা। তার হাসি, কথা, দ্রুত দৃষ্টিপাত ইত্যাদির অর্থ এত করুণ আর ভয়াবহ যে সভাপতি নিজেই লজ্জিত হলেন এবং মুহূর্তের জন্য সারাটা ঘরে নেমে এল নিস্তব্ধতা। হঠাৎ দর্শকমণ্ডলীর মধ্য থেকে একজন হেসে ওঠায় সে নিস্তব্ধতা দূরীভূত হল ; তাকে 'হিস্‌হিস্' শব্দ করে সতর্ক করে দিল অন্য একজন। সভাপতি চোখ তুলে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

'আগে কখনও বিচার হয়েছে তোমার ?'

'না, কখনও নয়।' মাসলোভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরম সুরে বলল।

'অভিযোগপত্রের একটা নকল পেয়েছ কি ?'

'পেয়েছি।'

'বস।'

মার্জিত কোন মহিলা যেভাবে ঘাগরার প্রান্ত টেনে নেয়, বন্দিনীও ঠিক সেভাবেই নিচু হয়ে তার জামার প্রান্ত তুলে নিয়ে স্বস্থানে বসে পড়ল। ছোট সাদা হাত দুটোকে ভাঁজ করে রাখল জামার আস্তিনের উপর ; এখনও সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সভাপতির দিকে।

সাক্ষীদের ডাকা হল, এবং কাউকে আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে যে ডাক্তারটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন তাকে আদালত কক্ষে

হাজির হবার জন্য আহ্বান জানালেন সভাপতি।

এবার কর্মসচিব উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগপত্র পড়া শুরু করলেন। তিনি জোর গলায় উচ্চারণ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু অস্বাভাবিক দ্রুততার জন্য শব্দগুলো একটা অন্যটার ঘাড়ে পড়ে এক বিচিত্র আওয়াজ করে চলল।

বিচারকেরা একবার চেয়ারের বাঁ দিকে, একবার ডানদিকে, একবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ছেন; কেউ কেউ ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন—কখনও চোখ খুলে, আবার কখনও বন্ধ করে। রক্ষীদের মধ্যে একজন হাই তুলতে গিয়েও আটকে ফেলল।

কারতিনকিন তার গাল নাড়নো একবারও বন্ধ করেনি; বোচকোভা একই-ভাবে সোজা-শান্ত হয়ে বসে রয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছে।

মাসলোভা অনড় হয়ে অভিযোগপত্র পাঠকারীর দিকে অচঞ্চল নেত্রে চেয়ে রয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে এমনভাবে একটু আধটু নড়ে উঠছে যে মনে হচ্ছে সে যেন কিছু একটা বলতে চাইছে। হঠাৎ হঠাৎ মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে, দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, হাত দুটো নড়ে-চড়ে উঠছে, এবং চোখ দুটো ঘুরছে। তারপর সেটা এসে নিবদ্ধ হচ্ছে অভিযোগপত্র পাঠকারীর ওপর।

সামনের সারির চেয়ারগুলোর কোণের দিক থেকে দ্বিতীয়টাতে নেখলুদভ বসে চশমা ছাড়াই মাসলোভার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তার সারাটা হৃদয় জুড়ে চলেছে এক কঠিন বেদনাদায়ক সংগ্রাম।

॥ দশ ॥

অভিযোগপত্রটা হচ্ছে এই:

১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে স্মেলকভ নামে সাইবেরিয়ার কুরগান শহরের একজন দ্বিতীয় গিল্ডের ব্যবসায়ী মোরিতানিয়া হোটেলে আকস্মিকভাবে মারা যান!

চতুর্থ জেলার স্থানীয় পুলিশ ডাক্তার এই মর্মে শংসাপত্র দেন যে অত্যাধিক মদ্যপানের জন্য হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে স্মেলকভের মৃত্যু ঘটেছে। তার দেহের ময়না তদন্ত হয়েছে।

এর কদিন পর স্মেলকভ যে শহরের বাসিন্দা ছিলেন সেই শহরেরই অন্য একজন ব্যবসায়ী তিমোখিন, পিটার্সবুর্গ থেকে ফেরেন। এবং স্মেলকভের মৃত্যু-ঘটিত সমস্ত কাহিনী শোনার পর তার মনে এই সন্দেহের উদয় হয় যে স্মেলকভের সঙ্গের টাকাপয়সা চুরি করার উদ্দেশ্যে তাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

এক প্রাথমিক তদন্তে তার এই সন্দেহের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। সে তদন্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

(১) মৃত্যুর ঠিক আগেই স্মেলকভ ব্যাঙ্ক থেকে ৩৮০০ রুবল তুলে এনেছিলেন, কিন্তু তার মৃত্যুর পর ঘর তল্লাশি করে পাওয়া যায় মাত্র ৩১২ রুবল ১৬ কোপেক।

(২) মৃত্যুর আগে স্মেলকভ সারাদিন সারারাত লিউবকা নাম্নী (কাতারিনা মাসলোভা) একটি পতিতার সঙ্গে পতিতালয়েই থাকেন। তার অনুপস্থিতিতে, হোটেলের যে ঘরটিতে তিনি ছিলেন, কাতারিনা সেই ঘরে যায় অর্থের অনুসন্ধানে। হোটেলের দুজন কর্মচারী ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা ও সিমন কারতিনকিনের

উপস্থিতিতে স্মেলকভের দেওয়া চাবি দিয়ে সে টাকা পয়সা রাখার বাক্সটা খোলে এবং বন্ধ করে। যখন বাক্স খোলা হয়, তখন বোচকোভা আর কারতিনকিন নিজেদের চোখে দেখেছে যে সেখানে অনেকগুলো একশ রুবলের নতুন ব্যাঙ্ক-নোট ছিল। একথা তারা তাদের জবানবন্দীতে স্বীকার করেছে।

(৩) স্মেলকভ যখন পতিতালয় থেকে মৌরিতানিয়া হোটেলে ফিরে আসে তখন লিউবকা নাম্নী পতিতাটিও তার সঙ্গেই ছিল। কারতিনকিনের নির্দেশে, তারই দেওয়া কিছুটা সাদা পাউডার সে মদের গেলাসে ঢেলে দেয়, এবং স্মেলকভকে সেই মদ পান করানো হয়।

(৪) সেদিন সকালেই লিউবকা (কাতেরিনা মাসলোভা) তার মনিবানীর কাছে (পতিতালয়ের কর্ত্রী কিতায়েভা) একটি হীরের আংটি বিক্রী করে। এবং সে দাবি করছে যে সেটা নাকি সেই স্মেলকভই তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

(৫) সেই কামরার চাকরানী ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা স্মেলকভের মৃত্যুর পরের দিনই ব্যাঙ্কের চলতি আমানতে ১৮০০ রুবল জমা দিয়েছে।

স্মেলকভের দেহের ডাক্তারী পরীক্ষা, ময়না-তদন্ত এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে তার পাকস্থলীতে বিষের উপস্থিতির কথা জানা গেছে। সুতরাং এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে বিষ প্রয়োগেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

অভিযুক্তা মাসলোভা, বোচকোভা এবং কারতিনকিন—এরা সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছে। মাসলোভা তার বিবৃতিতে বলেছে যে, যে পতিতালয়ে সে 'কাজ করে,' সে পতিতালয়ে স্মেলকভ উঠেছিলেন, এবং তিনিই তাকে মৌরিতানিয়া হোটেলে পাঠিয়ে ছিলেন চল্লিশ রুবল নিয়ে আসবার জন্য; এবং তার দেওয়া চাবি দিয়েই সে হোটেলে গিয়ে নির্দিষ্ট বাক্স খুলে নির্দেশিত চল্লিশ রুবলই বের করে, তার বেশি একটি কপর্দকও নয়। বোচকোভা আর কারতিনকিন—যাদের সামনে সে বাক্সটা খুলেছিল, তারাই তার এ কথার প্রমাণ দেবে।

পুনরায় সে বলেছে যে, দ্বিতীয়বার হোটেলে আসার পর, স্মেলকভের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, কারতিনকিনের নির্দেশে ঘুমের ওষুধ ভেবে কিছুটা সাদা পাউডার মদের সাথে মিশিয়ে সে তাকে খাইয়ে দেয়। আর আংটিটা স্মেলকভই তাকে দিয়েছিল মারার পর—যখন কিনা সে কাঁদতে কাঁদতে এই বলে তাকে ভয় দেখিয়েছিল যে সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

জেরা করার সময় অভিযুক্ত ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা বলেছে যে টাকা পয়সা হারানো সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, এবং স্মেলকভের ঘরেও সে কখনও ঢোকেনি; তবে লিউবকাকে সেখানে দেখেছে। অতএব যদি কিছু চুরি গিয়ে থাকে তবে তা লিউবকারই কাজ, কারণ একমাত্র সে-ই স্মেলকভের চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল বাক্স থেকে টাকা বের করবার জন্য।'

এবার মাসলোভা নড়ে উঠল; মুখটা কিছুটা ফাঁক করে বোচকোভার দিকে তাকাল।

কর্মসচিব বলে চললেন, 'যখন বোচকোভাকে ব্যাঙ্কে ১৮০০ রুবল জমা দেবার রসিদটা দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে এত বিপুল অর্থ সে পেল কোথা থেকে, তখন সে জবাব দেয় যে ওটা তার এবং তার ভাবী স্বামী সিমনের বার বছরের উপার্জিত অর্থ।

অভিযুক্ত সিমন কারতিনকিন প্রথমবারের জেরাতেই একথা স্বীকার করেছে যে মাসলোভোর নির্দেশেই সে পতিতালয় থেকে চাবি নিয়ে এসে বাক্স থেকে সমস্ত টাকাটা চুরি করে এবং সেটা মাসলোভা আর সে সমান সমান ভাগ করে নেয়।'

এবার মাসলোভা আবার নড়ে চড়ে উঠল, রাগত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে করে দিল, কিন্তু পেয়াদা থামিয়ে দেওয়ায় সে চুপ করল।

কর্মসচিবটি আবার পড়ে চললেন, 'অবশেষে কারতিনকিন স্বীকার করেছে যে ঘুম পাড়াবার জন্যই সে পাউডারের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তাকে আবার জেরা করা হয় তখন সে টাকা চুরি আর মাসলোভাকে পাউডার দেওয়া—এ দুটো ব্যাপারই সরাসরি অস্বীকার করে, এবং বলে যে মাসলোভা একাই নাকি সবকিছু করেছে। বোচকোভার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবার ব্যাপারে, বোচকোভা যা বলেছে সিমনের বক্তব্যও তাই। অর্থাৎ, সে টাকাটা তারা পেয়েছে হোটেলে তাদের বার বছরের কর্মজীবনে—বিভিন্ন বাসিন্দাদের কাছ থেকে বকশিশ বাবদ।'

এরপর পড়া হল আসামীদের বন্দী অবস্থায় গৃহীত জেরার বিবরণী, সাক্ষীদের জবানবন্দী, এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অবশেষে অভিযোগপত্র সিদ্ধান্ত টেনেছে এই বলে যে, 'উপরিউক্ত বিষয়ের ফলস্বরূপ বোর্কি গ্রামের তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক কৃষক সিমন কারতিনকিন, তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্কা শহুরে নিম্নমধ্যবিত্তা ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা এবং সাতাশ বৎসর বয়স্কা শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্তা কাতেরিনা মাসলোভা যৌথভাবে ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে স্মেলকভ নামক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আড়াই হাজার রুবল মূল্যের একটি হীরের আংটি ও নগদ টাকা চুরি এবং উক্ত স্মেলকভকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।

'ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫৩ ধারায় এই অপরাধ সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং ফৌজদারি আদালতের কার্যপ্রণালীর ২০১ ধারা অনুযায়ী সিমন কারতিনকিন, ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা এবং কাতেরিনা মাসলোভা জুরিদের দ্বারা বিচারের উদ্দেশ্যে এই জেলা আদালতে আনীত হয়েছে।'

কর্মসচিব অভিযোগপত্রটি পড়ে, কাগজগুলো ভাঁজ করে রেখে, নিজের আসনে বসে লম্বা চুলগুলোয় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। সকলে মনে মনে এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যে, যাই হোক এবার তাহলে কাজ শুরু হবে, এবং অচিরেই। তারা নিজেরা এবং আইন দুটোই মুক্তি পাবে। একমাত্র নেখলুদভই এই স্বস্তির স্বাদ অনুভব করতে পারছে না। বারবার এই একটা চিন্তাই তার মনে আগুন জ্বালিয়ে তুলছে যে কী ভাবে সেই নিষ্পাপ মেয়েটি, যাকে সে আজ থেকে দশ বছর আগে চিনত, সে এমন একটা জঘন্য কাণ্ড করে বসল।

॥ এগার ॥

অভিযোগপত্র পড়া শেষ হলে, সভাপতি অন্যসব সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে কারতিনকিনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে, মনে হল তিনি যেন বলতে চাইছেন, 'তাহলে এবার আমরা সবকিছু আগাগোড়া বিচার করে সত্যকে টেনে বার করছি।'

বাঁদিকে একটু হেলে তিনি ডাক দিলেন, 'কৃষক সিমন কারতিনকিন।'

সিমন কারতিনকিন উঠে দাঁড়াল; হাত দুটোকে নিজের দিকে টেনে,

শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, মুখে একটাও কথা না বলে, শুধুমাত্র চিবুকটা নাড়িয়ে চলল।

'১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা ও কাতেরিনা মাসলোভার সাথে একত্রিত হয়ে ব্যবসায়ী স্মেলকভের বাক্স থেকে টাকা চুরি এবং কিছুটা বিষ যোগাড় করে স্মেলকভকে খাইয়ে দেবার জন্য কাতারিনা মাসলোভাকে প্ররোচিত করে স্মেলকভের মৃত্যু ঘটানোর জন্য তুমি দায়ী। তুমি কি নিজের দোষ স্বীকার করছ?'

'না, কিছুতেই নয়; আমাদের কাজই হল অতিথিদের দেখাশোনা করা, এবং—'

'এসব তুমি পরে বলতে পারবে। তুমি কি নিজের দোষ স্বীকার করছ?'

'না, না হুজুর, আমি শুধু—'

'ওসব তুমি আমাদের পরে বলবে। তুমি কি দোষ স্বীকার করছ?' দৃঢ় শান্ত স্বরে কথাগুলো বললেন সভাপতি।

'এ রকম কিছু করতেই পারিনা—কারণ.' পেয়াদা দ্রুত তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

সভাপতি কাগজ থেকে হাতটাকে সরিয়ে নিয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে অনেকটা ধমকের সুরেই বললেন, 'তাহলে এটা শেষ হল।' তারপর তিনি বোচকোভার দিকে ফিরলেন। বললেন, 'ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি মোরিতানিয়া হোটেলে সিমন কারতিনকিন এবং কাতেরিনা মাসলোভার সঙ্গে একত্রিত হয়ে তুমি ব্যবসায়ী স্মেলকভের বাক্স থেকে টাকাকড়ি ও একটা আংটি চুরি কর, এবং অন্য দুজনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা কর। তুমি কি তোমার দোষ স্বীকার করছ?'

বন্দিনী বেশ দৃঢ়স্বরে সাহসের সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমি কোন দোষ করিনি। আমি তার ঘরের কাছেও যাইনি, যা-কিছু করার তা মাসলোভাই করেছে।'

সভাপতি তেমনি শান্ত এবং দৃঢ় স্বরে বললেন, 'এসব তুমি পরে বলবে; তাহলে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছ না?'

'আমি টাকা চুরি করিনি; তাকে মদও খেতে দিইনি, কিংবা তার ঘরেও ঢুকিনি। যদি আমি তার ঘরে যেতাম তবে মাসলোভাকে লাথি মেরে বের করতাম।'

'তাহলে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছ না?'

'কখনোই না।'

'ভাল কথা।' এরপর সভাপতি তৃতীয় বন্দিনীর দিকে ফিরে বলতে শুরু করলেন, 'কাতেরিনা মাসলোভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তুমি পতিতালয় থেকে চাবি নিয়ে এসে স্মেলকভের বাক্স খুলে টাকা পয়সা আর একটা হীরের আংটি চুরি করেছ।' মুখস্ত করা বিদ্যের মত শব্দগুলো আউরে তিনি তার বাঁ দিকে উপবিষ্ট সদস্যটির দিকে ঝুঁকলেন; সদস্যটি তাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন যে, যে সব মালপত্র প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার থেকে একটা কলসি খোয়া গেছে। 'তার বাক্স খুলে কিছু টাকা পয়সা আর একটা হীরের আংটি চুরি করেছ।' তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তারপর সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে, স্মেলকভের সঙ্গে মোরিতানিয়া হোটেলে ফিরে গিয়ে তাকে মদের সাথে বিষ মিশিয়ে খেতে দাও, ফলে তার মৃত্যু ঘটে। তুমি কি দোষ স্বীকার করছ?'

মাসলোভা অতি-দ্রুত জবাব দিল, 'আমি কোন দোষ করিনি। আগেও যেমন বলেছি, তেমনি এখনও আবার বলছি, আমি নিইনি, নিইনি,—কিছুই নিইনি ; আর আংটিটা সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।'

সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আড়াই হাজার রুবল চুরি করার অপরাধ তুমি স্বীকার করছ না ?'

'চল্লিশ রুবল ছাড়া আমি আর কিছুই নিইনি।'

তাহলে স্মেলকভের মদে পাউডার মেশাবার অপরাধ স্বীকার করছ কি ?'

'হ্যাঁ, সেটা আমি করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে ওটা ঘুমোবার ওষুধ, এবং ওতে কোন ক্ষতি হবে না। এসব ওরাই আমাকে বুঝিয়েছিল। আমি কখনও চিন্তাই করিনি, আর আমার সেরকম কোন ইচ্ছেও ছিলনা। ঈশ্বরই এক্ষেত্রে আমার একমাত্র সাক্ষী, আমি কখনোই এটা চাইনি।'

সভাপতি বললেন, 'তাহলে স্মেলকভের আংটি এবং টাকা চুরির অভিযোগ তুমি স্বীকার করছ না ; শুধু স্বীকার করছ যে তুমি তাকে পাউডারটা দিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ; আমি তা স্বীকার করছি। আমি ভেবেছিলাম যে ওটা ঘুমোবার ওষুধ। আমি শুধু তাকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলাম, তার কোন অনিষ্ট করতে চাইনি কখনোই।'

সভাপতি তার জিজ্ঞাসাবাদে বেশ সন্তুষ্ট হয়েই বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এবার বল ঘটনাটা কিভাবে ঘটল।' এরপর হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে তিনি চেয়ারে হেলান দিলেন। 'আমাদের সবকিছু খুলে বল ; একমাত্র সত্য কথা স্বীকারেই তোমার মঙ্গল, তাতেই তুমি মুক্তি পাবে।'

মাসলোভা নীরবে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সভাপতির দিকে।

'ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল !'

'কিভাবে ঘটল !' মাসলোভা হঠাৎ বেশ দ্রুততার সঙ্গে বলতে শুরু করল, 'আমি হোটেলে এসে তার ঘরে ঢুকলাম। তিনি তখন মদে চুর হয়ে আছেন।' বিস্ফারিত নয়নে ভয়ের প্রলেপ লাগিয়ে সে 'তিনি' শব্দটা উচ্চারণ করল। 'আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা।' মাসলোভা থেমে পড়ল ; মনে হল সে যেন চিন্তায় খেই হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা অন্য কিছু চিন্তা করছে।

'হুঁ, তারপর ?'

'তারপর ? তারপর কিছুক্ষণ থেকে বাড়ি চলে গেলাম।'

ঠিক এই সময়ে সরকারি উকিল, বেশ বিচিত্রভঙ্গিতে কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন।

সভাপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কোন প্রশ্ন করতে চান ?' তার কাছ থেকে সদর্থক উত্তর পেয়ে তিনি তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন।

মাসলোভার দিকে না তাকিয়েই সরকারি উকিল প্রশ্ন করলেন, 'আমি জানতে চাই, সিমন কারতিনকিনের সঙ্গে কি বন্দিনীর পূর্ব-পরিচয় ছিল ?' প্রশ্নটা করে তিনি ঠোঁট চাটলেন এবং ভ্রূ-ভঙ্গি করলেন।'

সভাপতি প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন। মাসলোভা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে সরকারি উকিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিমনের সাথে ? হ্যাঁ।'

'আমি জানতে চাই কারতিনকিনের সাথে বন্দিনীর কি ধরনের সম্পর্ক ছিল ?'

তারা কি মাঝে মধ্যেই দেখা সাক্ষাৎ করত ?'

উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে একবার সরকারি উকিল এবং একবার সভাপতির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কি রকম আবার। সে আমাকে তার হোটেলের অতিথিদের জন্য আসার আহ্বান জানাতে যেত। এতে তেমন একটা পরিচয়ের প্রশ্নই ওঠে না।'

সরকারি উকিল আধবোজা চোখ, চতুর ভঙ্গি আর কুটিল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি জানতে চাই, এত মেয়ে থাকতে কারতিনকিন কেন বারবার শুধু মাসলোভাকেই অতিথিদের জন্য আহ্বান জানাত ?'

ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে, নেখল্যুদভের দিকে কিছুক্ষণ নজর নিবদ্ধ করে মাসলোভা উত্তর দিল, 'আমি জানিনা ; কি করে জানব ? সে তাকে জিজ্ঞেস করছিল, কাকে তার পছন্দ হয় ? এই—'

'তাহলে ও কি আমাকে চিনতে পেরেছে ?' কথাটা মনে হতেই নেখল্যুদভের সারাটা মুখ লাল হয়ে গেল। কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে কোনরকম ফারাকের চিহ্ন না রেখেই মাসলোভা তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সরকারি উকিলের দিকে তাকাল।

'তাহলে বন্দিনী কারতিনকিনের সঙ্গে তার কোনরকম বিশেষ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করছে ? ভাল কথা, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।'

সরকারি উকিল ডেস্কের ওপর থেকে তার কনুই সরিয়ে নিয়ে কিছু একটা লেখার ভান করলেন। কিন্তু আসলে তিনি কিছুই লিখছেন না, শুধু কলমটা হাতে নিয়ে নোটের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন ; অবশেষে বিপক্ষের কৌশলীরা যাতে বেশ ভাল রকমের নাজেহাল হতে পারে, সেইজন্য কী একটা মন্তব্য লিখে নিলেন।

সভাপতি বন্দিনীকে আর কোন প্রশ্নই করলেন না, কারণ তিনি চশমা-চোখে সদস্যটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত কিনা যে আগে থাকতে তৈরি করা প্রশ্নগুলো এবার জিজ্ঞেস করা হবে।

এবার বললেন, 'আচ্ছা. তারপর কি হল ?'

সভাপতির দিকে সাহসী দৃষ্টি মেলে ধরে মাসলোভা বলল, 'আমি বাড়ি চলে এলাম। গৃহকর্ত্রীকে টাকা দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সবে একটু তন্দ্রাভাব এসেছে এমন সময় আমারই পেশার একটি মেয়ে, বার্থা, আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "ওঠ্, সেই ব্যবসায়ীটি আবার এসেছে।" আমার যাবার কোন ইচ্ছেই ছিল না, কিন্তু আমাদের গৃহকর্ত্রী আমাকে যেতে বাধ্য করলেন। তিনি—' মাসলোভা বেশ লক্ষণীয় ভয়ের সাথে 'তিনি' শব্দটা আবার উচ্চারণ করল, 'তিনি তখন অন্যান্য মেয়েদের সাথে মস্করা করছিলেন, এবং আবার মদ কিনতে পাঠাবার জন্য উদ্যত হয়ে দেখলেন যে তার পকেটে আর পয়সা নেই, এবং আমাদের গৃহকর্ত্রীও তাকে ভরসা করে টাকা ধার দিতে রাজি হলেন না। তখন তিনি আমাকে হোটেলে পাঠালেন টাকা আনতে ; এবং বলে দিলেন, কত আনতে হবে, আর কোথায় তা আছে। শুধু সে কারণেই আমি হোটেলে গিয়েছিলাম।'

সভাপতি এতক্ষণ তার বাঁদিকে উপবিষ্ট সদস্যটির সঙ্গে ফিস্‌ফাস্ করে কথা বলছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে মাসলোভার কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এটা বোঝাবার জন্যই তার শেষ কথাগুলো আবার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'এজন্য গিয়েছিলে ? তারপর ?'

'আমি গেলাম, এবং সে যা যা বলেছিল তাই করলাম। তবে তার ঘরে আমি

একা ঢুকিনি, ঢুকেছিলাম সিমন আর ওকে সাথে নিয়ে।' বোচকোভার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে কথাটা বলল।

'মিথ্যে কথা, আমি কখনও ভেতরেই যাইনি।' বোচকোভা বলতে শুরু করল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দেওয়া হল।

বোচকোভার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই মাসলোভা বলতে লাগল, 'তাদের উপস্থিতিতেই আমি চারটে ১০ রুবলের নোট নিলাম।'

সরকারি উকিল বললেন, 'ভাল কথা, কিন্তু বন্দিনী কি টাকা নেবার সময় লক্ষ্য করেছিল যে সেখানে আর কত টাকা ছিল?'

সরকারি উকিল এ প্রশ্ন করায় মাসলোভা বেশ জোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল, কিন্তু কেন যে তা হল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। তবে উপলব্ধি করল, সরকারি উকিল তার ক্ষতি করবার জন্য বদ্ধপরিকর।

'আমি গুনে দেখিনি, তবে বেশ কিছু একশ রুবলের নোট দেখেছিলাম।'

'এই তো, বন্দিনী তাহলে সেখানে অনেকগুলো একশ রুবলের নোট দেখেছিল। বেশ ভাল কথা।'

ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে সভাপতি বললেন, 'তাহলে তুমি টাকাটা নিয়ে ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তারপর?'

'তারপর তিনি আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে চললেন।' মাসলোভা বলল।

'তাহলে তার মদে পাউডারটা কিভাবে দিলে?'

'কিভাবে দিলাম? মদে মেশালাম, তারপর দিলাম।'

'কেন দিলে?'

সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নটার জবাব দিল না, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর নীরবতা ভেঙ্গে বলল, 'সে কিছুতেই আমাকে যেতে দিচ্ছিল না; অথচ আমি ছিলাম প্রচণ্ড ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাই বেরিয়ে এসে সিমনকে বললাম, "কিছুতেই ছাড়ছে না, অথচ আমি আর ক্লান্তিতে থাকতে পারছি না।" উত্তরে সিমন বলল, "আমরাও ওকে নিয়ে খুব উত্যক্ত। ভাবছিলাম একটা ঘুমের ওষুধ খেতে দেব। তাতে ও ঘুমিয়ে পড়বে, আর তুমিও চলে যেতে পারবে।" সুতরাং আমি বললাম, "ঠিক আছে, তাই দাও।" ভাবলাম, ঘুমের ওষুধ খেলে তো কোন ক্ষতি হয় না। সিমন আমাকে একটা পাউডারের প্যাকেট দিল, আমি সেটা নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। তিনি শুয়েছিলেন, আমাকে দেখেই আবার মদ চাইলেন। টেবিলের ওপর থেকে এক বোতল মদ এনে দুটো গেলাসে ঢাললাম; তার একটা আমার আর অন্যটা ওর। গ্লাসের মদের মধ্যে পাউডারটাকে ঢেলে ওকে খেতে দিলাম। যদি জানতাম যে ওটা বিষ তাহলে কি কখনও তা তাকে খেতে দিতাম?'

সভাপতি বললেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু আংটিটা তোমার কাছে এল কি করে?'

'তিনি নিজেই আমাকে এটা দিয়েছিলেন।'

'কখন দিয়েছিলেন?'

'যখন তার ঘরে ফিরে এলাম, তখন। আমি চলে যেতে চাইলে পর আমার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে তিনি আমার চিরুনিটাকে ভেঙ্গে দিলেন। এতে আমি

রেগে গেলাম; চলে যেতে চাইলাম তৎক্ষণাৎ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার হাত থেকে আংটিটা খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন, যাতে আমি আর চলে যেতে না চাই।'

সরকারি উকিল আবার উঠে দাঁড়ালেন, খুব সহজ ভঙ্গিতে প্রার্থনা জানালেন কয়েকটা প্রশ্ন করার। অনুমতি পেয়ে, কাজ-করা কলারের ওপর মাথা নুইয়ে বললেন, 'আমি জানতে চাই, বন্দিনী কতক্ষণ স্মেলকভের ঘরে ছিল?'

মাসলোভার মুখে আবার ভীতির চিহ্ন নেমে এল। সে সরকারি উকিল থেকে সভাপতি পর্যন্ত সবার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ বেশ দ্রুততার সঙ্গে বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু বন্দিনী কি মনে করতে পারছে যে স্মেলকভের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সে হোটেলে অন্য কারও ঘরে গিয়েছিল কিনা?'

মাসলোভা এক মুহূর্ত ভেবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম; সেই ঘরটার পাশেই আর একটা ফাঁকা ঘর ছিল, সেটাতেই গিয়েছিলাম।'

নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গিয়ে সরকারি উকিল এবার একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'কেন গিয়েছিলে?'

'বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলাম; ঘোড়ার গাড়ি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম।'

'আর সেখানে কারতিনকিনও ছিল; কি ছিল না?'

'হ্যাঁ, সে এসেছিল।'

'কেন এসেছিল?'

'ব্যবসায়ীটির বোতলে তখনও কিছুটা মদ ছিল, আমরা দুজনে মিলে সেটাকে শেষ করেছিলাম।'

'বাঃ, দুজনে মিলে শেষ করলে! খুব ভাল! তা বন্দিনী কি কারতিনকিনের সঙ্গে কথা বলেছিল? যদি বলে থাকে, তবে কি ব্যাপারে?'

মাসলোভা হঠাৎ ভ্রূভঙ্গি করল, লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল, এবং বেশ দ্রুততার সঙ্গে বলল, 'কি ব্যাপারে? কোন কিছু সম্পর্কেই আমি কোন কথা বলিনি; এবং এটাই ঠিক। আপনি আমার সম্বন্ধে যা খুশি ভাবুন, আমি মোটেই দোষী নই; ব্যাস।'

সরকারি উকিল বললেন, 'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' এবং বেশ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে তিনি তার বক্তৃতার জন্য নোট লিখতে শুরু করলেন। লিখলেন, বন্দিনীর নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী সে কারতিনকিনের সঙ্গে একটা ফাঁকা ঘরে ছিল।

এরপর কিছুক্ষণের নীরবতা।

'তোমার আর কিছু বলবার নেই?'

'যা বলার ছিল তা বলেছি।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথাটা শেষ করে সে বসে পড়ল।

এবার সভাপতি কাগজে কী যেন লিখতে শুরু করলেন, তারপর পাশে বসা সদস্যটির কাছ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু একটা শুনে দশ মিনিটের জন্য আদালত মুলতুবি ঘোষণা করে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দয়ালু চোখ আর লম্বা দাড়িওলা সদস্যটির কাছ থেকে তিনি যা শুনলেন তা হল: সদস্যটি অল্প পেটের

বেদনা হওয়ায় একটু ম্যাসেজ এবং সামান্য মদ্যপান করতে চান। এবং সেজন্যই আদালত স্থগিত রাখা হল।

বিচারকরা উঠে পড়ার পর, আইনজীবি, জুরি, এবং সাক্ষীরাও উঠে পড়লেন, আর যেন কর্তব্যকর্মের অর্ধেকটাই সম্পূর্ণ করা হয়ে গেছে এমন একটা ভাব নিয়ে এক একজন এক এক দিকে চলে গেলেন।

নেখল্যুদভও উঠে গিয়ে জুরিদের ঘরে ঢুকেন একটা জানলার সামনে বসলেন।

॥ বার ॥

'হ্যাঁ, এ কাত্যুসাই।'

নেখল্যুদভ ও কাত্যুসার মধ্যে সম্পর্কটা ছিল এ ধরনের :

নেখল্যুদভের সঙ্গে কাত্যুসার যখন প্রথম দেখা হয় তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। গরমের ছুটির অবকাশে জোতের শর্ত সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য সে তার পিসির বাড়িতে গিয়ে ওঠে। এর আগে প্রতি বছরই তার গরমের ছুটি কাটত মস্কোর খুব কাছে তার মায়ের জমিদারিতে—মা ও বোনের সঙ্গে একত্রে। কিন্তু সে বছর তার বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর মা গিয়েছিলেন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। ফলে সে গিয়ে হাজির হল পিসিদের কাছে—রচনাটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার উদ্দেশ্য। পিসিদের জমিদারির এলাকাটা ছিল সত্যিই শান্ত; সেখানে কোন কিছুই কারও মন বিক্ষিপ্ত করতে সক্ষম ছিল না। আর তাছাড়া তার পিসিরা ভাইপোকে, অর্থাৎ তাদের উত্তরাধিকারীকে স্নেহও করত যথেষ্ট; আর ভাইপোরও পিসিদের ভাল লাগত খুবই; বিশেষতঃ তাদের সহজ সরল পুরনো পদ্ধতির জীবনযাত্রার জন্য।

সেই গ্রীষ্মে পিসিদের জমিদারিতে নেখল্যুদভের বাঁধাবন্ধহীন যৌবনের কটা দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হল। সে সেদিন প্রথমবারের জন্য উপলব্ধি করল যে জীবন সত্যিই সৌন্দর্য আর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, এবং পুরুষের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা রয়েছে নিজের আত্মা ও সমগ্র পৃথিবীর পরিপূর্ণতাকে অসীম গতিতে ছুঁয়ে ফেলার আর শুধুমাত্র আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে কল্পনাকে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন। সে বছরই সে স্পেনসারে 'সামাজিক মতবাদ' পড়েছে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত স্পেনসারের বক্তব্যের সঙ্গে সে নিজের একাত্মতা উপলব্ধি করল—যদিও সে নিজেই ছিল এক বিরাট জমিদারির উত্তরাধিকারী। তার বাবা ধনী ছিলেন না, তবে তার মা বিয়ের যৌতুক হিসেবে পঁচিশ হাজার একর জমি পেয়েছিলেন। সে তখন উপলব্ধি করেছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে জমি রাখাটা নিতান্ত অন্যায়, এবং নিষ্ঠুরতা। বিবেকের দাবি অনুযায়ী তাকে সব অধিকার ত্যাগ করতে হবে—এমনি এক উচ্চতম আদর্শে তখন সে বিভোর। মনে মনে ঠিক করে ফেলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি সে গ্রহণ করবে না, তা বিলি করে দেবে গরিব ক্ষেত মজুরদের মধ্যে। জমির এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সে লিখছিল তার রচনা।

একটা বিশেষ কর্মসূচি আনুযায়ী সে তার পিসিদের জমিদারিতে দিন কাটত। কর্মসূচিটা ছিল এরকম : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠত, কখনও রাত তিনটের, সূর্য ওঠার আগেই পাহাড়ের নিচে নদীতে গিয়ে স্নান সারত। যখন ফিরত, তখনও হয়ত ঘাস আর ফুলের ওপর শিশিরবিন্দু টলটল করছে। কখনও কখনও কফি

খাওয়ার পর বইপত্র নিয়ে বসত গবেষণা শুরু করতে, তবে বেশির ভাগ দিনই চলে যেত মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার জন্য ; আবার দুপুরে খাবার সময় হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত বাগানে। খেতে বসে পিসিদের সাথে মজা করত, তারপর ঘোড়ায় চড়ত, কিংবা নদীতে যেত নৌকো চড়তে ; ফিরে এসে কোন কোনদিন হয়ত সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিত পিসিদের সঙ্গে শুধু তাস খেলে।

বেশিরভাগ রাতে, বিশেষতঃ চাঁদনী রাতে সে একেবারেই ঘুমোতে পারত না। এর কারণ ছিল খুবই সোজা—আবেগের তাড়নায় সে ভেসে চলত ; ঘুমোবার বদলে ঘুরে বেড়াত বাগানে, স্বপ্ন দেখত। কখনও কখনও হয়ত সারাটা রাতই কাবার হয়ে যেত এভাবে।

বলতে গেলে পিসিদের সঙ্গে বেশ শান্তি আর স্বস্তিতে তার প্রথম মাসটা অতিবাহিত হল। সে সময় আধা-ভদ্র, আধা-চাকরানী, কাজলনয়না, দ্রুত সঞ্চারণশীলা কাত্যুসার প্রতি তার কোন নজরই পড়ল না। তখন সে তার (বয়স উনিশ) মায়ের স্নেহে লালিত পূর্ণ পবিত্র এক যুবক। সেসময় যদি কখনও তার স্বপ্নে কোন নারীর আবির্ভাব হতও, তবে তা হত নিতান্তই স্ত্রীর বেশে। আর সব মেয়েরা, তার মতে যাদেরকে বিয়ে করা মোটেই সম্ভব নয়, তারা কখনোই তার কাছে নারী রূপে প্রতিভাত হত না ; তার দৃষ্টিতে তারা সবাই ছিল নিতান্তই মানুষ।

সেই গ্রীষ্মে খ্রীষ্টের হত্যার দিনে, পিসিদের প্রতিবেশী একটি পরিবারের দুটি যুবতী মেয়ে ও একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র, আর চাষীদের ঘরের একজন শিল্পী তাদের বাড়িতে এল সেই বিশেষ দিনটি পালন করার উদ্দেশ্যে। চা পানের পর বাড়ির সামনের মাঠটাতে তারা সবাই একত্রে জড়ো হল। মাঠের ঘাস তখন কাটা হয়ে গেছে ; তারা সেখানেই খেলা শুরু করে দিল। কাত্যুসাও ভিড়ে গেল তাদের দলেই। খেলার সময় নেখল্যুদভ তাকে ছুঁয়ে দিল, ফলে সে হয়ে গেল তার জুটি। যদিও কাত্যুসার চাহনী তাকে আকৃষ্ট করল, কিন্তু কোন রকম ঘনিষ্ট সম্পর্কের চিন্তাই তার মাথায় ঠাঁই পেল না সে মুহূর্তে।

চাষী শিল্পীটি তার খুদে, বাঁকা চাষারে পায়ে বেশ দ্রুত ছুটতে পারত। তার যখন পালা এল তখন সে বলল, 'হোঁচট না খেলে ওদের কিছুতেই ধরা যাবে না।'

কাত্যুসা বলল, 'তুমি!...কি, আমাদের ধরবে না?'

'এক, দুই, তিন।' শিল্পী তার হাত ধরে ফেলল।

কাত্যুসা প্রচণ্ড হাসতে হাসতে শিল্পীর পেছনে নেখল্যুদভের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিল ; আর তারপর তার চওড়া হাতে নিজের রুক্ষ হাতের চাপ দিয়ে বাঁদিকে ছুটে গেল পেটিকোটের সন্‌সন্‌ শব্দ তুলে।

শিল্পীর হাত থেকে বাঁচার জন্য নেখল্যুদভ দ্রুত ডান দিকে চলে গেল, কিন্তু যখন পিছে তাকাল, তখন দেখল শিল্পীকে এড়াবার জন্য বেশ নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাত্যুসা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনেই ছিল একটা লাইলাকের ঝোপ ; এগোতে এগোতে কাত্যুসা নেখল্যুদভকে ইশারা করল যাতে সে দৌড়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে ফেলে। কারণ, তাহলে একটা শিকলি তৈরি হয়ে যেত, এবং তখন আর শিল্পীর কিছুই করার থাকত না ; আর এটাই ছিল সেই বিশেষ খেলাটার নিয়ম। সুতরাং ইশারা পেয়েই নেখল্যুদভ দৌড়তে শুরু করল, কিন্তু সে জানতনা যে লাইলাকের ঝোপটার পেছনে রয়েছে বিচুটিভরা খানা। মুহূর্তের মধ্যে

সে ছিটকে গিয়ে পড়ল সেই বিচুটির ঝোপের মধ্যে। সেগুলো ছিল শিশিরে ভেজা; ফলে মারাত্মকভাবে চুলকানি শুরু হয়ে গেল তার গা-হাত-পায়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করে দিল।

কাত্যুসা কালোজামের মত চকচকে দুটো কালো চোখ, আর খুশিতে উজ্জ্বল হাসি মুখটা নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নেখল্যুদভের হাতটাকে ধরে ফেলল। তারপর মুক্ত হাতটা দিয়ে চুলগুলোকে ঠিক করতে করতে, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে, হাসি মুখে বলল, 'খুব চুলকোচ্ছে, না?'

তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিল নেখল্যুদভ, 'আরে, আমি তো জানতামই না যে এখানে একটা গর্ত আছে।' তারপর কাত্যুসা তার দিকে এগিয়ে এল, এবং নেখল্যুদভও কিছু যেন না বুঝেই এগিয়ে গেল কাত্যুসার দিকে। সে বাধা দিল না, নেখল্যুদভ তার হাতে চাপ দিল এবং ঠোঁটে চুমু খেল।

'তাহলে, তুমি এটা করলে!' কাত্যুসা বলল, এবং এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল তার কাছ থেকে।

সাদা লাইলাকের ফুলভর্তি দুটো ডালকে ভেঙ্গে ফেলে কাত্যুসা তার সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেখল্যুদভের দিকে তাকাতে তাকাতে হাত দুটোকে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা পায়ে হেঁটে গিয়ে যোগ দিল অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে।

এরপর থেকে নেখল্যুদভ ও কাত্যুসার মধ্যে গড়ে উঠল সেই বিচিত্র সম্পর্ক যা সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট পবিত্র যুবক যুবতীর মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে।

কাত্যুসা যখন ঘরে আসত কিংবা দূর থেকে যখন তার সাদা পোশাকের অংশটুকুও দেখা যেত তখন নেখল্যুদভের চোখে সব কিছুই হয়ে উঠত উজ্জ্বল, অনেকটা, সূর্যোদয়ের পর সবকিছু যেমন প্রফুল্ল আর গাঢ় হয়ে ওঠে, তেমনি। জীবনটাকে তখন মনে হত খুশির বন্যায় ভরপুর। ওদিকে কাত্যুসার অনুভূতিও ছিল সেই একই। তবে শুধুমাত্র দুজনের দেখা-দেখিতেই যে এমন হত, তা নয়; তারা যখন একে অপরের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করত তখনই সেই স্বর্গীয় সুখের অনুভূতি পেত হৃদয়ে।

হয়ত তখন তার মায়ের কাছ থেকে কোন অপ্রিয় চিঠি এসেছে, কিংবা হয়ত তার রচনা আর এগোচ্ছে না, অথবা সেই অযৌক্তিক দুঃখবাদ, যা প্রায়ই যুবকদের মন ভারাক্রান্ত করে তোলে, তা তাকে গ্রাস করে ফেলছে—এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কাত্যুসার চিন্তা কিংবা সাক্ষাৎলাভেই সে সবকিছু থেকে নিষ্কৃতি পেত।

কাত্যুসাকে বিস্তর ঘরের কাজ করতে হত—কিন্তু তারই মধ্যে সে কিছুটা সময় বের করে নিত পড়াশুনো করার জন্য। নেখল্যুদভ তাকে দস্তয়েভস্কি কিংবা তুর্গেনেভ পড়তে দিত (যা কিনা সে নিজেই সবেমাত্র পড়েছে)। তুর্গেনেভের 'নিভৃত কোণ' বইটা কাত্যুসার খুবই ভাল লাগত। কাজের ফাঁক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মুহূর্তগুলোতে তাদের দেখা হত বাতায়নে, বারান্দায় বা উঠোনে; আবার কখনও কখনও বা পিসিমার বৃদ্ধা চাকরানী মাত্রিওনা পাভলোভনার ঘরে তারা মিলিত হত; সেখানে চা খেত। আবার কখনও বা যেত কাত্যুসার শোবার ঘরে। মাত্রাইওনা পাভলোভনার উপস্থিতিতে তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হত, তা ছিল সত্যিই উপভোগ্য। যখন তারা দুজনেই একা থাকত তখন কারোরই ভাল লাগত না

এতটুকু। মুখে যা বলা যেত তার থেকে অনেক বেশি গভীর বক্তব্য প্রকাশ পেত তাদের চোখের ঈশারায়। আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় তখন তারা দুজনের মনে মনে বেশ বেদনা অনুভব করছিল।

নেখল্যুদভ যতদিন পিসিদের বাড়িতে রইল ততদিন তার সঙ্গে কাত্যুসার সম্পর্কটা বজায় রইল পুরোমাত্রায়। কিন্তু ব্যাপারটা তার পিসিদের নজরে পড়ে গেল ; ফলে তারা মনে মনে বেশ ভীত হয়ে উঠল। এমনকি নেখল্যুদভের মা রাজকুমারী ইয়েলেনা ইভানোভনার কাছেও চিঠি লিখে সবকিছু জানিয়ে দিতে দেরি করল না কারণ বড় পিসি মারিয়া ইভানোভনার ভয় ছিল যে দিমিত্রি হয়ত কাত্যুসার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। কিন্তু তার এ ভয়ের কোন ভিত্তিই ছিল না। কেননা নেখল্যুদভ যদিও তেমন আত্মসচেতন ছিল না, কিন্তু সে কাত্যুসাকে ঠিক তেমনিভাবেই ভালবেসেছিল, যেমন ভালবেসে থাকে পবিত্র মানুষেরা। আর এখানেই ছিল তার এবং তার প্রণয়িনীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা। কখনও একথা তার মনেই আসেনি যে সে তার প্রেমিকাকে শারীরিকভাবে ভোগ করবে ; এমনকি এ ধরনের কোন অনুভূতিও তখন তার কাছে ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মত মনে হত। কিন্তু অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ সোফিয়া ইভানোভনার মনে এ উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে দিমিত্রি হয়ত মেয়েটির জন্মবৃত্তান্তের কথা না জেনে একদিন হুট করে তাকে বিয়েই করে বসবে।

নেখল্যুদভ যদি এই প্রেম-বোধে আত্মসচেতন হত, এবং যদি তাকে বলা হত যে, এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়াটা একেবারেই অবাস্তব একটা কল্পনা মাত্র—তবে হয়ত এমনও হতে পারত যে, সে হয়ত তার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতা নিয়ে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হত যে যাকে সে ভালবাসে তাকে বিয়ে না করার কোন কারণ-ই থাকতে পারে না। কিন্তু পিসিরা তার কাছে তাদের আশঙ্কার কথা একবারও বলল না ; আর সেও যখন সেখান থেকে চলে এল তখনও কাত্যুসার প্রতি তার গভীর প্রণয়ের ব্যাপারে মনে মনে একেবারও সচেতনতা উপলব্ধি করল না।

এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিল যে কাত্যুসার প্রতি তার এই অনুভূতি, তার সমগ্র সত্তা যে জীবনানন্দে ভরপুর ছিল, তারই একটা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় ; এবং এই মিষ্টি চঞ্চলা বালিকাটি, তার সাথে একত্রিত হয়ে সেই আনন্দের একটা অংশ নিয়েছে মাত্র। বিদায় মুহূর্তে তার পিসিদের পাশে দাঁড়িয়ে সে যখন সজল নয়নে তীর্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল, তখন নেখল্যুদভের মনে হয়েছিল, সে এমন একটা কিছু ছেড়ে যাচ্ছে, সুন্দর, মূল্যবান এমন একটা কিছু, যা আর কোনদিনই সে ফিরে পাবে না। আর সেই মুহূর্তে কাত্যুসাকে মনে হয়েছিল সত্যি সে দুঃখিনী।

সোফিয়া ইভানোভনার মাথার টুপির ওপর থেকে তাকিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়বার সময় সে বলেছিল, 'বিদায় কাত্যুসা, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।'

চোখের পাতায় অশ্রু চেপে সুন্দর কোমল স্বরে কাত্যুসা উত্তর দিয়েছিল, 'বিদায়, দিমিত্রি।' তারপর দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে গিয়েছিল হলঘরে—শুধু একটু শান্তিতে বসে কাঁদবার জন্য।

॥ তের ॥

এরপর নেখল্যুদভ তিন বছর কাত্যুসাকে দেখেনি। তারপর যখন দুজনের দেখা হল তখন সে চলেছে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে। যাওয়ার পথে কয়েকটা

দিন পিসিদের সাথে কাটিয়ে যাবে মনস্থ করে সেখানে হাজির হল। কিন্তু ততদিনে সে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তিন বছর আগে যে যুবকটি হাসি-খুশিতে ভরা গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটিয়ে গিয়েছিল এই গ্রামে—সে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তখন সে ছিল সৎ, স্বার্থহীন—যে-কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মত্যাগে, সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু এখন তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে; সে এখন কলুষিত, দাম্ভিক আর আত্মসুখলোভাতুর। তখন তার কাছে ঈশ্বরের পৃথিবীকে মনে হত রহস্যাবৃত; বিপুল উৎসাহ আর আনন্দে সে তাই সেই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের চেষ্টা করত, কিন্তু এখন তার কাছে জীবন অতি স্বচ্ছ, সহজ, সরল। তখন সে প্রকৃতি, এবং অতীতের দার্শনিক ও কবিরা যেসব কথা চিন্তা ও অনুভব করেছিলেন তার সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করত। কিন্তু এখন সে যেটা সব থেকে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তা হল মানবিক প্রতিষ্ঠান আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান। নারীমাত্রেই তখন তার কাছে ছিল রহস্যময়ী এবং মাধুর্যরসে পূর্ণ; কিন্তু এখন একমাত্র নিজের পরিবারের এবং বন্ধু-বান্ধবের স্ত্রীরা ছাড়া, আর সব নারীই তার কাছে একই রকম বলে বোধ হয়, ইতিমধ্যে প্রাপ্ত একটি বিশেষ আনন্দের মাধ্যম ছাড়া তাঁদেরকে আর কোন কিছু হিসেবেই সে ভাবতে পারে না। তখন তার কাছে টাকার প্রকৃত-পক্ষে কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না; কারণ তার মা তাকে হাত খরচা হিসেবে যা দিতেন তার এক তৃতীয়াংশও সে খরচ করে উঠতে পারত না, এমনকি পৈত্রিক-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিও তখন তারপক্ষে বিলিয়ে দেবার চিন্তা করাটা মোটেই কষ্টকর বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন, দেড় হাজার রুবলের ভাতাটাকেও সে যথেষ্ট বলে মনে করতে পারে না, এবং এবং এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তার মার সাথে তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে। তখন নিজের আত্মার শক্তিকে সে অহং্ম বলে মনে করত, কিন্তু এখন দৈহিক এবং পাশবিক শক্তিকেই সে মনে করে প্রকৃত অহং্ম।

তার মধ্যে এই ভয়াবহ পরিবর্তনগুলো ঘটতে লাগল, কারণ ইতিমধ্যে সে নিজের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে অপরের ওপরও, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সে এটা করতে বাধ্য হল, কেননা, একজনের পক্ষে নিজের আত্মার ওপর বিশ্বাস রেখে চিরটা কাল বেঁচে থাকা সত্যিই কষ্টকর; কারণ, তাহলে যে তাকে নিজের প্রতিটি কাজের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে—সর্বদা সহজ গর্বে গর্বিত নিজের পাশবিক আমিত্বের পক্ষে নয়,—বরং একেবারে বিপরীতে। অপরের ওপর বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত করার কিছু নেই, কারণ সবকিছুই আগে থাকতেই স্থির হয়ে আছে—এবং সেটা সর্বদাই রয়েছে সেই পাশবিক আমিত্বের পক্ষে আর আত্মীকতার বিরুদ্ধে। এটুকুও সব নয়। নিজের আত্মার ওপর বিশ্বাস করে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করছে শুধুমাত্র তাদের কাছে, যারা কিনা তাকে ঘিরে রয়েছে; আর সে বিশ্বাস কেন, না; তিনি তাদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সুতরাং নেখল্যুদভ যখন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করত কিংবা কথা বলত—যেমন ঈশ্বর, সত্য, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি—তখন তার চারপাশের সবাই তা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে তো করতই, উপরন্তু সেগুলোকে উপহাসের বিষয় বলে ভাবত। তার পিসিরাও তাকে ব্যঙ্গোক্তি করতে ছাড়ত না। তারা তাকে ডাকত 'আমাদের প্রিয় দার্শনিক' বলে। কিন্তু যখন সে উপন্যাস পড়ত, ভুল উপাখ্যান

শোনাত, ফরাসী থিয়েটারে খেলো ভেলকি দেখতে যেত, আর বেশ রসিয়ে সেই ঠাট্টার পুনরাবৃত্তি করত—তখন সবাই তাকে উৎসাহ দিত, তারিফ করত। যখন সে বিবেচনা করে দেখল যে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর একটা সীমা রেখা টেনে দেওয়া দরকার, এবং সে কারণে পুরনো ওভারকোট পরা, মদ না খাওয়া ইত্যাদি শুরু করল, তখন সবাই তার নিন্দায় পঞ্চমুখ হল এবং ব্যাপারটাকে 'ঢঙ' বলে বর্ণনা করতে লেগে গেল। অথচ সেই একই মানুষ যখন শিকারের পেছনে বে-হিসাবীর মত টাকা খরচ করল, প্রচুর অর্থব্যায়ে নিজের জন্য আরামদায়ক পড়ার ঘর বানাল, তখন তারাই আবার দামী দামী উপহার দিয়ে তার সখকে উৎসাহিত করল আর তার তুলনাহীন রুচিবোধের প্রশংসায় লেগে গেল। যখন সে বিয়ের আগে পর্যন্ত পবিত্র জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তখন তার বন্ধুরা তার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করত; কিন্তু যখন সে তার এক বন্ধুকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে একটা ফরাসী মেয়েকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হল, (নেখল্যুদভের মার মনে যখনই কাত্যুসার কথা মনে হত, তখনই তিনি এ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন যে তার ছেলে যে-কোন মুহূর্তে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করে বসতে পারে) তখন তার মা-ই তাতে বেশি খুশি হলেন, এবং ভাবলেন যে তার ছেলে এবার সত্যিই 'মানুষ' হয়েছে।

এভাবে একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক ছোট জমিদারিটা সে যখন কৃষকদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিল, কেননা সে বিশ্বাস করত যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকাটা নিতান্ত অন্যায়, তখন তার মা এবং গোটা পরিবারটাই তার ভবিষ্যত ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল; এবং আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবের দল তার এই নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারটা নিয়ে তাকে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করে দিল। তাকে ক্রমাগত বলা হতে লাগল যে, জমি পেয়ে কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভাল হয়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে। সেখানে নতুন তিনটে শুঁড়িখানা গজিয়ে উঠেছে, আর কৃষকরা কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত সেই শুঁড়িখানাতেই পড়ে রয়েছে। অথচ সে যখন রক্ষীদলে যোগ দিল এবং অভিজাত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে জুয়া খেলে নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ হারাতে লাগল তখন তার মা ইয়েলিনা নিজের পুঁজিতে টান পড়া সত্ত্বেও মনে একটুকু কষ্ট পেলেন না। কারণ, তিনি মনে করতেন যে কাঁচা বয়সে একটু যৌবনসুলভ অনাচারে ব্যাপৃত থাকাটাই হচ্ছে সঠিক; এবং সেটা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনকও বটে।

প্রথম প্রথম নেখল্যুদভ বেশ সংগ্রাম করেছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকাকালীন সময়ে সে যা-কিছু ভাল মনে করেছিল পরবর্তীকালে ঠিক সেগুলোকেই মনে হতে লাগল খারাপ; আর আগে যেগুলোকে মনে হত অতি জঘণ্য এখন চারপাশের সমর্থকদের উৎসাহে সেগুলোকেই মনে হল ভাল। কিন্তু জীবনের সংগ্রামে কোন ঘাটতি হল না, বরং সেটা বেড়েই চলল। শেষে নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে সে অন্যদের বিশ্বাস করা শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম এই বিশ্বাস পরিত্যাগের ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই সুখকর মনে হত না, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটাই গা-সওয়া হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ধূমপান আর মদ্যপানে বেশ চোস্ত হয়ে সে তার সমস্ত নিরানন্দময় অনুভূতিকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হল; এমনকি মনে মনে বেশ স্বস্তিও পেল।

চারপাশের সকলের তারিফে তার উন্মত্ত স্বভাব এই নতুন জীবনধারার

জোয়ারে একেবারে ভেসে গেল। সে নিজেই তার আভ্যন্তরীণ স্বরের কণ্ঠরোধ করল—যা কিনা ছিল সত্যিকারের ভিন্নধারার পিয়াসী। পিটাসবুর্গে যাওয়ার পরেই এটা শুরু হল ; আর যখন সে সামরিক বাহিনীতে ঢুকল তখন তো অবস্থা একেবারে চরমে।

সামরিক জীবন মানুষকে এমনিতেই কলুষিত করে তোলে। সেখানে মাথা ঘামানোর কোন বালাই থাকে না ; থাকে না কোন সুস্থ বিচার কিংবা সাধারণ মানবিক কর্তব্যের তাগিদ ; তার পরিবর্তে নিজের বাহিনীর বাঁধাধরা কাজ, ইউনিফর্ম, আর পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনটাই হয়ে ওঠে প্রধান। সেখানে একদিকে যেমন তাদের হাতে অন্য মানুষের ওপর প্রভুত্ব খাটাবার চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়, তেমনি অপরদিকে আবার গোলাম করে রাখা হয় উচ্চপদে আসীন মানুষগুলোর কাছে।

সামরিক বাহিনীতে চাকরি জীবনের সম্মান, ইউনিফর্ম, পতাকার সারি, অনুমোদিত হিংসা, হত্যার সাথে রাজকীয় পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফল (ঠিক যেমনটি হয়েছে নির্বাচিত বাহিনীর রক্ষীদলের ক্ষেত্রে ; সেখানকার সমস্ত অফিসাররাই আসছেন ধনী, অভিজাত পরিবারগুলো থেকে) হিসেবে তাদের সদস্যদের মধ্যে আদান প্রদানে এক বিরাট কলুষতাপূর্ণ স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। স্বার্থ-পরতার এই ব্যাধি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের দিন থেকেই নেখল্যুদভকেও গ্রাস করতে শুরু করে ; সে-ও অন্যান্য সঙ্গিদের মতই জীবন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। অন্য লোকের সাফ করে দেওয়া পোশাক পরে, অন্য লোকের পরিষ্কার করা অস্ত্র হাতে নিয়ে, অন্য লোকের বাগমানানো ঘোড়ার পিঠে চড়ে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে তার এতটুকু আটকাত না। তারই সমমর্যাদার অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে তরবারির আস্ফালন, বন্দুক চালানো, অন্যদের এসব করতে শেখানো ছাড়া তার আর কোন কাজই ছিলনা। উচ্চপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা—সে বৃদ্ধই হোক আর যুবকই হোক, জারেরা এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল শুধু যে তার এই বৃত্তিকে অনুমোদন করেছিল তাই নয়—তারা তাকে এর জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদও জানিয়েছিল।

এছাড়াও ভাল এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে যা বিবেচিত হত, তাহল খাওয়া, বিশেষতঃ অফিসারদের ক্লাব ও ভাল রেস্তোরায় মদ্যপান, প্রচুর টাকা ওড়ানো—যেটা আসত একটা অজানিত উৎস থেকে, নাটক দেখা, বলনাচ করা, আর মেয়েদের সঙ্গে কাটানো ; তারপর আবার সেই ঘোড়ার পিঠে চড়া, তরবারি আস্ফালন আর জম্ফঝম্ফ করা ; শেষে আবার টাকা ওড়ানো, মদ্যপান, তাসখেলা আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি।

এই ধরনের জীবনযাত্রা অন্যান্যের তুলনায় সামরিক বাহিনীর মানুষদের আরও বেশি কলুষিত করে তোলে ; কারণ অন্যান্য লোকজন যখন এতে লজ্জা বোধ করতে বাধ্য হয় তখন কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকেরা ঠিক সেই একই কর্মের জন্য গর্ববোধ করে থাকে—বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় তো বটেই। আর নেখল্যুদভও এই বাহিনীতে যোগদান করেছিল ঠিক তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই।

'যুদ্ধে জীবন দেবার জন্য আমরা প্রস্তুত ; সুতরাং আনন্দমুখর, বাঁধাবন্ধনহীন জীবন শুধু ক্ষমার্হ-ই নয়, সেটা আমাদের একান্ত প্রয়োজনও বটে—তাই আমরা এ ধরনের জীবন-ই কাটাব।' সেই মুহূর্তে এটাই ছিল নেখল্যুদভের বিচ্ছিন্ন চিন্তার

ফলশ্রুতি। আগে যে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে মনে মনে মুক্তিজনিত একটা আনন্দ পেতে লাগল; আর নিজেকে ভাসিয়ে দিল স্বার্থপরতার উন্মত্ত জোয়ারে।

ঠিক তিন বছর পর সে যখন তার পিসিদের সঙ্গে দেখা করতে এল সে মুহূর্তে এটাই ছিল তার যথাযথ অবস্থা।

॥ চোদ্দ ॥

নেখল্যুদভ তার পিসিদের বাড়ি গিয়েছিল এ কারণে যে, তার পিসিদের জমিদারিটা ছিল, তার নিজের বাহিনীতে যোগ দিতে যাবার পথের ধারেই (তার বাহিনী ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল)। তাছাড়া পিসিরাও তাকে বারবার আসার জন্য বলেছিল, এবং সে নিজেও মনে মনে কাত্যুসাকে দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। বোধ হয় ইতিমধ্যেই তার মনের ভেতরের সংযমবিহীন পাশবিক শক্তিটা কাত্যুসার অমঙ্গলের জন্য একটা নকশা তৈরি করে ফেলেছিল। তবে সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে তার বহির্মনটা মোটেই সচেতন ছিল না। শুধু সে সেখানে যেতে চাইছিল এ কারণেই যে, সেই বিশেষ জায়গাটাকে ঘিরে তার মনে তখনও একটা পরম সুখস্মৃতি বিরাজ করছিল, তাছাড়া দয়ালু পিসিমাদের কথাও বারবার মনে পড়ছিল তার। মনে পড়ছিল তাদের স্নেহ আর ভালবাসার আবেষ্টনীর কথা; মনে পড়ছিল কাত্যুসার কোমল মুখমণ্ডল—যাকে সে তখনও ভুলতে পারেনি।

মার্চের শেষ দিকে, গুড ফ্রাইডেতে, যখন সবেমাত্র বরফ গলা শুরু হয়েছে, তখন সে গিয়ে হাজির হল পিসিমাদের বাড়িতে। বৃষ্টিতে তার গায়ের জামা-কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল, দারুণ ঠাণ্ডাবোধ হচ্ছিল শরীরে, কিন্তু তবুও সে এতটুকু কাহিল হল না; এতটুকু ঘাটতি হল না তার উৎসাহে। পরিচিত সেই পুরনো রীতির বাড়ির চত্বরে ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে ভাবল, 'সে কি এখনও এদের সাথেই আছে?'

সে ভেবেছিল হয়ত স্লেজগাড়ির আওয়াজ পেয়েই সে বেরিয়ে আসবে ছুটে, কিন্তু তা হল না; পরিবর্তে খালি পায়ে, দুধের পাত্র হাতে, ঘাগরার ভাঁজ পর্যন্ত তুলে দুজন মহিলা বেরিয়ে এল। তাদের দেখেই মনে হল যে ওরা এতক্ষণ ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। কিন্তু তাকে কোথাও চোখেই পড়ল না; বরং বাড়ির চাকর তিখোন, অ্যাপ্রণ পরে, বারান্দায় বের হয়ে এল। দেখে মনে হল, সেও ঘর পরিষ্কার করছিল। বাইরের ঘরের মুখটায় পিসি সোফিয়া ইভানোভনার সঙ্গে দেখা হল; তার পরনে ছিল সিল্কের পোশাক আর মাথায় টুপি।

সোফিয়া তাকে চুমু খেয়ে বলল, 'খুব ভালই হল যে তুমি এলে। মারিয়ার শরীরটা ভাল নেই; গির্জায় গিয়ে সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা আজ খ্রীষ্টের ভোজে যোগদান করতে গিয়েছিলাম।'

উত্তরে নেখল্যুদভও সোফিয়ার হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু একি! তোমাকে যে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, আগে ঘরে যাও; ভিজে জামা-কাপড়গুলো গায়ে শুকোচ্ছ কেন? হা কপাল! তুমি দেখছি আবার গোঁফ রেখেছ! ...কাত্যুসা, ওরে কাত্যুসা, ওকে কফি দে।'

'এক্ষুণি আনছি।' সেই সুখদায়ক মিষ্টি গলার স্বর শোনা গেল।

'ওঃ সে এখানে!' নেখলুদভের হৃদয় এমনভাবে নেচে উঠল যে মনে হল যেন মেঘের আড়াল থেকে সূর্যটা হঠাৎ বের হয়ে এসেছে।

তারপর তিখোনকে অনুসরণ করে সে নিজের সেই পুরনো ঘরটায় গেল জামাকাপড় পাল্টাতে। ইচ্ছে হচ্ছিল কাত্যুসার সম্পর্কে তিখোনকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কেমন আছে, কি করছে, তার বিয়ের কোন কথাবার্তা চলছে কিনা? কিন্তু তিখোন এমন সশ্রদ্ধ অথচ কঠোর ভঙ্গিতে একনাগাড়ে জল ঢেলে চলেছিল যে সাহসই হল না তার কাছ থেকে কাত্যুসার সম্পর্কে কোন খোঁজখবর নেবার; বরং সে তাকে তার বদলে জিজ্ঞেস করল তার নাতি-নাতনীরা কেমন আছে, ঘোড়াটার খবর কি, আর সেই পোলকান নামের কুকুরটাই বা কোথায়? উত্তরে জানল, পোলকান ছাড়া আর সবাই বেঁচে আছে, একমাত্র সে-ই গত গ্রীষ্মে পাগল হয়ে গেছে।

ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে তখন সে সবে নতুন জামাকাপড় পড়া শুরু করেছে, এমন সময় কানে এল দ্রুত পায়ের শব্দ, আর পরমুহূর্তেই দরজায় কড়া নাড়ার খট্‌খটানি। এ শব্দ তার পূর্ব পরিচিত। কাত্যুসা ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউই অমন করে হাঁটে না, অমন করে কড়া নাড়ে না।

ভিজে ওভারকোটটা কাঁধে ফেলে সে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। বলল, 'ভেতরে এস।'

এ সেই কাত্যুসা, সেই পুরনো মিষ্টি মেয়ে; শুধু তফাৎ সে আগের থেকে আরও বেশি সুন্দর দেখতে হয়েছে। নেখলুদভের দিকে সেই পরিচিত ভঙ্গিতে সহজ-সরল, সামান্য তেরচা দৃষ্টিতে কালো চোখ দুটো তুলে তাকাল কাত্যুসা। এখনও আগের মতই সেই সাদা অ্যাপ্রণ পরনে। তারজন্য পিসির কাছ থেকে চেয়ে একটুকরো গন্ধ সাবান নিয়ে এসেছে সে, আর দুটো তোয়ালে। একটায় রুশীয় কারু কাজ করা, অন্যটা স্নানের। অব্যবহৃত সাবান, তোয়ালে আর কাত্যুসা নিজে—এর সবকটাই পরিস্কার, অমলিন, তাজা আর সুখদায়ক। এই অদম্য আনন্দের জোয়ারে ভেসে গিয়ে নেখলুদভের ঠোঁট দুটো বৃদ্ধের মত কুঁচকে গেল।

'কেমন আছ দিমিত্রি?' বেশ কষ্টের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করল কাত্যুসা। তার মুখটা গোলাপী আভায় ভরে উঠল।

'সুপ্রভাত। তুমি কেমন আছ?' নেখলুদভও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বলল, 'ভাল আছ তো?'

চেয়ারের পেছনে তোয়ালেটা ঝুলিয়ে, সাবানটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে কাত্যুসা জবাব দিল, 'ঈশ্বরের দয়ায় আছি একরকম। এই যে তোমার সাবান, আর পিসির দেওয়া তোয়ালে।'

নেখলুদভের খোলা বাক্সটা ভর্তি ব্রাস, সুগন্ধি আতর, চুলের ক্রিম, রূপোলি ছিপি আঁটা অনেকগুলো বোতল আর প্রসাধন সামগ্রীর প্রাচুর্যতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিখোন বলল, 'এখানে সবকিছুই রয়েছে।'

বৃদ্ধের মত দয়া আর আলোকে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নেখলুদভ বলল, 'পিসিদের বোলো, এখানে এসে আমি খুব-ই খুশি হয়েছি।'

কথার জবাবে ইষৎ হেসে কাত্যুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিসিরা আগের থেকে আরও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে এবার তাকে গ্রহণ

করল। তারা এ ভেবে আকুল হল যে, দিমিত্রি যুদ্ধে যাচ্ছে; সেখানে সে আহত হতে পারে, এমনকি মারাও তো যেতে পারে।

সে ঠিক করেছিল পিসিদের সঙ্গে একদিন একরাত থাকবে, কিন্তু কাত্যুসাকে দেখার পর সিদ্ধান্ত বদলে ইস্টার পর্যন্ত থেকে যেতে মনস্থ করল। সাথে সাথে বন্ধু সেনবককে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিল, সে যেন ওডেসার বদলে তার সঙ্গে পিসির বাড়িতে এসেই সাক্ষাৎ করে।

কাত্যুসাকে দেখার পর নেখল্যুদভের মনে আবার সেই পূর্বেকার আবেগ জেগে উঠল। আবার সে সেই চাতকের দৃষ্টি ছাড়া কাত্যুসায় অ্যাপ্রণের দিকে সোজা তাকাতে পারল না। তার গলার স্বর, চলার শব্দ, উচ্ছাসের হাসি—সবকিছুই যেন তার জন্য বয়ে নিয়ে এল আনন্দের অনুভূতি। কোমল আবেগছাড়া সেই কালো বনলতার মত চোখ জোড়ার দিকে তার পক্ষে তাকানোই তখন অসম্ভব হয়ে পড়ল। সে অনুভব করল যে সে তার প্রেমে পড়েছে; কিন্তু এ প্রেম সেই আগেকার মত রহস্যময় প্রেম নয়—যখন কিনা তার বোধ হত যে মানুষের পক্ষে একবারই প্রেমে পড়া সম্ভব; বরং এ প্রেম হচ্ছে সেই প্রেম যে প্রেমের সংগা তার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়, সে নিজেই বুঝতে পারছে না যে এ প্রেম তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষের মতই তারও দুটো সত্ত্বা ছিল। সে দুটোর একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক—যা সেই জাতীয় সুখের সন্ধান করে ফেরে, যে সুখ সমগ্র মানবের; আর অন্যটা হচ্ছে পাশবিক, যা সমগ্র মানবজাতির সুখের বিনিময়ে নিজের সুখ খুঁজে বেড়ায়। সেই সময়ে তার মনেও সেই দ্বিতীয় সত্ত্বাই কাজ করছিল, যেটা কিনা সে তার পিটার্সবুর্গ আর সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে অর্জন করেছিল নিজের মধ্যের আত্মীক সত্ত্বাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে।

কিন্তু কাত্যুসাকে দেখার পর তিন বছর আগের সেই অনুভূতির স্বাদটা যখন সে আবার উপভোগ করল, এবং তার ভেতরের আত্মীক সত্ত্বাটা যখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তখন সে আবার তার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করল; এবং ইস্টার পর্যন্ত দুটো গোটা দিন আর রাত ধরে তার নিজের ভেতরে চলল এক অপরিচিত অন্তহীন সংগ্রাম।

নিজের আত্মার গভীরে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে পিসিদের কাছে তার আর থাকা উচিত নয়, চলে যাওয়া প্রয়োজন অতি অবশ্যই। কারণ তাতে নতুন কোন কিছু ভাল হওয়ার আশা নেই। কিন্তু তবুও সেটা এত মনোরম ও আনন্দদায়ক বলে বোধ হল যে নিজের কাছে সহজ-সরল বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার না করেই সে থেকে গেল।

ইস্টারের দিন যাজক আর ডিকন বাড়িতে এল পূজো নিতে। গির্জা থেকে বাড়ির দূরত্বের মধ্যকার তিন মাইল পথ খানা, ডোবা আর কাদার মধ্য দিয়ে স্লেজে করে আসতে তাদের নাকি ভীষণ কষ্ট হয়েছিল (তারা তা-ই বলেছিল)।

নেখল্যুদভও পিসি আর চাকরবাকরদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনায় যোগ দিল, কিন্তু তার চোখ রইল আসলে দরজার কাছে যাজকদের জন্য ধূপধুনো নিয়ে দণ্ডায়মান কাত্যুসার ওপর। তারপর যাজক আর পিসিদের ইস্টারের চুমু দিয়ে সে যখন শুতে যাচ্ছে, যদিও তখন মাঝরাত নয়, ফলে ইস্টারও নয়, তখন শুনল যে বুড়ি চাকরানী মাত্রিওনা পাভলোভনা গির্জায় যাচ্ছে ইস্টারের কেক আর মিষ্টি

আনতে। কথাটা শুনে সে ভাবল, 'আমিও যাব।'

গির্জায় যাবার রাস্তাটা খারাপ থাকায় স্লেজ কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সে পথে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব ছিল ; তাই নেখল্যুদভ, যে পিসিদের বাড়িতে থাকার সময় এমন ব্যবহার করত যে মনে হত সে যেন নিজের বাড়িতেই আছে, আদেশ দিল ঘোড়ার লাগাম লাগাবার জন্য। শুতে যাবার বদলে, আঁটোসাঁটো পোশাক পরে, পায়ে ব্রিচেস লাগিয়ে, ওভার কোটটা গায়ে চাপিয়ে পেট ঠেসে খাওয়া বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়াটা অন্ধকার পথে ক্রমাগত ডেকে চলল। আর সে তার পিঠে চড়ে ছুটে চলল গির্জার দিকে।

।। পনের ।।

সেবারের ইস্টার উৎসব নেখল্যুদভের জীবনে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে গাঁথা হয়ে গেছে।

সে যখন অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে, মাঝে মাঝে বরফের জন্য এখানে ওখানে থেমে, গির্জার প্রবেশ পথের আলোকমালা অতিক্রম করে উপাসনা গৃহের সম্মুখে পৌঁছল ততক্ষণে উপাসনা শুরু হয়ে গেছে।

মারিয়া ইভানোভনার ভাইপোকে চিনতে পেরে কৃষকরা তার নামার সুবিধের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে একটা শুকনো জায়গায় নিয়ে গেল, আর ঘোড়াটা এত আলো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল বলে সেটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর নেখল্যুদভকে তারা নিয়ে গেল গির্জার ভেতরে ; সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য।

কৃষকেরা ডানদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। বৃদ্ধদের গায়ে ছিল ঘরে তৈরি কোট আর সারা পা ঢাকা ছিল ধবধবে সাদা কাপড়ের পট্টিতে। যুবকরা পরেছিল নতুন কোট, চকচকে বেল্ট আর অশ্বারোহীর জুতো।

বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে ছিল যুবতী মেয়ের দল। তাদের গায়ে ছিল ভেলভেটের হাতকাটা কালো জ্যাকেট, লাল টকটকে জামার হাতা, আর হালকা সবুজ, নীল কিংবা লাল রঙের ঘাগরা ; মাথায় লাল সিল্কের ওড়না আর পায়ে নাল বাঁধানো চামড়ার জুতো। বৃদ্ধাদের পোশাক ছিল খুবই সাদাসিধে ; তারা দাঁড়িয়েছিল যুবতীদের ঠিক পেছনেই। পরনে ছিল ঘরে বোনা কোট, পুরনো কায়দায় কাটা কালো ঘাগরা, মাথায় সাদা ওড়না আর পায়ে জুতো। শিশুরাও প্রত্যেকেই পরেছিল উৎসবের ঝলমলে পোশাক, আর তাদের চুলগুলো পরিপাটি করা ছিল তেলে। তারা ভিড়ের মাঝখানে মিশে ছিল ; কখনও বাইরে যাচ্ছিল, আবার কখনও ঘোরফেরা করছিল ভেতরে।

পুরুষেরা ক্রুশ চিহ্ন আকার পর বারবার মাথা নোয়াল, আবার তুলে নিল, ফলে মাথার চুলগুলোও সামনে পেছনে ঝাঁকানি খেতে লাগল।

মেয়েরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধারা, কুমারী মেরির মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ; মাঝে মাঝে বুকে ক্রুশ আঁকছিল। আঙুল ভাঁজ করে, ওড়না শক্ত করে চেপে ধরে প্রথমে মাথা, তারপর কাঁধ, শেষে পেটের কাছে ঠেকাচ্ছিল ; আর মুখে বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছিল ; শেষে নুয়ে পড়ে কিংবা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে এটা বুঝতে পেরে শিশুরাও মনে মনে প্রার্থনা করল। সোনার গিলটি করা বাক্সে কুমারী মেরির মূর্তিটা চারপাশের মোমদানিতে

সাজানো মোমের আলোয় ঝলমল করছিল। ঝাড়বাতিগুলো ছোট ছোট মোমবাতিতে ভর্তি ছিল। অপেশাদার গায়কদল আনন্দের সুর তুলেছিল—উচ্চনাদের গম্ভীর সুরের সঙ্গে বালকদের বেসুরো গলার আওয়াজ মিলে বড় বিচিত্র শোনাচ্ছিল।

নেখল্যুদভ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গির্জার ঠিক মাঝখানটায় ছিল অভিজাত মানুষদের দাঁড়াবার জায়গা। সেখানে তখন দাঁড়িয়েছিল একজন জমিদার, তার বউ আর ছেলে (নাবিকের পোশাক পরনে); পুলিশের কর্তা, ডাক অফিসের কেরানি, অশ্বারোহীর জুতো পায়ে এক ব্যবসায়ী আর বুকে পদক আঁটা গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। বেদির ডানপাশে, জমিদারের বউয়ের ঠিক পেছনটাতে দাঁড়িয়েছিল মাত্রিওনা পাভলোভনা। তার পরিধানে ছিল উজ্জ্বল রামধনু রঙের পোশাক এবং সূঁচের কাজ করা সাদা শাল। আর কাত্যুসা দাঁড়িয়েছিল সাদা পোশাক, আঁটো করে বাঁধা অন্তর্বাস এবং নীল কটিবন্ধনী পরে। তার কালো চুল বাঁধা ছিল লাল ফিতে দিয়ে।

সমস্ত পরিবেশটাই ছিল উৎসবমুখর—শান্ত, উজ্জ্বল অথচ সুন্দর। পুরোহিতের গায়ে ছিল রূপোলী কাপড়ের তৈরি পূজোর পোশাক; তাতে সোনালী ক্রুশ চিহ্ন আঁকা। সহকারী পুরোহিত আর গায়কদের পরনে ছিল সেই একই ধরনের পোশাক। অপেশাদার গায়কেরাও তাদের সবচেয়ে দামী জামাকাপড়গুলো পরে এসেছিল আর মাথার চুলগুলো বিন্যস্ত করেছিল চকচকে তেলে। নৃত্য ও সঙ্গীতের মত চারপাশে বেজে চলেছিল ছুটিরদিনের আনন্দধ্বনি, আর পুরোহিত ক্রমাগত আশীর্বাদ করে চলেছিলেন কাউকে না কাউকে। তার হাতে ছিল কিছুটা ফুল আর একটা মোটা মোমবাতি। তিনি বারবার বলছিলেন, 'যীশু জেগে উঠেছেন, যীশু জেগে উঠেছেন।' সবকিছুই বড় চমৎকার লাগছিল নেখল্যুদভের কাছে। কিন্তু তবুও, সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল কাত্যুসা—তার সাদা পোশাক, নীল কটিবন্ধনী, কালো চুলে লাল ফিতে আর আনন্দোচ্ছাসে উজ্জীবিত দুটো চোখ।

নেখল্যুদভ বুঝতে পেরেছিল যে তার দিকে না তাকালেও কাত্যুসা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। এটা সে অনুভব করল তার পাশ থেকে বেদির দিকে এগিয়ে যাবার সময়। যদিও তাকে তার কিছুই বলার ছিল না, তবু সে মনে মনে তক্ষুণি একটা বিষয় ভেবে নিল। তারপর কাত্যুসার পাশ থেকে যাবার সময় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'পিসি তো আমাকে বলল যে উপাসনা শেষ হলে তবেই সে তার উপোস ভাঙ্গবে।'

প্রতিবার নেখল্যুদভের দিকে তাকালেই কাত্যুসার যেমন হত, এবারও তাই হল; তার সারা মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আনন্দোজ্জ্বল দুটো কালো চোখে সহজাত দৃষ্টি হেনে সে তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তা আমি জানি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারী পুরোহিত তামার পাত্রে পবিত্র জল নিয়ে সেখান থেকে যাচ্ছিলেন, এবং কাত্যুসাকে লক্ষ্য না করে তার সাদা পোশাক তিনি তার গায়ে বুলিয়ে গেলেন, যাতে কিনা নেখল্যুদভের পাশ থেকে যাবার সময় একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় তার পক্ষে। কিন্তু নেখল্যুদভ এ ভেবে অবাক হল যে, সরকারী পুরোহিতটি এই সত্যটাকে বুঝতেই পারলেন না যে এখানকার সব-কিছুই, এমনকি সারাটা দুনিয়াই সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র কাত্যুসার জন্যই; সুতরাং

সবকিছুকেই হয়ত উপেক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু কাত্যুসাকে কিছুতেই নয় ; কারণ, সে-ই তো সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। শুধু তার জন্যই কুমারী মেরির মূর্তিগুলোকে গিলটি করা হয়েছে, তারজন্যই মোমদানি আর ঝাড়বাতির আলোগুলো জ্বলছে, তাকে উদ্দেশ্য করেই গাওয়া হয়েছে আনন্দের স্তবগুচ্ছ : 'প্রভুর অভিক্রম অবলোকন কর, উপভোগ কর হে জনতা।' হ্যাঁ, সবকিছুই ; পৃথিবীতে যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলের প্রতীক সবই তো তারই জন্য। আর যখন সে কাত্যুসার খুশিভরা মুখটার দিকে তাকাল তখন তার এ কথাও মনে হল যে, কাত্যুসা নিজেও জানে যে ওগুলো তারই জন্য। এই মুখ দেখেই সে উপলব্ধি করল যে তার আত্মায় তখন যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সেই একই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ঘটছে কাত্যুসার আত্মাতেও।

প্রথম পর্বের বিরতির সময় সে গির্জা থেকে বের হয়ে এল। সবাই তার জন্য পথ করে দিল, তাকে অভিবাদন জানাল। অনেকেই তাকে চিনত, কিন্তু যারা চিনত না তারা জিজ্ঞেস করল, 'কে উনি ?'

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় অপেক্ষমান ভিখিরির দল তাকে ঘিরে ধরল ; ব্যাগে যত খুচরো পয়সা ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে সে নেমে এল।

পূব দিগন্তে ভোরের রূপোলী রেখা দেখা দিয়েছে, যদিও সূর্য তখনও ওঠেনি। গির্জার বাগানে সমাধিগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে মানুষজন জটলা করছে। কাত্যুসা তখনও বাইরে আসেনি ; নেখলুদভ তারই জন্য অপেক্ষারত।

পায়ের নাল লাগানো জুতোয় পাথরের সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে লোকেরা বাইরে আসছে, তারপর বাগানের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তার পিসিদের রাঁধুনে, এক বয়স্ক বৃদ্ধ তাকে ইস্টারের চুমু দেবার জন্য যেতে যেতে তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধটির স্ত্রী, সারা মুখে বয়সের ভাঁজ পড়া বৃদ্ধা মহিলাটি, রুমালের মধ্য থেকে একটা রঙ করা ডিম বের করে তার হাতে দিল। তারপর একজন জোয়ান চাষী, নতুন কোট আর সবুজ বেল্ট পরে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল, 'যীশু জেগে উঠেছেন।' তারপর বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে, নিজের দেহের অদ্ভুত কৃষাণী গন্ধ ছড়িয়ে, কোঁকড়ানো দাড়িগুলো তার মুখের ওপর ঘষে পরপর তিনবার চুমু খেল তার দৃঢ় তাজা ঠোঁটে।

যখন কৃষকটি চুমু খাচ্ছিল, আর তাকে একটা ঘন বাদামী রঙের ডিম উপহার দিচ্ছিল, ঠিক সে সময় মাত্রিওনা পাভলোভনার ধূসর পোশাক, এবং তার প্রিয় কালো মাথার লাল ফিতেটা এসে সামনে দাঁড়াল।

কাত্যুসা সামনে দাঁড়ানো লোকজনদের মাথার ওপর দিয়ে তাকে দেখতে পেয়েছিল, আর নেখলুদভও দেখতে পেল তার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখটা।

মাত্রিওনা পাভলোভনার সাথে দরজার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে এসে কাত্যুসা ভিখিরিদের ভিক্ষে দেবার জন্য থেমে পড়ল। একটা ভিখিরি নাকের জায়গাটায় দগদগে ঘা নিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে ভিক্ষের জন্য। কাত্যুসা ভিক্ষে দিয়ে মুখে কোন রকমের বিরক্তির ছাপ না এনেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে পরপর তিনবার চুমু খেল। চুমু খাওয়ার সময় তার সঙ্গে নেখলুদভের চোখাচোখি হল ; তার দৃষ্টি দেখে মনে হল সে যেন জানতে চাইছে, 'আমি কি ঠিক করছি ?' আর নেখলুদভও যেন উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা, ঠিকই করছ। সবকিছুই ঠিক ; সবকিছুই বড় সুন্দর। আমি তোমায় ভালবাসি।'

তারা দরজা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, আর নেখল্যুদভ এগিয়ে এল তাদের দিকে। ইস্টারের চুমু দেবার জন্য নয়, একটু ঘনিষ্ঠ হবার জন্যই মনে মনে সে চাইল।

মাত্রিওনা পাভলোভনা মাথা নিচু করে হেসে বলল, 'যীশু জেগেছেন।' কিন্তু তার বলার সুরে মনে হল সে যেন বলতে চাইছে, 'আজ আমরা সকলেই সমান।' বলের মত গোল করে পাকানো রুমালটা দিয়ে মুখটা মুছে ঠোঁট দুটো এগিয়ে ধরল নেখল্যুদভের দিকে।

'সত্যিই তিনি জেগেছেন।' চুমু খেতে খেতে নেখল্যুদভ উত্তর দিল। তারপর কাত্যুসার দিকে তাকাতেই সে লজ্জায় লাল হয়ে তার আরও কাছে সরে এল। বলল, 'যীশু জেগেছেন, দিমিত্রি ইভানভিচ।' সে উত্তর দিল, 'সত্যিই তিনি জেগেছেন।' তারপর উভয়ে উভয়কে পরপর দুবার চুম্বন করল, শেষে এমন ভান করল যে মনে হল তৃতীয় চুম্বন করাটা প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে দুজনেই ভাবছে। অবশেষে মৃদু হেসে তৃতীয় চুম্বনটা সমাধা করল।

নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল, 'পুরোহিতের কাছে যাবে না?'

যেন খুব আনন্দপূর্ণ একটা কাজ এইমাত্র শেষ করেছে, এমনভাবে বেশ জোরে একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্যাতুসা বলল, 'না, বরং আমরা একটু বসি।' তারপর আড়চোখে তার দিকে চাইল শ্রদ্ধা, কুমারীর সতীত্ব আর প্রেম নিয়ে।

একজন পুরুষ আর একজন রমণীর প্রেমে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সেটা এক চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছয়। সে মুহূর্ত এমনই যে তখন সবকিছু থাকে অসতর্ক, অযৌক্তিক—এ সম্পর্কে কোন অনুভূতিই গড়ে ওঠে না। সেই ইস্টারের রাতে নেখল্যুদভের জীবনেও তেমনি মুহূর্ত এল। যখনই তার কাত্যুসার কথা মনে এল অমনি অসম্ভব কিছু তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠল; কেবল ভেসে রইল সেই কালো মসৃন ঝলমলে মাথা, তার কুমারী শরীরে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো সাদা আঁটো পোশাক, কাঁচা বুক, আরক্তিম গাল, কোমল চিক্‌চিকে কালো চোখ, সতীত্বের প্রেমে চিহ্নিত সমগ্র সত্তা—এ প্রেম শুধুমাত্র তার জন্য নয় (সে তা জানতও) সবার জন্যই উন্মুক্ত, সবকিছুর প্রতি। শুধু শুভর জন্যই নয়, পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সবকিছুর জন্য, এমনকি যে, ভিখিরিটিকে চুমু খেয়েছে—তার জন্যও।

সে জানত যে তার ভেতরে সেই ভালবাসা রয়েছে; কারণ সেই রাত আর সকালে সে এ সম্পর্কে সচেতন ছিল; সচেতন ছিল একথা ভেবে যে এই প্রেমের সেও একজন পাত্র।

হায়! যদি এখানেই সব স্তব্ধ হত! সে রাতে যতটুকু এগিয়ে ছিল, ততটা এগিয়ে যদি ব্যাপারটা শেষ হত! জুরিদের বসার ঘরের জানলার পাশে বসে নেখল্যুদভ আজ একথাই চিন্তা করছে, 'না, ইস্টারের রাতে সেইসব ভয়ঙ্কর ব্যাপার-গুলো মোটেই ঘটেনি।'

॥ ষোল ॥

গির্জা থেকে ফিরেই নেখল্যুদভ পিসির সঙ্গে এক গেলাস জল খেয়ে উপোস ভেঙে, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার অভ্যাসবশতঃ কিছুটা মদ্যপান করে, নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় না খুলেই শুয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠল। সে বুঝতে পারল যে এটা কাত্যুসারই

কাজ। শরীরটাকে টানটান করে, চোখ দুটোকে রগড়ে বলল, 'কাত্যুসা নাকি? ভেতরে এস।'

কাত্যুসা দরজা খুলল। বলল, 'রান্না হয়ে গেছে।' তখনও তার পরনে সেই সাদা পোশাক, শুধু মাথায় ফিতেটা নেই। সে মৃদু হেসে নেখল্যুদভের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে মনে হল যেন খুব একটা কিছু ভাল খবর নিয়ে এসেছে।

নেখল্যুদভ মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জবাব দিল, 'আমি আসছি।'

কাত্যুসা মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে তা দেখে হাতের চিরুনীটা ফেলে কাত্যুসার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাত্যুসা ঘুরে গিয়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হালকা অথচ দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

নেখল্যুদভ ভাবল, 'উঃ আমি কী মূর্খ! ওকে আটকালাম না কেন?' তারপর দৌড়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে ফেলল।

সে নিজেই জানত না, তার কাছ থেকে সে কি চায়। কিন্তু অনুভব করল এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তা-ই হয়েছে; সে যখন তার ঘরে এসেছিল তখন তার যা করা উচিত ছিল তা সে করেনি।

সে বলল, 'কাত্যুসা, দাঁড়াও।'

'কি চাও তুমি?' দাঁড়িয়ে গিয়ে কাত্যুসা প্রশ্ন করল।

'কিছু না, কেবল—'সে ভাবতে চেষ্টা করল, এসব ক্ষেত্রে অন্য পুরুষেরা কি করে! তারপর হাত দুটো দিয়ে কাত্যুসার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

কাত্যুসা একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রচণ্ড আবেগে চোখের জলে ভেসে তার হাত দুটো সরাতে সরাতে বলল, 'দিমিত্রি, এটা কোরো না; এটা তোমায় মানায় না।'

নেখল্যুদভ তাকে ছেড়ে দিল, এবং মুহূর্তের জন্য শুধু যে দ্বিধাগ্রস্ত আর লজ্জিত হল তা-ই নয়, নিজের ওপরও প্রচণ্ড বিরক্ত হল। এক্ষেত্রে সে নিজেকে বিশ্বাস করেছিল, আর জানত যে এই দ্বিধা আর লজ্জা তার আত্মার মুক্তির দাবির অনুভূতি; কিন্তু এবার ভাবল যে এটা তার নির্বুদ্ধিতা; তার উচিত ছিল এক্ষেত্রে অন্য সবাই যা করে তা-ই করা; ফলে আবার এগিয়ে গিয়ে সে কাত্যুসাকে জাপটে ধরল এবং ঘাড়ে চুম্বন করল।

লাইলাকের ঝোপের আড়ালে সেই প্রথম চুম্বন, এমনকি আজ সকালে গীর্জার চুম্বনের থেকেও এ চুম্বন যেন একেবারেই আলাদা। কাত্যুসার মনে হল এ এক দুঃসাহসীর চুম্বন।

যেন কোন অমূল্য সম্পদ ভেঙ্গে ফেলেছে এমন গভীর একটা আতঙ্কের সঙ্গে সে আর্তনাদ করে উঠল, 'আঃ কী করছ!'

নেখল্যুদভ খাবার-ঘরে এল। মার্জিত পোশাক পরে পিসিরা, তাদের পারিবারিক চিকিৎসক এবং প্রতিবেশীরা আগে থাকতেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সবকিছুই বেশ সহজ-সরল ভাবে চলছিল, শুধু ব্যতিক্রম ছিল নেখল্যুদভ। তখন তার অন্তরে বয়ে চলেছে এক প্রচণ্ড ঝড়। অনর্গল কী সব বলা হচ্ছে, কি জবাব দেওয়া হচ্ছে তার কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। সে তখন শুধু কাত্যুসার কথাই ভেবে চলেছে, একটু আগে তাকে থামিয়ে যে চুম্বন করেছে—এটাই তার সমস্ত ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; আর কোন কথাই সে চিন্তা করতে পারছে

না। কাত্যুসা যখন ঘরের মধ্যে এল, তখন তার দিকে না তাকিয়েই সে তার সমগ্র সত্ত্বাকে অনুভব করতে সক্ষম হল; এবং এরজন্য নিজের ওপর রীতিমত জোর খাটাতে হল তাকে।

খাওয়া শেষ হবার সাথে সাথেই সে নিজের ঘরে ফিরে গেল, প্রচণ্ড উত্তেজনায় বেশ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করল। কাত্যুসার পায়ের শব্দ শোনার আশায় বাড়ির প্রতিটি লোকের, প্রতিটি জিনিসের শব্দ সে কান পেতে শুনতে লাগল। তার মধ্যেকার পাশব শক্তিটা তখন যে শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাই নয়, তার ভেতরের সেই আত্মার শক্তিটাকেও একেবারে দুমড়ে-মুছড়ে দিয়েছে; এখন সেই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

যদিও সারাদিন ধরেই সে তার প্রতি নজর রাখল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গে নির্জনে দেখা করতে সক্ষম হলনা। কাত্যুসা সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে চলল। কিন্তু বিকেলের দিকে একবার সে তার পাশের ঘরে যেতে বাধ্য হল; কারণ চিকিৎসক ভদ্রলোকটিকে রাত্রে সেখানেই থেকে যেতে বলা হয়েছিল, আর সে কারণেই কাত্যুসা তার জন্য বিছানা পাতছিল। নেখল্যুদভ তার উপস্থিতি টের পেয়ে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে দম বন্ধ করে এমনভাবে এগোতে লাগল যে মনে হল, হয়ত বেশ ভারি কোন একটা অপরাধ করতে চলেছে সে।

পরিষ্কার বালিশের ঢাকনির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুটো কোনা ধরে কাত্যুসা তার মধ্যে বালিশটা ঢোকাচ্ছিল। নেখল্যুদভকে দেখতে পেয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে হাসল; কিন্তু তার মুখে খুশির চিহ্নমাত্র দেখা গেলনা, বরং মনে হল সেটা যেন এক ভয়াবহ ভীতির অনিচ্ছাকৃত হাসি। সে হাসি যেন বলে দিল, নেখল্যুদভ যা করতে চাইছে তা ঠিক নয়। সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল; পুনরায় সেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও, তার প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসার কথা সে বলে উঠল; বলল তার আবেগের কথা, অনুভূতির কথা, জীবনের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্বরটা এই প্রথম স্বরকে শ্বাসরুদ্ধ করে বলে উঠল, 'সাবধান! নিজের সুখ আর আনন্দের এই সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া কোরো না।' এক ভয়াবহ অপ্রতিরোধ্য পাশবিক উন্মাদনা তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করল; তাকে চালিত করল কাত্যুসার দিকে।

দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তাকে বিছানায় বসে পড়তে বাধ্য করল; এবং আরও কিছু করা প্রয়োজন এটা মনে হতেই সে নিজেও তারপাশে বসে পড়ল।

কাত্যুসা খুব করুণ সুরে বলল, 'দিমিত্রি, লক্ষ্মীটি, আমায় ছেড়ে দাও।' তারপর জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'পাভলোভনা আসছে।' এবং সত্য সত্যই সেদিকে কেউ আসছিল।

নেখল্যুদভ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ঠিক আছে, রাতে তোমার কাছে যাব। তুমি একা থাকবে তো?'

'কি ভাবছ তুমি? না, কিছুতেই না' সে বলল। কথাটা শুধুমাত্র তার ঠোঁট দিয়েই বের হল; কিন্তু আসলে তার সত্ত্বার কম্পিত দ্বিধা অন্য কিছু, একেবারেই অন্য কিছু বলতে চেয়েছিল।

মাত্রিওনা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা কম্বল ছিল; নেখল্যুদভের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তাকে রাগে ধমকাতে লাগল

অন্য কম্বল নিয়ে আসার জন্য।

নেখল্যুদভ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাত্রিওনার দৃষ্টিতে তার প্রতি দোষারোপ তার নজরে পড়ল, এবং এ দোষারোপ যে ন্যায়সঙ্গত তাও সে বুঝল, এমনকি সে যে অন্যায় করেছে তা-ও অনুভব করল; কিন্তু এই অভিনব নিচুস্তরের পাশবিক উন্মাদনা, কাত্যুসা'র প্রতি প্রকৃত ভালবাসার সব অনুভূতি থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তার মনকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। এই পশুকে তৃপ্ত করতে হলে এরপর যে কি কর্তব্য তাও তার জানা। সুতরাং এখন সে ভাবতে লাগল কি করে সেই সুযোগ পাওয়া যায়।

সারাটা বিকেল উন্মাদের মত কাটল তার। কখনও পিসিদের ঘরে যায়, আবার পর মুহূর্তেই ফিরে আসে নিজের ঘরে, তারপর আবার চলে যায় বারান্দায়। খালি ভাবে কি ভাবে কাত্যুসাকে একা পাওয়া যাবে। কিন্তু কাত্যুসা তাকে এড়িয়েই চলে; আর পাভলোভনাও কাছ থেকে দৃষ্টি রাখে কাত্যুসার ওপর।

॥ সতের ॥

এভাবেই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এল। নেখল্যুদভের পিসিমারা শুতে চলে গেল। সে ভাবল মাত্রিওনা পাভলোভনাও নিশ্চয় তাদের সাথেই শুতে গেছে। সুতরাং কাত্যুসা এখন রয়েছে তার নিজের ঘরে—একা। সে বারান্দায় এল। ঘরের বাইরেটা অন্ধকার, সেঁতসেঁতে; বসন্তের উষ্ণ বাতাস শেষ কুয়াশাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে, নয়ত শেষবারের মত বরফ গলার ফলেই কুয়াশায় বাতাস ভরে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে তুষার ঝলমলে ছোট এক টুকরো জমির খানা পেরিয়ে সে নিঃশব্দে কাত্যুসার ঘরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার হৃদপিণ্ড এত দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল যে সে নিজেই সে স্পন্দনের শব্দ শুনতে পেল। অতি কষ্টার্জিত শ্বাস, দীর্ঘশ্বাসের মত যাওয়া আসার সময় যেন ফেটে পড়তে চাইল। ঘরের ভেতর একটা ছোট বাতি জ্বলছিল, আর কাত্যুসা টেবিলটার ধারে বসে চিন্তিত মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে কাত্যুসা কি করছে তা লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, কাত্যুসা একেবারে নড়ছে না; তারপর মৃদু হেসে মাথাটা নাড়ল—মনে হল যেন নিজেকেই সে নিজে ভর্ৎসনা করল। এরপর বসার ভঙ্গি পালটে, হাত দুটোকে টেবিলের ওপর রেখে আবার আগের মতই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে।

নেখল্যুদভ তার দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের হৃদস্পন্দন আর দূর থেকে ভেসে আসা নদীর তরঙ্গের শব্দ শুনতে লাগল। সাদা কুয়াশার নিচে, নদীর বুকে এক অনন্ত প্রসব বেদনা বয়ে চলেছে। কী যেন একটা গোঙাচ্ছে, শব্দ করে কী যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা করে কী যেন পড়ছে, আর মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য বরফের টুকরো একের সাথে অপরের সংঘর্ষে খান খান হয়ে কাঁচের মত ভেঙ্গে গুড়িগুড়ি হয়ে যাচ্ছে।

সে দাঁড়িয়ে দেখছে কাত্যুসাকে। কাত্যুসার সারা মুখে ছেয়ে রয়েছে হৃদয়ের গভীরতম কোণে সংঘটিত বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় প্রতিচ্ছায়া। নেখল্যুদভের তা দেখে দুঃখ হল; কিন্তু আশ্চর্য, এই দুঃখ তার মনের কামনাকে আরও বেশি করে তাতিয়ে তুলল। সমস্ত মন জুড়ে শুরু হল বাসনার একচ্ছত্র আধিপত্য।

সে আস্তে জানলায় টোকা দিল। শব্দ শুনে কাত্যুসা এমনভাবে চমকে

উঠল যে মনে হল সে যেন বিদ্যুতপিষ্ট হয়েছে। তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল, মুখময় ছড়িয়ে পড়ল ভীতির ছাপ। সে লাফিয়ে উঠে, এগিয়ে এসে মুখখানাকে জানলার কাঁচের কাছে নিয়ে এল। তখনও তার মুখে ভীতির ছাপ। চোখের সামনে হাতটা আড়াল করে কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল—নেখল্যুদভকে চিনতে পারল। নেখল্যুদভ এর আগে তার মুখে এমন অস্বাভাবিক গম্ভীরতা আর কোনদিনও দেখেনি। সে তার হাসির প্রতিদান দিল শুধুমাত্র তার প্রতি অসীম আনুগত্যের বশে; কিন্তু আসলে সে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র হাসির অস্তিত্ব ছিল না, ছিল শুধু ভীতি। নেখল্যুদভ তাকে হাতের ইসারা করে উঠোনে নেমে আসতে বলল; কিন্তু সে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। নেখল্যুদভ জানলার কাছে মুখটা নিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু কাত্যুসা সেই মুহূর্তে দরজার দিকে চলে গেল। বেশ বোঝা গেল ভেতর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। কুয়াশা এত ঘন হয়ে পড়েছে যে মাত্র পাঁচ পা দূর থেকেও জানলাটা দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু একটা নিরাকার কালো বস্তুর ভেতর থেকে যে বাতির বিস্তৃত লাল আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে তা বেশ স্পষ্ট প্রতিয়মান হচ্ছে। ওদিকে নদীর বুক চিরে সেই একই আওয়াজ উঠছে, সেই গোঙানি আর মর্মর ধ্বনি; সেই ফেটে যাওয়া আর পতনের শব্দ। কুয়াশার মধ্যে সামান্য দূরেই একটা মোরগ ডেকে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জবাব দিল; তারপর একটা—অবশেষে সেই ডাক যতক্ষণ না একটা একটানা ডাকে পরিণত হল, ততক্ষণ ধরে চলতেই থাকল। তারপর গভীর নিস্তব্ধতা; শুধু শোনা যেতে লাগল নদীর প্রবাহমান শব্দ। সে রাতের মত সেটাই ছিল মোরগের দ্বিতীয় ডাক।

বাড়ির কোণের দিকটায় নেখল্যুদভ পায়চারি করতে লাগল; পায়চারি করতে করতে দু একবার একই গর্তে পা পড়ে গেল তার। তারপর এগিয়ে এল জানলাটার কাছে। বাতিটা তখনও জ্বলছে, আর কাত্যুসাও বসে আছে সেই টেবিলটার ধারে—ঠিক তেমনিভাবেই। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, কী যে করবে তা যেন সে নিজেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। নেখল্যুদভ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাথে সাথেই কাত্যুসা তার দিকে ফিরে দেখল। নেখল্যুদভ চোখ টিপল। কে এসেছে তা না দেখেই কাত্যুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নেখল্যুদভ বাইরে থেকে খট্‌ করে দরজা খোলার শব্দ শুনল। সে নিজের জায়গাতেই অপেক্ষা করতে লাগল, আর কাত্যুসা বের হয়ে আসার সাথে সাথেই দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। কাত্যুসা অনুরাগে ঠোঁটটা বাড়িয়ে দিল চুমু নেবার জন্য। তারা বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল; সেখানে জমা সব বরফটুকু গলে গিয়ে নেখল্যুদভের মনকে এক যন্ত্রণাদায়ক বাসনায় ভরিয়ে তুলল। তারপর হঠাৎ দরজাটায় খট্‌ করে একটা শব্দ হল; সঙ্গে সঙ্গে মাত্রিওনার রাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কাত্যুসা।'

তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাত্যুসা ফিরে গেল নিজের ঘরে। নেখল্যুদভ ছিটকিনি আটকাবার শব্দ শুনতে পেল; তারপর সব শান্ত। লাল আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে; এখন চারিদিকে কেবল কুয়াশা। ওদিকে নদীর বুকের কলধ্বনি অবিরাম বেজে চলেছে।

নেখল্যুদভ জানলার কাছে গেল, কারও দেখা নেই। ঠক্‌ঠক্ শব্দ করল;

কিন্তু কোন উত্তর নেই। এবার সে ফিরে গেল নিজের ঘরে, কিন্তু ঘুম এল না। ফলে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে; খালি পায়ে বারান্দা ধরে কাত্যুসার ঘরের দিকে চলল। ঘরটা পাভলোভনার ঘরের পাশেই। বাইরে দাঁড়িয়ে পাভলোভনার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল সে, তারপর হঠাৎ এল কাশির আওয়াজ। পাভলোভনা খাটে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ তুলে পাশ ফিরে শুলো; নেখল্যুদভের দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। মিনিট পাঁচেক সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। যখন চারিদিক আবার শান্ত হয়ে এল, মাত্রিওনা যখন আবার নাক ডাকা শুরু করে দিল—তখন সে ধীর পদে এগিয়ে, নিঃশব্দে পা-ফেলে পা-ফেলে কাত্যুসার দরজার কাছে এল। কোন শব্দ শোনা গেল না। সম্ভবতঃ কাত্যুসা জেগেছিল আর নেখল্যুদভও শুনতে পাচ্ছিল তার নিঃশ্বাসের শব্দ। কিন্তু যখনই সে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল 'কাত্যুসা' বলে, অমনি কাত্যুসা লাফ দিয়ে উঠে বেশ রাগতঃ স্বরে তাকে চলে যাবার জন্য বলতে লাগল।

যদিও সে মুখে বলল, 'এর মানেটা কি? তুমি কি করছ? তোমার পিসিরা শুনে ফেলবেন.' কিন্তু তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বলতে চাইছিল, 'আমি সম্পূর্ণ তোমারই।' আর নেখল্যুদভও ঠিক ঐ দ্বিতীয় কথাটাই শুনতে পেল।

সে বলল, 'দরজা খোল, এক মিনিটের জন্য আমায় ভেতরে ঢুকতে দাও। কী যে বলল, তা যেন সে নিজেই বুঝতে পারল না।

কাত্যুসা নীরব। তারপর নেখল্যুদভ বুঝতে পারল কাত্যুসার হাত ছিট-কিনিটার সন্ধান করছে। পরমুহূর্তেই ছিটকিনিটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে নেখল্যুদভ ভেতরে ঢুকে কাত্যুসাকে জড়িয়ে ধরে—তার সেই রুক্ষ কড়া সেমিজ আর নগ্নবাহুসহ—কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

কাত্যুসা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'উঃ, কী করছ তুমি?' কিন্তু তার কথায় কানই দিল না নেখল্যুদভ, সেভাবেই তাকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

তাকে আরও বেশি জোরে আঁকড়ে ধরে কাত্যুসা বলল, 'না, কিছুতেই না, ছেড়ে দাও বলছি।'

* * *

নীরবে, কম্পিত পদক্ষেপে, নেখল্যুদভের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কাত্যুসা চলে যাবার পর নেখল্যুদভ আবার বারান্দায় বেরিয়ে এল, এবং এইমাত্র যা ঘটে গেল তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল।

ধীরে ধীরে আলো ফুটছে; নদীর গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে পতন আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার শব্দ, বরফ ভাঙার গোঙানী, কলকলধ্বনি,—জোরে আরও জোরে। কুয়াশা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে; আর মাথার ওপর ক্ষীয়মান চাঁদ আবছা ভাবে ছড়িয়ে চলেছে তার মৃদু আলোর রশ্মি।

নেখল্যুদভ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, 'এ সবের মানে কি? এ কি মহৎ আনন্দ না ভীষণ দুর্ভাগ্য—যা আমার কপালে নেমে এল?'

সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, 'সবারই এমন হয়, সবাই এমনটাই করে।' তারপর শুতে গেল, ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ আঠার ॥

পরের দিন দিলখোলা, সুদর্শন, বুদ্ধিমান সেনবক এসে হাজির হল নেখল্যুদভের পিসিদের বাড়িতে এবং তার অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত রুচি আর দিমিত্রির প্রতি

গভীর ভালবাসার জন্য সকলেই তাকে বেশ পছন্দ করল।

যদিও বৃদ্ধা মহিলারা তার মহত্বকে যথেষ্ট প্রশংসা করল, কিন্তু তার আতিশয্য দেখে মনে মনে বিহ্বল না হয়েও পারল না। একজন অন্ধ ভিখিরিকে সে একটা রুবল দিল, চাকরদের বকশিশ দিল পনের রুবল, আর সোফিয়া ইভানোভনার পোষা কুকুরটার থাবায় চোট লেগে যখন রক্ত পড়তে লাগল তখন মিহি কাপড়ে তৈরি, মিহি সেলাই করা ডোরাকাটা একটা রুমাল দিয়ে (যার দাম, সোফিয়া জানে, কম করেও প্রতি ডজন পনের রুবল) সে তার পায়ে পট্টি বেঁধে দিল। বৃদ্ধা মহিলা দুজন এর আগে এ ধরনের কোন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়নি ; এবং তারা জানতও না যে সেনবক দু লক্ষ রুবলের মালিক—যা কিনা সে অন্য কোন কাজেও লাগায়নি। ফলে তার মত লোকের পক্ষে পঁচিশটা রুবল খরচ করাটা এমন কিছু একটা অবাক হবার মত ব্যাপার নয়।

মাত্র একটা দিন থাকার পর সেই রাত্রেই সেনবক এবং নেখল্যুদভ দুজনেই চলে গেল। কারণ তাদের ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল, ফলে বাহিনীতে যোগদান না করে কোন উপায়ও ছিল না।

পিসিদের বাড়িতে শেষ দিনটায়, আগের রাতের স্মৃতির আঘাতে নেখল্যুদভের হৃদয়ে দু ধরনের অনুভূতির সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তার একটা হচ্ছে ; উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ার তৃপ্তিতে ভরপুর জলন্ত ইন্দ্রিয়াগুণ ভালবাসার স্মৃতিচারণ (যদিও তা ছিল প্রত্যাশার পরিপূর্ণতা থেকে অনেক দূরে) ; আর অন্যটা হচ্ছে : একটা অন্যায় সংঘটিত হওয়ার বোধ—যা শুধরে নেওয়া দরকার, কাত্যুসার জন্য নয়, তার নিজের জন্যই।

তার স্বার্থপর ব্যক্তিক তাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবা সম্ভবই নয়। সে বিস্মিত হচ্ছিল এই ভেবে যে তার চরিত্র উন্মোচিত হয়ে গেলে কি সে খুব বিকৃত হবে, কিংবা আদৌ হবে কি ? কিন্তু কিছুতেই সে এ কথা ভেবে পাচ্ছিলনা যে কাত্যুসা এখন কি অবস্থায় কাটাচ্ছে, আর তার হবেটাই বা কি।

সে বুঝল যে সেনবক তার সাথে কাত্যুসার সম্পর্কটা টের পেয়ে গেছে ; এবং সে কারণে মনে মনে বেশ গর্বিতও হল।

কাত্যুসাকে দেখার পর সেনবক মন্তব্য করেছিল, 'ও, এবার বুঝতে পারছি, হঠাৎ পিসিদের ওপর তোমার টানটা এমন উথলে উঠল কেন ; এক দু দিন নয় পুরো সপ্তাটাই তাদের সাথে কাটিয়ে দিলে ! অবশ্য আমি হলেও তাই করতাম ; যাই হোক সুন্দরী মেয়ে তো বটে।

নেখল্যুদভ ভাবছিল, প্রেমের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ না করে চলে যাওয়াটা যদিও করুণ, তবে বিচ্ছেদের চূড়ান্ত প্রয়োজনে তার একটা সুবিধেও হয়েছে ; কারণ ওতে দুজনের সম্পর্কে হঠাৎ ইতি টানা গেছে—না হলে তারপক্ষে এটা চালিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত হত। এরপর ভাবল, কাত্যুসাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত। সেটা তারজন্য নয়, তার কাজে লাগতে পারে বলেও নয়, বরং এইজন্য যে সেটা করাটাই হচ্ছে সঙ্গত। কেননা তাকে কাজে লাগিয়ে, তারপর তার হিসেব চুকিয়ে না দিলে তাকে অশ্রদ্ধেয় বিবেচনা করা হবে। সুতরাং সে তাকে ঠিক ততটা পরিমাণ অর্থই দিল যতটা তার এবং কাত্যুসার অবস্থা অনুযায়ী দেওয়া উচিত বলে সে মনে করল।

যাওয়ার দিন মধ্যাহ্নভোজের পর সে তারজন্য অপেক্ষা করছিল বাড়ির এক-পাশের প্রবেশ পথে। কাত্যুসা তাকে দেখতে পেয়েই যেন ঝলসে উঠল, এবং নিজের ঘরে যাবার জন্য তার পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল। কিন্তু সে তার পথ আটকাল; একটা খামের মধ্যে একশ রুবলের একটা নোট ভরে সেটা তার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। এখানে, আমি—'

কাত্যুসা বলল, সে কি বলতে চায়; জ্র কুঁচকে মাথা ঝাঁকিয়ে সে তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

নেখল্যুদভ তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'নিয়ে যাও, নিতেই হবে।' কাত্যুসার জামার বুকের কাছটাতে জোর করে সেটাকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আক্ষেপ করল, জ্রকুটি করল নিজেকেই। মানসিক যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করল। মনে হল, শেষ দৃশ্যের কথা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, আর্তনাদ করছে; নিজের ভবিতব্য নিজেই লিখে চলেছে!

'কিন্তু আমি কি করতে পারতাম? সবারই কি এরকমটা হয়না?, যেমন সেনবক বলেছিল, সেই গভর্নসের সঙ্গে গ্রিশার কথা, আমার বাবার সঙ্গে কৃষক রমণীর—যার অবৈধ সন্তান মিতেনকা এখনও বেঁচে আছে। যদি সবাই এরকম করতে পারে……হ্যাঁ, আমার মনে হয় এরওপর কারও কোন হাত নেই।' এভাবে চিন্তা করে সে বৃথাই চেষ্টা করল মনের শান্তি পেতে; কিন্তু যা ঘটে গিয়েছিল সেই স্মৃতি তার হৃদয়কে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে লাগল।

আত্মার অত্যন্ত গভীরে সে বুঝতে পারল যে সে মূলতঃ নিষ্ঠুর এবং কাপুরুষের মত ব্যবহার করেছে। নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কিত এই বোধ অপরের ত্রুটি ধরা থেকে তাকে বিরত রাখবে। অতঃপর তারপক্ষে নিজেকে একজন চমৎকার অভিজাত মানুষ হিসেবে আর ভাবা অসম্ভব হয়ে উঠবে—ইতিপূর্বে সে যা ভাবত এবং এক সাহসী উচ্ছল জীবনযাপনের জন্য যা অপরিহার্য্য ছিল তারপক্ষে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই মাত্র উপায় আছে তা হল এ সম্পর্কে আর কিছু না ভাবা। আর সে তা ভাবলও না।

এরপর যে জীবনে সে প্রবেশ করল, নতুন পরিবেশ, নতুন বন্ধুবান্ধব, যুদ্ধ এসবই তাকে সে ব্যাপারটা ভুলে যেতে সাহায্য করল। যতই দিন যেতে লাগল ততই সে আরও কম করে এ সম্পর্কে ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এটা একেবারে ভুলেই গেল।

শুধুমাত্র একবার, যুদ্ধ শেষে যখন সে তার পিসিদের সাথে দেখা করতে গেল সেখানে কাত্যুসার সাক্ষাৎ পাবে সে আশায়, তখন শুনল যে তার শেষবার আসার পরই কাত্যুসা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আর তার পিসি শুনেছে যে সে নাকি কোথায় আতুর পালছে, নয়ত গোল্লায় গেছে।

নেখল্যুদভের হৃদয় বেদনার্ত হল। ভাবল, আতুর-ঘরের সময় হিসেব করলে শিশুটি তার হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। পিসি কাত্যুসার ওপর দোষারোপ করে বলল যে সে তার মার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই এই কলুষিত জীবন পেয়েছে। সে তাদের এই মতে বেশ খুশিই হল। যেন এতে সে খালাস পেয়ে গেল। প্রথমে সে ভেবেছিল যে সে কাত্যুসাকে আর তার

শিশুটিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারপর তার আত্মার গভীরে সে এতই লজ্জিত ও যন্ত্রণাবোধ করল যে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারল না। বরং চেষ্টা করল আবার তার পাপের কথা ভুলে যেতে, এ সম্পর্কিত সব চিন্তাকেই শেষ করে ফেলতে।

এই ঘটনায় তার স্মৃতিতে সমস্ত অতীত যেন একসাথে ফিরে এল। তারা তার হৃদয়হীনতার, নিষ্ঠুরতার আর কাপুরুষতার স্বীকৃতি দাবি করল, যার ফলে তার বিবেকের ওপর এ ধরনের পাপ দশ বছরব্যাপী আধিপত্য করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এখনও সে এই স্বীকৃতির থেকে বহু দূরে। আজ তার একমাত্র ভয় হল যে সবকিছু জানাজানি হয়ে যেতে পারে। আর কাতুসা নিজে কিংবা উকিলের সাহায্যে সবার সামনে সমস্ত বিষয়ের পুনর্বিবেচনার জন্যে গোটা ব্যাপারটাকেই আবার টেনে এনে তাকে অপদস্থ করতে পারে।

॥ উনিশ ॥

এমনি যখন মনের অবস্থা তখন নেখলুদভ আদালত ছেড়ে জুরিদের ঘরে ঢুকল। চারপাশে কি সব কথাবার্তা চলছে বসে বসে তাই শুনতে লাগল, আর ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে চলল।

মৃত স্মেলকভের জীবনযাত্রার সাথে তাল রেখে একইভাবে সময় কাটাতে দেখা গেল সেই হাসিখুশি ব্যবসায়ীটিকে।

'হ্যাঁ, পুরনো বন্ধু, ঠিক এমনিই! খাঁটি সাইবেরিয়ার ফ্যাশান। সে জানত সে কি করছে, কোন ভয় ডর নেই। আমার কাছে ওটা খানিক মেয়ে নিয়ে মজা-করার মত!'

মুখপাত্রটি নিজের বিশ্বাসের কথা বলছিলেন, যেভাবেই হোক না কেন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পিওতর গেরাসিমোভিচ ইহুদি কেরানিটির সঙ্গে কোন একটা ব্যাপারে ঠাট্টা করছিলেন, আর দুজনেই একেবারে হাসিতে ফেটে পড়লেন। যে সব প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল নেখলুদভ তার উত্তর এক কথায় সারতে লাগল শুধুমাত্র একা থাকার বাসনায়।

এক পাশে কাত হয়ে চলার ভঙ্গিতে পেয়াদা যখন জুরিদের আদালতে ডাকতে এল তখন নেখলুদভ বেশ ভীত হয়ে পড়ল। মনে হল সে যেন বিচার করতে যাচ্ছে না বরং তারই যেন বিচার হতে চলেছে। সে নিজের আত্মার গভীরে অনুভব করল যে সে আসলে সে একটা আস্ত বদমাশ; লোকের চোখের দিকে তাকাতেও তার লজ্জা হওয়া উচিত। তবু কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃই বেদির দিকে পা বাড়াল সে তার স্বাভাবিক স্থৈর্যশীল ভঙ্গিতে, আর ঠিক মুখপাত্রের পাশেই বসে পড়ল। পা দুটো আড়াআড়ি করে চশমাটা হাতে নিয়ে খেলতে লাগল।

বন্দীদেরও বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন আবার তাদের আনা হল।

আদালতে এখন কিছু নতুন মুখও দেখা যাচ্ছে—সাক্ষীর, আর নেখলুদভ লক্ষ্য করল মাসলোভা লোহার শিকগুলোর সামনের সারিতে বসে থাকা এক স্থূলকায় মহিলার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। তার পরনে সিল্ক ও ভেলভেটের চেকনাই পোষাক, মাথায় উঁচু টুপি এবং ফিতে, আর হাতে সুন্দর জালির ব্যাগ। কনুই পর্যন্ত হাতখানা খালি। পরে সে জানতে পারল যে, এ হল আরেকজন সাক্ষী; মাসলোভা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করত তার কর্ত্রী।

সাক্ষীদের জেরা করা শুরু হল। নাম, ধর্ম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে গোটা-কয়েক প্রশ্ন করার পর, তাকে দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হবে কি হবে না, তা ঠিক হলে সেই বৃদ্ধ যাজক তার পা দুটো কষ্ট করে টেনে ভেতরে এলেন। তার পর আবার আঙুল দিয়ে বুকে সুবর্ণ ক্রুশ এঁকে সাক্ষী আর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেই একই রকম ধীরস্থিরভাবে প্রতিজ্ঞা করালেন। তিনি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর প্রয়োজনীয় একটা কাজ করছেন এ ব্যাপারে তাকে বেশ সুনিশ্চিত বলে মনে হল।

সাক্ষীদের প্রতিজ্ঞা করানো হয়ে গেলে, পতিতালয়ের কর্ত্রী কিতাইয়েভা ছাড়া অন্য সবাইকে বাইরে পাঠানো হল। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এ সম্পর্কে সে কি জানে। কিতাইয়েভা প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার বড় টুপিটা আর মাথাটা যুগপৎ নাড়াতে লাগল; চতুর মুখে ফুটে উঠল স্পষ্ট ছলনার হাসি। জোরালো জার্মান উচ্চারণে। সে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত আর পরিপূর্ণ বর্ণনা দিল।

বলল, তার পূর্বপরিচিত হোটেলের চাকর সিমন সাইবেরিয়ার ব্যবসায়ীটির জন্য একটি মেয়েকে নিতে তার প্রতিষ্ঠানে আসে। সে লিউবভকে তার সাথে পাঠায়। কিছুক্ষণ পরে লিউবভ ব্যবসায়ীটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ততক্ষণে ব্যবসায়ী সামান্য 'উন্মত্ত'—কিতাইয়েভা হাসতে হাসতে বলল—ক্রমান্বয়ে মদ গিলে আর মেয়েটার সাথে খুনসুটি করে চলল সে। শেষে টাকা কম পড়ে যাওয়ায় সে নিজেই লিউবভকে পাঠাল তার হোটেলে। তার মেয়েটির প্রতি যথেষ্ট আসক্তি ছিল। এ কথা বলার সাথে সাথে কিতাইয়েভা বন্দিনীর দিকে তাকাল।

নেখল্যুদভের মনে হল এবার যেন মাসলোভা একটু হাসল, আর এতে সে মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করল। এক অদ্ভুত, অনির্দিষ্ট বিরক্তির অনুভূতির সাথে মিশ্রিত এক অনুকম্পা তার ভেতর জেগে উঠল।

বিচার বিভাগীয় পদের জন্য দরখাস্তকারী মাসলোভার আইন-উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত ব্যক্তিটি উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠে প্রশ্ন করল, 'মাসলোভা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?'

'সে খুবই ভাল,' কিতাইয়েভা জবাব দিল. 'মেয়েটি সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। সে এক মার্জিত পরিবারে লালিত পালিত হয়েছে এবং ফরাসী ভাষা লিখতে ও পড়তে জানে। কখনও কখনও সে ঠাট্টা ইয়ার্কি করত বটে তবে কস্মিনকালেও তাকে আত্মবিস্মৃত হতে দেখিনি। সত্যিই সে খুব সুন্দর মেয়ে।'

কাত্যুসা মেয়েমানুষটির দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে নিল জুরিদের ওপর। শেষে নেখল্যুদভের দিকে এসে চোখজোড়া স্থির হল। এখন তার মুখ আরও গম্ভীর, এমনকি খানিকটা নিষ্ঠুরও লাগছে। তার চিন্তিত চোখের একটা ট্যারা, আর সেই অদ্ভুত একজোড়া চোখ নেখল্যুদভের দিকে স্থির হয়ে থাকল। কেমন ভয় ভয় করা সত্ত্বেও নেখল্যুদভ সেই তির্যক চোখের উজ্জ্বল স্বচ্ছ শুভ্রতা থেকে নিজের দৃষ্টি কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারল না।

সেই জলজ্বলে রাতের কথা তার মনে হল। সেই কুয়াশা, আর নদীর নিচে বরফ ভাঙার শব্দ। বিশেষতঃ প্রভাতের দিকে উত্থিত মরা চাঁদের ক্ষয়চিহ্ন। কালো রঙা কিসের যেন অপরূপ এক শোভা। তারদিকে তাকিয়ে থাকা এই কালো চোখ জোড়ায় যেন সেই অপরূপ কালো বস্তুটা দৃশ্যমান।

নেখল্যুদভ ভাবল, 'সে আমাকে চিনতে পেরেছে।' আঘাতের আশঙ্কা করে

সে পিছু হটল। কিন্তু কাত্যুসা সত্যি তাকে চিনতে পারেনি। শান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল সভাপতির দিকে। নেখল্যুদভও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে ভাবল, 'উঃ, যদি ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ হত !'

শিকারে গিয়ে একবার একটা আহত পাখিকে অনুগ্রহ করে হত্যা করার পর তার মনের ভাব যেমনটি হয়েছিল এখন ঠিক সে রকমই এক করুণা, অনুকম্পা আর তিরস্কার অনুভব করছে সে তার হৃদয়ে। আহত পাখি যখন শিকারীর থলির মধ্যে ছটফট করে, তখন হয়ত একজন বিরক্ত হয় এবং করুণা অনুভব করে, আর ঠিক সেই সময় অন্য একজন সেটাকে হত্যা করে সবকিছু ভুলে যেতে চায়।

বসে বসে সাক্ষীদের জেরা শুনতে শুনতে এ ধরনের মিশ্রিত অনুভূতিতে নেখল্যুদভের বুক ভরে উঠল।

॥ কুড়ি ॥

কিন্তু, তার গায়ে কাদা ছোঁড়ার জন্যই যেন মামলার বৃত্তান্ত জোর করেই বেড়ে চলল। সমস্ত সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়ার পর, এমনকি বিশেষজ্ঞদেরও, আদালতের স্বাভাবিক গুরুত্বের সাথে উভয় পক্ষের কৌঁসুলি ও সরকারি উকিলের বহু অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নোলোচনা শেষ হল, সভাপতি জুরিদের ডেকে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা করার ভার দিলেন। সেগুলোর মধ্যে ছোট্ট গোলাপের মত হীরে বসানো উদ্ভট আংটিটাও আছে। বোঝা যায় সেটা কড়ে আঙ্গুলেই পরা হত। আর আছে একটা টেস্ট টিউব যাতে বিষ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর সবগুলোতেই সীল লাগানো, লেবেল আঁটা।

ঠিক যে মুহূর্তে জুরিরা ওগুলোর দিকে তাকাতে গেলেন তক্ষুণি সরকারি উকিল উঠে দাঁড়িয়ে দাবি জানালেন যে ওগুলো দেখার আগে মৃতদেহের ডাক্তারী রিপোর্ট পড়া হোক।

সভাপতি যখন তার সাধ্য মত সভার কাজকর্ম দ্রুতগতিতে চালাচ্ছেন যাতে তিনি সেই সুইশ মেয়েটির সাথে তাড়াতাড়ি দেখা করতে পারেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, এই কাগজটা পড়া হলে শুধু ক্লান্তি উৎপাদনই হবে, আর এও বুঝলেন যে, শুধুমাত্র অধিকার আছে বলেই সরকারি উকিল এটা পড়ার দাবি জানালেন। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দাবি মঞ্জুর করতে হল।

কর্মসচিব ডাক্তারী রিপোর্ট বের করে অলসভাবে আধো আধো স্বরে তা পড়তে শুরু করলেন 'আর এবং 'এল' বর্ণ দুটোর উচ্চারণে কোন ফারাক না রেখে।

তিনি পড়লেন, 'বাহ্যিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ; (১) ফেরাপন্ত স্মেলকভের উচ্চতা ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি।'

'উহুঁ ! খুব খারাপ নয়। বেশ ভাল সাইজ', নেখল্যুদভের কানের কাছে ব্যবসায়ীটি বেশ আগ্রহের সাথে বিড়বিড় করল।

'(২) মনে হয় তার বয়েস প্রায় চল্লিশ।

(৩) দেহ বেশ ফোলা।

(৪) মাংসের বর্ণ সবুজ, কেবল কয়েক জায়গায় কালো দাগ রয়েছে।

(৫) চামড়ায় ছোট বড় হরেকরকম ফোস্কা পড়েছে ; তা-ও আবার কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা উঠে এসেছে।

(৬) মাথার চুল পিঙ্গল বর্ণের, বেশ মোটা, আর স্পর্শ করলে চামড়া থেকে

সহজেই তা উঠে আসে।

(৭) চোখের তারা কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর সাদা অংশটুকু বেশ ধূসর ঝাপসা।

(৮) নাক, কান আর মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। মুখ আধ খোলা।

(৯) বুক আর মুখ এমনি ফুলে গেছে যে ঘাড় দেখাই যায় না।'

এরকম আরও কত কি!

চারপাতা ধরে সাতাশটি পরিচ্ছেদে ব্যবসায়ীটির উৎকট, মোটা, ফোলা, পচা দেহের সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি শহরে মজা লুটতে গিয়েছিলেন। এমনিতেই নেখলুদভ বিরক্ত হচ্ছিল, তার ওপর মৃতদেহের এমন বর্ণনায় তার বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। কাত্যুসার জীবন, মৃতদেহের নাক দিয়ে পচা দুর্গন্ধের নির্গমন, কোটর থেকে চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে আসা, তার কাত্যুসার সাথে তার পূর্বের কীর্তিকলাপ—এসব মিলিয়ে সে মুসড়ে পড়ল। তার মনে হল এগুলো যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে, এবং শুধু তাকে ঘিরেই যেন আবর্তিত হয়ে চলেছে।

ডাক্তারী রিপোর্ট যখন পড়া শেষ হল, তখন সভাপতি একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর মাথা তুললেন এই আশায় যে বোধ হয় ওটা এবার শেষ হয়েছে। কিন্তু কর্মসচিব সঙ্গে সঙ্গেই আবার আভ্যন্তরীণ রিপোর্টটা পড়তে শুরু করলেন।

সভাপতি আবার তার হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বুঝলেন। নেখলুদভের পাশে বসা ব্যবসায়ীটি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছে। তার শরীরটা ক্রমাগত এদিক ওদিক নড়ছে। শুধুমাত্র বন্দীরা ও রক্ষীরাই চুপচাপ বসে আছে।

আভ্যন্তরীণ রিপোর্ট থেকে দেখা যায়ঃ

'(১) খুলির হাড় থেকে চামড়া সহজেই উঠিয়ে নেওয়া যায়, এবং রক্ত মোটেই জমাট ছিল না।

(২) খুলির হাড়গুলো গড়পড়তা একই ঘণত্বের ও বেশ ভাল অবস্থায় রয়েছে।

(৩) মাস্তিষ্কের ঝিল্লীতে দুটো চার ইঞ্চি লম্বা বিবর্ণ দাগ; সেটার রঙ ধূসর সাদা।'

এরকম আরও তেরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

এরপর রয়েছে সহকারীদের নাম ও স্বাক্ষর, আর ডাক্তারের সিদ্ধান্ত এই যে, বেশির ভাগ গণ্ডগোল পাকস্থলীতে; নাড়িভুঁড়ি আর কিডনিতে সেই তুলনায় অনেক কম। ময়না তদন্ত থেকে এটা জানা গেছে। সরকারী রিপোর্টে লেখা হয়েছে, এটা ভাবার খুব সঙ্গত কারণ আছে যে স্মেলকভের মৃত্যু ঘটেছে বিষক্রিয়ায়। এই বিষ মদের সাথে মিশে তার পাকস্থলীতে প্রবেশ করেছে। পাকস্থলীর অবস্থা দেখে বিষের প্রকার ভেদ করা খুবই কঠিন, তবে অনুমান করা যায় যে এটা মদের সাথে মিশিয়েই দেওয়া হয়েছিল। কারণ স্মেলকভের পাকস্থলীতে যথেষ্ট পরিমাণ মদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

'সত্যিই যে সে মদ খেতে পারত তাতে আর সন্দেহ নেই—' ব্যবসায়ীটি জেগে উঠে ফিস্‌ফিস্‌ করল।

রিপোর্টটা পড়তে পড়তে এক ঘন্টা কেটে গেল, কিন্তু এতেও সরকারি উকিল সন্তুষ্ট হলেন না। পড়া শেষ হওয়ার পর যখন সভাপতি তার দিকে ফিরে

বললেন, 'আমার মনে হয় দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কিত রিপোর্টটা পড়ার বোধ হয় আর দরকার হবে না।' তখন তিনি বেশ গম্ভীর স্বরে সভাপতির দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'ওটাও পড়া হোক'।

তিনি একটু উঠে দাঁড়ালেন। এমন ভাব করলেন যাতে এটা স্পষ্ট হল যে রিপোর্টটা পড়ার ব্যাপারে তার বলার যথেষ্ট অধিকার আছে আর সেই অধিকার তিনি দাবিও করতে পারেন। এবং যদি তার এ দাবি মানা না হয় তবে হয়ত তা নিয়ে আবেদন করার একটা অজুহাত সৃষ্টি হবে।

আদালতের আরেকজন সদয় সভ্য, যার হাতে তাপ্পি মারা ব্যাগ, মুখে লম্বা দাড়ি, চোখের কোল বসে গেছে সেই বারোমেসে আমাশার রুগিটি ব্যাপারটা শেষ হয়েছে ভেবে সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কি দরকার আর পড়ার ? এতে কেবল বিষয়টা ফাঁপিয়ে তোলাই হবে। এরা কেবল দোষ ধরতেই পারেন ; খালি সময় নষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য।'

সোনার চশমা পরা সভ্যটি কিছুই বলছেন না, কেবল সামনের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে যেন ভাবছেন যে স্ত্রী বা সমগ্র জীবন থেকে তার কোন মঙ্গলই সাধিত হয়নি।

আবার রিপোর্ট পড়া শুরু হল: '১৮৮—সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী চিকিৎসা বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ৬৩৮ নং পরীক্ষাটি চালাই, কর্মসচিবটি গলা সপ্তমে চড়িয়ে আবার এমন চিৎকার করে পড়তে শুরু করলেন যে, মনে হল তিনি যেন উপস্থিত সকলের ঘুম ঘুম ভাবকে নষ্ট করতে চাইছেন, 'সহকারী মেডিকেল ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে দেহের আভ্যন্তরীণ গঠনগুলির পরীক্ষা চালাই।

(১) ডানদিকের ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড (৬ পাউণ্ডের কাঁচের জারে রক্ষিত)।

(২) পাকস্থলীর ভেতরের জিনিস (৬ পাউণ্ডের কাঁচের জারে রক্ষিত)।

(৩) পাকস্থলী (৬ পাউণ্ডের কাঁচের জারে রক্ষিত)।

(৪) যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রাশয় (৬ পাউণ্ডের কাঁচের জারে রক্ষিত)।'

ঠিক এখানটায় সভাপতি একজন সভ্যকে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন, তারপর অন্য একজনের দিকে ঝুঁকলেন, এবং তারপর অন্যদের সমর্থন পেয়ে বললেন, 'এই বিচারালয় বর্তমান রিপোর্টের গঠনকে নিষ্প্রয়োজন মনে করছে।'

কর্মসচিব পাঠ থামালেন, কাগজ ভাঁজ করে রাখলেন, আর এসব দেখে সরকারি উকিল বেশ চটে গিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করলেন।

সভাপতি বললেন, 'তাহলে জুরিগণ এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' জুরিদের মুখপাত্র ও অন্য কয়েকজন উঠে টেবিলের কাছে এলেন। তারা জানেনই না যে এবার তাদের কি করতে হবে। তারা আংটি, কাঁচের পাত্রগুলো আর টেস্টটিউব দেখতে লাগলেন। ব্যবসায়ীটি তো আংটিটা পরেই দেখতে শুরু করে দিল। শেষে নিজের জায়গায় ফিরে এসে মন্তব্য করল, 'সত্যিই তার আঙুল ছিল বটে ; একেবারে শসার মত।' ফলতঃ মৃত ব্যবসায়ীটির দৈত্যের মত যে ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তাতে সে মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করল।

॥ একুশ ॥

প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের প্রমাণাদি পরখ করা শেষ হলে, সভাপতি ঘোষণা করলেন

যে তদন্ত কার্যও শেষ হয়েছে এবং সরকারি উকিলকে তার সওয়াল চালিয়ে যেতে বললেন এই আশায় যে সরকারি উকিলও তো মানুষ, আর তারও তো প্রয়োজন পড়তে পারে খাওয়া-দাওয়ার কিংবা সিগারেট টানার, তখন নিশ্চয় তিনি অন্যান্যদের ব্যাপারেও একটু দয়া দেখাবেন। কিন্তু সরকারি উকিল না নিজের প্রতি, না অন্যের প্রতি—কারও প্রতিই এতটুকু দয়া দেখালেন না। লোকটা সত্যিকারের আকাট। তা সত্ত্বেও, স্কুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় একটা সোনার মেডেল আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রোমান আইন পড়ার সময় 'দাসত্ব প্রথা'র ওপর প্রবন্ধ লিখে বিশেষ পুরস্কার লাভের দুর্ভাগ্য তার হয়েছিল। ফলে আত্মবিশ্বাস এবং যথেষ্ট পরিমাণে আত্মসন্তুষ্টির জন্য (মেয়েদের ব্যাপারেও তার সাফল্যও ঠিক এরকমই) তার নির্বুদ্ধিতা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

তাকে বলতে বলা হলে, কারু কাজ করা পোশাকে আবৃত কমনীয় চেহারার প্রায় সবটুকুই দেখিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের ওপর হাত দুটো রেখে একবার চারপাশ নিরীক্ষণ করে, মাথাটা একটু নুইয়ে, বন্দীদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে স্বাতন্ত্রে রেখে, রিপোর্টগুলো পড়ার সময় যে বক্তৃতাটা তৈরি করেছিলেন সেটা বলবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

'মাননীয় জুরীগণ! আমার যথাসাধ্য ভাবনা অনুযায়ী, আপনাদের সামনে যে মামলাটি উপস্থিত করা হয়েছে, তা সত্যিই বেশ তাৎপর্যময়।'

তার দৃষ্টিকোন অনুযায়ী, একজন সরকারি উকিলের বক্তৃতা সর্বসাধারণের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—বিশিষ্ট উকিলদের মহান বক্তৃতাগুলোরই অনুরূপ। একথা সত্যি যে, এখানে উপস্থিত রয়েছে মাত্র তিনজন মহিলা—একজন মেয়ে দর্জি, একজন রাঁধুনি ও অন্যজন সিমনের বোন,—আর একজন কোচোয়ান। কিন্তু তাতে কি এসে যায়! মহামান্য উকিলটির বক্তৃতা ঠিক এভাবেই শুরু হল। নিজের জ্ঞান-গম্যির চরমে পৌঁছে, পাপের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের গভীরে ডুব দিয়ে সমাজের ক্ষতগুলোকে নগ্নভাবে উন্মোচন করা—এটাই হল তার বলার অন্যতম বিষয়বস্তু।

'মাননীয় জুরিগণ, আমাদের শতাব্দীর এক বিশেষ তাৎপর্যময় অপরাধ, আমার যথারীতি ধারণা অনুযায়ী, আপনাদের সামনে উপস্থিত—যেমন, সেই যন্ত্রণা-দায়ক অবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো, সেই দুর্নীতিগুলো যার সাথে আমাদের বর্তমান সমাজের এই ব্যক্তিরা জড়িত—যেগুলো, ঠিকভাবে বলতে গেলে, জ্বালা ধরানো আলোয় বিশেষভাবে নগ্নরূপে উদঘাটিত হয়েছে—সেটাই হল আজকের আলোচ্য বিষয়।'

সরকারি উকিল বক্তৃতা শুরু করল। মনে মনে যেসব শক্তিশালী বাগ্‌বিন্যাস তৈরি করে রেখেছিলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে তার একটিও ফসকে না যায়। আর এভাবেই একবারও না থেমে একঘণ্টা পনেরো মিনিট ধরে তিনি অবিরাম বক্তৃতার বন্যা বইয়ে দিলেন।

কেবল একবার মাত্র থামলেন। তখন কিছুক্ষণ ধরে থুতু গিলতে লাগলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার দক্ষতা ফুটে বেরোল। আর এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণে উচ্চতম প্রকাশরীতি প্রয়োগ করলেন। এখন, তাই, তিনি বলতে লাগলেন ধীর সঞ্চারিত স্বরলীলায়, ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে আসতে আসতে, জুরিদের দিকে তাকাতে তাকাতে। কখনও খুব শান্ত পেশাদারী সুরে, নিজেই নোটবুক দেখতে দেখতে,

আবার কখনও অভিযোগের সুর সপ্তমে চড়িয়ে সভা থেকে শুরু করে উকিলদের অবস্থান পর্যন্ত চোখ সরাতে সরাতে। কিন্তু সবসময়ই বন্দীদের থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখলেন। তারা সবাই স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার সম্প্রদায়ের প্রচলিত সমস্ত রকম বিকার তার বক্তৃতায় ফুটে উঠছে। আর অন্যান্য যে সব বিষয় আজকাল খুবই প্রচলিত—তার সবকিছুকেই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার শেষ নিদর্শন বলে ধরে নিচ্ছেন। যেমন, বংশানুক্রমিক ও জন্মগত অপরাধ প্রবণতার ধারণা, লম্ব্রোসো ও তার্দে, বিবর্তন ও অস্তিত্বের সংগ্রাম, সম্মোহনবাদ ও সম্মোহনী ক্ষমতা—যা চারকট আর অবক্ষয়ের যুগে প্রচলিত হয়েছিল—তার সবকিছুই।

তার সংজ্ঞানুযায়ী ব্যবসায়ী স্মেলকভ ছিলেন একজন অন্যতম শক্তিশালী নিষ্পাপ রুশ, নিজের অমলিন উদার প্রকৃতি নিয়ে যিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন কেবলমাত্র কয়েকজন অধঃপতিত ব্যক্তির চক্রান্তে।

তার মতে, সিমন কারতিনকিন সার্ফপ্রথার আদিম নিদর্শন—নির্বোধ, অজ্ঞ, নীতি বিবর্জিত, এমনকি তার কোন ধর্মবোধও নেই। আর ইয়েভফিমিয়া হল তার কর্ত্রী, যে কিনা তার বংশানুক্রমিক পাপের শিকার। নীতিজ্ঞানহীনতার সমস্ত লক্ষণই তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। আর মাসলোভা হল প্রধান অপরাধিনী—অবক্ষয়ের নীচতম নিদর্শন তার মধ্যে বিদ্যমান।

'এই স্ত্রীলোকটি,' মাসলোভার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'আজ আমরা এই আদালতে তার কর্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম যে শিক্ষিত, আর সে যে শুধু লিখতে পড়তেই জানে তাই নয়, এমনকি ফরাসী ভাষাটাও নাকি তার জানা। সে একজন অনাথ, এবং তার মধ্যে রয়েছে অপরাধের বীজাণু। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে সে লেখাপড়া শিখেছে। ইচ্ছে করলে সে সৎ উপায় অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু সে তার রক্ষাকর্ত্রীদের পরিত্যাগ করে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বেশ্যালয়ে ঠাঁই নিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও, তার এই শিক্ষাদীক্ষার জন্য সে ছিল বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত, আর প্রধানতঃ, মাননীয় জুরিগণ, যেমনটি আপনারা তার কর্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন, অতিথিদের সে অভিনয় ক্ষমতায় অভিভূত করত; এ এক রহস্যময় ক্ষমতা যা বিজ্ঞান পরে আবিষ্কার করেছে, বিশেষ করে চারকটের সম্প্রদায়, এবং এর নাম দিয়েছে "সম্মোহনী শক্তি।" তার এই চাতুরীর দ্বারা সে সেই রুশীকে কাবু করে, প্রথমে তার বিশ্বাস অর্জন করে চুরি করার জন্য এবং পরে তাকে নির্দয় ভাবে হত্যা করে।'

'খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে তো, তাইনা?' সভাপতি রাশভারী সভ্যটির দিকে ঝুঁকে হেসে বললেন।

'ভয়ঙ্কর নির্বোধ তো!' রাশভারী সভ্যটি বললেন।

ইতিমধ্যে, সরকারি উকিল তার বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন।

'মাননীয় জুরিগণ!' নিজের কোমল চেহারাটি দোলাতে দোলাতে বললেন, 'আপনাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে শুধুমাত্র এই লোকদেরই ভাগ্য নয়, আমাদের এই সমাজের ভাগ্যও—আপনাদের বিচারের ওপর এতখানি গুরুত্ব রয়েছে। আপনারা এই অপরাধের পুরো তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করুন। সমাজের বুকে এরা সৃষ্টি করেছে এক বিরাট বিপদ—যাদের যথার্থ নামকরণ করা যায়, দক্ষ অপরাধী বলে; যেমন মাসলোভা। এই সংক্রামক ব্যধি থেকে সমাজকে রক্ষা করুন। সমাজের নিষ্পাপ

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের এই সংক্রামকের হাত থেকে রক্ষা করুন, বিলোপের কবল থেকে তাদের বাঁচান আপনারা।' নিজের ইপ্সিত গুরুত্বপূর্ণবিচার ফলাফলে মোহিত হয়ে, সরকারি উকিল এবার তার চেয়ারে বসে পড়লেন; বেশ বোঝা গেল, নিজের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার অন্তিম আনন্দে তিনি মূহ্যমান।

বক্তৃতার সারাংশ, অলংকারের ফুলগুলো খসিয়ে ফেললে, যা দাঁড়াল তা হল এই: ব্যবসায়ীটির বিশ্বাস অর্জন করার পর, মাসলোভা, তাকে সম্মোহিত করে চাবি নিয়ে সমস্ত টাকা একা চুরি করার জন্য তার বাসায় যায়; কিন্তু সিমন ও ইয়েভফিমিয়ার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর সে বাধ্য হয় টাকাপয়সা তাদের সাথে বখ্‌রা করে নিতে। তারপর, এই অপরাধের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে, সে ব্যবসায়ীকে নিয়ে আবার তার বাসায় ফেরে ও তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

সরকারি উকিলের বক্তৃতার পর, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, পরনে তার দোয়েল পাখির লেজের মত কোট, আর সেই নিচু ছাঁটের কোটের ভেতর থেকে ধবধপে সাদা জামার আর্ধেকটা বেরিয়ে রয়েছে, তিনি এ্যাডভোকেটদের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, এবং কারতিনকিন ও বোচকোভার সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। তারা তাকে তিনশ রুবল দিয়ে নিযুক্ত করেছে। তিনি তাদের দুজনকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করলেন, আর সমস্ত দোষটা চাপালেন মাসলোভার ঘাড়ে।

যখন সে টাকাটা নেয় তখন তার মাঝে বোচকোভা ও কারতিনকিন ছিল—মাসলোভার এই বিবৃতি তিনি অস্বীকার করলেন। যার বিরুদ্ধে বিষ দিয়ে হত্যার অভিযোগ রয়েছে তার সাক্ষ্য যে কোনমতেই গৃহীত হতে পারেনা, সে কথাটাও বেশ জোর দিয়েই বললেন। এ্যাডভোকেট আরও বললেন যে এই দুজন সৎ ও পরিশ্রমী কর্মী হোটেলবাসীদের কাছ থেকেই রোজ তিন থেকে পাঁচ রুবল পর্যন্ত বখশিশ পেয়ে সহজেই একহাজার আটশ রুবল রোজগার করতে পেরেছে। মাসলোভাই ব্যবসায়ীটির টাকা চুরি করেছে, আর সেই টাকাটা হয়ত অন্য কারও কাছে রেখে দিয়েছে, কিংবা হারিয়ে ফেলেছে; কেননা টাকা চুরির সময় সে মোটেই স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলনা। তাছাড়া সে একাই ব্যবসায়ীটিকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে। সুতরাং তিনি জুরিদের কাছে আবেদন জানালেন যে তারা যেন কারতিনকিন ও বোচকোভাকে টাকা চুরির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। আর যদি তারা তাদের বেকসুর খালাস দিতে রাজি না থাকেন তবে যেন অন্ততঃ এটুকু মেনে নেন যে চুরি করা ছাড়া বিষ দিয়ে হত্যা করার ব্যাপারে তার মক্কেলরা মোটেই জড়িত নয়। তারপর সরকারি উকিলের দিকে কটাক্ষ করে এই বলে তিনি তার কথা শেষ করলেন যে তার উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর অদ্ভুত পর্যবেক্ষণগুলো, যেমন বংশধারা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমূহ, বর্তমান ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়; কারণ বোচকোভা জানেইনা যে কারা তার বাবা-মা।

এই সময় সরকারি উকিল বেশ রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন একটা লিখে নিলেন, তারপর ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়ে কাঁধ ঝাঁকালেন।

এরপর উঠলেন মাসলোভার এ্যাডভোকেট। বেশ নিষ্প্রভভাবে আমতা আমতা করতে করতে তার সমর্থনে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি। টাকা চুরিতে যে সে অংশ নিয়েছিল সে কথা অস্বীকার না করে, তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, 'তার স্মেলকভকে বিষ দিয়ে হত্যা করার কোন অভিসন্ধি ছিলনা; সে কেবল তাকে

পাউডার দিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।' খানিক ভাষার কারিকুরিতে তিনি বলে চললেন কেমন করে মাসলোভা একটি পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে এই পাপের পথে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু সেই পুরুষটি আজও কোন শাস্তি পায়নি। অথচ নিজের পতনের জন্য সমস্ত বোঝাই তাকে একা ঘাড় পেতে নিতে হয়েছে। কিন্তু আইনজীবিটির এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এতই অকেজো মনে হল যে সকলেই বেশ বিব্রত বোধ করলেন। যখন তিনি পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও স্ত্রীলোকের অসহায়ত্ব নিয়ে তোতলাতে লাগলেন সভাপতি তখন তাকে মামলার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফিরে আসতে সাহায্য করলেন।

তিনি শেষ করার সাথে সাথেই সরকারি উকিল প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম আইনজীবির বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন যে যদিও বোচকোভা বেওয়ারিশ পিতামাতার সন্তান তবু তাতে বংশধারা সম্বন্ধীয় তত্ত্বের এতটুকু অবমূল্যায়ন ঘটে না, কেননা বংশধারা তত্ত্বের নিয়মগুলো বিজ্ঞান কর্তৃক প্রমাণিত। সেই কারণেই আমরা যে শুধু বংশধারা থেকে অপরাধকে বাদ দিতে পারিনা তাই নয়, অপরাধ থেকেও বংশধারাকে বাদ দিতে পারিনা। আর মাসলোভার সমর্থনে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে যে, অর্থাৎ কোন এক কাল্পনিক সতীত্বনাশকারীর জন্য বাধ্য হয়ে সে পাপের পথে এসেছে (তিনি 'কাল্পনিক' শব্দটার ওপর ভয়ঙ্কর জোর দিলেন) সে সম্পর্কে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, যে সব প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি এখানে হাজির করা হয়েছে তা থেকে এই ধারনায় আসা খুবই সঙ্গত হবে যে, যারা তার সংস্পর্শে আসত তাদের অনেককেই সে লোভিনীর ভূমিকা অভিনয় করে ধরাশায়ী করেছে। এইসব জ্ঞানগর্ভ কথা বলার পর তিনি বিজয়ানন্দে আবার আসন গ্রহণ করলেন।

এরপর বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া হল।

ইয়েভফিমিয়া আবার একবার বলল যে ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই জানত না, কোন কু-কর্মেই সে অংশ নেয়নি, আর বেশ দৃঢ় ভাবেই বলল যে সমস্ত দোষই মাসলোভার। সিমন কারতিনকিন কেবল কয়েকটা লাইন পুনরাবৃত্তি করল, 'যা করার তা তো আপনারাই করবেন, তবে আমি কিছু করিনি, এটা খুবই অন্যায়।'

মাসলোভা তার পক্ষে কিছুই বলল না। যখন সভাপতি তাকে বললেন যে সেও নিজের বক্তব্য রাখতে পারে, তখন সে কেবল তার চোখজোড়া তুলে তার দিকে তাকাল, ফাঁদে পরা পশুর মত শুধু ঘরের চারদিকটা একবার দেখল, তারপর মাথা নামিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জোরে কাঁদতে লাগল।

'আরে! আপনার কি হল?' ব্যবসায়ী নেখল্যুদভকে জিজ্ঞেস করল, যেহেতু তিনি তার মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন। আসলে ওটা ছিল তার জোর করে চাপা দেওয়া ফোঁপানি।

নেখল্যুদভ নিজের বর্তমান অবস্থার তাৎপর্য বুঝতে পারছে না। আর কিছুতেই সংযত হতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠল, এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতার জন্যেই দু চোখ জলে ভরে উঠল তার। সে চোখে চশমা এঁটে কান্নার বেগ আটকাল। তারপর নিজের রুমাল নিয়ে নাক ঝাড়তে শুরু করল।

তার আত্মার অন্তঃস্থিত কার্যাবলী রুদ্ধ হয়ে উঠল এই ভয়ে যে, যদি আদালতের কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায় তার কীর্তিকলাপ তবে তার যে কী অপমানই হবে……

প্রথম পর্যায়ে এই ভয়ই তার অন্য সব চিন্তার থেকে প্রবল হয়ে উঠল।

॥ বাইশ ॥

বন্দীদের কাছ থেকে শেষ কথা শোনার পর, যে দলিলে জুরিদের কাছে প্রশ্নরাজি উপস্থিত করা হবে তা ঠিক করা হল। এটা করতেও খানিক সময় লাগল। শেষে প্রশ্নগুলো ঠিক করে ফেলা হলে সভাপতি তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরলেন।

জুরিদের কাছে মামলা হাজির করার আগে, কিছুক্ষণ ধরে তিনি বেশ খুশি খুশি ঘরোয়াভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ডাকাতিটা ডাকাতিই, আর চুরি করাটা চুরি করাই; তালামারা কোন জায়গা থেকে চুরি করা মানে হল তালামারা কোন জায়গা থেকে চুরি করা, আর তালা দেওয়া নয় এমন কোন জায়গা থেকে চুরি করার মানে হল তালামারা নয় এমন জায়গা থেকেই চুরি করা। এটা ব্যাখ্যা করার সময় নেখল্যুদভের দিকে অসংখ্যবার তাকালেন এ কারণে যে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটা তিনি তার মনে গেঁথে দিতে চান এই আশায় যে, সে এটা বুঝে তার সহকর্মী জুরিদের সেটা বোঝাতে সাহায্য করবে। যখন বুঝলেন যে জুরিরা এই সত্যে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছে তখন তিনি অন্য বিষয়ে কথা বলা শুরু করলেন—যেমন, হত্যা হল এমন এক ক্রিয়া যার পরিণতিতে কোন মানুষের মৃত্যু ঘটে, সুতরাং বিষ প্রয়োগকেও হত্যা বলা চলে। যখন মনে হল যে এই সত্যটাও জুরিদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে তখন তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে যদি চুরি আর হত্যা দুটোই একসাথে করা হয় তাহলে এই সংমিশ্রনকে বলা যেতে পারে চুরির সঙ্গে হত্যা।

যদিও তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার জন্য উদ্বিগ্ন, এবং জানেন যে সুইশ মেয়েটি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কিন্তু নিজের বৃত্তিতে তিনি এতই অভ্যস্ত যে একবার কথা বলতে শুরু করার পর আর নিজেকে থামাতে পারলেন না। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বাহুল্যে জুরিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন—যেমন, যদি তারা মনে করে যে বন্দীরা দোষী সেক্ষেত্রে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের দোষী বলে রায় দেওয়ার। আর যদি মনে করেন যে বন্দীরা দোষী নয় তবে তাদের নির্দোষ বলে রায় দেওয়ার অধিকারও তাদের আছে। আর যদি অপরাধগুলোর একটিতে তারা তাদের দোষী মনে করেন অন্যটিতে নয়, সেক্ষেত্রে তারা রায় দিতে পারেন যে আসামীরা একটি অপরাধে দোষী অন্যটিতে নয়। এরপর বললেন, যদিও জুরিদের এই অধিকার আছে কিন্তু তারা নিশ্চয়ই এই অধিকার যুক্তির সাথে ব্যবহার করবেন। তিনি আরও বললেন, তাদের কাছে উপস্থিত কোন প্রশ্নের যদি সদর্থক উত্তর দেন তবে তার দ্বারা তারা সেই প্রশ্নের আওতায় আসে এমন সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বকেই মেনে নেবেন বলে ধরা হবে। সুতরাং যদি তারা কোন প্রশ্নের সমগ্রটুকুকে স্বীকার করতে না চান তাহলে তারা নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নের সেই অংশটুকুরই উল্লেখ করবেন যা তারা বাদ দিতে চান। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যখন দেখলেন যে ইতিমধ্যেই তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, তখন সিদ্ধান্ত করলেন, এ মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিলম্ব না করে শেষ করে ফেলাটা খুবই প্রয়োজন।

'এই মামলার ঘটনাবলী হচ্ছে,' সভাপতি শুরু করলেন, এবং ইতিমধ্যে উকিলের দল, সরকারি উকিল, আর সাক্ষীরা যা যা বলেছে তারই পুনরাবৃত্তি করে চললেন।

সভাপতি বলে চলছেন, আর তার আশ-পাশের সভ্যরা গভীর মনোযোগের অভিব্যক্তি সহকারে সে কথা শুনছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই থেকে থেকে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, কারণ তাদের কাছে বক্তৃতাটা বেশ দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে; যদিও সেটা খুবই সুন্দর, অর্থাৎ যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটিই। সরকারি উকিল, আইনজীবি, এবং প্রকৃতপক্ষে আদালতের সকলেরই এই একই ধারণা। অবশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষ হল।

ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে যে সব কিছুই বলা হয়ে গেছে, কিন্তু না, তিনি এখনও তার বলার অধিকার ছাড়েননি। নিজের কণ্ঠস্বর তার নিজের কানে এতই সুমধুর শুনতে লাগছে যে তিনি মনে করছেন জুরিদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আরও দু-চার কথা বলা দরকার। কত সতর্কভাবে তাদের এ অধিকার ব্যবহার করা উচিত, এবং কিভাবে এটার অপব্যবহার এড়ান প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ব্যাপারটা, তারা যে সমাজের বিবেক, বিতর্ক-কক্ষের গোপনীয়তাকে পবিত্র বলে বিবেচনা করাটা একান্ত কর্তব্য—এইসব আরকি।

সভাপতি বক্তৃতা শুরু করার সময় থেকে, পাছে তার একটাও শব্দ শুনতে ভুল হয়ে যায় এই ভয়ে মাসলোভা তার ওপর থেকে একবারও চোখ ফেরায়নি। ফলে নেখল্যুদভও তার দৃষ্টির সম্মুখীন হওয়ার আশংকায় আর তেমন ভীত নয়; এবং সর্বক্ষণ সে মাসলোভার দিকে তাকিয়ে রইল, আর তার মন সেই বিশেষ স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল, যা কিনা সাধারণতঃ বহুদিন পরে একটি পরিচিত মুখকে দেখতে পেলে আমাদের মধ্যে ঘটে থাকে। বিরহের এই সময়ে যে বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো ঘটে, ধীরে ধীরে পুরনো সত্তার সাথে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, সময়ের দ্বারা সৃষ্ঠ পবিবর্তনগুলো যখন অদৃশ্য হতে থাকে, আর আমাদের আত্মিক চোখে সামনে যখন জেগে ওঠে শুধুমাত্র তার সেই অতুলনীয়তা—ঠিক তখনকার মতই অভিজ্ঞতা লাভ হল নেখল্যুদভের।

হ্যাঁ, জেলের ঢিলে জামা, পুষ্টদেহ, বুকের আর মুখের নিম্নাংশের পূর্ণতা, কপালে আর কপালের পাশের রগে কতিপয় ভাঁজ, ফোলা চোখ, ইত্যাদি সত্ত্বেও, নিশ্চিত এই হল সেই একই কাত্যুসা যে কিনা ইস্টারের রাতে তার দিকে আশ্চর্য এক নিঃস্পাপ দৃষ্টি মেলে ধরেছিল—যাকে সে ভালবেসেছিল মনপ্রাণ দিয়ে, যার প্রিয় হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটো পরিপূর্ণ ছিল আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে।

'কী অদ্ভুত ঘটনার মিলন যে এত বছর পর, যাকে ইতিমধ্যে একবারও দেখিনি তারই মামলা আজকেই এলো যখন কিনা আমি হলাম গিয়ে আদালতের জুরিদের একজন। আজ আমিই আবার তাকে দেখছি বন্দীর পাটাতনে! এর শেষ কিভাবে হবে? উঃ ওরা যদি আর একটু তাড়াতাড়ি করত!'

তার ভেতরে জেগে ওঠা অনুতাপের অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিতে সে আর মোটেই রাজি নয়। ভাবতে চেষ্টা করল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক ঘটনা, যা তার জীবন-প্রবাহে বিঘ্ন না ঘটিয়ে ঘটতে পারত। অনুভব করল তার অবস্থাটা যেন সেই কুকুরছানায় মত যার প্রভু তার ঘাড়ের চামড়াটা ধরে তারই তৈরি নোংরার ভেতর তার নাকটা ঘষে দিচ্ছে। কুকুরটা পেছনে হাঁটছে, আর চেষ্টা করছে নিজের কুকর্ম থেকে যতটা সম্ভব দূরে যেতে, কিন্তু নিষ্করুণ প্রভু কিছুতেই তাকে যেতে দিচ্ছে না।

নেখল্যুদভও আজ নিজের কৃতকর্মের জন্য ঠিক সেরকমই বিরক্তি বোধ করছে। ঘাড়ের ওপর সে তার প্রভুর শক্তিশালী হাতটার অবস্থিতি টের পাচ্ছে, যদিও এখনও পর্যন্ত বুঝেই উঠতে পারছে না যে তার কাজের সামগ্রিক গুরুত্বটা কি; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর হাতটা সম্পর্কেও তার অজ্ঞতা সমান। বিশ্বাস করতে চাইছেনা যে তার নিষ্করুণ প্রভুর জোরজবদস্তির জন্যই সে এটা করতে বাধ্য হয়েছিল। আর এটা টের পেল যে তার পক্ষে কিছুতেই পালানো উচিত হবেনা। তাই এখনও সাহসের সাথে প্রথম সারির চেয়ারে বসে তার স্বভাবজ ধৈর্যশীল ভঙ্গিমায়, অন্য মনস্কভাবে একটা পা অন্য একটা পায়ের ওপর চাপিয়ে, চশমাটা নাড়াচাড়া করে চলেছে। যদিও সারাক্ষণ ধরে সে তার আত্মার গভীরে অনুভব করছে নিজের কাপুরষতা, স্বেচ্ছাচারীতা, কলুষতা, নিষ্ঠুরতা, আর অলসতাপূর্ণ জীবনযাপনের কথা, আর সেই ভয়ঙ্কর আবরণ যা অবর্ণনীয়ভাবে তার কাছ থেকে এই পাপকে লুকিয়ে রেখেছিল তার পরবর্তী জীবনের দশটা বছর ধরে। আবরণের দ্বারা আবৃত সেই জিনিসের এক ঝলক দেখামাত্র সে কাঁপতে শুরু করল।

॥ তেইশ ॥

অবশেষে সভাপতির বক্তৃতা শেষ হল। হাতের এক চমৎকার ভঙ্গিমায় প্রশ্নের তালিকাটা তুলে তিনি মুখপাত্রের হাতে দিলেন, যিনি সেটা নিতে এগিয়ে এসেছেন। জুরিরা বির্তকের ঘরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় মনে মনে বেশ খুশি হয়ে একজন একজন করে উঠে আদালত ত্যাগ করলেন। কী কারণে যেন তাদের বেশ লজ্জিত দেখাচ্ছে। আবার হাতগুলোকে নিয়ে যে তারা কি করবেন তাও যেন ভেবেই পাচ্ছেন না। তাদের পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথেই কয়েকজন রক্ষী সেদিকে এগিয়ে গেল। খাপ থেকে তরোয়ালটা টেনে বের করে কাঁধের ওপর তুলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বিচারকেরা উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে গেলেন। বন্দীদেরও বের করে নিয়ে যাওয়া হল।

জুরিরা যখন বিতর্কের ঘরে ঢুকলেন, তখন সর্বপ্রথম যা করলেন তাহল, নিজের নিজের পকেট থেকে সিগারেটগুলো বের করে, আগের বারের মতই সেগুলো টানতে থাকা। আদালতে নিজের নিজের জায়গায় বসে থাকাকালীন তাদের মধ্যে যে অস্বাভাবিক, কপট ভঙ্গিমার বোধ ছিল, যা সকলেই বিভিন্ন মাত্রায় টের পেয়েছেন, বিতর্কের ঘরে ঢোকার পর তা একেবারেই উবে গেল। প্রত্যেকেই ধূমপান করতে লেগে গেলেন। এক ধরনের স্বস্তির অনুভূতিতে সবাই বসে পড়ে উচ্ছল কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

'মেয়েটার কোন দোষ নেই। সে জড়িয়ে গেছে,' দয়ালু ব্যবসায়ীটি বলল, 'আমরা নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করতে বলব।'

'আমরাও ঠিক তাই ভাবছিলাম' মুখপাত্রটি বললেন, 'আমরা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা চালিত হব না।'

'সভাপতি বেশ ভালই সার সংক্ষেপ করেছেন' কর্ণেল মন্তব্য করলেন।

'ভাল? কেন, আমার তো প্রায় ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।'

'আসল ব্যাপার হল যে চাকরবাকরেরা টাকার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারত না যদি না মাসলোভা তাদের সাথে জোট বাঁধত।' ইহুদী বংশোদ্ভুব কেরানিটি বললেন।

'আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে সে-ই ওটা চুরি করেছে?' জুরিদের ভেতর একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কখনও তা বিশ্বাস করব না।' দয়ালু ব্যবসায়ীটি আর্তনাদ করে উঠল। এ সবই ঐ লালচোখো ডাইনীর কাজ।'

কর্নেল বললেন, 'ওদের দলটাই সুন্দর, সকলেই।'

'কিন্তু সে বলছে যে সে কখনও ঐ ঘরের ভেতরে যায়ই নি।'

'তাকে সবদিক থেকেই বিশ্বাস করা উচিত।'

'কোনমতেই আমি ঐ নষ্টা মেয়েমানুষটাকে বিশ্বাস করতে রাজি নই, এমন কি সারা দুনিয়া বললেও নয়।'

'কেরানিটি বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন কি করেন না তাতে তো আর প্রশ্নটার মীমাংসা হচ্ছে না।'

'মেয়েটির কাছে চাবি ছিল।' কর্নেল বললেন।

'ছিল, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি!' ব্যবসায়ীটি উত্তর দিল।

'আর চাবিটা।'

'কিন্তু সে কি এ সম্পর্কে সবকিছুই বলেনি?' ব্যবসায়ীটি আবার চেঁচিয়ে উঠল। 'লোকটার একটা নিজস্ব মেজাজ ছিল, আর সে মেয়েটাকে যথেষ্ট উত্যক্তও করেছিল, এমনকি মাথায় একটা ঠোকরও দিয়েছিল; এরচেয়ে সহজ আর কি হতে পারে! অবশ্য তারজন্য সে পরে দুঃখ প্রকাশও করেছিল—খুবই স্বাভাবিক। সে বলেছিল, "কিছু মনে কোরো না, এটা নাও।" কেন, আমি নিজেই তো তাদের বলতে শুনেছি যে সে ছ-ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছিল; আমার ধারণা তার ওজন ছিল কমপক্ষে কুড়ি স্টোন।'

'এটা কোন পয়েন্টই না।' পিওতর গারাসিমোভিচ বললেন, 'প্রশ্নটা হল সে কিংবা চাকর-বাকররা, কারা এটা আবিষ্কার করেছিল—।'

'চাকর-বাকরের পক্ষে এটা করা সম্ভবই ছিল না, চাবিটা তো তার কাছেই ছিল।'

এ ধরনের অনর্গল কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল। শেষে মুখপাত্রটি বললেন, 'মাফ করবেন, দেখুন, এর চেয়ে টেবিলের কাছে বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করাই ভাল নয় কি? অনুগ্রহ করে চলে আসুন।' এবং তিনি নিজে একটা চেয়ার টেনে নিলেন।

কেরানিটি বললেন, 'এইসব সস্তা মেয়েরা সবকিছু করতে পারে।' তারপর মাসলো ভাই যে পয়লা নম্বর দোষী এই মতটাকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বুলেভার্ডের কাছে তার এক বন্ধুর ঘড়ি কিভাবে এক চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক চুরি করে নিয়েছিল, সেই গল্প বললেন।

এই প্রসঙ্গে কর্নেল বর্ণনা করলেন আরও হৃদয়গ্রাহী একটা ঘটনা: রূপোর সামোভার চুরি সংক্রান্ত।

এবার পেন্সিল দিয়ে টেবিলে শব্দ করতে করতে মুখপাত্রটি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি প্রশ্নগুলোর প্রতি আপনাদের মনোযোগ প্রার্থনা করছি।'

সকলে নীরব হল।

নিম্নলিখিত শব্দে প্রশ্নগুলো রাখা হল:

(১) 'ক্রাপিভেনস্কি জেলার বোর্কি গ্রামের ৩৩ বৎসর বয়স্ক কৃষক, সিমন পেত্রোভিচ কারতিনকিন অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগসাজসে, ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারী, শহরে, ব্যবসায়ী স্মেলকভের কাছ থেকে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তার মদের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে দু হাজার পাঁচশত রুবল এবং একটা হীরের আংটি চুরি করেছে, কি করেনি ?

(২) তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্কা ইয়েভফিমিয়া ইভানোভনা বোচকোভা কি ওপরে বর্ণিত অপরাধে দোষী ?

(৩) সাতাশ বৎসর বয়স্কা কাতেরিনা ইয়েভফিমিয়া মাসলোভা কি প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে দোষী ?

(৪) যদি বন্দিনী ইয়েভফিমিয়া বোচকোভা প্রথম প্রশ্নে দোষী না হয়, তাহলে কি সে এই অপরাধে অপরাধী যে ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারী, শহরে, মৌরিতানিয়া হোটেলে কর্মরত অবস্থায় সেই হোটেলের বাসিন্দা ব্যবসায়ী স্মেলকভের ঘরের ভেতরকার তালামারা বাক্স থেকে দু হাজার পাঁচশ রুবল চুরি করে আর সে কারণে বাক্স খোলে এমন একটা চাবি দিয়ে যা কিনা সে নিজেই এনেছিল ?'

মুখপাত্রটি প্রথম প্রশ্নটি পড়লেন। এরপর বললেন, 'আচ্ছা ভদ্রমহোদয় আপনারা এ ব্যাপারে কি মনে করেন ?'

অতি দ্রুত এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বললেন, 'দোষী'। কারণ তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে কারতিনকিন বিষ প্রয়োগ এবং ডাকাতি এই দুটো ব্যাপারেই অংশগ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধ যিনি একটা সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য তিনি এ ব্যাপারে ভিন্ন মত ব্যক্ত করলেন।

মুখপাত্রটি ভাবলেন যে ভদ্রলোক হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি, তাই তিনি কারতিনকিনের দোষ যাতে প্রমাণিত হয় এমন সব বিষয় তাকে বোঝাতে লাগলেন। বৃদ্ধ লোকটি বললেন যে তিনি সবকিছুই বুঝেছেন, তবু তিনি চান যে তাদের করুণা করা হোক। তিনি বললেন, 'আমরা কেউই সাধু নই' এবং শেষ পর্যন্ত নিজের মতই আঁকড়ে রইলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বোচকোভা সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আর বিস্ময়ের পর 'দোষী নয়' এই কথাটাই বলা হল। কারণ, বিষ খাওয়ানোর ব্যাপারে তার অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোন পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর তার উকিলও ঠিক ঐ বিষয়টাতেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

মাসলোভাকে খালাস দেবার জন্য উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীটি বোচকোভাকেই গোটা ব্যাপারটার প্ররোচক বলে বোঝাতে চেষ্টা করল: জুরিদের অনেকেরই সেই একই ধারণা। কিন্তু মুখপাত্রটি আইনের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে বোচকোভাকে বিষ-প্রয়োগের ঘটনার সাথে যুক্ত করার পক্ষে কোন যথাযথ ক্ষেত্রই নেই, আর শেষ পর্যন্ত তার মতই বজায় রইল।

চতুর্থ প্রশ্নে বোচকোভার ক্ষেত্রে, 'দোষী' এই জবাবটাই পাওয়া গেল। কিন্তু সমবায়ের সদস্য ভদ্রলোকটি বললেন তাকে করুণা করার জন্য।

মাসলোভা সংক্রান্ত তৃতীয় প্রশ্নে আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হল। মুখপাত্রটির মতে সে চুরি এবং বিষপ্রয়োগ এই দুটো অপরাধেই দোষী। ব্যবসায়ীটি

কিন্তু তার সাথে একমত হল না। কর্ণেল, কেরানি আর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও ব্যবসায়ীটিকেই সমর্থন জানালেন। অন্যান্যদের দেখাচ্ছে খুবই দুর্বল। অবশেষে মুখপাত্রটির মতই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে প্রায়। কারণ, প্রধানতঃ সমস্ত জুরিরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ব্যাপারটার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায় সে কারণে মুখপাত্রটির মতকেই তারা মেনে নিলেন।

যা ঘটেছে, আর মাসলোভা সম্পর্কে যা সে আগে জানত তা থেকে নেখল্যুদভ সুনিশ্চিত যে সে চুরি এবং বিষপ্রয়োগ এর কোন অপরাধেই অপরাধিণী নয়। সে এটা নিশ্চিতভাবে অনুভব করছিল যে আর সকলেও এই একই সিদ্ধান্তে আসবেন। কিন্তু দেখল যে ব্যবসায়ীটির কদর্য পক্ষ-সমর্থন (বস্তুতঃ তার ভিত্তি হল, মাসলোভার শারীরিক গঠনের প্রশংসা, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে সে এটা লুকোতেও চায়নি), মুখপাত্রটির জেদ, আর ক্লান্তি মিলে মাসলোভাকে মৃত্যুদণ্ডের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সে এবার তার মত প্রকাশের ইচ্ছে বোধ করল, কিন্তু ভয় পেল এ ভেবে যে যদি এটা করতে গিয়ে তার সাথে মাসলোভার সম্পর্কটা কোনভাবে আবিষ্কৃত হয়ে যায়! তবু সে অনুভব করল, এরকমটা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। ধীরে ধীরে সে উত্তেজিত হল আর তার মুখ পাণ্ডুর হয়ে এল : এবার সে মুখ খোলবার জন্য তৈরি হল, কিন্তু সাথে সাথেই পিওতর গেরাসিমোভিচ তার আপত্তি শুরু করলেন। আর ঠিক সেই কথাটাই বললেন, যা নেখল্যুদভ বলতে যাচ্ছিল।

গেরাসিমোভিচ বললেন, 'আমাকে এক মিনিটের জন্য অনুমতি দিন, আপনারা তার কাছে চাবি থাকাটাই তাকে চোর বলে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করছেন। কিন্তু সে চলে গেলে চাকরবাকরের পক্ষে নকল চাবি দিয়ে বাক্সটা খোলা কি আরও সহজ হত না ?'

ব্যবসায়ীটি সমর্থন জানাল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'সে অবস্থায় টাকাটা নেওয়াই সম্ভব নয় ; কারণ সে তো জানতই না যে টাকাটা নিয়ে সে কি করবে।'

'ঠিক এই কথাটাই আমিও বলছি।' ব্যবসায়ীটি মন্তব্য করল।

'কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে তার আসার ফলে চাকরবাকরের মাথায় টাকা চুরির ফন্দিটা আসে, আর তারা সুযোগ বুঝে গোটা দোষটাই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।'

পিওতর গেরাসিমোভিচ কথাটা এমন চড়াগলায় বললেন যে মুখপাত্রটিও রেগে গেলেন, আর বেশ গোঁয়ারের মত বিপরীত মতটাকেই সমর্থন করতে লাগলেন। কিন্তু পিওতর গেরাসিমোভিচ এমনই যুক্তিতর্ক হাজির করলেন যে বেশির ভাগ সদস্যই তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হলেন যে মাসলোভা টাকা চুরি করার অপরাধে দোষী নয়, এবং আংটিটা তাকে সত্যি সত্যিই উপহার দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে তার অংশগ্রহণের প্রশ্ন উঠতেই মাসলোভার অত্যাগ্রহী সমর্থনকারী ব্যাবসায়ীটি ঘোষণা করল যে, যেহেতু স্মেলকভকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পেছনে মাসলোভার কোন স্বার্থই ছিলনা, সেহেতু এ অভিযোগ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু মুখপাত্রটি বললেন যে, না, তাকে অব্যাহতি দেওয়া অসম্ভব ; কারণ সে নিজেই তো স্বীকার করছে যে সে-ই তাকে পাউডার দিয়েছিল।

'হ্যাঁ, কিন্তু আফিং ভেবে' ব্যবসায়ী বলল।

এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে চলে যেতে অভ্যস্ত কর্ণেলটি বললেন, 'আফিং দিয়েও তো কেউ কাউকে মেরে ফেলতে পারে।' তারপর বলতে শুরু করলেন যে কি ভাবে একটু আফিং খেয়ে তার শ্যালকের স্ত্রী মরে যাচ্ছিল। তাকে তো বাঁচানোই যেত না যদি না হাতের কাছে তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারকে পাওয়া যেত। কর্ণেল গল্পটা বললেন এত আকর্ষণীয়ভাবে, এত গাম্ভীর্য্য আর মর্যাদার সাথে যে তাকে বাধা দেওয়ার সাহসই হলনা কারও। কেবলমাত্র কেরানিটি তার উদাহরণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের একটা গল্প বলে শেষ করতে চাইলেন ব্যাপারটা : 'কেউ কেউ এতে এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে তারা একসঙ্গে চল্লিশ কৌটা পর্যন্ত খেতে পারে। আমার এক আত্মীয় আছেন—' কিন্তু কর্ণেল নিজেকে বাধাপ্রাপ্ত হতে দিলেন না, তিনি তার শ্যালকের স্ত্রীর ওপর আফিং-এর ক্রিয়া বর্ণনা করেই চললেন।

হঠাৎ জুরিদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, 'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কি জানেন যে এখন পাঁচটা বাজতে চলেছে?'

'তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সিদ্ধান্তটা কি?' মুখপাত্রটি জানতে চাইলেন। 'আমরা কি বলব যে সে দোষী কিন্তু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সে কিছু করেনি? তাছাড়া সম্পত্তি চুরির কোন উদ্দেশ্যও তার ছিলনা। কি তাইতো?

পিওতর গেরাসিমোভিচ নিজের বিজয়ে আনন্দিত হয়ে সম্মত হলেন।

'কিন্তু তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করায় জন্য সুপারিশ করা হবে নিশ্চয়ই' ব্যবসায়ীটি বলল।

সকলেই সম্মত হলেন কেবলমাত্র সেই বৃদ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যটি ছাড়া। তিনি বারবার জোর দিতে লাগলেন যাতে তারা তাকে নির্দোষ বলে, সেজন্য।

'একই তো ব্যাপার,' মুখপাত্রটি ব্যাখ্যা করলেন, 'লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য ছাড়া, কোন সম্পত্তি চুরি করার উদ্দেশ্য ছাড়া, সুতরাং নির্দোষ—এ তো স্পষ্টই।'

'ঠিক আছে, ওতেই হবে। আর আমরা সুপারিশ করছি যে তাকে ক্ষমা করা হোক।' ব্যবসায়ীটি খোস মেজাজে বলল।

তারা সবাই এত ক্লান্ত, আর আলোচনার এত বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে কেউ এ কথাটা ভাবলেনই না যে যদিও সে জীবননাশের জন্য দায়ী নয় কিন্তু পাউডারটা দেওয়ার জন্য তো দোষী বটে।

নেখলু্যদভ এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে এটা তার খেয়ালই হল না, এবং তাদের সম্মতিসূচক উত্তরগুলো দলিলে লিখে সেটাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল।

রাবিলেইসের উপাখ্যানে এক উকিলের কথা আছে যে কিনা একটা মামলা চালানোর সময় বিচার সংক্রান্ত অর্থহীন লাতিন ভাষায় লিখিত কুড়িটা পাতা পড়ে সমস্ত রকম আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে, শেষে বিচারকদের কাছে প্রস্তাব করেছিল পাশা চালাবার জন্য, এবং বলেছিল, যদি পাশায় বেজোড় নম্বর পড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সঠিক আর যদি বিপরীত ফল হয় তবে বুঝতে হবে যে ফরিয়াদিই হচ্ছে ঠিক।

আজকের এই মামলার অবস্থাও হল ঠিক সেই রকমই। প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছে তার কারণ এই নয় যে সকলে তাতে সম্মত হয়েছেন, বরং আসল কারণ হল, সভাপতি এত লম্বা সারসংক্ষেপ করেছিলেন যে সব থেকে প্রয়োজনীয় কথাই তিনি

বলতে ভুলে গিয়েছেন, যা কিনা এরকম ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই বলে থাকেন ; অর্থাৎ 'হ্যাঁ, দোষী, তবে জীবননাশের উদ্দেশ্য ছাড়াই।' কারণ হল, কর্নেল তার শ্যালকের স্ত্রীর গল্পটা বড্ড বেশি লম্বা করে ফেলেছিলেন ; কারণ হল নেখল্যুদভ এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে 'জীবননাশের উদ্দেশ্যে নয়' অনুবিধিটি আর লেখাই হয়নি ; আর ভেবেছিল যে 'লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়' কথাটা অভিযোগটাকেই একেবারে নস্যাৎ করে দেবে ; কারণ হল, পিওতর গেরাসিমোভিচ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যখন প্রশ্ন আর উত্তরগুলো পড়া হচ্ছিল ; কারণ হল, প্রধানতঃ ক্লান্ত হওয়ায় আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবার ইচ্ছায় সকলেই চাইছিল সেই সিদ্ধান্ত যা ব্যাপারটার ওপর দ্রুত যবনিকা টেনে দেবে।

জুরিরা ঘন্টা বাজালেন। যে রক্ষীটি খোলা তলোয়াল নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল, সে তলোয়ারটা খাপে পুরে ফেলে সরে দাঁড়াল। বিচারকেরা আসন গ্রহণ করলেন, আর জুরিরা একে একে বেরিয়ে এলেন।

মুখপাত্রটি পবিত্রতার ভঙ্গিতে কাগজটা নিয়ে এসে সভাপতির হাতে দেবার পর সভাপতি সেটা দেখে হাত দুটো বিস্ময়ের সাথে প্রসারিত করে সঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। তিনি বিস্মিত হলেন এ কারণে যে জুরিরা 'লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়।' অনুবিধি লিখে আর দ্বিতীয় অনুবিধিটি অর্থাৎ জীবননাশের উদ্দেশ্যে নয়' টা লেখেননি। ফলে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে মাসলোভা চুরি করেনি, লুণ্ঠন করেনি, অথচ একজন মানুষকে বিষ দিয়েছে কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই।

'দেখুন দেখুন কি অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে ওরা পৌঁছেছেন.' বাঁপাশে উপবিষ্ট সদস্যটিকে ফিস্‌ফিস্ করে সভাপতি বললেন, 'এর মানে হল সাইবেরিয়াতে সশ্রম কারাবাস, অথচ সে কিনা নিরাপরাধিণী।'

গম্ভীর প্রকৃতির সদস্যটি জবাব দিলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এটা বলতে চান না যে সে নিরাপরাধিণী!'

'হ্যাঁ সে অবশ্যই নিরাপরাধিণী। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আইনের ৮১৭ ধারাটি কার্যকারী (৮১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালত যদি মনে করে যে জুরিদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয় তবে সে তা বাতিল করে দিতে পারে)।

'আপনাদের কি মনে হয়?' সভাপতি অন্যান্য সদস্যের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

দয়ালু সদস্যটি সেই মুহূর্তে জবাব দিলেন না। তিনি তার সামনে রাখা কাগজের সংখ্যা দেখলেন, আর সেগুলো যোগ করে ফেললেন। মোট সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে যদি এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করে ফেলা সম্ভব হত তাহলে তিনি সভাপতির প্রস্তাবের সাথে একমত হতেন। কিন্তু যদি সংখ্যাটিকে এভাবে ভাগ করে ফেলা না যায় তবে তার দয়ালু স্বভাবই তাকে এ বিষয়ে একমত হতে বাধ্য করত। তিনি বললেন, 'আমারও মনে হয়, এটাই করা উচিত।'

'আর আপনি' গম্ভীর প্রকৃতির সদস্যটির দিকে ফিরে সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

'কোনমতেই নয়' তিনি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন, 'কারণ, দলিল জুরিদের

অভিযুক্ত করছে বন্দীদের খালাস দেওয়ার জন্য ; যদি বিচারকেরা এটা করেন তাহলে তারা কি বলবেন ? আমি কোনভাবেই এর সাথে একমত নই।'

সভাপতি ঘড়ি দেখলেন। বললেন, 'আক্ষেপের বিষয়, কিন্তু কি আর করা যায় ?' এবং প্রশ্নগুলো মুখপাত্রের হাতে দিলেন পড়ার জন্য।

সকলে উঠে দাঁড়ালেন, আর মুখপাত্র ঘুরে ঘুরে কাশতে কাশতে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো পড়তে লাগলেন। সারাটা আদালত—কর্মসচিব, আইনজীবি, এমনকি সরকারি উকিল পর্যন্ত ব্যাপারটাতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বন্দীরা সমাহিত হয়ে বসে আছে। স্পষ্টতই তারা উত্তরগুলোর কোন অর্থই বুঝতে পারছেনা। সবাই আবার বসে পড়লেন। এবার সভাপতি সরকারি উকিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বন্দীদের কি শাস্তি হওয়া উচিত ?

সরকারি উকিল মাসলোভাকে দণ্ডিত করতে পারার অভাবনীয় সাফল্যে খুশি হয়ে, এবং এর সবটাই তার বাকচাতুর্যের ফলশ্রুতি ভেবে নিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সিমন কারতিনকিনের ক্ষেত্রে দফা ১৪৫২ এবং দফা ১৪৫৩র ৪র্থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ইয়েভফিমিয়া বোচকোভার ক্ষেত্রে ১৬৬৯ দফা অনুযায়ী আর কাতেরিনা মাসলোভার ক্ষেত্রে ১৪৫৪ দফা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত।'

একজনের প্রতি যত বেশি শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে এগুলো হচ্ছে ঠিক ততটাই।

এবার সভাপতি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'রায়ের পুনর্বিবেচনার জন্য আদালত মুলতুবি রাখা হচ্ছে।'

সভাপতি ওঠার পর অন্য সবাই উঠল। ভালভাবে কাজ শেষ হওয়ার সুখানুভূতিতে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কিংবা ভেতরেই ঘুরে ফিরে বেড়াতে শুরু করল।

নেখল্যুদভকে মুখপাত্রটি কিছু একটা বুঝোচ্ছেন, এমন সময় পিওতর গেরাসিমোভিচ বললেন, 'আপনারা জানেন, কী লজ্জাজনকভাবে আমরা ব্যাপারটা করলাম। কী কারণে আমরা তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠাব ?'

নেখল্যুদভ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি কি বললেন ?'

'কেন, আমরা কি আমাদের মতামতে লিখিনি যে "সে দোষী, তবে তার হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না।" কর্মসচিব এইমাত্র আমাকে বললেন যে সরকারি উকিল তার পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড দাবি করেছেন।'

মুখপাত্রটি বললেন, 'হ্যাঁ, সেভাবেই তো সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।'

গেরাসিমোভিচ তর্কের সূচনা করলেন এই বলে যে, যেহেতু সে কোন রকম টাকাপয়সা নেয়নি, সেহেতু এটা তো পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে হত্যা করার কোন ইচ্ছাই তার ছিলনা।

মুখপাত্রটি আত্মরক্ষা করার জন্য বললেন, 'আমি তো বের হওয়ার আগে উত্তরগুলো সম্পূর্ণই আপনাদের পড়ে শুনিয়েছিলাম, কিন্তু তখন তো আপনারা কেউ কোন আপত্তি করেননি।'

গেরাসিমোভিচ নেখল্যুদভের দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক সেই সময়ই আমি বাইরে গিয়েছিলাম, আর আপনারাও ব্যাপারটাকে এমনভাবে ঘটে যেতে দিলেন।'

নেখল্যুদভ বলল, 'আমি ভাবতেই পারিনি যে—'

'আপনি ভাবতেই পারেননি ?'

'কিন্তু আমরা তো এটাকে এখন শুধরে নিতে পারি।' নেখল্যুদভ বলল।

'হা কপাল, না, সব শেষ হয়ে গেছে।'

নেখল্যুদভ বন্দীদের দিকে তাকাল। যাদের ভাগ্য ইতিমধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা রক্ষীদের পাহারায় বসে রয়েছে। মাসলোভা হাসছে। একটা শয়তানী চিন্তা নেখল্যুদভের আত্মায় ধাক্কা দিল। এ মামলায় সে খালাস পেয়ে যাবে, এবং তারপর এ শহরেই থাকবে—এ কথাটা চিন্তা করে, কিভাবে সে তার সাথে ব্যবহার করবে এটা কিছুতেই এতক্ষণ সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। তার সাথে যে-কোন ধরনের সম্পর্ক রাখাটাই নেখল্যুদভের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু সাইবেরিয়া আর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যাপারটা তার সাথে সমস্ত রকম সম্পর্কের সম্ভাবনাকে একেবারে নসাৎ করে দিল। এরপর আর শিকারের থলির মধ্যে পাখিটা একটুও ছটফট করবে না, আর কখনও তাকে মনে করিয়ে দেবে না তার অস্তিত্বের কথা।

॥ চব্বিশ ॥

পিওতর গেরাসিমোভিচের ধারণাটাই মিলে গেল। আলোচনার ঘর থেকে সভাপতি একটা কাগজ হাতে নয়ে বেরিয়ে এলেন, তারপর নিম্নোক্ত বিবৃতি পড়তে লাগলেন :—

'২৮শে এপ্রিল, ১৮৮—মহামান্য সম্রাট জারের আদেশানুযায়ী, এই ফৌজদারি আদালত, জুরিদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৭৭১ এর গ ধারা ও ৭৭৬ এবং ৭৭৭ র গ ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তেত্রিশ বছর বয়স্ক চাষী সিমন কারতিনকিন ও সাতাশ বছর বয়স্কা নিম্ন মধ্যবিত্তা কাতেরিনা মাসলোভা, উভয়কেই তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত প্রকারের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হল, এবং ২৪ ধারায় বর্ণিত বিধি মত কারতিনকিনকে ৮ বছর এবং মাসলোভাকে চারবছর সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা নিম্ন মধ্যবিত্তা বোচকোভাকে, সব ধরণের ব্যক্তিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ৪৯ ধারা অনুযায়ী তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। বন্দীরা সমানভাবে এই মামলার সমস্ত খরচ বহন করবে ; তবে যদি দেখা যায় যে তারা এ খরচ দিতে সত্যিই অসমর্থ কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই সরকারি কোষাগার থেকে খরচ দেওয়া হবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণাদিস্বরূপ যেসব জিনিস রয়েছে তার প্রত্যেকটাই নিলামে বিক্রি করা হবে। আংটিটা ফেরৎ দেওয়া হবে আর কাঁচের পাত্রগুলিকে নষ্ট করে দিতে হবে।'

কারতিনকিন এখনও কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নাড়ছে, আর বোচকোভা একেবারে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছে। রায় শোনার পর মাসলোভা যেন কমলালেবুর মত লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল : 'আমি কোন দোষ করিনি। আমি কোন দোষ…' তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ সারা ঘরময় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। 'এটা একটা অন্যায়। আমি দোষ করিনি। বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর! আমি সত্যি সত্যি বলছি।…এটা সত্যি।' তারপর বেঞ্চে মুখ গুঁজে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কারতিনকিন আর বোচকোভা বেরিয়ে যাওয়ার পরও সে বসে বসে কেঁদে চলল। ফলে একদল সশস্ত্ররক্ষীকে তার পোষাকের হাতা ধরে টান দিতে হল।

'না! না! অসম্ভব! এভাবে এটার নিষ্পত্তি হতে পারে না।' নিজের বদচিন্তাগুলো ভুলে নেখলুদভ নিজের মনেই বলল। মাসলোভার পিছু পিছু সে দ্রুত এগোল। 'কেন' সে কথা না ভেবেই সে একবার তাকে দেখতে চাইল। দরজার কাছটাতে বেশ ভীড় জমে গেছে। আইনজীবি আর জুরিরা চলে গেছেন ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার শান্তিতে। বাধ্য হয়ে তাই তাকে আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হল। তারপর যখন সে বারান্দায় পৌঁছল তখন মাসলোভা অনেকটা দূরে চলে গেছে। জানলা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে করতে নেখল্যুদভ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রায় সকলেই তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সে মাসলোভার পাশ থেকে তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল। যদিও মাসলোভার কান্না থেমে গেছে তবে সে এখনও কেবলই ফোঁপাচ্ছে, আর রুমালের প্রান্ত দিয়ে টকটকে লাল মুখখানা মুছছে। সে নেখল্যুদভের দিকে একবারের জন্যও না তাকিয়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। তারপর নেখল্যুদভ সভাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য দ্রুত ফিরে চলল। সভাপতি ইতিমধ্যেই আদালত ছেড়ে চলে এসেছেন, তাই নেখল্যুদভ তাকে লবি থেকে অনুসরণ করে একেবারে তার সামনে চলে এল। এখন তিনি সবেমাত্র তার ফিকে ধূসর ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে পরিচারকের কাছ থেকে রুপো বসানো ছড়িটা হাতে নিয়েছেন।

'স্যার, আজ যে মামলার বিচার হয়ে গেল সে সম্পর্কে আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই?' নেখল্যুদভ বলল, 'আমি জুরিদের একজন।'

'নিশ্চয়ই, প্রিন্স নেখল্যুদভ, এ তো খুব ভাল কথা। মনে হয় আপনার সাথে আমার আগেও দেখা হয়েছে,' নেখল্যুদভের হাতে চাপ দিয়ে সভাপতি কথাগুলো বলার সময় তার মনে পড়ল নেখল্যুদভের সাথে সাক্ষাতের প্রথম সন্ধ্যাটির কথা; সেদিন তিনি এত ভাল নেচেছিলেন যে যুবকরাও তার কাছে হার মেনে গিয়েছিল। 'আপনার জন্য কি করতে পারি, বলুন?'

নেখল্যুদভ বেশ বিষণ্ণ সুরে বলল, 'মাসলোভার ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। সে মোটেই বিষ-প্রয়োগের ব্যাপারে দোষী নয়। তবু তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

সামনের প্রবেশ পথটার দিকে এগোতে এগোতে সভাপতি বললেন, 'আপনারা যে মত প্রকাশ করেছেন সে অনুযায়ীই তো আদালত শাস্তিবিধান করেছে। অবশ্য আপনাদের উত্তরগুলো যদিও আমার কাছে ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি।' এ কথাগুলো বলতে গিয়ে তার মনে হল যে তিনি যেন একজন জুরিকে এটা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন যে, যদি না ওতে 'জীবন নাশের অভিপ্রায় ছিল না।' কথাটা যোগ করা হয় তবে কাউকে 'দোষী' বলে সাব্যস্ত করলে সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোর দায়ে দোষীই বোঝায়। কিন্তু যেহেতু তিনি চেয়েছিলেন যে ব্যাপারটার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক সে কারণে তা আর তিনি বলে উঠতে পারেননি।

'হ্যাঁ, ঠিকই। কিন্তু এই ভুল কি আর শোধরানো যায় না?'

সভাপতি দরজার দিকে এগোতে এগোতে মাথার টুপিটাকে একদিকে হেলিয়ে

বললেন, 'পুনরায় আবেদন করার জন্য কারণের কোন অভাব ঘটে না। বরং আপনি একজন আইনজীবির সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করতে পারেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা তো খুবই ভয়ঙ্কর।'

'দেখুন, মাসলোভার জন্য কেবল দুটো পথ খোলা ছিল।' নেখলুদভের প্রতি বিনয় ও নম্রতা যাতে পুরোপুরি প্রকাশ পায়, সে কথা ভেবে সভাপতি কথাটা বললেন। তারপর, কোটের কলারের ওপর দিয়ে গালপাট্টাটা ঠিক করে নিয়ে তার কনুইটা একটু ছুঁয়ে সামনের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'তাহলে এবার চলুন, যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, চলুন,' কোটটা তাড়াতাড়ি গায়ে চাপিয়ে সে তাকে অনুসরণ করল।

বাইরে এখন খুশিতে ঝলমল উজ্জ্বল রোদ। গাড়ি ঘোড়ার হৈ হট্টগোলের জন্য তাদের দুজনকেই গলাটা একটু চড়াতে হল।

'না, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, তাইনা?' সভাপতি বলতে থাকলেন, 'মাসলোভার ক্ষেত্রে দুটোর একটা ঘটতই; যেমন, হয় তাকে প্রায় খালাস দিয়ে খুব অল্প কয়েক-দিনের জন্য সাজা দিতে হত, নয়ত কারাবাসের ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারত এবং সেটা অসম্ভব হত না বোধ হয়; আর তা না হলে তাকে পাঠাতেই হত সোজা সাইবেরিয়ায়। এছাড়া অন্যকিছু সম্ভবই ছিল না। কিন্তু আপনারা যদি "জীবননাশের অভিপ্রায় ছিল না" কথাটা যোগ করতেন তাহলে সে খালাসই পেয়ে যেত।'

'সত্যিই, এটা না বলাটা যে কী অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' নেখলুদভ বলল।

'এরজন্যই তো আসল গণ্ডগোলটা বাধল।' নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে একটু হেসে সভাপতি বললেন।

তার হাতে আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। এরমধ্যে যেতে না পারলে ক্লারার সাথে দেখা করাটাই ভেস্তে যাবে।

'তাহলে আপনি উকিলের সঙ্গে কথা বলুন। আবেদন করার জন্য একটা 'কারণ' আপনাকে খুঁজে বের করতে হবেই। কিন্তু সেটা তো খুব সহজ নয়।' এরপর একটা ঘোড়ার গাড়ির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "দভোর‍্যায়ান্‌স্কায়া—তিরিশ কোপেক দেব—যাবে? না, এর বেশি দেব না।'

'চলুন।' •

'শুভ সন্ধ্যা! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়—আমার ঠিকানা: দ্ভোরনিকভ হাউস, দ্ভোর‍্যায়ান্‌স্কায়া। মনে থাকবে তো?' তারপর খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে তার যাত্রা শুরু করলেন।

॥ পঁচিশ ॥

সভাপতির সাথে কথাবার্তায়, আর তাজা বাতাসে নেখলুদভ কিঞ্চিৎ শান্ত হল। সকাল থেকে যে অস্বাভাবিক পরিবেশে সে কাটিয়েছে তার জন্যই তার অনুভূতির তীব্রতা বেড়েছে বলে তার মনে হল।

'অবশ্যই এটা একটা অদ্ভুত আর উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমন্বয়। তার ভাগ্য হালকা করার জন্য আমার ক্ষমতার ভেতর করণীয় সব কিছুই করা একান্ত দরকার।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভবত করাটাই ঠিক হবে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে। আমাকে দেখতেই হবে আদালতের কোথায় ফানারিন আর মাইকিসিন আছেন।' দুজন বিখ্যাত আইনজীবির নাম মনে এল তার।

আদালতে ফিরে এসে, ওভারকোটটা খুলে, ওপরের সিঁড়ি ধরল সে। প্রথম দরদালানেই যাস ফানারিনের সাথে দেখা হয়ে গেল তার। তাকে থামিয়ে সে বলল যে একটা বিশেষ প্রয়োজনে সে তার কাছেই যাচ্ছিল। ফানারিন নেখল্যুদভকে চেহারায় আর নামে দুভাবেই চেনেন। তিনি বললেন যদি তিনি তার কাজে লাগতে পারেন তবে খুবই খুশি হবেন।

'আমি ক্লান্ত হলেও. যদি আপনার খুব বেশি সময় না লাগে তবে আপনি বলতে পারেন ব্যাপারটা কি। আপনি এদিকে আসবেন কি?' ফানারিন নেখল্যুদভকে একটা ঘরের দিকে নিয়ে চললেন, সম্ভবতঃ বিচারকদের ঘরে। সেখানে পৌঁছে তিনি নিজের টেবিলের পাশে বসে পড়লেন।

'হুঁ, বলুন তো আপনার বিষয়টা কি?'

'প্রথমতঃ, আমি আপনাকে বলব বিষয়টা গোপন রাখতে। কারণ, আমি চাই না যে এ বিষয়ে আমি যে উৎসাহ দেখিয়েছি, সেটা জানাজানি হয়ে যাক।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, তারপর?'

'আমি আজ জুরিদের মধ্যে ছিলাম; আমরা একজন মহিলাকে সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করেছি। অথচ সে একেবারেই নির্দোষী। এতে আমার মনে খুবই অনুশোচনা হচ্ছে।'

তার নিজেরই মনে হল যে সে বড় বেশি আবেগ প্রবণ এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এতে সে নিজেই বিস্মিত হল। ফানারিন এক পলকের জন্য তার দিকে তাকিয়ে, আবার মাথাটাকে নুইয়ে শুনতে লাগলেন। বললেন, 'তারপর?'

'আমরা এক নির্দোষী মহিলাকে দণ্ড দিয়েছি; তাই মনে করছি এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আবেদন করা উচিত।'

'সিনেটের কাছে, এটাই বলতে চাইছেন তো' ফানারিন তাকে শুধরে দিলেন।

'হ্যাঁ, আর আমি চাইছি মামলাটা আপনিই হাতে নিন।'

সে চাইছে সব থেকে কঠিন অংশটা শেষ করতে; তাই বলল, 'মামলার খরচ যাই লাগুক না কেন সেটা আমিই দেব।'

'সে সব ঠিক করে নেওয়া যাবে,' এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নেখল্যুদভের প্রতি সৌজন্যসূচক হাসি হেসে আইনজীবিটি বললেন, 'মামলাটা কি?'

কি কি ঘটেছে তার সমস্তটাই সে বলল।

'ঠিক আছে, আমি কাজে হাত দেব আর কালকেই মামলাটা আগাগোড়া দেখে নেব। তার পরের দিন—না, বরং বুধবারই আপনি আসুন; ছ-টার পর; সেদিনই সব বলব। বেশ, এখন তাহলে যাওয়া যাক, আমাকে এখানে কতকগুলো অনুসন্ধান চালাতে হবে।'

নেখল্যুদভ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

উকিলের সাথে কথাবার্তা, আর মাসলোভার পক্ষ সমর্থনের জন্য সে যে ব্যবস্থা করল, তাতে মনটা অনেকটা শান্ত হল। সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে চমৎকার বসন্তের আবহাওয়া; সেই স্বচ্ছ বাতাসে একটা দীর্ঘশ্বাস টানতে

সত্যিই ভাল লাগল। সাথে সাথে ঘোড়ার গাড়িগুলো ভাড়া পাওয়ার আশায় তাকে ঘিরে ধরল। কিন্তু সে মনস্থ করল হেঁটে যাওয়ার। হঠাৎ কাত্যুসার প্রতি নিজের আচরণের এক ঝাঁক ছবি তার মস্তিষ্কে ঘুর পাক খেতে শুরু করল; ফলে সে বিমর্ষ বোধ করল, আর সব কিছুই তার কাছে বিষণ্ণ ঠেকতে লাগল। নিজের মনেই নিজে বলল, 'না, এ সবের বিচার আমি পরে করব, এখন আমাকে এইসব বাজে ধারণা থেকে মুক্তি পেতে হবেই।'

কোরচাগিনদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল তার, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘড়ি দেখল। না, সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা দেরি হয়ে যায়নি এখনও। একটা চলন্ত ট্রামের ঘন্টি শুনতে পেল। সাথে সাথে সেটাকে ধরার জন্যে ছুটতে শুরু করে দিল সে, আর উঠেও পড়ল এক লাফে; বাজারের কাছে আসতেই আবার লাফ দিয়ে নেমেও পড়ল। একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই কোরচাগিনদের বাড়িটার দরজায় এসে পৌঁছল।

।। ছাব্বিশ ।।

'অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন,' কোরচাগিনদের বাড়ির মোটা অমায়িক দারোয়ান বড় কব্জার ওপর নির্ভরশীল দরজাটা খুলে বলল, 'আপনাকে আশা করছে সবাই; তারা ভোজে বসেছেন, কিন্তু আমার ওপর আদেশ রয়েছে আপনাকে ভেতরে যেতে দেবার।'

দারোয়ান সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গিয়ে ঘন্টা বাজাল।

নেখলুদভ তার ওভারকোটটা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কোন অচেনা লোক আছে কি?'

'পরিবারের লোকজন, কোলোসভ আর মিখাইল সার্গেইভিচ রয়েছেন।'

সাদা দস্তানা হাতে, উর্দিপড়া বেশ সুপুরুষ একজন চাকর সিঁড়ির ওপর থেকে নিচে তাকাল। বলল, 'অনুগ্রহ করে ওপরে উঠে আসুন; আপনাকে সবাই প্রত্যাশা করছে।'

নেখলুদভ ওপরে উঠে অতি পরিচিত বলনাচের বিরাট জমকালো ঘরটার ভেতর দিয়ে এগিয়ে খাবার ঘরে উপস্থিত হল। গোটা কোরচাগিন পরিবারটাই, কেবলমাত্র মা সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা ছাড়া—যিনি কখনও নিজের ঘর ছেড়ে নড়তেন না, টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে রয়েছে। টেবিলের মাথার দিকটায় বসে আছেন বৃদ্ধ কোরচাগিন, তার বাঁ দিকে বসেছেন ডাক্তার আর ডান দিকে বসেছেন অতিথি ইভান ইভানোভিচ কোলোসভ—যিনি বর্তমানে ব্যাঙ্কের অধিকর্তা, কোরচাগিনের বন্ধু এবং একজন উদারপন্থী ব্যক্তি। তার বাঁ দিকে বসেছে মিশির ছোট বোনের গর্ভনেস কুমারী রেডার আর চার বছরের মেয়েটি নিজে। তার উলটোদিকে বসেছে মিশির ভাই, কোরচাগিনদের একমাত্র ছেলে, জিমনাসিয়ামের ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র পেতাইয়া। তার পরীক্ষার জন্যই সমস্ত পরিবারটা এখন শহরে রয়েছে। তারপাশে বসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র যে তাকে পড়াচ্ছে, আর মিশির খুড়তুতো ভাই মিখাইল সের্গেইভিচ তেলেগিন—যাকে সাধারণতঃ মিশা বলেই ডাকা হয়ে থাকে। তার উলটোদিকে বসেছে চল্লিশ বছর বয়স্কা কুমারী কাতেরিনা আলেক্সইভনা আর টেবিলের পায়ের দিকটাতে বসেছে মিশি নিজে; তার পাশটাতে খানিকটা জায়গা ছাড়া রয়েছে।

'আসুন। বসুন, আমরা সবে হাত লাগিয়েছি।' বৃদ্ধ কোরচাগিন তার নকল দাঁত দিয়ে সতর্কে মাছ চিবোতে চিবোতে আরক্ত চোখ জোড়া (যার পাতা নেই বললেই চলে) তুললেন নেখল্যুদভের দিকে।

খালি জায়গাটার দিকে নির্দেশ করে, বলিষ্ঠ শক্ত-সমর্থ চেহারার খানসামাটিকে ডাক দিলেন, 'স্তেপান।'

যদিও নেখল্যুদভ কোরচাগিনকে খুব ভাল করেই জানে এবং তাকে প্রায়ই ভোজে দেখেছে তবে আজ তার সংবেদনে লাল হয়ে ওঠা মুখটা, লালসাসিক্ত ঠোঁট জোড়া, ঘাড় থেকে ছোট কোট অবধি বাঁধা তোয়ালেটা আর অতিরিক্ত ভোজনে পুষ্ট সামরিক গতরখানা দেখে তার খুবই বিশ্রী লাগল। এই মানুষটির নিষ্ঠুরতার কথা তার মনে পড়ল। যখন তিনি তার স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন মানুষজনকে চাবকাতেন তো বটেই এমনকি ফাঁসিতেও লটকে দিতেন কোনরকম কার্যকারণ ছাড়াই, শুধুমাত্র এই অহঙ্কারেই যে তিনি ধনী ছিলেন, ফলে কারও অনুগ্রহ লাভের কোন প্রয়োজনই ছিল না তার।

অসংখ্য রূপোর কারুকাজে সাজানো আলমারি থেকে ঝোলের হাতা বার করতে করতে স্তেপান বলল, 'এই যে আসছি।' এবং সুপুরুষ খানসামাটিকে সে মাথা নেড়ে ইশারা করল। সাথে সাথে খানসামাটি আনকোরা ছুরি, কাঁটা, সূঁচের কাজ করা কুলমর্য্যাদাসূচক রুমাল মিশির পাশের খালি জায়গাটার ঠিক সামনেই সাজিয়ে দিল।

সকলের সাথে হাত মেলাতে নেখল্যুদভ ঘুরে চলল। তার এগিয়ে যাবার সাথে সাথে একমাত্র গৃহকর্তা আর মহিলারা ছাড়া অন্য সকলেই উঠে দাঁড়াল। এভাবে টেবিলের চারপাশে ঘোরা, সেইসব লোকের সাথে হাত মেলানো—যাদের সাথে সে কখনও কথাও বলেনি তার কাছে খুব অপ্রীতিকর আর বিশ্রী মনে হল। দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে সে নিজেই নিজেকে মার্জনা করে দিল। তারপর মিশি আর কাতেরিনা আলেক্সেভনার মধ্যে যখন সে প্রায় বসে পড়ছে এমন সময় গৃহকর্তা বললেন, সে যদি এক গ্লাস ভদ্‌কা না-ও খায় তবু যেন হজম-শক্তি বাড়াবার জন্য পাশের টেবিলে রাখা ছোট ছোট গলদা চিংড়ি, নুন দেওয়া মাছের ডিম, পণির, নুন দেওয়া হেরিং মাছ ইত্যাদি থেকে কিছু একটা খেয়ে নেয়ই। যতক্ষণ না খেতে আরম্ভ করল ততক্ষণ সে বুঝতেই পারল না যে কী পরিমাণ ক্ষুধা পেয়েছিল তার। ফলে কিছুটা রুটি আর পণির খাওয়ার পর বেশ মৌজ করে খেয়ে চলল একটার পর একটা পদ।

'সমাজের ভিত নড়ানোর কাজে কতটা সফল হলেন?' জুরিদের বিচারকে আক্রমণ করে প্রতিক্রিয়াশীল কাজের অভিমত বিদ্রূপের সঙ্গে উল্লেখ করে কোলোসভ জিজ্ঞেস করলেন, 'দোষীরা মুক্তি পেল, আর নির্দোষের সাজা হল, তাই না?'

'ভিত নড়ানো—ভিত নড়ানো,' কোরচাগিন হাসতে হাসতে বারবার বললেন; তার উদারনৈতিক বন্ধু বান্ধবের জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রতি তার বেশ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

বাজে ঝামেলা মনে হওয়াতে নেখল্যুদভ কোলোসভের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই ধূমায়িত ঝোলের পাশে বসে খেয়ে চলল।

'ওকে খেতে দিন' মৃদু হেসে মিশি বলল। সে তার সাথে আন্তরিকতার কথা

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিশেষণ ব্যবহার করল।

কোলোসভ খুব জীবন্তভাবে এবং চীৎকার করে বলে চললেন, জুরির বিচারের বিরুদ্ধে লেখার বিষয় নিয়ে—যা তার ঘৃণার উদ্রেক করেছে। মিশির খুড়তুতো ভাই, মিখাইল সার্গেইভিচ তার সমস্ত বক্তব্যের পেছনে সমর্থন জুগিয়ে ঐ কাগজেই প্রকাশিত আর একটা বিষয়ের বর্ণনা দিল।

মিশিকে আগের মতই দেখাচ্ছে; যথেষ্ট মার্জিত, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত, এবং বিনীত। সে নেখল্যুদভের মুখে পুরে ফেলা খাবার না গেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত—'

নেখল্যুদভ বলল, 'তেমন কিছু নয়। তুমি? ছবি দেখতে গিয়েছিলে কি?'

'না, ওটা আমরা বাতিল করেছি। সালামাটোভসে টেনিস খেলছিলাম। সত্যি ক্রুক ভীষণ ভাল টেনিস খেলেন।'

নেখল্যুদভ এখানে এসেছে তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সত্যি বলতে কি, এখানে থাকতে তার বেশ ভালই লাগে। এখানকার পরিশীলিত কোমল চাটুকারিতা যা বিনীতভাবে তার চতুর্দিকে বিরাজিত তা তার মনের ওপর এক কোমল প্রভাব ফেলে। কিন্তু কী অদ্ভুত কাণ্ড, আজ এ বাড়ির সব কিছুই তার কাছে বিরক্তিকর ঠেকছে। সবকিছু—দারোয়ান থেকে শুরু করে, প্রশস্ত সিঁড়ি, ফুল, খানসামা, টেবিল সাজানো, এমনকি মিশি নিজেও। তাকেও আজ অনাকর্ষনায় আর সংক্রামিত মনে হচ্ছে। কোলোসভের আত্মবিশ্বাসী উদার-নৈতিকতার ক্ষীণ স্বর তার কানে বেশ অপ্রীতিকর ঠেকছে। ঠিক তেমনি অপ্রীতিকর ঠেকছে, আত্মতৃপ্ত কোরচাগিনের ষাঁড়ের মত আকৃতি আর কাতেরিনা আলেক্সইভনার ফরাসী কথাবার্তা। গভর্ণেসের সংকুচিত দৃষ্টি, এমনকি ছাত্রটিকেও মোটেই সুখদায়ক মনে হচ্ছে না; কিন্তু সবচেয়ে অপ্রীতিকর লাগছে মিশির ব্যবহৃত 'ওকে' বিশেষণটা। সে অনেকক্ষণ যাবৎ মিশিকে বিচার করার দুরকম পদ্ধতির মধ্যে ইতস্ততঃ করছে। কখনও কখনও তার দিকে চন্দ্রালোকের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্যে সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে সে সত্যিই সুন্দর, চতুর আর নিষ্পাপ। তারপরই হঠাৎ মাথার ওপর উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দেখতে শুরু করছে, ফলে তার সব দোষগুলোই তার চোখে পড়ছে। অবশ্য এভাবে না দেখে তার উপায়ও নেই। আর আজ দিনটা এমনই যে সে তার মুখের সব ভাঁজগুলো দেখতে পাচ্ছে। কিভাবে তার চুলগুলো কুঁকড়েছে, তার তীক্ষ্ণতা, বিশেষতঃ আঙ্গুলের নখটা কতটা লম্বা, কতটা তার বাবার মত ইত্যাদি।

'টেনিসটা একেবারে ভোঁতা খেলা' কোলোসভ বললেন, 'আমরা ছেলেবেলায় লাপটা খেলতাম, খুব মজার খেলা।'

'ওঃ না, তুমি কখনও খেলনি, এটা সাংঘাতিক আকর্ষণীয় খেলা' মিশি বলল। নেখল্যুদভের মনে হল মিশি যেন সাংঘাতিক শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিল।

তারপর একটা আলোচনা শুরু হয়ে গেল যাতে মিখাইল সের্গেইভিচ, কাতেরিনা আলেক্সইভনা প্রভৃতি সকলেই অংশ নিল—কেবলমাত্র গভর্ণেস, ছাত্র, আর শিশুরা ছাড়া; তারা খুব ক্লান্ত হয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

'ও, এটা একটা চিরকালের বিতর্কের বিষয়।' গৃহকর্তা ছোট কোটের ওপর থেকে তোয়ালেটা তুলে হাসতে হাসতে বললেন। শব্দ করে চেয়ারটা (খানসামা

সেটা শক্ত করে ধরে আছে) পেছনে ঠেলে টেবিল থেকে উঠে পড়লেন।

এরপর একে একে সবাই উঠে যে টেবিলটার ওপর বাটির ভেতর সুগন্ধী উষ্ণ জল রয়েছে তার দিকে এগলো। সবাই কুলকুচো সেরে কারও দিকে না তাকিয়েই আবার আলোচনা শুরু করে দিল।

'তোমার কি তা মনে হয় না ?' খেলাধূলা ছাড়া আর কোন কিছুতেই যে মানুষের চরিত্র এতটা উদঘাটিত হয় না এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নেখল্যুদভকে মিশি বলল। সে তার অন্যমনস্কতা তার অসন্তুষ্টিভাবটা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে। তাই জানতে চাইছে এটা হবার কারণটা কি।

'আমি বলতে পারি না, কারণ, এ নিয়ে আমি কোনদিন ভাবিই নি।' নেখল্যুদভ উত্তর দিল।

'মার কাছে যাবে কি ?' মিশি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, যাব।' কিন্তু কথাটা সে এমনভাবে বলল যাতে সাফ বোঝা যাচ্ছে যে সে যেতে চাইছে না। এরপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করল।

মিশি নিঃশব্দে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে রেখেছে তার দিকে ; ফলে সে বেশ লজ্জিত বোধ করছে নিজেকে। মনে মনে ভাবছে, 'কারও বাড়িতে গিয়ে লোকজনের মধ্যে বিষাদ ছড়ানো উচিত নয়।' এরপর বেশ উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করে বলল যে আনন্দের সঙ্গে সে যেতে রাজি আছে যদি রাজকুমারী সেটা পছন্দ করেন।

'হ্যাঁ নিশ্চয় ! মা তাতে খুশিই হবেন। তুমি ওখানে ধূমপানও করতে পার ; তাছাড়া ইভান ইভানোভিচও ওখানে রয়েছেন।'

বাড়ির কর্ত্রী রাজকুমারী সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা গত আট বছর ধরে শয্যাশায়ী। যখনই অতিথিরা আসেন তখনই তিনি বেশ ঝলমলে পোশাক পরে ফুলে পরিবৃতা হয়ে বসে থেকে তাদের অভ্যর্থনা জানান ; অবশ্য সেটা কেবলমাত্র বিশিষ্ট বন্ধুদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

নেখল্যুদভকেও এই বিশিষ্ট বন্ধুদের তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে এ কারণে যে সে সত্যিকারের চতুর, তাছাড়া তার মা ছিল এদের পারিবারিক বন্ধু, আর সব থেকে বড় কথা হল মিশির সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বড় আর ছোট দুটো বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানটাতেই হল সোফিয়া ভাসিলিয়েভনার ঘর। বড় বৈঠকখানা ঘরটায়, মিশি হঠাৎ একটা চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে নেখল্যুদভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিয়ের জন্য মিশি এতই উদ্বিগ্ন, আর নেখল্যুদভকে সে এত পছন্দ করে এবং এত বেশি সমকক্ষ বলে মনে করে যে তাকে নিজের হিসেবে ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে (অবশ্য সে যে তার—তা ভাবে না)। মানসিকভাবে অসুস্থ লোকদের মধ্যে যেমনটি প্রায়ই দেখা যায় তেমনি সচেতন আর জেদী চাতুর্যের সঙ্গে সে নিজের লক্ষ্যের জন্য চেষ্টা চালিয়ে চলেছে। এবার সুযোগ পেয়ে তার মনটা জেনে নেবার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করল।

'কিছু একটা হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে,' সে বলল, 'কি হয়েছে বল তো ?'

নেখল্যুদভ আদালতের কথা মনে করল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে ভ্রূ কোঁচকাল।

'হ্যাঁ কিছু একটা হয়েছে,' নেখল্যুদভ সত্যবাদী হওয়ার বাসনায় বলল, 'একটা খুব অস্বাভাবিক আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।'

'সেটা কি ? আমাকে বলবে না ?'

আরও বেশি লাল হয়ে উঠে সে বলল, 'এক্ষুনি নয় ; এখনই আমাকে বলতে বোলনা লক্ষ্মটি। এখনও এটাকে বিচার করে দেখার মত সময় পাইনি।'

'তাহলে বলবে না আমাকে ?' মিশির গালের একটা পেশী মোচড় দিয়ে উঠল, আর যে চেয়ারটা ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেটাকে পেছনে ঠেলে দিল।

'না, আমি পারি না।' এ কথাটা সে বলল, এটা অনুভব করে যে, এটা হচ্ছে নিজের কাছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটারই স্বীকৃতি যা কিনা সদ্য সদ্য ঘটে গেছে।

'ঠিক আছে তাহলে এস।'

মাথা নাড়াল মিশি ; মনে হল যেন কোন অবাঞ্ছিত ভাবনা চেপে ফেলল। আর স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশ দ্রুত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

নেখল্যুদভ ভাবল মিশি হয়ত তার মুখ অস্বাভাবিক রকমের শক্ত করেছে শুধুমাত্র চোখের জল যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য। তাকে আঘাত দেওয়ায় মনে মনে সে লজ্জিত হল ; যদিও সে জানে যে তার তরফে সামান্য জটিলতাই এক বিরাট সর্বনাশ ঘটাতে পারে, তাকে বেঁধে ফেলতে পারে। আর এটা আজ সে আগের চেয়ে আরও বেশি করে অনুভব করল ; এবং মিশির পিছু পিছু ভাসিলিয়েভনার ঘরের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

॥ সাতাশ ॥

মিশির মা রাজকুমারী সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা তার অপরাহ্ণের ভোজন শেষ করলেন (যাতে তার এই ব্যাপক ভোজনবিলাস কারও চোখে না পড়ে সেকারণে তিনি চিরকাল একা একা খেতেই ভালবাসেন)। তার চেয়ারের পাশেই একটা টেবিলের ওপর গরম কফি রয়েছে, আর তিনি মেজাজে ধূমপান করে চলেছেন। ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা আর রোগাটে, মাথার চুলগুলো কালো কুচকুচে, চোখগুলো বড় বড় আর দাঁতগুলো লম্বাটে। তিনি নিজেকে সবসময় যুবতী সাজিয়ে রাখতেই ভালবাসেন।

বেশ কিছুদিন হল ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। কথাটা নেখল্যুদভের কানেও এসেছে ; কিন্তু আজ ঘরে ঢুকেই যখন সে ডাক্তারকে তার চেয়ারে ঘন-সন্নিবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেল, তখন রাগে তার চকচকে দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল ; শুধু যে গুজবটার কথাই তার মনে পড়ল তা নয়, ভদ্রমহিলার ওপরও যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধা জেগে উঠল।

টেবিলের পাশে রাখা নরম চেয়ারে কোলোসভ ভাসিলিয়েভনার পাশে বসে কফির কাপে চামচ নেড়ে চলেছেন, আর টেবিলের ওপর রয়েছে এক গ্লাস মদ।

নেখল্যুদভকে নিয়ে মিশি ঘরে ঢুকল, কিন্তু দাঁড়াল না।

যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে কোলোসভ আর নেখল্যুদভের দিকে ফিরে সে বলল, 'যখন মা তোমাকে ভাগিয়ে দেবে তখন তুমি আমার কাছে এসো।' তারপর হাসতে হাসতে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

কৃত্রিম লোক দেখানো ভঙ্গিতে মুখে স্বাভাবিক হাসি হেসে ভাসিলিয়েভনা বললেন, 'আরে এস, এস, বস।' তার সুন্দর দাঁত দুটো বেরিয়ে এসেছে বিগত দিনের স্মৃতির চিহ্ন বহন করে। তিনি ফরাসীতে বললেন, 'শুনলাম নাকি, তুমি আদালত থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরেছ। তাহলে দেখছি, সত্যি সত্যিই মন দিয়ে

কারও বিচার করাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।'

'হ্যাঁ তা ঠিকই,' নেখল্যুদভ বলল। 'কর্তব্য তো প্রত্যেকের আছে, কিন্তু বিচার করার অধিকার সকলের নেই।'

'দারুণ সত্যি কথা,' তিনি বিলাপ করলেন; মনে হল যেন এ মন্তব্যে বেশ আঘাত পেলেন। যাদের সাথেই তিনি আলোচনা চালাতেন তাদের সকলকেই চতুরতার সঙ্গে তোষামোদ করার অভ্যাস আছে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তোমার ছবি আঁকা কেমন চলছে বল? আমার তো তা খুবই দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যদি এরকম জবুথবু মেরে না যেতাম তো অনেক আগেই তোমার ছবি দেখতে যেতাম।'

'ওটা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি,' সে খুব নীরস স্বরে উত্তর দিল। ভাসিলিয়েভনার তোষামুদে ভাবটা তার কাছে বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ল একেবারে ঠিক তার বয়সের মত—যা তিনি সর্বদাই গোপন করার চেষ্টা করে থাকেন। ফলে সে ভদ্র ব্যবহার করাও প্রয়োজন মনে করল না।

কোলোসভের দিকে ফিরে সোফিয়া বললেন, 'কি দুর্ভাগ্য!…কেন, শিল্পে ওর সত্যিই প্রতিভা রয়েছে। আমি নিজে রেপিনের মুখ থেকে শুনেছি।'

'কেন তিনি এরকম মিথ্যা ভাষণের জন্যে লজ্জিত হচ্ছেন না?' নেখল্যুদভ ভাবল যে, তারপর ভ্রূ কোঁচকাল।

যখন তিনি বুঝলেন যে নেখল্যুদভের মেজাজ এখন মোটেই ভাল নয় এবং অন্য কেউই আর তাকে প্রীতিপদ চতুর আলোচনায় প্রলোভিত করতে পারবে না, তখন সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা কোলোসভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন নতুন এক নাটক প্রসঙ্গে তার মতামতটা কি। তিনি এমন সুরে কথাটা পাড়লেন যেন কোলোসভের মতামতই সব সন্দেহ নিরস করে দেবে, আর তার মতামতের প্রতিটি শব্দই হবে অলঙ্ঘনীয়। কোলোসভ নাটক ও নাট্যকার—উভয়কেই সমালোচনা করলেন; আর তা থেকে শিল্প সম্পর্কে তার মতামতও বেরিয়ে এল। নাটকটাকে সমর্থন করতে গিয়ে সোফিয়া তার যুক্তিতে বেশ বিমোহিত হলেন, মনে মনে সেটাই মেনে নিলেন, কিংবা হয়ত এও হতে পারে যে তিনি নিজের মতট একটু পাল্টে নিলেন। নেখল্যুদভ তাকিয়ে তাকিয়ে সব শুনল, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলনা তার। কখনও সোফিয়ার দিকে কখনও বা কোলোসভের দিকে লক্ষ্য করে দেখল যে ওদের দুজনের কেউই নাটকটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না। তবু যে তারা এত কথা বলছে তার আসল কারণ হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার পর গলা ও জিভের পেশীগুলো নড়িয়ে চাড়িয়ে একটু শারীরিক স্বস্তি সৃষ্টি করা। তাছাড়া কোলোসভ ভদকা, মদ আর দেশীয় সুরা একত্রে পান করে একটু মাতাল হয়ে পড়েছেন—তবে সেটা চাষীদের সমগোত্রীয় নয়—যারা কদাচিৎ মদ খায়, কিন্তু মদটা খাওয়ার পর একেবারে নৈমিত্তিক মাতালদের মত হয়ে যায়। তিনি ঘুরে পড়েও যাচ্ছেন না, আজে বাজে বকবকও করছেন না, কিন্তু তবু তাকে স্বাভাবিক বলেও বোধ হচ্ছে না। বরং বলাচলে অনেকটা উত্তেজিত আত্মসন্তুষ্ট গোছের ভাব। নেখল্যুদভের আরও চোখে পড়ল যে সোফিয়া অসহজভাবে বারবার জানলার দিকে তাকাচ্ছেন। ওখান থেকে সূর্যরশ্মি—তারদিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে তার বয়স্ক মুখকে বেশ আলোকিত করে তুলেছে।

'সত্যিই,' কোলোসভের কোন মন্তব্যের সম্পর্কে তিনি বললেন। তারপর তার

কোচের পাশের বৈদ্যুতিক ঘন্টার বোতামটা টিপলেন।

ডাক্তার উঠে পড়ে একেবারে ঘরোয়া লোকের মত কিছু না বলেই বেরিয়ে গেলেন। সোফিয়া তার যাবার পথের দিকে তাকিয়েই নিজের কথা বলে চললেন।

বেলের সাড়ায় সুন্দর তকমাপরা ভৃত্যটি উপস্থিত হওয়ার পর তিনি জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন. 'ফিলিপ, পর্দাগুলো টেনে দাও।'

'না, না। যাই বল না কেন তারমধ্যে রয়েছে এক রহস্যময়তা। আর এই রহস্যময়তা বাদ দিয়ে কি কোন কাব্য সম্ভব!' তিনি বললেন। ভৃত্য পর্দা টানার সময় সোফিয়ার কালো চোখ জোড়া বেশ রাগত দৃষ্টিতে ভৃত্যের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

'কাব্য বাদ দিয়ে রহস্যময়তা হল কুসংস্কার, রহস্যময়তা বাদ দিলে কাব্য হয়—গদ্য.' কষ্টার্জিত হাসি ফুটিয়ে তিনি বলতে থাকলেন, কিন্তু চাকর আর পর্দা থেকে তার চোখ সরল না।

'ফিলিপ, আরে ওই পর্দাটা নয়, বড় জানলার পাশের পর্দাটা', বেশ ভেঙ্গে পড়া সুরে তিনি বললেন। কথাগুলো বলার পরিশ্রমে তাকে বেশ কাতর দেখাল। নিজের অনুভূতিকে নরম করার জন্য হীরের আংটি পরা আঙুলটা সুগন্ধী সিগারেট সহ ঠোঁটের কাছ পর্যন্ত তুললেন।

চওড়া বুক, পেশীবহুল সুন্দর ফিলিপ ঈষৎ মাথা ঝোঁকাল, মনে হল যেন ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারপর কার্পেটের ওপর তার শক্তিশালী খাঁজকাটা পায়ে হাল্কাচালে নম্র-নীরবভাবে চলে অপর জানলার প্রান্তে এগিয়ে গেল। শেষে সোফিয়ার দিকে চেয়ে এমনভাবে পর্দা সাজাতে লাগল যাতে তার ওপর এতটুকু সূর্যরশ্মি এসে পড়তে না পারে। এতেও কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। আবার তাকে রহস্যবাদ সম্পর্কিত আলোচনা থামাতে হল। আর নির্বোধ ফিলিপকে বেশ উদ্ধতভাবে বুঝিয়ে দিতে হল ব্যাপারটা। কারণ সে তাকে সত্যিই বেশ জ্বালাচ্ছিল। কথা শুনে মুহূর্তের জন্য ফিলিপের চোখ দুটো ঝক্ করে জ্বলে উঠল।

নেখল্যুদভ ভাবল, ফিলিপ নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে, শয়তানের কবলে পড়েছি। কিন্তু বলশালী সুদর্শন ফিলিপ সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই অধৈর্যতাকে গোপন করল, আর সে বেশ শান্তভাবেই বুড়ি সোফিয়ার সব আদেশ পালন করতে লাগল।

নিচু চেয়ারটার পেছনে ঢলে পড়ে সোফিয়া ভাসিলিয়েভনার দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে কোলোসভ বললেন, 'মানতেই হবে যে ডারউইনের মতবাদের মধ্যে অনেকটাই সত্যি। তবে তিনি অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করেছেন।'

'তুমি? তুমি বিশ্বাস কর বংশধারায়?' সোফিয়া নেখল্যুদভকে প্রশ্ন করলেন। তার নীরবতা তাকে বিরক্ত করছিল।

'বংশধারায়?' সে জিজ্ঞেস করল। 'না, না, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।' ঠিক এসময় তার মন কল্পনার এক অনভ্যস্ত বিস্তারে অদ্ভুত সব ছবিতে ভরে উঠতে লাগল। এই শক্তিশালী চমৎকার ফিলিপের পাশাপাশি (ফিলিপের সৌন্দর্য শিল্পীর মডেলের মত) কোলোসভের নগ্নমূর্তি ভেসে উঠল তার কল্পনার পর্দায়। পেটটা তরমুজের মত, টাকমাথা, হাত দুটোয় কোন পেশী নেই, ঠিক যেন হামামদিস্তার ডাঁটির মত। সেই একই আচ্ছন্ন প্রচ্ছায়ায় সিল্ক ও ভেলভেটের আবরণে সোফিয়ার কাঁধটাও তার মনে ভেসে উঠল। কিন্তু মনের এই ছবি বড় ভয়ঙ্কর; তাই সেটাকে সে দূর করতে সচেষ্ট হল।

সোফিয়া তাকেই লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ; তারপর বললেন, 'আরে, তোমার জন্যে না মিশি অপেক্ষা করছে; যাও, দেখা করো ওর সাথে। স্কম্যানের লেখার নতুন কোন অংশ হয়ত তোমাকে পড়ে শোনাবে ও। খুব ভাল লেখা কিন্তু।'

'সে মোটেই এখন কিছু পড়ে শোনাবে না। কে জানে হয়ত এখন দিব্যি শুয়ে রয়েছে বিছানায়।' সোফিয়ার স্বচ্ছ হাড়গিলে হাতের পাতায় চাপ দিতে দিতে নেখল্যুদভ ভাবল।

কাতেরিনা আলেক্সেভনার সাথে দেখা হয়ে গেল বৈঠকখানা ঘরে; আর দেখা হতেই স্বভাবসিদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে সে বলল, 'জুরির কর্তব্য করতে গিয়ে তুমি বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছ দেখছি।'

নেখল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে মাফ কর। আজ আমার মেজাজ মোটেই ভাল নেই। এরজন্যে অপরে বিরক্ত হোক এটা আমি মোটেই চাই না।'

'মেজাজ খারাপ কেন?'

টুপিটা খুঁজতে খুঁজতে সে বলল, 'কেনর উত্তর জিজ্ঞেস কোরো না।'

'তোমার কি মনে নেই যে আমরা বলতাম যে পরস্পর পরস্পরকে সবসময় সত্যি কথা বলব? আর আগে তো যে কোন নিষ্ঠুর সত্য বলতেও তুমি দ্বিধা করতে না। এখন তবে কেন তা বলতে চাইছ না? মিশি কথাটা তোমারও মনে আছে নিশ্চয়ই?' মিশির দিকে ফিরে সে বলল। মিশি এইমাত্র ঘরে ঢুকল।

'আমরা তাহলে এতদিন খেলা করছিলাম,' নেখল্যুদভ গম্ভীরভাবে বলল, 'খেলায় সত্যি কথা সহজেই বলা যায়; কিন্তু বাস্তবে আমরা এত অধম যে···মানে আমি এত অধঃপতিত···মানে···আমি অন্ততঃ এক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তুমি বোলো না। কিন্তু আমরা এত অধম কেন সেটা অন্ততঃ বল,' আর শব্দগুলো নিয়েই পরিহাসচ্ছলে কাতেরিনা বলল, আর মুখে এমন ভান করল যেন নেখল্যুদভের গাম্ভীর্য সে খেয়ালেই আনেনি।

'কিন্তু মেজাজ এমন বিগড়ে যাওয়ার থেকে স্বীকারোক্তি করাটাই কি ভাল নয়?' মিশি বলল। 'আমি এটা কখনও করি না, তাই আমার মেজাজও সবসময় ভালই থাকে। চল, যাওয়া যাক। আমরা চেষ্টা করব তোমার খারাপ মেজাজ কাটিয়ে দিতে।'

নেখল্যুদভ অনুভব করল যেন জোর করে একটা ঘোড়ার মত তার লাগাম টেনে ধরা হচ্ছে। কিন্তু তবু সে ওদের সাথে যেতে পারল না। '

নিজেকেই সে নিজে মার্জনা করল; কারণ তাকে এখন বাড়ি যেতে হবেই। সে বিদায় চাইল। মিশি অন্যদিনের তুলনায় তার হাতটা আজ বেশিক্ষণ ধরে রইল। বলল, 'মনে রেখো তোমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তোমার বন্ধুদের কাছেও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ;' 'কাল আসছ তো?'

'হয়ত না,' নেখল্যুদভ উত্তর দিল। তারপর নিজের জন্য না তার জন্যে সেটা না বুঝেই লজ্জা পেল, এবং আর কিছু না বলে চলে গেল।

'ব্যাপারটা কি?' আমার কাছে গোপন করা,—কাতেরিনা মনে মনে বলল, 'ঠিক আছে, আসল রহস্য আমি জানবই। মনে হচ্ছে কোন প্রেম-ঘটিত বিষয়। ঠিক আছে, দেখা যাক।'

'খুবই নোংরা একটা প্রেমের ব্যাপার' মিশি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল।

তার মুখ শুকিয়ে গেছে। যে মুখে সে তার দিকে চেয়ে থাকে এ যেন সে মুখই নয়; এমনকি কাতারিনার সঙ্গেও সে এমন ব্যবহার কখনও করিনি। বড় জোর হয়ত কখনও কখনও বলেছে যে, আমাদের সকলেরই সুসময় ও অসময় আছে—সব দিন একইভাবে কাটে না।

'এটা কি সম্ভব যে সেও আমাকে ঠকাবে?' মিশি ভাবল, 'মনে হয় যা ঘটেছে তা তার কাছে খুবই পীড়াদায়ক।'

যদি মিশিকে সত্যিসত্যিই 'যা ঘটেছে' কথাটার ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তাহলে সে হয়ত কিছুই বলতে পারবেনা। তবু সে জানে নেখল্যুদভ তার আশাকে উদ্দীপ্ত করেছে তার জীবনে এনে দিয়েছে প্রতিশ্রুতি। তাদের উভয়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট শব্দ বিনিময় এখনও হয়নি—যা হয়েছে তাহল শুধু দৃষ্টি, হাসি ও ইঙ্গিতের বিনিময়। তবু তাকে তার মনে হল একান্তই আপনার, আর সেই আপনজনকে হারানো তারপক্ষে সত্যই এক অসম্ভব ব্যাপার।

॥ আঠাশ ॥

'কী লজ্জা, কী ভয়ানক!' চেনা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নেখল্যুদভ মনে মনে বলে চলল। মিশির সাথে কথা বলার সময় সে যে বিষাদ অনুভব করেছিল তা এখনও তার মনে পুরোদস্তুর রয়ে গেছে। আপাতভাবে সে যেন ঠিক ব্যবহারই করেছিল; কারণ কখনও তো সে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করেনি যাতে কিনা তার সাথে তার কোন বাঁধন আছে বলে ভাবা যেতে পারে। কখনও তো সে প্রস্তাবও করেননি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে নিজেকে সে তার সাথে জড়িয়েই ফেলেছে, আশা জাগিয়েছে তার বুকে। এসব জানা সত্ত্বেও, সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে আজ এটা অনুভব করা সত্ত্বেও সে কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে পারে না।

'কী লজ্জার কথা, কী ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর আর লজ্জাজনক!' নিজের কাছেই নিজে বারবার আওড়াতে লাগল। এ শুধু মিশির সাথে সম্পর্কের প্রশ্নেই নয়, সবকিছু সম্পর্কেই।

'আগাগোড়া সবই ভয়ঙ্কর আর লজ্জার' বাড়ির বারান্দায় উঠেও সে বিড়বিড় করে চলল।

খাবার ঘরে তার পিছু পিছু যে চাকরটা ঢুকল, সেই কোর্নেইকে সে বলল, 'আজ আর কিছুই খাবনা, তুমি যেতে পার।'

কোর্নেই বলল, 'ঠিক আছে।' কিন্তু তবু সে গেল না, টেবিলের ওপর থেকে খাবার সরিয়ে ফেলতে লাগল। নেখল্যুদভ কোর্নেইয়ের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল। সে একা থাকতে চাইছে, অথচ তার মনে হচ্ছে সবাই যেন তার গায়ে থুতু ছেটানোর জন্য তাকে বিরক্ত করছে। কোর্নেই খাবার বাসন পত্র নিয়ে চলে যাবার পর সে সামোভারের দিকে এগিয়ে গেল, নিজেই চা বানাবে বলে। কিন্তু আগ্রাফনা পেত্রোভনার পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল যাতে পেত্রোভনা তাকে দেখতে না পায়। সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তিন মাস আগে এই ঘরেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই, যেখানে আয়না সমেত দুটো আলো জ্বলছিল—একটা তার বাবার ছবিকে আলোকিত করে, অন্যটা মার ছবিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ল মার সাথে শেষ দিককার সম্পর্কটা কেমন দাঁড়িয়েছিল, সে কথা। সত্যি সেটা খুব অস্বাভাবিক আর বিরক্তিকর মনে হল

তার কাছে মনে হল, ওটাও ছিল বেশ লজ্জাস্কর আর ভয়ঙ্কর। মনে পড়ল কিভাবে সে মার অসুস্থতার শেষ দিকে তার মৃত্যু কামনা করেছিল। নিজেকে সে বোঝাল যে এটা সে করছিল শুধুমাত্র ভালর জন্য—যাতে তিনি দ্রুত তার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল সে চেয়েছিল যন্ত্রণার এই দৃশ্য দেখার থেকে নিজের মুক্তি।

মার সম্পর্কে সুখদায়ক স্মৃতি রোমন্থন করতে চেষ্টা করল সে। পাঁচ হাজার রুবল দক্ষিণা দিয়ে এক বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো মার ছবিটার দিকে তাকাল। সরু গলা-ওলা কালো ভেলভেটের পোষাকে তাকে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং শিল্পী স্পষ্টতঃই বুকের রেখা ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। মাঝের ফাঁকটুকুও অতিশয় উজ্জ্বল, সুন্দর কাঁধ আর ঘাড়। সবই খুব উগ্র আর ভয়ঙ্কর। তার এই অর্ধনগ্ন সৌন্দর্যের মধ্যে একটা উগ্র আর অপূর্ণভাব রয়েছে; এটা আরও বিরক্তিজনক কারণ মাত্র তিনমাস আগে এই ঘরেই তিনি শুয়েছিলেন—মমির মত শুকনো হয়ে। তবু শুধু ঘরটাই নয়, গোটা বাড়িটাকেই তিনি এক অসহ্য বিরক্তিকর গন্ধে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। এখনও সে যেন সেই গন্ধ পাচ্ছে। আর তার মনে পড়ে গেল মরার কিছুদিন আগে তিনি তার হাড়সর্বস্ব আঙ্গুলগুলো দিয়ে কিভাবে তার হাতটা জড়িয়ে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'মিতিয়া আমার যা করা উচিত ছিল তা যদি করে না থাকি, তারজন্য তুমি আমার বিচার করো না।' কথা বলতে বলতে তার চোখ জলে ভরে এসেছিল; অসহ্য যন্ত্রণায় পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'উঃ কী ভয়ানক।' মার্বেল পাথরের মত চমৎকার কাঁধ, বাহু আর ঠোঁটে বিজয়িনীর হাসিমাখা সেই অর্দ্ধনগ্না স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল কথাটা। ছবির অর্দ্ধনগ্ন বুক তাকে আরেকজন যুবতী রমণীর কথা মনে করিয়ে দিল, যে কি না কিছুদিন আগে একদিন ঠিক এভাবেই নিজেকে জাহির করতে চেয়েছিল। সে যুবতীটি হল মিশি। সে বল নাচে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেশ কৌশলে তাকে নিজের ঘরে ডেকেছিল যাতে সে তাকে বল নাচের পোশাকে-পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পায়। অত্যন্ত বিরক্তির সাথেই সে সেই সুন্দর কাঁধ আর বাহুর কথা স্মরণ করল আর ভাবল, 'কর্কশ পশুর মত তার পিতা, যার অতীত সন্দেহজনক আর নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ, এবং রসিক মা, যার খ্যাতি সত্যিই সন্দেহজনক তার ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে, এসব তাকে লজ্জিত করেছে। লজ্জিত আর ভীত; ভীত আর লজ্জিত।'

সে ভাবল, 'মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, বংশপরম্পরা আর দুনিয়ার সব রকমের মিথ্যে সম্পর্কের হাত থেকে মুক্তির স্বাধীনতা আমার রয়েছে। স্বাধীনতা রয়েছে মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার—বিদেশ যাত্রায়, রোমে যাবার, ছবি আঁকার।' শিল্পে নিজের প্রতিভা সংক্রান্ত সন্দেহের কথা তার মনে পড়ে গেল। ভাবল, 'মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে; প্রথমে যেতে হবে কনস্টানটিনোপলে, তারপর রোমে। তার আগে জুরির কাজ আর উকিলের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে।'

তারপর অকস্মাৎ তার মনে বন্দিনীর সাংঘাতিক জীবন্ত ছবি জেগে উঠল। মনে পড়ল সেই কালো টেরা চোখ দুটো, কিভাবে সে কাঁদতে শুরু করল যখন বন্দীদের শেষ কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাকে। ছাইদানিতে চেপে দ্রুত সে

সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল। তারপর আবার একটা ধরিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে একত্রে কাটানোর দিনগুলোর কথা মনে জেগে উঠল। মনে পড়ল তার সাথে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটা ; মনে পড়ল সেই বন্য উন্মত্ত তার কথা যা তাকে ছেয়ে ফেলেছিল, আর তা পূরণ হওয়ার পরের সেই নৈরাশ্য। তার মনে পড়ে গেল সেই সাদা পোশাক, নীল কাঁচ, আর ইস্টার উৎসবের কথা। সে ভাবল, 'তাকে আমি ভালবেসেছিলাম ; আর ভালবেসেছিলাম সত্যি-কারের পবিত্র মন নিয়ে। এমনকি আমি তাকে আগেও ভালবেসেছিলাম ; হ্যাঁ আমি তাকে ভালবেসেছিলাম যখন সেই প্রথমবার পিসিদের সাথে কাটিয়েছিলাম রচনা লেখার সময়।' এবার সে নিজের কথা মনে করল, মনে করল তখন সে কেমন ছিল। তাজা স্মৃতির নিঃশ্বাস, জীবনের পরিপূর্ণতার তাকে যেন স্পর্শ করল। সে যন্ত্রণায় ছটফট্ করে উঠল।

তখন সে যা ছিল আর আজ যা হয়েছে এ দুটোর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য। আজ সকালে যাকে দণ্ডিত করা হয়েছে সেই ব্যবসায়ীর সাথে মদ খেয়ে হৈ-হল্লাকারিণী বেশ্যা কাত্যুসার সঙ্গে অতীতে গির্জায় দেখা কাত্যুসার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, এ পার্থক্যও তার থেকে বেশি না হলেও কোন অংশেই এতটুকু কমও নয়। তখন সে ছিল মুক্ত ও ভীতিহীন, আর তার সম্মুখে ছিল বিকাশোন্মুখ অসংখ্য সম্ভাবনা ; কিন্তু আজ সে নিজেই অনুভব করতে পারছে যে এমন এক নির্বোধের শূন্য মূল্যহীন তুচ্ছ জীবনের ফাঁদে সে ধরা পড়ে গেছে—যার বাইরে নিজেকে বের করে আনার ইচ্ছে থাকলেও আর কোন উপায় নেই বের হয়ে আসার। সে স্মরণ করল, তার সেই সত্যবাদীতার গর্ব—কিভাবে সত্যি কথা বলার নিয়ম তৈরি করেছিল, কিভাবে তা মেনে চলত,—সবকিছু। কিন্তু আজ সে এক ভয়ঙ্কর মিথ্যের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে—আর সেই মিথ্যেই চারপাশের লোকজন দ্বারা সত্য বলে সমর্থিত হচ্ছে, বিবেচিত হচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—এই পঙ্কিল মিথ্যার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই তার সামনে আর খোলা নেই। সে কাদার সাথে মিশে, কাদাতেই অভ্যস্ত হয়ে, কাদাতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কিভাবে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা আর তার স্বামীর সঙ্গে এমনভাবে সব সম্পর্কের অবসান ঘটানো যেতে পারে যাতে কিনা তার ছেলেমেয়েরাও তার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকাতে বাধ্য হবে। কিভাবে মিশির কাছ থেকে নিজেকে সে ছাড়াবে ? কিভাবে 'জমি ব্যক্তিগত অধিকারে রাখাটা অন্যায়'—তার এই বিশ্বাসের সাথে মার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমি নিজের অধিকারে রাখার বাস্তব দ্বন্দ্বের সে নিরসন করবে ? কিভাবে কাত্যুসার বিরুদ্ধে সংঘটিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে ? এটাকে তো যেমন আছে, তেমনি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যে নারীকে সে একবার ভালবেসেছিল, তাকে কিছুতেই তার পক্ষে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাকে যাতে সাইবেরিয়ায় গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে জীবন কাটাতে না হয়, সেজন্য কিছু টাকা দিয়ে একজন উকিলকে নিয়োগ করলেই তো আর তার কর্তব্য শেষ হয়ে যেতে পারে না। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, কিছু টাকার বিনিময়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা ! কেন, আগেও যখন সে তাকে টাকা দিয়েছিল, তখনও তো ভেবেছিল যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কৈ, তা তো হয়নি।

এখন তার পরিষ্কার মনে পড়ছে সেই মুহূর্তের কথা যখন সে তাকে বারান্দায়

দাঁড় করিয়ে তার জামার বুকের কাছটাতে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। 'সেই টাকা!' তখনও যা অনুভব করেছিল সেই একই ভয় আর ঘেন্না নিয়ে সে আজও কথাটা ভাবল। 'হা ভগবান! কী বিরক্তিকর,' সে জোরে আর্তনাদ করে উঠল ঠিক যেমনটি তখন করেছিল। 'একমাত্র একটা পাজি, একটা বদমাশই এ ধরনের কাজ করতে পারে। আর আমি—আমিই হলাম সেই বদমাশ, সেই পাজি।' মনে মনে আউড়ে চলল নেখল্যুদভ। কিন্তু এটা কি সম্ভব! —থেমে গেল; অনড় হয়ে দাঁড়াল—'এটা কি সত্যিই সম্ভব যে আমি একটা বদমাশ?—হ্যাঁ, আমিই—আমি ছাড়া আর কে?' নিজেই নিজেকে জবাব দিল। 'তাহলে এটাই কি একমাত্র বিষয়?' সে নিজেকে শাস্তি দিয়ে চলল। মারিয়া ভাসিলিয়েভনা ও তার স্বামীর প্রতি আমার আচরণ কি খুব নোংরা আর বিরক্তিকর নয়? আর অর্থের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি? অর্থের ব্যবহার করা আমার বিবেচনায় বেআইনী কি শুধু এজন্যই যে আমার মা-ই সেগুলোর জোগান দিয়েছিলেন? আর আমার সমগ্র অলস বিস্বাদ জীবন? আর কাত্যুসার প্রতি আমার আচরণ? একটা বদমাশ আর পাজি কোথাকার! যেভাবে খুশি তারা আমার বিচার করুক; আমি তাদের ঠকাতে পারি কিন্তু নিজেকে তো পারি না।'

অকস্মাৎ যে বিতৃষ্ণা সে সকলের প্রতি অনুভব করল,—রাজকুমার, সোফিয়া ভাসিলিয়েভনা, কর্নেই, এবং মিশি—তা তো তার নিজের প্রতিই বিতৃষ্ণা। আর বলতে গেলে এই অদ্ভুত নীচতার স্বীকৃতিতে এমন কিছু একটা রয়েছে যা যদিও বাইরে বেদনাদায়ক তবে তার মনে যথেষ্ট আনন্দ আর শান্তি এনে দিয়েছে।

তার জীবনে এটা একাধিকবার ঘটে গেছে। এটাকে সে বলে 'আত্মার পরশুদ্ধিকরণ।' আত্মার পরশুদ্ধিকরণ বলতে সে বোঝে মনের এমন একটা অবস্থা যেখানে অন্তর্জীবনের দীর্ঘ জড়াবস্থার পর সামগ্রিক কর্মস্তব্ধতা; আর তারপরই সে সেই আবর্জনার স্তূপ সাফ করতে শুরু করে দেয় যা তার আত্মায় সঞ্চিত হয়ে অবসাদ সৃষ্টি করেছে।

এমন এক একটা জাগরণের পর সে সর্বদা নিজের জন্য কতগুলো নিয়ম তৈরি করত চিরকাল মেনে চলার উদ্দেশ্যে। সে ডাইরী লিখতে শুরু করে দিত, আর শুরু করত এক নতুন জীবন যা সে আশা করত আর কখনও পালটাবে না। 'নতুন জীবন শুরু' তখন নিজের মনে ইংরেজীতে এই কথাটাই বলত সে। কিন্তু প্রতিবারই জগতের প্রলোভন তাকে ফাঁদে ফেলত আর কোন রকম লক্ষ্য না করেই আগের চেয়ে আরও নিচে নেমে পড়ত সে।

এভাবেই বহুবার সে মাথা তুলেছে আর নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। প্রথমবার এটা ঘটেছিল গ্রীষ্মকালে তার পিসিদের সাথে থাকার সময়। সেটা ছিল অপরিহার্য উল্লসিত এক জাগরণ। আর এর ফল বেশ কিছুকাল যাবৎ বলবৎ ছিল। পরের জাগরণ ঘটেছিল যখন সে অসামরিক চাকরি ছেড়ে যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তখন। সে সময় সে নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এইখানেই তার জাগরণ রোধ করার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হতে শুরু করে। তারপর আরেকটা জাগরণ আসে যখন সে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে বিদেশে গিয়ে শিল্পের তপস্যা শুরু করেছিল। সেই থেকে আজপর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় বয়ে গেছে কোন রকম শুদ্ধিকরণ ছাড়াই। ফলতঃ তার বিবেকের কামনা আর যে জীবন সে অতিবাহিত করছে

এ দু-য়ের বিষাদ আগের চেয়ে বিরাটাকার ধারণ করছে। সে ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ল যখন দেখল যে কী ভয়ানক পরস্পরবিরোধীতা রয়েছে তার মধ্যে!

এটা এতই প্রকাণ্ড আর দূষিতকরণের এমন এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে যে পরিশুদ্ধ হওয়ার আর কোন আশাই নেই। 'তুমি কি আগেও চেষ্টা করনি নিজেকে যথাযথ করতে? আর তুলনামূলকভাবে ভালও তো হয়েছিলে; তাতে কিছু লাভ হয়নি তোমার?—ভেতর থেকে শয়তানের গলা ফিস্‌ফিস্ করে উঠল। 'আর চেষ্টা করেই বা কি লাভ? তুমি কি আর একা?—সবই তো একই রকম, জীবনটাই তো এই রকম,' সেই গলা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল। কিন্তু মুক্ত আধ্যাত্মিক আত্মা, যে একাই সত্য, একাই শক্তিশালী, একাই চিরন্তন সে ইতিমধ্যে তার ভেতর জেগে উঠেছে, আর সে তা বিশ্বাস না করেও পারছে না। যদিও সে যা হতে চায় আর বর্তমানে যা হয়েছে—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাট, তবু তার মধ্যে জাগরিত আধ্যাত্মিক আত্মার কাছে কিছুই পরাজেয় মনে হচ্ছে না তার।

'যে কোন মূল্যে আমি এই মিথ্যেটাকে ভেঙে ফেলবই যা আমাকে বেঁধে রেখেছে। সবাইকে সত্যিটাই জানিয়ে দেব আর এখন থেকে হাঁটা ধরব সত্যের রাস্তায়,' জোরে জোরে দৃঢ়স্বরে নিজেকেই কথাটা বলল সে। 'আমি মিশিকে সত্যি কথাটাই বলব, বলব যে আমি একটা লম্পট, আমার পক্ষে তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়, কেবল মিছি মিছি তাকে আশা দিয়েছি। আর মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে বলব…না তাকে কিছুই বলার নেই, বরং তার স্বামীকেই বলব যে আমি একটা বদমাশ, আমি তাকে ঠকিয়েছি। আর এভাবেই সমস্ত উত্তরাধিকারকে খোলসা করে দেব সত্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কাত্যুসাকেও বলব যে, আমি একটা অতি জঘন্য জীব, এবং জেনে শুনেই তার বিরুদ্ধে পাপাচার করেছি; আর সেই পাপের বোঝা লাঘব করার জন্য আমার পক্ষে তার জন্য যা-কিছু করা সম্ভব তাই করব। হ্যাঁ, আমি তার সাথে দেখা করব, তার কাছে ক্ষমা চাইব।… ক্ষমা চাইব, যেমন করে শিশুরা চায়,' সে থেমে গেল—'প্রয়োজন হলে তাকে বিয়ে করব।'

সে আবার থামল, বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখল, ছোটবেলায় যেমন করত। চোখ তুলল আর কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলল: 'প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন, শিক্ষা দিন, আসুন, আমার মধ্যে প্রবেশ করুন আর এই সব বিজাতীয় ঘৃণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন আমাকে পবিত্র করুন।'

সে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করল যাতে ঈশ্বর তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে পরিশুদ্ধ করে তোলেন। সে যা প্রার্থনা করছে তা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। তার অন্তরের ভগবান, তার বিবেক জেগে উঠেছে। সে তার সাথে একাত্মতা বোধ করল। ফলতঃ শুধু জীবনের স্বাধীনতা, পূর্ণতা আর আনন্দই নয়, সাথে সাথে ন্যায়পরায়ণতার সমগ্র শক্তিও তার উপলব্ধিতে এল। একজন মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভাল যা করা সম্ভব সে তাই করার সক্ষমতা বোধ করল।

মনে মনে এসব কথা বলতে বলতে তার চোখদুটো জলে ভরে উঠল; এ ভাল আর মন্দের। ভাল, কারণ এটা হল আনন্দের অশ্রু; কেননা, এতকাল তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা আধ্যাত্মিক আত্মার নবজাগরণ ঘটেছে। আর মন্দ এ কারণে যে এ হচ্ছে তার নিজের ভালোত্বের প্রতি কোমলতার অশ্রু।

সে গরম বোধ করছে, তাই জানলার কাছে গিয়ে কপাট দুটো খুলে দিল।

জানলাটার মুখ রয়েছে বাগানের দিকে। সেখানে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত শান্ত, তাজা রাত মৃদু শব্দে কী যেন একটা বলে গেল, তারপর সব স্তব্ধ। জানলার উলটো দিকের দেওয়ালে লম্বা পপলারের ছায়া পড়েছে, আর তার নগ্ন শাখার প্রচ্ছায়া কাঁকর বিছানো মেঝেতে একেবারে স্পষ্ট মালুম হচ্ছে। বাগানের দেওয়ালের কালো ছায়ার সামনে গাছের জড়াজড়ি ডালপালার ভেতর দিয়ে গাড়ি রাখার বাড়িটার বাঁ দিকের ছাদ চাঁদের আলোয় একেবারে সাদা দেখাচ্ছে—নেখলুদভ ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চন্দ্রালোকিত বাগান, পপলারের ছায়া, আর সঞ্জীবনী বাতাস প্রাণ ভরে গ্রহণ করল।

নিজের আত্মার মধ্যে যে আলোড়ন চলেছে তারই উদ্দেশ্য সে বলল, 'কী চমৎকার, কী চমৎকার, হে ঈশ্বর, কী চমৎকার।'

॥ উনত্রিশ ॥

অনভ্যস্ত পায়ে প্রায় দশ মাইল পাথুরে রাস্তা অতিক্রম করার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা ছটার সময় মাসলোভা তার সেলে এসে পৌঁছল। আশাতীত সাজা আর খিদের চোটে সে বেশ কাতর হয়ে পড়েছে।

বিচারের প্রথম বিরতির সময় রক্ষীরা যখন তার পাশে বসে আধা সিদ্ধ ডিম আর রুটি খাচ্ছিল তখন তা দেখে তার জিভে লালা এসে গিয়েছিল, এবং সে বেশ ভালভাবেই অনুভব করেছিল যে সে ক্ষুধার্ত; কিন্তু তাদের কাছে কিছু চাওয়াটা মর্যাদাহানীকর বোধ হওয়ায় সে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল। এভাবে তিন ঘণ্টা থাকার পর খিদেটা আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল, পরিবর্তে সে অনুভব করছিল শুধু দুর্বলতা। রায় শোনার পর প্রথম তার মনে হয়েছিল যে সে নিশ্চয় ভুল শুনেছে, কারণ, তারপক্ষে নিজেকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত একজন দণ্ডিত আসামী হিসেবে ভেবে নেওয়াটা মোটেই সম্ভব হচ্ছিল না; ফলে যা শুনেছিল তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, বরং বিচারক আর জুরিদের শান্ত সমাহিত মুখমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে বোবার মত তাকিয়ে ছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল যে ওরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তখন সে ঘৃণায় আর রাগে চিৎকার করে সমগ্র আদালতের কাছে দাবি জানাল যে সত্যিসত্যিই সে নির্দোষ। কিন্তু আশ্চর্য, তার দাবির কথা শোনার পরও আসল ব্যাপারটায় এতটুকু পরিবর্তন ঘটল না, বরং সবাই যেন ধরেই নিল যে ওটাই হচ্ছে স্বাভাবিক আর কাম্য। ফলে সে প্রচণ্ড হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল এই অনুভূতিতে যে নিষ্ঠুর বিস্ময়কর অবিচারের কাছে তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হবেই। কিন্তু সবথেকে বেশি তাকে যা বিস্মিত করেছিল, তা হল কমবয়সী বিচারক আর জুরির দল। তারা বারবার তার দিকে সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল (তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সরকারি উকিল), কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই তাকে চরম দণ্ড দিল। বিচার শুরু হওয়ার আগে এবং বিশ্রামের সময় যখন সে বন্দীদের ঘরে বসেছিল তখন ওইসব লোকগুলো খোলা দরজার ওপার দিয়ে বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিল, আর ভান করছিল যেন কোন জরুরী কাজ করার জন্যই তাদেরকে ওখান থেকে যাতায়াত করতে হচ্ছে; আবার কেউ কেউ ভেতরে ঢুকে তার দিকে বেশ সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়েও থাকছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই তাকে এই কঠোর দণ্ড দিল—যদিও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে সে সত্যিই নির্দোষী। প্রথমে সে কেঁদে

ওঠে, তারপর শান্ত হয়ে বন্দীদের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকে—তাকে নিয়ে আসা হবে, সেজন্য। সে সময় একটাই মাত্র তার বাসনা ছিল—তা হল ধূমপান। সেই একই ঘরে অন্য দুজন দণ্ডিত আসামী বোচকোভা আর কারতিনকিনকে নিয়ে আসার সময় এটাই ছিল তার মানসিক অবস্থা। বোচকোভা ঘরে এসেই তাকে 'আসামী' বলে সম্বোধন করে গালাগালি শুরু করে দিল। বলল, 'নিজেকে নির্দোষ বলে তোর লাভটা হল কি? হারামী কোথাকার! চিন্তা করিস না, সাইবেরিয়ায় গেলে তোর সব দেমাক মরে যাবে, দেখে নিস।'

মাথাটা ঝুঁকিয়ে, হাত দুটো জামার আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে, সামনের নোংরা মেঝের দিকে তাকিয়ে মাসলোভা অনড়ভাবে বসেছিল। শুধু বলেছিল, 'আমিও তোমাদের জ্বালাচ্ছি না, আর তোমরাও আমাকে জ্বালিও না। ...আমি তোমাদের জ্বালাচ্ছি না, তাই নয় কি?' কথাটা কয়েকবার আওড়াবার পর সে চুপ করে গিয়েছিল। এরপর বোচকোভা আর কারতিনকিনকে যখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং একজন বেয়ারা এসে তার হাতে তিনটে রুবল দিল, তখন তার মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বেয়ারাটা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমিই কি মাসলোভা?' তারপর তার হাতে রুবল তিনটে দিয়ে বলেছিল, 'এক ভদ্রমহিলা এগুলো তোমাকে দিয়েছে।'

'ভদ্রমহিলা—কোন ভদ্রমহিলা?'

'এটা নাও, আমি এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

টাকাটা পাঠিয়েছিল পতিতালয়ের কর্ত্রী কিতাইয়েভা। আদালত থেকে বের হবার মুখে সে পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মাসলোভার হাতে সামান্য কিছু অর্থ দেবার অধিকার তার আছে কিনা। পেয়াদা উত্তরে সম্মতি জানিয়েছিল। ফলে কিতাইয়েভা অনুমতি পাবার পর, তিনটে বোতামওলা ছাগলের চামড়ার নোংরা দস্তানাটা হাত থেকে খুলে ফেলে, সিল্কের জামার পেছনের পকেট থেকে সুদের কাগজের কুপন ভর্তি একটা ছোট ব্যাগ বের করে তা থেকে আড়াই রুবলের একটা নোট আর দুটো কুড়ি কোপেক এবং একটা দশ কোপেকের মুদ্রা পেয়াদাকে দেয়, আর পেয়াদাও সঙ্গে সঙ্গে সেটা একজন বেয়ারাকে ডেকে মাসলোভার হাতে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল। কিতাইয়েভা তাকে বলেছিল, 'অনুগ্রহ করে সব টাই তার হাতে দেবেন।'

কিতাইয়েভার এমন অবিশ্বাসপূর্ণ ব্যবহারে বেয়ারাটি মনে মনে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল, এবং সে কারণেই সে মাসলোভার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল।

টাকা পেয়ে মাসলোভা বেশ খুশিই হয়েছিল, কারণ, সেই মুহূর্তে সে যা চাইছিল, সেটা কেবলমাত্র টাকার বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব ছিল তারপক্ষে।

সে নিজের মনে মনে ভাবছিল, 'আহাঃ, যদি একটা সিগারেট পেতাম আর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে পারতাম এখন!' তার সমস্ত ভাবনা সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সে ইচ্ছা এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে, বারান্দার দিকের খোলা দরজাটা থেকে তামাকের গন্ধ যখন বাতাসে ভেসে ভেতরে ঢুকছিল তখন সে সেই বাতাসকেই টানতে শুরু করে দিল। এভাবে অনেকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ, যে কর্মসচিবটির তাকে নিয়ে যাবার আদেশ

দেবার কথা তিনি একজন আইনজীবির সঙ্গে নিষিদ্ধ ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

নানান বয়সের কিছু লোক বিচার শেষে তাকে দেখবার জন্য ভেতরে এসে তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলছিল, কিন্তু সে তাদের কথায় কানই দিচ্ছিল না।

পাঁচটার সময় তাকে যেতে দেওয়া হল ; পেছনের দরজা দিয়ে সেই নিঝ্‌নি নোভগোরোদ আর চুভাসের বাসিন্দা রক্ষী দুজন তাকে নিয়ে চলল। আদালতের প্রবেশ পথটার কাছটার কাছে পৌঁছে সে তাদেরকে কুড়ি কোপেক দিয়ে রুটি আর সিগারেট আনতে বলল। চুভাসের রক্ষীটি পয়সাটা নিয়ে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি।' তারপর সত্যিসত্যিই সে রুটি আর সিগারেট এনে দিল, এমনকি খুচরো পয়সাটাও ফেরৎ দিতে ভুলল না।

রাস্তায় তাকে ধূমপান করতে দেওয়া হল না ; এবং অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই সে এতটা পথ হেঁটে শেষে জেলখানার দরজায় এসে পৌঁছল। দেখল, রেলগাড়িতে করে আনা একশ জন বন্দীকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আসামীদের মধ্যে রয়েছে দাড়িওলা, দাড়িবিহীন, বৃদ্ধ, যুবক, রুশীয়, অরুশীয় ; এদের মধ্যে কারও কারও মাথা কামানো, পায়ে বেড়ি ; সবাই মিলে তারা প্রবেশ মুখের ঘরটাকে ধূলো, চিৎকার, টক-গন্ধ আর ঘামে ভরিয়ে ফেলেছে। মাসলোভার পাশ দিয়ে যাবার সময় সব আসামীই একবার করে তার দিকে দেখল, কেউ কেউ আবার একটু সরে এসে তার গায়ে গা-ঘষে নিল।

একজন বলল, 'আঃ, একেবারে তাজা মাল !'

অন্যজন একটা চোখ টিপে বলল, 'সেলাম মেমসাব।'

পায়ে শেকল বাঁধা, মুখ আর ঘাড় পর্যন্ত পরিষ্কার করে কামানো গোঁফওলা একটি কালো লোক হঠাৎ তার দিকে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। দাঁতগুলো বের করে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, তুমি তোমার নাগরকে চিনতেই পারছ না ? এস, এস, এভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিও না।' আর মাসলোভা যখন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল তখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের সহকারী চিৎকার করে উঠল, 'পাজি কোথাকার ! কি চাস তুই ?'

আসামীটা এক লাফে পেছনে সরে গেল। সহকারীটি মাসলোভার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার এখানে কি চাই ?'

মাসলোভা বলতে যাচ্ছিল যে তাকে ফৌজদারি আদালত থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু সে এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে কথা বলতেও তার ভাল লাগছে না।

রক্ষীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'ও আদালত থেকে ফিরল।'

'ঠিক আছে, ওকে বড় জমাদারের কাছে নিয়ে যাও। এসব ব্যাপার আমি দেখব না।'

'আচ্ছা।'

সহকারী ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'সোকোলভ, ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

বড় জমাদার এগিয়ে এসে মাসলোভার কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে মাথা নেড়ে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে জেনানা-ফটকের বারান্দায় নিয়ে গেল।

সেখানে তার দেহ তল্লাশি করা হল, এবং তল্লাশির ফলে যখন আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না (সিগারেটের বাক্সটা সে রুটির প্যাকেটটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে) তখন তাকে, সকালবেলা যে সেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আবার সেই সেলেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

॥ ত্রিশ ॥

যে সেলে মাসলোভাকে রাখা হয়েছে সেটা ল একুশ ফুট আর চওড়ায় ষোল ফুট। তাতে রয়েছে দুটো জানলা আর একটা চওড়া স্টোভ। ঘরের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে থাক্‌থাক্ করা তক্তার বিছানা, আর সেগুলোর প্রত্যেকটা বেশ দোমড়ানো-মোচড়ানো। দরজার বিপরীত দিকে ঝুলছে একটা কালো আইকন, তাতে রয়েছে একটা মোমবাতি আর এক গুচ্ছ মান্ধাতার আমলের ফুল। বাঁদিকে দরজার পেছনে, কালো মেঝের কাছটায় পড়ে রয়েছে একটা দুর্গন্ধময় বালতি। গুনতি হয়ে গেছে ; আজ রাতের মত মেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে আছে মোট পনের জন ; তার মধ্যে আবার তিনজন বাচ্চা।

দিনের আলো এখনও শেষ হয়নি, মাত্র দুজন মেয়ে শুয়ে পড়েছে। একজন যক্ষ্মা রোগিণী চুরির দায়ে এসেছে ; আর একজন একেবারে নির্বোধ, পাসপোর্ট দেখাতে পারেনি বলে ধরা পড়েছে। সে বেশির ভাগ সময়টাই ঘুমিয়ে কাটায়। যক্ষ্মা রোগিণী এখনও ঘুমোয়নি ; চোখ খুলে শুয়ে রয়েছে। জামাটা ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে নিচে ; যাতে কাশিটা একটু কমে সেজন্য গলায় জমে থাকা কাশির ব্যথা সামলাচ্ছে।

অন্য মেয়েদের বেশির ভাগেরই গায়ে বাদামী রঙের মোটা হল্যাণ্ডীয় সেমিজ। এরা সবাই জানলা দিয়ে উঠোনের আসামীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। অন্য তিনজন বসে বসে সেলাই করছে। আর শেষ জন হল সেই বুড়ি যে মাসলোভাকে সকালে বিদায় জানিয়েছিল। তার নাম কোরাবলেভা। বেশ লম্বা, শক্তসমর্থ, সরলসিধে চাহনি, টানা ভ্রু, ভাঁজবিহীন ঝোলা গাল, পাকা চুলে স্বল্প ভাঁজ, সামনের দিকটা বেশি পাকা। গালের ওপর ঝুলে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। একে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কারণ সে তার স্বামীকে নিজের মেয়ের সতীত্ব নাশের জন্য কুঠার দিয়ে হত্যা করেছে। সেলের মেয়েদের মধ্যে সেই হচ্ছে অগ্রণী যে তাদের সকলের মধ্যে মদের ব্যবসা চালায়। তার পাশে বসে রয়েছে অন্য একটি মেয়ে। সে পুরু ক্যাম্বিসের একটা থলে সেলাই করছে। ও একজন রেলওয়ে ওয়াচম্যানের বউ। ওর সাজা হয়েছে তিনমাসের ; কারণ ও ঠিক সময়ে পতাকা হাতে নিয়ে লাইনে আসেনি, ফলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মাথায় খাটো, বোচাঁ নাক কালো দয়ালু চোখ, বেশি কথা বলে। তৃতীয় জনের নাম ফেদোসিয়া। সেও সেলাই করছে। একেবারে কাঁচা বয়েস ; ফর্সা, গোলাপী—দেখতে খুব সুন্দর। শিশুদের মত বড় বড় চোখ ; লম্বা বিন্যস্ত চুল ; চুলগুলো মাথার চারদিকে উড়ছে। স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারতে গিয়েছিল সে। কাজটা করেছিল ঠিক বিয়ের পরই (মাত্র ষোল বছর বয়সে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। প্রায় আট মাস জামিনে মুক্ত ছিল। এ সময়ে সে ও তার স্বামী পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হয়েছিল ; একের ওপর অপরের মন মজেছিল ; এবং যখন বিচার শুরু হয় তখন

যদিও তার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী (শাশুড়ী তাকে ভীষণ ভালবাসত) তাকে মুক্ত করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সাইবেরিয়ায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দয়াবতী, উচ্ছল হাসিখুসি ফিদোসিয়ার তক্তাটা হচ্ছে ঠিক মাসলোভার পাশেরটাই। তাকে তার এত ভাল লেগে গেছে যে সে তার দেখা শোনা করাটা নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। অন্য দুজন মেয়ে কিছুই করছে না। তারা তাদের তক্তায় শুয়ে আছে। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ। রোগা শুকনো মুখ। দেখে বোঝা যায় এককালে সে বেশ সুন্দরী ছিল। সে তার শীর্ণ ফর্সা বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে রয়েছে। তার অপরাধ হল: তাদের গ্রামে যখন সৈন্য সংগ্রহ অভিযানে একটি অল্পবয়স্ক ছেলেকে আইনবিরুদ্ধভাবে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন জনতা পুলিশ অফিসারের গতিরোধ করে সেই ছেলেটিকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। এই মহিলাটিই হল সেই ছেলেটির কাকীমা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই নাকি প্রথমে অফিসারের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরেছিল। অন্য যে মহিলাটি নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে সেও বেশ দয়াবতী। তার চুল পাকা, ঘাড় কুঁজো। ষ্টোভের পেছনের দিকের বিছানায় সে বসে রয়েছে। এমন ভাব করছে যেন ঐ চারবছরের ছেলেটি তার সামনে পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর সে তাকে ধরতে চেষ্টা করছে, এবং খিলখিল করে হাসছে। ছেলেটির গায়ে একটা ছোট্ট জামা, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। যখনই সে তাকে ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে তখনই বুড়ি বিড়বিড় করছে: 'কই! আমাকে ধরতে পারলে!'

এই বৃদ্ধা ও তার ছেলে একটা অগ্নিকাণ্ডের মামলায় আটক রয়েছে। সে বেশ আনন্দের সঙ্গেই তার বন্দীদশা অতিবাহিত করছে। শুধু ছেলেকে নিয়েই পড়ে রয়েছে। ঘরে আছে তার 'বুড়ো স্বামী।' তার কেবলই মনে হয় যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বুড়োর কী কষ্টেই না দিন কাটছে!

এই সাতজন ছাড়া, আরও চারজন মেয়ে লোহার গারদ ধরে জানলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা অন্যান্য আসামীদের ইশারা আর চেঁচামেচি করে ডাকছে। এদের সাথে জেলে ঢুকেই মাসলোভার সাক্ষাৎ ঘটেছে; এরা এখন উঠোন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই চারজনের একজন খুব মোটা। লাল চুল, শুকনো হলুদ মুখে নিস্তেজ ছায়া। বোতাম খোলা কলার থেকে মোটা ঘাড় বেরিয়ে পড়েছে, বেশ কর্কশ সুরে চেঁচাচ্ছিল এতক্ষণ। আর কী বিশ্রী হাসি! এই মেয়েটি চুরির দায়ে এসেছে। তার পাশেই এক অদ্ভুত দর্শন কালো বেঁটে মেয়ে—দশ বছরের ছেলের চেয়েও মাথায় ছোট। লম্বা কোমর, ছোট পা, লালচে ব্রনভর্তি মুখ, চোখদুটো বসা, পুরু ঠোঁট,—তা থেকে লম্বা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। উঠোনের দিকে চেয়ে সে মাঝে মাঝেই হাসিতে ফেটে পড়ছে; চুরি ও বরজ্বালানির দায়ে তার বিচার হবে। তারা তাকে খোরোশভকা বলে ডাকে। তার পেছনে রয়েছে নোংরা ধূসর সেমিজ পরা, রোগা-শীর্ণ, গর্ভবতী একটি মহিলা; চুরি গোপন করার দায়ে তার বিচার হবে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে; নিচের ঘটনাবলী দেখে হাসছে। তারপর রয়েছে এক মোটা কৃষকরমণী; জলজ্বলে চোখ, খুশিতে উজ্জ্বল মুখ। আর রয়েছে বৃদ্ধার সাথে ক্রীড়ারত ছেলেটির মা ও সাত বছরের একটি মেয়ে। এরা মার সাথেই জেলে এসেছে কারণ তাদের দেখার মত আর কেউ ছিল না। মদ চোলাইয়ের দায়ে সে জেল খাটছে। জানলার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মোজা বুনছে। যদিও

অন্য আসামীদের কথাবার্তা সে শুনছে, তবু ঘাড় নাড়ছে গররাজি ভঙ্গিতে; তারপর ভ্রূকুটি করে চোখ বন্ধ করছে। কিন্তু তার সাত বছরের মেয়েটা ছোট্ট সেমিজ পরে, হাল্কা ছড়ানো চুল আর নীল চোখ নিয়ে লালচুলো স্ত্রীলোকটির জামা ধরে টানছে, আর মেয়ে ও পুরুষ আসামীর দল পরস্পরকে আকর্ষণ করবার জন্য যে গালাগালি দিচ্ছে মনে মনে সেগুলো আওড়াচ্ছে; যেন মন দিয়ে শিখে নিচ্ছে সব কথা। বার নম্বর আসামী কোন কারও প্রতিই লক্ষ্য রাখছেনা। সে একজন পুরোহিতের মেয়ে; নিজের অবৈধ সন্তানকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। তার শরীর বেশ লম্বা, ঋজু। পা দুটো নগ্ন, পরনে নোংরা সেমিজ, আর মাথায় অবিন্যস্ত চুল। কোনদিকে না চেয়ে সেলের খালি জায়গাটায় সে কেবল পায়চারি করছে, আর প্রত্যেকবারই হঠাৎ হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকাচ্ছে।

।। একত্রিশ ।।

যখন হুড়কোর ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে দরজা খুলে গেল মাসলোভাকে সেলের ভেতর ঢোকানোর জন্য তখন সকলে তার দিকে ঘুরে তাকাল। এমনকি ডিকনের মেয়েও এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে গেল; তার ভ্রূ জোড়া তুলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু একটাও কথা বলল না, আগের মত উৎসাহেই পায়চারি করে চলল।

কোরাবলিওভা বাদামী রংয়ের কাপড়ে তার ছুঁচটা খিঁধিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে মাসলোভার দিকে তাকাল। পুরুষের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা নিচু গলায় বলল, 'মঙ্গলময় ভগবান! আবার ফিরে এলে! আমি নির্ঘাত ভেবেছিলাম যে তারা তোমায় ছেড়ে দেবে।' তারপর চশমাটা খুলে হাতের কাজটা নামিয়ে রাখল পাশের তক্তার বিছানায়।

'আর এখানে আমি আর বুড়ি খুড়ী বলে চলেছি যে, "তারা যদি তাকে এক্ষুণি মুক্ত করে দেয় তবে সেটা খুবই ভাল হয়।" তারা বলল, এরকমও নাকি হয়ও; আবার কেউ কেউ নাকি মোটা টাকাও পেয়ে যায়। এসব যার যার ভাগ্যের ব্যাপার।' সেপাইয়ের স্ত্রী বলে চলল, 'আর দেখ কেমন উলটো ব্যাপার। আমাদের সব অনুমান ভুল হয়ে গেল। ঈশ্বর অন্যরকম ভেবেছিলেন।' সে তেমনি খুশির স্বরে বলে চলল।

'একি সম্ভব? তারা কি তোমায় শাস্তি দিয়েছে?' ফিদোসিয়া তার হালকা নীল শিশুর মত চোখে মাসলোভার দিকে তাকিয়ে কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করল। তার উজ্জ্বল মুখের চেহারাটা এমন পালটে গেল যে মনে হল সে যেন কেঁদে ফেলল।

মাসলোভা কোন জবাব না দিয়েই তার জায়গায় চলে গেল। সেটা শেষের দিক দিয়ে দ্বিতীয়। সেখানে কোরাবলিওভার পাশে সে বসে পড়ল।

'তোমার কাছে খাবার আছে কিছু?' ফিদোসিয়া উঠে মাসলোভার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। মাসলোভা কোন জবাব দিল না। কিন্তু রুটিটা বিছানার ওপর রাখল; আর নোংরা ঢিলে জামা ও কোঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথা থেকে রুমালটা খুলে ফেলল।

যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বাচ্চা ছেলেটার সাথে খেলছিল সে উঠে এসে মাসলোভার সামনে দাঁড়াল। তারপর মাথাটাকে করুণভাবে নাড়িয়ে জিভে শব্দ করতে লাগল, 'টক্‌ টক্‌ টক্‌।'

ছেলেটিও তার সাথে এল, আর ওপরের ঠোঁটটা বের করে মাসলোভা যে

রুটিটা এনেছে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আজ তার ওপর এত কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর যখন মাসলোভা এইসব সহানুভূতিশীল মুখ দেখতে পেল তখন তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, এবং কান্না এসে গেল! তবু বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি আর তার বাচ্চাটা আসার আগে পর্যন্ত সে নিজকে আটকে রাখতে সক্ষম হল, কিন্তু যখন সে বৃদ্ধার মুখে দয়া আর করুণাসূচক টকটক্ শব্দটা শুনল, এবং ছেলেটার গম্ভীর চোখ তার রুটির ওপর থেকে মুখের ওপর এসে থামল, তখন সে আর কোন মতেই সহ্য করতে পারল না, তার মুখ কাঁপতে লাগল, আর হিক্কা তুলে সে কাঁদতে শুরু করল।

কোরাবলিওভা বলল 'আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি একজন ভাল উকিল ঠিক করতে? তা কি হয়েছে, নির্বাসন?'

মাসলোভা জবাব দিতে পারল না। রুটির ভেতর থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করল; তার ওপর গোলাপী রঙে ছাপা একটি মহিলার মুখের ছবি; তার চুল উঁচু করে আঁচড়ানো আর পরনে নিচু কাটিংয়ের পোশাক! কোরাবলিওভাকে সে ছবিটা দিল। কোরাবলিওভা ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কারণ প্রধানতঃ এমন একটা বাজে ব্যাপারে মাসলোভার টাকা খরচ করায় সে সম্মতি দিতে পারল না, যদিও একটা সিগারেট তুলে নিতে ভুল করল না। সিগারেটটা প্রদীপের আলোয় ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলল, তারপর মাসলোভাকে সেটা দিয়ে দিল। ক্রন্দনরতা মাসলোভা লোভীর মত তামাকের ধোঁয়া গিলতে লাগল।

'সশ্রম কারাদণ্ড' ধোঁয়া উড়িয়ে হিক্কা তুলতে তুলতে সে বিড়বিড় করল।

'তারা কি ঈশ্বরের ভয় করে না, অভিশপ্ত আত্মহননকারীর দল কোরাবলিওভা গজগজ করল, 'অকারণে মেয়েটাকে শাস্তি দিল!'

জানলার ধারে যেসব মেয়েরা এখনও বসে রয়েছে সেখান থেকে ঠিক এই সময় কর্কশ জোড়ালো হাসির আওয়াজ এল; ছোট মেয়েটা পর্যন্ত হাসছে। তার শিশুসুলভ জোড়ালো গলা অন্যদের কর্কশ পেঁচার মত হাসির সাথে মিশে গেল। বাইরে কোন আসামী কিছু একটা করেছে যাতে করে দর্শকদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া।

'দেখ, দেখ, লোম ওঠা শিকারী কুত্তা কি করছে!' লালচুলো স্ত্রীলোকটি বলল। হাসির চোটে তার মাংসল দেহটা কাঁপছে। ঝাঁঝরির দিকে ঝুঁকে সে অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে চলেছে।

'উঃঃ মোটা ভরপুকটা প্যাক প্যাক করছে। কি দেখে অত হাসছে?' কোরাবলিওভা বলল। তারপর মাসলোভার দিকে আবার ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কত দূর?'

'চার', মাসলোভা বলল। তার গাল বেয়ে এত চোখের জল গড়াল যে একটা ফোঁটা সিগারেটের ওপর এসে পড়ল। সে রেগে গিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সেটা; তারপর আরেকটা ধরাল।

সেপাইয়ের বউটা যদিও সিগারেট খায় না, তবু—মাসলোভার ফেলে দেওয়া সিগারেটটা সে তুলে নিল, আর অফুরন্ত কথা বলতে বলতে সেটাকে সোজা করতে লাগল।

'তাহলে এটা সত্যি,' সে বলল, "সত্যিই উচ্ছন্নে গেছে দেশটা, তাই তাদের যা ইচ্ছে তাই করছে, আর এদিকে আমরা কিনা ভাবছি যে তুমি মুক্ত হয়ে গেলে।

কোরাবলিওভা বলছিল, "সে ছাড়া পেয়ে যাবে।" কিন্তু আমি বলেছিলাম, "না, আমার মন বলছে তারা তাকে সাজা দেবে।" আর ঠিক হলও তাই' সে বলে চলল, আর স্পষ্টতঃই বেশ খুশির সঙ্গে নিজের কথা নিজেই শুনে চলল।

জানলার কাছে যেসব মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল তারা এখন মাসলোভার কাছে চলে এল। যে আসামীরা তাদের এতক্ষণ ফুর্তি যোগাচ্ছিল তারাও চলে গেল। প্রথমে এগিয়ে এল ফুলো চোখের একজন মহিলা আর তার ছোট মেয়েটি—চোলাই মদের ব্যবসা করার জন্য যাদের জেল হয়েছে।

'এমন কঠোর শাস্তি কেন?' মাসলোভার পাশে বসে দ্রুত উল বুনতে বুনতে মহিলাটি জিজ্ঞেস করল।

'এত কঠোর কেন? কারণ টাকা পয়সা নেই—এই হল কারণ! যদি টাকা থাকত, আর একজন ভাল উকিলকে লাগানো যেত তবে তারা তাকে খালাস দিত নির্ভয়ে,' কোরাবলিওভা বলল। 'ওখানে একজন আছে, কি যেন নাম—আরে সেই লম্বা নাক, মাথা ভর্তি চুল। সে তোমাকে অন্ধকার থেকে বার করে আনত, হুঁ ঠিকই আনত। আহা যদি আমরা তাকে পেতাম।'

খোরোসাভকা তাদের পাশে বসে কষ্ট সহ্য করতে করতে বলল, 'এক হাজার রুবলের কমে সে তোমার দিকে থুথুও ফেলত না, বুঝলে?'

'মনে হচ্ছে অশুভ লগ্নে তোমার জন্ম,' অগ্নিকাণ্ডের জন্য জেল খাটছে যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি সে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি শুধু ভাব সে ছেলের বউকে প্ররোচনা দেওয়া আর পোকামাকড় খাওয়ানোর জন্য তাকে, আর আমাকে, আমার এই বুড়ো বয়সে আটকে রাখা হয়েছে।' সে তার গল্পটা শততম বারের জন্য পুনর্বর্ণন করতে বসল। 'এটা যদি ভিক্ষুকের দঙ্গল না হয় তবে এটা জেলখানাই। হাঁ ভিক্ষুকদের দঙ্গল আর জেলখানা কারও নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না।'

'আহা সকলেরই এক হাল,' চোলাই মদের ব্যবসা করে যে, সে বলল; আর তার ছোট্ট মেয়ের মাথার দিকে তাকিয়ে বোনার কাজটা তুলে ফেলল। বাচ্চাটাকে হাঁটুর মধ্যে টেনে নিয়ে নিপুন হাতে তার মাথার মধ্যে কি যেন খুঁজে চলল। "কেন তুমি মদ বেচ?' সে বলে চলল, 'কেন?—তা দিয়ে কি ছেলেমেয়ের পেট ভরাবে?'

এ কথায় মাসলোভার মদ খাওয়ার ইচ্ছে হল।

'একটু ভদ্‌কা হলেই চলত,' সে জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে আরও কম ঘন ঘন হিক্কা তুলতে তুলতে কোরাবলিওভাকে বলল।

উত্তরে কোরোবলিওভা বলল, 'ঠিক আছে, নাও।'

।। বত্রিশ ।।

মাসলোভা রুটির মধ্যে লুকনো টাকাটা বের করল, তারপর কোরাবলিওভাকে কুপনটা দিয়ে দিল। কোরাবলিওভা পড়তে জানেনা, তবু সে ওটা নিল; নিয়ে খোরোসাভকাকে দেখাল, কারণ, সে লিখতে পড়তে পারে। সে বলল যে ঐ কাগজের স্লিপটার দাম দু রুবল পঞ্চাশ কোপেক। এবার সে ঘুলঘুলিটাতে গিয়ে উঠল কারণ সেখানেই লুকনো রয়েছে ছোট্ট একটা ফ্লাস্কভর্তি ভদকা। ব্যাপারটা দেখে দূরে ছিল যেসব মেয়েরা তারা আরও দূরে পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মাসলোভা নিজের জামা ও রুমালের ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসে রুটি খেতে শুরু করেছে।

'তোমার জন্য চা রেখেছি,' ফিদোসিয়া বলল। তারপর তাক থেকে কম্বলে জড়ানো একটা মগ ও টিনের কাপ বের করল। 'বোধহয় একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' সত্যিই সেটা একেবারে হিম মেরে গিয়েছে। ফলে চায়ের থেকে টিনের গন্ধটাই বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে ; তবু মাসলোভা সবটা চা মগে ঢেলে নিয়ে রুটি দিয়ে খেতে লাগল।

'ফিনাসকা! তুমি এখানে,' ছেলেটিকে এক টুকরো রুটি দিল সে। ছেলেটি এতক্ষণ তারই মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোরাবলিওভা একটা মগ ও ভদ্‌কাটা মাসলোভাকে দিল। মাসলোভা আবার তা থেকে তাকে ও খোরোসাভকাকে খানিকটা খেতে অনুরোধ করল। এই বন্দিনী কজন সেলের বেশ অভিজাত সম্প্রদায় বলে পরিগণিত হয়। কারণ তাদের কাছে সবসময় কিছু না কিছু টাকা থাকেই, ফলে তারা যা-কিছু আনে তা সবাই মিলে ভাগ করে খায়।

এর খানিকটা পরেই মাসলোভা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তারপর খুব জীবন্ত-ভাবে আদালতের যাবতীয় ঘটনা বলতে শুরু করল, সরকারি উকিলের নকল করে দেখতে লাগল, বিশেষ করে, সবাই কিভাবে তাকে অনুসরণ করছিল তা। আদালতে সবাই তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, আর যতক্ষণ না সে বন্দীদের ঘরে এসে পৌঁছল ততক্ষণই যে এই দশা চলছিল—তাও বলল।

'একজন সেপাই তো আমায় বলেই ফেলল, "আরে সবাই তো তোমাকেই দেখতে এসেছে" একজন আবার ভেতরে এল, বাহানা করে জিজ্ঞেস করতে "ঐ কাগজটা কই ?" এ রকম সব ব্যাপার, বুঝলে। আসলে লোকটা মোটেই কাগজ-টাগজ খুঁজতে আসেনি, চোখ দিয়ে আমায় গিলে ফেলতে এসেছিল,' হাত নেড়ে সে বলে চলল। 'ওঃ যেন বিখ্যাত সব শিল্পীর দল !'

'ঠিকই বলেছ,' ওয়াচম্যানের বউয়ের মিষ্টি গলা শোনা গেল। "যেন গুড়ে বসা মাছি সব। এরা সব করতে পারে। এরা রুটি ছাড়া থাকতে পারে, কিন্তু এসব ওদের অবশ্যই দরকার।'

'এখানেও তাই,' মাসলোভা তাকে বাধা দিয়ে বলতে শুরু করল, 'সব একই। সবে তারা আমায় ফিরিয়ে এনেছে অমনি একদল লোক রেল থেকে নেমেই আমার ওপর হাঁ করে পড়ল। উঃ কী জ্বালাতনই যে করল! তাদের হাত থেকে যে কী ভাবে পালাব! সত্যি, সহকারীকে ধন্যবাদ। সে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। একজন তো এমনভাবে গায়ে পড়ল যে আমি আর সামলাতেই পারলাম না।'

'কি রকম দেখতে ?' খোরোসাভকা জিজ্ঞাসা করল।

'কালো, তার ওপর আবার ইয়া গোঁফ।'

'তাহলে বোধহয় সে হবে।'

'সে—কে ?'

'কেন, সেগলভ, সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

'সেগলভ আবার কে ?'

'আরে, ওযে জানেই না দেখছি সেগলভকে। সাইবেরিয়া থেকে দু-দুবার পালিয়েছে, বুঝলে। এখন আবার ধরা পড়েছে। কিন্তু সে ঠিক আবার পালাবে। সিপাইরা সবাই ওকে ভয় পায়,' খোরোসাভকা বলল। সে পুরুষ বন্দীদের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে, ফলে জেলের সব খবরাখবর জানতে পারে। 'ও ঠিক

পালাবে, এ তো জানা কথাই।'

'ও যদি আবার পালায়, তবে আমাদের তো আর সাথে নিয়ে যাবে না!' মাসলোভার দিকে ফিরে কোরাবলিওভা বলল, 'বরং বল তো, উকিল আবেদন করার ব্যাপারে কি বলল? এখন করতে পারলে খুব কাজের হবে।'

মাসলোভা জানাল যে ও ব্যাপারে সে কিছুই জানেনা।

ঠিক এ সময় লালচুলো মহিলাটি অভিজাতদের দলে চলে এল। মোটা চুলে ভর্তি মাথাটা হাত দুটোর নখ দিয়ে চুলকোতে লাগল।

'কাতেরিনা, এ ব্যাপারে আমি তোমায় সব বলতে পারি।' সে শুরু করল, 'তোমাকে লিখে জানাতে হবে যে শাস্তিদান সম্পর্কে তোমার গভীর অসন্তুষ্টি রয়েছে, এবং সেটা মুন্সেফের হাতে দিতে হবে।'

'কি চাও এখানে?' কোরোবলিওভা রেগে গিয়ে বলল 'ভদকার গন্ধ পাচ্ছো? কি, পাচ্ছো? তোমার বকবকানি কে শুনতে চেয়েছে? তোমার উপদেশ ছাড়াই আমাদের চলবে, বুঝলে।'

'তোমার সঙ্গে কেউ কথা বলতে চাইছিনা। অমন নাক ওলটাচ্ছ কেন।'

'ওঃ, ভদকা খাবে। এ জন্যে কিলবিল করতে করতে এসেছ।'

'আরে ওকে খানিকটা দাওইনা,' মাসলোভা বলল। নিজের যা থাকে তা সব সময় সবার সাথে ভাগ করে খাওয়াই তার স্বভাব।

'আমি দিচ্ছি ওকে!'

'কোরাবলিওভার দিকে এগোতে এগোতে লালচুলো স্ত্রীলোকটি বলল, এস। এস! 'তোমাদের মত লোকজন বড় ঘ্যানঘেনে।'

'আসামীদের মত ভয় লাগে ওকে।'

'না ব্যাপারটা যা, তাই বলছি।'

'পেত্‌নি!'

'এ্যাঁ! আমি পেত্‌নি? আসামী! খুনী!' লালচুলো স্ত্রীলোকটি এবার শিউড়ে উঠল।

'এখন যাও তো,' কোরাবলিওভা এবার দৃঢ় স্বরে বলল। কিন্তু লালচুলো মেয়েটি আরও কাছে এল; সাথে সাথে কোরাবলিওভা তার বুকে একটা ধাক্কা মারল। মেয়েটি যেন এরই জন্য অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। এক ঝট্‌কায় সে এক হাতে কোরাবলিওভার চুল টেনে ধরে অন্য হাতে তার মুখে ঘুষি মারতে গেল, কিন্তু কোরাবলিওভা তার হাতটা ধরে ফেলল। তারপর মাসলোভা ও খোরোসাভকা তার হাত দুটো ধরে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সে বুড়ির চুল ছাড়ল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার চুলগুলো হাতে পেঁচিয়ে ধরল। কোরাবলিওভার মাথা একদিকে ঝুঁকে গেল; সে একহাতে ঘুষি চালাতে লাগল; তারপর লালচুলো মেয়েটির হাতটা কামড়ে দিতে চেষ্টা করল। সব মেয়েরা ওদের ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়ে দুজনকে পৃথক করার চেষ্টা করতে লাগল। এমনকি যক্ষ্মা রোগিনীটিও কাশতে কাশতে লড়াই দেখছে। শিশুরা কাঁদতে শুরু করেছে। গণ্ডগোলের শব্দ শুনে জেলার ও মেয়ে-ওয়ার্ডার ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সরে গেল। আর কোরাবলিওভা নিজের মাথা থেকে ছেঁড়া চুলগুলো হাতে নিয়ে—এবং লালচুলো মেয়েটি নিজের হলুদ সেমিজ থেকে ছেঁড়া অংশ দেখিয়ে জোরে জোরে

যে যার কথা বলে চলল।

জমাদার বলল, 'জানি, তোমরা ভদকা খেয়ে এসব করেছ। দাঁড়াও, কালই ইন্সপেক্টরকে খবর দিচ্ছি। বুঝবে তখন। গন্ধ পাচ্ছি না বুঝি? সব বের করে দাও বলছি, তা না হলে বুঝবে ঠ্যালা। তোমাদের ঝগড়ায় মাথা গলানোর সময় আমাদের নেই। যার যার নিজের জায়গায় যাও; চুপ কর।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা হল না। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই মেয়েরা এ ওর সাথে ঝগড়া করে চলল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে দোষারোপ করতে লাগল। শেষে জেলার ও জমাদার সেল ছেড়ে চলে গেল। মেয়েরাও ধীরে ধীরে চুপ করে যেতে শুরু করল। যে যার বিছানায় শুতে গেল, আর বুড়ী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করল।

'জেলের দুই ঘুঘু এবার মিলেছে,' লালচুলো মেয়েটি তক্তায় বসে হঠাৎ কর্কশ গলায় ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে উঠল, আর প্রত্যেকটা শব্দই গালাগাল দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল।

'এরকম বারবার হবে না বুঝলে,' কোরাবলিওভা উত্তর দিল। সেও খানিকটা গালাগাল করল। তারপর দুজনেই চুপ করে গেল।

'যদি আমায় সবাই না ধরত তবে তোমার চোখ দুটো উপড়ে নিতাম।' লালচুলো মেয়েটি আবার শুরু করল, এবং কোরাবলিওভার কাছ থেকেও একই ধাঁচের উত্তর আসতে মোটেই দেরি হল না।

আবার খানিক বিরতি, তারপর আবার গালাগাল। তবে বিরতির মাত্রা ধীরে ধীরে বেড়েই চলল। শেষে একেবারে নিস্তব্ধতা। সবাই বিছানায়। কেউ কেউ নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু বুড়ি তবুও দীর্ঘ প্রার্থনায় ডুবে রইল। সে এখনও মূর্তির সামনে মাথা নুইয়ে পড়ে আছে; আর পুরোহিতের মেয়েতো রক্ষীরা চলে যাওয়ার পর থেকেই ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে চলেছে।

মাসলোভা চিন্তা করতে লাগল যে তাকে এবার থেকে খুব পরিশ্রম করতে হবে। একথাটা সে দুবার শুনেছে। একবার বলেছে বোচকোভা, আর একবার বলেছে লালচুলো মেয়েটি। কিছুতেই সে তার চিন্তা দূর করতে পারছে না। তার পাশেই কোরাবলিওভার বিছানা, সে তার বিছানার দিকে ঝুঁকে এল।

'দেখলে তো,' মাসলোভা নিচু গলায় বলল, 'কে ভেবেছিল এটা? কতজনই তো কতকিছু করছে। তাদের কি-ই বা হচ্ছে।'

'কিছু ভেবো না। সাইবেরিয়াতেও লোক বেঁচে থাকে। তুমি গেলেও খুব মুশকিলে পড়বে না,।' কোরাবলিওভা তাকে সান্ত্বনা দিল।

'জানি, মুশকিলে পড়ব না, তবু কী কষ্টকর যে হবে। আমি তো কখনও এমন চাইনি। আমি চিরকালই স্বস্তিতে থেকে এসেছি।'

'হায়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কে যেতে পারে বল,' কোরাবলিওভা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কেউ পারে না, বুঝলে।'

'জানি গো ঠাকুমা; তবু কী যে কষ্টকর।' তারপর তারা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল।

'আরে, ওলে সরাবার আওয়াজ পাচ্ছ?' কোরাবলিওভা ঘরের অন্য প্রান্ত

থেকে উঠে আসা এক অদ্ভুত শব্দের দিকে মাসলোভার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এটা হচ্ছে লালচুলো স্ত্রীলোকটির চাপা কান্নার আওয়াজ। লালচুলো স্ত্রীলোকটি কাঁদছে; কারণ সে অনেক গাল খেয়েছে আজ। তাছাড়া একটুও ভদকা জোটেনি কপালে; যদিও সেটার খুবই প্রয়োজন ছিল তার; তাছাড়া সে হয়ত এও ভাবছে যে কিভাবে সারাটা জীবন সে শুধু গালই খেয়ে এসেছে। তাকে ঠাট্টা করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, মারা হয়েছে। মনে পড়ছে সেই কারখানার শ্রমিকের সাথে তার প্রণয়ের কথা। তার নাম ছিল ফেদ্কা মোলোদেনকভ। সেটাই ছিল তার প্রথম প্রেম। মনে পড়ছে কিভাবে সে প্রমত্ততার বশবর্তী হয়ে নষ্ট হয়ে গেল, অথচ সেটাই ছিল তার জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই মোলোদেনকভ একদিন মদ খেয়ে এসে তার শরীরের কোমল জায়গাগুলোয় বিষ মাখিয়ে দিল মজা করে। আর যখন সে যন্ত্রণায় কোঁকাতে লাগল, তখন সে ও তার বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়েছিল। এটা মনে পড়ায় তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কেউ শুনতে পাচ্ছে না ভেবে শিশুদের মত সে কাঁদতে শুরু করেছে। নাকে শব্দ হচ্ছে তার। চোখের নোনা জল সে গিলে নিচ্ছে নিঃশব্দে।

'ওর জন্য সত্যিই দুঃখ লাগে।' মাসলোভা বলল।

'সত্যিই, সকলেরই দুঃখ হবে,' কোরাবলিওভা বলল, "কিন্তু আর যেন সে ঘ্যানঘ্যান করতে না আসে।"

॥ তেত্রিশ ॥

পরদিন সকালে নেখল্যুদভের যখন ঘুম ভাঙল, তখন সে এ ব্যাপারে বেশ সচেতন যে তার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এমনকি যা ঘটেছে তা মনে করার আগেই সে সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ ও শুভ বলে মনে মনে গ্রহণ করল।

'কাত্যুসা—তার বিচার!' হ্যাঁ, সে আর মিথ্যে বলবে না, এখন থেকে সব কথা সত্যি বলবে।

অদ্ভুত এক ঘটনা পরম্পরায়, আজ সকালেই মার্শাল দ্য নোবলেসের স্ত্রী মারিয়া ভাসিলিয়েভনার কাছ থেকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত চিঠিটি সে পেয়েছে। এই চিঠিটার তার ভীষণ প্রয়োজন ছিল; কারণ এই চিঠিতে মারিয়া তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে, আর প্রার্থনা জানিয়েছে তার ইপ্সিত বিবাহিত জীবনে সুখি হওয়ার।

'বিয়ে!' পরিহাস করে সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'সত্যিই, ওসব ব্যাপার থেকে বর্তমানে কত দূরে সরে এসেছি।'

এবার তার মনে পড়ল আগের দিন ঠিক করা মনের অভিলাষগুলোর কথা; তা হল, এবার থেকে সে অকপটে সব স্বীকারোক্তি করবে। আর সে যে মারিয়ার স্বামীকে যে কোনও প্রকারে খুশি করতে প্রস্তুত সে কথাটা জানানো। কিন্তু কালকের মত আজ আর এগুলো বলে ফেলা তার কাছে তত সহজ বোধ হচ্ছে না; তাছাড়া যে সম্পর্কে সে নিজেই ভাল মত জানে না তা অপর এক ভদ্রলোককে বলে অখুশি করার দরকারটাই বা কি? বরং যদি তিনি নিজে এসে সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করেন তবে না হয় বলা যাবে। কিন্তু বলার জন্যে গিয়ে সব বলা—না…না…তার দরকার নেই।

আর মিশিকেও সব খুলে বলাটা এই সকালে তার কাছে খুবই অসুবিধেজনক বলে বোধ হল। এক্ষেত্রেও উপলক্ষ্য ছাড়া সে কিছুই বলবে না! এরকম বহু

সাংসারিক ব্যাপার ঘটে থাকে যা সর্বদাই গোপন রাখতে হয়। শুধু একটা বিষয় সে ঠিক করল : ওখানে আর সে যাবে না। এবং যদি তাকে কখনও জিজ্ঞাসা করা হয় কেবলমাত্র তখনই সে সত্যি কথাটা প্রকাশ করবে। তবে কাত্যুসার ব্যাপারে কোন কিছুই সে গোপন করবেন না।

'আমি জেলে গিয়ে তাকে সব কিছু বলব ; তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর যদি প্রয়োজন হয়,……হ্যাঁ, ঠিকই, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাকে বিয়ে করব,' সে মনে মনে ভাবল।

মনের এই বাসনা, তার এই নৈতিক উন্নয়নে, সে সব কিছু ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হল ; ফলে নিজের স্বপক্ষে বড়ই সংবেদনশীল হয় পড়ল।

বহুকাল পরে, আসন্ন দিনটিকে বড় ঘটা করে অভ্যর্থনা জানাল সে। আগ্রাফেনা পেত্রভনা যখন ভেতরে এল, তখন সে তাকে বেশ কঠোর স্বরে বলল (নিজের এই কঠোরতা সম্পর্কে সে আগে সচেতন ছিল না মোটেই) যে, তাকে বা তার কাজকর্মের তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এটা সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই সে এত বড় ও ব্যয়সাধ্য সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বাড়ি ছাড়ার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আগ্রাফেনা তাঁর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কিন্তু এত চাকরবাকর বা এত বাড়াবাড়ির আর দরকার নেই। যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চান করতে পারেন। মা বেঁচে থাকতে যেমন হয়েছিল,—তেমনিভাবে এত জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলুন। আর যখন নাতাশা আসবে তখন ওকে বলবেন, ও সব করে নেবে।' নাতাশা নেখল্যুদভের বোন।

আগ্রাফেনা মাথা নাড়ল। বলল, 'সব সরিয়ে ফেলব ? কেন, ওগুলোর তো আবার দরকার পড়বে।'

'না, না, ওসবের আর দরকারই হবেনা ; বলছি শুনুন, ওদের আর দরকার পড়বে না।' তার মাথা নাড়ার জবাবে নেখল্যুদভ বলল, 'আর, শুনুন, কোর্নেইকে বলে দিন যে ওকে আমি দুমাসের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি, ও চলে যাক ; ওকে আর দরকার নেই।'

'দিমিত্রি ইভানোভিচ, আপনি এমন করছেন কেন ?' আগ্রাফেনা বলল, 'যদি আপনি বিদেশে যান, তবু আপনার কোন না কোন ঘরের দরকার পড়বেই।'

'আপনি ভুল করছেন, আমি বিদেশে যাচ্ছি না। যদি কোথাও যাইতো তা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত কোন পথ!' হঠাৎ সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তাকেও আমি অবশ্যই বলব,' সে ভাবল, 'গোপন করার কিছুই নেই, সবাইকেই আমি বলব।'

'গতকাল আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। আমার পিসি মেরিয়া ইভানোভনার বাড়ির কাত্যুসাকে আপনার মনে পড়ে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে, আমিই তো তাকে সেলাই করতে শেখালাম।'

'সেই কাত্যুসার গতকাল আদালতে বিচার হয়েছে, আমি সে বিচারে একজন জুরি হিসেবে ছিলাম।'

'হায় ভগবান! কী কপাল!' আগ্রাফেনা বিলাপ করল, 'কেন, সে কি করেছিল ?'

'খুন, আর তা আমার জন্যেই।'

'কী আশ্চর্য! আপনি আবার সে ব্যাপারে কি করলেন?' আগ্রাফেনা চোখে হঠাৎ দীপ্তি হেনে বলল। কাত্যুসার সঙ্গে নেখল্যুদভের সব বৃত্তান্তই সে জানে।

'হ্যাঁ, আমি, আমার জন্যেই। আর এ জন্যই আমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা পালটে ফেলেছি।'

'কিন্তু এ আর এমন কি গুরুতর ব্যাপার!' আগ্রাফেনা হাসি চেপে বলল।

'খুবই গুরুতর। তার ওপথে যাওয়ার জন্য আমিই তো দায়ী। তাকে সবরকমে সাহায্য করাই হবে আমার কাজ।'

'সেটা অবশ্য আপনার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষই নেই। সকলেরই এমন হয়; আর যাদের বুদ্ধি থাকে তারা এ ধরনের ব্যাপার ভুলেই যায়।' বেশ গম্ভীরভাবেই কথাগুলো বলল সে। 'কেন যে আপনি পুরো ব্যাপারটা নিজের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন! কি দরকার আপনার! আমি তো শুনেছি যে সে নিজে থেকেই সৎপথ ছেড়েছে। তাহলে দোষটা কার?'

'আমার। আমি চাই গোটা ব্যাপারটাই সংশোধন করতে।'

'সংশোধন তো খুবই শক্ত।'

'সেটা আমার ব্যাপার; কিন্তু আপনি যদি নিজের কথা ভাবেন তো আমার মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী ...'

'না, না, নিজের কথা মোটেই ভাবছি না। আপনার মা আমার সাথে যে ব্যবহার করে গেছেন তা অতুলনীয়। আমি কিছুই প্রত্যাশা করি না। লিজাঙ্কা (তার বিবাহিতা ভাইঝি) তো আমাকে যেতেই বলেছে। আমাকে যখন আর দরকার নেই, তখন আমি চলেই যাব। কিন্তু আপনি যে বিষয়টা এমনভাবে নিচ্ছেন সেটাই খুব দুঃখের। সকলেরই তো এমনি হয়।'

'না, না, আমার সেরকম মনে হয় না। আমি সত্যিই আশা করি যে আপনি এই বাড়ি আর জিনিসপত্রগুলোর বন্দোবস্ত করতে আমাকে সাহায্য করবেন। খামাকা আমার ওপর রাগ করবেন না; আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, নেখল্যুদভের নিজেকে খুব জঘন্য আর ন্যাক্কারজনক বলে মনে হল। অন্যেরা মোটেই সেরকম নয়। আগ্রাফেন আর কোর্নেইয়ের ওপর সে সদয় হয়ে উঠল।

তার ইচ্ছে যে কোর্নেইয়ের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু কোর্নেইয়ের আচার ব্যবহারে এত বেশি উপেক্ষা রয়েছে যে তা আর হয়ে উঠল না।

আদালতে যাবার পথে আগের দিনের সেই একই রাস্তা আর একই ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে, নিজের সমগ্র সত্তার বিশেষ পরিবর্তন অনুভব করে বিস্মিত হল নেখল্যুদভ।

গতকাল পর্যন্ত মিশির সাথে তার বিয়েটা ছিল একান্তই সঙ্গত আর স্বাভাবিক। কিন্তু আজ তা একেবারেই অসম্ভব মনে হল তার কাছে। গতকাল পর্যন্ত সে ভাবত এটা নিছক তার পছন্দের ব্যাপার; আর আজ তার নিজেকেই মিশিকে বিয়ে করার অযোগ্য বলে মনে হল। এমনকি তার সাথে ঘনিষ্ঠতা করাটাও অসঙ্গত বোধ হচ্ছে। 'সে যদি আমার স্বরূপ জানত তাহলে কিছুতেই আমাকে অভ্যর্থনা করত না। এই তো গতকাল পর্যন্তও এক ভদ্রলোকের সাথে তার গায়ে পড়া

স্বভাবের জন্য তাকে দোষারোপ করছিলাম। কিন্তু না, আজ যদি সে আমাকে গ্রহনও করে তবু আমি শান্তি পাবনা, সুখী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ আমার আসল প্রেয়সী তো জেলে আটক রয়েছে। হয়ত আজ কিংবা কালই তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হবে। আমিই তাকে এ-পথে এনেছি, আর সেজন্যেই সে এখন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে; অথচ সেই আমিই কিনা এখন আমার যুবতী স্ত্রীর সাথে আনন্দ উপভোগ করব, অথবা মার্শাল দ্য নোবলেসের (যাকে আমি নির্লজ্জ-ভাবে প্রতারণা করেছি) সাথে স্থানীয় বিদ্যালয়ে তদন্তের ভোট গণনায় ব্যস্ত থাকব; আর তারপর সুযোগ বুঝে তার স্ত্রীর সাথে গোপনে মিলিত হব (কী বিভৎস চিন্তা) নয়ত নিজের ছবি আঁকায় ডুবে যাব—যা কিনা কোনদিনই শেষ হবে না, কেননা এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর মত আমার মধ্যে কিছুই নেই। না, এগুলোর কোনটাই এখন আমি করতে পারি না।' নিজের ভেতরের এই পরিবর্তনে বিভোর হয়ে সে ভাবতে লাগল। আমার কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে উকিলের সাথে দেখা করে তার মতামত জানা, তারপর তাকে দেখতে যাব, সেখানে তাকে সবকিছু খুলে বলব।'

মনে যখন এই ছবিটা ফুটে উঠল যে সে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছে, তাকে সব বলছে, তার প্রতি যে পাপাচার করেছে তা স্বীকার করছে, এবং এও বলছে যে নিজের ক্ষমতানুযায়ী তার জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত, এমনকি সে তাকে বিয়ে করতে চায়,—তখন এক বিশেষ ধরনের মানসিক তৃপ্তি তাকে গ্রাস করতে শুরু করল আর দু চোখ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা।

॥ চৌত্রিশ ॥

আদালতে এসে নেখল্যুদভ গতকালের সেই পেয়াদার দেখা পেল। তাকে জিজ্ঞেস করল, সাজা পাওয়া আসামীদের কোথায় রাখা হয়েছে, আর তাদের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার কাছে দরখাস্ত করতে হবে। পেয়াদা বলল, সাজা পাওয়া আসামী আলাদা আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে, আর যতক্ষণ না তাদের শাস্তি কার্যকরী হচ্ছে ততক্ষণ তাদের সাথে দেখা করার অনুমতি মুন্সেফের ওপরই নির্ভর করছে।

'সভা শেষ হয়ে গেলে আমি নিজে এসে আপনাকে মুন্সেফের কাছে নিয়ে যাব। এখন তিনি এখানে নেই, সভার পরে আসবেন। দয়া করে ভেতরে আসুন; আমরা শুরু করব।'

নেখল্যুদভ পেয়াদাকে তার দয়ালুতার জন্যে ধন্যবাদ দিল ('তাকে দেখে তার আজ খুব করুণার পাত্র বলে মনে হচ্ছে) এবং জুরিদের ঘরে প্রবেশ করল।

সে যখন ঘরে ঢুকল, একজন জুরি ঠিক তখনই বেরোচ্ছেন আদলতে যাওয়ার জন্য। ব্যবসায়ীটি আবার সামান্য একটু জলপান করছে আর ঠিক আগের দিনের মতই বেশ খোশমেজাজে রয়েছে। পুরনো বন্ধুর মতই সে নেখল্যুদভকে আপ্যায়ন করল। এমনকি পিওতর গেরাসিমোভিচের গায়েপড়া ভাব আর অট্টহাসিটাও আজ তার মনে কোন বিরক্তি জাগল না।

গতকালের বন্দীদের সাথে নিজের সম্পর্কের কথাটা জুরিদের বলার ইচ্ছে করছে তার। 'ন্যায়ের দিক থেকে,' সে ভাবল, 'গতকাল বিচারের সময় উঠে দাঁড়িয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করা উচিত ছিল আমার।' কিন্তু যখন অন্যান্য জুরিদের সঙ্গে সে আদালতে ঢুকল, তখন দেখল আগের দিনের মত সেই একই

পদ্ধতি চলেছে। 'আদালত বসছে,' ঘোষিত হল, তারপর কলারের ওপর কারুকাজ করা কোর্ট গায়ে তিনজন মানুষ বেদির ওপর উঠতে লাগল. পিঠ-উঁচু চেয়ারে জুরিরা সেই একইভাবে বসল; সেই রক্ষীরা, সেই একই ছবি, সেই একই যাজক; নেখল্যুদভ অনুভব করল যদিও এটা তার করা উচিত ছিল, কিন্তু গতকালের মত আজও সে এই পবিত্র গাম্ভীর্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না।

বিচারের প্রস্তুতি গতকাল যেমন হয়েছিল আজও তাই। একমাত্র ব্যতিক্রম হল জুরিদের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ আর সভাপতির ভাষণ বাদ দেওয়া।

আজ আদালতের সামনে রয়েছে সিঁধকেটে চুরির এক মামলা। খোলা তরবারি হাতে দুজন রক্ষীর পাহারায়, ধূসর ঢিলে জামা পরনে, ফুলো মুখ, রক্তশূন্য ক্ষীণ বুক, আর রোগা চেহারার কুড়ি বছরের একটি ছেলে। বন্দীর মঞ্চে সে একাই বসল, আর আদালতে যারাই ঢুকল, তাদের প্রত্যেকের দিকে ভ্রূ নিচু করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে তার এক সঙ্গির সাথে একটা আটচালার তালা ভেঙে অনেক পুরনো মাদুর চুরি করেছে, যার দাম তিন রুবল সাতষট্টি কোপেক। অভিযোগপত্র অনুযায়ী এই ছেলেটি যখন তার সঙ্গিটির সাথে যাচ্ছিল তখন একজন পুলিশ তাকে আটকায়। তার কাঁধে ছিল মাদুরের বোঝা। তারা তখনই দোষ স্বীকার করে এবং তাদের দুজনকেই হাজতে আটকানো হয়। ছেলেটির সঙ্গিটি ছিল তালাচাবির কারিগর। সে জেলখানার ভেতরেই মারা যায়। তাই এখন ছেলেটির একারই বিচার হচ্ছে। সাক্ষ্য প্রমাণাদি হিসেবে পুরনো মাদুরগুলো টেবিলের ওপর রয়েছে।

আগের দিনের পদ্ধতিতে কাজ চালানো হচ্ছে। সমগ্র সাক্ষ্য প্রমাণাদি, প্রতিজ্ঞা, প্রশ্ন, বিশেষজ্ঞ, জিজ্ঞাসাবাদ, সভাপতির প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সরকারি উকিল, অ্যাডভোকেট কিংবা পুলিশের (সাক্ষীদের একজন) অপরিবর্তনীয়ভাবে হয় 'ঠিক তাই' বা 'বলতে পারি না,' কথা দুটো উচ্চারণ চলছে। বুদ্ধিহীনতা আর শৃঙ্খলার দ্বারা যন্ত্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে কথা বলায় তাদের অনিচ্ছা বেশ স্পষ্ট।

আরেকজন সাক্ষী হল, ওই মাদুরগুলোর মালিক খিটখিটে স্বভাবের এক বৃদ্ধ বাড়িওলা। মাদুরগুলো তার কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সাথে সেগুলোকে নিজের বলে সনাক্ত করল। সরকারি উকিল যখন জানতে চাইল যে এই মাদুরগুলো দিয়ে সে কি করত, কি কাজে লাগাত, তখন সে রেগে গিয়ে বলল, 'শয়তানে নিক মাদুরগুলোকে; ওগুলোতে আমার কোন দরকার নেই। যদি জানতাম এগুলোর জন্য এত ঝামেলা হবে তবে কক্ষণোই ওগুলোকে তালাবন্দী করতাম না; বরং দশ রুবলের একটা কি দুটো নোট দিয়ে দিতাম যাতে আমাকে এখানে টেনে এনে এসব প্রশ্ন করে বিরক্ত করা না হয় তার জন্য। একমাত্র ঘোড়ার গাড়ির জন্যই আমাকে পাঁচ রুবল খরচা করতে হয়েছে! তাছাড়া আমি সুস্থও নই; আমি হার্নিয়া আর শ্লেষ্মায় ভুগছি।'

এটাই হচ্ছে সাক্ষীর কথা। অভিযুক্ত নিজেই সব স্বীকার করে, ফাঁদে পড়া জন্তুর মত, বোকার দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে আর ভাঙা ভাঙা গলায় আদ্যপ্রান্ত সব কি করে ঘটল তার বর্ণনা দিচ্ছে।

মামলা একেবারে পরিষ্কার, কিন্তু সরকারি উকিল আগের দিন যেমন

করেছিলেন তেমনিভাবে আজও কাঁধটা উঁচু করে হিসেব করতে লাগলেন কি করে এক ধূর্ত অপরাধীকে ফাঁদে ফেলা যায়।

তার বক্তৃতার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে চুরিটা একটি আবাসিক পল্লীতে ঘরের তালা ভেঙে করা হয়েছে; সুতরাং যুক্তি দেখালেন যে, ছেলেটির কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।

আসামীর পক্ষ সমর্থনকারী উকিল বলছেন যে চুরিটা কোন আবাসিক পল্লীতে সংঘটিত হয়নি। আর যেহেতু আসামী অপরাধটা অস্বীকার করেনি সেইহেতু সরকারি উকিল তাকে সমাজের পক্ষে যতটা ভয়াবহ বলে বর্ণনা করছেন সে আসলে ততটা ভয়াবহ নয়।

গতকালের মতই চূড়ান্ত নিরপেক্ষতা ও ন্যায়ের ভূমিকা ধারণ করলেন সভাপতি। জুরিরা যে সব ঘটনা জানেন এবং যা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার আর কোন প্রয়োজনই নেই সেই ঘটনাগুলোই আবার তিনি ব্যাখ্যা করে চললেন; আগের দিনের মতই এক সময় আদালত মুলতুবি হল, এবং সবাই ধূমপান শুরু করলেন; আবার পেয়াদা চিৎকার করল, 'আদালত বসছে।' আর ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে দুজন সৈন্য আগের দিনের মতই খোলা অস্ত্র হাতে বন্দীদের পাহারা দিতে লাগল।

মামলার কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেটিকে তার বাবা এক তামাকের কারখানায় শিক্ষানবিস হিসেবে ঢুকিয়েছিল, এবং সে সেখানে পাঁচ বছর ছিল। কিন্তু এ বছর একটা ধর্মঘটের পর তাকে বরখাস্ত করা হয়। ফলে চাকরি খুইয়ে সে শহরে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তার হাতে জমা টাকা মদ খেয়ে শেষ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ একদিন শুঁড়িখানায় তার মতই একজন বেকারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে ছিল তালার কারিগর আর মাতাল। একদিন রাতে দুজনে মিলে মদ খেয়ে একটা ঘরের তালা ভেঙে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু পরে ধরা পরে সব কথা স্বীকার করে এবং হাজতে যায়। সেখানে বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন তালার কারিগরটির মৃত্যু হয়। ছেলেটির এখন বিচার করা হচ্ছে একটি মারাত্মক জীব হিসেবে, কারণ, তার হাত থেকে এ সমাজকে রক্ষা করতেই হবে।

তার সামনে যা চলছে তার সবকিছু শুনে নেখলুদভ ভাবল, গতকালের আসামীর মতই এ মারাত্মক। তারপর ভাবল, 'তারা মারাত্মক; আর আমরা, যারা তাদের বিচার করছি, তারা মারাত্মক নয়? আমি—একটা লম্পট, ঠগ—আর আমরা সবাই, যারা আমাকে জানে যে আমি কি. তারা কি আমাকে শুধু ঘৃণাই করে, নাকি শ্রদ্ধাও করে? কিন্তু এই ঘরে যত লোক সমবেত হয়েছে, তাদের মধ্যে এই ছেলেটিই যদি সমাজের পক্ষে সব থেকে ক্ষতিকর হয় তবে সে ধরা পড়ার পর আমাদের ঠিক কি করা কর্তব্য?

'এটা পরিষ্কার যে সে বিশেষ ধরনের দুষ্কৃতকারী নয় বরং অতি সাধারণ একটি ছেলে—সকলেই তা দেখেছে—আর সে যা হয়েছে তার সহজ কারণ হল, যে পরিবেশে সে পড়েছিল সে পরিবেশে এ ধরণের চরিত্রই তৈরি হয়। সুতরাং এইসব ছেলেদের খারাপ হওয়া আটকাতে গেলে, যে পরিবেশে এইসব হতভাগ্যদের জন্ম হয় সেটাকেই নিশ্চিহ্ন করা দরকার।

'কিন্তু আমরা কি করছি ? ঘটনাক্রমে এই যে ছেলেটি আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, এরকম আরও হাজার হাজার ছেলে এখনও ধরা পড়েনি এটা জেনেও আমরা তার ওপর শিকারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তাকে জেলে পুরে সম্পূর্ণ অলস থাকার ব্যবস্থা করেছি, আর তার মত দুর্বল ও পতিত কিছু লোকের সাথে তাকে অর্থহীন অস্বাস্থ্যকর কাজ করতে বাধ্য করছি। তারপর তাকে জনতার খরচায় চালান দিচ্ছি মস্কো থেকে ইয়াকুটস্ক গুর্বেনিয়া পর্যন্ত একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যাক্তির সাথে।

আমরা যে শুধু যে অবস্থায় এ ধরনের লোকেরা জন্মাতে বাধ্য তা দূর করার জন্য চেষ্টা করছিনা তাই নয়, এমনকি যে সব সংগঠন এই পরিবেশকে মদত যোগাচ্ছে সেগুলোকেও পর্যন্ত উৎসাহিত করছি। আর এ ধরনের সংগঠনগুলোও খুব পরিচিতঃ কল-কারখানা, দোকান, শুঁড়িখানা, আমোদ প্রমোদের জায়গা, বেশ্যাখানা ইত্যাদি। আমরা যে কেবল এ ধরনের সংগঠনকে টিকিয়েই রাখছি তাই নয় এমনকি এগুলোকে উৎসাহ দিই, চালাই। আর সমাজের পক্ষে একটা অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গণ্যও করি।

'এভাবেই আমরা একটা নয়, দুটো নয়, লক্ষ লক্ষ এমনি মানুষের জন্ম দিচ্ছি। আর তারপর যখন তাদের একজনকে ধরা হচ্ছে তখন মনে করছি যে বিরাট একটা কিছু করে ফেললাম, এবং তাকে মস্কো থেকে ইয়াকুটস্কে চালান করে ভাবছি যে আমাদের কাছ থেকে আর কিছুই চাওয়ার নেই এ সমাজের।' কর্ণেলের পাশে বসে এ্যাডভোকেট, মুন্সেফ ও সভাপতির কণ্ঠধ্বনি আর আত্মতৃপ্ত ভাব লক্ষ করতে করতে অসাধারণ প্রাঞ্জলভাবে নেখলুদভ ভেবে চলল। 'কিন্তু এইসব ভানের জন্য কী প্রচণ্ড চেষ্টাই না করতে হয়েছে।' বিরাট ঘরটার চারদিকে ছবি, বাতি, হাতওলা চেয়ার, ইউনিফর্ম, পুরু দেওয়াল, আর জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল। বাড়িটা এমনকি সংগঠনটার বিরাট আকার সম্পর্কেও সে আজ সচেতন। সৈন্যবাহিনী, কেরানির দল, সেপাই, দূতেরা শুধু এখানেই নয় সারা রাশিয়াতেই ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের সামান্য উপকারেও যা আসে না তেমনি কিছু ভাড়ামিতে অংশ নেওয়ার জন্য তারা নিয়মিত মাইনে নিচ্ছে। সে ভাবল, 'কি হত, যদি এ ব্যাপারে যে উদ্যম নষ্ট হচ্ছে তার একশ ভাগের এক ভাগও এই অধঃপতিত মানুষগুলোকে সাহায্য করার জন্য ব্যয়িত হত? আমাদের শান্তির জন্য এতগুলো হাত আর শরীরের কি একান্তই প্রয়োজন?

'ছেলেটি যখন অভাবের তাড়নায় শহরে এসেছিল তখন যদি ঘটনাচক্রে কেউ তাকে সাহায্য করত তবে সেটাই হত যথেষ্ট।' ছেলেটির অসুস্থ মুখের দিকে তাকিয়ে নেখলুদভ ভাবল। 'কিংবা এমনকি পরেও, বার ঘন্টা কারখানায় কাজ করার পর সে যখন তার পুরনো সঙ্গির সাথে শুঁড়ীখানায় যাচ্ছিল, তখনও যদি কেউ এসে তাকে বলত যে "যেও না ভানিয়া, এটা ঠিক নয়," তবে সে হয়ত আর খারাপ রাস্তায় যেত না, হয়ত আর কোন অন্যায়ও করত না।

'কিন্তু না, শিক্ষানবিসির বছরগুলোতে সে যখন অসহায় একটা জন্তুর মত জীবন কাটাচ্ছিল তখন তার সাথে এমন কারও সাক্ষাৎ ঘটেনি যে কিনা তাকে সামান্য করুণা করতে পারত। যাতে চুলে উকুন না জন্মাতে পারে সে জন্য চুলগুলো খুব ছোট ছোট করে কেটে সে দিনরাত খাটিয়ে লোকজনদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করত, শহরে আসার পর থেকে তার দোস্ত, ইয়ার আর বয়স্ক মজুরদের কাছে সে

দেখে আর শুনে আসছে যে, যারা মানুষকে ঠকায়, মদ গেলে, দিব্যি খালে, মারপিট করে, আর বেশ ঢিলেঢালা জীবন কাটায়—সেই হচ্ছে চমৎকার মানুষ।

'অস্বাস্থ্যকর মজদুরী,—মদ্যপান আর লাম্পট্যের ফলে তার শরীর মনের হাল দিন দিন খারাপ হয়ে যেতে থাকে; শহরের পথে পথে সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়; তারপর একদিন স্বপ্নের মধ্যে দিশেহারা হওয়ার মত কোন একটা আটচালায় ঢুকে পড়ে কারও কাজে আসবে না এমন কিছু পুরনো মাদুর নিয়ে সরে পড়ে। আর আমরা একদল সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ, যে কারণগুলো এই অবস্থায় ছেলেটিকে আজ এ অবস্থায় এনে ফেলেছে সেগুলোকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে চিন্তা না করে, উলটে তাকে শাস্তি দিয়ে সব ঠিক করবার চেষ্টা চালাচ্ছি।

'ভয়ঙ্কর! কেউ জানেনা এখানে কোনটা মহত্তর—নিষ্ঠুরতা না নির্বুদ্ধিতা। তাদের সকলের কাছেই এটা যেন এক বৃহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে।'

নেখল্যুদভ এইসব ভাবছে। কে কী বলেছে তার কিছুই সে শোনেনি। তার নিজের ভেতর যে তোলপাড় হচ্ছে তাতে সে নিজেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। সে বুঝতেই পারছেনা যে আগে কেন এসব ব্যাপার সে বুঝতে সক্ষম হননি; আর অন্যেরাই বা কেন এখনও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

বিরতির সময় নেখল্যুদভ উঠে পড়ে দরদালানের দিকে এগিয়ে চলল আদালতে আর ফিরে আসবে না ঠিক করেই। ছেলেটিকে নিয়ে ওরা যা করতে চায় করুক, এই জঘন্য ভয়ঙ্কর ভাঁড়ামির ভেতর সে আর থাকবে না।

মুন্সেফের দপ্তরটা কোথায় তা জেনে নিয়ে সে সোজা সেই দিকে চলল। বেয়ারা তাকে ঢুকতে দিতে চাইল না এই বলে যে মুন্সেফ ব্যস্ত আছেন, কিন্তু নেখল্যুদভ কোন কথায় কান না দিয়ে দরজার দিকে এগোল। দরজার মুখে এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে তার দেখা হতে সে তাকে মুন্সেফকে গিয়ে একথা জানাতে বলল যে সে জুরিদের একজন; মুন্সেফের সাথে তার খুব জরুরী কথা রয়েছে।

তার পদমর্যাদা আর ভাল জামাকাপড় তাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সাহায্য করল। সরকারি কর্মচারীটি মুন্সেফকে তার কথা জানাল, এবং সে ভেতরে ঢুকতে পেল। সে জিদ ধরে ভেতরে আসাতে মুন্সেফ যে বেশ বিরক্ত হয়েছেন সেটা বোঝা গেল, যখন তিনি তার সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বললেন, তা দিয়ে।

'কি চান?' মুন্সেফ কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি জুরিদের একজন, আমার নাম নেখল্যুদভ, বন্দিনী মাসলোভার সাথে দেখা করাটা আমার বিশেষ প্রয়োজন।' নেখল্যুদভ দৃঢ়স্বরে অথচ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কথাটা বলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল যে সে এমন এক কদম ফেলল যা কিনা তার জীবনকে এক নতুন পথে চালিত করবে।

মুন্সেফকে দেখতে বেশ ছোটখাটো। কালো রঙ, ছোট করে ছাঁটা ধূসর চুল, উজ্জ্বল চোখ, আর ঘন দাড়িতে পরিপূর্ণ নিচের চোয়াল।

'মাসলোভা? হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে। বিষ-প্রয়োগে অভিযুক্তা,' শান্তভাবে মুন্সেফ বললেন। 'কিন্তু আপনি কেন তার সাথে দেখা করতে চাইছেন?' তারপর যেন প্রশ্নের ধার কিছুটা কমানোর জন্যই যোগ করলেন, 'আপনার প্রয়োজনটা কি তা না জেনে তো আর আমি আপনাকে তার সাথে দেখা করার

অনুমতি দিতে পারি না।'

'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণেই আমি তার সাথে দেখা করতে চাইছি।' নেখল্যুদভ ধীরে ধীরে লাল হতে শুরু করেছে।

মুন্সেফ চোখ তুলে বেশ মনোযোগের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তা তার মামলার শুনানী শেষ হয়েছে, না হয় নি?'

'গতকাল তার বিচার হয়েছে, এবং বিচারে অন্যায়ভাবে তাকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে; অথচ সে নিষ্পাপ।'

মাসলোভার নিষ্পাপতা সম্পর্কে নেখল্যুদভের বক্তব্যে কান না দিয়ে মুন্সেফ বলে চললেন, 'আচ্ছা? যদি গতকাল সাজা হয়ে থাকে তবে সে এখনও নিশ্চয় আগের জেলেই আটক রয়েছে—যতক্ষণ না পাকাপাকি আকারে সাজা পাঠানো হচ্ছে ততক্ষণ তাই থাকবে। কোন কোন বিশেষ দিন সেখানে বন্দীদের সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়। আমার মতে, আপনি সেখানে গিয়েই খোঁজ করুন।'

'কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তার সাথে অবশ্যই দেখা করব।' নেখল্যুদভ বলল; তার চোয়াল কাঁপতে লাগল যখন সে অনুভব করল যে সেই নির্দ্ধারক মুহূর্তটা দ্রুত আসছে।

বেশ অধৈর্যের সঙ্গে ভ্রূ তুলে মুন্সেফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আপনি অবশ্যই দেখা করবেন?'

'কারণ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে; আর এটা হয়েছে শুধু আমার দোষেই।' যা বলার দরকার নেই তা বলে ফেলেছে অনুভব করে, হঠাৎ তার গলার স্বরটা কেঁপে উঠল।

'কিভাবে?' মুন্সেফ জানতে চাইলেন।

'কারণ আমিই তার সতীত্ব নাশ করে তাকে বর্তমান অবস্থায় এনে ফেলেছি। আমি যদি না তাকে ঠেলে দিতাম তাহলে সে কখনই এমন হত না, এবং এরকম একটা অভিযোগে ধরাও পড়ত না কখনও।'

'যাই হোক, আমি এরমধ্যে তার সাথে আপনার দেখা করার কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি তাকে অনুসরণ করতে চাই, এবং···তাকে বিয়ে করতে,' নেখল্যুদভ তোতলাতে লাগল, নিজের আচরণে নিজের চোখে জল এসে গেল তার।

'সত্যি! হায় ভগবান!' মুন্সেফ বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই একটা অসাধারণ ঘটনা। আমার বিশ্বাস যে আপনি ক্রাসনোপারস্ক গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থার সভ্য?' তিনি এমনভাবে হঠাৎ কথাটা জিজ্ঞেস করলেন যে মনে হল যেন হঠাৎই তার মনে পড়ে গেছে এই নেখল্যুদভের কথা, যার নাম তিনি আগেও শুনেছেন।

বেশ রাগত কণ্ঠে নেখল্যুদভ উত্তর দিল, 'মাফ করবেন, আমার কিন্তু মনে হয় না যে আমার অনুরোধের সাথে ও ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে।'

'নিশ্চয়ই না,' বেশ দুর্লভ হাসি হেসে একটুও লজ্জিত না হয়ে মুন্সেফ বললেন, 'তবে আপনার ইচ্ছেটা তো একেবারেই অসাধারণ, তাই।'

'আচ্ছা আমি কি অনুমতি পেতে পারি?'

'অনুমতি? হ্যাঁ, আমি আপনাকে এক্ষুণি ভেতরে যাওয়ার অনুমতিপত্র দিচ্ছি; বসুন।'

মুন্সেফ টেবিলের কাছে গিয়ে বসে পড়ে লিখতে লাগলেন। বললেন, "অনুগ্রহ করে বসুন।'

নেখল্যুদভ দাঁড়িয়েই রইল।

একটা প্রবেশপত্র লিখে নেখল্যুদভের হাতে দিয়ে মুন্সেফ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি আপনাকে এটাও জানাচ্ছি যে আমার পক্ষে আর কোন মতেই আদালতের বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

'এরজন্য যে আপনাকে আদালতের সামনে যথেষ্ট কারণ দেখাতে হবে সেটা নিশ্চয় আপনি জানেন।'

'আমার কারণগুলো হচ্ছে এই যে, আমি বিশ্বাস করি, সমস্ত বিচার ব্যবস্থা-টাই যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, সেটা নীতিহীনও বটে।'

আবার সেই দুর্লভ হাসি হেসে, যেন এ ধরনের ঘোষণা তার কাছে খুবই পরিচিত আর বেশ মজার বিষয়, মুন্সেফ বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একজন মুন্সেফ হিসেবে আপনার সাথে এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারি না। সুতরাং আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি আদালতের কাছে আবেদন করতে; কারণ, আদালতই আপনার ঘোষণা বিচার করে ঠিক করবে তা বৈধ না অবৈধ; এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তারাই আপনার ওপর জরিমানা ধার্য করবে। সুতরাং আপনি আদালতের কাছেই দরখাস্ত দাখিল করুন।

নেখল্যুদভ রাগতভাবে বলল 'আমি আমার ঘোষণা করেছি, সুতরাং কোথাও আর দরখাস্ত করব না।'

মুন্সেফ মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে শুভ সন্ধ্যা।' স্পষ্টতই এই অদ্ভুত সাক্ষাৎ প্রার্থীটির হাত থেকে তিনি নিস্তার পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

নেখল্যুদভ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরই আদালতের একজন সভ্য ঘরে ঢুকে মুন্সেফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ আপনার এখানে কে ছিলেন?'

মুন্সেফ বললেন, 'নেখল্যুদভ; আপনি তাকে চেনেন; সেই যে লোকটি ক্রাসনোপাস্কের গ্রাম্য সভায় অদ্ভুত বক্তৃতা করতেন। তিনি একবার কল্পনা করুন! তিনি জুরিতে রয়েছেন, আর বলছেন কিনা যে বন্দীদের মধ্যে সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত একটি স্ত্রীলোকের সতীত্ব তিনিই নাশ করেছেন, আর এখন তাকে বিয়ে করতে চাইছেন।'

'আপনি কি বলছেন!'

'তিনি যা বলেছেন তাই বলছি। ভদ্রলোক এক অদ্ভুত উত্তেজনাময় অবস্থায় ছিলেন।'

'আজ কালকার প্রায় যুবকদের মধ্যে এরকম অস্বাভাবিকতা রয়েছে।'

'তা ঠিক; কিন্তু তিনি তো আর তা নন।'

'না; কিন্তু আপনার সেই বিখ্যাত ইভাশেঙ্কোভ কিরকম ক্লান্তিকর ছিল ভাবুন তো। সে গোটা দিনটা অন্যদের ক্লান্ত করে ছেড়েছিল। শুধু কথা কথা আর কথাই বলে চলেছিল; তা যেন আর শেষই হচ্ছিল না।'

'এ ধরনের লোকগুলোকে সোজা চুপ করিয়ে দিতে হয়, নয়ত সব কাজে বাধা দেবেই।'

।। ছত্রিশ ।।

মুন্সেফের কাছ থেকে নেখল্যুদভ সোজা গিয়ে হাজির হল প্রাথমিক-আটক জেলে। সেখানে মাসলোভা নামের কাউকে পাওয়া গেল না; ইন্সপেক্টর বলল যে সে সম্ভবতঃ অস্থায়ী জেলে রয়েছে। সুতরাং নেখল্যুদভ অস্থায়ী জেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। এই দুটো জেলখানার মধ্যে দুস্তর দূরত্ব থাকায় তার পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সোজা সে দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রক্ষী তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘন্টি বাজাল। ঘন্টির আওয়াজ শুনে কারাধ্যক্ষ এলেন। কিন্তু তিনি নেখল্যুদভের অনুমতিপত্র দেখে বললেন যে ইন্সপেক্টরের অনুমতি ছাড়া তিনি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবেন না। নেখল্যুদভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করার জন্য এগলো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দূর থেকে তার কানে ভেসে এল পিয়ানোর সুমধুর অথচ বেশ জটিল একটা সুর। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি চাকরানী এগিয়ে এসে সামনের দরজাটা খুলে দিতেই সেই পিয়ানোর সুরটা তার কানে এসে প্রচণ্ড ভাবে ঝঙ্কার দিল। এটা হচ্ছে লিৎসজের সেই সুমধুর গৎ, যা অনেকেই বাজাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে আর পারে না। আজ এখানেও সেই একই অবস্থা। নেখল্যুদভ চাকরানীটিকে জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর ঘরে আছেন কিনা। চাকরানী বলল যে, না, নেই।

'তাড়াতাড়ি ফিরবেন কি?'

বাজনা আবার বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আবার শুরু হল। আর সেই বিশেষ তালটা পর্যন্ত এগিয়ে বারবার থেমে যেতে লাগল।

'আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসছি' বলে চাকরানী ঘরের ভেতর গেল।

একটু পরেই সুর কেটে গেল, আর শোনা গেল একটি মহিলার কণ্ঠস্বর, 'ওনাকে গিয়ে বল যে তিনি নেই, এবং আজ থাকবেনও না; বাইরে গেছেন। কেন যে সারাদিন জ্বালাতে আসে—' তারপরই চেয়ার ঠেলার শব্দ হল। বোঝা গেল বিরক্ত পিয়ানোবাদিকা এই অসময়ের সাক্ষাৎকারীকে দু একটা কথা শোনাতে চান।

অসুস্থ চেহারার একটি বিষণ্ণ মেয়ে, নির্বোধ চোখের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছা নিয়ে এগিয়ে এসে ছোট ঘরটায় ঢুকে বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত একজন যুবককে দেখে নরম সুরে বলল, 'বাবা বাড়িতে নেই। অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন; বলুন, কি চান?'

'আমি জেলখানার একজন বন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মনে হয় রাজনৈতিক বন্দিনীর সাথে দেখা করতে চাইছেন?'

'না, রাজনৈতিক নয়। আমি মুন্সেফের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছি।'

সে বলল, 'ওঃ, তাই নাকি? কিন্তু আমি তো ও ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না, আর বাবাও বেরিয়ে গেছেন। আপনি ভেতরে আসুন না, কিংবা সহকারী ইন্সপেক্টরের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন; তিনি তার অফিসেই আছেন। তা, আপনার নাম?'

'ধন্যবাদ।' নেখল্যুদভ তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বের হয়ে এল।

পেছনের দরজাটা বন্ধ হবার আগেই আবার সেই চমৎকার সুরটা বাজা শুরু হল। সুরটা এই জায়গা, এমনকি অসুস্থ মেয়েটি চেহারার সঙ্গেও বড্ড বেশি

বেমানান। বারান্দায় নেমেই তার সাথে এক বিরাট গোঁফওলা অফিসারের দেখা হল, তার কাছেই সে সহকারী ইন্সপেক্টরের খোঁজ করল। ভদ্রলোক বললেন যে তিনিই সহকারী ইন্সপেক্টর; এবং নেখলুদভের অনুমতিপত্রটা দেখলেন। শেষে বললেন, এ ধরনের একটা অনুমতি পত্রের বিনিময়ে তাকে জেলের ভেতরে যেতে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়; তাছাড়া এখন সাক্ষাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বললেন, 'অনুগ্রহ করে কাল সকাল দশটায় আসুন; সে সময় সব সাক্ষাৎপ্রার্থীকেই ভেতরে যেতে দেওয়া হবে। তাছাড়া ইন্সপেক্টরও তখন বাড়িতে থাকবেন। আপনি সাধারণ ঘরে, কিংবা ইন্সপেক্টর যদি অনুমতি দেন তবে অফিসেও বন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

সুতরাং আজ আর নেখলুদভের পক্ষে সাক্ষাৎলাভ সম্ভব হল না। ফলে যাত্রা করতে হল বাড়ির পথে। কিন্তু মাসলোভার সাথে দেখা করার চিন্তায় সে এতবেশি উত্তেজিত যে আদালতের কথা আর তার মনেই পড়ছে না; এবং মুন্সেফ আর সহকারী ইন্সপেক্টরের কথাই বারবার ঘুরে ফিরে উঁকি দিচ্ছে স্মৃতির মণিকোঠায়।

মাসলোভার সাথে দেখা করার জন্য সে মুন্সেফকে সব কথা বলেছে, দু দুটো জেলে গেছে—এইসব চিন্তা তাকে এত বেশি উত্তেজিত করে ফেলেছে যে তার পক্ষে শান্ত হতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। তারপর বাড়িতে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে ডায়রী নিয়ে লিখতে বসল। যা লিখল, তা হল এই:

দু বছর হল আমি আমার ডায়রীতে কিছুই লিখিনি, এবং ভেবেছিলাম যে এ ধরনের ছেলেমানুষি আর কখনও করব না। অবশ্য এটাকে ছেলেমানুষ বলা ভুল হবে; বরং বলা যায় যে এ হচ্ছে নিজের স্বর্গীয় আত্মার সাথে কথা বলা—যে আত্মা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বাস করছে। এতদিন এ আত্মা আমার মধ্যে সুপ্ত থাকাতে কথা বলার মত কেউ ছিল না, কিন্তু আঠাশে এপ্রিল আদালতের জুরি থাকাকালীন একটা অসাধারণ ঘটনায় আমি জেগে উঠি। যে কাত্যুসার সতীত্ব আমি একদিন নষ্ট করেছিলাম তাকে বন্দীর আলখাল্লা পরা অবস্থায় কাঠগড়ায় দেখে চমকে উঠি; এবং আমারই এক বিচিত্র ভুলের জন্য তাকে সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছে। আজ মুন্সেফের অনুমতি নিয়ে জেলে গিয়েছিলাম তার সাথে দেখা করতে, কিন্তু দেখা হয়নি; কারণ জেলের ভেতর ঢোকার অনুমতি পাইনি। তবে তার সাথে দেখা করার জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি তাকে বিয়ে করতেও রাজি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন। এই মুহূর্তে আমার হৃদয় শান্তি আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

দরজার দিকে ঠায় তাকিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছে মাসলোভা। তার সামনে ডিকনের মেয়ে পায়চারি করছে; আর তার মনে চলেছে উথাল-পাথাল ঝড়।

সে ভাবছে, সাখালিনের কোন কয়েদী'কে বিয়ে করার কোন প্রবৃত্তিই আমার মধ্যে নেই; বরং তার থেকে জেলের কোন কর্মচারী, কেরানি, জমাদার, এমনকি জমাদারের সহকারীর সঙ্গেও একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে। 'ওরা সবাই কি ও পথেই চলে না? শুধু আমার হালকা হলে চলবে না, তাহলেই শেষ হয়ে যাব।'

মনে পড়ছে, উকিল, বিচারক আর আদালতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই তার

দিকে কিভাবে বারবার তাকাচ্ছিল! মনে পড়ছে, বার্থার কথা, যে তার সাথে জেলে দেখা করতে এসে বলে গেল যে, যে ছাত্রটিকে কিতায়েভায় থাকাকালীন সে ভালবেসেছিল, সে নাকি বারবার তার কথা জিজ্ঞেস করছিল, খোঁজখবর নিচ্ছিল, আর সহানুভূতি জানাচ্ছিল। লালচুলো স্ত্রীলোকটির সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারটাও তার মনে পড়ছে, এবং মেয়েটির জন্য মনে মনে বেশ করুণা বোধ হচ্ছে। এমনকি মনে পড়ছে সেই রুটি ব্যবসায়ীটির কথা যে তার জন্য অতিরিক্ত একটা রুটি পাঠিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তার মনে পড়ছে না শৈশবের কথা, যৌবনের কথা, আর নেখল্যুদভের প্রতি তার ভালবাসার কথা। তার আত্মার গভীরে সেই স্মৃতি স্পর্শহীন রয়ে গেল। সে তাকে ভুলে গেছে; আর কখনও তাকে মনে পড়েনি—না, এমনকি স্বপ্নেও নয়। আজ সকালে আদালতে সে তাকে চিনতে পারেনি শুধু এই কারণেই নয় যে শেষবার যখন সে তাকে দেখেছিল, তখন তার পরনে ছিল ইউনিফর্ম, ছোট্ট গোঁফ আর কোঁকড়ানো চুল, আর আজ সে বুড়ো হয়ে গেছে—সারা মুখে গজিয়েছে দাড়ি; বরং তাকে চিনতে পারিনি এ কারণেই যে সে তার কথা কখনও ভাবেইনি। তাকে সে চিরদিনের মত স্মৃতির মাটিতে কবর দিয়ে দিয়েছে, সেই কালো রাতে, যে রাতে জানতে পেরেছিল যে সৈন্যবাহিনী দিয়ে ফেরার পথে পিসিদের সাথে দেখা না করেই সে রেলে করে সোজা চলে গেছে নিজের শহরে।

কাত্যুসা তখন জেনে গিয়েছিল যে সে গর্ভবতী। যতদিন তার মনে আশা ছিল যে নেখল্যুদভ ফিরে আসবে ততদিন সে তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকায়িত শিশুটিকে মোটেই বোঝা হিসেবে মনে করেনি, এবং যখন সেটা হঠাৎ হঠাৎ নড়ে উঠে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করত তখন সে মনে মনে বেশ চমকে উঠত, আশ্চর্য হত। কিন্তু সেই কালরাত্রিতে সবকিছুই পালটে গেল, এবং তখন থেকে সেই শিশুটিকে তার বোঝা ছাড়া আর কিছুই মনে হত না।

তার পিসিরা নেখল্যুদভকে প্রত্যাশা করেছিল, এবং বলেছিল ফেরবার পথে সে যেন তাদের সাথে দেখা করে যায়; কিন্তু সে তাদেরকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেয় যে তা সম্ভব নয়, কারণ তাকে পিটার্সবুর্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে হবেই। কাত্যুসা যখন এ খবর শুনল তখন ঠিক করল যে স্টেশনে গিয়ে সে তার সাথে দেখা করবে। ট্রেনের সময় ছিল রাত দুটো। বৃদ্ধা মহিলাদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, রাঁধুনার বাচ্চা মেয়ে মাসকাকে তার সাথে আসতে রাজি করিয়ে, পায়ে একজোড়া পুরনো জুতো পরে, মাথায় একটা লাল শাল জড়িয়ে, জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে সে স্টেশনের পথে রওয়ানা দিল।

সেটা ছিল শরৎকালের ঝোড়ো বর্ষার কালো রাত। এই হঠাৎ বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, আবার পরমুহূর্তেই তা মিলিয়ে যায়। যদিও পথটা ছিল কাত্যুসার অতি-পরিচিত, কিন্তু অন্ধকারের জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না; তাছাড়া বনের পথটা একেবারে পীচের মত কালো হয়ে গিয়েছিল, ফলে সে যেখানে ভেবেছিল যে ট্রেন আসার আগেই গিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে পারবে, সেখানে পথ হারিয়ে যাবার দরুণ, ট্রেনটা যেখানে মাত্র তিন মিনিট অপেক্ষা করে, সেখানে দু দুটো ঘণ্টা বেজে যাবার পর সে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। প্ল্যাটফর্মে ওঠার সাথে সাথেই একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার জানলার মধ্য দিয়ে সে নেখল্যুদভকে দেখতে

পায়। কামরাটা ছিল আলোয় পরিপূর্ণ। ভেলভেটে মোড়া দুটো সিটে দুজন সামরিক অফিসার মুখোমুখী বসে তাস খেলছিল, আর তার মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর দুটো মোমবাতি জ্বলছিল। আঁটোসাঁটো প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরে নেখলুদভ সিটের হাতলের ওপর বসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি কারণে যেন খুব হাসছিল। তাকে চিনতে পারার সাথে সাথেই কাত্যুসা কাঁচের জানলায় তার অসার হাত দুটো দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে দেয়। আর সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ঘণ্টা বেজে ওঠে, এবং পেছন দিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা চলতে শুরু করে। সে সময় একজন খেলোয়াড় হাতে তাসগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকায়। কাত্যুসা আবার ধাক্কা মারে, জানলায় নিজের মুখখানা চেপে ধরে, আর চলন্ত গাড়ির সাথে দৌড়তে দৌড়তে ভেতরের দিকে দেখতে থাকে। সেই অফিসারটি জানলা খোলার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না। তখন নেখলুদভ এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেটা খোলার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি আরও বৃদ্ধি পায়, ফলে কাত্যুসাকে আরও দ্রুত পা চালাতে হয়। তারপর গতি যখন আরও বাড়ে তখন জানলাটা খুলে যায়; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই, গার্ড তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে নিজে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওদিকে কাত্যুসা তখনও ভিজে প্ল্যাটফর্মের পাটাতন বেয়ে ছুটে চলেছে; ছুটতে ছুটতে একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে; তারপর কোনরকমে নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আবার দৌড় শুরু করে। ততক্ষণে প্রথম শ্রেণীর কামরা তাকে অতিক্রম করে গেছে, এরপর অতিক্রম করল দ্বিতীয় শ্রেণী, অবশেষে তৃতীয় শ্রেণীও। শেষে যখন পেছনে লাল আলো জ্বালানো গার্ডের কামরাটাও তাকে অতিক্রম করে গেল, তখন সে পৌঁছে গেছে ইঞ্জিনের জলের কুয়োটার কাছে; আর বাতাসে উড়ে গেছে তার মাথার শাল, পায়ে জড়িয়ে গেছে ঢোলা জামার প্রান্ত—অথচ আশ্চর্য, সে তখনও ছুটেই চলেছে।

সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে তার পিছে পিছে ছুটছিল, সে চিৎকার করে বলল, 'কাতেরিনা, আপনার শালটা উড়ে যাচ্ছে।'

কাত্যুসা তার কথায় থেমে গিয়ে, মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে, দু হাত দিয়ে সেটাকে ধরে চিৎকার করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'সে চলে গেল।' মনে মনে ভাবল, 'সে এমন আলোয় ভরা কামরায় হাতলওলা ভেলভেটের চেয়ারে বসে মদ খাচ্ছে আর ফূর্তি করছে, অথচ আমি এখানে অন্ধকারে ঝড়, বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁদছি।' দুঃখে সে মাটিতে বসে পড়ল, আর এত জোরে ফোঁপাতে শুরু করল যে ছোট মেয়েটি ভয় পেয়ে তাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল; সেও বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল।

মেয়েটি বলল, 'বাড়ি চলুন।'

তার কথায় কান না দিয়ে কাত্যুসা ভেবে চলল, 'যখন ট্রেন যাবে, তখন যদি একটা বগীর তলায় নিজেকে—তাহলেই সব শেষ।' এবং মনে মনে সে তা-ই করবে বলে ঠিক করল; কিন্তু উত্তেজনার পরের মুহূর্তেই যা হয়—সেই শিশুটি, তার শরীরের ভেতরের শিশুটি, হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠে একটা ধাক্কা দিল, নিজেকে ছড়িয়ে দিল ধীরে ধীরে; তারপর আবার মনোরম, পাতলা এবং তীক্ষ্ণ একটা কিছু দিয়ে ঠেলা দিল। সাথে সাথে, একটু আগে যে কারণে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব

বোধ হয়েছিল,—তার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, মৃত্যুর বিনিময়েও প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা—সবকিছু অন্তর্হিত হয়ে গেল। কাত্যুসা শান্ত হল, উঠে দাঁড়াল, শালটা মাথায় জড়াল এবং বাড়ির পথে রওয়ানা দিল।

• ভিজে, কাদায় মাখামাখি হয়ে, সম্পূর্ণ ক্লান্ত শরীর নিয়ে সে বাসায় ফিরল, এবং সেই মুহূর্ত থেকে, যে পরিবর্তন তাকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে সেই পরিবর্তন তার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিল। সেই ভয়ঙ্কর রাতেই সে সমস্ত ভালর ওপর থেকে নিজের বিশ্বাসকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তার আগে সে ভালত্বে বিশ্বাস করত, এবং ভাবত যে অন্যেরাও তাই করে; কিন্তু সেই রাতের পর সে বুঝতে পারল যে কেউই তা করে না; আর বুঝল যে ভগবান ও তার নীতি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তার সবটাই প্রতারণা এবং অসত্য। যাকে সে ভালবেসেছিল, এবং যে তাকে ভালবাসত—অন্ততঃ সে তাই জানত—সে তাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করার পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার ভালবাসাকে কলুষিত করেছে। যদিও তার পরিচিতজনেদের মধ্যে সে-ই ছিল শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, এবং বাদবাকিরা ছিল আরও জঘন্য। পরবর্তীকালে তার জীবনে আর যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে তার এ বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়েছে। যখন পিসিদের সে আর আগের মত সেবা করতে পারছিল না, তখন তারাও তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে যত মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাদের সকলেই তাকে অর্থ রোজগারের মাধ্যম হিসেবে দেখেছে; আর পুরুষেরা, সেই বুড়ো পুলিশ অফিসার থেকে জেলের জমাদার পর্যন্ত সকলেই তাকে মনে করেছে সুখলাভের বস্তু; এবং দুনিয়ায় কেউই সুখ ছাড়া আর কিছুই চাইছে না। যে বৃদ্ধ লেখকের সঙ্গে সে তার স্বাধীন জীবনযাপনের দ্বিতীয় বৎসরটা কাটিয়েছিল—সেও তার এই বিশ্বাসকেই জোরদার করতে সাহায্য করেছে। সে স্পষ্টই বলত যে এর মধ্যেই জীবনের সুখ নিহিত রয়েছে, আর তার নাম দিয়েছিল কাব্যিক ও নান্দনিক।

প্রতিটি মানুষ শুধু নিজের জন্য, আর নিজের সুখের জন্য বেঁচে রয়েছে; ঈশ্বর ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তার সবটাই ভাঁওতা। যদি কখনও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হত, এবং এ ভেবে বিস্মিত হত যে কেন দুনিয়ায় সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে একজনের দ্বারা অপরজন আঘাত পায়—তাহলে সে ভাবত যে এ নিয়ে আর না ভাবাটাই সবচেয়ে ভাল; এবং যদি সে বিষণ্ণ বোধ করত তবে অনায়াসে ধূমপান কিংবা মদ্যপান করতে পারত; নয়ত সব থেকে ভাল হত, কারও সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে সময় কাটিয়ে দিত।

॥ আটত্রিশ ॥

রোববার সকাল পাঁচটায়, যখন জেলের জেনানা ফাটকের চত্বরে একটা বাঁশী বেজে উঠল, তখন কোরাবলিওভা, যে ইতিমধ্যে জেগে গিয়েছিল, সে মাসলোভাকেও জাগিয়ে দিল।

'হা ভগবান! একটা পাষাণী!' আতঙ্কে মাসলোভা ভাবল; অনিচ্ছায় ভোরবেলার দুর্গন্ধপূর্ণ বাতাসে শ্বাস নিল। সে আবার ঘুমোতে চাইল, পুনরায় ঢুকে পড়তে চাইল বিস্মৃতির রাজ্যে। কিন্তু ভীতির অভ্যাসে ঘুম চলে গেল, সে উঠে বসল এবং শরীরের নিচে পা দুটো টেনে; চারদিকে তাকাতে লাগল; সব মেয়েরাই জেগে উঠেছে, শুধু শিশুরা ঘুমোচ্ছে। চোলাই মদের ব্যবসার জন্য যে মেয়েটি

জেল খাটছে সে সন্তর্পণে শিশুদের তলা থেকে টিলে জামা টেনে নিল যাতে তারা জেগে না যায়। যে মেয়েটি চালান খালাস করত সে, যা থেকে শিশুদের কাঁথা বানানো হয়, সেই কম্বলগুলো শুকোবার জন্য টাঙিয়ে দিচ্ছে আর ওদিকে নীল চোখ ফিদোসিয়ার কোলের শিশুটি প্রাণপণ কেঁদে চলেছে, এবং খুব মৃদুস্বরে সে তাকে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা মেয়েটি কাশছে; তার হাত দুটো বুকের কাছে ধরা, মুখে রক্ত উঠে আসছে এবং বেশ জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কাশির মাঝে মাঝে প্রায়ই চিৎকার করে উঠছে। মোটা লালচুলো মেয়েটি হাঁটু মুড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে; জোরে জোরে খুশির মেজাজে একটা স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্তা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ আঁকছে আর মাথা নোয়াচ্ছে, এবং একই কথা বারবার আউড়ে চলেছে। ডিকনের মেয়েটি সামনের দিকে নির্বোধ ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে বিছানার পাটাতনে বসে আছে। খোরোসাভকা তার কালো তেলতেলে আগোছালো চুলগুলো আঙুলে জড়াচ্ছে।

গলিতে চটি জুতোর শব্দ শোনা গেল, আর মোজা অবধি পৌঁছয়নি এমন ধূসর পাজামা ও জ্যাকেট পড়া দুজন আসামীকে ঢোকানোর জন্য দরজাটা খোলা হল। গভীর ক্ষোভযুক্ত মুখ নিয়ে তারা জলের বালতি তুলে সেলের বাইরে নিয়ে গেল। মেয়েরা বাইরের কলে গেল ধোয়াধুয়ি করতে। সেখানে আবার লালচুলো মেয়েটি অন্য সেলের একটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। আবার সেই গালাগালি, চীৎকার আর নালিশ।

বুড়ো জমাদার চিৎকার করে উঠল, 'তুমি কি নির্জন জেলে যেতে চাও?' লালচুলো মেয়েটার মোটা উদোম পিঠে সে এমন জোরে থাপ্পর মারল যে দরদালানের ভেতর দিয়ে তা প্রতিধ্বনিত হল। 'আমি যেন এ সম্পর্কে আর একটাও কথা না শুনি!'

মেয়েটি সোহাগের ঢঙে বলল, 'দেখ দেখ, খেলুড়ে বুড়ো।'

'নাও, এখন জলদি কর, প্রার্থনার জন্য তৈরি হও।'

ইন্সপেক্টর যখন সহকারীকে নিয়ে ভেতরে এলেন, তখন মাসলোভার হাতে চুল বাঁধার কিংবা জামা কাপড় পড়বার আর সময় রইল না।

'তল্লাশির জন্য বেরিয়ে এস' জমাদার চিৎকার করে উঠল।

বিভিন্ন সেল থেকে বন্দীরা বেরিয়ে এসে দরদালানের সামনে দু সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। সব মেয়েকেই তার সামনের মেয়ের কাঁধে হাত রাখতে হল; তারপর সবার গনণা চলল।

গনণা শেষ হলে পর মেয়ে সেপাইরা তাদের সবাইকে গীর্জায় নিয়ে চলল। মাসলোভা আর ফিদোসিয়া বিভিন্ন সেলের শতাধিক বন্দীর লাইনের মাঝখানে রইল। যাদের রঙিন পোশাক আছে, একমাত্র তারা ছাড়া আর সবার পরনেই সাদা ঘাগরা, সাদা জ্যাকেট আর মাথায় সাদা রুমাল। রঙীন পোশাক পরা মহিলারা শিশুসহ তাঁদের শাস্তিপ্রাপ্ত স্বামীদের সাথে মিলিত হবার জন্য যাচ্ছে সাইবেরিয়াতে; সমস্ত সিঁড়িগুলো মিছিলে ভরাট। নরম পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর আর হাসির সাথে থেকে থেকে মিশে যাচ্ছে। মেঝেতে ঘোরার মুখে মাসলোভা তার দুশমন বোচকোভাকে দেখতে পেল, ঠিক সামনেই, আর ফিদোসিয়ার দিকে তার

রাণী মুখটা তুলে ধরল। সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে মেয়েরা কথা বলা বন্ধ করে দিল; তারপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে মাথা ঝাঁকিয়ে খালি গির্জায় ঢুকল। ডানদিকে নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে চলল।

মেয়েরা আসার পর ধূসর ঢিলে জামা গায়ে পুরুষেরা এল। দ্বীপান্তরের জন্য যারা অপেক্ষা করছে, যারা নিজেদের মেয়াদ খাটছে, যারা তাদের প্রাদেশিক প্রশাসন কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছে তারা সকলেই রয়েছে এ দলে। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ জোরে জোরে কাশছে। গির্জার বাঁদিকে আর মাঝখানটায় এরা সবাই ভিড় করে দাঁড়াল।

গ্যালারির ওপরের একদিকে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদেরকে অন্যদের সাথে গির্জায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের মাথার অর্ধেকটা কামানো; পায়ের শিকলির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দেই প্রত্যেকের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। গ্যালারির অন্যদিকে রয়েছে প্রাথমিক আটক বন্দীরা। তাদের পায়ে শেকল নেই, আর মাথাও কামানো নয়।

জেলের গির্জা সারানো এবং সাজানো হয়েছে এক ব্যবসায়ীর অর্থে যে কিনা কয়েক হাজার রুবল ঢেলেছে এর পেছনে। ধূসর আর সোনালী রঙে চিকচিক করছে সারাটা গির্জা।

কিছুক্ষণের জন্য সারাটা এলাকায় নেমে এল অখণ্ড নীরবতা; কেবলমাত্র কাশি, নাকঝাড়া, শিশুর কান্না আর শিকলির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ হল না। কিন্তু শেষকালে মাঝখানে দাঁড়ানো বন্দীরা নড়ে উঠল, পরস্পরকে ঠেলতে লাগল যতক্ষণ না গির্জার মাঝখানে একটা রাস্তা তৈরি হল যেখান দিয়ে জেল পরিদর্শক নেমে এসে সকলের সামনে একেবারে বেদির কাছে তার আসনে বসলেন।

।। ঊনচল্লিশ ।।

প্রার্থনা শুরু হল।

তাতে যোগ দিলেন এরা : প্রথমেই পুরোহিত। সোনালী রঙের অদ্ভুত দর্শন এক অসুবিধেজনক পোশাক পরেছেন তিনি। ছোট ছোট রুটির টুকরো রেকাবিতে সাজানো রয়েছে। তারপর সেগুলোকে তিনি মদের পাত্রে চুবিয়ে দিলেন। ঘনঘন বিভিন্ন নাম ও বিবিধ প্রার্থনা আবৃত্তি করে চললেন। যাজক ই প্রথমে স্লাভ ভাষায় প্রার্থনা পাঠ করলেন। সকলের পক্ষে সে ভাষা বোঝাই সম্ভব নয়। তার ওপর আবার এমন রুদ্ধশ্বাসে পাঠ করলেন যে বোঝা আরও দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। শেষে সবাই পালা করে আসামীদের সাথে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করলেন। প্রার্থনায় সম্রাট এবং তার পরিবারের মঙ্গল কামনাই মূলতঃ প্রকাশ পেল। এই আবেদনগুলোর বারবার পুনরাবৃত্তি করা হল, একসাথে ও ভিন্নভিন্নভাবে অন্য সব প্রার্থনার সাথে। তাছাড়া, দূতের কর্ম থেকে কয়েক স্তবক যাজক অদ্ভুত কৌত পেড়ে পেড়ে পড়তে লাগলেন; ফলে কিছু বোঝা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এরপর, সেন্ট মার্কস অসপেলের একটি অংশ পুরোহিত খুব স্পষ্ট করে পাঠ করলেন। এই গল্পে খ্রীষ্টের একটি কাহিনী রয়েছে। গল্পটি হল : পুনরুত্থানের পর, যীশু, আপন পিতার দক্ষিণ হস্তে উপবেশনের নিমিত্ত স্বর্গযাত্রার প্রাক্কালে, মেরি ম্যাগ-ডালিনকে প্রথম দর্শন দিলেন। তারমধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন তার একাদশ

শিষ্য ও সাতজন শয়তানকে। তিনি নির্দেশ দিলেন, সারা দুনিয়ার গল্পটির প্রচার করা হোক। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, যারা এ গল্প বিশ্বাস করবে না তারা ধ্বংস হবে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে ও দীক্ষা গ্রহণ করবে তারা রক্ষা পাবে। আর, তারা তাদের কর্তব্য হিসেবে শয়তানদের বিনষ্ট করবে ও জনগণের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করবে ; অদ্ভুত এক ভাষায় তারা ভাব প্রকাশ করবে। শয়তানদের শুধুমাত্র তারাই বুঝবে। এমনকি তারা যদি বিষপানও করে তো তাতে মারা যাবে না, বরং সুস্থ থাকবে।

পুজোর মূল বিষয় হল এই অনুমান যে পুরোহিতের টুকরো করা মদে চোবানো রুটির টুকরোগুলো হাত দিয়ে নিপুনভাবে উৎসর্গ করার পর সেগুলো ঈশ্বরের রক্তমাংসে পরিণত হয়ে যায়।

পুজোর এই নিপুন হস্তচালনা এরকম : পুরোহিতের পরনে চটের মত সোনালী পোষাক, ক্রুতলয়ে তার দুহাত ওঠানামা করছে, তারপর হাঁটু মুড়ে বসে মুখ গুঁজে বেদি ও বেদিস্থিত সবকিছুকেই তিনি চুম্বন করছেন। তবে প্রধাণতঃ একটা কাপড়ের দুটো প্রান্ত ধরে বেশ কোমল তালে তালে তাকে দোল খাওয়াচ্ছেন রূপোর ডিস ও সোনার কাপের ওপর। মনে করা হয় যে ঠিক এই মুহুর্তেই মদ ও রুটি রক্তমাংসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সে কারণে পুজোর এই অংশের ক্রিয়াদি খুবই ধীর স্থিরভাবে গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে হয়।

'হে মহিমান্বিতা পবিত্র পূত ঈশ্বর মাতা,' সোনালী বেড়ার আড়াল থেকে পুরোহিত বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন। এই বেড়াটাই গির্জার একটা অংশকে অন্য সব অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। কুমারী মেরির গুণগান যে খুবই সঠিক, সেটা বোঝাবার জন্য গির্জার গায়কবৃন্দ গম্ভীর সুরে গান গাইতে শুরু করল। নিজের কুমারীত্ব না হারিয়েও যিনি খ্রীষ্টের জন্ম দিয়েছেন, সর্বোচ্চ শ্রেণীর দেবদূত সেরাফিমের পরেই যার স্থান সেই চেরুবীমের থেকেও বেশি সম্মান এবং সেরাফিমের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা তার অবশ্যই প্রাপ্য। এরপর রূপান্তরণ সমাধা হয়েছে বলে ধরা হল। পুরোহিত পিরিচের ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনিটা তুলে নিয়ে যে রুটিটা মদে চোবানো হয়েছিল, সেটাকে মাঝখান থেকে চার টুকরো করলেন। তারপর নিজে প্রথম একটা টুকরো খেলেন। এর অর্থ হল এই যে তিনি ঈশ্বরের এক টুকরো মাংস ভক্ষণ করলেন। এরপর খানিকটা রক্তও পান করলেন। অবশেষে পর্দা সরিয়ে বেড়ার মধ্যের দরজাটা উন্মুক্ত করে হাতে সোনার পাত্রটা নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সকলকে অভ্যর্থনা করে, যারা চায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন পাত্র থেকে ঈশ্বরের মাংস ও রক্ত গ্রহণ করতে।

বেশ কিছু শিশুও এই রক্ত এবং মাংস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল।

শিশুদের নামধাম ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়ে পুরোহিত মদে চোবানো এক টুকরো রুটি চামচে দিয়ে তুলে একটি শিশুর মুখের একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রত্যেক শিশুকেই পালাক্রমে এমন করা হল ; আর যাজক তাদের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে খুশিতে সেই গানটা ধরলেন, যে গানের অর্থ হল শিশুরাও ঈশ্বরের মাংস ও রক্ত ভক্ষণ করছে। এরপর, পুরোহিত পাত্রটা নিয়ে বেড়ার ভেতরে গিয়ে বাকি রক্ত আর মাংসের টুকরোগুলো খেয়ে ফেললেন। শেষে বেশ যত্ন সহকারে গোঁফ চেটেপুটে মুখ মুছে নিয়ে পাত্রটাও মুছে ফেললেন।

তারপর বে-সামাল পা ফেলে, বুটের সোলে মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে বেড়ার পেছনে হাঁটতে শুরু করলেন।

এভাবে খ্রীষ্টীয় পূজো অর্চনার মূল অংশগুলো সম্পন্ন হল। কিন্তু দুর্ভাগা আসামীদের সান্ত্বনা দিতে পুরোহিত আবার এক সাধারণ রীতিচর্চা শুরু করলেন। এটা এ রকম : গিলটি করা খোদাই মূর্তির কাছে (কৃষ্ণবর্ণ মুখ ও হাত) তিনি গেলেন। ওখানে জ্বলছে ডজন খানেক মোমবাতি। যে ঈশ্বরকে তিনি ভক্ষণ করলেন তারই প্রতীক এটি। অদ্ভুত কর্কশ স্বরে গুনগুন করে নিম্নোক্ত শব্দগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন : 'মধুরতম যীশু, দূতেরা তোমার গুনগানে ধন্য, ধর্মতাপিত ব্যক্তিদের স্তুতি-ধন্য তুমি। হে সর্বশক্তিমান রাজন, রক্ষা কর আমায়, তুমিই আমার রক্ষাকর্তা। হে সুন্দর শ্রেষ্ঠ যীশু, যে তোমার করুণা প্রার্থনা করে তাকে ক্ষমা কর। হে রক্ষাকর্তা যীশু, হে উপাসনাপ্রসূত যীশু, রক্ষা কর তোমার অনুগামীদের প্রচারকদের ; তুমি তাদেরকে স্বর্গসুখ লাভ করার পথ দেখাও। হে যীশু। সকল মানবের প্রেমিক।'

অতঃপর তিনি থামলেন, নিঃশ্বাস নিলেন, বুকে ক্রুশ আঁকলেন, মাটিতে নত হলেন। এবং উপস্থিত অন্য সকলেও তাই করল—ইন্সপেক্টর, জমাদার আর আসামীরা—প্রত্যেকেই, আর ওদিকে ওপর থেকে শিকলির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ একটানা বেজে চলল।

আবার তিনি বলে চললেন : 'দেবদূতদের স্রষ্টা, শক্তির অধিকর্তা পরমাশ্চর্য যীশু, আমাদের পূর্বপুরুষের উদ্ধারকর্তা। মধুরতম যীশু, আদি পুরুষের প্রশংসা। সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যীশু, রাজনদের শক্তি। সর্বশ্রেষ্ঠ যীশু, ঋষিদের পরিপূর্ণতা। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর যীশু, শহীদদের শক্তি। সর্বাপেক্ষা বিনয়ী যীশু, সাধুদের আনন্দ। সর্বাপেক্ষা করুণাময় যীশু, যাজকদের মধুরতা। সর্বাপেক্ষা দানী যীশু, উপবাসে জিতেন্দ্রীয়। সর্বাপেক্ষা মধুর যীশু, ন্যায়ের আনন্দ। সর্বাপেক্ষা পবিত্র যীশু, কৌমার্যব্রতাবলম্বীদের সতীত্ব। সমস্তযুগের যীশু, পাপীর পরিত্রাণ। ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আমাকে করুণা কর।'

যতবার তিনি 'যীশু' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করলেন তার গলা ততবেশি গোঁ গোঁ করতে লাগল। শেষকালে তিনি একজায়গায় এসে থামলেন, সিল্কের রেখাঙ্কিত জোব্বা তুলে ধরে, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে নতজানু হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সাথে সাথে গায়কেরা গান শুরু করল, 'ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মার্জনা করুন' এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া চুল মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে ঠেলে, শিকলির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে পায়ের গোড়ালিতে কালশিটে ফেলে আসামীরা ঝুঁকে পড়ল, আবার উঠে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ ধরে এই চলল। প্রথমে হল মহিমাকীর্তন, যা শেষ হল ঈশ্বরের স্তোত্র দিয়ে। আসামীরা ক্রুশ আঁকল, আর মাথা নোয়াল ; প্রথমে প্রতি বাক্যের সাথে, তারপর প্রতি দুটি বাক্যে একবার, তারপর তিনটিতে একবার করে। এবং সকলেই বেশ খুশি হল যখন মহিমাকীর্তন সমাপ্ত করে মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বই বন্ধ করে যাজক পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। আর একটা পর্ব বাকি রয়েছে। একটা টেবিলের ওপর থেকে এক প্রান্তে এনামেলের পদক বসানো গিলটি করা একটা বিরাট ক্রুশ তুলে নিয়ে যাজক গীর্জার মাঝখানটায় চলে এলেন। প্রথমে পরিদর্শক সেটাতে চুমো খেলেন, তারপর চুমু খেলেন সহকারী ও সেপাইরা। শেষে

আসামীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল, একজন আরেকজনকে ফিসফিস্ করে গালাগালি দিতে লাগল। যাজক পরিদর্শকের সাথে কথা বলতে বলতে একবার আসামীদের নাকে, একবার মুখে ক্রুশ আর তার হাতটা ঠেলে দিতে লাগলেন; আর তারাও ক্রুশ ও যাজকের হাত এ দুটোকেই চুমু খাবার চেষ্টা করে চলল। এবং এভাবেই পতিত ভ্রাতাদের নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে চালিত খ্রীষ্টিয় ধর্মাচার শেষ হল।

॥ চল্লিশ ॥

যারা এখানে উপস্থিত তাদের কেউই—যাজক আর পরিদর্শক থেকে মাস-লোভা পর্যন্ত—এ ব্যাপারে সচেতন আছেন বলে মনে হয়ই না যে, যীশু, যার নাম যাজক এত অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করলেন, যাকে তিনি এত অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রশংসা করলেন, তিনি যা নিষেধ করেছেন, এখানে তাই করা হচ্ছে। তিনি যে কেবল এই অর্থহীন বেশি কথা বলা আর অধার্মিকের মত রুটি ও মদের ওপর মন্ত্র আওড়াতে নিষেধ করেছিলেন তাই নয় বরং খুব পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বারণ করেছিলেন, যাতে সে অন্য কোন মানুষকে তার প্রভু না বলে; নিষেধ করেছিলেন মন্দিরে প্রার্থনা করতে; শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকেরই নির্জনে প্রার্থনা করা উচিত; মন্দির বানাতে নিষেধ করেছিলেন এই বলে যে তিনি এগুলোকে ধূলিসাৎ করার জন্যই এসেছেন এবং প্রত্যেকেরই উচিত আত্মায় এবং সত্যে প্রার্থনা করা, মন্দিরে নয়। আর সর্বোপরি তিনি যে শুধু বিচার করতে, জেলে পুরতে, পীড়ন করতে, প্রাণ নিতে—যা এখানে করা হয়ে থাকে—নিষেধ করেছিলেন তাই নয়, এমনকি যে কোন ধরনের হিংসাও নিষিদ্ধ করেছিলেন এই বলে যে বন্দীকে স্বাধীনতা দেবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন।

উপস্থিত কেউই এ বিষয়ে সচেতন মনে হল না যে, এখানে যা কিছু চলেছে তার সবটাই চূড়ান্ত অধর্ম; আর এটা হচ্ছে সেই খ্রীষ্টের প্রতিই ঠাট্টা—যার নামে চলছে। শেষের দিকে এনামেলের পদক, এসব ক্রুশ, যা যাজক তুলে ধরেছিলেন জনতার সামনে চুমু খাওয়ার জন্যে, তা আর কিছুই নয়—এখানে আজ যা চলেছে—সেই একই ব্যবস্থার বিরোধিতা করার জন্য যে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করে খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়েছিল—তারই প্রতীক। একথা কেউ এখানে বুঝেছে বলে মনে হয়না। এই যাজকের দল, যারা কল্পনা করছেন, যে তারা খ্রীষ্টের দেহ আর রক্ত খাচ্ছেন রুটি ও মদের আকারে, তারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই তার মাংস ও রক্ত খাওয়ার জন্য দোষী; তবে তা সত্যি সত্যিই খাচ্ছেন আর পান করছেন বলে নয় বরং এইজন্যই যে যাদের সাথে তিনি মিশে আছেন, সেইসব সামান্য মানুষকে তারা ফাঁদে ফেলছেন মহান আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে অতিশয় নিষ্ঠুর পীড়নের হাতে তুলে দিয়ে, আর মানুষের কাছ থেকে মহান আনন্দের সেই স্রোত, যা তিনি এনেছিলেন—তাকে লুকিয়ে ফেলে। উপস্থিত কারও মনে এ চিন্তা একবারও আসছে না।

যাহোক, পুরোহিত তার দায়িত্ব পূর্ণ বিবেকের সাথে পালন করলেন; কারণ শৈশব থেকে তিনি এটাকেই প্রকৃত বিশ্বাস বলে বিবেচনা করতে শিখেছেন যা কিনা প্রাচীনকালের সমস্ত পবিত্র মানুষেরাই মনে করতেন, আর এখনও গির্জা ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব মনে করে থাকে। তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন না যে রুটিটা মাংসে পরিণত হয়ে গেছে; কিংবা এতগুলো শব্দের পুনরাবৃত্তি করাটা আত্মার জন্য একান্তই

প্রয়োজন অথবা ঈশ্বরের দেহের একটা টুকরো তিনি গিলে ফেলেছেন। কারও পক্ষেই এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেকেরই এটা বিশ্বাস করা উচিত। আর তার এই বিশ্বাসে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি শক্তি জোগাচ্ছে তাহলে এই যে এর চাহিদা পূরণের দ্বারা গত আঠারো বছর ধরে তিনি এমন রোজগার করতে সমর্থ হয়েছেন যা কিনা তার পরিবারকে পালন করতে, ছেলেকে জিমন্যাসিয়ামে পাঠাতে. এবং মেয়েকে পাদ্রীদের স্কুলে ভর্তি করতে তাকে সাহায্য করেছে। ডিকনও ঠিক একই ভাবে, এমনকি যাজকের থেকেও বেশি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন ব্যাপারটা, কিন্তু প্রার্থনার সারটুকুও ভুলে যাওয়াতে তিনি কেবল মৃতের জন্যই প্রার্থনা করতে পারেন. আর সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট মূল্য থাকাতে, প্রকৃত খৃষ্টানরা যা সাথে সাথে দিয়ে দেয়, তিনি আহ্বান করলেন, 'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর' বলে। তিনি কথাগুলো বললেন ঠিক তেমনি নিশ্চিন্তে যেমনভাবে অন্য লোকেরা জ্বালানী কাঠ, ময়দা বা আলু বিক্রি করে থাকে। জেল পরিদর্শক আর সেপাইরা, যারা কক্ষনো বোঝেনি কিংবা বিচার করেনি এই মতের অর্থ কি, এবং অন্যরা গির্জায় আসে বলেই নিজেরাও গির্জায় আসে, তারা এটা বিশ্বাস করে এজন্য যে তাদের এটা বিশ্বাস করা উচিত. কারণ কর্তৃপক্ষ এবং জার নিজেও তা বিশ্বাস করেন। তাছাড়া তারা আবছাভাবে (এবং তারা নিজেরা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন) এটা অনুভব করে যে এই বিশ্বাস তাদের বর্তমান নিষ্ঠুর বৃত্তিকে ন্যায়সংগত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের জন্যই এখন তারা যেমন করছে তখন তাদের পক্ষে এটা আরও শক্ত হোত, এমনকি বোধ হয় অসম্ভবই হত যে শান্ত বিবেকে অপর মানুষকে নিজেদের সব ক্ষমতা ব্যবহার করে পীড়া দেওয়া। পরিদর্শকটি এমনই দয়ালু ব্যক্তি যে যদি তিনি এই বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত না হতেন তাহলে যেভাবে এখন বেঁচে আছেন, সেভাবে তারপক্ষে এভাবে বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হত। সুতরাং তিনি অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মাথা নোয়াচ্ছেন, ঈর্ষার সাথে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছেন, স্বর্গীয় সুষমা সংক্রান্ত গানটি গাওয়ার সময় ভাবে মগ্ন হবার চেষ্টা করলেন. শেষে শিশুরাও যখন খৃষ্টের শেষ ভোজনের রুটি ও মদ পেল তখন তাদের একজনকে তিনি তুলে ধরলেন যাজকের দিকে।

বন্দীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে এই গিল্টির মূর্তি. ধর্মীয় পোশাক, মোমবাতি, পানপাত্র, ক্রুশের সারি, অবোধ্য শব্দের পুনরাবৃত্তিতে—'যীশু মধুরতম'—এবং 'ক্ষমা করুন'—এ সবে আছে এক রহস্যময় ক্ষমতা যার দ্বারা জীবনে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ হয় বা পাওয়া যেতে পারে। কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজনই এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট প্রবঞ্চনা ; আর সে কারণে মনে মনে হাসছে।' কিন্তু অধিকাংশই, বহু চেষ্টা চালানোর পর, তাঁদের ইপ্সিত সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে শেষ পর্যন্ত সেগুলো না পাওয়াতে (তাদের প্রার্থনা উত্তর-বিহীনই রয়ে গেছে) এটাই বিশ্বাস করছে যে তাদের অকৃতকার্যতার ব্যাপারটাই ঘটনাচক্রের ফল, আর আর্চবিশপ ও শিক্ষিতদের দ্বারা অনুমোদিত এই সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, যদি তা এ জীবনের জন্য নাও হয় তবু কোন না কোন মাত্রায় অন্তত পরবর্তী জীবনের জন্য তো বটেই।

মাসলোভাও এটাই বিশ্বাস করে। অন্যদের মত সেও অনুভব করে ধার্মিকতা আর নির্বুদ্ধিতার এক বিচিত্র সংমিশ্রন। সঙ্গিনীদের ছাড়া আর কাউকে যাতে

দেখতে না হয় সেকারণে সে রেলিংয়ের ধারে ভিড়ের মধ্যে এসে সবার আগে দাঁড়াল। কিন্তু যখন খ্রীষ্টের শেষ ভোজনের মদ আর রুটি নেওয়ার জন্য সবাই এগোতে লাগল, তখন সে আর ফিদোসিয়াও চলল সামনের দিকে। সেখানে পরিদর্শককে দেখতে পেল আর দেখল তার পেছনে সেপাইদের সাথে এক সারিতে দাঁড়ানো হালকা দাড়ি আর পরিষ্কার মাথাভর্তি চুলওলা এক খুদে কৃষককে। এ-ই হল ফিদোসিয়ার স্বামী। সে তার স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন মাসলোভা তাকে খুঁটিয়ে দেখল আর ফিদোসিয়ার সাথে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলতে লাগল। এবং অন্য সবাই যেভাবে মাথা নোয়াচ্ছে আর ক্রুশ আঁকছে, সেও তাই করে চলেছে।

।। একচল্লিশ ।।

নেখল্যুদভ সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হল। রাস্তার একপাশ ধরে একটি গ্রাম্য কৃষক বিচিত্র ভঙ্গিতে ডেকে চলেছে, 'দুধ, চাই দুধ।'

গতকাল বসন্তের প্রথম বৃষ্টিপাত হয়েছে, আর মাটির যে জায়গাটুকু খোড়া হয়নি সেখানে নতুন ঘাসের মুখ উঁকি দিচ্ছে। বাগানের বটগাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সবুজ তুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চেরী আর পপলার তার লম্বা সুগন্ধি পাতার ভাঁজ মেলে দিয়েছে; দোকান আর বাড়ির জানলাগুলো ঝাড়পোঁছ হচ্ছে।

বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় নেখল্যুদভ দেখল দোকানগুলোর সামনে বেশ ভিড় জমেছে আর কয়েকজন জীর্ণ জামাকাপড় পরা মানুষ হাতে জুতো, তাপ্পি মারা প্যান্ট এবং কাঁধে কোট ঝুলিয়ে বিক্রি করে চলেছে।

আজ রবিবার হওয়াতে, কারখানা থেকে মুক্তি পাওয়া পুরুষের দল গায়ে পরিষ্কার কোট চাপিয়ে, পায়ে চকচকে জুতো পরে, আর মেয়েরা উজ্জ্বল সিল্কের ওড়নায় মাথা ঢেকে, পালিশ করা জ্যাকেটে সেজেগুজে ঝাঁক বেঁধে চলেছে শুঁড়িখানার দিকে। পুলিশেরা, ইউনিফর্মের সাথে হলুদ দড়ি ঝুলিয়ে, পিস্তলসহ ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কিছু বিশৃঙ্খলার খোঁজে যা তাদের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। বুলেভার্ডে নতুন গজিয়ে ওঠা ঘাসের ওপর দিয়ে শিশু আর কুকুরেরা ছুটোছুটি করছে এবং পরিচারিকারা বেঞ্চিতে বসে বেশ মেজাজে খোশ-গল্প চালিয়ে চলেছে।

রাস্তার দু-ধার বেশ ভিজে হলেও মাঝখানটা একেবারে শুকনো; সেখান থেকে গর্‌গর্‌ শব্দে ছুটে চলেছে ভারী গাড়ি, ভাড়াটে গাড়ি আর ট্রাম-ঘন্টা বাজাতে বাজাতে। গির্জার ঘন্টা বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আহ্বান জানাচ্ছে মানুষজনকে এক পবিত্র প্রার্থনায় অংশগ্রহণের জন্য, এই মুহূর্তে ঠিক যেমনটি চলেছে কারাগারের গির্জাটাতে। আর মানুষজনও, তাদের রবিবারের সবথেকে ভাল পোশাকে সজ্জিত হয়ে চলেছে নিজের নিজের পছন্দসই গির্জায়।

ভাড়াটে গাড়িটা নেখল্যুদভকে জেলের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারল না; কিছুটা দূরে জেলে যাবার রাস্তাটার মুখে তাকে নামতে হল।

জেলের থেকে প্রায় একশ পা দূরে এই বাঁকের মুখটাকে ছোট ছোট পোঁটলা হাতে বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডানদিকে বেশ কয়েকটা কাঠের বাড়ি, আর বাঁদিকে রয়েছে সাইনবোর্ড ঝোলান একটা দোতলা গৃহ। সামনে

দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড ইটের তৈরি জেলখানা ; কিন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সেদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বাড়িটার সামনে একজন রক্ষী এদিক-ওদিক পায়চারি করছে, আর কেউ তাকে অতিক্রম করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই হাঁক পেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ডানদিকের কাঠের বাড়িগুলোর দরজার কাছটায়, রক্ষীটির ঠিক উলটো দিকে, গায়ে সোনালী ঝালর লাগানো ইউনিফর্ম চাপিয়ে, হাতে একটা নোটবুক নিয়ে একজন সেপাই বসে রয়েছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তার কাছে গিয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় তার নাম জানাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তা লিখে নিচ্ছে। নেখল্যুদভও তার কাছে এগিয়ে গেল, এবং বলল যে সে কাতেরিনা মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেপাইটি তার নাম লিখে নিল।

নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল, 'কেন ওরা আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না?'

'প্রার্থনা হচ্ছে ; শেষ হয়ে গেলেই আপনাদের ঢুকতে দেওয়া হবে।'

নেখল্যুদভ অপেক্ষমান ভিড়ের দিকে ফিরে এল। ছেঁড়া জামাকাপড় গায়ে, দোমড়ানো টুপি মাথায়, খালি পায়ে, সারা মুখে কাটার দাগওলা একটি লোক ভিড় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল।

বন্দুকধারী রক্ষীটি চিৎকার করে উঠল, 'এই, কোথায় যাচ্ছ?'

বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে লোকটি উত্তর দিল, 'নিজের চরকায় তেল দাও।' তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যদি আমায় যেতে না দাও, তবে আমি অবশ্য অপেক্ষা করতে রাজি আছি ; কিন্তু তারজন্য তোমার হাঁক দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এমনভাবে হাঁক ছাড়ছ যে মনে হচ্ছে যেন আগে সেনাপতি ছিলে।'

লোকটার কথায় সায় দিয়ে জনতা হেসে উঠল। সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রায় প্রতিটি লোকের পরনেই একেবারে ছেঁড়া-ময়লা জামাকাপড় ; অবশ্য দু চারজন যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। নেখল্যুদভের পাশেই একজন পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো শক্ত সমর্থ লাল-চিবুকওলা মানুষ হাতে একটা জামাকাপড়ের পোঁটলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেখল্যুদভ তাকে জিজ্ঞেস করল এবারই সে প্রথম এখানে আসছে কি না। লোকটি বলল যে সে প্রতি রবিবারই আসে, এবং দুজনের মধ্যে কথা শুরু হল। লোকটি একটা ব্যাঙ্কের দারোয়ান ; প্রতারণার দায়ে তার ভাই গ্রেপ্তার হয়েছে, এবং তার সাথে দেখা করবার জন্যই সে এসেছে। সে তার জীবনের সমস্ত কাহিনী নেখল্যুদভকে শোনাল, আর ঠিক যে মুহূর্তে নেখল্যুদভের কাহিনী শোনার জন্য প্রশ্ন করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে, তেজী ঘোড়ায় টানা, রবারের চাকাওলা একটা গাড়ির দুজন সওয়ারি—একটি ছাত্র এবং ঘোমটা মাথায় একজন মহিলা—তাদের মনোযোগ কেড়ে নিল। ছাত্রটির হাতে রয়েছে একটা বিরাট পোঁটলা। সে নেখল্যুদভের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, বন্দীদের কাছে এ রুটিগুলো কিভাবে পাঠানো যেতে পারে। এটা তার প্রিয়ার ইচ্ছা (সঙ্গের মহিলাটি) ; এবং মহিলাটির বাবা-মা তাদের উপদেশ দিয়েছেন বন্দীদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেবার।

নেখল্যুদভ বলল, 'আমিও এখানে নতুন, এই প্রথমবার এসেছি।' তারপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই নোটবই হাতে সেপাইটিকে দেখিয়ে বলল, 'আপনি ওখানে গিয়ে ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন।'

দুজনের কথা বলার সময় ছোট্ট জানলাওলা বিরাট লোহার দরজাটা খুলে

গেল, এবং ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অফিসার একজন সেপাইকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এল। নোটবই হাতে সেপাইটি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, সাক্ষাৎ প্রার্থীদের প্রবেশ এবার শুরু হবে। রক্ষী একপাশে সরে দাঁড়াল, এবং সব সাক্ষাৎ প্রার্থীরা, যেন খুব দেরি হয়ে গেছে, এমনভাবে হুড়মুড় করে ছুটে চলল সামনের দিকে। তারা ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই দরজার পাশে দণ্ডায়মান একজন রক্ষী জোর গলায় গুণে চলল ষোল, সতের …আঠার…। আর ওদিকে আর একজন রক্ষী দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় প্রত্যেককে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুণতে লাগল যাতে তারা যখন আবার বাইরে বেরিয়ে যাবে তখন কেউ ভেতরে থেকে না যায়, এবং পরিবর্তে কোন কয়েদি বাইরে চলে যেতে না পারে। কাকে স্পর্শ করছে সেদিকে না তাকিয়েই সেপাইটি নেখল্যুদভের পিঠে একটা চাপড় মারল ; এবং নেখল্যুদভ এতে মনে মনে বেশ আহত হল। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে সেটা মনে পড়ায় সে নিজেই আবার লজ্জাবোধ করল বিরক্তি আর অসন্তুষ্টির জন্য।

প্রবেশ পথের পেছনেই রয়েছে ছোট ছোট লোহার জানলাগুলো খিলান দেওয়া একটা বিরাট ঘর। এটাকেই বলা হয় সাক্ষাতের ঘর। এখানে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটা বিরাট ছবি দেখে নেখল্যুদভ মনে মনে হতভম্ব হয়ে গেল। ভাবল,' 'এটাকে এখানে কেন রাখা হয়েছে।' অনিচ্ছাকৃতভাবে সে ছবির বিষয়বস্তুকে মুক্তির সাথে যুক্ত করল, বন্দীদশার সঙ্গে নয়।

যারা তাড়াহুড়ো করছে সেই সব সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আগে যেতে দিয়ে নেখল্যুদভ অতি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল ; তার মন ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এই বিরাট বাড়িটায় আবদ্ধ দুষ্কৃতকারীদের কথা চিন্তা করে। কাত্যুসা, এবং গতকাল যে ছেলেটির বিচার হল—তাদের মত নিরাপরাধীরাও এখানে আটক রয়েছে এটা মনে হতেই তার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে উঠল, আর যার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে তার কথা ভাবতেই লজ্জা পেল। ওদিকে ঘরের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কারাধ্যক্ষ কী যেন বলছেন। কিন্তু নেখল্যুদভ নিজের চিন্তায় ডুবে থাকায় সে দিকে কোন মনোযোগই দিল না ; এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মহিলা বন্দিনীদের ঘরের দিকে যাবার পরিবর্তে ঢুকে পড়ল পুরুষ বন্দীদের অংশে।

অতিরিক্ত আগ্রহীদের আগে ঢুকতে দিয়ে সবার শেষে ঢুকল নেখল্যুদভ। ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথে সহস্র মানুষের সমবেত চিৎকার তার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করল ; কিন্তু এর কারণটা কি তা সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করতে পারল না। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর দেখল, ঠিক যেমন চিনির ওপর মাছি বসে, তেমনিভাবে সবাই মিলে ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা জালের বেড়াটাকে ঠেলছে। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা আসলে কি। দরজার একেবারে উলটো দিকের জানলাটার ধারে এসে দেখল, একটা নয়, সাত ফুট ব্যবধানে দু দুটো জালের বেড়া রয়েছে ঘরের মাঝখানটাতে। সেগুলো মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু ; আর তার মাঝখানে পায়চারি করছে সেপাইয়ের দল। জালের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দীরা, আর ঐ পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা। দুটো জালের মাঝখানে সাত ফুটের ব্যবধান থাকায়, কেউই কাউকে কিছু দিতে পারছে না, আর যারা চোখে একটু কম দেখে তাদের পক্ষে অপর প্রান্তের মানুষদের মধ্য থেকে আলাদাভাবে কাউকে চিনে নেওয়া তো সত্যই অসম্ভব। তাছাড়া কথা বলাও শক্ত।

কেননা, চিৎকার ছাড়া কেউ কারও কথা শুনতেই পাবে না।

দু পাশেই জালের ওপর বহুলোক নিজের মুখটা চেপে ধরেছে। স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, সন্তান একে অপরের চেহারাটা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে, এবং দরকারি কথাটা এমনভাবে বলবার চেষ্টা করছে যাতে অন্যজন সেটা বুঝতে পারে।

কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে যার সাথে সে কথা বলছে তাকে নিজের কথা শোনাতে, এবং যেহেতু পাশের লোকটিও ঠিক সেই একই চেষ্টা করে চলেছে, সেহেতু প্রত্যেকেই উচ্চ থেকে আরও উচ্চগ্রামে গলার স্বর তুলছে এবং তার ফলেই প্রচণ্ড চেঁচামেচির আওয়াজ হচ্ছে—যা ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই নেখল্যুদভকে চমকে দিয়েছিল। এ অবস্থায় কান দিয়ে কিছু শোনা সত্যিই অসম্ভব; শুধুমাত্র বক্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং মুখ দেখে বুঝে নিতে হবে যে কি বলা হচ্ছে। নেখল্যুদভের ঠিক পাশেই একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ওড়না সমেত নিজের মাথাটাকে জালের ওপর চেপে ধরে, অর্ধেক মাথা কামানো একটি বিষণ্ণ যুবককে চিৎকার করে কী যেন বলছে। মহিলাটির চিবুক কাঁপছে, আর যুবকটি ভ্রূ তুলে মনোযোগের সাথে তার কথা শুনছে। স্ত্রীলোকটির পাশে কৃষকের পোশাক গায়ে অল্পবয়সের একটি লোক বেশ প্রতৃপ্তির সাথে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কুৎসিত দর্শন পক্ককেশ এক বৃদ্ধের কথা শুনছে। দেখে মনে হচ্ছে সে তার বাবা। তারপর রয়েছে কম্বল গায়ে একটি লোক; সে হাত তুলে চিৎকার করছে আর হাসছে। ঠিক তার পাশেই কাঁধে একটা দামী শাল চড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক মাটিতে বসে কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে তারস্বরে কেঁদে চলেছে। সম্ভবতঃ এবারই সে প্রথম জালের ওপাশে মস্তক মুণ্ডিত, কয়েদির পোশাক পরিহিত বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দারোয়ানটি, যার সাথে নেখল্যুদভ বাইরে কথা বলেছিল। সে তার সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে কথা বলছে একজন টাকমাথা, উজ্জ্বল চোখের কয়েদির সাথে।

যখন নেখল্যুদভ বুঝল যে তাকেও এই পদ্ধতিতেই কথা বলতে হবে তখন তার ভেতর সেই লোকগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ ঘৃণার সঞ্চার হল যারা এ ধরনের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, এবং এটাকেই বাধ্যবাধ্যমূলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে একথা ভেবে বিস্মিত হল যে, মানব অনুভূতির ওপর এমন ঘৃণাব্যঞ্জক আঘাতেও কি কেউ এতটুকু বিরক্ত হচ্ছে না! সৈন্যেরা, পরিদর্শক এবং বন্দীরা এমনভাবে কথা বলছে যে মনে হচ্ছে তারা যেন স্বীকারই করে নিয়েছে যে এ ব্যবস্থাটা একান্তই জরুরী।

মাত্র পাঁচ মিনিট এই ঘরে থাকাকালীন নেখল্যুদভ উপলব্ধি করল এক প্রচণ্ড হতাশা, নিজের ক্ষমতাহীনতা সম্পর্কে সচেতনতা, আর সমগ্র পৃথিবীর থেকে স্বাতন্ত্রতা। সামুদ্রিক দৈহিক অসুস্থতার সঙ্গে তুলনীয় এক মানসিক নৈতিক অসুস্থতা তাকে গ্রাস করে ফেলল।

।। বিয়াল্লিশ ।।

মনে সাহস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে সে নিজেকেই বলল, 'বেশ, আমি যে জন্য এসেছি তা নিশ্চয়ই করব। এখন কি করা দরকার?' সে চারদিকে তাকাল সরকারি কর্মচারীর খোঁজে; একজন পাতলা ছোট্ট মানুষকে অফিসারের পোশাকে জনতার পেছনে ওঠানামা করতে দেখে তার কাছে এগিয়ে গেল।

'আচ্ছা আপনি কি আমাকে বলতে পারেন,' অত্যাধিক ভদ্রভাবে কেটে কেটে বলল, 'কোথায় মেয়েদের রাখা হয়, এবং কোথায় তাদের সাথে দেখা করার

অনুমতি পাওয়া যায় ?'

'আপনি কি জেনানা বিভাগে যেতে চান ?'

'হ্যাঁ, আমি একজন নারীবন্দিনীর সাথে দেখা করতে চাই,' নেখলুদভ কষ্টকর ভদ্রতার সাথে সে বলল।

'ঘরে ঢুকে আপনি একথা বলবেন। কার সাথে দেখা করতে চান ?'

'কাতেরিনা মাসলোভা নামে একজন বন্দিনীর সাথে।'

'সেকি রাজনৈতিক বন্দিনী ?'

'না সে নিছক—'

'আচ্ছা সে কি সাজা পেয়েছে ?'

'হ্যাঁ গত পরশু তার সাজা হয়েছে।' যে তার প্রতি সদয় বলেই মনে হল সেই পরিদর্শকের সুন্দর হাস্যরস নষ্ট করার ভয়ে নেখলুদভ ভীতিবিহ্বল স্বরে বলল।

'যদি আপনি জেনানা বিভাগে যেতে চান তবে এদিকে আসুন,' অফিসার বললেন; নেখলুদভের বেশভূষা দেখে মনোযোগ দেওয়ার উপযুক্ত বলে মনে হল তার। 'সিদোরভ, ভদ্রলোককে জেনানা বিভাগে নিয়ে যাও,' বুকে মেডেল আঁটা, গোঁফওয়ালা একজন কর্পোরালের দিকে ঘুরে বললেন তিনি।

'আসুন।'

এমন সময় জালের কাছ থেকে কার বুক ফাটা আর্তনাদ ভেসে এল।

নেখলুদভের কাছে এখানকার সবকিছুই অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছে এটা যে, যে পরিদর্শক আর জমাদারকে সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, যাদের প্রতি সে নিজেকে কৃতজ্ঞতাভাজন বলে অনুভব করছে তারা হচ্ছে ঠিক সেই মানুষগুলো যারা কিনা বিরাট বাড়িটায় তাদের নিষ্ঠুর কাণ্ডগুলো করে চলেছে।

কর্পোরাল তাকে ঘরের বাইরে বারান্দার মধ্য দিয়ে উলটো দিকের একটা দরজা ডিঙিয়ে সোজা মেয়েদের সাক্ষাৎকারের ঘরে নিয়ে এল।

এই ঘরটাও পুরুষদের ঘরের মতই দুটো তারের জালে বিভক্ত; কিন্তু এটা আরও ছোট। এখানে বন্দিনী আর সাক্ষাৎপ্রার্থী উভয়েরই সংখ্যা কম কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচিতে পুরুষদের ঘরের চেয়ে কোন অংশেই কমতি নয়। দুই জালের মাঝে একই পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ হেঁটে চলেছে; কিন্তু এখানে কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাচ্ছে একজন মেয়ে সেপাই; তার পরনে নীলবর্ডার দেওয়া ইউনিফর্ম জ্যাকেট, হাতায় সোনালী ফিতে, আর নীল বেল্ট। এখানেও, পুরুষদের ঘরের মতই দুদিকের জালের গায়ে মানুষজন সেঁটে দাঁড়িয়েছে। সামনের দিকে নানান পোশাকে শহরের লোকজন, অন্যরা তাদের রঙীন পোশাকে। জালের সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ পায়ের ডগায় ভর দিয়ে সকলের মাথার ওপর থেকে কথা শুনছে, আবার কেউ কেউ মেঝেয় বসে কথা বলছে।

বন্দিনীদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল একজন জিপসি। প্রথমতঃ তার রোগা চেহারার জন্য, দ্বিতীয়তঃ তীক্ষ্ণ চিৎকারের জন্য। তার মাথায় কোঁকড়ানো চুল থেকে রুমালটা নেমে গেছে; বন্দিনীদের মাঝখানে একটা থামের কাছে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোমরের গাঁটে আঁটো করে বাঁধা নীল কোট পরনে একজন জিপসি পুরুষকে দ্রুত অঙ্গভঙ্গির সাথে চিৎকার করে সে কিছু একটা বলছে। জিপসির পাশেই একটি সৈন্য মেঝেতে বসে এক বন্দিনীর সাথে কথা বলছে;

মেয়েটির পাশে সুন্দর দাড়িওলা, লালাভ মুখ এক জোয়ান কৃষক জালের দিকে শরীরটাকে চেপে চোখের জল আটকানোর কষ্টকর প্রচেষ্টায় রত। সুশোভিত চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ এক সুন্দরী বন্দিনী তার সাথে কথা বলছে। এরা দুজন হল ফিদোসিয়া আর তার স্বামী। এদের পাশে এক ভবঘুরে একজন চওড়া মুখো স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলে চলেছে। তারপর দুজন স্ত্রীলোক; তারপর একজন পুরুষ, তারপর আবার একজন স্ত্রীলোক, আর এদের প্রত্যেকের সামনেই একজন করে বন্দিনী।

মাসলোভা এদের মধ্যে নেই। কিন্তু বন্দিনীদের পেছনে জানলার কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, নেখল্যুদভ বুঝতে পারল যে এই সে। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। নির্দ্ধারক মুহূর্তটি আসছে। সে জালের কাছে এগিয়ে গেল এবং তাকে চিনতে পারল। সে নীল চোখো ফিদোসিয়ার পাশে বসে রয়েছে, আর হাসছে। ফিদোসিয়া কি বলছে তাই শুনছে। এখন তার পরনে বন্দিনীর আলখাল্লা নেই, রয়েছে একটা সাদা পোশাক, কোমরের কাছে বেল্ট দিয়ে আঁট করে বাঁধা, আর বুকের কাছটা বেশ ভরাট। ওড়নার নিচ থেকে কালো কোঁকড়ানো চুল বেরিয়ে আছে, ঠিক যেমনটি বেরিয়ে ছিল—আদালতে যখন গিয়েছিল, তখন।

'এক মুহূর্তের মধ্যে যা হওয়ার হয়ে যাবে', নেখল্যুদভ ভাবল 'কিভাবে আমি তাকে ডাকি? নাকি সে নিজেই আসবে?'

মাসলোভা ক্লারাকে প্রত্যাশা করছিল; কিন্তু এ মানুষটা যে তার সাথে দেখা করতে আসতে পারে তা তার মাথায়ই আসেনি কখনও।

'আপনি কাকে চান?' জালের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করছিল যে সেপাইটি সে নেখল্যুদভের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল।

'কাতেরিনা মাসলোভাকে,' নেখল্যুদভ বেশ কষ্টের সাথে উচ্চারণ করল।

সেপাই চিৎকার করল, 'মাসলোভা তোমার সাথে কে একজন দেখা করতে চাইছেন।'

॥ তেতাল্লিশ ॥

মাসলোভা ফিরে তাকিয়ে, মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে, বুক সোজা করে, মুখে সেই পরিচিত প্রস্তুতির চিহ্নসহ জালের কাছে এগিয়ে এসে নেখল্যুদভকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু নেখল্যুদভের সাজপোশাক দেখে তাকে বেশ ধনী মনে হওয়াতে সামান্য হাসল।

সামান্য তেরচা চোখে হাস্যোজ্জ্বল মুখটাকে জালের আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে চাইছেন কি?'

'আমি···আমি···আমি দেখা করতে চাই···মানে···তোমার সাথে...আমি...' স্বাভাবিকের থেকেও নিচু গলায় বলল।

তার পাশ থেকে ভবঘুরেটা চেঁচিয়ে উঠল, 'গাধা কোথাকার! যা বলছি শোন; তুমি এটা নিয়েছ, না নেওনি?'

ওদিক থেকে কে যেন আবার আর্তনাদ করল, 'অত্যন্ত দুর্বল, মরে যাব।'

নেখল্যুদভ কি বলছে তার একটাও কথা মাসলোভার কানে যাচ্ছে না; তবে কথা বলার সময় তার মুখের হাবভাব দেখে তার মনে এমন কিছু স্মৃতি জেগে

উঠল, যা কিনা সে নিজেই আর মনে করতে চায় না। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, আর ধীরে ধীরে ভ্রূযুগলে জেগে উঠল এক গভীর দুঃখের রেখা। সে সেই ভ্রূজোড়া কাঁপিয়ে বলল, 'আমি আপনার কোন কথাই শুনতে পাচ্ছি না।'

নেখলুদভ বলল, 'আমি এসেছি...' মনে মনে ভাবল, 'আমি তো আমার কর্তব্য করছি—আমি তো সবকিছুই স্বীকার করছি।' কথাটা মনে হতেই তার দু চোখ ভরে এল জলে, গলা বসে যেতে লাগল, এবং চোখের জল আটকাবার জন্য দু হাত দিয়ে জালটাকে সে আঁকড়ে ধরল।

তার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'যে ব্যাপারে তোমার দরকার নেই তাতে নাক গলাতে গেছ কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে একজন বন্দিনী আর্তনাদ করে উঠল, 'ভগবান সাক্ষী, আমি এর কিছুই জানি না।'

নেখলুদভের উত্তেজনা মাসলোভার চোখে ধরা পড়ল, এবং সে তাকে চিনতে পারল।

তার দিকে না তাকিয়েই সে চিৎকার করে উঠল, 'আপনি বোধ হয়…না, আমার মনে পড়ছে না।' তার দীপ্ত মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল।

হৃদয় থেকে পড়া মুখস্থ করার মত বেশ জোরে অথচ একঘেয়ে স্বরে নেখলুদভ বলল, 'আমি তোমার কাছে এসেছি ক্ষমা চাইতে।' কথাগুলো শেষ হবার সাথে সাথে সে চোখ ফিরিয়ে নিল, সেই মুহূর্তেই তার মনে এই চিন্তা এল যে, যদি তার মনে লজ্জা জাগে তো ভালই—সে নিজেই নিজের লজ্জাকে বহন করবে। তাই আবার বেশ জোরে চিৎকার করে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর; আমি তোমার সাথে ভয়ঙ্কর অন্যায় করছি।'

তার ওপর থেকে তির্যক চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে মাসলোভা অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

নেখলুদভ আর কথা বলতে পারছে না; সে নিজের কান্না রোধ করার জন্য জালের কাছ থেকে সরে এল।

জেল পরিদর্শক, এবং অফিসারটি, যিনি নেখলুদভকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, এবং নেখলুদভ যাদের মনে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল তারা ঘরের ভেতরে ঢুকলেন, তার তাকে জালের বেড়াটার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন সে তার প্রত্যাশিত মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে না। নেখলুদভ নাকে নিঃশ্বাস টেনে, শরীরটাকে একটু ঝাড়া দিয়ে, শান্ত ভঙ্গি আনার চেষ্টা করে বলল, 'জালের মধ্য দিয়ে কথা বলতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে; কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

পরিদর্শক এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তাকে কিছুক্ষণের মত বাইরে আনা যেতে পারে।' শেষে সেপাইটির দিকে ফিরে বললেন, 'মারিয়া, মাসলোভাকে বাইরে নিয়ে এস।'

মিনিটখানেক পরে পাশের দরজাটা দিয়ে মাসলোভা বেরিয়ে এল। ধীর পদক্ষেপে নেখলুদভের একেবারে সামনে এসে থেমে ভ্রূর নিচ থেকে তার দিকে তাকাল। দুদিন আগে যেমনটি ছিল আজ তেমনিভাবে তার মাথার কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো কপালের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে; মুখটা যদিও শুকনো ও খসখসে

তবু তা সত্যিই সুন্দর এবং প্রশান্ত. কিন্তু সবথেকে আকর্ষণীয় হচ্ছে চক্‌চকে কালো চোখজোড়া।

'আপনি এখানে কথা বলতে পারেন।' পরিদর্শক বলে সরে গেলেন।

• নেখলুদভ দেওয়ালের পাশে বসার জায়গাটার দিকে এল।

মাসলোভা পরিদর্শকের দিকে একবার জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বিস্ময়ে কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে, নেখলুদভের পেছন পেছন এগিয়ে জামার নিচের দিকটা গুটিয়ে নিয়ে তার পাশে বসে পড়ল।

'আমি জানি, আমাকে ক্ষমা করা তোমার পক্ষে সত্যিই কঠিন।' শুরু করেই আবার থেমে গেল নেখলুদভ। কান্নার প্রচণ্ড বেগ তাকে থামিয়ে দিল। তবু সে বলল, 'অতীতকে নিয়ে আর কিছুই করার নেই, তবে আমার ক্ষমতায় এখন যতটা কুলোবে আমি তা করব। আমাকে বল—'

'আমাকে খুঁজে বের করলে কিভাবে?' তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই, দৃষ্টি না সরিয়ে, আবার তার দিকে পুরোপুরি না তাকিয়েই মাসলোভা বলল।

নেখলুদভ মনে মনে বলল, 'হে ঈশ্বর, আমায় সাহায্য করুন; শিখিয়ে দিন কি করব।' মাসলোভার দিকে চেয়ে দেখল তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেই খুশির আমেজ আর নেই। বলল, 'পরশুদিন আমি জুরিদের মধ্যে ছিলাম; তুমি আমায় চিনতে পারনি?'

মাসলোভা বলল, 'না, পারিনি; চেনার মত সময়ই ছিল না তখন। এমনকি আমি তাকাইও নি।'

বেশ লজ্জিত স্বরে সে জানতে চাইল, 'আমাদের একটি সন্তান হয়েছিল, তাই না?'

তারদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাসলোভা অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, জন্মের সাথে সাথেই সে মারা গেছে।'

'তুমি কি বলছ? কেন?'

চোখ না তুলেই সে বলল, 'আমি এত অসুস্থ ছিলাম যে প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি।'

'আমার পিসিরা কিভাবে তোমাকে যেতে দিল?'

'যার একটা বাচ্চা আছে এমন ঝিকে কে রাখে বল? ব্যাপারটা জানতে পারার পরই তারা আমাকে দূর করে দেন। কিন্তু এসব কথার প্রয়োজনটা কি? আমার কিছুই মনে পড়ছে না; ওসব অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

'না শেষ হয়নি; আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'প্রায়শ্চিত্ত করার কিছুই নেই। যা হবার ছিল, তাই হয়েছে।' সে বলল। তারপর নেখলুদভ যা মোটেও আশা করেনি, মাসলোভা তাই করল। তার দিকে তাকিয়ে বেশ করুণ অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল।

মাসলোভা কখনই আশা করেনি যে তাকে আবার দেখতে পাবে; এবং এখানে এ সময় তো নয়ই। ফলে যে মুহূর্তে তাকে সে চিনতে পারল, সে মুহূর্তে, যে দুঃখের স্মৃতি সে ভুলে গিয়েছিল, তাকে আর জোর করে সরিয়ে রাখা সম্ভব হলনা তারপক্ষে। প্রথমেই তার ভাসাভাসা মনে পড়ল সেই সুন্দর যুবকটির কথা যে তার জীবনে এনেছিল প্রথম ভালবাসার পরশ; তার ঠিক পরমুহূর্তেই তার সমগ্র সত্তাকে

আচ্ছন্ন করে ফেলল সেই একই যুবকের নিষ্ঠুরতার স্মৃতি, অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের ইতিহাস। সে হৃদয়ে যথেষ্ট অসুস্থতা বোধ করল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না পারায় চিরাচরিত অভ্যাস মাফিক সে স্মৃতিগুলোকে নিজের কলুষিত জীবনের আস্তরণে ঢেকে ফেলতে চাইল। প্রথমে চেষ্টা করল এই মুহূর্তে তার পাশে বসে থাকা মানুষটির সাথে সেই অতীতের ভালবাসার মানুষটিকে মিলিয়ে নেবার; কিন্তু এ চিন্তা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে বোধ হওয়াতে সে আবার এই মানুষ দুজনকে আলাদা করে ফেলল। দামী পোশাকে সজ্জিত, সুগন্ধতে ভরপুর দাড়িওলা অভিজাত লোকটির মধ্যে তার সেই ভালবাসার নেখল্যুদভকে সে খুঁজেই পেলনা; বরং তার মধ্যে যেন দেখতে পেল সেরকম একজন মানুষকেই যারা তার মত মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খুবই ভালবাসে; আর সে কারণেই সে তার দিকে চেয়ে মোহিনী হাসি হাসল। তারপর নীরব হয়ে মনে মনে ভাবতে শুরু করল লোকটিকে কিভাবে সে তার কাজে লাগাতে পারে, তাই। বলল, 'ওসব শেষ হয়ে গেছে; এখন আমি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা।' এ ভয়ানক শব্দগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

নেখল্যুদভ বলল, 'আমি জানি। আমি নিশ্চিত যে তুমি দোষী নও।'

'দোষী! নিশ্চয়ই নই। আমি চোর না ডাকাত? এখানে সবাই বলাবলি করে যে উকিলের ওপরই নাকি সবকিছু নির্ভর করে।' সে বলে চলে, 'আমার একটা আবেদন দাখিল করা দরকার; তবে তাতে নাকি অনেক টাকার প্রয়োজন।'

নেখল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ। আমি একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি।'

'পয়সার জন্য চিন্তা নেই; তবে ভাল উকিল হওয়া চাই।' সে বলল।

'যতদূর যা করা সম্ভব তা আমি করব।'

এরপর দুজন নীরব হল; এবং মাসলোভা আবার সেই মোহিনী হাসি হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, 'যদি কিছু মনে না কর...যদি পার তবে...খুব বেশি নয়... মাত্র দশটা রুবল আমাকে দিতে পারবে কি?'

বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে নেখল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

ঘরের মধ্যে পায়চারিরত পরিদর্শকটির দিকে মাসলোভা দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। 'ওর সামনে দিওনা; তাহলে নিয়ে যাবে।'

পরিদর্শক পেছন দিকে ফেরা মাত্র নেখল্যুদভ পকেট থেকে ব্যাগটা বের করল; কিন্তু টাকাটা হস্তান্তরিত করার আগেই সে আবার এদিকে মুখ ফেরাবার ফলে টাকাটা সে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

অতীতের সেই মিষ্টি মুখ, যা আজ নিতান্তই শুকনো আর কর্কশতায় রূপান্তরিত তার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল, 'কাত্যুসা মারা গেছে।' তার তির্যক কালো চোখ এখন হাতের মধ্যে লুকনো রুবলগুলোর দিকে নিবদ্ধ, আর মাঝে মাঝে তা পতিত হচ্ছে পায়চারিরত পরিদর্শকের ওপর। ফলে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করল।

রাতে যে আত্মা তার সাথে কথা বলে, সে আবার তার মধ্যে জেগে উঠেছে; সে কি করবে, সেই প্রশ্ন থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ফলাফল কি হবে সেই প্রশ্নে, আর কোনটা বাস্তব সম্মত হবে তাতে।

সেই অন্তর্নিহিত স্বর বলে উঠল, 'এই মহিলার প্রতি তোমার করণীয় আর

কিছুই নেই। তুমি শুধু শুধু গলায় একটা পাথর ঝোলাবে, যা তোমাকে ডুবিয়ে মারবে, তোমাকে অন্যের উপকারে আসাতে বাধা দেবে। তার থেকে এটাই কি ভাল নয় যে তোমার কাছে এখন যত টাকা-পয়সা আছে, তার সবটাই ওকে দিয়ে, ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওর সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্ক চুকিয়ে ফেল।' এবং সে উপলব্ধি করল, তার আত্মার গভীরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু একটা ঘটছে ; তার আত্মীক সত্তা ভারসাম্যের দোলায় দুলছে ; এবং যে কোন মুহূর্তে সামান্যমাত্র ধাক্কায় সেটা যে কোন দিকে ছিটকে যেতে পারে। গতকাল পর্যন্ত যে ঈশ্বরকে সে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছিল সেই ঈশ্বরকেই আবার আহ্বান জানাল স্বীকারোক্তির জন্য। তার কাছে এই মুহূর্তেই সবকিছু বলার জনা প্রস্তুত হল সে।

'কাত্যুসা, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই দিলেনা। বল, আমায় ক্ষমা করেছ ? কোনদিন কি ক্ষমা করবে না ?'

তার কথায় কান না দিয়ে মাসলোভা তার হাতের দিকে আর পরিদর্শকের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। এবং পরিদর্শক পেছন ফেরার সাথে সাথেই সে তার হাত থেকে টাকাটা খামচে তুলে নিয়ে জামার বেলটের ভেতর লুকিয়ে ফেলল।

'কি আজেবাজে বকছ !' সামান্য উপেক্ষার হাসি হেসে সে বলল ; অন্ততঃ নেখলুদভের তা-ই মনে হল। সে অনুভব করল, কাত্যুসার মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধী সত্তা কাজ করছে, যার একটা তার প্রতি প্রসন্ন এবং অন্যটা সমর্থন করছে কাত্যুসার বর্তমান ভাব ভঙ্গিকে যা নেখলুদভকে বাধা দিচ্ছে তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটা তাকে দূরে ঠেলে দেবার পরিবর্তে বরং নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে কাত্যুসার আরও কাছে টেনে নিয়ে গেল। সে জানে যে যতই কঠিন হোক না কেন কাত্যুসার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে সে সক্ষম হবেই— আর এই বাধাই তাকে বেশি করে আকৃষ্ট করল। এই মুহূর্তে তার মধ্যে যে অনুভূতি জেগে উঠেছে এর আগে অন্য কারও প্রতি তো নয়ই, এমনকি কাত্যুসার জন্যও কখনও তেমনটি হয়নি। এতে তার ব্যক্তিগত কোন আকাঙ্খা নেই, কাত্যুসার কাছে তার নিজের জন্য কোন প্রত্যাশা নেই—শুধু সে চাইছে, কাত্যুসা এখন যে অবস্থায় রয়েছে তার থেকে যেন মুক্তি পায়. তার ভেতরের সত্তা যেন আবার জেগে ওঠে, আবার সে যেন সেই আগের কাত্যুসায় পরিণত হতে পারে।

'কাত্যুসা, তুমি এমন কথা বলছ কেন ? আমি তো তোমায় জানি ; জানি তোমার সেই অতীতের দিনগুলো—সেই যখন পানোভায় থাকতে, তখন থেকে।'

উপেক্ষার সুরে সে বলল, 'অতীতের কথা চিন্তা করে লাভটা কি বল ?'

'নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই আমি সেই অতীতকে স্মরণ করছি।' নেখলুদভ বলল। এবং বলতে যাচ্ছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু হঠাৎ তার সাথে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় দেখতে পেল তার চোখে এক ভয়ঙ্কর স্থূল বিরক্তির অভিব্যক্তি—ফলে সে আর সে কথা বলতে পারল না।

ঠিক এই সময়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা চলে যেতে শুরু করল। পরিদর্শক নেখলুদভের কাছে এসে বলল যে তারও যাবার সময় হয়ে গেছে। মাসলোভা সংযতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল।

নেখলুদভ বলল, 'বিদায়, তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু দেখতেই

পাচ্ছ, এখানে তা বলা মোটেই সম্ভব নয়।' তারপর হাতটা ধরে বলল, 'আমি আবার আসব।'

'আমার মনে হয়, তোমার সব কথাই বলা হয়ে গেছে।' সে নেখলুদভের সঙ্গে হাত মেলাল, কিন্তু তাতে মোটেই ঝাঁকানি দিল না।

'না, তোমার সাথে আবার দেখা করব এমন কোন জায়গায় যেখানে দুজনে কথা বলতে পারব। তখন বলব, যা বলতে চেয়েছিলাম ; সত্যিই সেটা খুব জরুরী কথা।'

যে পুরুষকে সে খুশি করতে চায় তার দিকে চেয়ে সাধারণতঃ যেমন হাসি হেসে থাকে তেমনি হেসে সে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আবার এসো।'

'তুমি আমার কাছে বোনের থেকেও বড়।' নেখলুদভ বলল।

মাথা নেড়ে কাত্যুসা বলল, 'কি যা তা বলছ!' তারপর জালের ওপারে চলে গেল।

।। চুয়াল্লিশ ।।

এই সাক্ষাৎকারের আগে নেখলুদভ ভেবেছিল যে কাত্যুসা যখন দেখবে যে তাকে সাহায্য করার জন্য সে এতটা উৎসুক তখন সে আবার সেই আগের কাত্যুসায় পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু ভীতি বিহ্বলতার সঙ্গে সে দেখল যে সে কাত্যুসা আর নেই, বরং সেখানে অধিষ্ঠিতা হয়েছে মাসলোভা। এটা তাকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে তুলল।

তাকে সব থেকে বেশি যা বিস্মিত করল তা হল এই যে কাত্যুসা তার নিজের অবস্থার জন্য মোটেই লজ্জিত নয়,—বন্দীত্ব নয় (এরজন্য অবশ্য সে লজ্জিত), পতিতা বৃত্তির জন্য—বরং আত্মতৃপ্ত এবং গর্বিত। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণও নেই ; কেননা, প্রত্যেককেই তার নিজের বৃত্তিকে ভাল আর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে হয়। সুতরাং যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন মানুষের জীবন সম্পর্কে তাকে সব সময়ই এমন একটা ধারণা করে নিতে হয় যাতে কিনা তার বৃত্তিটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাল বলে বিবেচিত হতে পারে।

সাধারণতঃ এটা কল্পনা করা হয়ে থাকে যে চোর, খুনী, গুপ্তচর এবং পতিতারা নিজের নিজের বৃত্তিকে অত্যন্ত নোংরা অনুভব করে মনে মনে লজ্জা পায় ; কিন্তু আসলে সত্য হচ্ছে এর ঠিক উলটোটাই। ভাগ্য ও পাপ কাজের ফলে যেসব মানুষের একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে যেতে বাধ্য হয়, এবং সে অবস্থান যতই মিথ্যে হোক না কেন, জীবনের এক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তাদের অবস্থাকে ভাল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। জীবন সম্পর্কিত নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার জন্য এইসব লোকেরা ইন্দ্রিয়ানুগভাবে সেই চক্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে যারা তাদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার মাঝে নিজেদের অবস্থিতি চিন্তা করে নেয়। এটা আমাদের খুবই বিস্মিত করে যখন দেখি চোরেরা নিজেদের নৈপুণ্যের জন্য দম্ভ প্রকাশ করে, পতিতারা নিজেদের অধঃপতনের জন্য গর্বিত হয়, আর খুনীরা তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য আত্মতৃপ্ত বোধ করে। কিন্তু এটা আমাদের এ জন্যই বিস্মিত করে যে, ওই সব লোকেরা যে পরিস্থিতি, যে অবস্থার মধ্যে বাস করে সেটা খুবই সীমিত ; আর প্রধানতঃ আমরা তা থেকে বাইরে আছি বলে। কিন্তু আমরা কি এই একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করি না যখন ধনীরা তাদের সম্পদের জন্য, অর্থাৎ ডাকাতির

জন্য গর্ববোধ করে ; সেনাপতিরা তাদের খুনের জন্য, অর্থাৎ বিজয়ের জন্য গর্ববোধ করে ; আর উচ্চপদাধিকারীরা তাদের হিংসার জন্য, অর্থাৎ ক্ষমতার জন্য দম্ভ প্রকাশ করে থাকে ? কিন্তু আমরা জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব লোকের মধ্যে কোনরকম বিকৃতি দেখতে পাই না শুধুমাত্র এই কারণেই যে তাদের দ্বারা গঠিত চক্র আকারে অনেক বড় আর তাছাড়া আমরা নিজেরাও সেই একই চক্রের অন্তর্ভুক্ত।

ঠিক এভাবেই মাসলোভাও তার জীবন ও অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিয়েছে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন পতিতা হওয়া সত্ত্বেও তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সে নিজের অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, মনে মনে আত্মতৃপ্তি বোধ করছে, এমনকি নিজের জন্য গর্বও বোধ হচ্ছে তার।

এই ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি মানুষের পক্ষে—বৃদ্ধ, যুবক, ছাত্র, সেনাপতি, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার কাছেই সবচেয়ে ভাল জিনিস হল আকর্ষণীয়া রমণীর সঙ্গে যৌন মিলন। সুতরাং সব মানুষই, যখন তারা অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করে, তখনও, মনে মনে ও ছাড়া আর কিছুই চায় না। কাত্যুসা ছিল সত্যি-কারের একজন আকর্ষণীয়া মহিলা, এবং এই ইচ্ছাকে তৃপ্ত করা কিংবা অতৃপ্ত করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকায় সে ধীরে ধীরে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়া মহিলাতে পরিণত হয়। তার অতীত এবং বর্তমান এই বিশ্বাসের সত্যতাকেই প্রমাণ করে।

তার জীবনের গত দশটি বছর ধরে সে দেখেছে—নেখল্যুদভ থেকে বৃদ্ধ পুলিশ-অফিসার আর জেলের অধ্যক্ষ পর্যন্ত সকলেই তাকে চায় ; তাই যে সব মানুষকে তার কোন প্রয়োজন নেই তাদের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। অতএব সারা দুনিয়াটাই তার কাছে কামনায় উত্তেজিত একদল মানুষের সম্মেলন বলে মনে হয়, যারা কিনা তাকে অধিকার করার জন্য প্রবঞ্চনা, হিংসা, ক্রয় অথবা চাতুর্য—এর সবকিছু করতেই প্রস্তুত।

এইভাবে মাসলোভা জীবনকে বুঝেছে ; এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সে কোনমতেই নিচু নয়, বরং বেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন মহিলা। আর এটাকে সে অন্য সবকিছুর থেকে বেশি মূল্য দেয়, এ কারণে যে, জীবন সম্পর্কে সে তার দৃষ্টি-ভঙ্গিকে যদি একবার খুইয়ে বসে তাহলে তার সাথে নিজের গুরুত্বটাও তাকে বিসর্জন দিতে হবে। আর সে গুরুত্ব যাতে কমে না যায় সেজন্য নিজের তৈরি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সে নিজের জীবনকে দেখে থাকে। নেখল্যুদভ তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে চাইছে এটা বুঝতে পেরেই সে তাকে বাধা দিয়েছে এ কথা চিন্তা করে যে তাহলে সে নিজের তৈরি সম্মান ও আত্মবিশ্বাসের জগত থেকে চির-নির্বাসিত হতে বাধ্য হবে। সে কারণে নেখল্যুদভের সঙ্গে তার যৌবনের সম্পর্কের কথা সে জোর করেই ভুলে গেছে। কারণ, এই স্মৃতি তার বর্তমান বিশ্বাস ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে মোটে খাপ খায় না, আর সেজন্যই তা সরে গেছে, কিংবা কোথাও হয়ত অস্পর্শ কবরে শায়িত রয়েছে কোন গভীর আচ্ছাদনের নিচে—ঠিক যেমন মৌমাছিরা তাদের পরিশ্রমের ফসলকে রক্ষা করে থাকে অতি সযত্নে—তেমনি। সুতরাং নেখল্যুদভ আজ আর তার কাছে সেই মানুষটি নয়, যাকে সে একদিন

গভীরভাবে ভালবেসেছিল, বরং সে হচ্ছে তেমনই একটি ধনী লোক যার অর্থ ও প্রতিপত্তিকে আজ সে নিজের স্বার্থের জন্য কাজে লাগাতে সক্ষম হবে এবং তার সাথে তার সেই সম্পর্কই থাকবে যে সম্পর্ক অন্য সব সাধারণ মানুষের সাথে রয়েছে।

অন্যান্য সাক্ষাৎকারীদের সাথে দরজার দিকে এগোতে এগোতে নেখল্যুদভ ভাবল, 'না, আসল ব্যাপারটা তাকে বলতে পারব না; তাকে তো বলিনি যে আমি তাকে বিয়ে করব; তা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, তবে করব ঠিকই।'

যাতে অতিরিক্ত কেউ বাইরে চলে যেতে না পারে, আবার ভেতরেও কেউ থেকে না যায় সে কারণে দরজার কাছে দণ্ডায়মান দুজন সেপাই প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়ে গুনে গুনে বাইরে যেতে দিল। এবার পিঠে চাপড় মারাতে নেখল্যুদভ আর উত্তেজিত হল না, এমনকি তা গ্রাহ্যও করল না।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

চাকরবাকরদের বিদায় দিয়ে, বিরাট বাড়ি ছেড়ে কোন ছোট বাড়িতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করে নেখল্যুদভ তার জীবনযাত্রাকে একেবারে পালটে ফেলতে চাইল, কিন্তু আগ্রাফেনা বলল যে, শীতের আগে এসব করাটা তার পক্ষে ঠিক উচিত হবে না। কারণ গ্রীষ্মে কেউ শহরে বাড়ি ভাড়া দিতে চাইবে না; এবং যেভাবেই হোক এ সময়টা মালপত্র আর ভার নিজেকে কোথাও থাকতেই হবে। ফলে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পুরো ব্যাপারটাই (সে চাইছে ছাত্রদের মত একেবারে সহজ-সরল জীবনযাপন করতে) পরিত্যক্ত হল। ফলে সবকিছু যে ঠিক আগের মতই রয়ে গেল, তাই নয়, হঠাৎ এক নতুন কর্মতৎপরতা শুরু হল। পশম আর পালকে তৈরি জিনিসগুলোকে রোদে মেলা এবং ধুনো দেবার জন্য বাইরে টেনে বের করা হল। দারোয়ান, চাকর, রাঁধুনি, কোর্নেই—এরা সকলেই কাজে হাত লাগাল; এর আগে চর্মচোক্ষে দেখেনি এমন সব পালকের বিছানা আর পোশাক এক সারিতে ঝুলিয়ে রাখা হল। তারপর টেনে বের করা হল কম্বল আর আসবাবপত্র। দারোয়ান আর চাকর মিলে পেশীবহুল হাতের আস্তিন গুটিয়ে সেগুলোকে ধুনতে শুরু করে দিল; ঘরগুলো তীব্র নেপথলিনের গন্ধে ভরে উঠল।

নেখল্যুদভ উঠোন অতিক্রম করার সময় কিংবা জানলা দিয়ে তাকিয়ে এতসব অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, আগ্রাফেনা, কোর্নেই, দারোয়ান, চাকর এবং রাঁধুনির শরীর চর্চার উপকরণ ছাড়া ওগুলোর আর কোন প্রয়োজনই নেই।

'কিন্তু এক্ষুণি আমার জীবনযাত্রার প্রণালীটাকে বদলে ফেলাটা বোধহয় ঠিক হবে না।' হঠাৎ তার মনে হল। সে ভাবল, 'অন্ততঃ যতক্ষণ না মাসলোভার মামলাটার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে। তাছাড়া এটা বেশ কঠিন কাজও বটে। যখন সে ছাড়া পাবে, কিংবা নির্বাসনে যাবে, আর আমি তাকে অনুসরণ করব—তখন এটা আপনা-আপনিই বদলে যাবে।'

পূর্ব নির্ধারিত দিনে নেখল্যুদভ গিয়ে উপস্থিত হল ফানারিনের বাড়ির দরজায়। বিরাট বাড়ির চত্বরে পামগাছ ও অন্যান্য গাছের মেলা, দরজায় ঝুলছে অসাধারণ সুন্দর পর্দা; সব দেখে মনে হয় গৃহকর্তার হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে, এবং তিনি সদ্যসদ্য বড়লোক হয়েছেন (যে টাকা তিনি মেহনত না করেই রোজগার করেছেন)। ডাক্তারদের বসার ঘরের মত এখানেও এসে জুটেছে বহু হতাশাগ্রস্ত

মানুষ। তারা টেবিলের চারপাশে জমায়েত হয়েছে আর তাদের মনোরঞ্জনের জন্য টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে বহু রকমের পত্রপত্রিকা। তারা প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে ফানারিনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগের অপেক্ষায়। ঘরের মধ্যেই একটু উঁচু টেবিলের ওপরে বসেছিলেন ফানারিনের সহকারী ; তিনি নেখল্যুদভকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বলতে চাইলেন যে এক্ষুণি তার ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন ; কিন্তু তিনি দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছবার আগেই দরজাটা খুলে গেল আর বেশ গুরুগম্ভীর গলার তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে এল ভেতর থেকে। এ স্বর হচ্ছে একজন মধ্যবয়সী, নতুন পোশাক পরিহিত লালমুখো গোঁফওলা ব্যবসায়ীর ; আর তার সঙ্গে শোনা গেল ফানারিনের গলাও। এদের দুজনের মুখ দেখেই বোঝা গেল যে এরা দুজনে এইমাত্র এমন একটা লেনদেনের ব্যাপার সমাধা করেছেন যা বেশ মোটা লাভের কিন্তু মোটেই সৎ নয়।

'এটা আপনার দোষ, বুঝলেন মশাই!' ফানারিন হাসতে হাসতে বললেন।

'আরে আমরা কেউই তো দেবদূত নই ; পাপ না করলে তো স্বর্গেই বাস করতাম।'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। ঠিকই বলেছেন।' দুজনেই অস্বাভাবিক হাসিতে ফেটে পড়লেন।

'আরে আসুন, আসুন! প্রিন্স নেখল্যুদভ!' তাকে দেখতে পেয়ে ফানারিন বললেন ; তারপর একবার ব্যবসায়ীর দিকে ঘাড় নেড়ে তাকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। ঘরটা বেশ রীতি মাফিক সাজানো।

'সিগারেট ধরাবেন না?' তার উলটো দিকে বসে ফানারিন বললেন। এইমাত্র যে লেনদেন হয়েছে সেই সাফল্যের উত্তেজনা ঢাকতে চেষ্টা করছেন তিনি।

'ধন্যবাদ! আমি মাসলোভার কেসের ব্যাপারে এসেছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক! কিন্তু বুঝলেন, এই টাকাওলা লোকগুলো যা জোচ্চোর না।' তিনি বললেন, 'এই যে লোকটাকে দেখলেন এখন উনি এক কোটি কুড়ি লক্ষ রুবলের মালিক। আর তিনিই বলছেন কিনা যে পারবেন না! আর, উনি এমনই লোক যে আপনার কাছে যদি পঁচিশ রুবল আছে টের পান, তো পারলে ঠিক নিয়ে নেবেন। এমনকি, যদি তা দাঁত দিয়েও ছিঁড়ে নিতে হয় তো তাতেও গ্রাহ্য করবেন না।'

'সে বলছে, "পারব না," এবং "সময় চাই," আর তুমি বলছ, "পঁচিশ রুবলও ছিনিয়ে নেবে," নেখল্যুদভ মনে মনে ভাবল, এবং এই লোকটিকে তার খুবই বিশ্রী লাগতে লাগল। কারণ, তিনি কেবলই চেষ্টা করছেন এটা প্রমাণ করতে যে তিনি আর নেখল্যুদভ একই শ্রেণীর লোক, আর তার অন্যান্য মক্কেলরা হল সম্পূর্ণ উলটো দলের লোক। হাবভাবে তিনি অন্তত: তাই বোঝাতে চেষ্টা করছেন।

'ও লোকটা আমায় জ্বালিয়ে মারল। কী পাথারে বাবা! শালাকে তাড়াতে পারলে বাঁচি,' এ্যাডভোকেট বললেন। নিজের অগোছাল কথার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেই যেন তিনি বলে চললেন, 'আচ্ছা! আসুন, এবার আপনার মামলাটা নিয়ে বসা যাক। আমি ওটা ভাল করে পড়েছি। আর তুর্গেনেভের মতই বলতে হচ্ছে," ওর মধ্যে কোন বিষয়বস্তু নেই।" আপীল করার মত তেমন কোন কারণই পাচ্ছি না আমি ; অর্থাৎ কোন এ্যাডভোকেটের জন্য ওখানে কোন সূত্রই ছেড়ে

রাখা হয়নি।'

'কি হবে তাহলে ?'

'একটু দাঁড়ান। ওকে বল,' তিনি তার সহকারীকে বলতে লাগলেন, 'আমি যা বলেছি তা থেকে এক চুলও নড়ব না। যদি পারে তো ভাল, না পারে তো চুলোয় যাক।'

'কিন্তু তিনি তো রাজিই হচ্ছেন না !'

'ঠিক আছে, দরকার নেই।' তার শান্ত প্রফুল্ল মুখখানা বেশ গোমড়া হয়ে উঠল।

'দেখলেন তো !—আর সবাই বলে কিনা, এ্যাডভোকেটরা কিছু না করেই টাকা রোজগার করে,' একটু থেমে চোখে-মুখে আগের আমেজ ফিরিয়ে এনে তিনি মন্তব্য করলেন। 'কোথায় একটা দেউলেকে মিথ্যে অভিযোগ থেকে বাঁচালাম—আর এখন কিনা সবাই মিলে ছেঁকে ধরেছে এসে আমায়। এ ধরনের মামলায় ঢের মেহনত করতে হয়। একজন লেখক বলেছেন কালির দোয়াতে আমরা নাকি মাংসের টুকরো ফেলে আসি।

'আপনার মামলার ব্যাপারটা—না, ঠিক আপনার নয়, অর্থাৎ কিনা—যে মামলা নিয়ে আপনি এসেছেন আর কি—খুবই জঘন্যভাবে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। আপীল করার মত আর কোন রাস্তাই রাখেনি।' তিনি বলে চললেন, 'আমরা শাস্তি নাকচ করার চেষ্টা করতে পারি। ব্যাপারটা দেখে আমার এটাই মনে হচ্ছে।''

বেশ কিছু লেখা কাগজ তিনি তুলে নিলেন ; তারপর দ্রুত পড়তে লাগলেন। বদখত আইনী শব্দগুলো অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে কতকগুলো বাক্যের ওপর অদ্ভুত জোর দিলেন।

"আপীল আদালত, ফৌজদারি বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি···অমুক অমুক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী···এই রায় প্রদত্ত হল···ইত্যাদি···ফলে···ব্যবসায়ী স্মেলকভকে বিষ-প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে মাসলোভা দোষী সাব্যস্ত হল···এবং দণ্ডবিধির ১৪৫৪ ধারা অনুযায়ী তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল..."ইত্যাদি ইত্যাদি।'

তিনি থামলেন। এবার নিজের ভাষণ শুনে নিজেই আনন্দে মশগুল হয়ে উঠলেন।

' "স্পষ্টতঃই বিচার বিভাগের ভুল ভ্রান্তির ফলে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে," ' তিনি বেশ খোশমেজাজে পড়ে চললেন, ' "ফলতঃ শাস্তি বাতিল করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ স্মেলকভের পাকস্থলী পরীক্ষার রিপোর্ট পড়ার শুরুতেই সভাপতি তাতে বাধা দেন।" এটাই হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট।'

'কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষই তো এটা পড়ার দাবি জানিয়েছিল,' নেখল্যুদভ বেজায় অবাক হয়ে বলল।

'তাতে কি এসে যায় ! ওটা আবার পড়ার দাবি জানানো যেতে পারে।'

'ও ; কিন্তু কোন কাজে আসবে কি সেটা ?'

'আপীলের একটা কারণ তো তাতে সৃষ্টি হবে। তারপর "দ্বিতীয়ত !" ' তিনি পড়ে যেতে লাগলেন, ' "যখন মাসলোভার আইনজীবি তার পক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তব্য রাখতে উঠে মাসলোভার ব্যক্তিত্ব ও তার অধঃপতনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, তখন সভাপতি তাকে মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্য বিষয়ে

আসার অপরাধে বাধা দেন কিন্তু সেনেট যেমন বহুবার বলেছে যে, অপরাধীর বৈশিষ্ট্যগুলো খুলে ধরা, তার নৈতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করাটা ফৌজদারি মামলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; এমনকি যদি তা মূল বিষয়ে কেবলমাত্র পথপ্রদর্শকের কাজও করে তবু," এটা হচ্ছে দু নম্বর পয়েন্ট।' নেখল্যুদভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'কিন্তু তিনি এত বিশ্রীভাবে বলেছিলেন যে তা থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি,' নেখল্যুদভ তের বেশি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

সে একটি আস্ত গাধা। তার কাছ থেকে এটা আশাও করা যায় না যে সে কোন কথা গুছিয়ে বলতে পারবে,' ফানারিন হাসতে হাসতে বললেন। 'সে যাই হোক, এটাও আপীলের একটা কারণ। "তৃতীয়তঃ সভাপতি তার শেষ বক্তৃতায় ফৌজদারি বিধির ৮০১ ধারার ১নং উপধারার অর্থের বিপরীতে জুরিদের একথা জানাতে ভুলেই গিয়েছিলেন যে কি কি বিচারবিভাগীয় অবস্থায় দোষী সাব্যস্ত করা হল। আর তিনি এও বলেননি যে যখন মাসলোভা নিজেই স্মেলকভকে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে এবং যখন ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি তখন তাকে খুনের দায়ে দোষী না করার সমস্ত অধিকার জুরিদের ছিল। এমনকি তিনি এটাও জানান যে মাসলোভার অপরাধ হল শুধু অমনোযোগী হওয়া ; যদিও সে তা চায়নি, কিন্তু তার ফলে ব্যবসায়ীটির মৃত্যু ঘটেছে।" এটাই আমার প্রধান পয়েন্ট।

'হ্যাঁ আমরা নিজেরাও এগুলো জানতাম না। এটা আমাদেরই ভুল।'

'এবার আমি আসছি চতুর্থ পয়েন্টে,' অ্যাডভোকেট পড়ে চললেন, ' "জুরিরা যে ভাবে তাদের উত্তর জানিয়েছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই বিরোধ ছিল। অর্থলিপ্সার জন্য স্মেলকভকে বিষ প্রয়োগে হত্যার দায়ে মাসলোভা অভিযুক্তা, খুনের পেছনে তার কেবলমাত্র এই একটাই অভিসন্ধি থাকতে পারে। কিন্তু জুরিরা তাদের বিচারে তাকে চুরির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ; এমনকি মূল্যবান জিনিষপত্র চুরির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার অভিযোগ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আর এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা তাকে খুনের দায় থেকেও অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু শুধুমাত্র ভুল বোঝা-বুঝির জন্যই—সভাপতির সারমর্ম বক্তৃতায় অসম্পূর্ণতার ফলেই যা ঘটেছিল—তাদের উত্তরে তারা ঠিক ঠিকভাবে তা লিখে উঠতে পারেননি। সুতরাং জুরিদের এহেন উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও ফৌজদারি আদালতের পদ্ধতির ৮১৬ ও ৮০৮ ধারার প্রয়োগ অবশ্যই দাবি করা যেতে পারে। অর্থাৎ যার মানে হল, সভাপতি জুরিদের ভুলের কথা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, এবং তারা আসামীর দোষ সম্পর্কে যাতে পুনরায় বিচার করার সুযোগ পান, তেমনি ব্যবস্থা করবেন।" '

'তাহলে সভাপতি তা করলেন না কেন?'

'আমারও তো ওই "কেন" টাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।' ফানারিন হাসতে হাসতে বললেন।

'তাহলে কি সেনেট তার ভুল শুধরে নেবে?'

'সেটা সবটাই সভাপতির ওপর নির্ভর করে। আচ্ছা আরও শুনুন,আর যা আমি লিখেছি,' তিনি তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে লাগলেন, ' "এ ধরনের রায়ে মাস-

লোভাকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার আদালতের থাকতে পারেনা। আর তার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৭৭১ ধারার ৩নং উপধারা প্রয়োগের তো কথাই ওঠে না। আমাদের ফৌজদারি আইনের মূল নীতিগুলোকেই এর ফলে লঙ্ঘন করা হয়েছে। ওপরে উল্লিখিত কারণ সমূহের নিমিত্ত আমি আবেদন করছি আপনার কাছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধারা ৯০৯, ৯১০, ৯১২-র ২ নম্বর উপধারা এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৯২৮ ধারা অনুযায়ী বাতিল করা···ইত্যাদি···এবং এই মামলাটিকে পুনরায় পরীক্ষা করার নিমিত্ত। এই আদালতের অন্য বিভাগে স্থানান্তর করা" ' তাহলেই বুঝলেন, যা কিছু করার সবই আমি করেছি। কিন্তু খুলে বলতে গেলে, এ মামলায় জেতার সম্ভাবনা খুবই কম, যদিও সবই নির্ভর করছে সেনেটের সভ্যদের মতিগতির ওপরে। তবে আপনি যদি সেখানে আপনার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে পারেন তবে তো খুবই ভাল হয়।'

'আমি অবশ্যি তাদের কয়েকজনকে চিনি।'

'খুবই ভাল কথা, তাহলে শুরু করে দিন; দেরি করলে সবাই আবার অর্শ সারাতে ছুটবে; তখন তাদের ফিরে আসার জন্যে আপনাকে আবার তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা হেরে গেলেও সম্রাটের কাছে সোজাসুজি আবেদন করতে পারব। সেটা করতে গেলেও আপনাকে পর্দার আড়ালে খানিক ধরাধরি করতে হবে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ কিনা—এই দরখাস্ত লেখাটা আর কি—সেটা অবশ্য পর্দার আড়ালে নয়।'

'ধন্যবাদ! তাহলে আপনার ফি-টা কত দিতে হবে বলুন?'

'আমার সহকারী আপনার হাতে দরখাস্ত দেওয়ার সময় বলবে।'

'আচ্ছা, আর একটা কথা। মোক্তার আমাকে একটা অনুমতিপত্র দিয়েছিল যাতে আমি আসামীর সাথে দেখা করতে পারি। কিন্তু জেলে আমাকে বলা হল যে, আলাদা ঘরে দেখা করতে গেলে নাকি, রাজ্যপালের অনুমতি দরকার। সত্যি কি তার কোন প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই। কিন্তু রাজ্যপাল তো এখন এখানে নেই। একজন উপ-রাজ্যপাল তার কাজ চালাচ্ছেন কিন্তু তিনি এমন আকাট, যে তাকে দিয়ে আপনার কোন কাজই হবে না।'

'তার নাম কি মাসলেনিকভ?'

'হ্যাঁ।'

'তার সাথে আমার আলাপ আছে।' কথাটা বলে সে যাওয়ার জন্যে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভীষণ কুৎসিত, হাড়গিলে বোঁচা হলদে মুখ নিয়ে বেটেখাটো একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। ইনিই অ্যাডভোকেটের স্ত্রী। এবং স্ত্রীর ওই কুৎসিত রূপের জন্য অ্যাডভোকেটও যে কম বিরক্ত নন। সেটা বেশ ভালই বোঝা গেল।

ভদ্রমহিলার সাজপোশাক বেশ বিশেষত্বপূর্ণ। সবুজ আর হলুদ রঙের ভেলভেট ও সিল্কে সারাটা শরীর ঢাকা। পাতলা চুলগুলো কোঁকড়ানো। বিজয়িনীর ঢঙে তিনি ঘরে ঢুকলেন। তার পেছনে ঢুকলেন ঈষৎ সবজে রঙের লম্বা একটি লোক। তার মুখে হাসি, গায়ের কোটের ধারগুলো সিল্কের, গলায় সাদা টাই। ইনি একজন কবি। নেখলুদভ এনার চেহারার সাথে বিশেষ পরিচিত।

'আনাতোল,' পাশের ঘরের দরজাটা খুলে মহিলাটি বললেন, 'আমার সাথে তোমাকে এক্ষুণি একবার আসতে হবে। ইনি সিমন ইভানোভিচ। ইনি আমাকে কথা দিয়েছেন, আজ ওনার কাব্য পাঠ করবেন। তোমাকে আসতেই হবে, তুমিও গারসিনের বিষয়ে আলোচনা করবে।'

নেখলুদভ প্রায় বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন কিন্তু ভদ্রমহিলা তার স্বামীর কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি একটা বলে তার দিকে ফিরে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি কিন্তু আপনাকে চিনি ; সুতরাং পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই। দয়া করে যদি আপনিও আমাদের বৈকালিক সাহিত্য সভায় যোগদান করেন তাহলে খুবই ভাল হয়। আনাতোল খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারে।'

'কিন্তু আমার তো এখন অনেক কাজ,' ফানারিন তার স্ত্রীর দিকে একখানা হাত এমনভাবে এগিয়ে ধরে কথাটা বললেন, যার অর্থ দাঁড়াল যেতে না পারার জন্য তিনি বেশ দুঃখ পাচ্ছেন।

নেখলুদেভ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে যথেষ্ট বিনয়ের সাথে অ্যাডভোকেটের স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বিদায় নিল।

'উনি এত বিমর্ষ কেন ?' সে চলে গেলে অ্যাডভোকেটের স্ত্রী মন্তব্য করলেন।

অপেক্ষা করার ঘরেই অ্যাডভোকেটের সহকারী তাকে দরখাস্তটা দিয়ে দিলেন। এক হাজার রুবল ফি লাগবে তাও জানিয়ে দিলেন। আর ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ফানারিন এ ধরনের মামলায় হাত দেন না, কিন্তু এটা নিয়েছেন শুধুমাত্র তার সম্মানে।

'আর দরখাস্তটা কে সই করবে ?'

আসামী নিজেই এতে সই করতে পারে, তবে তাতে কোন অসুবিধে থাকলে তার কাছে থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পেলে ফানারিনও তা করতে পারেন।'

তার সাথে বাঁধা দিন ছাড়া বাড়তি সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যাবে এই আনন্দে নেখলুদভ বলল, না, না, আমি বরং তার কাছেই দরখাস্তটা নিয়ে যাব। সে-ই সই করবে।'

।। ছেচল্লিশ ।।

জেলখানার বারান্দায় যথাসময়ে সেপাইর বাঁশি বেজে ওঠে, সেলের লোহার দরজায় ঝন্‌ঝন্ শব্দ হয়, খালি পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, গোড়ালির ঠক্‌ঠক্ শব্দ বাজে, ঝাড়ুদারের কাজ করে যে সব কয়েদিরা তারা বারান্দার বাতাসকে বিরক্তি-করা গন্ধে ভরিয়ে দিয়ে চলে যায়। বন্দীর দল হাত মুখ ধুয়ে, জামাকাপড় পরে, গুনতির জন্য বেরিয়ে এসে, গুনতি হয়ে গেলে চায়ের জন্য গরম জল আনতে চলে গেল।

প্রাতঃরাশের সময় প্রতিটি সেলেই বেশ চমৎকার কথাবার্তা চলে। আজই যে দুজন কয়েদিকে চাবকানো হবে তাদের সম্পর্কেই কথাবার্তা হয়। একজন হচ্ছে অল্পশিক্ষিত কেরানি ভাসিলিয়েভ, যে কিনা প্রতিহিংসার বশে নিজের মণিবানীকে খুন করেছে। তার সহবন্দীরা তাকে খুবই ভালবাসে, কেননা চরিত্রগতভাবে সে বেশ হাসি খুশি এবং মহানুভব ; তাছাড়া জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারেও বেশ দৃঢ়। জেলের নিয়মকানুন সবই তার নখদর্পণে, তাই সেগুলো মেনে চলার জন্য সে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে থাকে ; ফলে কর্তৃপক্ষও তাকে বিশেষভাবে অপছন্দ করে।

তিন সপ্তাহ আগে নতুন ইউনিফর্মের ওপর ঝোল ঢেলে দেবার জন্য একজন সেপাই একজন বন্দীকে খুব মারছিল। ভাসিলিয়েভ তখন বন্দীটির পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই বলে যে কোন বন্দীকে মারাটা আইনবিরুদ্ধ কাজ।

সেপাইটি তখন খুব রাগতভাবে ভাসিলিয়েভকে গালাগালি দিয়ে বলেছিল, 'আইনটা কি, তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।' ভাসিলিয়েভও ঠিক একইভাবে তার কথার উত্তর দেওয়াতে সেপাইটি তাকে মারতে উদ্যত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাসিলিয়েভ তার হাত দুটো ধরে ফেলে দু তিন সেকেণ্ড আটকে রেখে তারপর একটা মোচড় দিয়ে একেবারে সেলের বাইরে বের করে দেয়। সেপাইটি গিয়ে পরিদর্শকের কাছে নালিশ করে; পরিদর্শক আদেশ দেন ভাসিলিয়েভকে নির্জন সেলে রাখার।

নির্জন সেলগুলো হল বাইরে থেকে বন্ধ করা এক ধরনের অন্ধকার খুপরির সারি, যাতে খাটিয়া, চেয়ার, টেবিল কিছুই নেই; ফলে বন্দীদের মেঝেতেই শোয়া-বসা করতে হয় আর ইঁদুরগুলো তখন তাদের শরীরের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করে, এবং তাদের খাবার চুরি করে খায়, এমনকি তারা যদি নড়াচড়া বন্ধ করে তবে তাদের আক্রমণ করতেও এতটুকু দ্বিধা করেনা। ভাসিলিয়েভ এই যুক্তিতে নির্জন সেলে যেতে অস্বীকার করেছিল যে সে কোন অন্যায়ই করেনি; ফলে তারা তার ওপর জোর খাটাতে চেষ্টা করে। সুতরাং শুরু হয়ে যায় টানাটানি, আর সেই টানাটানিতে অন্য দুজন বন্দী তাকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে যায়। একে একে সমস্ত সেপাইরা এসে হাজির হয়, তাদের মধ্যে পেত্রভ নামে বিরাট শক্তিশালী সেপাইটাও ছিল। বন্দীদের নির্জন সেলের মধ্যে জোর করে ছুঁড়ে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালকে খবর দেওয়া হয় যে জেলের ভেতর বিদ্রোহের চেষ্টা করা হয়েছে, আর রাজ্যপালও মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আদেশ দিয়ে দেন যে, দুজন প্রধান অপরাধী ভাসিলিয়েভ ও ভবঘুরে নেপোমনিয়াশ্চিকে তিরিশ ঘা বেত মারা হোক।' মেয়েদের সাক্ষাৎকারের ঘরেই চাবুক মারার কথা।

সন্ধ্যার পরই সারা জেলে খবরটা রটে গেছে, আর তা নিয়েই প্রতিটি সেলে কথাবার্তা হচ্ছে।

কোরাবলিওভা, খোরসাভকা, ফিদোসিয়া ও মাসলোভা ঘরের কোণটাতে বসে চা খাচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই ভদকা খেয়ে বেশ খোশমেজাজে রয়েছে। আজকাল মাসলোভাই তাদেরকে বিনামূল্যে নিয়মিত ভদকা জুগিয়ে যাচ্ছে।

শক্ত দাঁতে চিনির ছোট একটা টুকরোয় কামড় দিয়ে কোরাবলিওভা ভাসিলি-য়েভের কথা উল্লেখ করে বলল, 'সে বিদ্রোহ-টিদ্রোহ কিছুই করছিল না; শুধু একজন সঙ্গির জন্যই মারটা খাচ্ছে, কারণ আজকাল বন্দীদের মারধোর করাটা মোটেই আইনসম্মত নয়।'

কাঠের তক্তাপোষের যেখানটায় চায়ের পাত্রগুলো রয়েছে তার ঠিক উলটো দিকে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে বিনুনি জড়ানো মাথা দুলিয়ে ফিদোসিয়া বলল, 'আমি বলতে শুনেছি, লোকটা নাকি খুবই ভাল।'

ওয়াচম্যানের বউটি মাসলোভাকে বলল, 'তুমি যদি তখন তাকে জিজ্ঞেস করতে—' (তাকে বলতে সে বোঝাল নেখল্যুদভকে)।

মাথা নাড়িয়ে হাসতে হাসতে মাসলোভা বলল, 'আমি তাকে বলব। সে আমার জন্য সবকিছুই করবে।'

ফিদোসিয়া বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সে আসছে কখন ? ওরা তো ইতিমধ্যেই তাদের নিয়ে আসতে গেছে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল, 'সত্যি, কী ভয়ঙ্কর !'

'আমি একবার গ্রামে দেখেছিলাম এক কৃষককে চাবকাতে। আমার শ্বশুর আমাকে পাঠিয়েছিল গাঁয়ের মোড়লের কাছে ; আর আমি তো সেখানে গিয়ে...' ওয়াচম্যানের বউ লম্বা গল্প শুরু করে দিল, কিন্তু তা দোতলার বারান্দায় চলমান মানুষজনের পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজে ডুবে গেল।

মহিলারা চুপ করে কান খাড়া করে বসে রইল।

খোরসাভকা বলল, 'ওখানে শয়তানগুলো ওকে একা হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ওকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। সেপাইরা ওর ওপর এত ক্ষেপে গেছে, কারণ ও কখনও কাউকে কিছু দিত না।'

ওপরের তলায় আবার সব শান্ত হল, এবং ওয়াচম্যানের বউ গোলাবাড়িতে পৌঁছে, একজন কৃষককে চাষ করতে দেখে কেমন ভীত হয়ে পড়েছিল, তার হৃদয় কী ভয়ঙ্কর রকম কেঁপে উঠেছিল ইত্যাদি বলে গল্পটা শেষ করল। খোরসাভকা তার জের টেনে বলল সেচগ্লভ কখনও চাবুক খেয়েও কিভাবে একটা শব্দও করেনি। এরপর ফিদোসিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলোকে সরিয়ে রাখল, আর কোরাবলিওভাও ওয়াচম্যানের বউ আবার সেলাই শুরু করে দিল। হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাসলোভা বেশ হতাশভাবে তার বিছানাটার ওপর বসল। আর যখন শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করল ঠিক তখনই একজন মেয়ে সেপাই এসে তাকে একজন সাক্ষাৎ-প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অফিসে যাবার আহ্বান জানাল।

আবছা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মাসলোভা মাথার রুমালটা ঠিক করে নেবার সময় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি (মেনসোভা) তাকে বলল, 'মনে রেখো, তাকে আমাদের কথা বলতে যেন ভুলে যেওনা। আমরা বাড়িটায় আগুন লাগাইনি, বরং ওই শয়তানটা নিজেই তা করেছিল। ওর একজন কর্মচারী স্বচক্ষে তা দেখেও ছিল, আর আমি জানি সে সেকথা অস্বীকার করে নরকে যাবার পাপ করবে না। তুমি শুধু তাকে বলবে আমার মিত্রির সাথে দেখা করতে। মিত্রি তাকে সহজ সরলভাবে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে। একবার ভাব আমাদের অবস্থাটা ; আমরা কোন অন্যায় করিনি অথচ আমরাই পচে মরছি জেলের মধ্যে থেকে, আর ওই শয়তানটা কিনা অপরের বউকে নিয়ে ফুর্তি করছে শুঁড়িখানায় !'

কোরাবলিওভা মন্তব্য করল, 'এটা আইন নয়।'

মাসলোভা উত্তর দিল, 'ঠিক আছে, আমি তাকে বলব।' তারপর চোখটা টিপে যোগ করল, 'সাহসটা বজায় রাখার জন্য যদি আর এক ফোঁটা পাই—' সঙ্গে সঙ্গে কোরাবলিওভা আধকাপ ভদকা এনে তাকে দিল, আর সেটা পান করে মাসলোভা একই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল, 'শুধু সাহসটা বজায় রাখার জন্য।' তারপর সেপাইর পেছন পেছন মাথা নাড়তে নাড়তে হাসি মুখে বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল।

।। সাতচল্লিশ ।।

অনেকক্ষণ ধরে নেখলুদভ হল ঘরে অপেক্ষা করছে।

জেলখানায় এসে প্রবেশ পথের দরজায় ঘন্টা বাজিয়ে সে মুন্সেফের কাছে

থেকে পাওয়া অনুমতিপত্রটা কর্তব্যরত সেপাইয়ের হাতে দিল।

'কার সাথে দেখা করতে চান?'

'বন্দিনী মাসলোভার সাথে।'

'এখন পারবেন না, পরিদর্শক ব্যস্ত আছেন।'

'তিনি কি অফিসে আছেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না সাক্ষাৎকারের ঘরে রয়েছেন,' সেপাই বলল; তাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল।

'কেন আজ কি সাক্ষাৎকারের দিন?'

'না, ওটা বিশেষ ব্যাপার।'

'আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। কি করতে হবে আমাকে?' সে বলল।

'পরিদর্শক বাইরে এলে আপনি বলবেন—একটু দাঁড়ান।' সেপাই বলল।

ঠিক এই সময় মসৃন চকচকে মুখ আর তামাকের ধোঁয়ার গন্ধওলা গোঁফ নিয়ে একজন সার্জেন্ট-মেজর পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তার ইউনিফর্মের সোনালী দড়ি চিক্‌চিক্ করছে। তিনি কর্কশ গলায় সেপাইকে বললেন, 'এখানে লোক ঢোকানোর অর্থ কি? অফিসে—'

'আমাকে বলা হয়েছে যে পরিদর্শক এখানে ছিলেন,' সার্জেন্ট-মেজরের ব্যবহারে উত্তেজনা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে নেখলুদভ বলল।

ঠিক এই সময়ে ভেতরের দরজা খুলে গেল আর পেত্রভ বেরিয়ে এল। সে রেগে আগুন আর ঘামছে। সার্জেন্টের দিকে ফিরে বলল, 'সে এটা মনে রাখবে।' তারপর নেখলুদভের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সে সামনের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

নেখলুদভ ভাবল, 'কে এটা মনে রাখবে? তাদের সবাইকে এমন দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন? সার্জেন্ট-মেজর তার দিকে ইশারা করল কেন?'

আবার সে উদ্দেশ্য করে সার্জেন্ট-মেজর বললেন, 'আপনি এখানে দেখা করতে পারবেন না; দয়া করে অফিসের দিকে যান।'

সে সম্মত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই পেছনের দরজা দিয়ে পরিদর্শক বেরিয়ে এলেন। তার অধীনস্থদের চেয়ে তাকে আরও বেশি দিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে; আর তিনি ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। নেখলুদভকে দেখেই তিনি সেপাইদের দিকে ঘুরে গেলেন। বললেন, 'ফিদোতভ, জেনানা ওয়ার্ডের পাঁচ নম্বর সেল থেকে মাসলোভাকে অফিসে নিয়ে এস।'

'আপনি কি এদিক দিয়ে আসবেন দয়া করে?' তার দিকে ফিরে তিনি বললেন। তারা সিঁড়ি দিয়ে একধাপ উঠে জানলাওলা ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকলেন। পরিদর্শক বসে পড়লেন।

একটা সিগারেট বার করতে করতে তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি মন্তব্য করলেন 'আমার প্রচণ্ড, প্রচণ্ড কাজ।'

'স্পষ্টতঃই আপনি ক্লান্ত,' নেখলুদভ বলল।

'গোটা চাকরিটা নিয়েই ক্লান্ত—খুব খাটুনির ডিউটি। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজের কাজের বোঝা হালকা করতে, আর তাতেই ব্যাপারটা আরও জঘণ্য করে তোলে। আমার একমাত্র চিন্তা হল কি করে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রচণ্ড, প্রচণ্ড কাজ!'

নেখলুদভ জানে না পরিদর্শকের বিশেষ অসুবিধেগুলো কি, কিন্তু সে দেখল

যে আজ তিনি করুণার উদ্রেক করে এমন হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন।

'হ্যাঁ সত্যি, কাজগুলো ভীষণ ভারি—,' তিনি বললেন। 'কেন আপনি এত কাজ করছেন?'

'আমার পরিবার আছে, তাছাড়া অন্য কোন রাস্তাও নেই।'

'কিন্তু এটা যদি এতই শক্ত—'

'আচ্ছা, তবুও, আপনি জানেন, খানিকটা কাজে লাগা সম্ভব; যতটা পারি আমি ব্যাপারগুলোকে নরম করে দেখি। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ব্যাপারগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করত। আমাদের এখানে দু হাজার লোক আছে; আর তারা কি ধরনের লোক! প্রত্যেকের জানা উচিত কিভাবে তাদের সামলাতে হয়। যাই হোক তারাও তো মানুষ; তাই তাদের করুণা না করে কেউ পারে না। কিন্তু তাদের আবার সামলে রাখাও দরকার।' পরিদর্শক তাকে কিছুদিন আগে আসামীদের ভেতর যা হয়ে গেছে যার সমাপ্তি ঘটেছিল কিনা একজনের হত্যায় সেই লড়াইটার কথা বলতে শুরু করলেন।

সেপাইর সাথে মাসলোভার প্রবেশের ফলে গল্পটা বাধাপ্রাপ্ত হল।

মাসলোভা পরিদর্শককে দেখার আগেই নেখলুদভ দরজার পথ দিয়ে মাসলোভাকে দেখল। তার মুখ লালাভ এবং সে সেপাইটিকে দ্রুত অনুসরণ করছে হাসতে হাসতে, মাথা নাড়াতে নাড়াতে। যখন সে পরিদর্শককে দেখতে পেল তখন হঠাৎ তার মুখের ভাব পালটে গেল; আর বেশ ভীতভাবে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সাহস ও খুশির সঙ্গে নেখলুদভকে সম্ভাষণ করল। নিজের কথাগুলোকে টেনে বের করে হাসতে হাসতে নেখলুদভের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কেমন আছ?' প্রথমবার যেমন করেছিল এবার আর তেমন নয়।

যে সাহসের সাথে মাসলোভা তাকে আমন্ত্রণ জানাল তাতে খানিকটা বিস্মিত হয়েই নেখলুদভ বলল, 'এই যে, তোমাকে সই করানোর জন্য একটা দরখাস্ত এনেছি। অ্যাডভোকেট একটা দরখাস্ত লিখেছেন তাতে তোমাকে সই করতে হবে; তারপর আমরা এটা পিটার্সবুর্গে পাঠাব।'

চোখ টিপে হেসে মাসলোভা বলল। 'আমি কিছুই ভাবছি না, তুমি যা ভাল বোঝ, কর—'

নেখলুদভ পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল।

'সে কি এখানে সই করতে পারে?' পরিদর্শকের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, বসুন। এই যে কলম; তুমি লিখতে পার কি?' পরিদর্শক বললেন।

'একসময় পারতাম,' মাসলোভা বলল। তারপর ঘাগরা ও জ্যাকেটের আস্তিন ঠিক করে নিয়ে টেবিলে বসল হাসতে হাসতে। তার ক্ষুদে চটপটে হাতে বিশ্রীভাবে কলমটা নিল, আর হেসে নেখলুদভের দিকে এক ঝলক তাকাল।

নেখলুদভ তাকে বলল কি লিখতে হবে এবং কোথায় সই করতে হবে।

সে কালিতে কলমটা চুবিয়ে নিয়ে সতর্কভাবে সেটা ঝেড়ে নিল, তারপর নিজের নাম সই করল।

নেখলুদভ আর পরিদর্শকের দিকে বারবার চেয়ে একবার কলমটা কালির

মধ্যে রেখে, পরমুহূর্তেই আবার সেটাকে কাগজের ওপর উঠিয়ে বলল, 'এই তো ?'

'তোমাকে আমার কতকগুলো কথা বলার আছে,' কলমটা তার কাছ থেকে নিতে নিতে নেখল্যুদভ বলল।

'ঠিক আছে ; বল।' সে বলল। আর হঠাৎ যেন কিছু একটা মনে হওয়াতে কিংবা ঘুম পাওয়ায় সে গম্ভীর হয়ে উঠল।

পরিদর্শক উঠে দাঁড়ালেন, এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নেখল্যুদভকে মাসলোভার সাথে একা রেখে।

॥ আটচল্লিশ ॥

যে সেপাইটি মাসলোভাকে ভেতরে নিয়ে এসেছে সে এখনও তাদের থেকে খানিক দূরে বসে রয়েছে।

নেখল্যুদভের পক্ষে চরম মুহূর্ত সমাগত। সে সীমাহীনভাবে নিজেকে দোষারোপ করে চলেছিল প্রথম সাক্ষাৎকারকালে আসল কথাটা তাকে না বলতে পারাতে। আর এখন সে যে তাকে বিয়ে করবে এটা বলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাসলোভা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে। ঘরে আলো জ্বলছে, আর নেখল্যুদভ এই প্রথম একেবারে কাছ থেকে তার মুখ দেখছে ; পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তার গালের ভাঁজ আর ফুলো চোখের পাতা। আগের চেয়ে তার প্রতি বেশি করুণা জাগল তার মনে।

টেবিলে ঝুঁকে,—ইহুদি ধাঁচের ধূসর গালপাট্টাওলা সেপাই যাতে শুনতে না পায় তাই নিচু স্বরে নেখল্যুদভ বলল, 'যদি এ দরখাস্তে কোন কাজ না হয়, তবে আমরা সম্রাটের কাছে আবেদন করব। সম্ভবপর সবকিছু করা হবে।'

'শুরু থেকেই যদি আমাদের একজন ভাল অ্যাডভোকেট থাকত।' মাসলোভা বাধা দিল। 'আমার উকিল একেবারে ছেলেমানুষ। সে কিছুই করেনি, কেবল অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করেছে।' সে বলল আর হেসে উঠল। 'যদি তখন থেকে জানা যেত যে আমি তোমার পরিচিত তবে এটা অন্যরকম ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ওরা ভাবে সকলেই চোর।'

'আজ সে কী অদ্ভুত,' নেখল্যুদভ ভাবল আর তার মনে যা রয়েছে সে কথাটা যখন বলতে যাচ্ছে ঠিক তখনই মাসলোভা আবার শুরু করল, 'একটা বিষয় আমি বলতে চাই। আমাদের এখানে একটি বুড়ি আছে : বড় সুন্দর, সবাইকেই সে অবাক করে দেয়। তাকে বিনা কারণে বন্দী করা হয়েছে, এমনকি তার ছেলেকেও ; আর সবাই জানে যে তারা নির্দোষ, যদিও একটা বাড়িতে আগুন লাগানোর দায়ে তারা অভিযুক্ত হয়েছে। তোমার সাথে আমার পরিচয় আছে জেনে সে বলল, 'তাকে বোলো আমার ছেলের সাথে দেখা করতে, সে তাকে এ ব্যাপারে সবকিছু বলবে।' বলার সময় মাসলোভা তার মাথাটা একেক দিকে ঘোরাচ্ছে আর নেখল্যুদভের দিকে ঝলক দিয়ে তাকাচ্ছে। 'তাদের নাম মেনসভ। আচ্ছা, তুমি এটা করবে ? সত্যি বড় সুন্দর বুড়ী ! তুমি বুঝতেই পারবে যে সে নিরপরাধী। তুমি যদি এটা কর তাহলে খুব ভাল হয়।' তারপর সে হেসে, নেখল্যুদভের দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল ; শেষে ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল।

'ঠিক আছে আমি তাদের সম্পর্কে খোঁজ নেব,' নেখল্যুদভ বলল ; মাসলোভার সহজ সরল স্বচ্ছ ভঙ্গিতে সে আরও বিস্মিত হল। 'কিন্তু আমি তোমাকে নিজের

সম্পর্কে যা বলতে যাচ্ছিলাম। আগের বার কি বলেছিলাম তোমার তা মনে আছে?'

'অনেক কিছু বলেছিলে আগেরবার। কি বলেছিলে?' হাসি আর এক পাশ থেকে অন্য পাশে মাথা নাড়ানো অব্যাহত রেখে সে বলল।

'আমি বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।' সে শুরু করল।

'তাতে লাভটা কি? ক্ষমা, ক্ষমা; এতে ভালটাই বা আছে কি? তার চেয়ে ভাল হয় যদি—'

'আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, শুধু কথা দিয়ে নয় বরং কাজে। আমি তোমাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

মাসলোভার মুখে হঠাৎ ভীতির ভাব খেলে গেল। তার তেরছা চোখ নেখল্যুদভের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল, তবু মনে হল যেন তাকে দেখছেই না।

'কি জন্যে?' রাগত স্বরে ভ্রূ কুঁচকে সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি অনুভব করছি, ঈশ্বরের কাছে এটা করা আমার কর্তব্য।'

'এখন তুমি কোন ঈশ্বরকে পেয়েছ? তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ না। সত্যিই ঈশ্বর। কোন ঈশ্বর? তোমার ঈশ্বরের কথা স্মরণ করা উচিত ছিল তখন,' সে বলল, আর মুখখানা খোলা রেখেই হেসে গেল।

হঠাৎ নেখল্যুদভ খেয়াল করল যে মাসলোভার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ মিশে রয়েছে, ফলে সে তার এই উত্তেজনার কারণটা বুঝতে পারল। বলল, 'একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর।'

'কেন আমি শান্ত হব? তুমি ভাবছ আমি মাতাল হয়েছি? আমি মাতাল ঠিকই, তবে এও জানি যে আমি কি বলছি।' সে দ্রুত বলতে শুরু করল, আর তার মুখ রক্তের মত লাল হয়ে উঠল। 'আমি একটা আসামী, একটা বেশ্যা, আর তুমি হলে একজন ভদ্রলোক এবং একজন রাজকুমার। আমাকে ছুঁয়ে নিজেকে মাটি করার তোমার কোন প্রয়োজন নেই; তুমি তোমার রাজকুমারীর কাছে যাও। আমার মূল্য মাত্র দশ রুবলের একটা নোটের সমান।'

কম্পিত কণ্ঠে নেখল্যুদভ বলল, 'যত নিষ্ঠুরভাবেই তুমি বলনা কেন, কিন্তু আমি যা অনুভব করছি, তা তুমি কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না। তুমি কল্পনাই করতে পারবে না যে আমি নিজেকে কী মাত্রায় দোষী অনুভব করছি।'

'আজ তুমি নিজেকে দোষী অনুভব করছ।' তাকে লক্ষ্য করে সে ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'কিন্তু তখন তো তুমি এরকম অনুভব করনি; বরং আমাকে একটা একশ রুবলের নোট ছুঁড়ে দিয়েছিল। বলেছিলে সেটাই হচ্ছে আমার দাম।'

'আমি জানি; কিন্তু এখন কি করা যায়?' নেখল্যুদভ বলল, 'আমি স্থির করেছি, তোমাকে আর পরিত্যাগ করব না, আর তাই করব যা তোমাকে বললাম।'

'কিন্তু আমি বলছি যে তুমি তা করবে না,' বেশ জোরে হেসে উঠে সে বলল।

'কাত্যুসা!' নেখল্যুদভ তার হাত ধরল।

'তুমি চলে যাও। আমি একটা আসামী আর তুমি হলে একজন রাজকুমার; তোমার এখানে কোন কাজ নেই,' সে কেঁদে উঠল। রাগে তার চেহারাটাই পালটে গেল; সে জোর করে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

মাসলোভার আত্মার যা জেগে উঠেছে সেটাকে দ্রুত প্রকাশ করার জন্য সে বলে চলল, 'আমার কাছ থেকে তুমি এ জীবনের সব আনন্দ নিংড়ে নিয়েছ আর এখন চাইছ আগামী জীবনে 'আমার মাধ্যমেই নিজেকে রক্ষা করতে। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না হয়, তোমার চশমা আর তোমার নোংরা মোটা মগের মত শরীরটা—দূর হও,' সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে সে চিৎকার করে উঠল।

সেপাই তাদের কাছে এগিয়ে এল।

'এখানে আবার কি অনিষ্ট করতে এসেছ? ওসব হবে না।'

'অনুগ্রহ করে ওকে একা থাকতে দাও,' নেখলুদভ বলল।

সেপাইটি বলল, 'তার কিছুতেই নিজের অবস্থার কথা ভোলা উচিত নয়।'

'অনুগ্রহ করে আর একটু অপেক্ষা কর,' নেখলুদভ বলল এবং সেপাইটি জানলার কাছে ফিরে গেল।

চোখ নামিয়ে, দুটো হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মাসলোভা আবার বসে পড়ল; নেখলুদভ তার দিকে ঝুঁকে পড়ল কি করতে হবে সেটা না বুঝেই; বলল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?'

'অর্থাৎ তুমি আমাকে বিয়ে করবে? এটা কক্ষনো হবে না। তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। হ্যাঁ তাই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তবু আমি তোমার উপকার করে যাব।'

'সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তোমার কাছে থেকে কিছুই চাই না। এটাই হল সোজা কথা।' মাসলোভা বলল, 'উঃ, কেন তখন মরলাম না!' কথাটা বলে সে করুণ সুরে কাঁদতে লাগল।

নেখলুদভ আর কথা বলতে পারল না। তার চোখের জল তারও মনকে ছুঁয়েছে।

মাসলোভা চোখ তুলল, বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল, আর রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

সেপাই আবার এগিয়ে এসে তাদের মনে করিয়ে দিল যে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। মাসলোভা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি উত্তেজিত। সম্ভব হলে আমি কাল আবার আসব—তুমি এটা নিয়ে ভেবে দেখো।' নেখলুদভ বলল।

সে তাকে কোন উত্তর দিল না, এবং তার দিকে না তাকিয়েই সেপাইকে অনুসরণ করে ঘরের বাইরে চলে এল।

মাসলোভা সেলে ফিরে আসার পর কোরাবলিওভা বলল, 'বুঝলে মেয়ে, তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে এল; মনে হয় তোমার ওপর তার খুব টান আছে। যখন সে তোমার পেছনে আছে তখন এটাকে দারুণ কাজে লাগাও। সে তোমাকে বেরোতে সাহায্য করতে পারে। জানবে বড়লোকদের দ্বারা সবই সম্ভব।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' সঙ্গীত মধুর স্বরে ওয়াচম্যানের বউ বলল। 'কোন গরিব যদি বিয়ে করতে চায় তো তার ঠোঁট থেকে চায়ের পাত্রটা অনেকবারই ফস্কে যায়, কিন্তু বড়লোকের শুধু ব্যাপারটা মনে হলেই হল। আমরা জমকালো পোশাক পরা একজন ভদ্রলোককে জানতাম, তার 'ডাকি' না ওরকমই কি যেন একটা নাম। ভাবতে পার তিনি কি করেছিলেন?'

হ্যাঁ, আমার ব্যাপারটা বলেছিলে ?' বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু মাসলোভা তার বন্ধুদের কথার কোন জবাবই দিল না। তেরচা চোখ দুটো ঘরের এক কোণে স্থির করে সে কাঠের বিছানায় শুয়ে পড়ল, আর সন্ধ্যে পর্যন্ত এভাবেই থাকল।

তার আত্মায় এক বেদনাদায়ক সংগ্রাম চলছে। নেখল্যুদভ যা বলেছে তাতে তার মনে পড়ে গেছে সেই দুনিয়ার কথা যেখানে সে কষ্ট পেয়েছে, যা সে না বুঝেই ছেড়ে এসেছে, শুধুমাত্র ঘৃণার বসে! যে মোহের মধ্যে সে বাস করছিল তা থেকে সে এখন জেগে উঠেছে। কিন্তু যা ঘটে গেছে তার জ্বলজ্বল স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা সত্যি অসম্ভব। এটা তার ওপর একটা প্রবল পীড়ন ছাড়া আর কিছুই নয়; তাই সন্ধ্যার সময় সে আবার খানিকটা ভদকা আনিয়ে বন্ধুদের সাথে পান করল।

।। ঊনপঞ্চাশ ।।

'তাহলে এর মানে হল—এই,' জেল থেকে বেরিয়ে এসেই নেখল্যুদভ ভাবল; কেবলমাত্র এখনই সে তার অপরাধ উপলব্ধি করতে পারল। যদি সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে না চাইত তবে কখনোই বুঝতে পারত না যে তার অপরাধটা কত ভয়ঙ্কর। শুধু তাই নয়, মাসলোভার পক্ষেও তাহলে বুঝে ওঠা সম্ভব হত না যে কত বড় অন্যায় তার প্রতি করা হয়েছে। শুধুমাত্র এখনই এটা তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল। একমাত্র এখনই নেখল্যুদভ দেখতে পেল এই স্ত্রীলোকটির আত্মার প্রতি কত বড় অবিচার করা হয়েছে; আর কাত্যুসাও অনুভব করতে পারল তার প্রতি কত বড় অন্যায় সাধিত হয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত নেখল্যুদভ আত্ম-প্রশংসার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, নিজের অনুতাপের প্রশংসা করছিল, কিন্তু এখন সে আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে। সে জানে এখন আর কাত্যুসাকে ছেড়ে দেওয়া তাঁরপক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও তার কাছে মোটেই বোধগম্য হচ্ছেনা যে তাদের দুজনের সম্পর্কের ফলে কার কতটা লাভ হবে।

দরজা থেকে বের হবার মুখে, বদমাশের মত দেখতে একজন সেপাই বুকে ক্রুশ আর মেডেল ঝুলিয়ে রহস্যজনকভাবে ছুটে এসে তার হাতে একটা চিরকুট দিতে দিতে বলল, 'একজন এই কাগজটা দিল।

'কে ?'

অস্বাভাবিক সুরে সে বলল, 'পড়লেই বুঝতে পারবেন। একজন রাজনৈতিক বন্দিনী। আমি তাদেরই ওয়ার্ডে পাহারা দিই, তাই সে আমাকে বলল; এবং যদিও এটা আইনবিরুদ্ধ, তবু, মানবতার খাতিরে—'

নেখল্যুদভ এটা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল যে জেলের চৌহদ্দির মধ্যেই, প্রায় সকলের চোখের সামনেই রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডের একজন সেপাই তাকে একটা চিরকুট দিচ্ছে। অবশ্য সে এটা বুঝতে পারল না যে এই লোকটা সেপাই আর গুপ্তচর দুই-ই। যাইহোক, সে কাগজটা নিয়ে বাইরে এসে পড়ল।

তাতে বেশ সাহসী হাতে লেখা রয়েছে:

'শুনলাম আপনি জেল পরিদর্শন করতে এসেছেন, এবং একজন ফৌজদারি মামলার আসামীর ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহলী; সে কারণে আপনাকে দেখার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে মনে মনে। অনুগ্রহ করে আমার সাথে দেখা করার জন্য একটা অনুমতিপত্র চান। ওরা আপনাকে তা দেবে। যদি আসেন তবে আপনার আশ্রিত

আর আমাদের দলের সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারব।

আপনার একান্ত অনুগতা ভেরা দুখোভা।'

শুয়োর শিকার করতে গিয়ে নেখলুদভ ও তার বন্ধুরা একবার যেখানে রাত কাটিয়েছিল সেই নোভগোরদ গুর্বেনিয়ার অজপাড়াগাঁয়ে একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করত ভেরা দুখোভা। সে পড়াশুনা করার জন্য নেখলুদভের কাছে কিছু অর্থ-সাহায্য চেয়েছিল; আর নেখলুদভও তাকে তা দিয়েছিল। তারপর তার কথা সে ভুলেই যায়। এতদিন পরে আজ সে জানতে পারল যে সেই মহিলাটিই রাজনৈতিক বন্দিনী হিসেবে জেলে আটক রয়েছে (সম্ভবতঃ সেখানেই সে নেখলুদভের কাহিনী শুনেছে), এবং তাকে নিজের কাজে লাগাতে চাইছে।

তখন সবকিছু কতই না সহজ ছিল; কিন্তু আজ সবই বেশ কঠিন আর জটিল।

দুখোভার সঙ্গে তার পরিচয়ের সেই দিনগুলোর কথা নেখলুদভের স্পষ্ট মনে পড়ল। সেটা ছিল লেন্টের ঠিক আগে, আর জায়গাটা ছিল রেলপথের থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। শিকার পুরোপুরি সফল হয়েছিল—দু দুটো শুয়োর মারা হয়েছিল। তারপর চলে আসার আগে, তারা যখন খেতে বসেছে, তখন যে কুটিরটায় তারা ছিল, সেই কুটিরের মনিবানী এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে জানাল যে স্থানীয় এলাকার প্রধান যাজকের মেয়েটি রাজকুমার নেখলুদভের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে।

কে একজন যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মেয়েটি কি সুন্দরী?'

নেখলুদভ বলেছিল, 'না, ওসব কথা একেবারে নয়।' তারপর গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে, মুখ মুছে, যাজকের মেয়ের তার সাথে কি কাজ থাকতে পারে তা ভাবতে ভাবতে সেই কুটিরেরই অপর প্রান্তে অতিথিশালার দিকে এগিয়েছিল।

সেখানে পৌঁছে দেখেছিল, অত্যন্ত কুৎসিৎদর্শন, মোটাসোটা চেহারার একটি মেয়ে ফেল্টের টুপি মাথায়, গরম জামা গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সারা শরীরের মধ্যে একমাত্র দর্শনীয় ছিল বাঁকা ধনুকের মত ভ্রূ-জোড়ার নিচে অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখ।

মনিবানী মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই যে, ইনিই হচ্ছেন নেখলুদভ, তুমি এর সাথে কথা বল; ততক্ষণে আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।'

সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বলুন, আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি?'

মেয়েটি বেশ সংকোচের সঙ্গে বলতে শুরু করে, 'আমি…মানে…আমি দেখলাম আপনি বেশ আজেবাজে ব্যাপারে বহু অর্থ নষ্ট করছেন। অথচ আমি শুধু চাইছি একটা জিনিস,…যা মানুষের উপকারে আসে, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না, কেমনা আমি তো কিছুই জানি না।'

তার চোখ দুটো ছিল বড় বিশ্বস্ত, বড় দয়ালু, আর তার অটল অথচ লাজুক দৃষ্টি ছিল এতই আকর্ষণীয় যে এসব ক্ষেত্রে নেখলুদভের যা হয়ে থাকে সেবারও তাই হল। সে তার অবস্থা বুঝল এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হল।

'আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি একজন শিক্ষয়িত্রী; বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে চাই, কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। তার মানে এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে নেওয়া

হচ্ছে না ; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মত সঙ্গতি আমার নিজেরই নেই। অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করুন ; পড়াশুনো শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করে দেব। আমি ভাবছিলাম বড়লোকেরা ভাল্লুক মারে, গরিবদের মদ, খেতে দেয়, কিন্তু তাতে কি সমাজের কোন উপকার হয় ? কেন তারা ভাল কাজ করবে না ? আমার প্রয়োজন মাত্র আশি রুবলের···অবশ্য আপনার যদি দিতে আপত্তি থাকে···' মেয়েটি কুণ্ঠার সঙ্গে নিজের কথা শেষ করেছিল।

নেখলুদভ বলেছিল, 'ব্যাপারটা বরং উলটো। আমি নিজেই আপনার কাছে আমাকে এমন একটা সুযোগ দেবার জন্য কৃতজ্ঞ। দাঁড়ান এক্ষুণি টাকাটা এনে দিচ্ছি।'

সে পথে পা দিতেই একটি বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল, যে আড়াল থেকে তাদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল। বন্ধুটির ঠাট্টায় কোনরকম কান না দিয়ে সে নিজের ব্যাগ থেকে টাকাটা এনে তুলে দিয়েছিল মেয়েটির হাতে। বলেছিল, 'অনুগ্রহ করে এরজন্য ধন্যবাদ জানাবেন না : বরং আমারই উচিত আপনাকে ধন্যবাদ জানানো।'

এখন এসব কথা ভাবতে তার সত্যিই খুব ভাল লাগছে ; ভাল লাগছে সেই ঘটনার কথা চিন্তা করতে—যা কিনা এই ব্যাপারটা নিয়ে একজন অফিসারের আপত্তিকর ঠাট্টার ফলে একেবারে হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ; শেষে যার মিটমাট হয়েছিল একজন বন্ধুর মধ্যস্থতায়—আর যার ফলে তার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করেছিল। মনে পড়ছে সেই শিকারের দিনগুলোর কথা, সেই রাতে রেল স্টেশনে ফিরে আসার পরের সুখানুভূতির স্মৃতিগুলো।

প্রতিটি দু ঘোড়ায় টানা বিরাট লম্বা এক স্লেজগাড়ির সারি দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে বনের মধ্যে সরু রাস্তাটা ধরে, কখনও বিরাট বিরাট গাছের মাঝখান থেকে, কখনও তুষারের চাপে নুয়ে পড়া ফারের ডালপালার নিচ দিয়ে। সেই গভীর অন্ধকারকে চমকে দিয়ে হঠাৎ লাল আলো জ্বলে উঠল—কে যেন বেশ সুগন্ধী একটা সিগারেট ধরাল। অসিপ নামে একজন ভাল্লুকচালক হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবিয়ে একটা স্লেজ থেকে অন্য স্লেজে যাচ্ছে, আর কখনও গভীর বরফে লুকিয়ে পড়া হরিণের বর্ণনা দিচ্ছে, আবার কখনও বা গভীর গুহায় শুয়ে থাকা ভালুকের নাক ডাকার শব্দ করছে।

এ সবই আজ তার মনে পড়ছে ; কিন্তু সব থেকে বেশি করে মনে পড়ছে সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের আনন্দ, শক্তি আর বন্ধনহীন মুক্তির কথা। সেদিন তার ফুসফুস তুষারপূর্ণ বাতাসে এমন গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছিল যে তার কোটটা বুকের সঙ্গে একেবারে এঁটে বসে গিয়েছিল ; নিচু ডাল থেকে মুখের ওপর ঝরে পড়ছিল তুষার ; শরীরটা গরম হয়ে গিয়েছিল, মুখটা হয়ে উঠেছিল তাজা আর আত্মা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বন্ধনহীন মুক্তির আস্বাদে ; কলঙ্ক, ভয় অথবা ইচ্ছা···সত্যি, কী ভালই না ছিল সময়টা। কিন্তু আজ ? কী কষ্টকর, কী ভয়ানক।

স্পষ্টতঃই ভেরা একজন বিপ্লবী আর সে কারণেই সে বন্দী রয়েছে। সে অবশ্যই তার সাথে দেখা করবে ; এবং বিশেষতঃ এ কারণে যে সে তাকে কথা দিয়েছে মাসলোভার ব্যাপারে পরামর্শ দেবে।

॥ পঞ্চাশ ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, গতকাল কি করেছে সে কথা ভেবে সে মনে মনে বেশ ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু এই ভয় সত্ত্বেও, তার মন আরও বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল, যা শুরু করেছে সেটাকে চালিয়ে যেতে।

কর্তব্যবোধে সচেতন হয়ে, জেলে মাসলোভা ও মেনসভ--মা ও ছেলে—যাদের সম্পর্কে মাসলোভা তাকে বলেছে—তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতিপত্র আদায়ের জন্য সে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাসলেনিকভের বাড়ির পথে রওয়ানা হল। এদের ছাড়াও, দুখোভা, যে মাসলোভার কাজে আসতে পারে, তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতিপত্র সে চাইবে ঠিক করেছে।

অনেকদিন আগে থেকেই সে মাসলেনিকভকে চেনে। তারা দুজনে একসাথে সৈন্যবাহিনীতে ছিল। মাসলেনিকভের ওপর দায়িত্ব ছিল সমগ্র বাহিনীর। তিনি যেমন দয়ালু ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। রাজকীয় পরিবার আর সৈন্যবাহিনীর বাইরে কিছু জানার কোন ইচ্ছেই ছিল না তার। এখন নেখল্যুদভ তাকে এমন একজন অফিসার হিসেবে দেখছে যিনি কিনা শাসন বিভাগের পদের বদলে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বেশ ধনী এক কর্মচঞ্চলা মহিলাকে বিয়ে করেছেন। সেই মহিলাই তাকে এই পদ পরিবর্তনে বাধ্য করেছেন।

মহিলাটি তাকে নিয়ে মজা করতেন আর এমনভাবে আদর করতেন যে মনে হত তিনি যেন তার কাছে একটা পোষা জন্তু। একবার শীতে নেখল্যুদভ তাদের দেখছিল। কিন্তু এই দম্পতিটি তার কাছে এমন নীরস বলে মনে হয়েছিল যে সে আর কখনও তাদের কাছে যায়নি।

নেখল্যুদভকে দেখে মাসলেনিকভের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখনও তার সেই একই গোলগাল মুখ, সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় যেমনটি ছিল তেমনি থলথলে চেহারা আর পরনে পরিপাটি পোষাক। তখন তিনি সব সময়ই ভাল করে ব্রাশ করা সর্বাধুনিক ইউনিফর্ম পড়তেন; সেটা তার কাঁধ আর বুকে যেন অঁাট হয়ে থাকত। আর এখন তার গায়ে রয়েছে সর্বাধুনিক ছাঁচের অসামরিক ইউনিফর্ম, কিন্তু ভুরিভোজনে অভ্যস্ত শরীরটায় তা বড্ড বেশি অঁাট হয়ে গেছে। তার চওড়া বুক ঠেলে বেরিয়ে আছে। বয়সের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও (মাসলেনিকভের পুরো চল্লিশ), দুজনের মধ্যে এককালে বেশ বন্ধুত্ব ছিল।

'কি হে পুরনো দোস্ত. কি সৌভাগ্য আমার, তুমি এসেছ! চল, আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করবে। মিটিংয়ের আগে হাতে মোটে দশ মিনিট সময় আছে। আমার ওপরওলা ছুটিতে আছেন, জান তো, সুতরাং গুবেনিয়ার শাসন ব্যবস্থার হর্তাকর্তা এখন আমিই,' নিজের খুশিক গোপন রতে অপবাগ হয়ে তিনি বলেই ফেললেন।

'আমি একটা কাজে এসেছি।'

'কি কাজ?' মাসলেনিকভ উদ্বিগ্ন ও কর্কশ স্বরে জানতে চাইলেন। নিজেকেই তিনি নিজের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাঁড় করালেন।

'জেলের ভেতরে আছে এমন একজনের ব্যাপারে আমিই খুবই আগ্রহী ('জেল' শব্দটায় মাসলেনিকভের মুখ কঠোর হয়ে উঠল): এবং তার সাথে দেখা করতে চাই, তবে সাধারণ সাক্ষাৎকারের ঘরে নয়, অফিসে; আর শুধু স্বাভাবিক দেখা করার সময়েই নয়, অন্য সময়েও। আমি শুনলাম এটা নাকি তোমার ওপর

নির্ভর করছে।'

'নিশ্চয়ই, তোমার জন্য আমি সবরকমের চেষ্টা করব।' নেখল্যুদভের হাঁটুতে দুহাত রেখে মাসলেনিকভ তার গাম্ভীর্যকে কাজে লাগাতে চাইছেন এমন স্বরে বললেন, 'কিন্তু মনে রেখো, আমি হচ্ছি এক ঘন্টার বাদশা।'

'তুমি কি আমাকে এমন একটা অনুমতিপত্র দেবে যাতে তার সাথে দেখা করতে পারি?'

'স্ত্রীলোক কি?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে তাকে রেখেছ কেন?'

'বিষপ্রয়োগের অপরাধে, কিন্তু তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'

হ্যাঁ, ওরকমই হয়ে থাকে; তোমাদের জুরি ব্যবস্থা যা। আমি জানি তুমি আমার সাথে একমত হবে না, কিন্তু কোন উপায় নেই, অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি,' গত বারোমাস ধরে তিনি একটা প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণপন্থী দলের কাগজে যে মত পড়েছেন তাই আবার বললেন। 'আমি জানি তুমি একজন উদারপন্থী।'

'জানিনা আমি উদারপন্থী কি না,' নেখল্যুদভ হেসে হেসে বলল। একটা রাজনৈতিক দলের সাথে নিজেকে সব সময় যুক্ত করায় এবং উদার পন্থী বলায় সে নিজেই মনে মনে বিস্মিত হত, কারণ সে তো মনে করত যে, কোন মানুষের বিচারের আগে তার সব কথা শোনা প্রয়োজন, শাস্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আইনের চোখে সব মানুষই সমান, কোন মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবেনা, মারধোর করা হবেনা, বিশেষ করে যারা তখন পর্যন্ত শাস্তি পায়নি তাদেরকে তো বটেই, 'আমি উদারপন্থী কিনা জানিনা, তবে জানি যে আজকের ব্যবস্থাটা যতই খারাপ হোক না কেন পুরনো ব্যবস্থার থেকে ঢের ভাল।

'তোমার অ্যাডভোকেট কে?'

'ফানারিনের সাথে কথা বলেছি।'

এই ফানারিনই আগের বছর সাক্ষী হিসেবে তাকে জেরা করেছিল সেই কথা মনে করে মাসলেনিকভ মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হা কপাল, ফানারিন!' 'আমার মতে ওর সাথে কিছু না করতে যাওয়াই ভালো, ও একটা কুখ্যাত লোক।'

'আমার আরেকটা অনুরোধ আছে, 'তার কথার জবাব না দিয়ে নেখল্যুদভ বলল, 'একটি যুবতী মহিলা, যার সাথে আমার অনেক দিন আগে থেকে পরিচয় রয়েছে, এক শিক্ষয়িত্রী, খুবই করুণার পাত্রী, তিনিও এখন জেলে বন্দী, তিনিও আমার সাথে দেখা করতে চান। তাঁর সাথে দেখা করার একটা অনুমতিপত্র দেবে কি আমায়?

মাসলেনিকভ মাথাটা এক পাশে নুইয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন 'তিনি কি রাজনৈতিক বন্দিনী?'

'হ্যাঁ, আমাকে তাই বলেছেন।'

'হুঁ, তুমি তো জানই একমাত্র আত্মীয়েরাই রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে দেখা করার অনুমতি পায়। তবু তোমাকে আমি একটা অনুমতিপত্র দেব। ওদের মজা মারতে দাও, ঈশ্বরের আশীর্বাদও পাক ওরা। যার সাথে তুমি দেখা

করতে চাও তার নামটি কি? দুখোভা? সে কি খুব সুন্দরী?'

'সাংঘাতিক।'

মাসলেনিকভ অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা শিরোনামা ছাপা সাদা কাগজে লিখলেন:

'পত্রবাহক, রাজকুমার দিমিত্রি ইভানোভিচ নেখলুদভকে জেল অফিসে বন্দিনী মাসলোভা এবং নার্স দুখোভার সাথে দেখা করতে দেওয়া যেতে পারে।' তারপর বিস্তারিত অলঙ্কার দিয়ে শেষ করলেন।

'এখন তুমি দেখতে পাবে আমরা সেখানে কেমন আদেশ মেনে চলি। আর আদেশ মেনে চলাটাও বেশ শক্ত: কারণ এত ভিড়, বিশেষ করে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদির দলের—তবে আমি তাদের ওপর বেশ কড়া নজর রাখি আর কাজ পছন্দ করি। তুমি দেখতে পাবে তারা সেখানে কেমন আরামে এবং স্বচ্ছন্দে রয়েছে। আসলে তাদের সাথে আচার ব্যবহার কেমন করতে হবে তা জানা চাই। এই তো কদিন আগে ছোট্ট একটা ঝামেলা হল—অবাধ্যতা; অন্যলোক হলে বলত বিদ্রোহ, আর অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দিত। কিন্তু আমরা শান্তভাবে ব্যাপারটা সেরে ফেলেছি। একদিকে আমরা বারবার বোঝাব আবার অন্যদিকে থাকবে ক্ষমতা আর দৃঢ়তা।' তিনি শরীরের মাংস শক্ত করে নিলেন: সাদা, তুর্কিদের মত গোল মুঠো, যা তার জামার আস্তিনের সোনালী কারুকাজ করা বোতাম আটকানো শক্ত কাফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে সেটা ঠুকে বললেন, 'অনুরোধ আর দৃঢ় শক্তি।'

'হুঁ সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না,' নেখলুদভ বলল, 'আমি সেখানে দুবার গেছি আর খুব হতাশ বোধ করেছি।'

'কাউন্ট পত্নী পাশেকের সাথে তোমার আলাপ থাকা উচিত ছিল' মাসলেনিকভ কথাবার্তা উষ্ণ রাখার জন্য সেভাবেই বলে চললেন 'এ ধরনের কাজের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, অনেক ভাল কাজ করেছেন। তাকে ধন্যবাদ, আর বোধ হয় মিথ্যে বিনয় ছাড়াই আমি বলতে পারি, আমার কাছে—সবকিছু পালটে গেছে; এমনভাবে পালটে গেছে যে আগের ভীতি আর নেই-ই, আর সত্যি ওরা যে ওখানে যথেষ্ট সুখদায়কভাবেই রয়েছে, তা তুমি দেখতেই পাবে। ফানারিনের ব্যাপারে, তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না—তাছাড়া আমার সামাজিক অবস্থান আমাদের রাস্তাকে আলাদা করে রেখেছে—কিন্তু সে নিঃসন্দেহে একটা বদলোক; আর সে আদালতের ভেতর এমন সব কথা বলার স্বাধীনতা নেয়—এমন সবকথা—!'

নেখলুদভ কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা ধন্যবাদ।' তারপর আর তার কথা না শুনেই সে তার পুরনো সহকর্মী অফিসারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

'আরে, ভেতরে গিয়ে একবার আমার বউয়ের সাথে দেখা করবে না?'

'মাফ কর ভাই, আজ আর সময় নেই।'

'হা ভগবান, আমাকে সে কোনদিনই ক্ষমা করবে না।' মাসলেনিকভ তার পুরনো বন্ধুকে সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে যেমনটা তিনি করে থাকেন দ্বিতীয় সারির গুরুত্বপূর্ণ মানুষজনের ক্ষেত্রে, এবং যাদের মধ্যে তিনি নেখলুদভকেও ধরে নিয়েছেন, বললেন, "এক মুহূর্তের জন্যে ঢোক।'

কিন্তু নেখল্যুদভ অনড়। আর চাপরাসি এবং দারোয়ান যখন তাকে ছড়ি আর ওভারকোটটা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতে লাগল, আর দরজাটা খুলে দিল, যেটার বাইরে একজন পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, নেখল্যুদভ তখন আবার পুনরাবৃত্তি করল এই বলে যে সত্যিই সে আর থাকতে পারছে না।

'তাহলে, আমি তাকে বলব যে তুমি বুধবার আসছ।' সিঁড়ির ওপর থেকে মাসলেনিকভ চিৎকার করলেন।

॥ একান্ন ॥

নেখল্যুদভ মাসলেনিকভের বাড়ি দিয়ে বের হয়ে সোজা চলে এল জেল পরিদর্শকের বাড়িতে। সেই একই নিকৃষ্ট ধরনের পিয়ানোর বাজনা শুনে সে চমকে উঠল : তবে এবার আর কোন উজ্জ্বল সুর নয়, বরং ক্লেমেন্তির মৃদু লয় সেই একই দ্রুততার সঙ্গে প্রাণশক্তিপূর্ণ স্পষ্টতায় বেজে চলেছে। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চাকরানীটি বলল যে পরিদর্শক বাড়িতেই আছেন, আর বসবার জন্য সেই ছোট বৈঠকখানাটা দেখিয়ে দিল যার ভেতরে রয়েছে একটা শোফা, শোফার সামনে রয়েছে একটা টেবিল আর সেই টেবিলটায় লতাপাতা আঁকা এক টুকরো কাপড়ের ওপর দাঁড় করানো রয়েছে একটা বড় বাতি ; তার ওপরে রয়েছে একটা গোলাপী কাগজে তৈরি ঢাকনা যেটার একটা পাশ কিছুটা পুড়ে গিয়েছে। স্বভাবজনিত দুঃখ আর ক্লান্তির দৃষ্টি নিয়ে পরিদর্শক ঘরে ঢুকলেন। ইউনিফর্মের মাঝের বোতামটা আঁটতে আঁটতে বললেন, 'বসুন! বসুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমি এই মাত্র উপ-রাজ্যপালের কাছে ছিলাম ; তার কাছ থেকে এই আদেশপত্রটা নিয়ে এসেছি। আমি বন্দিনী মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বাজনার শব্দের জন্য ঠিক মত শুনতে না পাওয়ায় তিনি বললেন, 'মারকোভা?'

'না মাসলোভা।'

'ওঃ, আচ্ছা।' পরিদর্শক উঠে পড়ে যেদিক থেকে বাজনার আওয়াজ আসছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

'মারিয়া, তুমি কি এক মুহূর্তের জন্য থামতে পার না?' এমন সুরে কথাটা বললেন যে মনে হল এ বাজনা তার কাছে বিষের মত। 'কারও একটা কথা শোনার জো নেই।'

বাজনা থেমে গেল, তারপর ভেসে এল অনিচ্ছুক পদক্ষেপের শব্দ, এবং কে একজন যেন দরজার দিকে তাকাল।

নীরবতাপূর্ণ এই বিরতিতে পরিদর্শক বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করলেন ; হালকা তামাকে তৈরি একটা সিগারেট নিজে ধরিয়ে, আর একটা এগিয়ে দিলেন নেখল্যুদভের দিকে। কিন্তু সে সেটা নিল না। বলল, 'মাসলোভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পরিদর্শক বললেন, 'মাসলোভা! আজ মাসলোভার সঙ্গে দেখা করাটা খুব সহজ নয়।'

'কি ব্যাপার?'

মৃদু হেসে পরিদর্শক বললেন, 'এটা আপনারই দোষ রাজকুমার। তার হাতে কোন টাকা পয়সা দেবেন না। যদি দিতে হয় তো আমার হাতেই দেবেন, আমি

তার জন্য রেখে দেব। সে আজ বেশ কিছুটা মদ্যপান করে একেবারে মাতাল হয়ে রয়েছে, এমনকি বেশ খেপে গেছে। এটা খুবই জঘন্য, তবে আমরা কিছুতেই এটাকে উৎখাত করতে পারছি না?'

'এটা সম্ভব।'

'নিশ্চয়। এমনকি তাকে একটা আলাদা সেলে নিয়ে আটকে রাখার জন্য আমাকে বিভিন্ন রকমের কসরত করতে হয়েছে। সাধারণভাবে সে খুবই শান্ত স্বভাবের মহিলা। তবে অনুগ্রহ করে তার হাতে টাকা পয়সা দেবেন না। এ ধরনের মেয়েরা...'

গতকাল যা ঘটেছিল সে স্মৃতি নেখল্যুদভের মনে জেগে উঠল; সে আবার ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

'আর রাজনৈতিক বন্দিনী ভুখোভার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

পরিদর্শক বললেন, 'হ্যাঁ, পারেন।' তারপর একটি পাঁচ ছ বছরের মেয়ে, যে ঘরে ঢুকে নেখল্যুদভের দিকে ঘাড়টা বাঁকা করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাবার দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'এখানে তোমার কি চাই?' তারপর মেয়েটি হাসতে হাসতে কোনদিকে যাচ্ছে এটা নজর না করে এগোতে গিয়ে যখন একটা কম্বলে পা জড়িয়ে গেল, তখন বললেন, 'এই যা, তুমি তো ডিগবাজি খাবে।'

'যদি অনুমতি দেন তো যাব।'

'আপনি যেতে পারেন।'

মেয়েটি এখনও নেখল্যুদভের দিকে দেখছে। পরিদর্শক তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তারপর উঠে চলে গেলেন ভেতরের ঘরে। চাকরানীর সাহায্যে গায়ে ওভারকোটটা গলিয়ে আবার দরজার কাছে আসতে না আসতেই শুরু হয়ে গেল সেই সুর-ঝঙ্কার। পরিদর্শক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, 'ও একটা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু সেখানে এমন গোলমেলে ব্যাপার যে কিছুই হবার নয়। ওর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা আছে, কনসার্ট বাজায়ও বেশ ভাল।

পরিদর্শক আর নেখল্যুদভ জেলে পৌঁছলেন। দরজা খোলাই ছিল; সেপাই আঙুল দিয়ে তাদের টুপি তুলে ধরে পরিদর্শককে অনুসরণ করতে লাগল। মাথার অর্ধেকটা কামানো চারজন লোক, যারা কিছু একটা বোঝাই করা বালতি বয়ে আনছিল, তারা তাকে দেখামাত্র গোলামের মত নুয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন ক্ষেপে গিয়ে ভুরু কোঁচকালো; তার কালো চোখ দুটো চকচক্ করছে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই এ ধরনের একটা প্রতিভার বিকাশ ঘটা উচিত, এটাকে কবর দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু ছোট ঘরে, বুঝলেন তো, বড্ড ক্লান্তিকর ব্যাপারটা।' বন্দীদের খেয়াল না করেই পরিদর্শক তার কথা বলে চললেন, আর নেখল্যুদভের পেছন পেছন হল ঘরের দিকে তার ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে চললেন।

'কার সাথে দেখা করতে চান তাহলে?'

'ভুখোভার সাথে।'

'ওহ, সে আছে মিনারে, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে।' তিনি বললেন।

'আমি কি ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত বন্দী মেনসভের সাথে দেখা করতে পারি না ?'

'হ্যাঁ, একুশ নম্বর সেল ; তাদের ডাকা যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি কি মেনসভদের সেলে গিয়ে দেখতে পারি না ?'

'পারেন, তবে দেখা করার ঘরটা খুবই ভাল লাগবে।'

'না, আমি সেলে গিয়ে দেখা করতেই ইচ্ছুক। এটা আমার কাছে আরও ভাল লাগবে।'

'মনে হচ্ছে আপনি এর মধ্যে কৌতূহলের কিছু একটা পেয়েছেন।' ঠিক এই সময়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পোশাকে সহকারী পরিদর্শক পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল।

'এই যে, রাজকুমারকে একুশ নম্বরে মেনসভদের সেলে নিয়ে যান তো;' পরিদর্শক তার সহকারীকে বললেন, 'তারপর ওনাকে অফিসে নিয়ে আসবেন, আর আমি তাকে ডেকে আনব ; কি যেন নাম বললেন ?'

'ভেরা দুখোভা।

পরিদর্শকের সহকারীটি বেশ সুদর্শন যুবক। মুখ জুড়ে পাকানো গোঁফ আর সারা শরীর থেকে ওডিকোলোনের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'এদিক দিয়ে আসুন' সে নেখল্যুদভকে মিষ্টি হেসে বলল, 'আমাদের এ জায়গাটা আপনার মনে খুব কৌতূহল সৃষ্টি করছে, না ?'

'হ্যাঁ সত্যি, এ জায়গাটা আমার কাছে সত্যিই বেশ কৌতূহলের ; তাছাড়া এটা আমার কর্তব্যও। আমি এমন একজনকে সাহায্য করতে চাইছি যে কিনা শুনেছি বিনা দোষে আটক রয়েছে।'

সহকারী কাঁধ ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ এরকম হয়ে থাকে,' সাক্ষাৎকারীকে দুর্গন্ধযুক্ত দালানের চত্বরে আগে ঢুকতে দিয়ে ভদ্রভাবে সরে দাঁড়িয়ে সে ঝট্ করে বলল, 'অবশ্য আবার এমনও হতে পারে যে তারা মিথ্যে কথা বলছে। এদিকে আসুন।'

সেলের দরজাগুলো খোলাই রয়েছে, আর বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ বারান্দায় ঘোরাফেরা করছে। সহকারীটি সেপাইদের দিকে সামান্য মাথা নাড়িয়ে, সেলের দিকে পেছন ফিরে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা সৈনিকের মত পাশে অস্ত্র রেখে দুহাত ঝুলিয়ে কর্তৃপক্ষকে দু চোখ দিয়ে অনুসরণকারী বন্দীদের ওপর আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রথম বারান্দাটা অতিক্রম করার পর, প্রথমটার থেকে লোহার দরজা দিয়ে আলাদা করা অন্য একটা সেলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সহকারীটি নেখল্যুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই বারান্দাটা আরও সরু এবং অন্ধকার, তাছাড়া প্রথমটার থেকে আরও বেশি দুর্গন্ধময়। এটার দুপাশে দুটো এক ইঞ্চি গোলাকার গর্তওলা দরজা রয়েছে। সেখানে বসে রয়েছে কোঁচকানো বিষণ্ণমুখে, এক বৃদ্ধ দরোয়ান।

পরিদর্শকের সহকারী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মেনসভ কোথায় ?'

'বাঁদিকে আট নম্বর সেলে।'

॥ বাহান্ন ॥

'আমি কি ভেতরটা দেখতে পারি ?' নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই,' সহকারী উত্তর দিল, হাসল এবং প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে সেপাইর দিকে

চাইল। নেখল্যুদভ একটা ছোট গর্তের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল একজন লম্বা জওয়ান মানুষ অল্প কালো দাড়ি নিয়ে সেলের ভেতর অন্তর্বাস পরে পায়চারি করছে। কারও অবস্থান টের পেয়ে সে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, কিন্তু পায়চারি থামাল না।

নেখল্যুদভ আরেকটা গর্তের ভেতর দিয়ে দেখল। তার চোখ বড়সড় আরেকটা ভীত চোখের সাথে মিলিত হল—যা কিনা গর্তের ভেতর থেকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সাথে সাথে সে এক পাশে সরে গেল। তৃতীয় সেলে বন্দীর আলখাল্লায় আপদমস্তক মুড়ি দিয়ে ক্ষুদে একটি মানুষকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখল। চার নম্বরে ফেকাসে চওড়া মুখের একটি মানুষ হাঁটুতে কনুই রেখে মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে বসে আছে ; পায়ের শব্দে সে মাথা তুলে একবলক তাকাল। তার মুখ, বিশেষতঃ তার ডাগর চোখদুটো হতাশ বিষণ্ণতায় সাক্ষ্য বহন করছে। দেখলেই বোঝা যায় যে তার সেল পরিদর্শনে কে এল তা জানার তার কোন উৎসাহই নেই। সে যেই হোক না কেন তাতে বন্দীর কোন উপকারটাই বা হবে!

আর কোন গর্তে উঁকি মারার জন্য না থেমে নেখল্যুদভ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মেনসভের ২১নং সেলের দিকে এগলো। সেপাই দরজার তালা খুলল। লম্বা ঘাড়ওয়ালা এক যুবক, পুষ্ট পেশী, সামান্য দাড়ি, দয়ালু গোলাকার চোখ নিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢিলে জামাটা গায়ে গলিয়ে। নবাগতের দিকে সে ভীত দৃষ্টিতে দেখছে। নেখল্যুদভ চমকে উঠল, বিশেষতঃ এই দয়ালু গোলাকার চোখ দুটোর জন্য। যুবকটি পর্যায়ক্রমে সহকারী, সেপাই আর নেখল্যুদভের মুখের ওপর পালা করে ভীত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলছে।

'এই ভদ্রলোক তোমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান।'

'ধন্যবাদ— ।'

'হ্যাঁ তোমার ব্যাপারে শুনেছি,' সেলটা পেরিয়ে জানলার নোংরা শিকের কাছে গিয়ে নেখল্যুদভ বলল, 'তবে তোমার মামলার ব্যাপারে সবকিছু আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

মেনসভও জানলার কাছে এগিয়ে এল এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল। প্রথম দিকটায় পরিদর্শকের সহকারীর দিকে লাজুকভাবে কয়েকবার তাকাল, তবে ক্রমশঃ বেশ সাহসী হয়ে উঠল। সহকারী যখন কতকগুলো নির্দেশ দেবার জন্য সেল থেকে বার হয়ে সামনের বারান্দার দিকে গেল, লোকটা তখন আরও সাহসী হয়ে উঠল। সে কাহিনীটা এমন মাত্রা আর ঢঙে বলতে শুরু করল যেটা একমাত্র একজন সাচ্চা কৃষকের ছেলের পক্ষেই স্বাভাবিক। জেলের ভেতর, এমন নিম্নমানের পোশাক পরনে এক বন্দীর কাছ থেকে এটা শুনতে নেখল্যুদভের অদ্ভুত লাগছে। নেখল্যুদভ শুনছে আর সাথে সাথে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে : খড়ের গদি আঁটা, নিচু তক্তা, মোটা লোহার শিক বসানো জানলা, নোংরা সেঁতসেঁতে দেওয়াল আর জেলের ঢিলে জামা ও জুতো পরনে এই দুর্ভাগা কৃষকটির অদ্ভুত চেহারা ও করুণ মুখ। সে আরও দুঃখিত হল কারণ সে কিছুতেই এই ভালমানুষটার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা চিন্তা করা তারপক্ষে খুবই ভয়ানক হয়ে উঠল যে, কোন মানুষের পক্ষে কি বিনা কারণে এমন কাজ করা সম্ভব, যাতে কিনা সে নিজেই আহত হয়ে আসামীর পোশাক পরে এমন একটা ভয়ঙ্কর স্থানে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ; তাছাড়া মুখে এমন ভালমানুষের ভাব এনে বলা গল্পটা যে মিথ্যে হতে পারে

এই চিন্তাটা তার কাছে আরও ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। গল্পটা হল এই : বিয়ের পরেই গাঁয়ের সরাইখানার মালিক জোয়ান ছেলেটার বউকে নষ্ট করে। সে বিচার চেয়েছিল সকলের কাছে; কিন্তু সব জায়গাতেই সরাইখানার মালিক অফিসারদের ঘুষ দিয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ফলে সে খালাস পেয়ে যায়। একবার সে তার বউকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু পরের দিনই তার বউ আবার পালিয়ে যায়। তখন সে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। সে সেখানে গিয়ে তাকে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও সরাইখানার মালিক বলে যে সে সেখানে নেই, এবং তাকে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু সে ফিরছিলনা বলে সরাইখানার মালিক ও চাকর মিলে তাকে মেরে রক্ত বার করে দেয়। ঠিক তার পরের দিনই সরাইখানায় আগুন লাগে; ফলে জোয়ান লোকটা আর তার মাকে বাড়িতে আগুন লাগানোর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সে বলে যে সে মোটেই আগুন লাগায়নি, কেননা সে সময় সে তার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।

'সত্যিই কি তুমি আগুন লাগাওনি?'

'ও চিন্তাটা কখনও আমার মাথাতেই আসেনি। আমার দুশমন নিজেই এ কাণ্ডটা করেছে। আমি শুনেছিলাম যে তার কিছুদিন আগেই সে সরাইখানার একটা বীমা করেছিল। কিন্তু ওরা বলল যে আমি আর আমার মা নাকি এটা করেছি এবং ওদের ভয় দেখিয়েছি। একথা সত্য যে আমি ওর খোঁজে একবার ওখানে গিয়েছিলাম—কারণ মনে মনে আমি কিছুতেই সে অপমান সহ্য করতে পারছিলাম না।—কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগানো—কখনো আমি তা করিনি। সে নিজেই আগুন লাগিয়ে আমাদের দোষী খাড়া করেছে। আগুন যখন লাগে তখন আমি ওখানে ছিলামই না। কিন্তু সে ভেবেচিন্তে ব্যাপারটাকে এমন করে সাজিয়েছিল যাতে মা আর আমি সেখানে গেলে তবেই কাণ্ডটা ঘটে।

'সত্যিই কি তাই?'

'ঈশ্বর আমার সাক্ষী, এটা সত্যি। সত্যি, আপনি যে কী ভাল···' এবং নেখলুদভের তাকে মাটিতে নুয়ে পড়া থেকে ঠেকাতে বেশ বেগ পেতে হল। 'করুণা করুন···দেখছেন তো বিনা কারণে কেমন পচে মরছি।'

হঠাৎ তার মুখে শিহরণ খেলে গেল, আর সে আলখাল্লার আস্তিন টেনে কাঁদতে শুরু করল; নোংরা জামার আস্তিনে চোখের জল মুছতে লাগল।

'আপনি তৈরি?' সহকারী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ···আচ্ছা হিম্মত রাখ, আমাদের সাধ্যের ভেতর আমরা সবকিছু করব।' নেখলুদভ বলে, বেরিয়ে এল। মেনসভ দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল, ফলে সেটা বন্ধ করার সময় সেপাই তাকে ঠেলে দিল; আর সে ছোট ফুটোটার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

হালকা হলুদ রঙের জামা, চওড়া খাটো পাজামা ও জেলের জুতো পরা মানুষগুলোর পাশ থেকে যেতে যেতে নেখলুদভের মনে এদের প্রতি এক অদ্ভুত সহানুভূতি জেগে উঠল। মানুষগুলো তার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে (এখন খাবার সময়, তাই সেলের দরজাগুলো খোলা রয়েছে) আছে। তার মনে সেই লোকগুলোর সম্পর্কে এক আশ্চর্য ভীতি ও বিহ্বলতার সৃষ্টি হল যারা ওদেরকে এখানে আটকে রেখেছে। আর কেন, তা সে নিজেই জানে না, তবু, ওদেরকে

এমন শান্ত দৃষ্টিতে দেখার জন্য সে নিজেই মনে মনে বেশ লজ্জিত হল।

অন্য একটা বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দ করতে করতে কে যেন দৌড়ে এল একটা সেলের দরজার কাছটাতে। তারপর বেশ কিছু লোক সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নেখলুদভের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কুর্নিস করল। বলল, 'মান্যবর, আপনাকে কি বলে সম্বোধন করতে হয় তা আমরা জানি না, তবে দয়া করে যদি আমাদের অবস্থাটা দেখে একটু ব্যবস্থা করেন—'

'আমি এখানকার কেউ নই; এ ব্যাপারে কিছুই আমার জানা নেই।'

অভিযোগের সুরে কে একজন বলল, 'তবু, আপনি তো বাইরে থেকে আসছেন; যদি সম্ভব হয়, দয়া করে কর্তৃপক্ষস্থানীয় কাউকে ব্যাপারটা বলবেন; বিনা কারণে গত দু মাস ধরে আমরা কষ্ট পেয়ে চলেছি।'

নেখলুদভ বলল, 'তোমরা কি বলতে চাইছ? কেন?'

'কেন তা আমরা নিজেরাই জানি না, তবে গত দু মাস ধরে এখানে আটকা রয়েছি।'

সহকারীটি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক; তবে এটা ঘটেছে নিতান্ত কপালের ফেরে। সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকার অপরাধে এদের ধরে আনা হয়েছে। কথা ছিল যার যার নিজস্ব প্রদেশে সবাইকে পাঠিয়ে দেবার, কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয় কারাগার পুড়ে গেছে, এবং তারা অনুরোধ করেছে, আপাততঃ বন্দীদের না পাঠাবার জন্য। তাই অন্যদের নিজ নিজ প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এদের সেই অসুবিধের কারণে পাঠানো সম্ভব হয়নি।'

'শুধু মাত্র এই কারণে!' নেখলুদভ বিস্ময়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রায় চল্লিশ জনের এক জনতা তাকে এবং সহকারীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে কথা বলতে শুরু করে দিল। সহকারী তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। বলল, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন কথা বল।'

তাদের মধ্য থেকে বেশ লম্বা, বছর পঞ্চাশ বয়সের একজন মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারার কৃষক এগিয়ে এল। সে নেখলুদভকে বলল যে, তাদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের প্রদেশে পাঠিয়ে দেবার আদেশ হয়েছে, কিন্তু ছাড়পত্র না থাকার জন্য আটকে রাখা হয়েছে; যদিও প্রথমে তাদের কাছে পনের দিনের ছাড়পত্র ছিল। এ ব্যাপার প্রতি বছরই ঘটে। আগেও তারা অনেকবার ছাড়পত্র পুনঃনবীকরণ করতে ভুলে গেছে, কিন্তু তারজন্য কখনোই তাদেরকে এমন ঝামেলায় পড়তে হয়নি। শুধু এ বছরই সবাইকে ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন তারা প্রত্যেকেই সমাজ-বিরোধী।

'আমরা পাথর কাটার কাজ করি, আর প্রত্যেকে একই গোষ্ঠীর লোক। বলা হচ্ছে যে আমাদের প্রদেশের কারাগার পুড়ে গেছে। কিন্তু সেটা তো আর আমাদের দোষ নয়। অনুগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করুন।'

নেখলুদভ শুনল, কিন্তু এই বৃদ্ধ লোকটির কোন কথাই তার বোধগম্য হল না; কারণ তার গালের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে বড় সাইজেই অনেক পা-ওলা একটা কালো উকুন। নেখলুদভের দৃষ্টি এবং মন-দুটোই সেই উকুনটার প্রতি নিবিষ্ট। তারপর সে সহকারীর দিকে ফিরে বলল, 'কী আশ্চর্য! শুধুমাত্র এ কারণে লোকগুলোকে

আটকে রাখা হয়েছে।'

সহকারী শান্তস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই এদেরকে নিজেদের দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মনে হয় সেখানকার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ভুলেই গেছে, কিংবা অন্য কিছু একটা হয়েছে।'

সহকারীর কথা শেষ হবার আগেই কয়েদির পোশাক গায়ে বেশ বেঁটে মোটা চেহারার কমজোরী একজন কৃষক ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত কি যেন বলল; তার কিছুই বোঝা গেল না। শুধু শোনা গেল সে বলছে, 'কুত্তার থেকেও খারাপ...'

'চুপ কর, বেশি বোকো না। থাম, না হলে জান...'

'জানবটা কি?' বেঁটেখাটো লোকটি হতাশ সুরে চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের অপরাধটা কি?'

সহকারীটি ধমক দিয়ে উঠল. 'চুপ কর।' সাথে সাথে লোকটি চুপ করে গেল।

'এসবের মানেটা কি?' বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে নেখল্যুদভ নিজের মনে ভাবল। ওদিকে শত শত চোখ সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছে; যাদেরকে সে অতিক্রম করে যাচ্ছে তারাও দেখছে। তার মনে হল সবাই যেন তাকে মুগুর দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত।

বারান্দা অতিক্রম করার পর সে বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলল, 'এটা কি সম্ভব যে একেবারে নির্দোষী লোকদেরও এখানে আটকে রাখা হয়?'

সহকারী বলল, 'কি আর বলব বলুন, ওরা ওরকমই বলে থাকে। এই তো শুনলেন, ওরা সবাই নাকি নির্দোষী। তবে দু একটা ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে দু একজন নির্দোষী লোকও হয়ত আটক থাকে।'

'এরা সত্যিই নির্দোষী।'

'আমরা সেটা স্বীকার করি। তবু অনেকেই একেবারে যা-তা। কেউ কেউ আছে প্রচণ্ড রকমের বেপরোয়া; এদের ওপর সবসময় নজর রাখতে হয়। এই ধরুন না, গতকালই তো এ ধরনের দুজনকে শাস্তি দেওয়া হল।'

'শাস্তি? কিভাবে?'

'নির্দেশ অনুযায়ী বার্চগাছের ডাল দিয়ে পেটানো হল।'

'কিন্তু শারীরিক শাস্তি তো উঠে গেছে।'

'যাদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। তাদের ওপর এটা এখনও বলবৎ আছে।'

গতকাল বড় ঘরটাতে অপেক্ষা করার সময় সে যা দেখেছিল সেটা এবার মনে পড়ল; বুঝতে পারল তখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। সাথে সাথে ঔৎসুক্য, হতাশা, বিহ্বলতা, আত্মিক বমনেচ্ছা থেকে শারীরিক বমনেচ্ছা তাকে প্রচণ্ডভাবে গ্রাস করে ফেলল।

সহকারী কিংবা অন্য কারও দিকে না তাকিয়েই অতিদ্রুত বারান্দা অতিক্রম করে সে এসে প্রবেশ করল অফিস ঘরে। পরিদর্শক অন্য কাজে খুব ব্যস্ত রয়েছেন; দুখোভাকে ডেকে আনার ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেছেন। নেখল্যুদভ ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তার মনে পড়ল যে তিনি তাকে বলেছিলেন, দুখোভাকে ডেকে আনবেন। তাই বললেন, 'বসুন। এক্ষুণি আমি তাকে ডেকে আনছি।'

॥ চুয়াম ॥

অফিসটা দুটো ঘর নিয়ে। প্রথম ঘরটায় রয়েছে ভাঙ্গাচোরা একটা স্টোভ, দুটো জানলা, কয়েদিদের দৈহিক ওজন নেবার জন্য একটা ওজন-দাঁড়ি আর দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা যীশুর মূর্তি—যা কিনা প্রতিটি পীড়নের জায়গায় তার শিক্ষাকে উপহাস করার জন্য রাখা হয়ে থাকে। এ ঘরটায় অনেক সেপাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশের ঘরটায় কুড়ি জনের মত স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় কিংবা দলে দলে বিভক্ত হয়ে নিচুস্বরে কথা বলে চলেছে ; আর জানলার ঠিক পাশটাতে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লেখার টেবিল।

পরিদর্শক টেবিলের পাশে বসে নেখল্যুদভকে আসন গ্রহণের অনুরোধ করলেন। নেখল্যুদভ বসে পড়ে ঘরের ভেতরের লোকগুলোকে দেখতে লাগল।

প্রথমে যার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল সে একটি হাসিখুশি মুখের যুবক। সাদা জ্যাকেট পরে সে কালো জ্রর একটি মাঝবয়সী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাতনেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কী যেন বোঝাচ্ছে। তার পাশে নীল চশমা চোখে একজন বৃদ্ধ আসামীর পোশাক পরা একটি যুবতীর হাতধরে তার কথা শুনছে, আর একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র বেশ ভীত দৃষ্টিতে বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এক কোনায় বসে রয়েছে এক প্রেমিক যুগল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী আর যুবতী ; মাথায় ছোট ধূসর চুল, মুখে উৎসাহের ছাপ আর পরনে সুন্দর পোশাক। যুবকটির শরীরও বেশ সুগঠিত ; মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, গায়ে একটা রবারের জ্যাকেট। বেশ নিচুস্বরে তারা কথা বলছে ; দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। টেবিলের কাছটায় বসে রয়েছে টি, বি, রোগীর মত দেখতে একটি ছেলের মা। তার পরনে কালো পোশাক, তার ওপরে রবারের জ্যাকেট। সে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু বারবার হিক্কা ওঠার জন্য কথাটা বলতে পারছেনা ; বহুবার শুরু করেও তাকে শেষ পর্যন্ত থেমে যেতে হচ্ছে। যুবকটি, ঠিক কি করতে হবে তা না বুঝতে পেরে হাতে একটা কাগজ নিয়ে বেশ রাগত দৃষ্টিতে সেটাকে বারবার ভাঁজ করে পিষে চলেছে। তার ঠিক পাশটাতে বসে রয়েছে উজ্জ্বল নয়না একটি সুন্দরী মেয়ে ; মাথায় তার টুপি আর পরনে ধূসর রঙের পোশাক। ক্রন্দনরতা মায়ের পাশে বসে অত্যন্ত কোমলভাবে সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে চলেছে। তার সবকিছুই সুন্দর—প্রশস্ত শুভ্র হাত, ছোট ঢেউ খেলানো চুল, উন্নত নাক আর ঠোঁট, কিন্তু সব থেকে আকর্ষণীয় হচ্ছেতার সন্তাপূর্ণ দয়ার্দ্র চোখদুটো। এই সুন্দর চোখদুটো, নেখল্যুদভ যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন মুহূর্তের জন্য তার মায়ের ওপর দিয়ে সরে গিয়ে মিলিত হয়েছিল নেখল্যুদভের চোখের সঙ্গে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে তার মার কানে কানে কী যেন বলছিল। ওদিকে প্রেমিক-যুগলের একটু দূরেই একজন বিষণ্ণ মুখের শ্যামবর্ণ লোক বেশ রাগত স্বরে খোজার মত দেখতে একজন দাড়িবিহীন লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

নেখল্যুদভ পরিদর্শকের পাশে বসে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে চারপাশটা দেখছে। ছোট করে চুল ছাঁটা একটি বাচ্চা ছেলে তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাকে চাইছেন ?

নেখল্যুদভ এই প্রশ্নে বিস্মিত হল, কিন্তু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তার গম্ভীর ছোট্ট মুখটা, তার প্রতি নিবদ্ধ স্থির দৃষ্টি দেখে বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল যে সে

তার পরিচিত একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে অপেক্ষা করছে।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'তিনি কি আপনার বোন?'

বিস্ময়ের সঙ্গে নেখল্যুদভ বলল, 'না, আমার বোন নয়।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কার সাথে এখানে এসেছ?'

সে বলল, 'মার সাথে; তিনি একজন রাজনৈতিক বন্দিনী।'

নেখল্যুদভের সঙ্গে তার আইন বিরুদ্ধ কথাবার্তা লক্ষ্য করে পরিদর্শক বললেন, 'মারিয়া, কোলিয়াকে নিয়ে যান।'

নেখল্যুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে সুন্দর মেয়েটি, সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং পুরুষের মত দৃঢ় পদক্ষেপে নেখল্যুদভ ও ছেলেটির দিকে এগিয়ে এল।

'আপনি কে তাই জিজ্ঞেস করছিল, না?' তার উজ্জ্বল দয়ালু চোখে নেখল্যু-দভের দিকে সোজা তাকিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল। তার দৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে সবাইকেই সে ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিতে দেখে।

'ও সবকিছুই জানতে চায়।' এত মধুর এবং দয়ালু দৃষ্টিতে সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল যে ছেলেটি এবং নেখল্যুদভ দুজনেই সেই হাসির বিনিময়ে হাসি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল।

'ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমি কার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

পরিদর্শক বললেন, 'মারিয়া পাভলোভনা, আপনি জানেন, অচেনা লোকের সাথে কথা বলাটা নিয়মবিরুদ্ধ।'

সে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' তারপর কোলিয়ার হাত ধরে সেই টি. বি. রোগীর মার কাছে চলে গেল।

নেখল্যুদভ পরিদর্শককে জিজ্ঞেস করল, 'এই বাচ্চা ছেলেটি কে?'

এই জেলখানাটা যে কী বিচিত্র জায়গা এটা প্রমাণ করার জন্য বেশ খুশি মাখা গলায় তিনি বললেন, 'ওর মা একজন রাজনৈতিক বন্দিনী, আর ওর জন্ম এই জেলেই।'

'এটাও সম্ভব?'

'হ্যাঁ; ছেলেটি এখন তার মার সাথে সাইবেরিয়ায় যাবে।'

'আর ওই যুবতী মেয়েটি?'

পরিদর্শক কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। তাছাড়া এই যে, দুখোভা এসে গেছেন।'

॥ পঞ্চান্ন ॥

রোগাটে হলদে চেহারার ভেরা দুখোভা মোচড় দেওয়ার ঢঙে, ডাগর দয়ালু চোখদুটো নিয়ে ঘরটার পেছন দিককার একটা দরজা দিয়ে ঢুকল।

'আসার জন্য ধন্যবাদ,' নেখল্যুদভের হাতে চাপ দিয়ে সে বলল। 'তাহলে আপনি আমাকে মনে রেখেছেন? আসুন, বসা যাক।'

'আপনাকে এভাবে দেখব তা ভাবিনি।'

'ওহো, আমি খুবই সুখী। এখানে থাকাটা এত চমৎকার যে, আমি এর চেয়ে ভাল কিছু চাইছি না,' ভেরা দুখোভা তার ডাগর দয়ালু চোখে স্বভাবজ ভীতির ভাব ফুটিয়ে, ছেঁড়াফাটা কোঁচকানো নোংরা অন্তর্বাসের কলারের ঘেরাওর ভেতর থেকে সরু এবং শিরাজাগা ঘাড়টা ভয়ঙ্করভাবে নাড়িয়ে নেখল্যুদভের দিকে একদৃষ্টে

তাকিয়ে কথাটা বলল।

নেখল্যুদভ জিজ্ঞেস করল সে কেমন করে জেলে এল।

জবাবে সে তার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে উত্তেজিতভাবে বর্ণনা দিতে শুরু করল। তার বক্তব্য অনেক বিশেষ শব্দের সাথে মিশে গেল। যেমন, প্রচার, বিচ্ছিন্ন করা, দল, বিভাগ, উপবিভাগ—যে সম্পর্কে তার ধারণা যে তা সকলেই জানে, অথচ নেখল্যুদভ তা জন্মেও শোনেনি।

সে তাকে 'জনতার ইচ্ছা' নামক বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে গোপনীয় সবকিছু বলল। স্পষ্টতই তার বিশ্বাস হল যে নেখল্যুদভও এগুলো শুনে বেশ সন্তুষ্ট। নেখল্যুদভ তার রোগাটে ঘাড় আর চিরুনীর ছোঁয়াবিহীন এলোমেলো চুলের দিকে তাকাল, আর এটা ভেবে অবাক হল যে, সে এসব করে বেড়াচ্ছে কেন, আর তাকেই বা এসব বলছে কেন! সে তাকে করুণা করল, কিন্তু সেই কৃষক যাকে তার নিজের কোন দোষ ছাড়াই এই পচা জেলের ভেতর পুরে দেওয়া হয়েছে, সেই মেনসভকে সে যে করুণা দেখিয়েছিল—এ তা নয়। সে করুণার পাত্রী এ কারণে যে দ্বিধায় তার মন ভরে গেছে। এটা পরিষ্কার যে সে নিজেকে এমন এক নায়িকা ভেবে বসেছে যে কিনা তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনায়াসে নিজের জীবন ত্যাগ করতে পারে। যদিও সে তার এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিংবা কিভাবে তা সফল হতে পারে সে সম্পর্কে খুবই কম কথা বলেছে।

যে কাজের জন্যে ভেরা দুখোভা নেখল্যুদভের সাথে দেখা করতে চেয়েছিল তা হল : তার এক বন্ধু, সুস্তোভা নামে একটি মেয়ে, যে এমনকি তাদের 'উপদলে'রও কেউ নয়, সে তার সাথে পাঁচ মাস আগে গ্রেপ্তার হয়েছে, আর পিটার ও পল দুর্গে বন্দী আছে, কারণ তার কাছে নাকি কিছু নিষিদ্ধ বই-পত্র (যা সে কারও জন্যে রেখেছিল) পাওয়া গেছে। ভেরা দুখোভা বন্ধুর গ্রেপ্তারের জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবছে, আর প্রভাবশালী লোকজনের সাথে নেখল্যুদভের সম্পর্ক থাকায় তাকে মিনতি করল যে সে যেন তার বন্ধুর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

এছাড়া, দুখোভা তাকে অনুরোধ করল তার এক বন্ধু গুর্কেভিচের (সে-ও পিটার ও পল দুর্গে বন্দী আছে) সাথে দেখা করার জন্য আর একখানা অনুমতি-পত্র যোগাড় করতে। এবং কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক বই সংগ্রহ করতে বলল যা কিনা তার পড়াশুনার জন্য দরকার।

নেখল্যুদভ প্রতিশ্রুতি দিল, পিটার্সবুর্গে যখন যাবে তখন তার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করবে।

নিজের কাহিনী সম্পর্কে সে বলল : ধাইয়ের পড়াশুনা শেষ করে 'জনগণের ইচ্ছা' আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি দলের সাথে তার যোগাযোগ হয়। শুরুর দিকটায় সব বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছিল। দাবিপত্র তৈরি করা আর কারখানায় প্রচারের কাজেই তারা নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখেছিল। তারপর তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ধরা পড়ার পর, তাদের কাগজপত্র নিয়ে নেওয়া হয় আর এই দলের সাথে জড়িত সব লোকজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

'আমিও ধরা পড়েছি এবং আমাকে ওরা নির্বাসনে পাঠাবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমি পুরোদস্তুর সুখ অনুভব করছি।' সে তার গল্পের উপসংহার টানল করুণ এক হাসি দিয়ে।

উজ্জ্বল চোখের মেয়েটি সম্পর্কে নেখলুদভ কিছু খোঁজখবর নিল। ভেরা দুখোভা তাকে বলল যে এই মেয়েটি এক সেনাপতির কন্যা। দীর্ঘদিন যাবৎ বিপ্লবী দলের সাথে সে যুক্ত। আর এ কারণে তার জেল হয়েছে যে সে এক সৈনিককে গুলি করে মারার ব্যাপারে নিজের দোষ স্বীকার করেছে। সে জনাকয়েক ষড়যন্ত্রীর সাথে একটা ঘরে থাকত, আর সেখানটাতেই তাদের গোপন ছাপাখানাটা ছিল। এক রাতে যখন পুলিশ বাড়িটা তল্লাসি করতে গেল তখন দখলদাররা আত্মরক্ষা করবে বলে মনস্থ করল। তারা বাতি নিভিয়ে দিয়ে, তাদের সাক্ষীসাবুদ বহন করে এমন সব জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলতে শুরু করল। তখন পুলিশ জবরদস্তি ঢোকবার চেষ্টা করলে ষড়যন্ত্রীদের একজন গুলি ছোঁড়ে, এবং তাতেই একজন সৈনিক ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়। যখন তদন্ত চলছিল তখন এই মেয়েটি বলে যে সে-ই নাকি ঐ সৈনিকটিকে গুলি করেছিল। যদিও আসল সত্যটা হচ্ছে যে সে কোনদিন রিভলবার হাতেই নেয়নি, আর একটা মাছিও কখনও মারেনি, কিন্তু সে তার বিবৃতিকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকল, আর এখন যাচ্ছে সাইবেরিয়াতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে।

'পরোপকারী, চমৎকার চরিত্র,' ভেরা দুখোভা সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

এবার তৃতীয় যে বিষয়টা নিয়ে সে কথা বলতে শুরু করল সেটা হচ্ছে মাসলোভা সংক্রান্ত। সে জানে—যেমনটি জেলে প্রত্যেকেই জানে, মাসলোভার জীবন কাহিনী আর নেখলুদভের সাথে তার সম্পর্কের কথা। আর পরামর্শ দিল যে তাকে রাজনৈতিক ওয়ার্ডে কিংবা হাসপাতালে রুগীদের সেবা শুশ্রূষায় সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করতে। কারণ সেখানটায় এখন গাদাগাদা রোগী রয়েছে, ফলে বাড়তি নার্সের একান্তই প্রয়োজন।

নেখলুদভ তার এই পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানাল, আর বলল যে এটা করতে সে চেষ্টা করবে।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

তাদের আলোচনায় বাধ সাধলেন পরিদর্শক। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে ধার্য সময় কেটে গেছে এবং বন্দী ও তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরা এখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবেন। নেখলুদভ ভেরা দুখোভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার কাছে এল। সেখানটায় থেমে চারদিকে যা ঘটছে তা দেখতে লাগল।

'ভদ্র মহোদয়গণ, সময় পেরিয়ে গেছে!' কখনও উঠে কখনও বসে পরিদর্শক বারবার কথাটা বলতে লাগলেন।

পরিদর্শকের আদেশে ঘরের বন্দীদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি হল, কিন্তু কেউই চলে গেল না। কেউ কেউ উঠে দাঁড়াল, আর দাঁড়িয়েই কথা চালাতে লাগল। কেউ কেউ না উঠেই কথাবার্তা বলছে; কেউ কেউ কান্নাকাটি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করেছে। সেই মা ও তার যক্ষা-রোগাক্রান্ত সন্তানের দৃশ্যটা বড়ই করুণ। ছেলেটি হাতে করে একটুকরো কাগজ নাড়াচাড়া করছে; তার মুখ ভীষণ গম্ভীর, সে চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তার মায়ের আবেগ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে; আর মা, চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে এটা জেনে ঘাড়ের ওপর মাথাটা সোজা রেখে জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। অপর একটি মেয়ে, বড় বড় করুণ চোখে তার ক্রন্দনরতা মার ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে কোমলস্বরে তাকে কি যেন বলছে। নেখল্যুদভ তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারল না। আর চোখে নীল চশমা আঁটা সেই বৃদ্ধ তার মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং মেয়েটি যা বলছে তাতেই ঘাড় নাড়ছে। কমবয়সী প্রেমিক প্রেমিকা দুজন উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত ধরে নীরবে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এখানে ওরাই একমাত্র আনন্দের প্রতীক,' খাটো কোট পরা একটি যুবক মন্তব্য করল। নেখল্যুদভের পাশে দাঁড়িয়ে সেও একই দৃশ্য দেখছিল; প্রেমিক প্রেমিকা দুজনকে লক্ষ্য করেই সে কথাটা বলল।

নেখল্যুদভ এবং যুবকটির চোখ তাদের ওপর নিবদ্ধ এটা অনুভব করে প্রেমিক প্রেমিকা দুজন তাদের বাহু বাড়িয়ে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

'আজ রাতেই জেলের মধ্যে ওদের বিয়ে হবে, তারপর মেয়েটিও ছেলেটির সঙ্গে সাইবেরিয়ায় চলে যাবে।' যুবকটি মন্তব্য করল।

'ছেলেটি কি করে?'

'ও সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ওরা উভয়ে একটু আনন্দ করুক; না হলে এটা সত্যিই ভীষণ বেদনাদায়ক ব্যাপার,' যক্ষা রোগীর মায়ের ফোঁপানী শুনতে শুনতে যুবকটি মন্তব্য করল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে এবার আপনারা উঠুন; অনুগ্রহ করে এর জন্য কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমাকে বাধ্য করবেন না,' পরিদর্শক কথাগুলো বার বার বলে চলেছেন। 'দেখুন সময় হয়ে গেছে। আপনারা কি করতে চান বলুন তো? এ তো একেবারে অসম্ভব......আমি আপনাদের শেষ বারের মত বলছি।' একটা সিগারেট নিভিয়ে পরক্ষণেই আরেকটা ধরিয়ে তিনি ক্লান্তভাবে আউরে চলেছেন।

এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, চাতুর্য্য পুরনো ধরনের বা খুব সাধারণ—যাই হোক না কেন, যার সাহায্যে মানুষ কোন কিছু না ভেবেই পরস্পরের প্রতি অন্যায় সাধন করে, এই পরিদর্শকও এ ঘরে বেদনা সৃষ্টির কারণ হিসেবে সচেতনভাবে নিজেকে দোষী না ভেবে পারছেন না। আর এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি এর জন্য মনে মনে খুবই মর্মাহত হচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত বন্দীরা এবং তাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিতে শুরু করল; একদল ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেল আর একদল সেই দরজা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এল। রবারের জ্যাকেটপরা লোকগুলি, সেই যক্ষা রোগী আর সেই বিপর্যস্ত মানুষটিও চলে গেল। মেরিয়া পাভলোভনা, জেলেতেই জন্মগ্রহণ করেছে যে ছেলেটি, তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থীরাও সবাই চলে গেল। নীল চশমা পরিহিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও বেশ শব্দ করে পা ফেলে ফেলে নেখল্যুদভের পেছন পেছন বেরিয়ে এল।

নেখল্যুদভের সাথে পাশাপাশি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে যেন এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এমন সুরে সেই বাচাল যুবকটি বলল, 'কী অদ্ভুত জায়গা এটা! তবু আমাদের পরিদর্শককে ভালই বলতে হবে; তিনি মোটেই কড়া নন,

বরং বেশ দয়ালু। যদি তারা একটু কথা বলার সুযোগ পায় তবে তাদের কষ্টের অনেকটাই লাঘব হতে পারে।'

যুবকটি নিজেকে মেডনিস্টেভ বলে পরিচয় দিল। তার সাথে কথা বলতে বলতেই নেখল্যুদভ হল পর্যন্ত এল। পরিদর্শকও বেশ ক্লান্ত পদক্ষেপে সেখানে এলেন।

'যদি আপনি মাসলোভার সাথে দেখা করতে চান,' নেখল্যুদভের প্রতি বাহ্যিক হলেও যথেষ্ট ভদ্রতা প্রদর্শন করে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনাকে কাল আসতে হবে'।

'ঠিক আছে.' নেখল্যুদভ উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

নির্দোষী মেনসভের দুঃখ যন্ত্রণা তার কাছে বড় ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। কিন্তু তার এই শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও তার বিহ্বলতা, ঈশ্বর ও ন্যায়ের প্রতি অবিশ্বাস আরও বেশি বেদনাদায়ক বোধ হচ্ছে। তার মন থেকে এই চিন্তার কিছুতেই অন্তর্হিত হচ্ছে না যে মানুষের নিষ্ঠুরতা কোন কারণ ছাড়াই তাকে কিভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

শুধুমাত্র কাগজ পত্রাদিতে যা লেখা থাকা উচিত ছিল তা লেখা নেই বলেই কত অসংখ্য নিরপরাধ লোককে বিনা কারণে কী ভয়ঙ্কর কষ্টই না দেওয়া হচ্ছে। যাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ভাইয়েদের ওপর অত্যাচার করা, আর মনে মনে এটা ভাবা যে কী গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কর্মই না তারা সমাধা করছে—সেই সব রক্ষকদের নিষ্ঠুরতাও কী ভয়ানক! কিন্তু সব থেকে ভয়ানক হচ্ছেন এই শীর্ণ, বয়স্ক, দয়ালু পরিদর্শক ভদ্রলোকটি, যার কাজই হচ্ছে মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নেওয়া, পিতার কাছ থেকে কন্যাকে; অথচ এরাই এক একজন পিতা, পুত্র, ভাই।

নেখল্যুদভ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, 'এসবের প্রয়োজনটা কি?' কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে তার মধ্যে জেগে উঠল সেই আত্মীক বমন প্রবৃত্তি, যা শেষ পর্যন্ত শারীরিক বমনেচ্ছাতে পরিবর্তিত হয়ে যায় যখনই সে জেলখানায় যায়, তখনই। কিন্তু এই রহস্যময়তার কোন উত্তরই সে পেলনা।

।। সাতান্ন ।।

পরের দিন নেখল্যুদভ অ্যাডভোকেটের বাড়ি গেল! মেনসভের মোকদ্দমা নিয়ে তার সাথে কথা বলে ওদের রক্ষা করার জন্য সে তাকে অনুরোধ জানাল। অ্যাডভোকেট তার অনুরোধে রাজি হলেন এবং বললেন যে প্রয়োজন হলে তার ইচ্ছানুযায়ী তিনি বিনা ফিতেই মামলাটা করবেন। এরপর নেখল্যুদভ তাকে বলল কিভাবে সামান্য একটি ভুলের জন্য একশ ত্রিশজন লোক জেলে আটকে পড়ে রয়েছে। 'কিন্তু কার জন্যে? এ দোষটা কার?'

অ্যাডভোকেট কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন সঠিক উত্তর দেওয়ার। তারপর হঠাৎ বললেন, 'কার আবার দোষ? কারোই নয়; অভিশংসককে যদি জিজ্ঞেস করেন তো তিনি বলবেন, দোষটা রাজ্যপালের; আবার যদি রাজ্যপালকে জিজ্ঞেস করেন তো তিনি দোষ দেবেন অভিশংসকের। সুতরাং দোষ কারোই নয়।'

'আমি উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি; তাকেই বলব সব।'

'ওতে কোন লাভ হবে না।' মৃদু হেসে অ্যাডভোকেট বললেন। 'তিনি এমনিই আচ্ছা, তিনি নিশ্চয়ই আপনার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নন?—বড্ড নির্বোধ; কিছু মনে করবেন না, ভদ্রলোক একটা চালাক জন্তু ছাড়া আর কিছুই নন।'

মাসলেনিকভ তার সম্পর্কে যা বলেছিলেন নেখল্যুদভের তা মনে পড়ল ; আর তাই সে কিছু না বলে বিদায় নিল মাসলেনিকভের কাছে যাবার জন্য।

সে তাকে দুটো ব্যাপার জিজ্ঞাসা করবে : এক, মাসলোভাকে জেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে কিনা ; আর দুই, সেই ছাড়পত্র মামলার ১৩০ জন নির্দোষ বন্দীর ব্যাপারটার কি হয় ? যাকে যে শ্রদ্ধা করেনা তার কাছে এ ধরনের অনুগ্রহ লাভের বিষয় নিয়ে যাওয়া খুবই খারাপ, কিন্তু তার লক্ষ্য পথে পৌঁছনোর জন্য এছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই।

নেখল্যুদভ যখন মাসলেনিকভের বাড়িতে পৌঁছল তখন দেখল যে তার বাড়ির সামনে বেশ কিছু সংখ্যক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মনে পড়ল যে আজ হল উপ-রাজ্যপালের বাড়িতে উৎসব পালনের দিন। আজকের ভোজসভায় তারও নিমন্ত্রণ রয়েছে। সে যখন পৌঁছল তখন দরজার সামনে অন্য একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একজন ভৃত্য, বিশেষ ধরনের পোষাক পরিহিত ফিতে বাঁধা টুপি মাথায়, একজন মহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে সাহায্য করছে। মহিলাটি তার মাটিতে লুটনো ঘাগড়া সামলাচ্ছেন। তার শীর্ণ গোড়ালি, কালো মোজা আর পায়ের চটি দেখিয়ে দেখাতে তিনি হাঁটছেন। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে লাণ্ডো। সেটা দেখে তার মনে ধারণা জন্মাল যে হয়ত কোরচাগিনরা এসেছে। সাদের পাকাচুল লালমুখো কোচোয়ানটা মাথার টুপি খুলে ঘাড় নুইয়ে শ্রদ্ধার সাথে তাকে অভিবাদন জানাল। সে এই প্রাণখোলা অভিবাদন জানাল এমন একজন ভদ্রলোককে যাকে সে ভালভাবেই চেনে। নেখল্যুদভ মাসলেনিকভের খোঁজ করতে না করতেই দেখল এক গণ্যমান্য অতিথির সাথে শুধুমাত্র কার্পেট বিছানো সিঁড়ির প্রথম ধাপ নয় একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত তিনি এগিয়ে এসেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অতিথিটি শহরে শিশুদের আবাস চালানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটা লটারী সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় কিসব বলে চলেছেন। তিনি বলছেন যে, মহিলাদের পক্ষে এটা বেশ ভাল কাজ। 'এতে তারা মজা পাবে, আবার টাকাও পাবে। আহা, তারা আনন্দ পাক আর ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন।'

'আরে নেখল্যুদভ যে! কেমন আছ ? কি ব্যাপার, আজকাল যে কেউ তোমার দেখাই পাচ্ছে না ?' নেখল্যুদভকে আমন্ত্রণ জানালেন উপ-রাজ্যপাল।

'যাও শ্রীমতিদের খবর দাও। কোরচাগিনরা আর নাদিনে বুকশেভডেন এখানে রয়েছেন। শহরের সব সুন্দরী মেয়েরা হাজির আজ,' মহামান্য অতিথি তার উর্দিপরা কাঁধ সামান্য তুলে মিলিটারী ওভারকোটটা পরার জন্যে দামী তকমা আঁটা চাকরের দিকে সেটাকে এগিয়ে ধরে বললেন। তারপর মাসলেনিকভের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'চললাম বন্ধু।'

'নাও, এস ; তুমি আসাতে যে কী খুশি হয়েছি,' মাসলেনিকভ উত্তেজিতভাবে নেখল্যুদভের হাতটা মুঠো করে ধরে বললেন। শরীরটা বেশ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সিঁড়ি দিয়ে খুব দ্রুত ওপরে উঠলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটির মনোযোগ তার দিকে বর্ষিত হওয়ায় তিনি বেশ খুশি হলেন। কেউ কেউ ভাবতে পারে যেহেতু তিনি জারের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেছিলেন সেহেতু বোধহয় রাজকীয় লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করায়

বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বভাবজ প্রশ্রয়ে নিয়মানের উন্মত্ত বাসনা রয়ে গেছে তার মধ্যে। এ ধরনের প্রতিটি মনোযোগ তার মধ্যে সেই উচ্ছলতা জাগিয়ে তোলে যেমনটি প্রভু পিঠ চাপড়ালে, মৃদু আঘাত করলে কিংবা কান টানলে পোষা কুকুর অনুভব করে থাকে। সে তার লেজ ওঠায়, আঁচড়ায়, লাফায়, কান দুটো মাটিতে লুটোয়, আর একটা বৃত্ত ঘিরে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে থাকে—মাসলেনিকভও ঠিক এসব করার জন্যই উৎসুক। নেখলুদভের মুখের গম্ভীর ভাবটা তিনি খেয়ালই করলেন না, তার কথায় কানও দিলেন না, বরং তাকে এমনভাবে জোর করে বৈঠকখানায় টেনে নিয়ে গেলেন যে তারপক্ষে তাকে অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন পথই রইল না।

নাচের ঘরের ভেতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মাসলেনিকভ বললেন, 'পরে কাজ হবে, তুমি যা চাও আমি তা করব।' যেতে যেতে এক চাপরাসিকে বললেন, বল, প্রিন্স নেখলুদভ এসেছেন।' চাপরাসি তাদের অতিক্রম করে ঘোড়ার মত ছুটে গেল।

'তুমি সবচেয়ে আগে আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করবে। কারণ, আগেরবার তার সাথে দেখা না করেই আমি তোমায় চলে যেতে দিয়েছিলাম।'

ইতিমধ্যে তারা বৈঠকখানায় পৌঁছে গেছে, আর চাপরাসিও তৎক্ষণে নেখলুদভের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ভেতর থেকে উপ-রাজ্যপালের স্ত্রী আনা ইগনাতিয়েভনা এক সহাস্য মুখটা নেখলুদভের দিকে আলো ছিটিয়ে দিল। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা চায়ের টেবিল ঘিরে বেশ কিছু মহিলা বসে রয়েছে, তাদের চারপাশে ভিড় করেছে কয়েকজন সামরিক বেসামরিক মানুষ। সেখানে নারী ও পুরুষ কণ্ঠের কলধ্বনির আর বিরাম নেই।

'শেষকালে! আমরা ভেবেছি যে আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন। মনে মনে অনুরাগ হয়েছে না আপনার উপর—'

একথা বলে তিনি এমন এক অন্তরঙ্গতার ধারনা সৃষ্টি করতে চাইলেন যা নেখলুদভ

এর আপনার পরিচিত ?—মাদম বেলিয়াভস্কায়া, মঁসিয়ে চার্নভ, একটু কাছে এসে বসুন। মিশি, আমাদের দলে এস, ওরা তোমার চা নিয়ে আসবে···আর আপনি,' একজন অফিসার যিনি মিশির সাথে কথা বলছিলেন, এবং স্পষ্টতঃই যার নাম তিনি ভুলে গেছেন তাকে বললেন, 'এদিকে আসুন···এক কাপ চা দিই, প্রিন্স ?'

'কক্ষণো না, আমি কখনও তোমার সাথে একমত হবনা। কারণটা খুবই সহজ, সে ওকে কোনদিনই ভালোবাসত না।' একজন রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কিন্তু সে চাটনিটা খুব ভালবাসে।'

'ওঃ, তোমার সেই চিরকেলে হালকা ঠাট্টা!' সিল্ক, সোনা আর মণিমাণিক্যের সাজে সজ্জিতা এক মহিলা হাসতে হাসতে বলল।

'এটা চমৎকার, এই ছোট বিস্কুটগুলো, আর এত হালকা; মনে হচ্ছে আরেকটা খাই।'

'আচ্ছা, তুমি না কি শিগগিরই শহর ছেড়ে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ আজই আমাদের শেষদিন, সেজন্যেই তো আমরা এলাম।'

'গ্রামে খুব সুন্দর লাগে; আমরা সেখানে একটা উজ্জ্বল বসন্ত কাটিয়েছি।'

তাকে মানায় এমন কালো ডোরাকাটা পোশাকে, টুপিতে মিশিকে খুবই রূপসী লাগছে। নেখল্যুদভকে দেখে সে লাল হয়ে উঠেছে।

'ওহো, আমি ভেবেছি তুমি চলে গেছ,' সে নেখল্যুদভকে বলল।

'প্রায় যাওয়ার মুখে ; কাজের জন্যই শহরে রয়েছি, আর এখানেও এসেছি বিশেষ কাজেই।'

'তুমি কি মাকে দেখতেও আসবেনা ? তিনি তোমার সাথে দেখা করার জন্য খুবই উৎসুক।' মিশি বলল, এবং সে যা বলছে সেটা যে সত্যি নয়, আর নেখল্যুদভও যে সেটা বুঝে ফেলেছে এটা বুঝতে পেরে সে লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল।

যেন তার লজ্জারুণ অবস্থাটা তার চোখেই পড়েনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে নেখল্যুদভ বেশ বিষণ্ণ সুরে বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সময় করে উঠতে পারব কি না।'

রাগত ভ্রূকুটি করে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিশি একটি সুদর্শন অফিসারের দিকে ফিরল। অফিসারটি তার হাতের খালি কাপটা নিয়ে চেয়ারের পেছনে নিজের তরবারিটা ঠুকতে ঠুকতে বেশ পুরুষোচিতভাবে সেটাকে পরের টেবিলটাতে রেখে দিল।

'তুমি অনাথ আশ্রমের জন্য অবশ্যই কিছু সাহায্য করবে।'

'আমি প্রত্যাখ্যান করছি না, তবে আমার উদারতাকে আমি লটারীর জন্য তাজা রাখতেই ইচ্ছুক। সেখানে যতটা সত্ত্ব দেখানো সম্ভব আমি তা-ই দেখাব।'

স্পষ্টতঃ নকল হাসি হেসে কে যেন বলে উঠল, 'ঠিক আছে, কথাটা ভুলোনা যেন।'

নানা ইগাতিয়েভনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, কারণ তার উদ্দেশ্য ভীষণভাবে সফল হয়েছে।

তিনি নেখল্যুদভকে বললেন, 'মিকি আমাকে বলল যে আপনি নাকি জেলের ব্যাপার নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছেন। মিকির (তিনি তার মোটাসোটা স্বামী মাসলেনিকভের কথা বলছেন) কিছু দোষ থাকতে পারে ; তবে আপনি তো জানেন যে সে কি রকম দয়ালু। এই সব দুর্ভাগা বন্দীরা তার সন্তানের মতই ; তাদের সে কখনও অন্য চোখে দেখেই না। তার শরীরে যথেষ্ট দয়ামায়া আছে...' যার আদেশে মানুষদের চাবকানো হয় তার সে স্বামীর দয়ার প্রতি ন্যায্য বিচার করতে পারে এমন কোন শব্দ না আসায় তিনি থামলেন এবং মাথায় লাইলাক রঙের ফিতে বাঁধা কোঁচকানো চামড়ার একজন বৃদ্ধা, যিনি এইমাত্র এলেন, তার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলেন।

যতটা বলা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কথা বলে নেখল্যুদভ মাসলেনিকভের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'তুমি আমায় ক মিনিট সময় দেবে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় ; কি ব্যাপার ? এদিকে এস।'

তারা জাপানী কায়দায় সাজানো একটা ছোট্ট বসার ঘরে ঢুকে জানলার কাছটাতে বসল।

॥ আটান্ন ॥

'এই নাও, এখন আমি তোমার জিম্মায়। সিগারেট খাবে ? একটু অপেক্ষা কর। আমরা অবশ্যই সাবধান থাকব, তাছাড়া এ জায়গাটাকে কিছুতেই নোংরা

করব না।' কথাটা বলে মাসলেনিকভ একটা সিগারেটদানি উঠিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, 'এবার বল।'

'তোমার কাছে আমি দুটো বিষয় জানতে চাই।'

'হায়, ভগবান!'

মাসলেনিকভের চোখে মুখে বিরক্তি আর হতাশার ছায়া নামল; সেই কুকুরের মুখের উত্তেজনার প্রতিটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, যার প্রভু পেছন থেকে তার কান টেনে ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওদিকে বৈঠকখানা ঘর থেকে সম্মিলিত গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। একজন মহিলার কথার উত্তরে একজন পুরুষ কি যেন বলছে। কয়তেসি ভোরোনোৎসব ও ভিক্টর আপ্রাকসিনের নাম দুটো বার-বারই ঘুরে ফিরে আসছে। অন্যদিক থেকে হাসিমিশ্রিত বেশ কিছু গলার গুনগুনে সুর শোনা যাচ্ছে। মাসলেনিকভ একই সাথে নেখলুদভের বক্তব্য আর বৈঠকখানা ঘরের কথাবার্তা—এ দুটোই শোনার চেষ্টা করছেন।

নেখলুদভ বলল, 'আমি আবার সেই মহিলাটির ব্যাপারেই এসেছি।'

'হ্যাঁ, জানি; সেই যে বিনা দোষে যার শাস্তি হয়েছে।'

'আমি চাই তাকে জেলের হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত করা হোক। আমি শুনেছি যে, এটা করা যেতে পারে।'

মাসলেনিকভ ঠোঁট উলটে ভাবতে শুরু করলেন। বললেন, 'সেটা খুবই শক্ত। তবু দেখব কি করতে পারি; কাল তোমায় খবর পাঠাব।'

'আমি শুনেছি সেখানে বহু অসুস্থ লোক রয়েছে, তাদের সাহায্যের প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে; যাই হোক আমি তোমায় জানাব।'

নেখলুদভ বলল, 'একটু দেখো।'

বৈঠকখানা থেকে সাধারণ, এমনকি স্বাভাবিক হাসির আওয়াজ পর্যন্ত ভেসে এল। মাসলেনিকভ বললেন, 'ও হচ্ছে ভিক্টরের কাণ্ড। ভাল মেজাজে থাকলে সে আশ্চর্য সপ্রতিভ থাকে।'

নেখলুদভ বলল, 'আর যেটা তোমায় আমি বলতে চাই, তা হল, একশ তিরিশ জন মানুষকে শুধুমাত্র ছাড়পত্রের তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার অপরাধে এক মাসের থেকে বেশি দিন আটকে রাখা হয়েছে।' এবং সে ব্যাপারটার সম্পূর্ণ বর্ণনা দিল।

বিরক্তির সুরে মাসলেনিকভ বললেন, 'তুমি এসব জানলে কি করে?'

'আমি যখন একজন বন্দীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন এইসব মানুষেরা আমায় বারান্দায় এসে ঘিরে ধরে তাদের কাহিনী বলে—'

'কোন বন্দীকে তুমি দেখতে গিয়েছিলে?'

'নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যাকে জেলে রাখা হয়েছে এমন এক কৃষককে। আমি তার মামলাটা একজন উকিলের হাতে দিয়েছি। সেটা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যারা কোন অপরাধ করেনি, কেবলমাত্র ছাড়পত্রের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এই অজুহাতে কি তাদেরকে আটকে রাখা যায়? আর—'

এটা সংগ্রাহক বিভাগের ব্যাপার।' বেশ রাগতভাবে মাসলেনিকভ তাকে বাধা দিলেন। 'তাহলে বুঝতে পারছ তো, যেটাকে তোমরা দ্রুত ও ন্যায্যবিচার

বসে থাক তার ফলাফলটা কি হয়। এটা হচ্ছে সরকারি অভিশংসকের দায়িত্ব জেল পরিদর্শন করে দেখা যে সেখানে বন্দীরা আইনানুগভাবে রয়েছে কিনা। কিন্তু তারা তো তাস খেলেই সময় পায় না, সুতরাং ওসব আর করবে কখন।'

'তাহলে কি আমি ধরেই নেব যে এ ব্যাপারে তুমি কিছুই করতে পারবে না?' অ্যাডভোকেটের সেই ভবিষ্যতবাণী, অর্থাৎ উপ-রাজ্যপাল সংগ্রাহকের ঘাড়েই সব দোষটা চাপাবেন, এটা মনে করে বেশ মনমরাভাবে নেখল্যুদভ কথাটা বলল।

'হ্যাঁ নিশ্চয় পারব। এখনই দেখছি।'

বৈঠকখানা থেকে একজন মহিলার উদাসীন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'যত নষ্টের মূলেই তো সে; সে একটা নির্বোধ।'

একজন মহিলা যে লোক দেখানো ভঙ্গিতে একজন পুরুষের কাছ থেকে কিছু একটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, তার উচ্ছল হাসির প্রত্যুত্তরে পুরুষটি বলল, 'এটাই ভাল; আমি এটাই নেব।'

মহিলাটির গলা শোনা যাচ্ছে, 'না, না, কিছুতেই না।'

সাদা হাতে, গোলাকার নীলকান্ত মণির মত আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে মাসলেনিকভ বললেন, 'ঠিক আছে, আমি এগুলো করব। চল, এবার মহিলাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেওয়া যাক।'

'একটু দাঁড়াও,' বৈঠকখানা ঘরের দরজার কাছটাতে দাঁড়িয়ে পড়ে নেখল্যুদভ বলল, 'আমি শুনলাম, গতকাল জেলের মধ্যে কয়েকজনকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কথাটা কি ঠিক?'

মাসলেনিকভ বেশ লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওঃ, ওটা! না, ওখানে ভেবে-চিন্তে তোমার কিছু করার নেই। তুমি সব ব্যাপারেই নাক গলাতে চাও। এস, এস, আনা আমাদের ডাকছে—' নেখল্যুদভের হাত ধরে আবার সেই আগের মত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যেমনটি হয়েছিলেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটি তার প্রতি নজর দেওয়াতে। তবে এবারের উত্তেজনা তেমন আনন্দদায়ক নয়, বরং উদ্বেগপূর্ণ।

নেখল্যুদভ হাত সরিয়ে, কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে, কারও সাথে একটা কথা না বলে বেশ বিরক্তিকর দৃষ্টিতে বৈঠকখানা অতিক্রম করে, বড় ঘরটা ছাড়িয়ে, তার দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসা চাপরাসিকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে এল রাস্তায়।

'কি হয়েছে? তুমি ওনাকে কি বলেছ?' আনা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন।

কে একজন মন্তব্য করল, 'এটা হচ্ছে ফরাসী কায়দা।'

'ফরাসী কায়দা? না, এটা হচ্ছে জুলু কায়দা।'

'তবে উনি সব সময়েই এরকম করেন।'

কেউ উঠে দাঁড়াল, কেউ আবার ভেতরে এল আর কলধ্বনি তার আপন গতিপথেই বয়ে চলল। সমবেত মানুষজনেরা নেখল্যুদভের এই ব্যাপারটাকে তাদের মজলিসে থাকার বাকি সময়টুকুতে আলোচনার মশলা হিসেবে পেয়ে গেল।

মাসলেনিকভের সাথে দেখা করার পরের দিন নেখল্যুদভ তার কাছ থেকে মোম দিয়ে আঁটা, ধর্মচিহ্নের ছাপ মারা একটা চকচকে কাগজে বেশ স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা একটা চিঠি পেল। তাতে তিনি বলেছেন যে, তিনি ডাক্তারকে

লিখেছেন মাসলোভাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য, আর আশা করছেন যে নেখল্যুদভের ইচ্ছেই কার্যকরী হবে। শেষে লেখা রয়েছে 'তোমার প্রিয় বয়স্ক বন্ধু' আর তার তলায় বেশ কায়দা করে খুব বড় আকারের শৈল্পিক উৎকর্ষপূর্ণ একটা সই করেছেন। 'গাধা কোথাকার!' নেখল্যুদভ কথাটা না বলে পারল না। বিশেষতঃ 'বন্ধু' শব্দটায় সে অনুভব করল যে মাসলেনিকভ তাকে অনুকম্পা দেখাবার চেষ্টা করেছেন; অর্থাৎ সে টের পেল, যা নৈতিকভাবে নোংরা ও লজ্জাকর সে পদে থেকেও তিনি নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোক বলেই ভাবছেন, আর আশা করছেন, যদি নেখল্যুদভকে তোয়াজ করার জন্য না-ও হয় তবে অন্ততঃপক্ষে এটা দেখানো যে, তিনি এত গর্বিত নন যে তাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করবেন না।

।। উনষাট ।।

বহুল প্রচারিত কুসংস্কারগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা হল এই যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কোন না কোন বিশেষ গুণ আছেই। যেমন কেউ হল দয়ালু, কেউ নিষ্ঠুর, তৃতীয়জন জ্ঞানী কিংবা গর্দভ কিংবা উৎসাহী কিংবা উদাসী। মানুষ কিন্তু সত্যিই ওরকম নয়। আমরা একজন সম্পর্কে বলতে পারি যে সে বেশির ভাগ সময় নিষ্ঠুরের থেকে দয়ালু, বেশির ভাগ সময় বোকার থেকে জ্ঞানী, বেশির ভাগ সময় উদাসীনের থেকে উৎসাহী কিংবা তার উলটোটা। কিন্তু একজন মানুষ সম্পর্কে একথা বলা ঠিক হবে না যে সে দয়ালু ও জ্ঞানী, আরেকজন সম্পর্কে যে সে খারাপ আর বোকা। তবু আমরা মানবজাতিকে এভাবেই ভাগ করে থাকি! কিন্তু এটা মিথ্যে। মানুষ নদীর মত: সবসময় সেই একই জল, কিন্তু প্রত্যেকটি নদী এখানে সঙ্কীর্ণ, ওখানে দ্রুত, এখানে শ্লথ, ওখানে প্রশস্ততর, এই স্বচ্ছ, এই ঘোলা, এই ঠাণ্ডা, এই উষ্ণ। মানুষও তাই। প্রত্যেকটি মানুষই তার মধ্যে মানব ধর্মের বীজ বহন করছে; কিন্তু কখনও সে একই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে না; কখনও একরকম থাকে কখনও আবার অন্য রকম হয়ে যায়। ফলে সেই একই লোক হওয়া সত্ত্বেও সে আর একই রকম থাকতে পারে না।

কোন কোন মানুষের ভেতর এই পরিবর্তন চূড়ান্তভাবে দেখা যায়। নেখল্যুদভও ঠিক সেই ধাতেরই মানুষ। তার ভেতর এইসব পরিবর্তনের কারণ শারীরিক ও মানসিক দুইই। এখন ঠিক এরকম একটা পরিবর্তনই তার ভেতর ঘটেছে।

বিচারের পরে এবং কাত্যুসার সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর পুনরায় নতুন জীবন শুরু......যে আনন্দ ও জয়ের অনুভূতি তার মধ্যে জেগেছিল শেষ সাক্ষাতের পর ভীতি আর আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের বোধ সেই আনন্দকে সরিয়ে দিয়েছে। তাকে পরিত্যাগ না করা আর যদি সে ইচ্ছুক থাকে তাকে বিয়ে করার প্রশ্নে সে এখনও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; কিন্তু এ কাজটা তার কাছে এখন বেশ শক্ত বোধ হচ্ছে, আর সে কারণে সে কষ্টও পাচ্ছে যথেষ্ট।

মাসলেনিকভের সাথে দেখা করার পরের দিন সে আবার জেলে গেল মাসলোভার সাথে দেখা করতে।

পরিদর্শক তার সাথে তাকে কথা বলতে দিলেন, তবে অফিস ঘর কিংবা অ্যাডভোকেটদের ঘরে নয়, একেবারে মেয়েদের সাক্ষাৎকারের ঘরে।

তার দয়ালুতা সত্ত্বেও পরিদর্শক নেখল্যুদভের প্রতি আগের থেকেও বেশি গম্ভীর রইলেন। মাসলেনিকভের সাথে তার কথাবার্তার ফলে বাহ্যত যথেষ্ট

সর্তকতা নেওয়ার এক নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

'আপনি তার সাথে দেখা করতে পারেন,' পরিদর্শক বললেন, 'কিন্তু টাকার ব্যাপারে আমি যা বলেছি দয়া করে সে কথাটা মনে রাখবেন। আর তাকে হাসপাতালে সরানোর ব্যাপারে উপ-রাজ্যপাল আমাকে যা লিখেছেন তা করা হবে; ডাক্তারও এতে রাজি হবেন। একমাত্র মাসলোভাই এটা পছন্দ করছে না। সে বলছে, "ভিখারীগুলোর জন্য আমাকে নোংরা ঘাঁটতে হবে।" শেষে যোগ করলেন, 'রাজকুমার আপনি এদের চেনেন না।'

নেখল্যুদভ উত্তর দিলন', কিন্তু সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করতে বলল। পরিদর্শক এক সেপাইকে ডাকলেন, আর নেখল্যুদভ তাকে অনুসরণ করে মেয়েদের সাক্ষাৎকারের ঘরে ঢুকল। সেখানে কেউ নেই, একমাত্র মাসলোভাই অপেক্ষা করছে। সে জালের পেছন থেকে শান্ত ও ভীতভাবে বেরিয়ে এসে একেবারে তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল, আর তার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'দিমিত্রি, আমাকে মাফ কর, পরশু আমি তোমাকে অনেক অন্যায় কথা বলেছি।'

'মাফ করার কথা তো আমার নয়।' নেখল্যুদভ বলল।

'তা একই কথা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও,' সে বাধা দিল, আর এমন ভয়ঙ্কর রকম তির্যক দৃষ্টিতে নেখল্যুদভের দিকে তাকাল যে নেখল্যুদভ তার চোখে আগেকার সেই ভারাক্রান্ত রাগ দেখতে পেল।

'কেন আমি তোমাকে ছেড়ে দেব?'

'তোমাকে ছাড়তেই হবে।'

'কিন্তু কেন?'

সে আবার সেই একই ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল বলে নেখল্যুদভের মনে হল।

মাসলোভা বলল, 'হুঁ, ব্যাপারটা হল এই। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ছাড়বে। আমি যা বলছি তা সত্যি—আমি আর পারছিনা। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।' তার ঠোঁট কাঁপছে, এবং সে একমুহূর্ত নীরব রইল। 'যা বললাম, সত্যি। না হলে আমি গলায় দড়ি দেব।'

নেখল্যুদভ অনুভব করল যে এই প্রত্যাখানের সাথে মিশে রয়েছে ক্ষমার অযোগ্য এক বিরক্তি। কিন্তু তার সাথে আরও কি যেন আছে, ভাল একটা কিছু। তার পূর্ববর্তী প্রত্যাখানের সমর্থন—যা সে বেশ শান্তভাবেই করছিল—তৎক্ষণাৎ নেখল্যুদভের বুকের সমস্ত সন্দেহকে নিভিয়ে দিল, এবং কাত্যুসা সম্পর্কে যে গম্ভীর বিজয়ী আবেগ সে অনুভব করত তা ফিরিয়ে আনল।

'কাত্যুসা, আমি যা বলেছি তা আবারও বলব,' সে গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর। যদি তুমি তা না করতে চাও, তবুও আমি তোমাকে অনুসরণ করব আর যেখানেই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেই যাব।'

'সেটা তোমার ব্যাপার। আমি আর একটাও কথা বলব না' সে জবাব দিল, এবং তার ঠোঁট আবার কাঁপতে লাগল। কথা বলতে অক্ষম হয়ে নেখল্যুদভও নীরব রইল।

'আমি এখন দেশে যাব, তারপর যাব পিটার্সবুর্গে,' মাসলোভা শান্ত হলে সে বলল। 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমার···মানে আমাদের মামলা পুনর্বিবেচনা করাতে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে সাজা বাতিল হয়ে যেতে পারে।' কিন্তু যদি বাতিল

না হয় তবে তুমি কিছু মনে কোরো না। এ পথে না হলে আমি অন্য পথে চেষ্টা করবই।' সে উপলব্ধি করল তার পক্ষে চোখের জল আটকানো বেশ শক্ত হয়ে উঠছে।

'আচ্ছা, মেনসভের সাথে দেখা করেছ?' নিজের অস্থিরতা গোপন করতে মাসলোভা জিজ্ঞেস করল। 'তারা যে নিরপরাধ, এটা সত্যি, না?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই ধারণা।'

'সত্যি, কী চমৎকার বৃদ্ধা।' সে বলল।

নেখলুদভ মেনসভের ব্যাপারে যা কিছু জেনেছে তা বলল, আর জানতে চাইল মাসলোভার কোন কিছুর দরকার আছে কিনা।

মাসলোভা বলল, 'না কোন কিছুরই দরকার নেই।'

আবার তারা নীরব হল।

'হ্যাঁ, হাসপাতালের ব্যাপারে,' নেখলুদভের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ মাসলোভা বলল, 'যদি তুমি চাও তাহলে আমি যাব, আর আজ থেকে কখনও মদও খাব না।'

নেখলুদভ তার চোখের দিকে তাকাল, এবং দুজনেই হাসল। সে বলল, 'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না, এবং তারপর মাসলোভার কাছ থেকে বিদায় নিল।

নেখলুদভ মনে মনে ভাবল, সে একেবারে ভিন্ন জাতের জীব। আগে যাই হোক না কেন, এখন সে এমন এক অভিজ্ঞতার স্বাদ পেল যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি;—আর তা হচ্ছে, প্রেম অজেয়—এই নিশ্চয়তা।

সাক্ষাৎকার সেরে সরব সেলের ভেতর ঢুকে মাসলোভা তার ঢিলে জামাটা খুলে ফেলে, হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ করে তার নিজের তক্তাটার ওপর বসল। সেলের ভেতর এখন সেই টি, বি, রোগী ভালাদিমিরের স্ত্রীলোকটি আর তার ছেলে এবং মেনসভের মা ও ওয়াচম্যানের বউ ছাড়া আর কেউ নেই। যাজকের মেয়েটিকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা করে হাসপাতালে সরানো হয়েছে। বাদবাকি মেয়েরা কাপড়জামা ধুতে বাইরে গিয়েছে। বৃদ্ধা মহিলাটি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সেলের দরজা হাঁ করে খোলা, আর সেপাইয়ের ছেলেমেয়েরা বাইরের উঠোনে। শিশু কোলে ভালাদিমিরের মহিলাটি আর সেপাইয়ের বউ নিপুণ হাতে মোজা সেলাই করে চলেছে। তারা সবাই মাসলোভার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা বললে?'

মাসলোভা উঁচু তক্তার ওপর চুপ করে বসে পা দুলিয়ে চলেছে কিন্তু মেঝেতে তার ছোঁয়াই লাগছে না।

'হা হুতাসের কি হল?' সেপাইর বউ বলল। 'আসল ব্যাপার হল মনমরা হওয়া ঠিক না। এই কাতুসা, ওঠ্,' সে বলে চলল আর নিজের আঙুলগুলো চরকির মত ঘোরাতে লাগল।

মাসলোভা কোন জবাব দিল না।

'আমাদের মেয়েরা সব কাপড় কাচতে গিয়েছে।' ভালাদিমিরের মহিলাটি বলল। 'আমি ওদের বলতে শুনেছি যে আজ নাকি অনেক ভিক্ষে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর জিনিস আনা হয়েছে।'

'ফিনাসকা,' সেপাইর বউ বলল 'ক্ষুদে দুষ্টুটা গেল কোথায়?' সেলাই করার একটা ছুঁচ তুলে নিয়ে সে মোজা আর সুতোর গোলাটায় তা আটকে রেখে বাইরে উঠোনের দিকে গেল।

ঠিক এই সময় উঠোন থেকে মেয়েদের গলার আওয়াজ এল, আর বন্দিনীরা ঢুকল। তাদের পায়ে জেলের জুতো কিন্তু মোজা নেই। প্রত্যেকের হাতে একটা পাকানো রুটি; কারও কারও হাতে দুটোও রয়েছে। ফিদোসিয়া তৎক্ষণাৎ মাসলোভার কাছে এল।

'ব্যাপারটা কি? কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?' মাসলোভার দিকে কোমলভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা আমাদের চা খাওয়ার জন্যে,' সে একটা তাকের ওপর রুটিটা রাখল।

'কি, নিশ্চয়ই সে বিয়ে করার সঙ্কল্প ত্যাগ করেনি?' কোরাবলিওভা জিজ্ঞেস করল।

'না সে করেনি, কিন্তু আমি তা চাইনা,' মাসলোভা বলল, 'আর আমি তাকে তা বলেও দিয়েছি।'

'বোকার হদ্দ কোথাকার!' গম্ভীর সুরে কোরাবলিওভা বিড়বিড় করল।

'যদি একসাথে কেউ থাকতেই না পারে, তবে বিয়ে করে লাভটা কি?' ফিদোসিয়া বলল।

'তোমার স্বামীকেই দেখনা—সেওতো তোমার সাথে যাচ্ছে,' সেপাইর বউ বলল।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমরা তো বিবাহিত,' ফিদোসিয়া বলল।

'কিন্তু সে যদি তার সাথে থাকতে না পারে তো বিয়ে করতে যাবে কেন?

'কেন, সত্যি! বোকামি কোরো না। তুমি জান, সে যদি ওকে বিয়ে করে তো ও সম্পত্তির ওপর শুয়ে থাকবে।' কোরাবলিওভা বলল।

'সে বলছে, "ওরা তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক আমি তোমাকে অনুসরণ করব," ' মাসলোভা বলল। 'যদি সে তাই করে, ভালই; আর না করলেও ভাল। আমি কখনোই তাকে তা করতে বলব না। এখন সে পিটার্সবুর্গে সব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। সেখানকার সব মন্ত্রীদের সাথে তার পরিচয় আছে। কিন্তু তবু আমার তাকে কোন দরকার নেই,' সে বলে চলল।

'নিশ্চয়ই না,' হঠাৎ কোরাবলিওভাও তার সাথে একমত হল। স্পষ্টতঃই তার ব্যাগের জিনিসপত্র পরখ করতে করতে কিছু একটা ভেবে বলল। 'আমরা দু এক ফোঁটা খাব কি?'

'তোমরা খেতে পার,' মাসলোভা জবাব দিল, 'তবে আমি খাব না।'

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

ক্রয়টজার সোনাটা

'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কেউ যখন কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করল।' (মেথি লিখিত সুসমাচার ৫;২৮)

'শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সকলে এই বক্তব্য গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহারাই করে।

কারণ এমন নপুংসক আছে, যাহারা মাতার উদর হইতে সেইরূপ হইয়াই জন্মিয়াছে: আর এমন নপুংসক আছে, যাহাদিগকে মানুষ নপুংসক করিয়াছে; আর এমন নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গরাজ্যের নিমিত্ত আপনাদিগকে নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ করুক।'

(মথি লিখিত সুসমাচার ১৯; ১০, ১১,১২)

বসন্তের প্রথম। প্রায় দু দিন হল গাড়িতে চেপেছি। কাছাকাছি জায়গায় যাওয়ার যাত্রীদের ওঠানামার আর শেষ নেই, তবে আমার মত আরও তিনজন যাত্রী রেল ছাড়ার স্টেশন থেকেই একসঙ্গে চলেছেন। দেখতে ভাল নয়, আধা-পুরুষালি কোট ও টুপি পরিহিতা শুকনো মুখের মাঝবয়সী এক মহিলা একনাগাড়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। তার সাথে রয়েছেন বছর চল্লিশ বয়সের একজন পুরুষ। সঙ্গে তার সাজানো নতুন বাক্স; তিনি ক্রমাগত বকবক করে চলেছেন। তৃতীয় লোকটি নিজেকে একটু তফাতে রাখছেন। লম্বায় মাঝারি গড়নের, বেশ ছটফটে, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুটো চোখ, দ্রুত দৃষ্টিপাত ঘটছে এটা থেকে ওটার ওপরে; বুড়ো না হলেও কোঁকড়ানো চুলে পাক ধরেছে, আর মাথায় রয়েছে আস্ত্রাখান টুপি এবং পরিধানে সৌখীন দর্জির হাতে তৈরি আস্ত্রাখান-কলারওলা পুরনো কোট। কোটের বোতামের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে রুশী জ্যাকেট আর ছুঁচের কাজ-করা রুশী জামা। থেকে থেকে তিনি গলায় হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভট আওয়াজ করে উঠছেন।

সারাটা পথে যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা কিংবা পরিচয় করা এড়িয়ে চলছেন তিনি। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বেশ রূঢ়স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছেন। বই পড়ে, বাইরে তাকিয়ে, সিগারেট টেনে কিংবা পুরনো ঝোলা হাতড়ে চা অথবা টুকিটাকি অন্য কিছু খেয়ে সময় কাটাচ্ছেন।

একা থাকতে তার বেশ খারাপ লাগছে ভেবে কয়েকবার আমি তার সাথে আলাপ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু যতবার চোখাচোখি হল (সামনা সামনি বসে আছি বলে সেটা না হয়েও উপায় নেই) ততবারই তিনি মুখ ঘুরিয়ে হয় একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলেন, নয়ত জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটা বড় স্টেশনে গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ থামায় লোকটি গরম জলের খোঁজে বাইরে গেলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে চা বানাতে বসলেন। নতুন বাক্সের মালিকটি (পরে জেনেছি যে তিনি একজন উকিল) ও তার সেই বান্ধবীটি স্টেশনের রেস্তোরাতে চা খেতে গেলেন।

তারা দুজন বাইরে থাকার সময় কামরায় কয়েকজন নতুন যাত্রী এলেন। তাদের মধ্যে একজন লম্বা, দাড়িগোঁফ কামানো লিকলিকে চেহারার বৃদ্ধ; পরনে তার ফারের কোট আর মাথায় টুপি; দেখে মনে হয় ব্যবসায়ী। উকিল ও স্ত্রীলোকটির সামনের সিটে বসে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে এই স্টেশন থেকেই ওঠা দোকান-কর্মচারীর মত দেখতে একটি যুবকের সঙ্গে তিনি আলাপ শুরু করে দিলেন।

আমি কোণাকুণি বসে, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, যাত্রীরা সামনে দিয়ে যাতায়াত না করলে ওদের কথাবার্তার টুকরো কানে আসছে। ব্যবসায়ীটি জানিয়ে দিলেন যে তিনি পরের স্টেশনে তার দেশের বাড়িতে যাচ্ছেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল ব্যবসা আর জিনিসপত্রের দাম দিয়ে, তা থেকে এল মস্কোর বাজার সম্পর্কে মন্তব্য, এরপর উঠল নিঝনি নভগোরোদ মেলার কথা। দোকান-কর্মচারীটি মেলায় দুজনেরই চেনা একজন ধনী ব্যবসায়ীর বেলেল্লাপনার বর্ণনা শুরু করল, কিন্তু বৃদ্ধটি তাকে বাধা দিয়ে কুনাভিনোর বেলেল্লাপনার কথা বলতে লাগলেন। মুখে বেশ আত্মপ্রসাদ আর আহ্লাদের ভাব এনে তিনি নিজে ও সেই পরিচিত ব্যক্তিটি মত্তাবস্থায় সেখানে কী করেছিলেন ফিস্‌ফিস্ করে তা বললেন। দোকান-কর্মচারীটির কান ফাটানো হাসিতে সমস্ত কামরা ভরে উঠল, আর দুটো হলদে দাঁত বের করে বৃদ্ধটিও হাসলেন।

কৌতূহল উদ্রেক করার মত কিছু শুনব না ঠিক করে আমি উঠে দাঁড়ালাম, গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে বেড়িয়ে আসব বলে। দরজার কাছে উকিল ও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হল, কী একটা বিষয়ে হাঁটতে হাঁটতেই দুজনে জোর কথাবার্তা বলছেন।

উকিলটি আমাকে জানালেন, 'সময় পাবেন না, এক্ষুণি দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বে।'

আর সত্যি, কামরার শেষ পর্যন্ত যেতে না যেতেই ঘণ্টা পড়ে গেল। ফিরে এসে দেখলাম উকিল ও স্ত্রীলোকটি আগেকার মতই সমান উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলে চলেছেন। মুখোমুখি চুপ করে বসে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীটি কড়া চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে অপ্রসন্নভাবে দুটো দাঁত চিবোচ্ছেন।

ওদের পেরিয়ে যেতে যেতে শুনলাম উকিলটি একটু হেসে বলছেন, 'তাই মেয়েটি সোজাসুজি স্বামীকে জানিয়ে দিল যে তার সঙ্গে সে আর ঘর করতে পারবে না, এবং ঘর করতে চায়ও না, কেননা…'

এ ছাড়াও কীসব বলেছিল, তা আর শুনতে পেলাম না। অন্যান্য যাত্রীরা এল, তারপর এল কণ্ডাক্টর, শেষে একজন মিস্ত্রী দৌড়ে আমাকে পার হয়ে গেল, আর কিছুক্ষণ ধরে এত হৈচৈ চলল যে কোন কথাবার্তা কানেই এল না।

সবকিছু একটু শান্ত হয়ে এলে আবার কানে এল উকিলটির গলা। তিনি বিশেষ একটা মামলার কথা বলছেন। আরও বলছেন যে, ইউরোপের জনমত এখন বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন নিয়ে বেশ চিন্তিত, আর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা রাশিয়ায়ও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শেষে আর কেউ কথা বলছে না এটা লক্ষ্য করে তিনি নিজের কথা থামিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আগেকার দিনে এরকম ছিল না, তাই না?'

বৃদ্ধ উত্তর দিতে যাবেন এমন সময়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়াতে তিনি টুপি খুলে ক্রুশ এঁকে বিড়বিড় করে প্রার্থনা শুরু করলেন। উকিলটি তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা

করে রইলেন। প্রার্থনা শেষে তিন বার ক্রুশ এঁকে টুপিটা বেশ সোজা করে নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসে, তারপর মুখ খুললেন বৃদ্ধ। বললেন, 'এ ধরনের ব্যাপার আগেও হত, তবে খুবই কম। এখন আর এসব না হয়ে উপায় নেই। লোকেরা আজকাল হাতিঘোড়া অনেক কিছুই শিখেছে।'

গতিবেগ ক্রমশ বাড়ায় লাইনের জোড়গুলোতে চাকার খটখট শব্দ হওয়ায় আমার শোনায় ব্যাঘাত ঘটল; কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে আমার আগ্রহ থাকায় আমি বক্তাদের কাছের একটি জায়গায় সরে বসলাম। মনে হল আমার পাশের সেই উজ্জ্বল চোখ, অস্থির ভদ্রলোকটিরও ব্যাপারটায় আগ্রহ জেগেছে, ফলে তিনিও জায়গা না ছেড়েই শোনার জন্য কান পেতে রইলেন।

ক্ষীণহাসি হেসে স্ত্রীলোকটি বললেন, 'কিন্তু লেখাপড়া শেখাটা খারাপ কিসে?' আগেকার দিনে বর কনে কেউ কাউকে চোখে না দেখেই অনেক সময় বিয়ে করে ফেলত, সেটা কি আপনি ভাল মনে করেন?' স্ত্রীলোকটি বলে চললেন, অন্য অনেক মহিলাদের মতই, যারা অন্য লোকে যা বলেছে তার জবাব না দিয়ে, তারা কী বলবে ভেবে নিয়েই তার জবাবে বলে থাকেন।

'দুজনে দুজনকে ভালবাসে কিনা, কখনও ভালবাসা হবে কিনা, সেসব কিছু না জেনে, ওরা যাকে পেত তাকেই বিয়ে করে বসত, আর বাকি জীবনটা কাটত যন্ত্রণায়। সেটা কি এখনকার থেকে ভাল মনে করেন?' বোঝা গেল স্ত্রীলোকটির আবেদন, বুড়োর কাছে যতটা নয়, ততটা আমার ও উকিলটির কাছে; অবশ্য যদিও তার কথাবার্তা চলেছে বুড়োর সঙ্গেই।

'লোকেরা আজকাল হাতিঘোড়া অনেক কিছু শিখছে,' অবজ্ঞাভরে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে, তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বৃদ্ধটি আবার বললেন।

ক্ষীণ হেসে উকিলটি জিজ্ঞেস করলেন, 'শিক্ষা আর দাম্পত্যজীবন—এরমধ্যে আপনি কী সম্পর্ক দেখতে পান, সেটা জানতে পারি কি?'

ব্যবসায়ীটি কথা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় তাকে বাধা দিয়ে স্ত্রীলোকটি বললেন, 'না, না, সেসব দিন আর কখনও ফিরে আসবে না।'

উকিলটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, উনি কী ভাবেন তা বলতে দিন।'

বৃদ্ধটি চূড়ান্তভাবে জানালেন, 'শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বোকামিও এসে জড়ো হয়।'

'যাদের মধ্যে ভালবাসা নেই এমন দুজনের মধ্যে ওরা বিয়ে দিয়ে দেয়, তারপর যখন দেখে যে তাদের মনের কোন মিলই নেই তখন অবাক হয়ে যায়।' স্ত্রীলোকটি বললেন, বলার সময়ে আমার ও উকিলটির দিকে তাকালেন, এমনকি দোকান কর্মচারীটির দিকেও—সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সীটের পিঠে কনুইয়ের ভর দিয়ে হাসি মুখে শুনছে। 'শুধুমাত্র জন্তু জানোয়ারদের মালিকের ইচ্ছে মত জুড়ে দেওয়া যায়; কিন্তু মানুষের নিজের নিজের রুচি আর পছন্দ বলে তো একটা ব্যাপার আছে।' তিনি বললেন। বোঝা গেল তার ইচ্ছেটা বৃদ্ধকে ঠোকা দেওয়া।

'আপনি যা বলছেন সেটা ঠিক নয়,' বৃদ্ধটি বলল। 'জন্তু জানোয়াররা বুনো; আর মানুষরা যে আইন মেনে চলে।'

'যাকে ভালইবাসিনা তার সঙ্গে কী করে সহবাস করব?' স্ত্রীলোকটি বললেন।

এসব অত্যন্ত নতুন মতবাদ তার কাছে বলেমনে হল ; তাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন।

'আগে ওসব বাছবিচার ছিল না,' গম্ভীর কেতায় বৃদ্ধ বললেন, 'এসব হচ্ছে হালফ্যাশনের কথা। মেয়েরা এখন বলে "তবে তোমাকে ছেড়ে চললাম।" এমন কি চাষীদের ঘরেও এই নতুন কায়দাগুলো ঢুকেছে। তারা তো বলেই, "এই নাও তোমার জামা-কাপড়, আমি চললাম ভানিয়ার সঙ্গে—ওর চুল তোমার থেকে আরও বেশি কোঁকড়া।" ব্যস, বোঝাও এখন! মেয়েমানুষের মনে ভয় থাকাই সবচেয়ে জরুরী।' দোকান-কর্মচারীটি প্রথমে উকিলটির দিকে তারপর স্ত্রীলোকটি ও আমার দিকে দেখল এবং মনে হল সে যেন হাসি চেপে রেখেছে। সওদাগরের বক্তব্যটি লোকে কী ভাবে নেয় তা জেনে নিয়ে হয় সে তা মেনে নেবে নয়ত ব্যঙ্গ করবে।

'কীসের আবার? স্বামীকে ভয় দেখানো, আবার কী।'

গলায় একটু ঝাঁঝ এনে স্ত্রীলোকটি বললেন, 'সে সবদিন আর নেই।'

'না, মহাশয়, সেদিন কখনও যাওয়া সম্ভব নয়। বেটাছেলের পাঁজরের হাড় দিয়ে ইভের, অর্থাৎ মেয়েমানুষের সৃষ্টি, আর চিরকালই তারা তাই থাকবে,' এমন কঠিনভাবে বিজয়ীর মত মাথা ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বললেন যে তাতে দোকান-কর্মচারীটি তক্ষুণি ধরে নিল যে বৃদ্ধেরই জয় হল। সে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ল।

'শুধু পুরুষরা এ রকম মনে করে,' হার না মেনে স্ত্রীলোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'আপনারা নিজেদের স্বাধীন করে, মেয়েদের বন্দী করে রাখতে চান। আপনারা চান নিজেদেরকে অধিকার যথেচ্ছ রাখতে।

'অধিকার কেউ দেয় না, কারণ শুধু পুরুষ থেকে সংসার বাড়ে না, নারীরা তো ঠুনকো পাত্র মাত্র,' সমান ভারিক্কি গলায় বৃদ্ধ বললেন।

তার বলার কায়দাটা এমন গম্ভীর যে মনে হল কথাটা শ্রোতারা মেনে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটিরও বোধ হল যে তিনি হেরে গেছেন, তবু কিন্তু হার সে মানলেন না।

'কিন্তু আপনি তো না মেনে পারেন না যে মেয়েরাও মানুষ, পুরুষদের মত তাদেরও হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে। স্বামীকে না ভালবাসলে তাদের আর কী করণীয় আছে?'

'স্বামীকে ভালবাসে না?' ভয়ঙ্করভাবে আবার বললেন বৃদ্ধ ; তার ভ্রূ আর ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেল। 'স্বামীকে ভালবাসতে হবেই।'

অপ্রত্যাশিত এই যুক্তিতে বিশেষ খুশি হল দোকান কর্মচারীটি। বাহবাসূচক ধ্বনি করল সে।

'না, ভালবাসবে না,' স্ত্রীলোকটি বললেন। আর ভাল না বাসলে জোর করে ভালবাসানো উচিতও নয়।'

'কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে ঠকায়, তখন?' উকিলটির জিজ্ঞাসা।

'সেটা চলবে না,' বৃদ্ধ বললেন, 'ওদিকে হুঁশ রাখা দরকার।'

'আর যদি তেমনটা ঘটে, তাহলে? তেমন তো ঘটে থাকেই।

'হ্যাঁ কারও ক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের মধ্যে নয়,' বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

কেউ কোন কথা বলল না। আলোচনায় যোগ দিতে দোকান-কর্মচারীটি নড়েচড়ে এগিয়ে এল। হেসে বলতে শুরু করল সে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের একটি ছেলেকে নিয়ে গণ্ডগোল হয়। কার দোষ তা বলা কঠিন। এই ছেলের বউটিকে দেখা গেল, একদিন সে নষ্টামী শুরু করে দিল। বিচার বোধ ছিল ছেলেটির। প্রথমে খাজাঞ্চির সঙ্গে মেয়েটার খটখট হয়। ছেলেটি ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন লাভ হল না। মেয়েটি ভীষণ বজ্জাত, সে তার স্বামীর টাকা সরাতে শুরু করল। তখন তাকে বেশ করে ধোলাই দিল ছেলেটি। ফলটা হল আরও খারাপ। মেয়েটি কারবার চালাল একটা বিধর্মীর সঙ্গে, বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, মানে একটা ইহুদীর সঙ্গে। স্বামীর আর তখন কী করণীয় আছে? সে ছেড়ে দিল মেয়েটিকে। এখন সে অবিবাহিতের মত থাকে, আর মেয়েটি ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়।

বৃদ্ধ বললেন, 'ছেলেটি বোকা, প্রথম থেকে যদি লাই না দিত, উচিত মতন ব্যবস্থা নিত তাহলে আজও যে মেয়েটা ঠিক থাকত তাতে কোন সন্দেহই নেই। প্রথম থেকে ওদের যা খুশি করতে দেওয়াটা অনুচিত। মাঠের ঘোড়া আর ঘরের মেয়ে বিশ্বাস নেই এদের।

ঠিক সে সময়ে পরের স্টেশনের টিকিট নিতে চেকার এল। বৃদ্ধ নিজের টিকিটটা তাকে দিলেন।

'তাতো বটেই, একেবারে প্রথম থেকেই মেয়েদের সামলে রাখাটা খুবই দরকার, না হলে সবকিছু শেষ।'

'এবং বিবাহিত লোকেরা কুনাভিনোর মেলায় যে ফুর্তি করেছিল, যার গল্প এইমাত্র আপনি নিজেই করলেন, সেটা তাহলে কী?' কথাটা না বলে আমি পারলাম না।

'এটা স্বতন্ত্র জিনিস' বলে ব্যবসায়ীটি একেবারে চুপ করে গেলেন।

ট্রেনের হুইশল পড়ল। আসনের নিচ থেকে নিজের ঝোলা টেনে বের করে গায়ে ওভারকোটটা জড়িয়ে টুপিটা তুলে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

দুই

যেই বৃদ্ধ চলে গেলেন অমনি কয়েকজন একই সঙ্গে মন্তব্য করে উঠল।

'লোকটা সেকেলে' দোকান-কর্মচারীটি বলল।

স্ত্রীলোকটি বললেন, 'যেন স্বয়ং ঋষি! মেয়েছেলে আর বিয়ের সম্বন্ধে বর্বর যত সব ধারণা!'

'আর বিয়ের ব্যাপারে আমরা ইউরোপীয়দের থেকে অনেক পেছনে।' উকিলটি ফোড়ন কাটলেন।

স্ত্রীলোকটি বললেন, 'আসল ব্যাপারটাই এরা বোঝেই না। ভালবাসা ছাড়া বিয়ে বিয়ে নয়, বিয়ে পবিত্র হয় একমাত্র ভালবাসার জোরে, ভালবাসা বিয়েই হলসত্যিকারের বিয়ে।'

কথাগুলো শুনে কর্মচারীটি হাসল, ভবিষ্যতে যাতে কাজে লাগতে পারে সে জন্য বুদ্ধিমন্ত আলোচনার যতটা পারে সে মনে রাখার চেষ্টা করছে।

স্ত্রীলোকটির কথা বলার সময় আমার পেছনে ভাঙা হাসি বা কান্নার মত আওয়াজ শুনলাম; ঘুরে তাকিয়ে দেখি পাশে একটি লোক। জ্বলজ্বলে চোখ, পাকাচুল, নিঃসঙ্গ সেই ভদ্রলোকটি। আমাদের আলোচনা শুনতে শুনতে কখন যে তিনি কাছে চলে এসেছেন সেটা লক্ষ্য করিনি। সীটের পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন, দেখে মনে হল অত্যন্ত উত্তেজিত। মুখটা লাল, গালের মাংসপেশী কাঁপছেযেন।

'সে ভালবাসাটা—যেটা বিয়েকে পবিত্র করে—সেই ভালবাসা জিনিসটা কী ?' একটু তোতলাতে তোতলাতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তার উত্তেজনা দেখে স্ত্রীলোকটি ধীরে আরও বিস্তারিতভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন। 'সত্যিকার ভালবাসা…পুরুষ ও নারীর মধ্যে সে ভালবাসা থাকলে বিয়ে সম্ভব,' তিনি বুঝিয়ে বললেন।

সঙ্কোচভরে জ্বলজ্বলে চোখওলা ভদ্রলোকটি তার বিব্রত হাসি মুখে বললেন, তা তো হল, কিন্তু সত্যিকার ভালবাসাটা বুঝবে কী করে ?'

স্ত্রীলোকটি বললেন, 'ভালবাসা জিনিসটা কী তা সবাই জানে না। বোঝা গেল তার সঙ্গে আলোচনায় তিনি আর রাজি নন।

'আমি কিন্তু জানি না.' ভদ্রলোক বললেন। 'আপনার ধারণাটা স্পষ্ট করে বলুন না…'

'এটা তো খুবই সোজা,' স্ত্রীলোকটি উত্তর দিলেন। কিন্তু থেমে একবার ভেবে নিয়ে বললেন, ভালবাসা ? সবাইকে ছেড়ে কেবল একজনের প্রতি প্রেম—সেটই হল ভালবাসা।'

'প্রেম কতদিনের জন্যে ? এক মাস ? দু দিন ? আধ ঘণ্টা ?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন সেই পাকাচুল বৃদ্ধ।

'না, দাঁড়ান, আপনি হয়ত সম্পূর্ণ অন্য কিছু মনে করছেন।'

'মোটেই না, আমি সেই একই কথা ভাবছি।'

স্ত্রীলোকটির দিকে হাত তুলে উকিলটি মাঝখান থেকে বললেন, 'ওঁরা বলছেন,' 'বিয়ে হওয়া উচিত প্রথমত, অনুরাগ থেকে—যাকে ইচ্ছে হল প্রেমও বলতে পারেন, আর সেটা থাকলেই শুধু বিয়েকে বলা যায়…আসলে…পবিত্র আর কি। তাছাড়া, পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের, মানে প্রেমের ভিত্তিতে বিয়ে না হলে, বিয়ের কোন নৈতিক-বাধ্যবাধকতা থাকে না। এই আপনি বলতে চাইছেন তো ?' স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, উকিলটি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মহিলা। হ্যাঁ, এটাই তার মনের কথা।

'তাছাড়া…' উকিলটি বলতে গেলেন, কিন্তু কথা শেষ করতে হল না। ভদ্রলোকের, আগুনের মত দীপ্ত চোখ ; তার উত্তেজনা চরমে উঠেছে—নিজেকে তিনি সামলাতে পারলেন না ; বলে ফেললেন, 'আমিও তো ঠিক তাই বলছি—সবাইকে ছেড়ে কোন বিশেষ নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণের কথা। কিন্তু আমার শুধু প্রশ্ন সে প্রেম কতদিনের জন্য ?'

'কত দিন ? অনেক দিন, সারা জীবন,' স্ত্রীলোকটি কাঁধ নাচিয়ে উত্তর দিল।

'নাটক উপন্যাসে ও সব ঘটে, বাস্তব জীবনে কখনও নয়। অন্যদের ছেড়ে এক জনের ওপর টান জীবনে কয়েক বছর টেঁকে খুব কম, বরং তার আয়ু মাস কয়েক, কখনও কখনও মাত্র কয়েক সপ্তাহ, কয়েকদিন, এমনকি কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে।' ভদ্রলোক বললেন। তিনি জানেন যে তার মতামতে সবাই বিস্মিত আর অবাক হয়ে গেছে এবং তাতে তিনিই বিশেষ খুশি হলেন।

তিনজনেই একসঙ্গে প্রতিবাদ জানালাম, 'আপনি কি বলছেন ; মোটেই

সেরকম নয়।' দোকান কর্মচারীটি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গলা মেলাল।

প্রত্যেকের গলা ছাপিয়ে পককেশ ভদ্রলোকটি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সবই জানা আছে। আপনারা যা বলছেন সেটা হচ্ছে কল্পনা, আর আমি যা বলছি তা হল বাস্তব। আপনারা যেটাকে ভালবাসা বলে থাকেন, সুন্দরী মহিলা দেখলে পুরুষের মনেই সে রকম অনুভূতি হয়ে থাকে।'

স্ত্রীলোকটি বললেন, 'আপনি তো দেখছি বড় ভয়ানক কথা বলছেন। প্রতিটি লোকের মনে ভালবাসা বলে একটা বস্তু আছে : এবং সেটার আয়ু মাসখানেক কিংবা বছরখানেক নয়, সারাজীবন।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'না, সে রকম কোন বস্তুই নেই। কোন মেয়ে বরাবর একই ছেলেকে ভালবেসে গেল—এটা যদি সম্ভব বলে ধরে নেওয়াও যায়, কিন্তু তার থেকে বেশি সম্ভব হচ্ছে, হঠাৎ অন্য কারও ওপর মেয়েটির টান হওয়া। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার, আর বরাবর এ রকমই হয়ে আসছে।'

উকিলটি বললেন, 'তবে দুজনেরই দুজনকে পছন্দ করে যাওয়াও তো সম্ভব।'

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'না, তা সম্ভব নয়, অনেকটা যেমন সম্ভব নয় একগাড়ি মটর দানার মধ্যে আগে থাকতে বাছাই করা দুটো মটরের পাশাপাশি অবস্থান। তাছাড়া সম্ভাব্যতার কথা ছেড়ে দিলেও অতৃপ্তি-তৃপ্তিতে অরুচি ধরার ব্যাপারটাও থাকছে। একজন ছেলে আর মেয়ের পক্ষে সারাজীবন ধরে ভালবেসে যাওয়া—তার থেকে বলুন না কেন যে একটা মোমবাতি সারাজীবন ধরে আলো জুগিয়ে যাবে।' তিনি বেশ জোরে জোরে সিগারেট টান দিয়ে চলেছেন।

'আপনি তো শুধু শারীরিক প্রেমের কথাই বলছেন।' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাবের মিলন, আত্মার সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভালবাসার কথা কি আপনি স্বীকার করেন না ?'

'ভাবের মিলন! আত্মার সম্পর্ক!' গলায় তেমনি আওয়াজ করে ভদ্রলোক কথাগুলোর রেশ টানলেন, 'স্থূলতার জন্য মাফ করবেন, তাহলে তো একসাথে শোবার কোন মানেই হয়না।' হেসে বললেন, 'ভাবের মিলনের পরিণাম হচ্ছে একত্রে শয়ন!'

উকিলটি বললেন, 'আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টা কিন্তু তথ্যের সঙ্গে মোটেই মিলছে না। আমরা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি যে দাম্পত্য জীবন বলে একটা বস্তু আছে। মানুষদের মধ্যে বেশির ভাগই তো আমরণ দাম্পত্য জীবন চালিয়ে চলেছে একনিষ্ঠভাবে!'

পককেশ ভদ্রলোকটি হেসে বললেন, 'প্রথমে আপনারা বললেন যে বিয়ের মূলটাই হচ্ছে প্রেম ; তারপর আমি যখন বললাম যে দৈহিক প্রেম ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সেটাই সন্দেহ, তখন আপনারা চেষ্টা করছেন বিয়ের অস্তিত্বের সাহায্যে প্রেমের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে। আসলে আজকালকার বিয়েটাই হচ্ছে প্রবঞ্চনা—অন্য কিছু নয়।'

উকিলটি বললেন, 'না, ঠিক তা নয়, আমি শুধু বলেছি যে বিয়ে বলে একটা জিনিস বরাবরই রয়েছে।'

'কথাটা সত্যি, কিন্তু সেটা কিসের ভিত্তিতে? যারা বিয়েটাকে একটা রহস্যময় বিষয় বলে মনে করেন, এবং তারজন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে দায়ী ভাবেন,

তাদের মধ্যে বিয়ে ব্যাপারটা বরাবরই ছিল, আজও আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে মোটেই নেই। আমরা বিয়ে করি মৈথুন ছাড়া আর কিছুর কথা চিন্তা না করেই ; ফলে দেখা দেয় প্রবঞ্চনা ও অত্যাচার। সতীত্বের ভান করে স্বামী-স্ত্রী অন্যালোকদের ঠকায়, কারণ আসলে তারা থাকে বহু-বিবাহের মানসিকতায়। আর সাধারণতঃ যা হয়, যেহেতু তারা গায়ে পড়েই সারাজীবন একসাথে থাকার দায়িত্বটা মাথায় তুলে নেয়, এবং মাস ঘুরতে না ঘুরতেই একজন আরেকজনকে ঘৃণা করতে শুরু করে, মনে মনে চায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে, অথচ একসাথেই থেকে যায়, সেহেতু দেখা দেয় সেই নারকীয় পরিস্থিতি, যার ফলে লোকে মদ ধরে, আত্মহত্যা করে, পরস্পরকে খুন করে।' কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের উত্তেজনা বেড়ে গেল। তিনি এত দ্রুত কথা বললেন যে তার কথার মধ্যে অন্য কেউ কিছু বলতেই পারছে না। অবশেষে তিনি থামলে পর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

উত্তেজিত অশোভন আলোচনাটাকে থামিয়ে দেবার জন্য উকিলটি বললেন, 'বিবাহিত জীবনে যে সঙ্কটের মুহূর্ত আসে তাতে কোন সন্দেহই নেই।'

মৃদুস্বরে পককেশ ভদ্রলোকটি শান্তভাবে বললেন, 'তাহলে আমাকে চিনেছেন দেখছি।'

'না ; এখনও সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'এতে সৌভাগ্যের কিছু নেই। আমার নাম পজদনীশেভ ; আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যাকে প্রায়ই আপনার উল্লিখিত সঙ্কট মুহূর্তের সামনাসামনি হয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে—' দ্রুত সবার ওপর দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। আমরা বলার কিছু না পেয়ে সবাই চুপ করে রইলাম।

সেই বিচিত্র আওয়াজ করে ভদ্রলোক বললেন, 'তাতে কিছু আসে যায় না। আপনাদের কাছে মাফ চাইছি। যাক···আপনাদের আর বিরক্ত করব না।'

উকিলটি বললেন, 'আরে না, না, কী যে বলছেন !' তিনি যে কি বলতে চান তা নিজেই জানেন না।

তার কথায় কান না দিয়ে পজদনীশেভ দ্রুত নিজের জায়গায় চলে এলেন। উকিল ও স্ত্রীলোকটি ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে লাগলেন ; আমি বলবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে পজদনীশেভের পাশে বসে রইলাম। অন্ধকারে পড়া চলবে না, তাই চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করলাম। এভাবেই নীরবে পরের স্টেশনে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত কাটল।

কনডাকটরের সাথে আগে থাকতে কথাবার্তা হয়ে থাকাতে উকিল এবং স্ত্রীলোকটি অন্য কামরায় চলে গেলেন। দোকান কর্মচারীটি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ; এবং পজদনীশেভ একটার পর একটা সিগারেট আর আগের স্টেশনে তৈরি চা খেয়ে চললেন। আমি তার দিকে তাকাতেই তিনি হঠাৎ বিরক্তিপূর্ণ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি লোকটা কে সেটা জানার পর আমার সঙ্গটা বোধহয় খুবই খারাপ লাগছে আপনার। যদি লাগে বলুন, চলে যাচ্ছি।'

'না, না, সে কী বলছেন ?'

'তাহলে একটু চলুক। তবে বড্ড কড়া।' এক কাপ চা দিলেন আমাকে। বললেন, 'কথা, শুধু কথা···আর সবই মিথ্যে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা বলছেন ?'

'সেই একই কথা : প্রেম আর প্রেম ; কিন্তু আসলে জিনিসটা কি ? আপনার ঘুম পাচ্ছে ?'

'না।'

'যদি শোনেন তবে বলি—এই প্রেমের তাড়নায় আমার কী হয়েছিল।'

'যদি আপনার কষ্ট না হয় তবে বলুন।'

'বরং না বললেই কষ্ট পাই। চা-টা খান। খুব কড়া হয়েছে ?'

চা টা একেবারে বিয়ারের মত, তবু এক গেলাস খেলাম। ঠিক এই সময়েই কনডাকটরটি আমাদের অতিক্রম করে গেল। তার যাবার পথের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সে চলে গেলে পর ভদ্রলোক নিজের কাহিনী বলা শুরু করলেন।

॥ তিন ॥

'ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে বলি···কিন্তু আপনি সত্যিসত্যিই শুনতে চান তো ?'

আবার বললাম যে সত্যিই শুনতে চাই। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে শুরু করলেন।

'যদি বলতেই হয় তবে একেবারে প্রথম থেকেই বলতে হবে। বলতে হবে কেন আমি বিয়ে করেছিলাম, আর বিয়ের আগে কি ধরনের মানুষ ছিলাম।

'বিয়ের আগে ছিলাম অন্য সবার মত, অর্থাৎ সমাজে সবাই যেমন থাকে, তেমনি। জমিদার বংশের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আছে, তাই অভিজাত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিলাম। বিয়ের আগে অন্য সবার মতই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবন কাটত : সে জীবন যে যথোচিত ছিল সে বিষয়ও আমাদের শ্রেণীর অন্য সবার মতই আমার মনেও কোন সন্দেহ ছিল না। নিজেকে সম্পূর্ণ নৈতিক ভাবতাম। মেয়েদের আকৃষ্ট করা কিংবা কোনরকম বিকৃত রুচি আমার মধ্যে ছিল না; এমনকি আমার বয়সের অনেকেই যেটা করে থাকে, সেভাবে লাম্পট্যকেই আমি আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করেও নিইনি। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে সর্বদ মর্যাদা বজায় রেখেই সুষ্ঠ কামচর্চা করতাম। ছেলের জন্ম দিয়ে কিংবা আমার প্রতি অতি-আসক্তির ফলে বোঝার মত হয়ে উঠতে পারে এমন মেয়েদের সবসময় এড়িয়ে চলতাম। সত্যি সত্যিই হয়ত কয়েকজনের বাচ্চা ও আসক্তি জন্মেছিল, কিন্তু আমি এমন ভাব দেখাতাম যে ওগুলো তেমন একটা কিছুই নয়। এটাকে যে শুধু নীতিসম্মত মনে করতাম তা ই নয়, এমনকি এরজন্য মনে মনে গর্বও হত।'

একটু থেমে তিনি আবার সেই আওয়াজটা করলেন। মনে হল, কোন নতুন কথা মাথায় এলে এই আওয়াজটা করা তার স্বভাব।

চড়া গলায় তিনি আবার শুরু করলেন, 'অথচ এটাই হল সবচেয়ে নোংরা ব্যাপার। ব্যভিচারটা কোনক্ষেত্রেই শরীর ঘটিত কোন ব্যাপার নয়, শারীরিক কোন কলুষতার মধ্যে ব্যভিচার বলে কিছু নেই ; ব্যভিচার হচ্ছে আসলে, যে মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে তার বিষয়ে সবরকমের নৈতিক দায়িত্বকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। আর আমিও এই নৈতিক দায়িত্বটা ঝেড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম বলেই নিজেকে বারবার বাহবা দিতাম। মনে আছে, সত্যিকারের ভালবেসে একটি মেয়ে একবার আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, অথচ আমি

তাকে টাকা দিয়ে উঠতে পারিনি বলে নিজে মনে মনে দারুণ বিবেক যন্ত্রণায় ভুগেছিলাম। শেষে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পেলাম; কারণ মনে করলাম যে এরপর আর আমার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে না।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার কথায় সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়াবেন না, বুঝলেন; ও ব্যাপারটা আমি ভাল করেই বুঝি। আপনারা সবাই, এমনকি আপনিও, সেই একই গোয়ালের গরু। অবশ্য আপনি যদি দলছাড়া মানুষ না হন, কিংবা যদি সব থেকে সেরাও হন তাতেও আমার কিছু এসে যায় না; আমার আগের মতামতই আমার মধ্যে রয়ে গেছে। কিন্তু মাফ করবেন, ব্যাপারটা ভয়াবহ! সত্যিই ভয়াবহ!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি এত ভয়াবহ?'

'মেয়েদের নিয়ে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে যে ভুলের শেষ নেই, সেটাই হচ্ছে ভয়াবহ। না, এ ব্যাপারে শান্তভাবে কথাবার্তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই ভদ্রলোকটি যাকে "সঙ্কটের মুহূর্ত" বলেছিলেন সেটা যে আমার জীবনে শুধু ঘটেছে তাই নয়, তারপর থেকে আমার চোখও খুলে গেছে: সেদিন থেকে সবকিছুই আলাদা আলোয় দেখছি। আমার সামনে সবকিছুরই মুখোস খুলে গেছে…' সিগারেট ধরিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে তিনি বলে চললেন।

অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। খটখট্ আওয়াজ ছাপিয়ে শুধু কানে আসছে তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর।

॥ চার ॥

'বিশ্বাস করুন, সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছি। আর সেই কষ্ট পাওয়ার জন্যই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে পাপের মূলটা কোথায়, বুঝতে পারলাম আমার কী রকম হওয়া উচিত; এবং তার ফলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম বিদ্যমান যা কিছু আর বিভীষিকা।

'কখন এবং কিভাবে সবকিছু শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে ফেলল সেই সঙ্কটের মুহূর্তে, সেটাই এবার বলি শুনুন। আমার বয়স যখন মাত্র ষোল বছর তখন এটার শুরু। তখন আমি জিমনাসিয়ামে পড়ছি, আর আমার দাদা পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে। তখনও মেয়েদের ঠিক মত চিনি না, তবে নিষ্পাপ শিশু বলতে যা বুঝোয়—তাও নই। অনেকটা আমাদের শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের যে অবস্থা থাকে—তেমনি। এর বছর খানেক আগেই আমার বন্ধুরা আমাকে খারাপ করে দিয়েছিল। তখনই মেয়ে দেখে মন আনচান করা শুরু হয়ে গিয়েছে; সেটা কোন বিশেষ মেয়ের জন্য নয়, বরং বলা চলে মেয়েজাতটার জন্যই। মনে হত, ওরা লোভনীয়—ওদের নগ্নতা আমাকে কাতর করে তুলত। সেই বয়সের ছেলে মেয়েদের শতকরা নিরানব্বই জনের যা হয়, আমারও তাই হত। কী ভীষণ আতঙ্ক হত মনে, কী ভীষণ যন্ত্রণা, কী ভীষণ দুর্ভোগ। মনে মনে প্রার্থনা করতাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন পতন সমাধা হল। কল্পনা ও বাস্তবে আমি তখনই কলুষিত হয়ে পড়েছি, কিন্তু শেষ ধাপটা তখনও পর্যন্ত ছোঁয়া বাকি রয়েছে। নিজেকেই তখন নষ্ট করে চলেছি, কিন্তু অন্য কাউকে আমার সাথে জড়াইনি। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় দাদার এক ফুর্তিবাজ বন্ধু,—যাদের "পাকা ছেলে" বলা হয়, যারা অন্যদের মদ খেতে শেখায়, তাস খেলানো রপ্ত করায়—এক কথায় যাকে বলে

"বখাটে"—তেমনি একজন মদের পার্টির পর প্রস্তাব করল "সেখানে" যাবার। তার কথায় আমরা গেলাম। আমার দাদাও তখন পর্যন্ত নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু সেই রাত্রেই তার পতন ঘটল। আমিও নিজেকে কলুষিত করলাম; মাত্র পনের বছর বয়স তখন, কী করছি উপলব্ধি না করেই একজন স্ত্রীলোককে কলুষিত করাতে সাহায্য করলাম। যা করছি সেটা যে অন্যায়, বড়দের মুখে সে কথা কখনও শুনিনি; এমনকি এখনও তারা সে কথা বলেন না। অবশ্য বাইবেলের দশটি আদেশবাণীতে এ বিষয়টাকে অন্যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সে আদেশবাণীগুলো জানতাম শুধু এ কারণে যে পরীক্ষার সময় পাদ্রিদের প্রশ্নের উত্তরে ওগুলোকে বলতে হত; তাও ব্যাকরণের সূত্র জানার মত সেসব জানা ততটা জরুরী ছিল না।

'সে কারণে, যাদের মতামতকে সমীহ করতাম, তাদের কারও কাছ থেকে কখনও শুনিনি যে কাজটা খারাপ, বরং এটাই শুনেছি যে ওটা ভালই। শুনেছিলাম ওটা করার পরই নাকি আমার মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। বড়রা বলতেন, ওটা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই; তাছাড়া কথাটা বইয়েও পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, বন্ধুরাও বলত যে ওটা করা নাকি খুবই বাহাদুরি; ফলে সেটার মধ্যে ভাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। আর রোগের ভয়? সদাশয় সরকার আগের থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পতিতালয়ের নিয়মিত তদারকির আয়োজন আছে যাতে কিনা স্কুলের ছাত্ররাও নির্দ্বিধায় নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে পারে। এরজন্য মাইনে দিয়ে ডাক্তার রাখা হয়েছে। তাদের মত হচ্ছে, লাম্পট্য করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী; তাই তারা বেশ পরিষ্কার সাজানো-গোছানো লাম্পট্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এমনকি সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য মায়েদেরও এ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখেছি আমি। স্বয়ং বিজ্ঞানই ছেলেদের পতিতালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত করে।'

আমি জানতে চাইলাম, 'বিজ্ঞানটা আসছে কোত্থেকে?'

'ডাক্তাররা কি বিজ্ঞানী নয়? ওরাই তো হল বিজ্ঞানের হর্তাকর্তা। কাজটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই—এ কথা ঘোষণা করে ছেলেদের পাপের পথে নিয়ে যায় কারা? ডাক্তাররা। আর তারপর বেশ গম্ভীর মুখে সিফিলিসের চিকিৎসা শুরু করে।'

'কিন্তু সিফিলিসের চিকিৎসা করাটা চলবেনা কেন?'

'কারণ, সিফিলিস দূর করার জন্য যে উদ্যম ব্যয় করা হয় তার শতকরা একভাগ উদ্যমও যদি লাম্পট্য দূর করার কাজে ব্যয়ীত হত তাহলে অনেক আগেই সিফিলিস রোগটারই অবসান ঘটে যেত। কিন্তু লাম্পট্যকে দূর করার জন্য নয়, বরং তাকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই সমস্ত উদ্যম ব্যয়ীত হচ্ছে। কিন্তু থাক সেকথা, যা বলছিলাম। শুধু আমাদের শ্রেণীরই নয়,সবশ্রেণীর, এমনকি চাষী শ্রেণীর ছেলেদের দশ জনের মধ্যে ন জনের মতই (আরও বেশিও হতে পারে) আমার ক্ষেত্রেও এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটল, যা কিনা কোন মেয়ের রূপের মোহে নয়—অন্য কারণে। না, কোন মেয়ে আমাকে বশীভূত করেনি; আমি পাপ করলাম শুধুমাত্র এই কারণে যে, আমার আশেপাশের লোকজনের মতে ওটা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হিতকর আর সঙ্গত; এবং অন্যদের চোখে ওটা নিতান্তই যৌবনের স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদের ব্যাপার; আর তা যে শুধু মার্জনীয় তা-ই নয়, নির্দোষও বটে। ফলে আমিও সেটাকে পাপ

বলে ভাবিই নি ; বরং কিছুটা আনন্দ, কিছুটা বয়সের তাগিদ (তা-ই শুনেছিলাম) বলেই শুরু করেছিলাম ঠিক সেভাবেই যেভাবে শুরু হয়েছিল ধূম আর মদ্যপান। তবু যেন আমার প্রথম পদস্খলনের মধ্যে করুণ আর অসাধারণ গোছের কী একটা ছিল। মনে আছে, তখনও সেই ঘরের বাইরে আসিনি, সে সময়ই এমন একটা বিষণ্ণতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁদি। নিজের যে নিষ্পাপতাকে হারিয়ে ফেললাম, জীবনে আর কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতাতে পারব না সেই শোকের জন্য ইচ্ছে করল প্রাণভরে কাঁদতে। হ্যাঁ, সেই মুহূর্তেই মেয়েদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কটা চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সেদিন থেকে মেয়েদের প্রতি আমার মনোভাবে আর কোন বিশুদ্ধতা রইল না, এবং তা থাকা সম্ভবও ছিল না। ফলে, যাকে বলে লম্পট, আমি তা-ই হয়ে গেলাম। আর পুরোপুরি লম্পট হওয়া মানে মদ্যপ, ধূমপায়ী বা আফিমখোরের শারীরিক অবস্থায় উপনীত হওয়া। মদ্যপ, ধূমপায়ী বা আফিমখোরেরা যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক মানুষ হচ্ছে সে, যে কিনা শুধু সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই একটি মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে। সেই মুহূর্তেই সে-লোকের চির-দিনের জন্য পতন ঘটে গেছে—সেদিন থেকে সে শুধু লম্পট। এবং মদ্যপ কিংবা আফিমখোরকে যেমন তাদের চেহারা দেখেই চিনে নেওয়া যায়—লম্পটকেও চেনা যায় ঠিক সেভাবেই। লম্পট হয়ত আত্মসংযমের চেষ্টা করবে, লড়বে, কিন্তু মহিলাদের সঙ্গে সহজ-সরল ভাইয়ের মত সম্পর্ক আর কখনই তার আয়ত্তে আসবে না। কমবয়সী মেয়ের দিকে তাকানোর ভঙ্গি থেকেই লম্পটকে তৎক্ষণাৎ চেনা যায়। আমিও সেই লম্পট হয়ে গেলাম, এখনও আছি ; আর সে কারণেই আমার সর্বনাশ ঘটেছে।

॥ পাঁচ ॥

'হ্যাঁ, তাই। পরে ব্যাপারটা আরও গড়াতে লাগল। হে ঈশ্বর! নিজের নোংরামির কথা ভাবতে গিয়ে মন গভীর আতঙ্কে ভরে ওঠে। যে নিষ্পাপ ছেলেটিকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা হাসি তামাশা করত, সেই আমার কথাই আজ আমার মনে পড়ছে : আর মনে পড়ছে সেই ধনীর দুলালদের কথা, সেই অফিসার-দের কথা, সেই প্যারিসপন্থীদের কথা, সেই সব ভদ্রলোকদের কথা আর আমার নিজের কথা যারা তিরিশ বছরের লম্পটের দল, যারা মহিলাদের বিরুদ্ধে শত শত বিভিন্ন প্রকারের জঘন্য অপরাধে অপরাধী, যারা লম্পট চূড়ামনি, যারা দল বেঁধে ঢুকছি বৈঠকখানায়, নাচঘরে—যাদের দাড়িগোঁফ কামানো, পরিষ্কার গাল, ঘষামাজা শরীর, ধবধবে জামাকাপড়, সুগন্ধীর ছটা আর পরনে ফ্রককোট ও ইউনিফর্ম—যাদের দেখলেই মনে হয় অতি সুন্দর এক পবিত্রতার প্রতিমূর্তি!

ব্যাপারটা কি হওয়া উচিত ছিল, আর হয়েছে কী রকম সেটা একবার ভেবে দেখুন। ধরুন, এ ধরনের একজন ভদ্রলোক আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ; আমার তো জানাই যে তিনি কিভাবে জীবনযাপন করেন। সুতরাং আমার নিশ্চয় উচিত যে তাকে একপাশে ডেকে এনে চুপি চুপি বলা, "শোন, তুমি কিভাবে থাক, সেটা আমার জানা আছে ; কোথায়, কার সাথে রাত কাটাও সেটাও ভালভাবেই জানি। সুতরাং এখানে তোমার কোন স্থান নেই। এখানে রয়েছে একান্তই নিষ্পাপ পবিত্র মেয়েরা। দয়া করে চলে যাও এখান থেকে।"

ব্যাপারটা এরকমই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যখন এ ধরনের কোন লোক এসে আমার বোন বা মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে, তখন তিনি যদি সঙ্গতিসম্পন্ন বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হন তাহলে আমরা কিন্তু সকলেই মনে মনে বেশ খুশিই হই। একসাথে রাত কাটাবার পরও হয়ত তিনি আমার মেয়েকে নেকনজরে দেখবেন। তিনি লম্পট হোন, তার দেহে রোগ থাকুক—তাতে কিছু এসে যায় না। আজকালকার চিকিৎসা ব্যবস্থা তো খুবই চমৎকার। আমার নিজেরই জানা কয়েকজন উচ্চ সমাজের মা-বাপ তাদের মেয়েদের সিফিলিস রোগীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খুবই আহ্লাদিত হয়েছেন। উঃ কী ভয়ঙ্কর নোংরামি! এ মিথ্যের মুখোস কি একদিন খুলে যাবে না!'

ভদ্রলোক মুখ দিয়ে সেই বিচিত্র আওয়াজ করে চা খেতে লাগলেন। বেজায় কড়া—জল মিশিয়ে পাতলা করার মত জলও নেই। দু গেলাস চা খাবার ফলটা আমার ওপর বেশ ভালই হয়েছে বুঝতে পারছি। মনে হয় তার ওপরও এর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কেননা তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন; গলার স্বর আরও ভাবালু, এবং সুরেলা হয়ে উঠেছে। খালি নড়াচড়া করছেন; টুপিটা একবার খুলছেন, আবার পরছেন; আধো-অন্ধকারে মুখে বিচিত্র ভাবান্তর ঘটে চলেছে।

তিনি বলে চললেন, 'এভাবেই তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটালাম। তবে তারই মধ্যে বিয়ে করে পবিত্র পারিবারিক জীবন কাটানোর সঙ্কল্প কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করিনি; আর সে কারণেই যোগ্য মেয়ের অনুসন্ধান করে চললাম। ব্যভিচারের কাদায় আমার সারা গা ভরে গেলেও একেবারে অকলুষিত একটি মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। সেই খোঁজখবরের সময় অনেক মেয়েকেই প্রত্যাখান করলাম এই যুক্তিতে যে তারা আমার মতে যথেষ্ট অকলুষিত নয়। অবশেষে আমার যোগ্য বলে একজনকে মনে হল। পেনজার একজন জমিদারের দুটি মেয়ের একটি সে। জমিদারটি একসময় বেশ ধনী ছিলেন, কিন্তু তখন তার অবস্থা অনেক পড়ে গিয়েছিল।

'মেয়েটির সঙ্গে সারাদিন নৌকোয় কাটিয়ে তার উলের জার্সি পরা সুঠাম দেহ আর কোঁকড়ানো চুলের তারিফ করতে করতে রাতে চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরছি একদিন, তখন হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম যে এই হচ্ছে আমার সেই মানসী। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল মেয়েটি আমার মনের সব ভাব আর অনুভূতিকে বুঝতে পারছে, এবং মনে হয়েছিল সে ভাব ও অনুভূতি খুবই উঁচু দরের। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছিল এই যে সেই জার্সি আর কোঁকড়ানো চুলে তাকে দারুণ মানিয়েছিল, এবং সারাদিন তার কাছে কাছে থাকার ফলে আমার তাকে আরও কাছে পেতে ইচ্ছে করছিল।

'সৌন্দর্য মানেই শুভ—এটা যে কত বড় ভ্রান্তি সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। সুন্দরী মেয়ে যদি বাজে কথা বলে তো শুনে মনে হবে সেটা বাজে কথা নয়—বুদ্ধিমতীর কথা। মেয়েটি যদি কুৎসিত কথা বলে কুৎসিত কাজ করে তবু সেগুলোকে মনে হবে মধুর। আর যদি কোন কারণে সে কুৎসিত কথা না বলে, অথচ দেখতেও সুন্দর হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে মনে হবে নৈতিকগুণবতী আর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

'দারুণ উচ্ছ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কোন সন্দেহ ছিল না যে মেয়েটি

নৈতিক গুণের ভাণ্ডার ; তাই আমার স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। সুতরাং পরের দিনই তার পাণি প্রার্থনা করলাম।

'কিন্তু ব্যাপারটা কী গোলমেলে তা একবার ভেবে দেখুন! হাজারটা লোক বিয়ে করলে তাদের মধ্যে (দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু আমাদের শ্রেণীতেই নয়, সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রেও তাই) আজ পর্যন্ত দশবার বিয়ে করেনি, এমন লোক খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর ; তাছাড়া ডন জুয়ানের মত শতাধিক বা সহস্রাধিকবার বিয়ে করেছে এমন লোকেরও খুব একটা কমতি নেই। (এটাও সত্যি, আমি শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছিও, নবীনদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে বিয়েটা কোন তামাশার ব্যাপার নয়, এটা একটা পবিত্র ও মহান বিষয়। ভগবান তাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আমাদের সময় প্রতি দশ হাজার জনেও এমন একজন লোকও ছিল না)। এটা সবারই জানা, তবু সকলেই ভান করে যে তা জানেনা। নাটক ও উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মনের কথা সবিস্তারে লেখা হয়। তারা ফুল ও পুকুরের পাশে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোন নায়িকার প্রতি নায়কের মহান প্রেমের বর্ণনা দেবার সময় এটা বলা হয় না যে তিনি তার আগের জীবনটা কিভাবে কাটিয়েছেন ; বলা হয় না তার পতিতালয়ে যাবার কথা, চাকরানী, রাঁধুনী আর পরস্ত্রীর সাথে ফষ্টিনষ্টির খবরও চেপে যাওয়া হয়। এবং যদি কখনও এ ধরনের অশোভন কাহিনী লেখা হয়ও তবু তা কখনও যাদের এ কথাটাজানা খুবই দরকার—অর্থাৎ কুমারীদের হাতে তা দেওয়া হয়না। প্রথম প্রথম নবীনা-দের কাছে ভান করা হয় যে ব্যভিচার বলে কিছুই নেই, অথচ আমাদের শহরগুলোয়, এমনকি গ্রামের অর্ধেক জীবনটাই কাটে ব্যভিচারে। পরে ভান করে করে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত তারা ইংরেজদের মত নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করে দেয় যে অত্যন্ত উঁচু নৈতিক জগতের বেশ উঁচু পর্যায়ের নীতিবাগীশ তারা। এবং আশ্চর্য, মেয়েরা সে কথাটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করে বসে। আমার দুর্ভাগা স্ত্রীও তাই বিশ্বাস করেছিল। মনে আছে, যখন সে আমার বাগদত্তা তখন একদিন আমি তাকে আমার ডায়রীটা দেখিয়েছিলাম। তা দেখে সে আমার অতীত জীবনের কিছুটা আভাস পেল, আমার সর্বশেষ ব্যাপারটাও জানল ; কারণ, আমি চেয়েছিলাম যে তা সে জানুক। কেননা অন্য লোকের মুখ থেকে যা শুনবে সেটা তাকে আগেই বলে দেওয়াটা ভাল বলে আমার মনে হয়েছিল। মনে আছে ব্যাপারটা যখন সে জানল তখন মনে মনে কী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কী ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, কী হতাশা আর উদ্‌ভ্রান্তি ঘিরে ধরেছিল তাকে! সে মুহূর্তে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়ে দেবার জন্য যে সে মনে মনে চাইছিল সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু কেন যে শেষ পর্যন্ত তা করল না!'

আবার সেই আওয়াজটা করলেন তিনি ; কথা থামিয়ে এক ঢোক চা খেলেন।

॥ ছয় ॥

বেশ উঁচু গলায় বললেন, 'ন', ন', যা হয়েছিল সেটাই ভাল ; বেশ উচিত শিক্ষাই পেয়েছিলাম আমি। যা হোক, সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আমার কথা হল, কেবলমাত্র হতভাগা কুমারীরাই প্রতারিত হয়। মায়েরা, বিশেষতঃ স্বামীদের কাছ থেকে যারা শিখেছে, তারা সবকিছু ভালভাবেই জানে। যদিও তারা পুরুষের সুচিতায় বিশ্বাসের ভান করে, তবে আচরণ করে একেবারে বিপরীত। নিজেদের

জন্য, নিজেদের মেয়েদের জন্য ছেলে ধরতে হলে কি টোপ ফেলতে হবে তা তাদের বেশ ভাল করেই জানা।

'আমরা পুরুষেরা যেহেতু জানতে চাই না তাই জানি না, কিন্তু মেয়েরা এটা বেশ ভাল করেই জানে যে তথাকথিত মহান কাব্যিক প্রেমের উৎস কোনক্ষেত্রেই নৈতিক নয়, বরং শারীরিক সান্নিধ্যে, কেশবিন্যাসে, জামার রঙে আর কাটিংয়ে। বিশেষ কোন পুরুষকে বাগে আনতে চায় এমন কোন বহুবল্লভাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সে পুরুষটির সামনে নিষ্ঠুর ছলনাময়ী, এমনকি অধঃপতিতা রূপে আবির্ভূতা হবে, নাকি কুৎসিত, বেমানান পোশাকে আসবে? সে যে প্রথম ঝুঁকিটাই নেবে তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। কারণ, সে ভাল করেই জানে, পুরুষটি যে উচ্চ নৈতিকতার কথা বলছে সেটা নিতান্তই মিথ্যে; সে আসলে চাইছে তার শরীর; এবং সে কারণে সে তার সব পাপকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু কুৎসিত পোশাকের জন্য মার্জনা লাভ তার কাছ থেকে কিছুতেই সম্ভব নয়। বহুবল্লভারা এটা হাড়ে হাড়ে জানে, তবে নিষ্পাপ কুমারীরা বোঝে সহজাত বোধশক্তির সাহায্যে, যেমন করে বুঝে থাকে পশুরা।

'আর সে কারণেই এমন অশ্লীল জার্সির বাহার, পেছনে ফোলানো ফ্রক, খোলা কাঁধ, হাত আর প্রায়-নগ্ন বুক। মেয়েদের, যারা বিশেষ করে পুরুষের কাছ থেকে শিখেছে, তাদের এটা ভালভাবেই জানা আছে যে বড় বড় কথার কচকচি সত্ত্বেও প্রতিটি পুরুষ আসলে যা চায় তা হল শরীর, আর শরীরের প্রলোভনকে যা-কিছু বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম তার সবকিছু, এবং তারা সেটাই করে থাকে অতি যত্নের সঙ্গে। এই কদর্যতার যে অভ্যাসটা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা ঝেড়ে ফেলে যদি খোলা চোখে সমাজের উচ্চশ্রেণীর জীবনটাকে দেখা যায় তবে আমরা দেখতে পাব যে সেটা একটা অশুহীন পতিতালয়। কি, কথাটা মানতে চাইছেন না? ঠিক আছে আপনাকে প্রমাণ দিচ্ছি।' আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বলে চললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন যে পতিতালয়ের মেয়েদের থেকে সমাজে বসবাসকারী মেয়েদের উদ্দেশ্য আলাদা; কিন্তু আমি বলছি যে তা নয়—এবং সেটাই আমি আপনার সামনে প্রমাণ করে দেব। যদি জীবনের আলাদা উদ্দেশ্য থাকে, যদি তার মর্মবস্তু আলাদা হয়, তাহলে জীবনের বাহ্যিক রূপটাও আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু যে সব অধঃপতিত দুর্ভাগা মেয়েদের আমরা ঘৃণার চোখে দেখে থাকি, তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে তারপর দেখুন সমাজের সর্বোচ্চস্তরের মেয়েদের। দেখবেন, সেই এক প্রসাধন, এক কায়দা, একই সুগন্ধী, সেই একই নগ্ন হাত, বুক আর কাঁধ, সেই পেছন ফোলানো ফ্রক, হীরে, জহরত ও দামী গহণাগাটির ওপর একই লোভ, সেই একই পদ্ধতির আমোদ প্রমোদ; নাচ আর গানবাজনা। পুরুষদের বশীভূত করার পদ্ধতি দু শ্রেণীর মধ্যে একই—কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই। তবে যদি চুলচেরা পার্থক্য করতে হয় তো বলা যায় অল্পদিনের পতিতাদের আমরা ঘৃণা করি, কিন্তু দীর্ঘদিনের পতিতাদের জানাই সম্মান।

॥ সাত ॥

'সে কারণেই আমি জার্সি, কোঁকড়ানো চুল ও পেছন ফোলানো ফ্রকের ফাঁদে ধরা দিলাম। আমাকে ফাঁদে ফেলাটা খুবই সহজ ছিল; কারণ, যে বিশেষ পারিপার্শিকতার মধ্যে আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলাম সেটা ছিল অনেকটা

শশা ফলাবার কাঁচের ঘরের মত, যা ছেলেদের প্রেমের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। আমরা শরীর গরম করা একগাদা খাদ্য আর পানীয় খেয়ে থাকি, এবং তার সাথে চালাই শারীরিক আলস্য, যা-কিনা নিয়মিত লালসাকে প্ররোচনা যুগিয়ে চলে। কথাটা শুনে অবাক হোন আর নাই হোন—তবে জানবেন, এটা সত্যি। অবশ্য আমি একেবারে শেষের দিকের আগে অবধি এটা বুঝতে পারিনি। তবু এখন বুঝি; আর সে কারণেই ওই স্ত্রীলোকটির মতই যখন অন্য লোকেরাও না বুঝেই হাল্কা কথা বলে তখন বড্ড বিরক্ত হই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার বসন্তে আমার ওখান থেকে কিছুটা দূরেই কয়েকজন চাষী রেলপথের বাঁধে কাজ করছিল। তাদের সাধারণ খাবার হল রুটি, কভাস আর পেঁয়াজ। তাতেই তারা বেঁচে থাকে, ফুর্তি ও স্বাস্থ্য পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে সক্ষম হয়, এবং মাঠে কাজ করে। রেলপথের কাজ করতে গেলে দৈনিক আধ কিলো গরুর মাংস আর পাঁয়াজ পায় খাবার জন্য। কিন্তু এই খাদ্যের দ্বারা সঞ্চিত শক্তি তারা ব্যয় করে দিনে ষোল ঘণ্টা কাজ করে আর তিরিশ মণ ওজনের মাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি টেনে। এবং এটাই ওদের প্রয়োজন। অথচ আমরা? দিনে এক সের মাংস, হাঁস-মুরগি, শরীর গরম-করা অন্যান্য সৌখীন খাবার আর পানীয় গ্রহণ করি। কিন্তু সেগুলো যায় কোথায়? সবটাই ইন্দ্রিয় সম্ভোগে। তবু যদি উত্তেজনা মোচনের একটা পথ খোলা থাকে তবে সেটা ভালয় ভালয় মিটতে পারে, কিন্তু সে পথ যদি বন্ধ হয়ে যায়, যেমন আমার বেলা মাঝে মাঝে হত, তাহলেই সৃষ্টি হয় উত্তেজনার, তারপর কৃত্রিম জীবনের রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে সেটা গিয়ে পর্যবসিত হয় অতি-সূক্ষ্ম প্রেমে, এমনকি অদেহী ভালবাসায়। এবং সেভাবেই অন্য সকলের মত আমিও প্রেমে পড়লাম। আমার সে প্রেমে সবই ছিল—উচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ, কাব্য—সবকিছু। বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে আমার ভালবাসার জন্য একদিকে দায়ী ছিল মেয়েটির মা ও তার দর্জি, আর অন্যদিকে দায়ী ছিল আমার খাওয়া দাওয়া ও অলস জীবনযাপন প্রণালী। যদি তার সাথে নৌকোয় না বেড়াতাম, যদি তার দেহের কটা রেখাকে ফুটিয়ে তোলার মত কোন দর্জি না থাকত, যদি সে বেখাপ্পা একটা ড্রেসিং গাউন পরে বাড়িতে বসে থাকত, যদি নিজের কাজের জন্য যতটা খাবার দরকার ততটাই খেয়ে স্বাভাবিক লোকদের মত থাকতাম, যদি উত্তেজনা মোচনের জন্য কোন স্বাভাবিক পথ খোলা থাকত, (ঘটনাচক্রে সে সময় তা খোলা ছিল না), তাহলে আমি কিছুতেই তার প্রেমে পড়তাম না; ফলে পরিণামটাও কিছুতেই এমন হত না।

॥ আট ॥

কিন্তু এক্ষেত্রে সবই মিলে গেল; আমার অবস্থা, ওর সাজগোজ আর নৌকো বিহার। এর আগে বিশবারের যোগাযোগেও যা ঘটেনি, এবার তাই ঘটল। ঠাট্টা করছি না, একেবারে ফাঁদে পড়লাম। আমাদের সময় বিয়ের তোড়জোড়টা ফাঁদ পাতার মতই হত। মেয়ের বয়স হলেই বিয়ে দিতে হবে। সাধারণভাবে বিষয়টা খুবই সহজ। অবশ্য যদি মেয়েটি কুৎসিত না হয় এবং তার পাণিপ্রার্থী কোন পুরুষ থাকে, তবেই। আগেকার দিনে ব্যাপারটা ঘটত এভাবে। মেয়ের বয়স হলে বাবা-মাই তার পাত্র যোগাড় করে দিত। এ প্রথা এখনও আছে—চীনে, ভারতবর্ষে, মুসলমানদের মধ্যে, এমনকি আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যেও। পৃথিবীতে শতকরা

নিরনব্বই জন লোকের মধ্যেই রয়েছে এ প্রথা। কিন্তু শতকরা মাত্র একজন, কিংবা বলতে পারেন তার থেকেও কম, আমাদের মত কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোকেরাই এগিয়ে এসে বলল যে এটা ভুল, এবং তারা নিজেরাই একটা নতুন প্রথা আবিষ্কার করল। আর সেটা কি? সেটা হল, মেয়েরা বসে থাকবে, আর তাদের সামনে পুরুষেরা, অনেকটা বাজার করার মত পায়চারি করে বাছাই করবে। মেয়েরা চুপচাপ বসে থাকে, মনে মনে ভাবে, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না যে, "এই যে, আমায় নিন! আমায়! ওকে নয়, আমায়! দেখুন না, আমার কাঁধ দুটো কী চমৎকার! তাছাড়া…এই যে অন্যান্য জিনিস…দেখুন না!" আর আমরা পুরুষেরা পায়চারি করতে করতে তাই দেখি, বেশ মজা লাগে। মনে মনে বলি, "না, না, অত সহজে ফাঁদে পা দিচ্ছি না।" ঘুরে ফিরে দেখি, বেশ খুশি হই; ভাবি আমাদের জন্যই তো এত আয়োজন। তারপর দেখতে দেখতে একসময় আমরাও ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি—আটকে যাই।'

বললাম, 'এছাড়া আর উপায়টাই বা কি? মেয়েরা কি তবে নিজেরাই বিয়ের প্রস্তাব করবে?'

'অন্য কি উপায় আছে তা আমার জানা নেই: তবে ছেলে ও মেয়েদের তো সমানই বলা হয়; সুতরাং সত্যিকারেরই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক না সেখানে। এবং বাবা মা বিয়ের ব্যবস্থা করবেন এটা যদি ঘৃণা বলে বোধ হয়, তবে এ ব্যবস্থাটাতো তার থেকেও হাজার গুণে ঘৃণ্য। প্রথম ক্ষেত্রে আর কিছু না হোক মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির অধিকার ও সুযোগ অন্ততঃ সমান-সমান; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মেয়েটির অবস্থা দাঁড়ায় বাজারে বিক্রির জন্য আনীতদাসীর মত, নয়ত ফাঁদের টোপের মত। কিন্তু কোন মেয়ে কিংবা তার মাকে গিয়ে একবার সত্যি কথাটা বলুন তো দেখি যে তার একমাত্র পেশা হচ্ছে স্বামী ধরা। তাহলেই দেখতে পাবেন রাগ কাকে বলে। অথচ সত্যি বলতে তো এছাড়া ওর আর কিছু করেই না, এবং করার কিছু নেইও। একেবারে কমবয়সী সরল-সিধে মেয়েরাও এরকম করতে বাধ্য হয়; তখন তাদের দেখলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তবু যদি খোলাখুলিভাবে সবকিছু চলত, তাহলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু তা তো আর চলেনা, চলে গোপনে—ডুবে ডুবে। "সত্যি, জীবনের বিবর্তন কত চমৎকার! আমার লিজা ছবি আঁকা বলতে একেবারে পাগল! আপনি কি প্রদর্শনীতে যাবেন? এখনও আমাদের জানার আছে অনেক কিছু! তাছাড়া স্লেজে ঘোরা, নাটক দেখা, সিম্ফনি শুনতে যাওয়া? সত্যিই চমৎকার! আমার লিজা গানবাজনার নামেতেই নেচে ওঠে! ওর মতামতের সঙ্গে আপনার মিল নেই কেন বলুন তো? আচ্ছা নৌকোয় গেলে কেমন হয়!" আর সব সময় একটাই মাত্র চিন্তা; "আমাকে নিন, আমাকে, মানে আমার লিজাকে! না, আমাকে! একবার চেখেই দেখুন না!" উঃ কী ভয়ঙ্কর নোংরামি! কী নিদারুণ মিথ্যে!' কথা বলে ভদ্রলোক শেষ চা টুকুতে চুমুক দিয়ে কাপ প্লেটটাকে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

।। নয় ।।

ঝোলাটার ভেতর চা আর চিনিটুকু ভরে নিয়ে তিনি আবার শুরু করলেন, 'আসলে কি জানেন, এ সবকিছুর মূলে হল স্ত্রীলোকের আধিপত্য—এ পৃথিবীতে অসংখ্য দুঃখের শুরুই হল তা থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্ত্রীলোকের আধিপত্য মানে? কি বলতে চাইছেন? আইনে তো পুরুষেরই অধিকার বেশি।'

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই; আপনাকে আমি ঠিক এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। একদিকে এটা যেমন ঠিক যে মেয়েদের চরম অপমানের স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমনি আবার অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, এই বিচিত্র ব্যাপারটার আসল কারণটা এরমধ্যেই নিহিত রয়েছে। টাকার জোরে যেমন ইহুদীরা অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ খুঁজে পায়, মেয়েদের ব্যাপারটাও ঠিক সেরকমই। ইহুদীরা বলে, "তোমরা চাও যে আমরা শুধু বেনে হই, দোকানদার হই—অন্য কিছু নয়, এই তো? ঠিক আছে, তবে বেনে হিসেবেই তোমাদের ওপর শক্তি বিস্তার করব।" আর মেয়েরাও সেভাবেই বলে, "তাহলে তোমরা শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সেবিকা হিসেবেই কামনা কর, অন্য কোনভাবে নয়। বেশ, তাহলে ইন্দ্রিয়ের সেবিকা হয়েই তোমাদের গোলাম বানাব।" মেয়েরা যে অধিকারহীন তা কেবলমাত্র এ কারণেই নয় যে তাদের ভোটাধিকার নেই, কিংবা তারা হাকিমের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেনা—আসলে এ ধরনের কাজ কোনরকম অধিকারের মধ্যেই পড়ে না। বরং তারা অধিকারহীন এই কারণে যে, যৌনজীবনে তারা পুরুষের সমকক্ষ নয়; মনের মত কোন পুরুষের কাছে আত্মদান করা কিংবা না করাটা তাদের ইচ্ছাধীন নয়, আর পুরুষেরাই তাদের বাছাই করে থাকে, তারা তাদের পছন্দ মত কোন পুরুষকে বেছে নিতে পারে না।

'আপনি বলছেন যে এটা খুবই ভয়ঙ্কর। ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি। তাহলে পুরুষেরও তো এ অধিকার থাকা উচিত নয়। মেয়েরা যে অধিকারে বঞ্চিত পুরুষরা সেই অধিকার ভোগ করে থাকে, আর সে কারণেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে মেয়েরা পুরুষদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে কাজে লাগায়। এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে সে তাকে এমনভাবে বশ করে ফেলে যে, শেষপর্যন্ত তার পছন্দটা নিতান্তই নামমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আসলে মেয়েরাই তখন পছন্দ করে। একবার সিদ্ধির পথ খুঁজে পাবার পর মেয়েরা তার সুযোগে সমস্ত লোককেই নিজের কব্জায় এনে ফেলে।'

'এটা কোথায় দেখলেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'কোথায়? সব জায়গায়, সব কিছুর মধ্যেই। বড় শহরগুলোর যে কোন একটা দোকানে গিয়ে দেখুন। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস—কত অগণিত লোকের মেহনতের ফসল যে সেখানে সাজানো রয়েছে তার আর কোন ইয়ত্তাই নেই। অথচ ভাবুন একবার, দশটা দোকান ঘুরে একটাতেও কি পুরুষের ব্যবহার্য কোন কিছু পাওয়া যায়? দুনিয়ার সবকিছু বিলাস-সামগ্রী মেয়েদের চাই; একমাত্র তারাই সেগুলো ব্যবহার করে। কলকারখানাগুলোর কথা একবার ভাবুন; মেয়েদের জন্য তুচ্ছ গহনাগাটি, গাড়ি, আসবাবপত্র আর টুকিটাকি দ্রব্যসামগ্রী বানাতেই তারা ব্যস্ত। মেয়েদের খেয়াল মেটাবার জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষ, পুরুষানুক্রমে অগণিত গোলাম নিজেদের হাড়মাস কালি করে ফেলল কঠোর পরিশ্রম করে। মেয়েরা রানীর মত থাকার জন্য প্রতি দশজন মানুষের নজনকেই দিনরাত গোলামের মত খাটতে বাধ্য করছে। আর এসব কিছু হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের অবমানিত করা হয়েছে বলে, তাদেরকে পুরুষের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি বলে। এবং সে কারণেই আমাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে কাজে লাগিয়ে, আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে তারা

নিজেদের অপমানের প্রতিশোধ তুলছে। বিশ্বাস করুন, সাকিছুর মূলেই এই। ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে কাজে লাগাবার এমন কৌশল মেয়েরা বের করেছে যে তাদের সঙ্গে সম্পর্কে পুরুষেরা কিছুতেই নিজেদেরকে সংযত করে রাখতে পারে না। মেয়েদের কাছে আসার সাথে সাথেই পুরুষেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় আফিমখোরের মত। আগে নাচের পোশাকে সজ্জিতা কোন রমণীকে দেখলে আমি জড়সড় হয়ে যেতাম, বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতাম মনে; আর এখন ভয়ঙ্কর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি, মেয়েটির মধ্যে দেখতে পাই বিপজ্জনক বেআইনি কিছু একটা, আর ইচ্ছে হয় পুলিশকে ডাক দিয়ে বলি এই বিপজ্জনক বস্তুটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

'হাসছেন?' আমাকে একটা ধমক দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'এটা ইয়ার্কি নয়; আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে এমন একটা সময় আসছে যখন কিনা মানুষ একথা ভেবে অবাক হয়ে যাবে যে, ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে তোলার ইচ্ছায় নারীদেহকে গহনা দিয়ে সাজাবার মত একটা শান্তি বিঘ্নকারী ব্যাপারকে মেনে নেবার মত সমাজব্যবস্থা কিভাবে এককালে বজায় ছিল? ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের চলার পথে ফাঁদ পেতে রাখার মতই। না, তার থেকেও খারাপ। জুয়া খেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য অশ্লীল পোশাকে পতিতাদের মত সেজে থাকাটা নিষিদ্ধ নয় কেন? সেটা তো ওর থেকেও হাজার গুণ ভয়ঙ্কর!'

॥ দশ ॥

'আর সে কারণেই, হ্যাঁ, আমিও ফাঁদে ধরা দিলাম। অর্থাৎ সাধারণ লোকের কথায় "প্রেমে পড়লাম।" শুধু যে মেয়েটিকেই গুণবতী ভাবলাম তা নয়, বাগদানের পর নিজেকেও মনে হল গুণবান। কোন কোন বিষয়ে নিজের থেকেও জঘন্য লোককে খুঁজে পায়নি এ রকম বদলোকের অস্তিত্বই নেই; ফলে সে নিজের বিষয়ে গর্ব ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। আমারও ঠিক তেমনিই হল। আমার চেনা পরিচিতেরা যেমন টাকা ও সুযোগ সুবিধের লোভে বিয়ে করেছিল, আমি সে ধরনের কিছুই করছিলাম না। কারণ আমি ছিলাম ধনী, আর মেয়েটি ছিল দরিদ্র। সেটা ছিল একটা ব্যাপার; আর একটা ব্যাপার ছিল এই যে অন্যেরা আগেরকার মতই অন্যান্য মেয়েদের সাথে কারবার চালিয়ে যাবে ঠিক করে নিয়েই বিয়ে করেছিল কিন্তু আমি প্রথমেই মনস্থ করে নিয়েছিলাম যে বিয়ের পর একেবারেই স্ত্রীগত প্রাণ হব, এবং সে কারণে আমার মনে গর্বেরও সীমা ছিল না। হ্যাঁ, আসলে আমি ছিলাম একটা আস্ত শুয়োর, কিন্তু নিজেকে ভাবতাম দেবশিশু।

'বাগদানের পর বেশি দিন কাটল না। সে সময়টুকুর কথা মনে পড়লে আজও লজ্জায় আমার কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। উঃ কী ইতরোমি! আমরা ধরেই নিই যে প্রেম হল একটা আত্মিক ব্যাপার—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। কিন্তু প্রেম যদি আত্মিক হয়, যদি তাতে আত্মার সংযোগ থাকে, তবে তার প্রভাব তো আমাদের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মধ্যে পড়বেই। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেরকম কিছুই হল না। দুজনে একা থাকবার সময় কথা বলাটা সত্যিই কঠিন হয়ে উঠত। কিছু বলার আগে ভাবা, ভাবার পর বলা, বলার পর চুপ করা, চুপ করে আবার ভাবা। এভাবেই চলত, আসলে বলার কিছু ছিলই না। আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের পরিকল্পনা, তার আয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলার

ছিল তার সবটা আগেই বলা হয়ে গিয়েছিল; সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিল—তারপর? যদি পশু হতাম তবে আগে থাকতে জানাই থাকত যে কথা বলার কিছুই নেই; কিন্তু যেহেতু মানুষ, সেহেতু আমাদের কথা বলা উচিত, অথচ বলার মত কিছুই নেই; কারণ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে ব্যাপারটা সেটা কথাবার্তায় মেটার নয়; তাছাড়া সেই জঘন্য প্রথাটা—সেই চকোলেট, মিষ্টি আর বিয়ের অন্যান্য নক্কারজনক ব্যাপার—যেমন, বাড়ি, শোবার ঘর, বিছানা, ড্রেসিং-গাউন, অন্তর্বাস, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে হইচই। ওই বুড়োটা যা বলছিল, অর্থাৎ প্রাচীন প্রথায় বিয়ে হলে বরপণ, বিছানাপত্র, পালঙ্কের গদি—এ সবকিছুই তো কেবলমাত্র বিয়ের রহস্যের আনুষঙ্গিক ব্যাপার; কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, এমন বরেদের প্রতি দশজনের একজনও এইসব রহস্যে বিশ্বাসই করে না; কেউই বিশ্বাস করে না যে, যেটা করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা দায়িত্ব। বিয়ের আগে নারীর-সঙ্গে মিলিত হয়নি এমন লোক একশ জনের মধ্যে একজন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর; বিয়ের পর প্রথম সুযোগেই স্ত্রীকে ঠকাতে চায় না এমন লোক পঞ্চাশ জনের মধ্যে একটি পাওয়াই মুশকিল; বরেদের মধ্যে বেশির ভাগই মনে করে যে গির্জায় বিয়ে অনুষ্ঠানটা একটি নারীর মালিকানা লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব যদি চিন্তা করা যায় তবে বিয়ের সব আচার অনুষ্ঠানের ভয়াবহ তাৎপর্য জলের মত স্পষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। আসল ব্যাপারটাই ওই। অর্থাৎ সোজাসুজি বিক্রি। একটি নির্দোষ মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে একজন লম্পটের কাছে; আর সেই উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হচ্ছে কয়েকটা লৌকিক অনুষ্ঠান।

॥ এগার ॥

গভীর বিদ্বেষের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে ভদ্রলোকটি বললেন, 'সকলেই এভাবে বিয়ে করে, আর আমারও বিয়ে হল এভাবেই; তারপর গেলাম মধুচন্দ্রিমায়। সত্যি, মধুচন্দ্রিমা কথাটাই কী জঘণ্য। প্যারিসে একবার নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়াচ্ছিলাম। একটা সাইন বোর্ড দেখে ঢুকলাম গিয়ে দাড়িওলা মেয়ে আর জলচর কুকুর দেখতে। পরে দেখলাম সেই দাড়িওলা মেয়ে আর কিছুই নয়, একজন পুরুষ একটি মেয়ের সাজ সেজেছে, আর কুকুরটাকে শীল মাছের চামড়ায় মুড়ে একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাঁতার কাটতে। দেখবার কিছুই ছিল না সেখানে, তাই চলে আসছিলাম; সে সময় দালালটা সসম্ভ্রমে আমাকে দেখিয়ে অন্য লোকদের বলল, "এনাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না, জিনিসগুলো দেখার মত কিনা। চলে আসুন, দেরি করবেন না, চলে আসুন! মাথাপিছু মাত্র এক ফ্রাঁ!" আমার একথা বলতে লজ্জা লাগল যে সত্যি সত্যিই ভেতরে দেখার মত কিছু নেই, আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাবার জন্যই দালালটা ওত পেতে বসেছিল। মধুচন্দ্রিমার জঘণ্য অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তাদের অবস্থাটাও ঠিক এরকমই, সম্ভবতঃ লজ্জার জন্যই তারা অপরের ভ্রান্তি ভাঙ্গায় না। আমিও তাই করেছি, কিন্তু আজ আর সেই সত্য গোপন রাখার কোন কারণই খুঁজে পাই না। এমনকি আজ সত্যি কথাটা বলাই নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। মধুচন্দ্রিমা ব্যাপারটাই অস্বস্তিপূর্ণ, লজ্জাকর, ঘৃণ্য, করুণ, আর সবথেকে বড় হল, সেটা বিরক্তিকর, একঘেয়ে; অসহনীয়। অনেকটা প্রথম সিগারেট খাওয়ার সময়ের মত—যখন মুখ দিয়ে লালা বের হয়ে আসছে, গা-ঘোলাচ্ছে আর সেই লালা গিলে ফেলে ভান করছি ভাললাগার। ধূমপানের

আনন্দটা পরে আসে—আর এটাও ঠিক তাই। উপভোগের আনন্দ পেতে হলে আগে পাপটাকে বেশ ভালরকম রপ্ত করে নিতে হয়।'

কথার মাঝেই আমি বলে উঠলাম, 'পাপ মানে? যেটার কথা বলছেন সেটা তো মানুষের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া।'

তিনি বললেন, 'স্বাভাবিক? না, মোটেই স্বাভাবিক নয়; এবং আমি ঠিক ওর উলটো সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। কথাটা বাচ্চাদের আর নিষ্পাপ কুমারীদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন তো। খুবই কম বয়সে আমার বোন তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ বয়সের একটি লম্পটকে বিয়ে করেছিল। আমার মনে আছে, বিয়ের রাতে অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখেছিলাম ও ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল; ওর মুখখানা ছিল একদম ফেকাসে, চোখে জল; কাঁপতে কাঁপতে বলছিল, না, পারবে না, কিছুতেই না। লোকটা যে কি চাইছিল ওর কাছে তা-ও ও বলতে পারেনি।

'অথচ আপনি কিনা বলছেন যে এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, স্বাভাবিক জিনিসও নিশ্চয় আছে। সেসব হল অত্যন্ত সহজ, আনন্দের বস্তু; তাদের মধ্যে লজ্জাকর কিছু নেই। কিন্তু এটা অতি ঘৃণ্য, লজ্জাজনক ও কষ্টকর। না, এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমার এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই যে নিষ্পাপ মেয়েরা ব্যাপারটাকে ঘৃণাই করে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাহলে মানুষের বংশরক্ষা হবে কিভাবে?'

আমি যে এমন একটা অন্যায় প্রশ্ন করব সেটা যেন তার জানাই ছিল, তাই তিনি বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বললেন, 'ঠিকই তো, মানুষের বংশ ধ্বংস হয়ে গেলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। অভিজাত ইংরেজদের পক্ষে যাতে প্রাণ ভরে নিয়মিত ভূড়ি-ভোজ চালানো সম্ভব হয় সে কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিমা কীর্তন চলাটা উচিত; লোকে যাতে আরও বেশি মজা লুটতে পারে সে উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের গুণগান হবে, কিন্তু যদি নৈতিক বোধের নামে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেন তা হলেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। যদি ডজন খানেক মানুষ শুয়োরের মত জীবনযাপন করতে অস্বীকার করে তাহলে আর মানুষের বংশরক্ষাই হবে না? কিন্তু মাফ করবেন, আলোটা বিশ্রী লাগছে, ওটায় ঢাকা পরিয়ে দিলে আপনার আপত্তি হবে কি?' বাতিটা দেখিয়ে তিনি জানতে চাইলেন।

বললাম, সেটা তিনি করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাতির ওপর পর্দাটা টেনে দিলেন। ভদ্রলোকের সব কাজেই দেখছি অস্থিরতা।

বললাম, 'তবু, প্রত্যেকে এ নিয়মটা মেনে নিলে মানুষের আর অস্তিত্বই থাকবে না।'

ভদ্রলোক সামনের আসনে আবার বসে পড়ে, পা দুটো বেশ ফাঁক করে, ঝুঁকে পড়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে তারপর বললেন, 'মানুষের বংশরক্ষা হবে কি করে তাই বলছেন তো? কিন্তু মানুষ জাতটা চিরটাকাল টিকে থাকবে কেন সেটা আগে শুনি তো?'

'কেন নয়? তাহলে যে আপনার আমার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।'

'আমাদের অস্তিত্ব থাকতেই হবে কেন?'

'কেন আবার? বেঁচে থাকার জন্য।'

'বেঁচে থাকবই 'বা কেন ? জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, যদি জীবনটা শুধু জীবনই হয়, তাহলে তো আমাদের বেঁচে থাকার কোন কারণই দেখি না। আর তা যদি সত্য হয়, তবে শোপেনহাওয়ার, হার্টম্যান ও বৌদ্ধরা যা বলেছেন, তাই সঠিক। কিন্তু জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাটাই ন্যায্য।' বেশ উত্তেজনার সঙ্গে তিনি কথাটা বললেন ; বুঝলাম কথাটার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে তার নিজের কাছে। 'এই হচ্ছে ফলাফল। ভেবে দেখুন একবার, মঙ্গল, মমতা ও ভালবাসাই যদি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, যদি শাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা হয়েছে সেটাই হয় মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভালবাসায় মানুষ এক হয়ে যাবে, হাতিয়ার থেকে বানাতে হবে লাঙল···ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে আমাদের বাধাটা কি ? আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রিপু রয়েছে। আর এই রিপুগুলোর মধ্যে সব থেকে অবাধ্য হচ্ছে যৌন প্রেম, অর্থাৎ দৈহিক প্রেম ; এবং আমরা যদি এই রিপুকে দমন করতে পারি, বিশেষ করে সব থেকে প্রখর যেটা সেই যৌন প্রেমটাকে—তবে তো ভবিষ্যদ্বাণীটাই সফল হয়ে যাবে। মানুষ সেদিন এক হবে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করবে ; তখন তো আর প্রাণধারণের কোন কারণই থাকবে না। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিনই এই আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। সেটা শুয়োর আর খরগোশের অবাধ প্রজননের আদর্শ নয় ; সেটা বাঁদর ও প্যারিসপন্থীদের অতি সূক্ষ্ম সম্ভোগের আদর্শও নয়—সেটা হল মানুষের মঙ্গলের আদর্শ : আর সে আদর্শের সিদ্ধিলাভের উপায় হল জিতেন্দ্রিয়তা, মানসিক শুদ্ধতা। মানুষ বারবার এ আদর্শে পৌঁছবার চেষ্টা করে চলেছে, বারবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল সেটা একবার ভেবে দেখুন তো।

'ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে দৈহিক প্রেম হল উত্তেজনা নিরসনের একটা পথ। আমাদের কালের লোকেরা মনুষ্যজীবনের আদর্শে পৌঁছতে পারেনি ; আর এটা পারেনি শুধুমাত্র এই কারণে যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সজাগ রিপু কাজ করে চলেছে ; এবং এইসব রিপুর মধ্যে সবথেকে সতেজ হচ্ছে যৌন রিপু। আর যৌন কামনা যখন রয়েছে, যখন নতুন নতুন লোকজন জন্মাচ্ছে, তখন মানুষের আদর্শে পৌঁছবার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। এবং তারা যদি সে কাজ সমাধা করতে না পারে, তবে তাদের পরবর্তী বংশধরদের পালা আসবে সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার ; আর এভাবেই চলবে একের পর এক বংশধারার, যতদিন না ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সফল হয়, যতদিন না সব মানুষ মিলে একাকার হয়ে যায়। এছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে ? ধরা যাক, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি করলেন। হয় তাদের নশ্বর প্রাণী হিসেবে যৌন প্রবৃত্তি বাদ দিয়ে সৃষ্টি করলেন, নয়ত একেবারে অবিনশ্বর হিসেবে বানালেন। যদি যৌন প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে নশ্বর প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করা হয় তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াবে ? তখন তারা শুধু কিছুদিন বেঁচে থাকবে, তারপর তাদের মৃত্যু হবে ; কিন্তু কখনোই সিদ্ধিলাভ হবে না ; ফলে সিদ্ধিলাভের জন্য ঈশ্বরকে আবার নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবেই। অবিনশ্বর হলে অবশ্য হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব (অবশ্য নিজেদের দোষত্রুটি নিজেদের পক্ষে শোধরানোটা খুবই কঠিন ; কিন্তু

পরে যারা আসবে তাদের পক্ষে পূর্বপুরুষদের ভুলত্রুটিকে শুধরে পূর্ণতার কাছাকাছি যাওয়া খুবই সোজা হবে), যদি তাই ধরে নেওয়া হয়, তবে অমরলোকের প্রয়োজনটাই বা কি ? কোন্ কাজে লাগবে সেটা ? এখন যে অবস্থা চলছে সেটাই ভাল—এ ধরনের বক্তব্য বলাতেই নিশ্চয় আপনার আপত্তি ? সম্ভবতঃ আপনি বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী ? কিন্তু আসলে ফলটা তো সমানই-ই। প্রাণী জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে মানুষ ; অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে বাঁচবার জন্য তাদেরকেও মৌমাছির মতই জোট বাঁধতে হবে—অবাধ প্রজননের হাতে নিজেদের তুলে দিলে কিছুতেই তা সম্ভব হবে না। মৌমাছিদের মত তাদেরকেও যৌন চিন্তাহীন ব্যক্তিদের পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দিতে হবে—সংযমের চেষ্টা করতে হবে ; আমাদের সমাজে যৌন প্রবৃত্তিকে যেমন আস্কারা দেওয়া হয়, তেমন দিলে আর চলবে না।' মুহূর্তের জন্য থেমে তারপরই বললেন, 'মনুষ্য জাতের সমাপ্তি ঘটবে এটা খুবই ভয়ঙ্কর ; কিন্তু যার যাই মতামত হোক না কেন, অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা কি কারও পক্ষে সম্ভব ? এটা তো নিয়তির মতই অমোঘ। প্রত্যেকটা ধর্মশাস্ত্রেই আছে যে একদিন পৃথিবীর বিলুপ্তি ঘটবেই ; এমনকি বিজ্ঞানও সে কথাই বলে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষাধারী যখন সেটা বলে তখন তা বিচিত্র বলে বোধ হবে কেন ?'

এরপর ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। চা খেলেন, সিগারেটটা শেষ করে ঝোলা থেকে আর একটা সিগারেট বের করে পুরনো দাগওলা সিগারেট কেসটায় ভরলেন।

আমি বললাম, 'আপনার বক্তব্যটা বুঝতে পারলাম। শেকারদের (১৮শ শতকের মাঝামাঝি চিরকৌমার্যের প্রচারক ইংল্যাণ্ডের ধর্মসম্প্রদায়) মতামতটাও ঠিক এরকমই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওরা ঠিকই বলে। সেটা যেভাবেই প্রকাশ পাক না কেন, যৌন আবেগ হল একটা ঘোরতর পাপ ; যেভাবেই হোক সেটাকে দাবিয়ে রাখা দরকার—কিছুতেই ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। বাইবেলের সেই উক্তি : "লালসার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো মানেই হল তার সঙ্গে ব্যভিচার করা" কথাটা যে শুধু পরস্ত্রীর বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়, সেটা প্রযোজ্য এমনকি নিজেদের স্ত্রীর বেলাতেও।'

।। বার ।।

আমাদের সমাজে কিন্তু সবকিছুই উলটো। অবিবাহিত অবস্থায় কেউ হয়ত সংযম অভ্যাস করছে, কিন্তু বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মনে করছে যে সংযমের আর কোন প্রয়োজনই নেই। সত্যি বলতে কি বিয়ের পরই বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমরা যে দেশভ্রমণে বের হই, দুজনে নিরালায় কাটাই—সেটা গুরুজনদের পক্ষ থেকে লাম্পট্যের অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জানবেন, নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলাকে মেনে না চললে এমনিতেই কপালে শাস্তি জোটে। আমিও অনেক চেষ্টা করেছিলাম মধুচন্দ্রিমাকে সার্থক করে তোলার, কিন্তু সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত সব ব্যাপারটাই আমার কাছে লজ্জাকর, জঘণ্য ও একঘেয়ে বলে মনে হয়েছে। দুদিনেই সবকিছু বিশ্রী বলে বোধ করতে থাকি। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে দেখলাম যে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ মুষড়ে পড়েছে। কেন তার মন খারাপ সেটা জানতে চেয়ে তাকে আদর করলাম, কারণ ভেবেছিলাম ওতেই সে খুশি হবে।

কিন্তু সে আমার হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। কেন কাঁদছে তা বলতে পারল না, তবে বলল যে খুবই খারাপ লাগছে। সম্ভবতঃ স্নায়ুর চাপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে আমাদের দুজনের সম্পর্কটা খুবই জঘণ্য, কিন্তু সেটা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিল না। আমি ব্যাপারটা জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে বলল যে ওর মার জন্য নাকি খুব মন খারাপ করছে। বুঝলাম, কথাটা সত্যি নয়; তবু মায়ের কথা না তুলেই সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ও যে সত্যিসত্যিই অসুখী, মার ব্যাপারটা নিতান্তই একটা ছুতো মাত্র—সেটা আমার মাথায়ই ঢুকল না। কিন্তু ওর মার কথাতে কান না দেওয়াতে ও বেশ চটে গেল। বলল, ওকে যে আমি মোটেই ভালবাসি না সেটা ওর কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি তখন ওকে মেজাজের ঠিক নেই বলে বকলাম; সাথে সাথে ওর মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল; দুঃখের অভিব্যক্তির পরিবর্তে ফুটে উঠল তীব্র বিরক্তির রেখা; অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর বলে গালাগালি দিতে শুরু করল। ওর দিকে চেয়ে দেখলাম সারা মুখ জুড়ে ছড়িয়ে আছে বাসনাবিহীন শত্রুতা, বিরূপতা আর বিদ্বেষের ভাব। মনে আছে, ওর মুখ দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, "কি হল? কি ব্যাপার ঘটল? কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই পরম আত্মীয়তা? সে কি এ? না—অসম্ভব! এ তো সে নয়!" ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওর মুখের ভাবে এত বেশি শত্রুতার প্রকাশ দেখেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, দুজনেই দুজনকে অনেক গালমন্দ করলাম। এই ঝগড়াটা আমার মনে এক বিরাট প্রভাব ফেলল। যদিও এটাকে ঝগড়া বলছি, কিন্তু আসলে এটা মোটেই ঝগড়া ছিল না; এটা ছিল আমাদের দুজনের মধ্যেকার বিরাট ব্যবধানের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কামনার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রেম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; তখন আমরা আমাদের মধ্যে সত্যিকারের যা সম্পর্ক তার মুখোমুখী হয়ে পড়েছি—অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে দুজন অনাত্মীয় আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সম্পর্ক, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে যতটা তৃপ্তি আদায় করে নেওয়া সম্ভব সেটা আদায় করা। যা ঘটেছিল সেটাকে আমি যদিও ঝগড়া বলে বর্ণনা করেছি, কিন্তু আসলে সেটা মোটেই তা নয়—সেটা হচ্ছে কামের উপসংহারে আমাদের সত্যিকার সম্পর্কের উন্মোচন। তখন এটা বুঝতেই পারিনি যে এই কঠোর শত্রুতার ভাবটাই হচ্ছে আমাদের দুজনকার মধ্যের স্বাভাবিক সম্পর্ক; সেটা না বোঝার কারণটা হচ্ছে এই যে, কামনার, অর্থাৎ প্রেমের উন্মত্ততায় শত্রুতার এই ভাবটা খুব তাড়াতাড়িই চাপা পড়ে গেল।

'ভেবেছিলাম, ঝগড়া করেছি, সেটা মিটেও গেছে. সুতরাং আর কখনও সে রকমটি হবে না। কিন্তু মধুচন্দ্রিমার প্রথম মাসেই আবার একটা অতিতৃপ্তির অবস্থায় গিয়ে আমরা পৌঁছলাম। তখন আর দুজনের কোন প্রয়োজন নেই; সুতরাং শুরু হল আর একটা ঝগড়া। প্রথমটার তুলনায় সেটা আরও বেশি কষ্টের বলে মনে হল। ভাবলাম, প্রথমটা তাহলে আকস্মিকভাবে ঘটেনি। দ্বিতীয় ঝগড়াটার কারণ ছিল খুবই তুচ্ছ—সামান্য কয়েকটা টাকার ব্যাপার; টাকা খরচের ব্যাপারে আমি কোনদিনই এতটুকু কার্পণ্য করিনি; তাই স্ত্রীকে টাকা দিতে যে ইতস্তত করব সেটা ভাবার কারণই নেই। শুধু মনে আছে, আমার কী যেন একটা

কথাকে সে ঘুরিয়ে এই মানেতে নিয়ে গিয়েছিল যে আমি নাকি তার ওপর টাকার জোরেই কর্তৃত্ব খাটাচ্ছি; টাকা খরচ করার অধিকার নাকি কেবল আমারই। কথাটা ছিল অত্যন্ত নির্বোধের মত, অত্যন্ত জঘণ্য—যা আমাদের কাউকেই শোভা পায় না। তাই রেগে গিয়ে বললাম যে ওর মধ্যে বিবেচনা বলতে কিছুই নেই; সঙ্গে সঙ্গেই ও-ও আমার মুখের ওপর জবাব দিল; সুতরাং শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। ওর কথাতে, মুখের ভাবে প্রকাশ পেল সেই শত্রুতার ভাব, যা দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলাম। ভাই, বন্ধু, এমনকি বাবার সাথে ঝগড়ার কথাও আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু তাতে কোনদিনই এমন তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটাও মিলিয়ে গেল; দুজনের বিদ্বেষই ঢাকা পড়ে গেল প্রেমের আড়ালে, অর্থাৎ কিনা কামের আড়ালে। নিজেকে আবার সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে ঝগড়া ঘটো হয়েছে নিতান্ত ভুলের জন্য; এবং এ ভুল শোধরানোটা খুব একটা কঠিন নয়। কিন্তু তার কিছুদিন পর আবার ঝগড়া হল, তারপর আবার, আবার, আবার—তখন বুঝলাম এগুলো কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটাই ভবিতব্য; ফলে কপালে কী আছে ভেবে মনে মনে বেশ আতঙ্কিত হলাম। আর এটা ভেবে আরও খারাপ লাগল যে, একমাত্র আমার বউয়ের সঙ্গেই আমার সম্পর্কটা খারাপ, কিন্তু অন্য সকলেই যে যার বউকে নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে। তখনও এটা জানতে পারিনি যে শুধু আমি নই, প্রত্যেকের কপালেই ঘটছে ঠিক আমার মতই; তারাও আমার মতই ভাবে যে তাদের দুর্ভাগ্যটা ঘটছে শুধুমাত্র তাদের-ই, দুনিয়ায় আর সকলেই সুখী। এবং সেই সত্যটাকে যে তারা অপরের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে তা নয়, নিজের কাছ থেকেও লুকোয়; লুকোয় এই জঘণ্য লজ্জাকর দুর্ভাগ্যকে—আর মনে মনে সেটাকেই স্বীকার করে নেয় অমোঘ হিসেবে।

'ধীরে ধীরে ব্যাপারটা আরও গভীর ও নির্মম হয়ে উঠল আমার কাছে। প্রথম সপ্তাহ থেকেই বুঝতে পারলাম যা আশা করেছিলাম তা হয়নি; আসলে বিয়েটা মোটেই সুখের নয়, বরং দুর্ভাগ্যের। কিন্তু অন্য সবার মতই আমিও সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে চাইলাম না (পরিনাম ফল যা হয়েছে, সেটা যদি না হত; তবে তা আজও স্বীকার করতাম না), শুধু অপরের কাছ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও সেটাকে গোপন করে রাখলাম। এখন ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে যে কেন আমি সেদিন আমার আসল অবস্থাটাকে বুঝতে পারিনি। যা-নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে সেগুলো এত তুচ্ছ ব্যাপার যে তা আর পরে মনেই থাকে না—শুধু এই কথাটুকু ভাবলেই তো আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই অশেষ শত্রুতার সঠিক উপলক্ষ আমাদের পক্ষে মাথা খাটিয়ে বের করাও সম্ভব ছিল না, কিন্তু মীমাংসার ছলনাগুলো ছিল আরও অদ্ভুত। মনে পড়লে গা জ্বলে ওঠে—মাঝে মাঝে কথা, যুক্তি, ব্যাখ্যা এমনকি চোখের জলেরও খুব একটা অভাব হত না; দুজনেই অত্যন্ত তিক্ত বাদানুবাদের পর হঠাৎ নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাতাম, তারপর মধুর হেসে জড়িয়ে ধরতাম, চুমু খেতাম···উঃ কী জঘণ্য ব্যাপার! এই জঘণ্যতাটা যে তখন কেন আমার কাছে ধরা পড়েনি···'

॥ তের ॥

নতুন দুজন যাত্রী কামরার অন্য দিকটায় এসে বসল। তারা ঠিকঠাক হয়ে বসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে রইলেন, তারপর ওদের কথাবার্তা বন্ধ হবার সাথে

সাথেই আবার শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তার কথার খেই এতটুকু কিন্তু হারায়নি।

তিনি বললেন, 'সবথেকে ঘৃণ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে প্রেমকে সর্বদাই আদর্শ ও মহান ধরনের কিছু একটা ভাবা হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা এমনই জঘণ্য ও পশুত্বজনক যে এটার কথা বলা, এমনকি ভাবাটাও বেশ জঘণ্য এবং লজ্জাকর। প্রকৃতি তো আর অকারণে এটাকে লজ্জাকর ও জঘণ্য করেনি। আর সেটা যখন তা-ই তখন সেটাকে তো সেভাবেই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু লোকে এমন ভান করে যে ওটা বোধহয় খুব সুন্দর ও মহান। আমার প্রেমের প্রধান লক্ষণ কি? পাশবিক উপভোগ্যতা। এবং তারজন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত ছিলাম না, আর এটা করতে পারছি বলে মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করতাম, এবং উপভোগের সময় স্ত্রীর মানসিক, এমনকি দৈহিক জীবনসম্পর্কেও উদাসীনতা দেখাতাম। অবাক হয়ে ভাবতাম, আমরা পরস্পরের প্রতি এমন বিরূপ কেন, অথচ ব্যাপারটা ছিল একেবারে জলের মত পরিষ্কার: পশুত্বের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মানবিক প্রকৃতির প্রতিবাদই হল এই বিরূপতা।

'আমাদের দুজনের পারস্পরিক ঘৃণা দেখে আমি নিজে খুবই আশ্চর্য হতাম, কিন্তু তাছাড়া তো অন্য কিছু হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। একই অপরাধে আমরা দুজনেই যে সহযোগিতা করে চলতাম তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই পারস্পরিক ঘৃণার। বিয়ের প্রথম মাসেই আমার স্ত্রী গর্ভবতী হল, কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যের জান্তব সম্পর্কের বিরতি ঘটল না। বলুন, এটা কি অপরাধ নয়? আপনি ভাবছেন, আমি অপ্রয়োজনীয় কথা বলছি, তাই না? কিন্তু ঘটনাটা মোটেই তা নয়। আমি আমার স্ত্রীকে কিভাবে হত্যা করলাম সেটাই আপনাকে বলছি। বিচারের সময় ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কিভাবে, কি দিয়ে আমি তাকে হত্যা করেছিলাম! কী নির্বোধের দল! ওরা ভেবেছিল আমি হয়ত তাকে খুন করেছিলাম একটা ছুরি দিয়ে—সেই অক্টোবরের ৫ তারিখে। কিন্তু না, হত্যাটা করেছিলাম অনেক আগে। প্রত্যেকে যেমনভাবে করে থাকে, এখনও যেমন করছে, আমিও ঠিক সেভাবেই করেছিলাম…'

আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে?'

'এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার—যা বেশ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ তা কিন্তু কেউই স্বীকার করতে চায় না; ডাক্তারদের উচিত এ বিষয়ে ভাল করে জানা এবং সেটা প্রচার করা; কিন্তু তারা তা করে না, মুখ বুজে থাকে। অথচ ব্যাপারটা খুবই সহজ। স্ত্রী পুরুষের গঠন ঠিক পশুদের মতই। তাদেরও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রেম উপভোগের পরই আসে গর্ভাবস্থা, তাদেরকেও খাওয়াতে হয় বাচ্চাকে। শরীরের এ অবস্থায় সহবাস মা এবং সন্তান—এ দুজনের পক্ষেই বেশ ক্ষতিকারক। আপনি জানেন নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান। আর এটা কিসের ইঙ্গিত? খুবই স্পষ্ট, এটা সংযমের ইঙ্গিত। পশুরা যেটা করে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য খুব একটা মহাজ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমরা তা করি না। বিজ্ঞানীরা রক্তে লিউকোসাইটের অস্তিত্ব প্রভৃতি অত্যন্ত তুচ্ছ বহু বিষয় নিয়ে বেশ মাথা ঘামিয়েছে, অথচ এই সামান্য কথাটা বোঝাব মত বুদ্ধি তাদের নেই। অন্ততঃ এ ব্যাপারটার উল্লেখ করতেও কখনও তাদের দেখা যায় না।

'আর সে কারণেই মেয়েদের সামনে মাত্র দুটো পথই খোলা আছে। একটা

হল, মা হবার ক্ষমতাটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে নিজে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া যাতে স্বামী ভদ্রলোকটি যখন খুশি তার কাছ থেকে আনন্দ আদায় করে নিতে পারে : আর দ্বিতীয় পথটা হল, প্রকৃতিকে স্থূলভাবে লঙ্ঘন করা—মানে যেটা আমাদের তথাকথিত সৎপরিবারে ঘটে থাকে, অর্থাৎ নারীকে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে একই সঙ্গে প্রসূতি, জননী এবং রক্ষিতার ভূমিকা পালন করতে হবে ; আর এটা হচ্ছে এমনই একটা ব্যবস্থা যা পশুরাও মেনে নিতে অস্বীকার করে থাকে। তাই, যেহেতু এতগুলো দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আমাদের মেয়েদের মধ্যে নেই, সেহেতু তারা স্নায়ুবিকার ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, চাষীর মেয়েরা ভোগে 'ক্লিকুশি'তে। কই, অল্পবয়সী কিংবা নিষ্পাপ মেয়েদের তো কখনও এ রোগ হয় না ; এটা হয় কেবলমাত্র বয়স্ক মেয়েদের, বিশেষতঃ যারা পুরুষের সাথে সহবাস করে তাদের। এটাই হয়ে থাকে আমাদের দেশে, এমনকি সারা ইউরোপেও তাই-ই হয়। আজ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে স্ত্রীলোকদের ভিড়ে হাসপাতালগুলো একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য একেবারে পঙ্গুর থেকে অর্দ্ধপঙ্গু মহিলাদের ছড়াছড়িটাই বেশি। একবার ভাবুন তো, গর্ভধারণ ও সন্তানকে স্তন্যদান কী মহৎ ব্যাপার! তা দিয়েই তো আমাদের বংশধরেরা বেড়ে ওঠে। অথচ এই পবিত্র ক্রিয়াটা লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু কেন? ভাবলে সত্যি ভয় হয়। আর দেখুন লোকেরা এদিকে নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে কিরকম বাজে বকে চলেছে! এ যেন এক রাক্ষস তার বন্দীকে হত্যা করার আগে দুধ ঘি খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে তার অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে সে সত্যিসত্যিই খুব চিন্তিত।'

সত্যি, ভদ্রলোকের কথাগুলো একেবারেই নতুন ও স্তম্ভিত করে দেবার মত। তবু বললাম, 'তাছাড়া কী-ই বা করার আছে বলুন? সে রকমই যদি হয় তবে তো মানুষ প্রতি ২ বছরে স্ত্রীর সঙ্গে মাত্র একবারই প্রেম করতে পারবে : কিন্তু পুরুষেরা তো...'

ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পুরুষের ওটা খুবই দরকার। বিজ্ঞানের মহারথীর দল সবাইকে এটা বেশ ভাল করে বুঝিয়েও দিয়েছেন। এরা তো বলেই থাকেন যে পুরুষের পক্ষে নারী নাকি খুবই প্রয়োজনীয় : কিন্তু যদি মেয়েদের দৈহিক কাজ জোর করে তাদের দিয়ে করানো হয় তবে তারা কি বলবেন? মানুষকে একবার বুঝিয়ে দিন যে মদ, তামাক, আফিম এগুলো সবই তাদের খুবই প্রয়োজনীয়—অমনি দেখবেন ওগুলো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন কোনটা অপরিহার্য সেটা জানা ছিল না বলে এবং বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ঈশ্বর সেটা জেনে নেননি তাই সবকিছুই আগোছালোভাবে সৃষ্টি করে রেখেছেন। আসলে কি জানেন, পুরুষ ঠিকই করে নিয়েছে যে তার লালসার পরিতৃপ্তি অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু মাঝখান থেকে হঠাৎ হঠাৎ শিশুর জন্ম, তার লালন-পালন ইত্যাদি ঝামেলাগুলো এসে পড়ে তার লালসার পরিতৃপ্তিতে বাধা দেয়। তারজন্য কি করা দরকার? কেন, বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানানো হোক, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর সত্যি সত্যিই তারা ব্যবস্থা করে দেন। উঃ ডাক্তারদের মিথ্যের মুখোসটা যে কবে খুলে পড়বে! অবশ্য তার সময় অনেকদিন আগেই এসে গেছে। আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে লোকে পাগল হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে

গুলি করে হত্যা করছে। আর এটা না হয়ে উপায়টাই বা কি? মনে হয় জন্তু জানোয়ারদের এ কথাটা বেশ ভাল করেই জানা আছে যে বংশরক্ষার জন্য সন্তানের প্রয়োজন, আর এ বিষয়ে তারা সর্বদা প্রকৃতির নিয়ম মেনেই চলে। এ সত্যটা জানে না শুধু মানুষ, কারণ তার সেট জানার এতটুকু ইচ্ছেও নেই। সে সব সময় চাইছে শুধু পাপভরে নিজেকে উপভোগ করে নিতে। আর সে কে? না, মানুষ; এই বিশ্ব জগতের অধিপতি। একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, কেবলমাত্র নতুন জীবন সৃষ্টি যখন সম্ভব তখনই পশুরা পরস্পরে মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ, এই ইতরের দল যখন তখন সহবাস করে থাকে কেবলমাত্র আনন্দ পাবে, এই জন্য। আর তার থেকেও ঘৃণ্য ব্যাপার, এই ইতরোমিটাকেই সে মহিমান্বিত করে বলে সৃষ্টির মহত্ব, প্রেম। আর এই জঘন্য প্রেম বস্তুটার জন্যই সে মানবজাতির অর্ধেকটাকে বিসর্জিত করে থাকে। সত্য ও মঙ্গলের পথে যার পুরুষের সহচারিনী হওয়ার কথা সেই নারীকেই সে উপভোগের নিদারুণ ইচ্ছায় শত্রুতে পরিণত করে। বলুন তো, মানুষের অগ্রগতিকে প্রতিনিয়ত বাধা দিচ্ছে কে? নারী। কিন্তু সে এটা করে কেন? শুধু এই একটা কারণেই। হ্যাঁ, তাই—' সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বেশ কয়েকবার বললেন কথাটা; তারপর আত্মস্থ হবার চেষ্টায় সিগারেট টানতে লাগলেন।

।। চোদ্দ ।।

কথার রেশ টেনে তিনি বলে চললেন, 'আমার জীবনযাত্রাটাও ছিল এমনি শুয়োরের মতই। সবথেকে খারাপ যা ছিল তা হল, এমন ইতরের মত জীবনধারণ করা সত্ত্বেও আমি এ ভেবে আত্মতৃপ্তি পেতাম যে, অন্যকোন মেয়ের প্রতি আমি আকৃষ্ট নই, স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট একনিষ্ঠ, ফলে আমি একজন নৈতিক আদর্শবান মানুষ, আমার কোন দোষই নেই: আর মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে যে ঝগড়া হয় তারজন্য আমার স্ত্রী কিংবা বলতে গেলে তার স্বভাব-ই দায়ী।

'কিন্তু সত্যি বলতে কি, ওর কোন দোষই ছিল না। অন্য মেয়েদের মত, অর্থাৎ বেশির ভাগ মেয়েদের মতই ছিল সে। সে মানুষ হয়েছিল আমাদের সমাজে অন্যান্য মেয়েরা যেভাবে মানুষ হয়, সেভাবেই: ওপরের শ্রেণীর সব মেয়েকেই সেভাবে মানুষ হতে হয়, না হলে চলে না। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা নিয়ে আজকাল খুব বড় বড় কথা শোনা যায়; কিন্তু সবকিছুই নিতান্ত ফাঁপা বুলি। মেয়েদের প্রতি আমাদের যে আসল দৃষ্টিভঙ্গি তাতে তাদের শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবেই হবে, আমরা যেভাবে ভান করে থাকি সেভাবে নয়।'

'মেয়েদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবের সঙ্গে তাল রেখেই সর্বদা তাদের শিক্ষা চলতে বাধ্য। পুরুষেরা আসলে কি চোখে মেয়েদের দেখে থাকে সেটা সবারই জানা। কবিরা তো বলেই দিয়েছেন—সুরা, সুন্দরী আর সঙ্গীতই হল সব। প্রেমের কবিতা আর ভেনাসের নগ্ন মূর্তি থেকে শুরু করেসমস্ত কাব্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো—দেখবেন, সবখানেই মেয়েরা হচ্ছে ভোগের বস্তু: তা সে রাজসভার নাচের আসর হোক কিংবা ক্রুবনায়া স্কোয়ার অথবা গ্রাভেচকা স্ট্রীটই হোক, সব জায়গায় সেই একই চিত্র। আর সেই শয়তানের কথাটা ভুলবেন না; যদি তারা রস আর ভোগের বস্তুই হয় তো ঠিক আছে, জানাই রইল, তারা তাই। কিন্তু না, নাইটরা প্রথমে জানালেন যে তারা মেয়েদের দেবী জ্ঞানে পূজো

করে থাকেন (পূজো, তবে নিতান্তই ভোগের বস্তু হিসেবে)। তারপর আজকালকার পুরুষেরা বলে বেড়ান যে তারা নাকি মেয়েদের শ্রদ্ধা করেন। দেখতে পাই, অনেকেই মেয়েদের চেয়ার ছেড়ে দেন, মাটিতে রুমাল পড়ে গেলে সেটা তুলে দেন, এমনকি কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, যে কোন পদে, মায় প্রশাসনিক ব্যাপারেও নাকি মেয়েদের অধিকার রয়েছে। এটা ঠিক যে এসবই করা হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত তাদের প্রতি সেই বিশেষ মনোভাবের কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। এখনও মেয়েরা হচ্ছে নিতান্তই ভোগের সামগ্রী : তাদের শরীরটা হল আনন্দলাভের উপকরণ মাত্র। কথাটা মেয়েরাও জানে। এটা একেবারে দাসত্বেরই সমান। যে অবস্থায় একদল আরেকদলকে জোর করিয়ে খাটিয়ে তার ফলাফল ভোগ করতে সমর্থ হচ্ছে সেটাকে দাসত্ব ছাড়া আর কি-ইবা বলব ? অন্যদের জোর করে খাটিয়ে নিয়ে তার ফলভোগ করাটা নিতান্ত পাপ এবং লজ্জার বিষয়—এ কথাটা মেনে নিয়ে যতক্ষণ না মানুষ সেটাকে পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ কিছুতেই এ দাসত্বের অবসান ঘটবে না। কিন্তু আসলে যা করা হয়, তা হল, দাসত্ব প্রথার বাহ্যিক রূপটাকে বদলে, গোলাম কেনাবেচাটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে লোকে ভাবছে (এমনকি নিজেকেই নিজে তা বিশ্বাস করাচ্ছে) যে বোধহয় দাসত্ব সত্যি সত্যিই উঠে গেছে। তারা দেখেনা, এটা দেখতে চায়ও না যে সেটা এখনও টিকে রয়েছে ; টিকে রয়েছে এ কারণে যে অন্যের শ্রমের ফলভোগ করার জন্য তারা এখনও সেই আগের মতই ইচ্ছুক ; সেটাকে এখনও আগের মতই ন্যায় ও ন্যায্য বলে ভাবছে। এটাকে ভাল মনে করার অর্থই হচ্ছে সবসময় অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী ও ধূর্ত কয়েকজন মানুষ অপরের শ্রমের ফসল ভোগ করে যাবে। নারী স্বাধীনতার ব্যাপারটাও ঠিক একইরকম। পুরুষেরা যে নিজেদের সুখের জন্য মেয়েদের ব্যবহার করাটা উচিত এবং বাঞ্ছনীয় বলে ভাবে সেটাই হল মেয়েদের দাসত্ব। যদিও পুরুষেরা এখন মেয়েদের স্বাধীনতা দিচ্ছে বলে প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু যতই স্বাধীনতা দেওয়া হোক না কেন, মেয়েদের এখনও তারা ভোগের সামগ্রী বলেই ভাবছে ; ছেলেবেলা থেকেই তাদেরকে এভাবে জনমতের মাধ্যমে গড়ে তোলা হচ্ছে। মেয়েদের অবস্থা ঠিক সেই আগের মতই রয়ে গেছে। তারা এখনও সেই দীনহীনা ব্যভিচারিণী দাসী আর পুরুষেরা হল সেই দাসীর ব্যভিচারী মালিক।

'কলেজে ও আদালতে তারা মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু তারা যে ভোগের সামগ্রী এ মনোভাবটা একেবারেই বদলায়নি। যতদিন মেয়েদেরকে নিজেদের এভাবে দেখতে শেখানো হবে (আমরা সে শিক্ষাই দিয়ে থাকি) ততদিন তারা নিম্নস্তরের জীব হয়ে থাকবেই। হয় তারা জঘন্য ডাক্তারগুলোর সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে, তার মানে সম্পূর্ণভাবে পতিতায় পরিণত হয়ে যাবে ; জন্তুদের স্তরে নয়, একেবারে বস্তুর স্তরে উপনীত হবে ; নয়ত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তেমনি হবে—অসুখী, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, মানসিক রোগী ; আধ্যাত্মিক বিকাশের কোন সুযোগই আর তাদের সামনে থাকবে না।

'স্কুল কলেজ কোন অবস্থাতেই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না; যা পারে, তা হল মেয়েদের বিষয়ে পুরুষদের এবং নিজেদের বিষয়ে মেয়েদের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন। মেয়েরা যখন কুমারী অবস্থাকে এখনকার মত লজ্জা ও নিন্দার বিষয় বলে ভাববে না, বরং মনে করবে সেটাই হচ্ছে সবথেকে উচ্চস্তরের

ব্যাপার একমাত্র তখনই সম্ভব হবে এই অবস্থার পরিবর্তন। আর যতদিন সেটা না হচ্ছে, ততদিন তারা যতই শিক্ষিতা হোক না কেন, প্রতিটি মেয়েই চাইবে যতবেশি পুরুষকে আকর্ষণ করা সম্ভব তাই করতে, যাতে তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোকটিকে অনায়াসে খুঁজে বের করা যায়।

'একজন হয়ত অঙ্কে খুব ভাল, অন্যজন হয়ত ভাল বীণা বাজায়, কিন্তু তাতে অবস্থার এতটুকু হেরফের হয় না। মেয়েরা যখন কোন পুরুষকে বশ করতে সক্ষম হয় তখনই তারা নিজেদের সুখী মনে করে থাকে, তখনই মনে করে যে তাদের যেন মোক্ষলাভ ঘটে গেছে। আর সে কারণেই তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই হল পুরুষ ধরার ক্ষমতা অর্জন করা। এটা আছে,এবং জানবেন এটাই থাকবে। আমাদের সমাজে বিবাহিতা, অবিবাহিতা সব মেয়ের বেলাতেই এটা খাটে। অবিবাহিতাদের এটা করতে হয় পছন্দমত পুরুষকে বেছে নেবার জন্য, আর বিবাহিতারা এটা করে স্বামীর ওপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করার জন্য।

'এটাকে বন্ধ করে, অন্ততপক্ষে কিছুটা সংযত করে মাত্র একটাই জিনিস, তা হল শিশু। সেটাও নির্ভর করে মার ওপরই। যদি তারা রাক্ষসী না হয়, অর্থাৎ যদি নিজের সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে তারা অরাজি না হয়, একমাত্র' তবেই। কিন্তু ডাক্তাররা আবার এ ব্যাপারটাতেও নাক গলান।

'আমার স্ত্রী বাচ্চাদের নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে চেয়েছিল ; এবং প্রথমটি ছাড়া পরের পাঁচটির বেলা তা করেও ছিল। কিন্তু প্রথমটির জন্মের পর তার শরীর ভাল না থাকায় ডাক্তারদের ডাকতে হয়। তারা এসে নির্লজ্জভাবে জামা-কাপড় খুলে ফেলে, সর্বাঙ্গ টেপাটেপি করে (এরজন্য তাদেরকে আমার ধন্যবাদ ও ফি দুটোই দিতে হল) বললেন যে বাচ্চাটিকে নিজের বুকের দুধ খাওয়ানোটা আমার স্ত্রীর পক্ষে উচিত হবে না। অর্থাৎ কিনা অশ্লীল কাণ্ড কারখানার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রথম উপায়টা থেকেই সে বঞ্চিত হল। একজন স্তন্যদাত্রী ধাত্রী রাখা হল ; যার সোজা মানে হল, একটি অপরিচিতা নারীর দারিদ্র, অভাব ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে লোভ দেখিয়ে তার নিজের বাচ্চার কাছ থেকে সরিয়ে এনে তার কোলে তুলে দেওয়া হল আমাদের বাচ্চাটাকে, এবং সে কারণে তার মাথায় চাপানো হল ফিতে দেওয়া টুপি। যাক ওসব ; আসল কথা হল, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার দায় থেকে মুক্ত হয়ে আমার স্ত্রী যখন আঁতুরঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন সে বাস্তবিক পক্ষে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে অশ্লীল কর্মকাণ্ড করার সুযোগ পেয়ে গেল ; তার ভেতরের সুপ্ত ইচ্ছা বিপুল আবেগে জেগে উঠল। আর তার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার মনের ঈর্ষা উন্মত্ত হয়ে উঠল, আমার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের শান্তি সে কেড়ে নিল। জানবেন, যারা আমার মত নৈতিকতার বালাই না রেখে স্ত্রীর সঙ্গে থাকে তাদের পক্ষে ঈর্ষার যন্ত্রণা না পেয়ে কোন উপায় নেই।

।। পনের ।।

'আমার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলেছি। তারই মধ্যে সময়ে সময়ে সে জ্বালাটা বড্ড তীব্র হয়ে উঠত। তেমনি একটা সময় হল আমার প্রথম সন্তানের জন্মের ঠিক পরেই, যখন ডাক্তাররা এসে আমার স্ত্রীকে বুকের দুধ খাওয়াতে নিষেধ করে দিল। সে সময়ে আমার মনের ঈর্ষাটা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তার কারণ, প্রথমতঃ, প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে বিনা কারণে বাধা দিলে প্রতিটি

মায়ের মধ্যে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় আমার স্ত্রীর মধ্যেও ঠিক সেই উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি হল; দ্বিতীয়তঃ, সে এত স্বচ্ছন্দভাবে তার মাতৃত্বের নৈতিক দায়িত্বটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল যে আমি মনে মনে (হয়ত কিছুটা নিজের অজ্ঞাত সারেই) ধরেই নিলাম যে, প্রয়োজন বোধ করলে একদিন ও আমাদের দাম্পত্যজীবনটাকেও এভাবেই ঝেড়ে ফেলে দেবে। আর সে কথা এই কারণে আরও বেশি করে ভেবেছিলাম কারণ ওর শরীরটা তখনও বেশ সুপুষ্টই ছিল। তবু যাই হোক, ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও কিন্তু ও পরের বাচ্চাগুলোকে নিজের বুকের দুধ খাইয়েই মানুষ করেছিল।'

আমি ভদ্রলোকের কথার মধ্যে মন্তব্য করলাম, 'ডাক্তারদের ওপর আপনি খুব চটে আছেন দেখছি।' কারণ আমি লক্ষ্য করছি, যতবারই উনি ডাক্তারদের কথা বলছেন, ততবারই ওর গলায় ফুটে উঠছে বেশ বিরক্তি আর বিদ্বেষের ভাব।

'বিষয়টা ওদের ওপর রেগে যাওয়া কিংবা খুশি হওয়ার মধ্যে নিহিত নয়। অন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের বেলায় যেমন করে থাকে আমার বেলাও ঠিক তেমনিভাবেই ওরা আমার জীবনটাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে; আর আমার পক্ষে কার্যকারণটাকে আলাদা করে দেখাটা সত্যিই অসম্ভব। জানি, ওরা উকিল ও অন্যদের মতই যতটা পারা যায় ততটা টাকা আদায় করে নিতেই ব্যস্ত; কিন্তু যদি আমার আয়ের অর্ধেকটা দিয়েও আমি ওদের আমার পারিবারিক-জীবনের ধারে কাছে আসাটাও বন্ধ করে দিতে সক্ষম হতাম, তবে তা-ই করতাম (যারা এ ব্যাপারে সতর্ক তারা সকলেই তাই করেন)। সঠিক হিসেব আমার জানা নেই, তবে বহু ক্ষেত্রেই (সংখ্যায় অগুণতি) দেখেছি ডাক্তারেরা মায়ের প্রসব ক্ষমতা নেই এই যুক্তিতে (যদিও পরে সে অনায়াসেই অন্য শিশুদের জন্ম দিয়েছে) গর্ভস্থ শিশুকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। এভাবে একটা হত্যাকাণ্ডকে তবু খুন বলা হয় না, ঠিক যেভাবে মধ্যযুগে কিছুকিছু হত্যাকাণ্ডকে মানব কল্যাণের সহায়ক বলে মনে করা হত—এটাও ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার। ডাক্তাররা যে কত পাপ করেছে তার আর কোন লেখাজোখা নেই। তবে বিশেষ করে নারীজাতির মাধ্যমে জড়বাদের যে দুর্নীতি তারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে সে তুলনায় এ পাপ নিতান্তই নগণ্য। তাছাড়া তাদের পরামর্শ মেনে চললে সব মানুষের এক হওয়া তো দূরের কথা, একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোন সম্পর্কই থাকবে না—কেননা সকলের মধ্যে সব কিছুর মধ্যেই তো একটা ছোঁয়াচের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ওদের উপদেশ মেনে নিতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই কার্বলিক অ্যাসিডের নির্যাস মুখে নিয়ে বসে থাকতে হয় (অবশ্য ইদানিং দেখা যাচ্ছে এতে কোন কাজ হচ্ছে না)। কিন্তু সেটাও কিছু নয়, আসলে ব্যাপারটা হল ওরা মেয়েদের খারাপ করে দিচ্ছে।

'আজকাল আর বলা যায় না যে, "ওহে, তোমার ভাবসাব তো বিশেষ সুবিধার দেখছি না; তুমি নিজেকে শোধরাবার একটু চেষ্টা কর।" কথাটা নিজেকে যেমন বলা যায় না, তেমনি বলা যায় না অপরকেও। ভাবসাব খারাপ? ওর আসল কারণটা হচ্ছে স্নায়বিক ব্যবস্থার কোন গণ্ডগোল, কিংবা ঐ-ই ধরনেরই কিছু একটা— সুতরাং ছোটো ডাক্তারের কাছে। তারা তোমাকে পঁয়ত্রিশ কোপেকের একটা ওষুধ দেবে—সেটা না খেলে চলবেই না। যদি ভাবসাব আরও খারাপ হয় তো আবার ডাক্তারের কাছে যাও, আবার ওষুধ খাও। সত্যি, কী বিচিত্র তামাশা!

'যাক গে, ওটা অবান্তর বিষয়। আমি যা বলতে চাইছি, তা হল, আমার

স্ত্রী তারপরে অন্য বাচ্চাদের কিন্তু বেশ ভালভাবেই নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিল। তার গর্ভাবস্থা ও বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে মানুষ করার সময়টাতে আমি আমার মনের ঈর্ষার তাড়না থেকে মুক্ত থাকতাম। না হলে, যা ঘটেছে তা কিন্তু অনেক আগেই ঘটত। তাকে আর আমাকে রক্ষা করছিল আমাদের সন্তানেরা। আট বছরে তার পাঁচটি বাচ্চা হয়, এবং তাদের প্রত্যেককেই সে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে তোলে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায়?'

'ছেলেমেয়েরা?' ভদ্রলোক বেশ ভীত স্বরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

আমি বললাম, 'মাফ করবেন, সম্ভবতঃ ওদের কথা মনে হলে আপনার কষ্ট হয় নিশ্চয়।'

'না, তেমন কিছু নয়। আমার শালা আর শালী ওদের নিয়ে গেছে। ওরা তাদেরকে আমার কাছে রাখতে দিতে রাজি হল না। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলাম ওদেরকে, কিন্তু তবু ওরা ছেলেমেয়েদের আমার কাছে থাকতে দিল না; কারণ, আমাকে ওরা পাগল মনে করে। আমি তো এখন ওদের দেখেই ফিরছি: ওদের দেখে আসি, কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারি না। ওরা যাতে বাপ মায়ের মত না হয় সেভাবেই আমি ওদেরকে মানুষ করতাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের সেরকমই হতে হবে। তাছাড়া আর কী-ই বা করা যায় বলুন? আমাকে ওরা বিশ্বাস করে না, সে কারণে ছেলেমেয়েদেরও আমার কাছে দেবেনা, এটা তো খুবই স্বাভাবিক; তাছাড়া ওদেরকে মানুষ করার ক্ষমতা যে কখনও আমার হবে সে বিষয়ে আমি নিজেও খুব একটা নিশ্চিত নই। মনে হয় তা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমার সবকিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সবকিছুই একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস এখনও আমার মধ্যে রয়েছে—সেটা হল জ্ঞান। হ্যাঁ, এমন অনেক বিষয়ই আমার জানা আছে যা শিখতে অন্যদের বহু বছর লেগে যাবে।

'হ্যাঁ, আমার ছেলেমেয়েরা এখনও বেঁচে আছে, আর অন্যদের মত বর্বর হয়েই তারা বেড়ে উঠছে। ওদের আমি তারপর তিনবার দেখেছি, কিন্তু ওদের জন্য কিছুই করার উপায় নেই আমার। এখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি—সেখানে আমার একটা ছোট্ট বাগানবাড়ি রয়েছে।

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি—আমার যা জানা আছে সেটা শিখতে অন্যদের বহু সময় লেগে যাবে। সূর্য আর নক্ষত্রে কতটা লোহা এবং কতটা অন্য ধাতু রয়েছে সেটা বের করতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না, অথচ আমাদের মধ্যের পশুশক্তি যা করে সেটাকে বোঝা খুবই কঠিন…খুবই কঠিন…

'আপনি যে অন্ততঃ ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্যটা শুনছেন সেজন্য আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।'

।। ষোল ।।

'ছেলেমেয়েদের কথাটা আপনি তুলেছেন। সত্যি, তাদেরকে নিয়ে কী ভয়ঙ্কর মিথ্যার কারবার চলেছে! বলা হচ্ছে, ওরা নাকি আনন্দের উৎস, ওরা নাকি ঈশ্বরের আশীর্বাদ! হ্যাঁ, এককালে সত্যিসত্যিই এ রকমটা ছিল, তবে আজ সেটা নিতান্ত মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়—আজ ওরা হচ্ছে কেবলমাত্র যন্ত্রণার উৎস। বেশির ভাগ মায়েরাই আজকাল এটা মনে করে, আর মাঝে মধ্যে অসতর্ক

মুহূর্তে সে কথাটা বলেও ফেলে। আমাদের সমাজের অভিজাত মায়েদের জিজ্ঞাসা করুন কথাটা ; শুনবেন, তারা বাচ্চা চান না, কারণ, ভয়—পাছে বাচ্চার অসুখ হয়, পাছে সে মারা যায় ! আর বাচ্চা হলে সে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে তাদের অনিচ্ছা এ কারণে যে তাহলে বাচ্চার ওপর টান জন্মে যাবে ; এবং তারফলে কষ্ট আরও বাড়বে। শিশুর লাবণ্যে তাদের যে আনন্দ—তার সেই ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা ও শরীর, তার যা কিছু আমাদের আনন্দ যোগাতে সক্ষম, তার রোগচিন্তা, তার মৃত্যুশোক তো দূরের ব্যাপার, এমনকি তার অসুখ হতে পারে, সে মারা যেতে পারে—এ আশঙ্কার তুলনায়ও সেটা কম। বাচ্চা হবার সুবিধে অসুবিধে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে অসুবিধেটাই বেশি, আর সে বাচ্চা না হওয়াটাই ভাল। মেয়েরা এ কথাগুলো নির্দ্বিধায় বেশ সোজাসুজিই বলে দেয় ; কারণ তারা মনে করে বাচ্চাদের প্রতি অনুরাগ থেকেই তাদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে ; আর সে কারণে তারা মনে মনে বেশ গর্বিতও। ওরা এটা বুঝতে চায় না যে এভাবে চিন্তা করাটা নিতান্তই প্রেমকে অস্বীকার করার সামিল, স্বার্থপরতার লক্ষণ মাত্র। বাচ্চার সৌন্দর্য তাদেরকে আনন্দ যোগায় ঠিকই, কিন্তু সেটা তাদেরকে নিয়ে যে আশঙ্কা হয় তার তুলনায় অনেক কম, আর সে কারণেই মেয়েরা বাচ্চা চায় না ; কেননা বাচ্চা হলে তো তার ওপর টান জন্মাবেই। কোন আদরের জিনিসের জন্য তারা স্বার্থত্যাগ করতে এতটুকু রাজি নয়, তবে যেটা আদরের জিনিস হতে পারে তাকে সর্বদাই ত্যাগ করে থাকে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে।

এটা যে অনুরাগ নয়, স্বার্থপরতা সেটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু তারজন্য বড়লোক মায়েদের দোষ দেওয়া খুবই শক্ত—কারণ, অভিজাত সমাজে ওই সব ডাক্তারদের কল্যাণে সন্তানদের সার্থকতার জন্য মেয়েদের যে কী দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয় (ডাক্তারদের দয়ায়) তা ভাবলে মুখে আর কোন প্রতিবাদ আসেনা। প্রথম দিকে তিন চারটে ছেলেপুলেকে সামলাতেই আমার স্ত্রীর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যেত ; একটা মুহূর্তও সে অবসর পেত না। সেই সময় তার জীবন ও মানসিকতার কথা চিন্তা করলে আমার সারাটা শরীর শিরশির করে ওঠে। তখন আমাদের জীবন বলে কিছু ছিল না ; প্রতিটি মুহূর্ত ছিল জীবনের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। এই বিপদ কেটে গেল, আবার সেটা ফিরে এল ; তখন তাকে ঠেকাবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছি—হয়ত আবার একটু মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল ; অনেকটা ডুবন্ত জাহাজে থাকার মত ব্যাপার আর কি। মাঝে মাঝে মনে হত সব ব্যাপারটাকেই সে কৃত্রিম-ভাবে তৈরি করেছে, শুধুমাত্র আমার ওপর জয়লাভ করার বাসনাতে ; সমস্ত কিছু নিজের সুবিধে মত সমাধান করে নেবার একটা চমৎকার কৌশল এটা। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ ব্যাপারে ও যা কিছু করে, যা কিছু বলে সবটাই সাজানো। কিন্তু না, সেটা ছিল আমারই ভুল। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর রোগ নিয়ে সত্যি সত্যিই ও ভীষণ উৎকণ্ঠিত থাকত। ব্যাপারটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল ওর পক্ষে, তাছাড়া আমার কাছেও বটে। আর যন্ত্রণা না পেয়ে কোন উপায়ও ছিল না। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে ওর চিন্তা, তাদের খেতে দিতে হবে, আদর করতে হবে, সামলে রাখতে হবে ইত্যাদি জান্তব উৎকণ্ঠাগুলো অন্যান্য মেয়েদের মতই বেশ প্রবল ছিল ; অথচ জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে যে ব্যাপারটার কোন বালাই নেই—অর্থাৎ চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি—সে দুটোও ওর মধ্যে কাজ করত পুরোমাত্রায়। মোরগ ছানার কি রোগ

হতে পারে তা নিয়ে মুরগি এতটুকু চিন্তা করেনা, এতটুকু ভয় পায়না—কারণ, তার তো জানাই নেই যে ছানার কতরকম রোগ হতে পারে, আর কী ভাবে সেই রোগের নিবারণ ও মৃত্যুকে রোধ করা যেতে পারে ; অন্ততঃ আমরা, অর্থাৎ মানুষেরা তা-ই ভাবি। আর সে কারণেই নিজের ছানাকে নিয়ে মুরগি যন্ত্রণায় ছটফট করে না। তার যা স্বভাব, ছানার জন্য সে তাই করে ; এবং করে সানন্দেই। কেননা তার কাছে ছানা হল অনন্দের উৎস। সন্তানের অসুখ হলে কি করা উচিত সেটা সে ভালভাবেই জানে ; সে কারণে তাকে খাওয়ায়, গরম রাখে। আর নিজেই বুঝতে পারে যে বাচ্চার জন্য যা-কিছু করা উচিত সে তা-ই করছে। তারপর বাচ্চা যদি মারা যায়, তাহলে সে কেন মরল, মৃত্যুর পর কোথায় গেল, ইত্যাদি আজেবাজে প্রশ্ন নিয়ে সে এতটুকু ভাবে না ; শুধু কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার আগেকার মতই বেঁচে থাকে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা মেয়েদের পক্ষে ব্যাপারটা অতটা সহজ নয় ; আমার স্ত্রীর পক্ষেও তা ছিল না। শিশু-রোগ ও তার চিকিৎসার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, শিশু-শিক্ষা ও লালন-পালনের বিচিত্র ও অবিরাম পরিবর্তনশীল নিয়মকানুনগুলো কিন্তু সে বেশ ভালভাবেই শুনেছিল আর পড়েও ছিল। ওদেরকে এটা খাওয়াতে হবে, এভাবে খাওয়াতে হবে ; না, না, এভাবে নয়, ওভাবে, এটা নয়, সেটা—এই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা দুজনে মিলে, বিশেষতঃ আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো, শোওয়ানো, পরানো, স্নান করানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, হাওয়া খাইয়ে আনা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন নিয়ম বের করতাম। মনে হত, যেন দুনিয়াতে শিশুদের জন্ম শুরু হয়েছে এই মাত্র গতকাল থেকে। একটার অসুখ হল তো ভাবলাম, নিশ্চয়ই তাকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো হয়নি, কিংবা ঠিক স্নান করানো হয়নি, অথবা ঠিক সময়ে সেটা করা হয়নি। এক কথায়, যেটা করা উচিত ছিল সেটা ঠিক সময়ে করেনি বলে আমি আমার স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করতাম।

এ তো যখন বাচ্চারা ভাল থাকে তখনকার ব্যাপার। তাদের যদি কখনও অসুখ বিসুখ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই—সে এক নরক যন্ত্রণা। আমরা ধরে নিই যে বিজ্ঞানের এমন একটা শাখা আছে যার সাহায্যে অসুখকে সারিয়ে ফেলা সম্ভব। আর আছে কিছু লোক, অর্থাৎ ডাক্তারেরা, যারা সব জানে। সকলেই অবশ্য জানেনা, তবে ওদের মধ্যে যারা সেরা তারা জানেই। সুতরাং বাচ্চার যদি অসুখ হয় তবে সেরা ডাক্তারটিকে খুঁজে বের করতে হবে, কারণ সে-ই বাচ্চাটির রোগকে সারিয়ে তুলবে, আর তাহলেই বাচ্চাটা বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি সেই বিশেষ ডাক্তারটিকে না পাওয়া যায়, সে যেখানে থাকে সেখানে যদি আমরা না থাকি তবে আর বাচ্চাটির রক্ষা নেই। এটা যে শুধু আমার স্ত্রী একাই মনে করত তা নয়, আমাদের সমাজের সবারই তাই ধারণা ; ফলে আমার স্ত্রী চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে এছাড়া আর কিছুই শুনতে পেত না। "ইভান জাখারিচকে সময় মত ডাকেনি বলেই তো ইয়েকাতেরিনা সেমিওভনার বাচ্চা দুটো মারা গেল", "মারিয়া ইভানোভনার বড় মেয়েকে তো জাখারিচই বাঁচালেন", "ডাক্তারের পরামর্শ মত পেত্রোভরা হোটেলে চলে গিয়েছিল বলেই তো বাচ্চা কটা রক্ষা পেয়ে গেল ; হোটেলে না গেলে তারা মারা পড়তই", "অমুকের বাচ্চাটা বড্ড লিকলিকে, তাই ডাক্তার বললেন দক্ষিণে নিয়ে যেতে, আর তার ফলেই বাচ্চাটার জীবন রক্ষা পেল"।

যে-কোন পশুর মতই সে তার বাচ্চাদের মঙ্গল-চিন্তায় দিনরাত অতিবাহিত করত ; ঠিক সময় মত ইভান জাখারিচের একটা কথা বলার ওপর তাদের জীবন নির্ভর করছে—বাস্তব অবস্থাটা যখন এই, তখন ক্রমাগত উৎকণ্ঠা আর বিরক্তির মধ্যে সময় কাটানো ছাড়া তার আর অন্য উপায়টাই বা ছিল কি ? কিন্তু কেউই জানেনা যে ইভান জাখারিচ কি বলবে, আর সবথেকে কম জানে সে নিজেই, কারণ সে তো ভাল করেই জানে যে তারপক্ষে কারও কিছু করা সম্ভব নয় ; তবে সে যে কিছু একটা জানেই এই আস্থা যাতে লোকেরা হারিয়ে না ফেলে সে কারণে সে গাভিক বুঝে চাল মেরে যায়। শুধুমাত্র যদি প্রাণী হত তাহলে আমার স্ত্রীকে কখনোই এরকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হতনা, আর যদি সম্পূর্ণভাবে মানুষ হত তাহলে সে অনায়াসেই ধর্মভীরুদের মত বলতে পারত যে "ভগবানই দেন, আবার তিনিই নিয়ে নেন ; তার হাতেই সব।' সকলের মত সেও এটাই ভাবতে পারত যে তার সন্তানের জন্ম মৃত্যু সবকিছুই সেই পরম দয়াময় ঈশ্বরের হাতে. মানুষের হাতে কিছুই নেই—তাহলে আর সে এ ভেবে যন্ত্রণা পেত না যে তার সন্তানদের রোগ ও মৃত্যু আটকাবার ক্ষমতা তার ছিল, কিন্তু সে-তা করেনি। আসলে তার দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ছিল এরকম : তার ওপর রয়েছে পৃথিবীর সবথেকে দুর্বল প্রাণীর ভার ; হাজার রকমের রোগ তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে ; সেই প্রাণীগুলির প্রতি তার প্রবল জান্তব অনুরাগ রয়েছে অথচ তাদেরকে রক্ষা করার কোন উপায় তার জানা নেই—সেটা জানে শুধু বাইরের কয়েকজন মানুষ ; আর তাদের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে একমাত্র বিপুল অর্থের বিনিময়ে ; তাও আবার সবসময়ে নয়।

'সন্তানদের নিয়ে সে তার জীবনে কখনও আনন্দ পায়নি, পেয়েছে শুধু যন্ত্রণা ; ফলে আমাকেও তা-ই সহ্য করতে হয়েছে। আর তাছাড়া উপায়টাই বা ছিল কি ? মনের দুঃখেই তার সারাটা সময় কাটত। দুজনের মধ্যে ঈর্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে ঝগড়া কিংবা সাধারণ কথাকাটাকাটির পর হয়ত একটু আশা জেগেছে যে এবার মানসিক শান্তি পাব, ইচ্ছে হলে কোন একটা বই নিয়ে বসবার, ভাববার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কিছু করে ওঠার আগেই হয়ত খবর এল যে ভাসিয়ার বমি হয়েছে, কিংবা মাশার পায়খানায় রক্তের ফোঁটা দেখা গেছে, নয়ত আন্দ্রেইয়ের গায় গুটি বেরিয়েছে—সুতরাং সাথে সাথে আমার পরিকল্পনার জলাঞ্জলি। কোথায় যেতে হবে ? কোন ডাক্তারকে ডাকতে হবে ? বাচ্চাকে কোথায় আলাদা রাখতে হবে ? তারপর ওষুধ, থার্মোমিটার, ডুস, ডাক্তার—একটা শেষ না হতেই আর একটা শুরু হয়ে গেল। আসলে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন বলে আমাদের কিছুই ছিল না। আগেই তো বলেছি, কেবলমাত্র বাস্তবিক ও কাল্পনিক—এই দুটো বিপদ থেকে নিজেদেরকে অবিরাম রক্ষা করাটাই ছিল আমাদের কাজ। এখন বেশির ভাগ পরিবারের আভ্যন্তরীন অবস্থাটা ঠিক এরকমই—আর আমাদের সময় তো ছিল আরও বেশি। আমার স্ত্রী তার ছেলেমেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ করত, তার ওপর লোকের কথায় কান দিত খুব বেশি।

'তাই যখন বাচ্চার জন্ম হল তখন আমাদের জীবনে উন্নতি তো দূরের কথা, বরং সেটা আরও বিষিয়ে উঠল। তাছাড়া তারাই আমাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটির ইন্ধন হয়ে দাঁড়াল। তাদের জন্মের সাথে সাথেই এটা হল, এবং যতই তাদের বয়েস বাড়ল ততই যেন তারা ঝগড়াঝাটির উপলক্ষ হয়ে উঠল। শেষে শুধু ঝগড়া-

খাটির উপলক্ষই নয় এমনকি তারা সোজাসুজি লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে গেল। বাচ্চাদেরকে নিজের নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে আমরা একে অপরের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতাম। দুজনেরই এক একজন বিশেষ স্নেহভাজন বাচ্চা ছিল— তারাই প্রধান হাতিয়ারের কাজ করত। আমি সাধারণতঃ লড়াই করতাম আমার বড় ছেলে ভাসিয়াকে নিয়ে; আর আমার স্ত্রী লড়ত লিজাকে নিয়ে। তাছাড়া ওরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে বের হতে শুরু করল তখন আমরা উভয়েই চেষ্টা করতে লাগলাম ওদেরকে নিজের নিজের দলে টানবার জন্য। এ কারণে ওদের দুর্ভোগেরও অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই বিরাম-বিহীন লড়াইতে ওদের কথা ভাববার কোন অবকাশই ছিল না আমাদের। মেয়েটি থাকত আমার দলে, আর আমার বড় ছেলেটি (তাকে দেখতে অনেকটা আমার স্ত্রীর মতই, সে ছিল তার বড় আদরের) চলে যেত তার মার পক্ষে, ফলে তাকে দেখলেই আমার মনে বেশ রাগ হত।

॥ সতের ॥

'এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। দিনকে দিন আমাদের দুজনের সম্পর্ক ঘোরতর শত্রুতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। শেষের দিকে যে মতানৈক্যের জন্যই শত্রুতা হত তা নয়, বরং শত্রুতার জন্যই মতানৈক্য হওয়া শুরু হল। সে যা-ই বলত না কেন, কথাটা বলার আগে থাকতেই সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর আপত্তি থাকত; আর আমার ব্যাপারেও তার মনোভাবটা ছিল ঠিক সেরকমই।

'চতুর্থ বছরে আমরা যেন মনে মনে ঠিকই করে নিলাম যে কেউ কাউকে বুঝতেই চাইব না, আর কিছুতেই দুজনের মতের মিল হতে দেব না। ফলে বোঝাপড়ার চেষ্টাই ছেড়ে দিলাম। যে কোন সাধারণ ব্যাপারে, বিশেষতঃ বাচ্চাদের নিয়ে হলে আমরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই যে যার নিজের মত আঁকড়ে থাকতাম। এখন মনে হয়, তখন আমি যেসব মতামত জাহির করতাম, তার কোনটাই আমার কাছে বিশেষ জরুরী ছিল না; ইচ্ছে করলেই সেগুলোকে বাতিল করে দিতে পারতাম; কিন্তু যেহেতু তার মতামত ছিল একেবারে ভিন্ন সেহেতু আমার মতামতকে বাতিল করার অর্থই ছিল তার কাছে হেরে যাওয়া— আর সেটাই আমি পারতাম না কিছুতেই। শুধু আমি নই, সেও তা পারত না কখনও। হয়ত সে ভাবত যে সব ব্যাপারে সে-ই সঠিক; আর আমি ভাবতাম যে আমার থেকে অভ্রান্ত আর কেউ নেই। ফলে দুজনে কখনও চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় থাকত না, আর যদি কখনও দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হত তাহলে সেটা এমন পর্যায়ে নেমে যেত যা কিনা একমাত্র জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেই চলা সম্ভব। যেমন, "কটা বেজেছে? ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে। আজ ডিনারে কি কি আছে? কোথায় যাব? কাগজে কি বেরিয়েছে? মাশার গলায় ব্যথা হয়েছে, ডাক্তার ডাকতে হবে।" এই বাঁধাধরা কথাবার্তার সীমানা ডিঙানো ছিল সত্যিই কঠিন। প্রায়ই দুজনে দারুণভাবে রেগে উঠতাম; যদিও আমাদের দুজনের কাছেই ব্যাপারটা যথেষ্ট মূল্যহীন ছিল তবু কফি, টেবিলের ঢাকনা, গাড়ি, তাসের চাল ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই খিটিমিটি চলত। আমার ব্যাপারে বলতে পারি ওর প্রতি আমার মনের বিদ্বেষ মাঝে মাঝে বড় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করত। ও হয়ত চা ঢালছে, পা দোলাচ্ছে, চামচ মুখে দিচ্ছে, কিংবা চা খাচ্ছে—তা দেখে

আমার মন এমনভাবে ঘৃণায় ভরে যেত যে বোধ হত ওগুলো এক মহাপাপের ব্যাপার। সে সময়ে বুঝতে পারিনি যে প্রতিটি তথাকথিত প্রেমের পালার পরই শুরু হয়ে যেত আমার ঘৃণার পালা। যদি প্রেমের পালাটা দুর্বল গোছের হত, তবে ঘৃণাটাও হত ক্ষণস্থায়ী, আর প্রেমের পালা তীব্র হলে ঘৃণার স্থায়ীত্বও বেড়ে যেত অনেকটা। তখন দুজনের কেউই বুঝতে পারিনি যে এই প্রেম আর এই ঘৃণা হল একই জান্তব অনুভূতির দুটো দিক। সেদিন যদি সত্যিকার অবস্থাটা আমাদের কাছে ধরা পড়ে যেত তবে আমরা কিছুতেই আর ওভাবে জীবন কাটাতে পারতাম না। মানুষের জীবনযাত্রা যতই ভুল হোক না কেন, সে সেটা অনায়াসেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। আমরা দুজনেও ঠিক তাই করেছিলাম। সে সর্বদা ঘর সাজানো, নিজের ও ছেলেমেয়েদের সাজগোজ, পড়াশুনো, তাদের স্বাস্থ্যের দেখাশুনোয় চেষ্টা করত সবকিছু ভুলে থাকতে। আর আমার ছিল বিভিন্ন রকম নেশার উপকরণ—চাকরি, শিকার, তাস। সারাটা সময়ই আমরা দুজন ব্যস্ত থাকতাম। দুজনেই ভাবতাম, যত বেশি ব্যস্ত থাকব, ততই পরস্পরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের সুযোগ পাব। ওর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলতাম, "ও রকম মুখ ঝামটানো একমাত্র তোমাকেই মানায়; সারারাত ধরে জ্বালিয়েছ, আর এখন আমাকে যেতেই হবে বৈঠকে।" আর ও আমার মত মুনে মনে নয়, সোজাসুজি আমাকে শুনিয়েই বলত, "তোমার আর কী, আরামেই তো আছ; এদিকে আমি ছেলেকে নিয়ে সারারাত চোখের পাতা দুটো এক করতে পারিনি।"

'এভাবেই কেটেছে আমাদের জীবন; কিন্তু কুয়াসার আস্তরণ ভেদ করে প্রকৃত অবস্থাটা কখনোই নজরে পড়েনি। পরে যা ঘটেছিল সেটা যদি না ঘটত, তবে আরও অনেকদিন এভাবেই বেঁচে থাকতাম, আর মরার সময় ভাবতাম যে, জীবনটা খুব একটা মন্দ কাটেনি—সবার যেমন কেটে থাকে তেমনি। কখনও আমার নিজের কাছে এ সত্যটা ধরাই পড়ত না যে কী জঘন্য অবস্থায় এতটা কাল বেঁচেছিলাম! কী মিথ্যার পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম।

'একই শেকলে বাঁধা দুই কয়েদ, দুজনেই দুজনকে শত্রু মনে করতাম, একে অন্যের জীবন বিষিয়ে দিতাম, কিন্তু কিছুতেই সেই সত্যটাকে স্বীকার করতে চাইতাম না। তখনও জানতাম না যে অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীদের শতকরা নিরানব্বই জনই এভাবে জীবনযাপন করে থাকে—কারণ, না করে তাদের কোন উপায় নেই। সে সময়ে আমার নিজের ও অন্যদের সম্পর্কে এ কথাটা আমার জানাই ছিলনা।

'লোক সঠিক পথে থাক কিংবা বেঠিক পথে—জীবনে আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে যাবেই। জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে—বাবা মা যদি এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-লাভের জন্য শহরে যাওয়াটা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরাও সেই একান্ত প্রয়োজনটার মুখোমুখী হয়ে পড়েছিলাম।'

ভদ্রলোক চুপ করলেন; তার মুখ থেকে পরপর দুবার সেই আওয়াজ বেরিয়ে এল; এখন সেটা অনেকটা চাপা কান্নার মত শোনাচ্ছে। গাড়িটা একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা বাজে?'

ঘড়িতে দেখলাম দুটো।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার ক্লান্তি লাগছে না?'

'না ; তবে আপনি তো খুবই ক্লান্ত।'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ; যাই একটু জল খেয়ে আসি গিয়ে।' ভদ্রলোক টলতে টলতে কড়িডোর দিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

তিনি এতক্ষণ ধরে যা বললেন তা ভাবতে শুরু করলাম। ভাবতে ভাবতে এত তন্ময় হয়ে গেলাম যে, অন্যদিকের দরজা দিয়ে কখন যে তিনি ফিরে এলেন তা টেরই পেলাম না।

॥ আঠার ॥

ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন, 'বলতে বলতে মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে ফেলি। এখন অনেক কিছু নতুন করে ভাবি, নতুন চোখে দেখি, আর ইচ্ছে করে সে সব অন্যদের শোনাই। হ্যাঁ, আমরা শহরে বসবাস শুরু করলাম। যারা অসুখী তাদের পক্ষে শহরে থাকাটা খুবই ভাল। নিজে যে মরে গেছে এটা না জেনেই শহরে অন্ততঃ একশ বছর যে-কেউ বেঁচে থাকতে পারে। সেখানে আত্মচিন্তার কোন অবকাশই থাকে না—প্রত্যেকেই ব্যস্ত। কাজকর্ম, শিল্পকলা, নিজের স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, আজ একে নিমন্ত্রণ করতে হবে, কাল ওর বাড়ি যেতে হবে, আজ এটা দেখতে হবে, কাল ওটা শুনতে হবে—এসব নিয়েই সময় কেটে যায়। শহরে সব সময়ই—একজন তো বটেই, এমনকি কখনও কখনও দু তিনজন এমন খ্যাতিমান লোক থাকেন-ই যাদের কিছুতেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। নিজের কিংবা বাড়ির অন্যান্যদের চিকিৎসার দরকার, শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, গৃহশিক্ষিকা ইত্যাদিও আছেন—অথচ এদিকে জীবনটা একেবারেই ফাঁপা হয়ে গেছে। আর সেভাবেই আমাদের জীবনযাত্রা চলতে লাগল ; তবে একসাথে থাকার ফলে মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা কমল। তাছাড়া প্রথম কটা মাস নতুন বাড়িতে নতুন শহরে গুছিয়ে বসা এবং নিয়মিত গ্রাম থেকে শহরে আসা যাওয়ার কাজে দুজনে চমৎকারভাবে নিয়োজিত রইলাম।

'একটা শীত কাটল, তবে দ্বিতীয় শীতে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হলেও শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল তারজন্য সেটাই ছিল মূলতঃ দায়ী।

'আমার স্ত্রীর শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না, ফলে সেই বদমাশগুলো বলল যে তার আর সন্তান হলে চলবে না, তাই তাকে বলে দিল কিভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত জঘণ্য বলে মনে হল। আমি সবরকমই চেষ্টা করলাম সেটাকে বানচাল করতে, কিন্তু ও এমন জেদ ধরে রইল যে শেষ পর্যন্ত ওর দাবিকেই মেনে নিতে বাধ্য হলাম আমি। আমাদের জান্তবতার শেষ বাহানাটা, অর্থাৎ সন্তানের জন্মের ব্যাপারটা আর রইল না! ফলে জীবনটা আগের থেকে আরও জঘণ্য হয়ে গেল।

'চাষী বা মজুরদের ছেলেপুলে খুবই দরকার ; যদিও অন্নসংস্থানের ব্যাপারটা খুবই কঠিন হতে পারে, তবে ছেলেমেয়ে ওদের চাই-ই চাই ; তাই ওদের পক্ষে দাম্পত্য জীবনের একটা কারণ খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের মত লোকদের বেলা, যাদের ইতিমধ্যেই কয়েকটি ছেলেপুলে হয়ে গেছে, তারা আর বেশি ছেলেপুলে চায় না, কারণ সেগুলো হবে অতিরিক্ত বোঝা—ভবিষ্যতে সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে গোলমাল অবধারিত। তাই আমাদের

বাস্তবতার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। হয় কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করি, নয়ত ওদেরকে নিতান্ত দুর্ভোগের বস্তু, অসাবধানতার পরিণাম হিসেবেই মনে করে থাকি ; এ মনোভাবটা হল আরও জঘন্য। কোন যুক্তি নেই, কিন্তু আমরা এতই নিচে নেমে গেছি যে যুক্তির আর কোন প্রয়োজনই বোধ করি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকই আজকাল বিবেকদংশনের দোহাই দিয়ে এই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দেয়।

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিবেকদংশনটা হবে কি করে ? বিবেক বলে তো আমাদের জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই ; অবশ্য যদি জনমত বা ফৌজদারি দণ্ডবিধিটাকে কেউ বিবেক আখ্যা দিয়ে না বসে। তবে এই জঘন্য ব্যাপারটার বেলায় কিন্তু জনমত বা দণ্ডবিধি—এর কোনটাই বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। কেননা, সমাজের সামনে বিবেকদংশন বলে কিছু নেই ; কারণ সকলেই তো এটা করে থাকে, এমনকি মারিয়া পাভলভনা ও ইভান জাখারিচ পর্যন্ত। সামাজিকতাকে জেনে দিয়ে ভিখিরির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান ? ফৌজদারি দণ্ডবিধি নিয়েও ভয় পাওয়া কিংবা বিবেক দংশনের কিছুই নেই। বাচ্চাদের কুয়োর মধ্যে ফেলে শুধু ইতর মেয়ে আর সেপাইদের বউরা, ওদের জেলে দেওয়াটা খুবই জরুরী ; কিন্তু আমরা তো সবকিছু যথাসময়েই করি, আর করি বেশ পরিষ্কারভাবেই।

'এভাবেই আরও দুটো বছর কেটে গেল আমাদের জীবনে। শয়তানদের পদ্ধতি বেশ কাজে লাগল ; আমার স্ত্রী একেবারে পরিপূর্ণা হয়ে উঠল, তার চেহারাটাও বেশ খোলতাই হল। সেটা জানার ফলে ওর রূপ-প্রসাধনের বহরটা বেড়ে গেল দ্বিগুণ। লোককে বিচলিত করার মত বেশ উগ্র ধরনের কিছু একটা ছিল ওর মধ্যে। তিরিশ বছর বয়স, বেশ ভরাট যৌবন, আর বাচ্চাকাচ্চা হওয়াও বন্ধ। দেখলে যে কারও মন আনচান করে ওঠাই স্বাভাবিক। লোকজনের মাঝে গেলে সকলেরই দৃষ্টি পড়ত ওর ওপর। তার অবস্থা তখন অনেকটা হঠাৎ রাশ ছেড়ে দেওয়া হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ার মত। আসলে রাশ বলতে যা বোঝায় তার কানাকড়িও ছিল না—অনেকটা আমাদের সমাজের শতকরা নিরানব্বইজন মেয়ের যেমনি—তেমনি। এসব দেখে আমার মনে বেশ ভয় ধরে গেল।

॥ উনিশ ॥

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক জানলার ধারটায় গিয়ে বসলেন।

'মাফ করবেন,' বলে প্রায় মিনিট তিনেক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কাটিয়ে দিলেন ; তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে এসে আবার আমার পাশটাতে বসলেন। তার মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে, দৃষ্টি করুণ, হাসির মত একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করলেন, 'একটু ক্লান্ত লাগছে, তবু বলি। সকাল হতে এখনও অনেক বাকি, আকাশ ফর্সা হওয়া শুরু করেনি এখনও। বাচ্চাকাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়ে যাবার ফলে আমার স্ত্রী বেশ ভরাট হয়ে উঠল, এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবিরাম দুর্ভোগের ব্যাপারটাও অনেকটা কমে গেল। একেবারেই যে সেরে গেল তা নয়, তবে ওর অবস্থাটা দাঁড়াল অনেকটা নেশার ঘোর কাটবার পর আনন্দে ভরা পৃথিবী দেখে খুশি হওয়ার মত। যে পৃথিবীর কথা সে ভুলে গিয়েছিল, যার মধ্যে তার বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, যাকে

সে বুঝেই উঠতে পারেনি, সেই পৃথিবীকে আবার নবরূপে দেখার আনন্দে তখন সে উচ্ছ্বসিত। আমার মনে হয় সে হয়ত তখন ভাবত কিংবা অনুভব করত যে, "এই সুযোগটাকে ছেড়ে দিলে চলবে না! সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে—এ সব আর কখনও ফিরে আসবে না।" এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ, জীবনে শুধু প্রেমটাই হচ্ছে একমাত্র বস্তু—এমন একটা ধারণা যাতে ওর মধ্যে গড়ে ওঠে সেভাবেই ওকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করা হয়েছিল। বিয়ে হওয়ার ফলে সেই প্রেম ব্যাপারটা থেকে কিছু পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মনে মনে ও যা প্রত্যাশা করত তার তুলনায় সেটা কিছুই নয়; বরং যেটা পাওয়া গেল সেটা তার মনে আরও বেশি হতাশা ও দুর্ভোগের সৃষ্টি করল; তাছাড়া একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঝামেলাও এল—তা হল ছেলেমেয়ে। সেই মানসিক যন্ত্রণায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন মহানুভব ডাক্তারদের কৃপায় সে এই সত্যটা আবিষ্কার করে বসল যে ইচ্ছে করলে বাচ্চাকাচ্চা না হয়েও থাকা যায়। মন তার ফুর্তিতে ভরে উঠল; জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু বলে যেটাকে সে জেনে এসেছিল সেই প্রেমের জন্য আবার সে বেশ সতেজ হয়ে উঠল। কিন্তু সে প্রেম হিংসা আর বিদ্বেষে পূর্ণ স্বামীর সঙ্গে নয়, সে প্রেম একেবারে আলাদা ধরনের। নতুন এক পবিত্র প্রেমের স্বপ্ন দেখা শুরু করল সে। অন্ততঃ আমার তা-ই মনে হল। সব সময় সে চারদিকে চেয়ে দেখত, মনে হত হয়ত কারও প্রতীক্ষা করছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না। নিজস্ব কায়দায় সে যখন অন্যদের মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলত—অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে উদ্দেশ্য করেই সেগুলো বলত, তখন বারবার গলায় একটা তাচ্ছিল্যের সুর টেনে (ঘণ্টা খানেক আগেই যে তার উলটা কথা বলেছে সেটা যেন ভুলেই যেত) জানিয়ে দিত সে, মাতৃত্বের ব্যাপারটা নিতান্তই একটা ছলনা মাত্র; যখন যৌবন রয়েছে, আর জীবন উপভোগ করাটা যখন সম্ভবই তখন ছেলেমেয়েদের জন্য মিছিমিছি আত্মত্যাগ করার কোন মানেই হয় না। ক্রমেই ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়াটা কমে যেতে লাগল, আর যেটুকুও বা দিত, তার মধ্যে আগেকার সেই টানটা আর ছিল না। নিজেকে নিয়ে, নিজের চেহারাটাকে নিয়েই সে সারাদিন ব্যস্ত থাকা শুরু করল; যদিও সেটাকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাই করত বেশি করে—তবু মনটা সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে গেল আত্মচিন্তায়, আমোদ-প্রমোদে। পিয়ানো বাজানোটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু আবার সেটা বেশ আগ্রহ সহকারে শুরু করে দিল। এ থেকেই শুরু হল চূড়ান্ত গণ্ডগোলের।'

ভদ্রলোক বেশ শান্ত দৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকালেন, কিন্তু তক্ষুণি আবার বেশ জোর দিয়েই শুরু করলেন বলতে।

'তারপর সেই লোকটার আবির্ভাব ঘটল।' একটু যেন থতমত খেয়ে বার তিনেক নাক দিয়ে সেই অদ্ভুত আওয়াজটা করলেন।

বুঝতে পারছি, সেই লোকটির নাম করা, তার স্মৃতি মনে আনা, তার কথা বলা ভদ্রলোকের পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু যে ব্যাপারটা তাকে এ কথা বলতে বাধা দিচ্ছে সে বাধাটাকে একরকম জোর করে সরিয়ে দিয়েই যেন তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার দৃষ্টিতে, আমার বিবেচনায় লোকটা অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির। আমার জীবনে তার জঘন্য ভূমিকাটার জন্য নয়, আসলে সে সত্যিই খুব

নীচ প্রবৃত্তির লোকই ছিল। আর সে যে খারাপ ছিল, সেটাই হল আমার স্ত্রীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রমাণ। লোকটা যদি না হত, তবে অন্য কেউ নিশ্চয়ই হত—কারণ, না হয়ে কোন উপায়ও ছিল না।' ভদ্রলোক একটু থেমে তারপর বললেন, 'লোকটা ভায়োলিন বাজাত ; তবে পেশাদার বাজিয়ে ছিল না, ছিল অর্ধেক বাজিয়ে ; অনেকটা অর্ধেক ভদ্রলোক আর কি।

'তার বাবা ছিল জমিদার ; আমার বাবারই প্রতিবেশী। বাবা ফতুর হয়ে যাবার ফলে তিন ছেলের মধ্যে দু ছেলেকে বাধ্য হয়ে কাজে যেতে হয়, আর ছোটটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্যারিসে—তার ধর্ম-মার কাছে। গানবাজনায় হাত ছিল বলে সেটাকে সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়—শেষে ভায়োলিন বাজানো শিখে কনসার্ট বাজানোতে যোগ দেয়। লোক হিসেবে সে···' ভদ্রলোক সেই লোকটির সম্পর্কে খারাপ কিছু একটা বলতে গিয়ে শেষে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলেন, 'সেখানে সে কিভাবে জীবন কাটাত তা আমার জানা নেই, তবে রাশিয়ায় ফিরে এসেই সে একেবারে সোজা এসে হাজির হল আমার বাড়িতে।

'বাদামের মত ভিজে চোখ, হাসি-হাসি লাল ঠোঁট, মোম-মাখানো গোঁফ, আধুনিক রীতির কেশবিন্যাস, মুখখানা অশ্লীল কায়দায় বেশ ভালই, অর্থাৎ মেয়েরা যাদেরকে "মন্দ নয়" বলে থাকে তেমনি, রোগাটে, তবে বিশ্রী নয় মোটেই, ভারি নিতম্ব—অনেকটা মেয়েদের মত, মানে হটেনটটদের মতই আর কি। শুনেছি হটেনটটরাও গানবাজনা পছন্দ করে বেশ। বেশ গায়ে পড়া ভাব, তবে খুবই সতর্ক —একটু বাধা দিলেই পেছনে সরে যেতে মুহূর্তমাত্র দেরি করত না। চলাফেরার ধরন ধারণ ছিল বেশ মর্যাদাব্যঞ্জক. পায়ে থাকত প্যারিসসুলভ বিচিত্র রঙের বোতাম লাগানো বুট, গলায় ঝুলত উজ্জ্বল রঙের টাই, আর পরিধেয় অন্যান্য জিনিসগুলো ছিল ঠিক তেমনি যেমনটি বিদেশীরা প্যারিসে সংগ্রহ করে থাকে—যা মৌলিকত্ব আর অভিনবত্বের জন্য মেয়েদের প্রায়ই মুগ্ধ করে ; লোকটা সবসময়েই ওপর ওপর একটা কৃত্রিম ভঙ্গির ভাব দেখাত, কথা বলত আভাসে ইঙ্গিতে, মনে হত, ও যা বলতে চাইছে তা যেন সবারই জানা—শুধু ওর ভঙ্গি দেখেই কথাটাকে তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ করে নিতে পারবে।

'সবকিছুর মূলেই ছিল লোকটা নিজে আর তার বাজনা। বিচারের সময়ে এটা বোঝানো হয়েছিল যে সবকিছুই নাকি ঘটেছিল ঈর্ষার জন্য। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয় ; অবশ্য একেবারেই যে নয়, তাও নয়, তবে ঠিক ওটাই সব নয়। বিচারে এই সিদ্ধান্তই করা হয় যে আমি একজন প্রবঞ্চিত স্বামী, এবং নিজের হৃত সম্মান (ওরাই ওটার ওই নাম দিয়েছে) রক্ষা করার জন্যই আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, আর সে কারণেই আমি খালাস পেয়ে যাই। বিচারের সময় সব ব্যাপারটাই আমি তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা ভাবত যে আমি নাকি নিজের স্ত্রীর সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছি।

'সেই বাজিয়েটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর যে সম্পর্কই থেকে থাকনা কেন, সেটা আমার কাছে যেমন অর্থহীন ছিল, তার ঠিক কাছেও তাই। শুধু ভাববার মত একটাই মাত্র জিনিস ছিল, এবং সেটার কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি, তা হল আমার ভেতরকার পশুত্ব। আমাদের দুজনের মধ্যে সে বিরাট ব্যবধানটা ছিল বলেই, আপনাকে এতক্ষণ যা-কিছু বললাম, সেগুলো ঘটেছিল। আমাদের

পারস্পরিক ঘৃণাটা এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সামান্যমাত্র উস্কানিতেই আমরা চরম অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারতাম। শেষের দিকে ঝগড়াঝাটিটা এক ভয়ঙ্কর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এবং সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেটা ঘটত তীব্র জান্তব কামপর্ব সমাধা হওয়ার পরই।

'যদি সে লোকটা না আসত, তবে অন্য কেউ আসতই। যদি ঈর্ষা প্ররোচনা না দিত, তবে অন্য কিছু তা দিতই। আমি বিশ্বাস করি, যারা আমার মত, তারা হয় লম্পট হয়ে যাবে, নয়ত স্ত্রীদের ত্যাগ করবে, অথবা আমি যেমন করেছিলাম তেমনিভাবে হয় নিজেদের, নয়ত স্ত্রীদের হত্যা করবেই। এ সবের হাত থেকে কেউ যদি কখনও রেহাই পেয়ে যায়, জানবেন সেটা একটা ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি শেষ পর্যন্ত যেভাবে ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলাম তার আগে বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি, এবং আমার স্ত্রীকেও ঠিক তা-ই করতে হয়েছে।

॥ কুড়ি ॥

'হ্যাঁ, একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অবস্থাটা ছিল ঠিক এরকমই।

'দুজনেই একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, এবং সে চুক্তিকে লঙ্ঘন করার কোন তাগিদও ছিল না কখনও। কিন্তু হয়ত একদিন বললাম যে একটা প্রদর্শনীতে কী একটা কুকুর যেন পদক পেয়েছে। অমনি সে এই বলল, "না, পদক নয়; প্রশংসাপত্র পেয়েছে।" অর্থাৎ ঝগড়ার সূত্রপাত হল। তারপর দেখতে না দেখতেই এসে গেল অন্য একটা বিষয়। শুরু হল অভিযোগ প্রত্যাভিযোগ: "হ্যাঁ, সবাই এটা জানে; এটা তো সবসময়ই এরকম। তুমিই তো বলেছিলে…", "না, আমি কখনোই ওরকম কিছু বলিনি,", "তার মানে, তুমি বলতে চাইছ যে আমি মিথ্যে কথা বলছি?" মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি যে, সেই ভয়ঙ্কর ঝগড়াটা আবার হাজির হয়েছে—ইচ্ছে হয় ওকে কিংবা নিজেকে খুন করে ফেলি। টের পাই সে এসে গেছে, তাই ভয় হয়; ইচ্ছেও করে আত্মসম্বরণ করার কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আত্মাই যে বিদ্বেষপূর্ণ। ওর অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি, কিংবা কি জানি হয়ত আরও খারাপ; আমি যা বলছি, ও ইচ্ছাকৃতভাবেই সেগুলোর বিকৃত মানে করে চলেছে। ওর প্রত্যেকটা কথাই তখন এক একটা বিষের হুল—আমার ব্যথার জায়গাগুলো খুঁজে বের করে সেখানে অবিরাম আঘাত করে চলেছে। যতদিন যায় ততই সেটা বেড়ে চলে। হয়ত আমি চিৎকার করে বললাম, 'চুপ কর" কিংবা ওই ধরনেরই অন্য কিছু একটা, সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের ঘরের দিকে ছুটে গেল। আমি আমার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ শোনাবার জন্য হয়ত ওকে থামাবার চেষ্টা করতাম, হয়ত হাতটা চেপে ধরলাম। অমনি সে ব্যথা পাবার ভান করে ছেলেমেয়েদের চিৎকার করে ডেকে উঠল, "ওরে, তোরা শুনছিস, তোদের বাবা আমাকে মারছে।" আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "মিথ্যে কথা বোলো না।" আর সেও উত্তরে চেঁচিয়েই বলল, "এবারই তো আর প্রথম নয়!" বাচ্চারা ওর কাছে দৌড়ে এসে কান্নাকাটি শুরু করল। ও সাথে সাথে তাদের ঠাণ্ডা করার কাজে লেগে গেল। আমি বললাম, "ওসব ভান করা ছাড়।" সে বলল, "তোমার কাছে তো সবকিছুই ভান; তুমি একটা মানুষকে খুন করেও বলতে পার যে লোকটা ভান করছিল। এখন আমি তোমায় হাড়ে হাড়ে চিনতে পেয়েছি,

তুমি ঠিক তা-ই চাও।" আমিও চিৎকার করে বললাম, "হ্যাঁ, তাই চাই; তুমি মরলে আমি বাঁচি!" এখনও মনে আছে, আমি নিজের কথাতে নিজেই কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এমন ভয়ঙ্কর কথা যে কখনও বলতে হবে তা কোনদিন ভাবিওনি; তাই আমার মুখ দিয়েই অমন কথা বেরিয়েছে দেখে চমকে উঠলাম। শেষ কথাটা বলেই হয়ত দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লাম পড়ার ঘরে, তারপর বসে পড়ে একটা সিগারেট টানতে শুরু করলাম। ওদিকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে বড় ঘরটায় গিয়ে তৈরি হচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্য। তার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, "কোথায় যাচ্ছ?" সে কোন জবাব দিল না। মনে মনে বললাম, "জাহান্নমে যাক।" তারপর আবার পড়ার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে সিগারেট টানতে শুরু করলাম। ওর ওপর শোধ নেবার, ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার, কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করে নেবার জন্য মাথার ভেতর হাজার রকম ফন্দি ঘোরপাক খেতে লাগল। শুয়ে শুয়ে ভাবছি, আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি। ভাবছি, ওকে ফেলে কোথাও পালিয়ে যাই, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি, কিংবা চলেই যাই না সেই সুদূর আমেরিকাতে। শেষ পর্যন্ত ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার কল্পনাটা আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে চমৎকারভাবে আবার জীবন শুরু করব। ও মরে যাক, নয়ত বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে ওর হাত থেকে নিস্তার নেবই; আর কিভাবে সেটাকে বাস্তবায়িত করা যায় তা নিয়ে নানান ফন্দি আঁটতে শুরু করলাম। বুঝলাম, আমার ভেতরে সবকিছুই গোলতাল পাকিয়ে যাচ্ছে; যা ভাবা দরকার সেটা মোটে ভাবছি না; আর সেটা যে ভাবছি না এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চললাম।

'সংসারে সবকিছুই রুটিন মাফিক চলতে থাকে। গভর্নেস এসে জানতে চায়, "শ্রীমতী কোথায়? তিনি কখন ফিরবেন?" আর্দালি জিজ্ঞেস করে চা দেবে কিনা; আমি খাবার ঘরে যাই, বাচ্চারা আমার দিকে কঠিন প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে বড় মেয়ে লিজা—ওর এতদিনে বোঝবার বয়স হয়েছে। একটাও টু শব্দ না করে আমরা চা খেয়ে চলি। স্ত্রীর কোন খবর নেই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখনও সে ফিরলনা; আমার মনে তখন দুটো পরস্পরবিরোধী অনুভূতির লড়াই চলেছে। ভাবছি, ও তো জানেই যে শেষ পর্যন্ত ও ফিরে আসবেই, তবু বাড়ির বাইরে থেকে ছেলেমেয়েদের মনে ব্যথা দিচ্ছে—এ কারণে বিদ্বেষ জাগে; আর ভয় জাগে এই ভেবে যে, ও হয়ত আর ফিরে আসবে না, হয়ত হঠাৎ একটা কিছু করে বসবে। ওর খোঁজে বের হবার ইচ্ছে জাগে, কিন্তু প্রশ্ন, যাবটা কোথায়? ওর বোনের বাড়িতে? ওখানে গিয়ে ওর কথাটা জিজ্ঞেস করা নিতান্তই বোকামি। জাহান্নামে যাক। যদি অন্যকে শাস্তি দেবার এতই জেদ চেপে থাকে মনে তবে নিজেকেই দিকনা। সেটাই তো ও চায়। তারপর ভাবি, ও যদি বোনের বাড়িতে না গিয়ে অন্য কিছু করার মতলবে কোথাও গিয়ে থাকে, তাহলে? যদি ইতিমধ্যে একটা কিছু করে বসে থাকে, তবে? এগারটা বাজল, তারপর বারটা, তারপর একটা। শোবার ঘরে যাই না, কারণ সেখানে গিয়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকাটা নিতান্তই মূর্খমি। আবার পড়ার ঘরেও শোয়া সম্ভব হল না। চাইলাম কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখি—কিছু একটা করি,—লিখি কিংবা পড়ি, কিন্তু না,

কিছুই করতে পারলাম না। নানারকম চিন্তায় জর্জরিত হয়ে, প্রচণ্ড রেগে একা একা বসে রইলাম পড়ার ঘরে—কান দুটোকে খাড়া রেখে। তিনটে বাজল, চারটে—তবু সে এলনা। এভাবে জেগে জেগে ভোরের দিকে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। শেষে ঘুম যখন ভাঙল তখনও দেখলাম যে সে আসেনি।

'সংসারের সবকিছুই যথারীতি চলেছে, কিন্তু সকলেই কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, সকলেই বারবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ তারা ধরেই নিয়েছে যে দোষটা হচ্ছে সম্পূর্ণই আমার। আর এদিকে তখনও আমার মনে চলেছে সেই লড়াই—আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য বিদ্বেষ, আবার ওর জন্য উৎকণ্ঠাও।'

'এগারটা নাগাদ ওর বোন এল বার্তাবাহিকা হয়ে। যথারীতি শুরু করল, "ওর অবস্থা খুবই খারাপ। কি হয়েছে?" বললাম, "কই, কিছুই তো হয়নি।" বুঝিয়ে দিলাম ওর স্বভাবটা সত্যিই অসহনীয়, আর আমি কিছুই করিনি, একেবারে কিছুই না।

'ওর বোন বলল, "কিন্তু এভাবে তো আর চিরটাকাল চলতে পারে না।"

'উত্তরে আমি বললাম, "সেটা ওর ব্যাপার, এতে আমার গায়ে পড়ে কিছু করার নেই। যদি সে আলাদা থাকতে চায় তো তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

'আমার শালী আশাব্যঞ্জক কিছু না পেয়ে চলে গেল। তাকে আমি জোর গলায় বলেছিলাম যে এতে গায়ে পড়ে কিছু করব না, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভীত সন্ত্রস্ত করুণ মুখগুলো দেখে মনে হল যে আমারই উচিত গায়ে পড়ে কিছু করা। কিছু করতে পারলে অবশ্যই খুশি হই, কিন্তু প্রশ্ন হল করবটা কি? সুতরাং আবার শুরু হল পায়চারি, ধূমপান। প্রাতরাশের সময় ভদকা ও অন্য মদ খেলাম, ফলে নিজেরই অজ্ঞাতসারে প্রতিমুহূর্তে যেটা কামনা করছিলাম সেটা নিজের আয়ত্তে এল : আমার অবস্থার নীচতা এবং নির্বুদ্ধিতার কথাটা ভুলেই গেলাম।

'তিনটে নাগাদ সে বাড়ি ফিরল; আমার সাথে একটা কথাও বলল না। আমি নিজেই সেধে বোঝাতে গেলাম যে ওর চেঁচামেচির জন্যই আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমার মনে হল যে ও নিশ্চয় আমার সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু না, আমার কথায় ওর মুখের কঠোর ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। বরং ও বলল, আমার সঙ্গে মিটমাট করার জন্য ও আসেনি, এসেছে বাচ্চাদের নিয়ে যেতে, কারণ আমাদের দুজনের একসাথে ঘর করা সম্ভব নয়। আমি তখন বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে দোষটা আমার নয়, বরং ও আমাকে উত্তেজিত করে তোলার ফলেই এমনটা ঘটেছে। কথাটা শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "আর কিছু বলার দরকার নেই; বললে পরে অনুতাপ করতে হবে।"

'আমি বললাম, কোনরকম নাটুকেপনা সহ্য করতে আমি মোটেও রাজি নই। কথাটা শুনে সে কী একটা অবোধ্য চিৎকার করেই দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। দরজায় তালা লাগানোর শব্দ কানে এল। বুঝলাম, ও ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দরজা ধাক্কালাম কয়েকবার, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না; তাই রাগে, চলে এলাম। আধঘণ্টা পরে লিজা সজল চোখে দৌড়ে এল আমার কাছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি, কি হয়েছে?"

' "মার ঘরে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

'ছুটে গেলাম ; প্রাণপনে দরজা ধরে টানলাম ; খিলটা ভাল করে আঁটা ছিল না, তাই খুলে গেল সেটা। বিছানার কাছে গেলাম। পরনে স্কার্ট, পায়ে ফিতেতোলা জুতো—বেশ অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে সে। বিছানার পাশে রাখা টেবিলটার ওপরে পড়ে রয়েছে আফিমের একটা খালি শিশি। অতি কষ্টে জ্ঞান ফেরানো হল। আবার শুরু হল সেই চোখের জল, এবং সবশেষে মিটমাট। কিন্তু সেটা সত্যিকারের মিটমাট হল না : দুজনের মনের মধ্যেই রয়ে গেল সেই পুরনো শত্রুতার ভাব, আর তার সঙ্গে অনিবার্য হিংসের সংযোজিত হল এই ঝগড়ার দুর্ভোগের ফলশ্রুতি আরও বেশি আক্রোশ : মনে মনে চাইলাম ব্যাপারটাকে শেষ করতে, কিন্তু তবু জীবন সেই একই ধারায় বয়ে চলল। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার, দিনে একবার করে এরকম, আবার কখনও কখনও এর থেকেও খারাপ ঝগড়া হতে লাগল। বারবার ঘুরে ফিরে সেই একই ব্যাপার। একবার বিদেশে যাবার ছাড়পত্রও যোগাড় করে ফেললাম : সেবার ঝগড়াটা চলেছিল পুরো দুদিন—শেষে একটা আধা মিটমাট হয়ে যাওয়ায় আর গেলাম না, বাড়িতেই থাকলাম।

॥ একুশ ॥

আমাদের বাড়িতে লোকটার যখন আবির্ভাব ঘটল তখন আমাদের সম্পর্কটা ছিল ঠিক এ ধরনেরই। মস্কোয় এসেই সে (তার নাম ত্রুখাচেভস্কি) আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তখন সকালবেলা : আমি তার সাথে দেখা করলাম। একসময় আমরা একে অপরকে "তুমি" বলে সম্বোধন করতাম। আলাপের প্রথম দিকটায় ও চেষ্টা করল "আপনি" ও "তুমি"র মাঝামাঝি একটা অবস্থান থেকে সোজাসুজি "তুমি"তে চলে আসবার, কিন্তু আমি প্রথম থেকেই "আপনি" চালিয়ে যাওয়াতে সেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল "আপনি"তেই থেকে যেতে। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে আমার খুবই অপছন্দ হল। কিন্তু কী যে বিচিত্র গ্রহের ফের, আমি ওকে কিছুতেই ভাগিয়ে দিতে পারলাম না, বরং প্রশ্রয় দিলাম। ওকে কোনরকম পাত্তা না দিয়ে, নিস্পৃহভাবে কথাবার্তা বলে, স্ত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ না করিয়েই ওকে ভাগিয়ে দেওয়াটা কঠিন না সহজ ছিল, কিন্তু আমি নিজে থেকে সেধেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর সেই বাজনার কথাটা ; বললাম, কার কাছে যেন শুনেছি যে ও আর আজকাল ভায়োলিন বাজায় না। উত্তরে ও আমাকে বলল যে, কথাটা সত্যি নয়, আজকাল নাকি আগের থেকে আরও বেশিই বাজায়। আর একথাটাও মনে করিয়ে দিল যে এককালে আমিও তো তা বাজাতাম। কিন্তু উত্তরে জানালাম, আমি আর আজকাল বাজাই না, বরং আমার স্ত্রীর হাত খুবই ভাল।

'কী আশ্চর্য ব্যাপার! প্রথম দিন, প্রথম ঘন্টা থেকেই ওর সঙ্গে আমার সেই সম্পর্কটা গড়ে উঠল, যা কিনা কেবলমাত্র শেষদিন যা ঘটেছিল, তার পরের অবস্থাতেই হওয়া উচিত ছিল। ওর প্রতি আমার মনোভাব খুবই কঠিন হল। আমি আমাদের দুজনের মধ্যেকার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অভিব্যক্তিকে খুঁটিয়ে দেখে তাতে বেশ গুরুত্ব আরোপ করলাম।

'ওকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। সাথে সাথে গান বাজনার কথা উঠল, এবং ও জানাল যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি ও একত্রে বাজাতে পারে তবে খুবই খুশি হবে। আমার স্ত্রী ছিল বেশ সুসজ্জিতা ; চিত্তবিক্ষোভ ঘটাবার মতই

ছিল তার রূপ। মনে হল প্রথম দর্শনেই সে লোকটিকে বেশ পছন্দ করল। পিয়ানো ও ভায়োলিনের যৌথ ধ্বনির আবেশের সম্ভাবনায় তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তাছাড়া এটা তার খুবই ভাল লাগত—প্রায়ই সে অপেরা থেকে কোন ভায়োলিন বাজিয়েকে ভাড়া করে নিয়ে আসত। তার মুখের ভাবে আনন্দটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কিন্তু সে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার চিন্তাটা কোন ধারায় বইছে, একবার আমার দিকে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুঝতে পেরে সে মুহূর্তের মধ্যে নিজের মুখের ভাবটাকে একেবারে বদলে ফেলল; সুতরাং আবার শুরু হয়ে গেল পরস্পরকে ঠকাবার লুকোচুরি খেলা। আমি মধুর হাসি হেসে এমন ভান করলাম যে মনে হল প্রস্তাবটা শুনে আমিও খুব খুশি হয়েছি। কামুক মানুষেরা যেভাবে সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত ওই লোকটাও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই আমার স্ত্রীর দিকে তাকাতে শুরু করল; কিন্তু ভাবটা এমন করল, যেন শুধু আমাদের কথাবার্তা শোনাতেই তার যত আগ্রহ; অথচ আসল ব্যাপারটা হল ও ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমার স্ত্রী মুখে উদাসীনতার ভাব আনার চেষ্টা করল, কিন্তু ঈর্ষান্বিত স্বামীর কৃত্রিম হাসি (এ হাসি ওঁর হাড়ে হাড়ে চেনা) ও সেই লোকটার কামুক দৃষ্টির সামনে বিচলিত না হয়ে সে থাকতে পারল না। লোকটাকে প্রথমবার দেখার পরই তার চোখের তারায় একটা বিশেষ ঔজ্জ্বল্যের ভাব দেখতে পেলাম আমি, আর সম্ভবতঃ আমার মনের প্রচণ্ড ঈর্ষার দরুণই হয়ত ওদের দুজনের হাসি, চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাব একই ধরনের হয়ে গেল। আমার স্ত্রী যখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তখন সেই লোকটিরও তাই হল; আবার লোকটি যখন হাসল, তখন আমার স্ত্রীও হেসে উঠল। গান বাজনা, প্যারিস এবং অন্যান্য বহু আজেবাজে বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটাকে পেছন দিকে ধরে সে একবার আমার দিকে আর একবার আমার স্ত্রীর দিকে তাকাতে থাকল; যেন আমরা কি করব সেটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছে। সে মুহূর্তটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে; কারণ, তখন যদি ওকে নিমন্ত্রণ না করতাম তাহলে তো আর এ বিপত্তি ঘটত না। একবার আমি ওর দিকে তাকালাম, তারপর চাইলাম স্ত্রীর দিকে; মনে মনে স্ত্রীকে বললাম, "ভেবো না যে আমার হিংসে হচ্ছে," আর লোকটিকেও মনে মনেই বললাম, "ভেবো না যে আমি তোমাকে এতটুকু ভয় পাই," আর আমন্ত্রণ জানালাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় এসে বাজনা বাজাতে। অবাক দৃষ্টিতে, যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে, লাল হয়ে উঠে আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ওর সাথে বাজাবার মত অত ভাল হাত তার নেই। ওর আপত্তিতে আমার জেদ চেপে গেল, তাই তাকে আরও জোর দিয়ে আসবার জন্য বললাম। পাখির মত লাফিয়ে লাফিয়ে পা ফেলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; আজও আমার মনে আছে, তখন আমি তাকিয়েছিলাম ওর মাথা আর টেরি কাটা কালো চুলের নিচের সাদা ঘাড়টার দিকে। নিজের কাছে তখন এ কথাটা স্বীকার না করে পারলাম না যে এই জীবটির উপস্থিতি আমার কাছে সত্যিই খুব যন্ত্রণাদায়ক। ভাবলাম, "ওর সাথে আর যাতে কখনও দেখা না হয় সেটা তো আমার হাতেই নির্ভর করছে।" কিন্তু তার মানেটা তো দাঁড়ায় যে আমি ওকে ভয় পাই। মনে মনে বললাম, "না, আমি ওকে ভয় পাই না; ভয় পাওয়াটা তো নিতান্তই অপমানকর ব্যাপার।"

তাই বারান্দায় গিয়ে আবার তাকে জোর দিয়ে বললাম, সে যেন সেদিন সন্ধ্যাতেই তার ভায়োলিনটা নিয়ে আসে; জানতাম আমার স্ত্রীর কানে আমার গলার স্বর পৌঁছচ্ছে। সে আমাকে আসবে কথা দিয়ে চলে গেল।

'সেদিন সন্ধ্যাতেই সে ভায়োলিন নিয়ে এল; এবং দুজনে মিলে বাজাল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বাজানো সত্ত্বেও বাজনাটা তেমন জমল না, কারণ, প্রয়োজনীয় স্বরলিপিগুলো ওদের কাছে ছিল না, আর যা-ও বা ছিল তা আমার স্ত্রীর পক্ষে বিনা প্রস্তুতিতে বাজানো সম্ভব হল না। গান বাজনা আমিও খুব ভালবাসি, সে কারণে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম,—লোকটার জন্য একটা স্ট্যাণ্ড বসিয়ে স্বরলিপির পাতাগুলো উলটে দিতে লাগলাম। বেশ কয়েকটা সুর ওরা বাজাল, তার মধ্যে মোজার্টের একটা গত্‌ও ছিল। লোকটার হাত সত্যিই চমৎকার; সুরের ওপর মারাত্মক দখল ওর। তাছাড়া সেদিন যে মার্জিত রুচির পরিচয় দিল ও সেটা ওর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

'আমার স্ত্রীর থেকে অনেক ভাল হাত হওয়াতে সে তাকে সাহায্য করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভদ্রভাবে তার তারিফ করাও শুরু করে দিল। অবশ্য আচরণ বেশ প্রশংসনীয়ই রইল। স্ত্রীকে দেখেও মনে হল শুধু সঙ্গীতেই তার আগ্রহ; আর তার ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত সহজ ও অকপট। এদিকে আমিও ভান করতে লাগলাম যে একমাত্র সঙ্গীতেই আমার আগ্রহ, কিন্তু মনে মনে সারাটা সন্ধ্যা হিংসার আগুনে পুড়ে মরতে লাগলাম।

'দেখতে পেলাম, আমার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করার সাথে সাথেই ভদ্রসমাজের সমস্ত রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে তার ভেতরকার পশু প্রশ্ন করল, "কি, হবে নাকি?" তবিৎ উত্তর, "হ্যাঁ, না হবার কি আছে?" বুঝলাম, ও ভাবতেও পারেনি যে আমার মস্কোওয়ালী স্ত্রী এত মোহিনী হতে পারে, এত সুন্দর হতে পারে; তাই তাকে দেখে সে খুবই খুশি হল। ও একবারের জন্যও ভাবেনি যে আমার স্ত্রী ওকে গ্রহণ করবে না, শুধুমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল তার হতভাগা স্বামীটা যাতে সে ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না বসে। আমার নিজের যদি চরিত্র শুদ্ধ হত তাহলে একথা মনেই আসত না, কিন্তু বিয়ের আগে বেশির ভাগ লোকের মতই যেহেতু আমিও ছিলাম লম্পট সেহেতু তার মনের কথাটা পড়ে নিতে আমার এতটুকু অসুবিধে হল না। আর একটা ব্যাপার আমাকে ভীষণভাবে যন্ত্রণা দিল, তা হল, আমি জানতাম যে কামের কয়েকটা নিশ্চিত মুহূর্ত ছাড়া আমার প্রতি আমার স্ত্রীর মনোভাব খুবই বিরক্তিজনক; সুতরাং এই লোকটা যে অনায়াসেই তার হৃদয়কে জয় করে নেবে তাই নয়, তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করবে; তাকে চাপবে, মোচড়াবে, দড়ি পাকাবে—যা মনে চাইবে তাই করবে। সেটা সে করবে তার বাইরের চাকচিক্য, অভিনবত্বে, আর তার সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা ও একসঙ্গে বাজানোর ফলে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে তার জোরে, আবেগপ্রবণ মনের ওপর সঙ্গীতের বিশেষ করে ভায়োলিনের যে প্রভাব পড়ে তার জোরে। এটা না বোঝার আমার কোন উপায়ই ছিল না, আর বোঝার ফলেই এই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা। তা সত্ত্বেও আমি আমার ইচ্ছার বিরোধী কোন শক্তির প্রভাবেই লোকটার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রব্যবহার করলাম। তাকে যে ভয় পাইনা, স্ত্রীকে এবং তাকে সেটা দেখিয়ে দেবার জন্য, নাকি নিজেকেই ঠকাবার জন্য সেটা করলাম তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়; তবে লোকটার সঙ্গে

সহজ-সরলভাবে মেশাটা আমার পক্ষে প্রথম থেকেই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখনই ওকে খুন করে ফেলার ইচ্ছাটাকে দাবিয়ে রাখার জন্যই সম্ভবতঃ ওর সাথে ভদ্রব্যবহার করলাম। খাবার সময় দামী মদ দিলাম, ওর বাজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম, কথাবার্তার সময় মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তুললাম, এবং পরের রবিবার আবার আমাদের সঙ্গে খেতে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আবার একত্রে বাজনা বাজাতে আমন্ত্রণ জানালাম। তাছাড়া এ-ও বললাম যে সেদিন আমার আরও কয়েকজন সঙ্গীত অনুরাগী বন্ধুকে আসতে বলব। এভাবেই সেই সন্ধ্যাটা শেষ হল।'

পজদনীশেভ বেশ উত্তেজিত, তিনি নড়েচড়ে বসে মুখ দিয়ে সেই অদ্ভুত আওয়াজটা করলেন। তারপর আত্মস্থ হবার জন্য স্পষ্টত চেষ্টা করে আবার শুরু করলেন, 'লোকটার উপস্থিতিটা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ২ একদিন পর একটা প্রদর্শনী থেকে ফিরে এসে সবে বড় ঘরটাতে ঢুকতে যাব, অমনি কি জানি কি কারণে বুকটা পাথরের মত ভারি হয়ে উঠল। বারান্দা পার হবার সময় এমন কিছু একটা দেখেছিলাম যেটা ওর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। পড়ার ঘরে ঢোকার পর ব্যাপারটা মাথায় এল, তাই আবার বারান্দায় ফিরে এলাম। না, কোন ভুল হয়নি; স্পষ্ট দেখলাম ওর সৌখীন ওভারকোটটা ঝুলছে (আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি ওর সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম)। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, লোকটা এসেছে। বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে না গিয়ে বাচ্চাদের পড়ার ঘরের মধ্য দিয়ে বড় ঘরের দিকে এগোলাম। লিজা বই নিয়ে পড়ছে, আর আয়া ছোট মেয়েটিকে নিয়ে টেবিলের পাশে বসে কী একটা নাড়াচাড়া করছে। বড় ঘরের দরজাটা বন্ধ; ভেতর থেকে সুরের আওয়াজ, আমার স্ত্রী আর তার হাসির শব্দ কানে এল। আমি কান পেতে রইলাম, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। অর্থাৎ কিনা, নিজেদের কণ্ঠস্বর, এমনকি চুম্বনের শব্দ ঢাকার জন্যই হয়ত জোরে পিয়ানো বাজানো হচ্ছে। দেখতে দেখতে আমার ভেতরে ঝড় উঠল। সেই মুহূর্তে আমার ভেতরে জেগে ওঠা পশুটার কথা মনে পড়লে আজও আমার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। আমার হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে শেষে এক সময় থেমে গেল, তারপর শুরু হল হাতুড়ি পেটাবার আওয়াজ। আমার নিজের প্রতি করুণা হল; প্রচণ্ড রাগ হলে আমার এরকমটা হয়ে থাকে। ভাবলাম, "ছি ছি, শেষে আয়ার সামনে! লিজার সামনে!" লিজা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল; মনে হল আমাকে তখন খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, "কি করব? ভেতরে যাব? কিন্তু সাহস হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত কি যে করে বসব তা ভগবানই জানেন।" অথচ চলে যাওয়াও সম্ভব নয়। আয়া এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল, সে হয়ত আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে গেছে। নিজেকে বললাম, "আমাকে ভেতরে যেতেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে ফেললাম। দেখলাম, বড় পিয়ানোটার সামনে বসে লোকটা সাদা সাদা বাঁকা আঙুলে দ্রুত সুর তুলে যাচ্ছে আর কোণের দিকে আমার স্ত্রী স্বরলিপিটা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আমার আসার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। হয়ত ভয় পেয়েছে, কিন্তু ভান করল ভয় না-পাওয়ার কিংবা হয়ত সত্যিই ভয় পায়নি। তবে চমকে উঠল না মোটেই, শুধু কিছুক্ষণ পরে একটু লাল হয়ে উঠল। বলল, "তুমি এসে পড়াতে খুব খুশি হয়েছি। রবিবারে কি বাজানো হবে তা এখনও আমরা ঠিক

করিনি।" কথাটা যে সুরে বলল, আমি একলা থাকলে তা কখনোই বলত না। সেই লোকটা আর নিজেকে নিয়ে "আমরা" বলাতে আমার রাগ হল। তার কথার উত্তর না দিয়ে লোকটাকে অভ্যর্থনা করলাম।

সে করমর্দন করে হেসে আমাকে বোঝাতে লাগল যে রবিবারে যা বাজানো হবে তার স্বরলিপি সে নিয়ে এসেছে, তবে ঠিক কি বাজানো হবে সে সম্পর্কে তারা দুজন একমত হতে পারেনি। সবই বেশ সহজ এবং সরল—সুতরাং সন্দেহ করার মত কিছুই ছিল না। তবু আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে সে যা বলছে তার পুরোটাই ধাপ্পা।

'ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের পক্ষে (আমাদের সমাজে সকলেই ঈর্ষান্বিত) চরম যন্ত্রণার ব্যাপার হল সমাজ অনুমোদিত নারী-পুরুষের শারীরিক সান্নিধ্য। নাচের আসরে, ডাক্তার রোগীর সম্পর্কে, চারুকলা, চিত্রকলা ও বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শারীরিক সান্নিধ্য ঘোচাবার চেষ্টা করলে যে কোন ব্যক্তিই হাস্যাস্পদ হতে বাধ্য। দুজনে গান বাজনার মত মহান শিল্পকলা যখন শিখছে তখন শারীরিক সান্নিধ্য একটু হবে বইকি, তাতে নিন্দে করার কিছু নেই; তারমধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যাপার খুঁজে পায় যে স্বামী সে নির্বোধ ও ঈর্ষাকাতর। অথচ সকলেই জানে এ ধরনের শিক্ষার ফলে ব্যভিচার বেড়ে চলেছে। মনে হল আমার বিচলিত ভাবটা ওদেরও সংক্রামিত করল। তখন আমার অবস্থা উলটা করে ধরা বোতলের মত; কিছু বেরোবার উপায় নেই। ইচ্ছে হল ওকে ধমকে বাড়ি থেকে বের করে দিই, কিন্তু বুঝলাম আমাকে ভদ্র ও অমায়িক হতেই হবে। তাই হলাম। সব কিছুতেই খুশির ভান করলাম; বললাম, আমি ওর রুচির সমঝদার। ও অপ্রীতিকর আবহাওয়াটা কেটে যাবার সাথে সাথে পরের দিন কি বাজানো হবে সেটা যেন ঠিক হয়ে গেছে এমন ভান করে চলে গেল। আমার আর সন্দেহ রইল না— ওদের মন কি বাজানো হবে তাতে নিমগ্ন নয়, নিমগ্ন অন্য কোন সন্দেহজনক ব্যাপারে।

'বিশেষ সৌজন্যের সাথে তাকে এগিয়ে দিলাম; বিশেষ সমাদরে হাতে চাপ দিলাম।'

।। বাইশ ।।

'সারাটা দিন স্ত্রীর সাথে একটাও কথা বললাম না; ওর সান্নিধ্যে বড্ড ভয় পেলাম। খাবার সময় বাচ্চাদের সামনে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আঞ্চলিক সম্মেলনে কবে যাব। বললাম কবে যাব। পথে কিছু দরকার কিনা জানতে চাইল; কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে কিছুক্ষণ টেবিলে বসে থেকে শেষে পড়ার ঘরে চলে গেলাম। ইদানিং ও আর পড়ার ঘরে আসত না। সেখানে রাগের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করল। হঠাৎ কানে এল চেনা পায়ের শব্দ। মনে হল, ও তাহলে বাইবেলের সেই পাতকিনী উরিয়ার মত নিজের পাপ ঢাকার জন্য আমার কাছে আসছে। ক্রমশঃ এগিয়ে আসা শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলাম, "সত্যিই কি আসছে?" যদি আসে, বুঝব যা ভেবেছি তাই ঠিক। ওর প্রতি ঘৃণায় মন ভরে যেতে লাগল। পায়ের শব্দ আরও কাছে এল। ভাবলাম, দরজা পার হয়ে বড় ঘরে চলে যাব কিনা? দরজায় মৃদু আওয়াজ হল; দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ দেহ আর সুন্দর চোখে মুখে ভীরু মিনতির দৃষ্টি। এ দৃষ্টির অর্থ আমার জানা। এতক্ষণ শ্বাসরোধ করে রইলাম যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ওর

মুখের ওপর চোখ রেখেই সিগারেট কেস হাতড়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

'সোফার কাছ ঘেঁষে আমার দিকে ঝুঁকে সে বলল, "কথা বলতে এলাম আর তুমি সিগারেট ধরালে! এটা কি ধরনের ব্যাপার?"

'পাছে ও আমাকে ছুঁয়ে দেয় তাই সরে গেলাম।'

'ও বলল, "রবিবার বাজাতে চাইলাম বলে তুমি খুব চটেছ।"

'আমি বললাম, "মোটেই চটিনি।"

'সে বলল, "আমি যেন সেটা আর টের পাইনি!"

'আমি বললাম, "যদি টের পেয়ে থাক তো ভাল। তবে আমিও টের পেয়েছি, তোমার ব্যবহার বাঈজীর মত।"

'সে বলল, "গাড়োয়ানের মত গালাগালি করলে চলে যাব।"

'আমি বললাম, "যেখানে খুশি যাও, শুধু মনে রেখো, তোমার কাছে বাড়ির ইজ্জৎ বলে কিছু না থাকতে পারে তবে আমার কাছে আছে।"

'সে বলল, "কি, বলছ কি তুমি?"

'আমি বললাম, "যাও, দোহাই তোমার, চলে যাও।"

'ব্যাপারটা যে কি সেটা যেন বুঝতে পারেনি এমন ভান করে, কিংবা হয়ত সত্যিই বোঝেনি—সে ক্রুদ্ধ অপমানিতভাবে উঠে ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়াল। তারপর শুরু করল বলতে, "সত্যি, তুমি কী ভয়ঙ্কর হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন; তোমার সঙ্গে স্বর্গের দেবীও একত্রে বাস করতে পারবে না।" এরপর আমার বোনকে একবার রাগের মাথায় যেসব কথা বলেছিলাম সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, "ওই ঘটনার পর তোমার কোন কিছুতেই আর আমি অবাক হই না।"

'মনে মনে বললাম, "তোমার মতলব হচ্ছে আমাকে অপমান করা, অপদস্থ করা, এবং শেষে নিজের দোষটা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া।" হঠাৎ ওর প্রতি এমন ঘৃণা মনে জাগল যা আগে আর কোনদিন হয়নি।

'ইচ্ছে হল এই ঘৃণাটার দৈহিক প্রকাশ দেখাই। লাফিয়ে উঠে ওর দিকে এগোলাম; সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করলাম এভাবে রাগের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া উচিত কিনা। উত্তর পেলাম, উচিত; কারণ তাহলে ও ভয় পাবে। তাই সেটাকে না দাবিয়ে আরও বেশি করে জাগিয়ে তুললাম। কাছে গিয়ে হাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে বললাম, "খুন করে ফেলব; চলে যাও বলছি।" ইচ্ছে করেই ঘৃণার সুরটাতে জোর দিলাম; তখন আমাকে খুবই ভয়াবহ দেখাচ্ছিল, কারণ সে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে তার আর নড়ার ক্ষমতাই ছিল না। শুধু বলল, 'এ কী, ভাসিয়া, তোমার হয়েছেটা কি?"

'আরও জোরে চিৎকার করে বললাম, "বেরিয়ে যাও! রাগে তুমি আমায় পাগল করে দাও। শেষে কিছু করে বসলে দায়ী হব না বলে রাখছি।"

'উন্মত্ত ক্রোধের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে হল অসাধারণ কিছু একটা করে বসি। ইচ্ছে হল ওকে মারি, খুন করে ফেলি; কিন্তু তা করা যাবে না বলে কাগজ-চাপাটা তুলে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করলাম, "বেরিয়ে যাও।" ও বেরিয়ে যেতে যেতে দরজার কাছে থামল। ওকে দেখাবার জন্য আমি টেবিলের জিনিসগুলো বাতিদান কটা, দোয়াতদানিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলাম আর চেঁচালাম, "বেরিয়ে যাও, শেষে কিছু একটা করে বসলে দায়ী হব না।"

'ও চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও থামলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আয়া এসে খবর দিল ওর মূর্ছা হয়েছে। গেলাম। দেখলাম ও কাঁদছে, থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে, কিন্তু বলতে পারছেনা কিছু। কোন ভান করছিল না, তখন ও সত্যিই অসুস্থ। সকালের দিকে ব্যাপারটা মিটল, আর যাকে প্রেম বলা হয় তার কৃপায় আমাদের আবার মিলন হল।

'সকালে যখন ক্রুখাচেভস্কির প্রতি আমার ঈর্ষার কথা বললাম তখন ও বিব্রত না হয়ে স্বাভাবিক হাসি হেসে বলল, অমন মানুষের প্রতি তার আসক্ত হওয়ার কথা চিন্তা করতেই অদ্ভুত লাগে। বলল, "ওরকম একজন লোকের প্রতি কোন রুচি-সম্মত মেয়ের আসক্তি জন্মানো সম্ভব? গানবাজনার জন্যই ওর সঙ্গে কথা বলি। তুমি চাইলে তাও আর কখনও বলব না। এমনকি, যদিও রবিবার সবাইকে আসতে বলা হয়েছে, তবু আমি সেদিনও ওর সামনে যাব না। ওকে একটা চিঠি লিখে দাও, আমার শরীর খারাপ—তা হলে সবকিছু মিটে যাবে। শুধু আমার দুঃখ এই যে ও লোকটা এখন থেকে নিজেকে ভাববে যে ওরও সর্বনাশ করার ক্ষমতা আছে। এমন ভাবতে দেওয়াটা আমার মর্যাদায় বাধে।"

'ও মিথ্যে বলেনি, যা বলেছিল তাতে নিজের বিশ্বাস ছিল। আশা করেছিল, লোকটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। রবিবার অতিথিরা এলে সেও সেই লোকটা একসাথে বাজনা বাজিয়ে শোনাল তাদের।'

॥ তেইশ ॥

'আমি যে খুব অহঙ্কারী সেটা আর বোধহয় বলার দরকার নেই। অহঙ্কার ছাড়া আমাদের সমাজে বেঁচে থাকার মত আর আছেই বা কি? তাই রবিবার খানাপিনা আর সঙ্গীতের আয়োজন করলাম। নিজেই সবকিছু কিনলাম, নিজেই গিয়ে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করলাম।

'দুটো নাগাদ সবাই এল। সেই লোকটিও হাজির হল। তার পরনে ছিল ফ্রক-কোট, নিম্নরুচির হীরের বোতাম; খুব গায়ে পড়া ভাবে অতি চালাকের হাসি হেসে সব কথাতেই সায় দিতে লাগল এমনভাবে যে মনে হল সবকিছুই যেন তার আগে থাকতেই জানা। ওর অভব্যতা দেখে আনন্দিত হলাম, মনে স্বস্তি জাগল এ দেখে যে আমার স্ত্রী ওকে যতটা নিচু বলেছিল ও তার থেকের নিচুতে—এত নিচুতে যে তার প্রতি আসক্ত হবার মত হীনকাজ সে কিছুতেই করবে না। আমি আর ঈর্ষার হাতে আত্মসমর্পণ করলাম না। প্রথমতঃ, ঈর্ষায় ভুগে ভুগে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল; দ্বিতীয়তঃ, তার কথাতে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, এবং তা করলামও। তবু সবসময় ওদের গতিবিধি ও দৃষ্টি বিনিময়ের ওপর নজর রাখতে লাগলাম।

'খাওয়াদাওয়া যেমন একঘেয়ে হয়ে থাকে তেমনি হল। গানবাজনা আরম্ভ হল বেশ আগেভাগে। সেই বিশেষ সন্ধ্যাটার সব খুঁটিনাটি আমার মনে দাগ কেটে বসে গেছে। মনে আছে বাক্সটা খুলে ভায়োলিনটা বের করে ও সুর বাঁধতে লাগল। আমার স্ত্রী সলজ্জভাবটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য ঔদাসীন্যের ভান করে পিয়ানোতে বসল। তারপর দৃষ্টি বিনিময় করে করে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে বাজাতে শুরু করল। প্রথম কর্ড বাজাল

আমার স্ত্রী ; তারপর অতি সাবধানে ভায়োলিনে চাপ দিল লোকটি ; এবং শুরু হল…'

কথা থামিয়ে ভদ্রলোক পরপর কয়েকবার সেই আওয়াজটা করলেন। তারপর কথা বলার চেষ্টা করতেই নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ হল, তিনি থেমে গেলেন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরা বিঠোফেনের ক্রয়টজার সোনাটা বাজাল। তার প্রথম স্তবকটা আপনার মনে আছে? উঃ কী সাংঘাতিক! সোনাটাটা কী ভয়ানক! বিশেষতঃ প্রথম স্তবকটা। তাছাড়া সঙ্গীত জিনিসটাই হল ভয়াবহ। সেটা কি? আমি তো তার কিছুই বুঝি না। সেটা কি করে? কেন করে? লোকে বলে সঙ্গীতের প্রভাবে নাকি মানুষের মন উন্নত হয়। বাজে কথা; মিথ্যে কথা। প্রভাব আছে স্বীকার করি, তবে সেটা মনকে উন্নত করার মত মোটেই নয়। সঙ্গীতে মন উন্নত বা নীচ, কিছুই হয় না,—তা শুধু উত্তেজনা যোগায়। কথাটা কিভাবে বোঝাব? সঙ্গীতে আমি নিজের যথার্থ অবস্থার কথা ভুলে যাই। কল্পনা করি বিভিন্ন জিনিসের অনুভূতি হচ্ছে. কিন্তু কি তা বুঝি না। মনে হয় অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু তা সত্যিসত্যিই আমার সাধ্যের বাইরে। আমার ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়াটা হাইতোলা বা হাসির মত। চোখে ঘুম না থাকলেও কেউ হাই তুললে আমিও হাই তুলি, হাসার মত কিছু না থাকলেও কেউ যদি হাসে তখন আমিও হাসি।

'সঙ্গীত শোনামাত্র সুরকারের ধ্যানের সামিল হই; আমার আত্মা বিলীন হয়ে যায় তার আত্মায়, বিভিন্ন ভাবের পরিক্রমনে তার সহচর হই, কিন্তু কেন যে তা হই তা বলতে পারি না। তবে সুরকার—যেমন ধরা যাক, এই ক্রয়টজার সোনাটার রচয়িতা বিঠোফেন কিন্তু জানতেন কেন তার মধ্যে এই বিশেষ ভাবের সৃষ্টি হয় তবে আমি জানি না, আর সেজন্যই সঙ্গীত আমার মনে উত্তেজনা যোগায়, শেষ হয়ে যায় না। যখন সামরিক বাজনা বাজানো হয় তখন সৈন্যেরা কদম ফেলে এগোয়, ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি ঘটে। নাচের বাজনা বাজলে নাচি, ফলে সঙ্গীত সফল হয়। ধর্ম সঙ্গীতের বেলাও তাই, স্যাক্রামেণ্ট নিলেই মোক্ষলাভ। তাই সঙ্গীতের প্রভাব বড় ভয়ঙ্কর। চীন দেশে সঙ্গীতটা রাষ্ট্রীয় আওতায় পড়ে। সেটাই উচিত। ইচ্ছে হলেই একজন আর একজনকে যাদু করে তাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে সেটা কি সমর্থন করা যায়? যাদুকরের নীতিজ্ঞান বলে কিছু নেই, ফলে সেটা আরও খারাপ।

'অস্ত্রটা খুবই মারাত্মক; এটা যার তার হাতে দেবার মত নয়। ক্রয়টজার সোনাটার প্রথম স্তবকটার কথাই ধরুন না। ওটা কি বৈঠকখানা ঘরে গলা খোলা জামা পরিহিতা মেয়েদের সামনে বাজাবার মত? বাজাবার পর হাত-তালি, আইসক্রিম খাওয়া আর আধুনিক গল্প-গুজব, ব্যস। এ ধরনের সঙ্গীত কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই বাজানো উচিত। সুরের প্রতিক্রিয়ায় যে কাজের উদ্যম আসে তাকে কাজে না লাগালে এইসব রুদ্ধ অনুভূতি সর্বনাশ বাধিয়ে দেবে। আমার সামনে একেবারে নতুন জগৎ খুলে গেল, যে সম্পর্কে আগে কোন ধারণাই ছিল না। মনে হল কেউ যেন ভেতর থেকে বলছে আগে যেমন থাকতে, যেমন ভাবতে মোটেই আর সেরকমটি নেই। নতুন কি জানলাম, তা বলতে পারি না,

তবে নতুনত্বের চেতনা আমাকে আনন্দ দিল। চেনা পরিচিত লোকজনদের, আমার স্ত্রী ও সেই লোকটাকেও দেখলাম একেবারে নতুন আলোয়।

'প্রথম স্তবক শেষ হলে পর ওরা ধীর লয়ের আলাদা একটা বাজনা বাজাল। তার প্রথমটা মিঠে হলেও শেষটা খুবই কাঁচা। অতিথিদের অনুরোধে একটা শোক সঙ্গীত বা ওই ধরনের কিছু একটা হল। সুরগুলো খুবই ভাল, তবে প্রথমটার মত সেটা আমার মনে তেমন দাগ কাটতে পারল না। প্রথমটার পটভূমিতে অন্যগুলো শুনলাম। বাকি সন্ধ্যাটা হালকা খুশির মেজাজে কেটে গেল। সেদিন স্ত্রীকে যেভাবে দেখলাম তেমন আর কখনও দেখিনি। চোখে ঔজ্জ্বল্য, বাজাবার সময় মুখে গাম্ভীর্য. শেষ হবার পর অসহায়তা. চরম সুখের অস্ফুট হাসি, অথচ বেশ করুণ। সব কিছুই চোখে পড়ল. কিন্তু তার কোন অন্য মানে বের করলাম না ; শুধু ভাবলাম আমার মতই ওর সামনেও নিশ্চয় খুলে গেছে কোন নতুন অনুভূতির জগৎ। সন্ধ্যাটা ভালভাবেই কাটল ; সবাই বাড়ি ফিরে গেল।

'দু দিন পরে সম্মেলনে যাব সেটা ক্রুখাচেভস্কি জানত ; বিদায় নেবার সময় বলল. আশা করে, পরের বার আবার এমনি আনন্দের হাট বসাতে পারবে। সে যে আমার অবর্তমানে আমাদের বাড়িতে আসাটা অসম্ভব মনে করে. তার কথার এই মানেটা বের করে মনে মনে বেশ খুশিই হলাম। ও চলে যাবার আগে যেহেতু সম্মেলন থেকে ফিরতে পারব না, সেহেতু ধরে নিলাম যে ওর সাথে আর আমার দেখা হচ্ছে না।

'এই প্রথমবার আন্তরিকতার সাথে ওর করমর্দন করে. আমাদের আনন্দ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। যেন অনেকদিনের জন্য চলে যাচ্ছে এমন একটা ভান করে ও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল। মনে হল ওদের বিদায় পর্বটা খুবই স্বাভাবিক ও ভদ্র ; সবকিছুই বেশ ভাল লাগল, আমি ও আমার স্ত্রী সন্ধ্যাটা নিয়ে খুবই খুশি হলাম।'

॥ চব্বিশ ॥

'দু দিন পরে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে উয়েজদে রওয়ানা হলাম। সেখানে সব-সময়েই একটা না একটা কিছু লেগেই থাকে ; সেখানকার জীবনটাই আলাদা, জীবন যাত্রার ধরনটাও খুবই নিজস্ব। প্রথম দু দিন কাছারিতে দশ ঘন্টা করে রইলাম ; তৃতীয় দিনে স্ত্রীর একটা চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ পড়লাম। তাতে লিখেছিল, ছেলেমেয়ে, কাকা, আয়া আর কেনাকাটার কথা ; তারপর অনেকটা কথাচ্ছলেই জানিয়েছিল যে ক্রুখাচেভস্কির যে কটা স্বরলিপি নিয়ে আসার কথা ছিল. সেগুলো সে নিয়ে এসেছিল, এবং বাজাতে চেয়েছিল কিন্তু সে তাতে রাজি হয়নি। ওকে যে সে স্বরলিপি এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আমি জানতামই না ; বরং ভেবেছিলাম তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েই সে চলে গেছে। ফলে কথাটা পড়ে অবাক হলাম। কিন্তু হাতে এত কাজ ছিল যে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে চিঠিটা আবার না পড়া পর্যন্ত সে ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবার অবকাশই হয়নি। তখন মনে হল আমার অবর্তমানে ক্রুখাচেভস্কির আসার খবর ছাড়াও সমস্ত চিঠিটাই যেন কেমন অস্বাভাবিক। ঈর্ষার জানোয়ারটা গর্জে উঠে লাফ দিয়ে বের হবার চেষ্টা করল. কিন্তু ভয় পেয়ে আমিই তাকে দাবিয়ে রাখলাম। নিজেকেই নিজে বললাম, "কী নীচ অনুভূতি! ও যা লিখেছে, তার থেকে স্বাভাবিক আর কী-ইবা হতে পারে?"

'শুয়ে পড়লাম, পরের দিনের কাজকর্ম সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। অচেনা জায়গায় আমার ঘুম আসেনা, কিন্তু সেদিন খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। মনে তখন তার কথা, তার প্রতি কামানুরাগের কথা, ক্রুখাচেভস্কির কথা। মনে হল ওদের দুজনের মধ্যে যা হওয়াটা অবধারিত ছিল, তা হয়ে গেছে। বিভীষিকা আর রাগে বুক ফেটে গেল। নিজের সঙ্গে যুক্তির লড়াইতে নামলাম। নিজেকে বললাম, "বাজে কথা, কিছুই হয়নি, কোনকালে কিছু ছিলও না। এটা ভেবে কেন আমি নিজেকে ও তাকে—দুজনকেই নিচু করছি? লোকটা হচ্ছে দুর্নামওলা ভাড়াটে-বাজনদার, আর ও হল ভদ্রঘরের মেয়ে, আমার সন্তানদের জননী, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী! সত্যি, কী বিশ্রী ব্যাপার।" আবার বিপরীত দিক থেকে ভাবলাম, "কেন, না হবার কি আছে?" ওটার জন্যই তো তাকে বিয়ে করেছি, ওই জন্যই তো তার সাথে একত্রে থাকি। ওটাই তো সবাই চায়—এমনকি ঐ নচ্ছার লোকটাও। লোকটা অবিবাহিত, তার ওপর স্বাস্থ্যটাও বেশ, চেহারাটাও মসৃণ; ওর যে কোন নীতিবোধ নেই শুধু তাই নয়, হাতের কাছে সুখের সুযোগ এলেই সেটাকে হাতছাড়া না করাটাই ওর নীতি। তার ওপর আমার স্ত্রী এবং ওই লোকটা সঙ্গীতের বাঁধনে বাঁধা; কামোত্তেজনা জাগাবার এর থেকে আর ভাল উপায় কি আছে? ওকে সংযত করবার কিছুই নেই, এবং উৎসাহ যোগাবার মত অনেক কিছুই রয়েছে। আর আমার স্ত্রী? চিরকালের একটা হেঁয়ালি। ওকে আমি চিনি না, চিনি শুধু ওর ভেতরের পশুত্বটাকে। আর পশু কোন বাধা মানতে রাজি হয়না, সে কিছুতেই সংযত থাকতে পারে না।

'সেদিন সন্ধ্যায় ক্রয়টজার সোনাটা বাজাবার পর ওদের মুখে তীব্র আবেগের ভাবটার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, "কিভাবে আমি চলে আসতে পারলাম? সেদিন সন্ধ্যায় ওদের মধ্যে যা-কিছু ঘটেছিল সেটা কি স্পষ্ট নয়? ওদের মধ্যের ব্যাপারটাতে ওরা নিজেরাই যে লজ্জিত হয়েছিল সেটাও তো স্পষ্টই বোঝা গেছে।" কিন্তু সাথে সাথেই আবার মনে পড়ে গেল তার চরম সুখে ভরা করুণ মুখের হাসি; আমি পিয়ানোর কাছটাতে যাওয়াতে সে কী-ভাবে নিজের লজ্জারুণ মুখের ঘাম মুছে নিয়েছিল। সে সময় তারা পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় এড়িয়ে চলছিল; কিন্তু খাবার সময় লোকটা যখন তাকে জল ঢেলে দিল তখন সে একবার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিল। সেই দৃষ্টি, সেই চকিত হাসির ব্যাপারটা মনে পড়ল। সাথে সাথে ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "সব শেষ।" আবার অন্য একটা স্বর একেবারে অন্য কথা বলল, "নিশ্চয়ই তোমার কিছু একটা হয়েছে; না হলে এমন হতে পারে না।" অন্ধকারে শুয়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য ঠেকল; দেশলাই জ্বাললাম; হলুদ কাগজে মোড়া ছোট্ট ঘরটার ভেতর ভয়ভয় লাগল। সিগারেট ধরিয়ে টেনে চললাম, যাতে অনুভূতিটা ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে যায়, সমস্যাটা চোখে না পড়ে সেজন্য।

'সারারাত বিনিদ্র কাটল। পাঁচটা বাজল, ঠিক করে ফেললাম এ যাতনা সহ্য করা অসম্ভব; এখনই বাড়ি যেতে হবে। আর দেরি করলাম না, চৌকিদারকে ডেকে ঘোড়া আনতে পাঠালাম। বিশেষ জরুরী কাজে মস্কোতে আমায় ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে সম্মেলন কর্তৃপক্ষের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করলাম আমার জায়গায় অন্য কাউকে নির্বাচিত করার। আটটার সময় রওয়ানা দিলাম।'

॥ পঁচিশ ॥

কামরায় কনডাকটর এসে মোমবাতিটা শেষ হয়ে এসেছে দেখে সেটাকে নিভিয়ে দিল, কিন্তু কোন নতুন মোমবাতি জ্বালল না। বাইরে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। কনডাকটর না যাওয়া পর্যন্ত পজ্‌দনীশেভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। সে চলে যাবার পর আবার নিজের কাহিনী বলা শুরু করলেন। আবছা কামরাটার ভেতরে একমাত্র জানলার কাঁচকাঁচ আওয়াজ ও দোকান-কর্মচারীটির নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। পজ্‌দনীশেভকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শুনতে পাচ্ছি তার গলার স্বর; ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ছোঁয়া তাতে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

'ঘোড়ার গাড়িতে পঁয়ত্রিশ ভার্স্ট আর রেলে প্রায় আট ঘণ্টা সময় আমাকে অতিবাহিত করতে হল। হেমন্তের সকাল, আকাশে সূর্যের দীপ্তি, মসৃণ রাস্তা, ঝকঝকে আলো আর প্রাণ জুড়ানো বাতাস। ঘোড়ার গাড়িতে করে আসাটা যে কী চমৎকার! আমার মেজাজটা আগের থেকে অনেক হালকা হল। ঘোড়া, মাঠ-ঘাট আর পথ-চলতি মানুষজনকে দেখতে দেখতে আমি ভুলেই গেলাম যে কোথায় যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বেড়াতে চলেছি; আমার যাত্রার কারণগুলো নিতান্তই কাল্পনিক। যখনই মনে পড়ছিল সে কোথায় চলেছি, তখনই নিজেকে বলছিলাম, "ভাববার কিছু নেই; দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত কী হয়।" মাঝপথে একটা কারণে আরও দেরি হয়ে গেল; গাড়িটা অচল হয়ে যাওয়াতে সেটাকে সারাতে হল, ফলে মনটা আরও বেশি অন্যমনস্ক হল। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়াতে এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরতে পারলাম না, তাই উঠতে হল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে; ভেবেছিলাম পাঁচটার মধ্যে মস্কোতে পৌঁছতে পারব, কিন্তু পৌঁছলাম এসে মাঝ রাতে, আর বাড়ি এলাম রাত বারটার পর। আসার পথে গাড়ি খোঁজা, মেরামত করা, তিসেবনিকেশ মেটানো, সরাইখানায় চা পান, জমাদারের সঙ্গে কথাবার্তা—এসবের মধ্যেই আটকে রইল মনটা। সন্ধ্যার মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক হলে আবার যাত্রা শুরু হল, এবং সেটা সকালের থেকেও বেশি আনন্দদায়ক লাগল। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, ঝিরঝির বরফ পড়ছে, চমৎকার রাস্তা, বেশ তেজী ঘোড়া, ফূর্তিবাজ সহিস—সব মিলিয়ে মারাত্মক ভাল লাগছিল, আর কপালে কি আছে তা নিয়ে মোটেই ভাবছিলাম না; কিংবা হয়ত কপালে কি আছে তা জানতাম বলেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে নিচ্ছিলাম, চিরকালের জন্য বিদায় নিচ্ছিলাম জীবনের সব রকম আনন্দের কাছ থেকে। কিন্তু এই অনুভূতিকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা ঘোড়ার গাড়ির যাত্রা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে গেল। রেলের কামরায় প্রবেশের মুহূর্তেই একেবারে নতুন একটা অনুভূতি আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন রেলের আট ঘণ্টার সেই যাত্রার যন্ত্রণার স্মৃতিটুকু কিছুতেই ভুলতে পারব না। যন্ত্রণার কারণ ছিল সম্ভবতঃ কামরায় ঢোকার সাথে সাথেই মনে হয়েছিল যে হয়ত বাড়িতেই পৌঁছে গেছি; কিংবা এমনও হতে পারে, রেলভ্রমণ লোকের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তোলে। কারণ যাই থাক না কেন, কামরায় বসার পর আর আমি আমার কল্পনার রাশ টেনে রাখতে পারলাম না, আমার ঈর্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম এমন একটার পর একটা উত্তেজক ছবি এসে চোখের সামনে

ভিড় করতে লাগল। তার প্রত্যেকটাই আমার স্ত্রী আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কী ভয়ঙ্কর ব্যভিচার করেছে সে সম্পর্কীত। রাগে, হিংসায় বুকটা জ্বলে যাচ্ছিল। ছবিগুলো সম্পর্কে যতই ভাবছিলাম ততই যেন সেগুলো আরও বাস্তব হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন শয়তান ভয়াবহ সব মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে। ক্রশাচেভস্কির ভাইয়ের সঙ্গে অনেক বছর আগের একটা আলোচনার কথা আমার মনে পড়ল, সেই আলোচনাটার সাথে ক্রশাচেভস্কি ও আমার স্ত্রীকে জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর দানবিক উল্লাসে নিজের হৃদয়টাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলাম।

'আলোচনাটা হয়েছিল বহু বছর আগে, তবু সেটা সেদিন মনে পড়ে গেল: একদিন ক্রশাচেভস্কির ভাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সে কখনও পতিতালয়ে যায় কিনা; তার উত্তরে সে বলেছিল ভদ্রলোকেরা পতিতালয়ে যাবে কোন দুঃখে, সমাজে ভদ্রঘরের মেয়ের তো আর আকাল শুরু হয়নি। তা ছাড়া ওখানে রয়েছে রোগের ভয়, তার ওপর জায়গাটা সত্যিই নোংরা আর জঘন্য। সেই লোকটার ভাই ই শেষ পর্যন্ত আমার বউকে বাগালো! আমি নিজেকেই নিজে বললাম, "অবশ্য এটাও ঠিক, এখন আর প্রথম যৌবন নয়, পাশে একটা দাঁত পড়ে গেছে, তার ওপর একটু বেশি রকমের মোটা; কিন্তু কি আর করা যাবে, যার কপালে যা জোটে!" নিজেকে বললাম, "আমার বউকে রক্ষিতা হিসেবে রেখে ও তো ভালই করেছে। কিন্তু ওর কাছ থেকে তো কোন রোগ হবার আশঙ্কা নেই তো!" তারপর আতঙ্কের সাথে মনের গভীরে নিজেই চেঁচিয়ে উঠলাম, "না, না, এ অসম্ভব! এসব কী ভাবছি আমি। ও রকম কিছু ঘটেনি; ঘটা সম্ভব নয়। ও তো বলেছে যে এরকম একজন লোকের প্রতি আসক্ত হওয়ার কথা চিন্তা করাটাও ওর পক্ষে অপমানকর! হ্যাঁ, বলেছিল ঠিকই, তবে সেটা নিতান্তই মিথ্যে কথা।" —কামরায় তখন আর মাত্র দুজন যাত্রী—একটি বৃদ্ধা ও তার স্বামী; তারা দুজনেই ছিলেন খুবই স্বল্পভাষী। একটা স্টেশনে তারা নেমে গেলেন; তখন কামরায় মাত্র আমি একা; আমার অবস্থা তখন একটা খাঁচায় পোরা পশুর মত! এক একবার লাফিয়ে লাফিয়ে জানলার কাছে যাচ্ছি, তারপরই পায়চারি করতে শুরু করছি এমনভাবে যেন তাতেই ট্রেনের গতি বেড়ে যাবে: কিন্তু জানলা আর বেঞ্চগুলো নিয়ে ট্রেনটা তার নির্ধারিত বেগেই এগিয়ে চলল, যেমন এখন এই ট্রেনটা চলেছে।'

পজ্‌দনীশেভ লাফিয়ে উঠে দু একবার পাক খেয়ে আবার এসে বসলেন নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটাতে। তারপর বলতে লাগলেন, 'রেলে করে যেতে আমার সব-সময়েই খুব ভয় লাগে, ভয়ানক ভয়। তাই সেদিন নিজেকে বলেছিলাম, "এখন অন্য কোন কথা ভাবি, যেমন যেখানে চা খেয়েছিলাম সেই সরাইখানার মালিকের কথাটা।" সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল জমাদার ও তার বাচ্চা নাতিটা। নাতিটার বয়স আমার ভাসিয়ার মতই। সেই ভাসিয়াই একদিন দেখবে যে ওই বাজনদারটা তার মাকে চুমু খাচ্ছে! তখন তার মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে। তাতে তো তার মায়ের কিছু যাবে আসবে না। উনি যে প্রেমে পড়েছেন···আবার সেই একই জিনিস এসে জড়ো হতে থাকে মাথার ভেতর। না, না, এভাবে চলতে পারে না, সেই স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শনের কথাটা ভাবা যাক। রুগীটা কেন ডাক্তারের নামে নালিশ করল? ডাক্তারটার গোঁফটা ঠিক

ক্রশাচেভস্কির মতই। আবার শুরু হল! যাই ভাবতে যাই না কেন তার প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গেই ওদের যোগাযোগ বেরিয়ে পড়ছে। অসহ্যকর যাতনা। আমার অজ্ঞতা, আমার সন্দেহ আমার অনিশ্চয়তা—ওকে ভালবাসা উচিত কি উচিত নয় এইসব চিন্তা আমাকে কুরেকুরে খেয়ে চলে। যন্ত্রণাটা এত ভয়ঙ্কর লাগছিল যে মনে আছে রেল লাইনের ওপর শুয়ে পড়ে সবকিছু শেষ করে দেবার চিন্তাটা মাথায় আসতেই খুব ভাল লেগেছিল। তাহলে তো অন্ততঃ সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা এভাবে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারবে না। কিন্তু একটা জিনিস এ কাজ করা থেকে আমাকে বাধা দিল—তা হচ্ছে আমার আত্ম-করুণা। লোকটার ওপর আমার ঘৃণার মূল কারণ ছিল আত্ম-অবমাননা আর ও জয়লাভ করে যাবে—এই অসহনীয় চিন্তাটা। তবে স্ত্রীর ওপর যে ঘৃণা ছিল সেটা ছিল একেবারেই ভয়ানক গোছের। তাই মনে মনে বললাম, "কিছুতেই আত্মহত্যা করব না, তা হলে তো ও পারই পেয়ে যাবে; আমি যে যন্ত্রণা পাচ্ছি সেটা ওকে টের পাওয়াবই।" চিন্তার মোড় ঘোরাবার জন্য প্রতিটি স্টেশনে একবার করে নামলাম। একটা স্টেশনের রেস্তোরায় কয়েকজনকে মদ খেতে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কিছুটা ভদকা খেলাম। পাশে একটা ইহুদী দাঁড়িয়ে ছিল, সেও মদ খেল। দু জনে কথা বলতে শুরু করলাম; শেষে যাতে আর একলা থাকতে না হয় সে কারণে ওর সাথে গিয়ে উঠলাম একটা নোংরা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। ওর পাশে বসে ওর বকবকানি শুনে চললাম; কিন্তু নিজের চিন্তাতেই মনটা ভরে থাকাতে ওর একটাও কথা অমার মগজে ঢুকল না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও চেষ্টা করল আমার মন আকর্ষণ করতে। বিরক্ত হয়ে আবার নিজের কামরায় ফিরে এলাম। নিজেকে বললাম, "ভেবে দেখা দরকার যা ভাবছি সেটা সত্যি কিনা, যে যন্ত্রণা পাচ্ছি তা পাবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কিনা।" ধীরে সুস্থে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তা আর হল না—সেই একই জিনিস এসে মাথার মধ্যে ভিড় করল। যুক্তির বদলে ছবি আর কল্পনা ছেয়ে ফেলল মনটাকে। আগেকার ঈর্ষার কথা ভেবে বললাম, "এর আগে তো কতবারই এ রকম কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখেছি শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিছুই নয়। এবারেও গিয়ে দেখব হয়ত সে শান্তিতেই ঘুমোচ্ছে, জেগে উঠে আমায় দেখতে পেয়ে খুশি হবে, ওর দৃষ্টি দেখে বুঝব যে কিছুই হয়নি, সবই আমার মানসিক কল্পনা। উঃ, তাহলে কী দারুণ ভালটাই না লাগবে।" সঙ্গে সঙ্গে কার কণ্ঠস্বর যেন বলে উঠল, "না, যদিও আগে বহুবার ওরকম হয়েছে, তবে এবার আর তা মোটেই হবে না।" ফলে আবার শুরু। লাওসাকে সারিয়ে তোলবার জন্য আমি ওদের সিফিলিস হাসপাতালে নিয়ে যাব না; দেখিয়ে দেব আমার অন্তরের ভেতরটা, অন্তরটা যারা ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখিয়ে দেব সেই শয়তানদের! আর সব থেকে বড় কথা হল এই, আমার স্ত্রীর দেহের ওপর একমাত্র আমারই রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, না, তা নয়, তার দেহ সে যেভাবে খুশি বাঁটোয়ারা করতে পারে, যাকে খুশি দিতে পারে—আর সত্যি বলতে কি আমি যেভাবে চাই সেভাবে দেবার ইচ্ছে ওর মোটেই নেই। তাছাড়া ওর কিংবা ওই লোকটার এতটুকু ক্ষতি করার ক্ষমতাও আমার নেই। লোকটা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাবার পথেও হয়ত চুমু খাওয়ার কোন গান গাইতে শুরু করে দেবে; ফলে জয় হবে তারই। তাছাড়া নিজের স্ত্রীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার

আরও কম। হয়ত সে এখনও কোন পাপ করেনি, তবে করার ইচ্ছে পুরোমাত্রায় আছে। আমি জানি ব্যাপারটা, তাই সেটা আমার কাছে আরও খারাপ লাগে। ও যা মনে আসে করুক, কিন্তু সেটা আগে থাকতে আমার জানা থাক; কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি থাকতে চাই না। কী যে চাইছিলাম তা বলতে পারব না। যেটা না চেয়ে ওর উপায় নেই, সেটা যাতে না চায়—সেটাই আমি চাইছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে একটা আস্ত পাগলামি।'

॥ ছাব্বিশ ॥

'শেষ স্টেশন আসার একটু আগে কনডাকটর টিকিট চাইতে এল, ব্যাগটা হাতে নিয়ে মাঝখানের জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় এসে পড়েছি, যবনিকা পতনের সময় হয়ে এসেছে এই চিন্তাটা আমার মনের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিল। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে চিবুকে এত বেশি কাঁপুনি শুরু হল যে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগল। ভিড়ের তালে তালে বাইরে এসে একটা গাড়ি ডেকে উঠে বসলাম। যেতে যেতে নজরে এল রাস্তায় মাত্র কয়েকটি লোক আর জমাদার রয়েছে। পথের পাশের বাতি দানির আলো ছিটকে এসে পড়ছে গাড়ির সামনে পেছনে। কিছুটা যাবার পর পায়ে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল; মনে হল ট্রেনে উলের মোজাটা খুলে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। ব্যাগটা কোথায় গেল? আর ঝুড়িটা? মালপত্রের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, এবার মনে পড়ল: কিন্তু রসিদটা খুঁজে পেয়ে ভাবলাম আবার এখনই স্টেশনে ফিরে যাবার কোন মানে হয় না; সুতরাং এগিয়ে চললাম।

'তখন আমি কি ভাবছিলাম? কি চাইছিলাম? সঠিক বলতে পারব না, তবে মনে আছে আমার জীবনে ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এ চিন্তা আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ওই ভাবনার ফলেই সেই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ঘটেছিল কিনা তা অবশ্য আমার পক্ষে বলা মোটেই সম্ভব নয়। কিংবা এমনও হওয়া সম্ভব, চূড়ান্ত ঘটনাটা ঘটে যাবার পরই আমার স্মৃতিতে আগেকার সব ঘটনাই বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির চত্বরে যখন ঢুকলাম তখন বারোটা বেজে গেছে। জানলায় আলো দেখে সওয়ারির আশায় বাড়ির সামনে কয়েকটা ছ্যাকরা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে (আমারই বৈঠকখানা আর বড় ঘরের জানলায় আলো জ্বলছে)। এত রাতে ঘরে আলো জ্বলছে কেন তা না ভেবেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ঘন্টা বাজালাম; আশা, হয়ত ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। বোকাসোকা ভালমানুষ আমার চাকর ইয়েগর এসে দরজাটা খুলে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল অন্যান্য ওভারকোটের সঙ্গে সেই লোকটার কোটটাও বারান্দায় ঝুলছে। ব্যাপারটা দেখে অবাক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হলাম না; কারণ আমি যেন এটারই প্রত্যাশা করছিলাম। মনে মনে বললাম, "তাহলে সব ঠিকই ভেবেছিলাম" ইয়েগরকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ক্রুখাচেভস্কি-ই এসেছে। আর কেউ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, "না হুজুর, আর কেউ নেই।"

'কথাটা ও এমন সুরে বলল যে আর কেউ থাকার সন্দেহটা যেন মুক্ত হয়ে যায় আমার মন থেকে। আমি নিজেকে বললাম, "আর কেউ নেই: বেশ, ভালই।"

'জানতে চাইলাম, "বাচ্চারা?"

'সে জবাব দিল, "ঈশ্বরের দয়ায় সবাই ভাল আছে। অনেকক্ষণ

ঘুমিয়ে পড়েছে।"

'নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার: চিবুকের কাঁপুনিকেও আটকাতে পারছিলাম না। ভাবলাম, "তাহলে যা ভেবেছিলাম, তা নয়। আগে ভাবতাম মারাত্মক কিছু হবে; কিন্তু তা হত না। এবার একেবারে অন্যরকম: মনে মনে যা কল্পনা করেছিলাম সেটা কল্পনাই রয়ে গেছে, বরং এটাই আজ বাস্তব।"

'প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠতে গেলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে পিশাচ কানে কানে বলে উঠল "তুমি কেঁদে কেটে পাড়া মাথায় তুলবে আর ওরা সেই ফাঁকে পাপের কোন চিহ্ন না রেখে চুপি চুপি সরে পড়বে, আর তারপর তুমি চিরটাকাল সন্দেহের জ্বালায় জ্বলে মরবে?" সাথে সাথে আমার মনে আত্ম করুণার অবলুপ্তি ঘটে এক নতুন অনুভূতির আবির্ভাব হল। সে অনুভূতির আনন্দ যে কী তা আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব না। অনুভব করলাম, এবার ওকে শাস্তি দিতে পারব, ওকে সরাতে পারব, আমার যন্ত্রণা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে, আমি নিজেকে বিদ্বেষের হাতে ছেড়ে দিতে পারব। আর সত্যি সত্যিই তাই করলাম—বিদ্বেষের বশে একেবারে একটা হিংস্র পশুতে পরিণত হয়ে গেলাম।

'ইয়েগরকে বৈঠকখানায় যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই ওকে বললাম, "দাঁড়াও, এই রসিদটা নিয়ে স্টেশনে গিয়ে মালপত্রগুলো নিয়ে এস। একটা গাড়ি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাও। এক্ষুণি—'

'বারান্দা পার হয়ে নিজের কোট আনতে গেল ইয়েগর। ও ওদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে আশঙ্কা করে ওর পিছে পিছে গেলাম; ওর কোট পরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ভেতর থেকে কানে এল নিচু-স্বরের আলাপ, ছুরি ও প্লেটের ঠুনঠুন আওয়াজ। বুঝলাম, ওরা খাচ্ছে, দরজার শব্দ ওদের কানে যায়নি। ভাবলাম, "ওরা যেন এখন না বেরিয়ে আসে।" ইয়েগর কোটটা পরে চলে গেল। ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সেটাকে বন্ধ করে দিলাম। এবার আমি একলা—এবারই একটা মারাত্মক কিছু করতে হবে ভেবে মনে ভয় ধরে গেল। তখনও ঠিক করতে পারছিনা কাজটা কিভাবে করব। শুধু বুঝতে পারছি, সবকিছু শেষ হয়ে যাবার সময় হয়েছে। এখন ও যে নির্দোষ সে কথাটা আর ওঠেই না। ওকে শাস্তি দেবার, ওর সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে।

'আগে বারবার ইতস্তত: করেছি, বারবার নিজেকে বলেছি, 'না এটা সত্যি নয়, এটা হয়ত আমার নিজেরই মনের ভুল।' কিন্তু এবার আর কোন দ্বিধা নেই, নেই কোন সন্দেহ। সবকিছু চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমাকে লুকিয়ে সারারাত ধরে ওর সাথে একা একা! কোনরকম সাবধানতাকেও ও আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। কিংবা এটা হয়ত ইচ্ছাকৃতই; কারণ ও হয়ত দেখাতে চাইছে যে ওর কোন দোষ নেই। আজ সবকিছুই জলের মত পরিষ্কার, আর কোন সন্দেহ নেই। শুধু ভয়, কোনরকমে যেন পালিয়ে যেতে না পারে, কোনরকম ফন্দি এঁটে যেন আমার হাত থেকে শাস্তিদানের এই মহা সুযোগটাকে ছিনিয়ে না নেয়। সুতরাং ওদেরকে হাতেনাতে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা ঘরটার বদলে বারান্দার ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে খুব আস্তে আস্তে এগোলাম বড় ঘরটার দিকে, যেখানে ওরা বসে রয়েছে।

'বাচ্চাদের প্রথম ঘরটায় ছেলেরা ঘুমন্ত। দ্বিতীয় ঘরে আয়াটা সামান্য নড়ে

চড়ে উঠল। সবকিছু জানতে পারলে সে কি ভাববে সেটা ভেবে আমার মধ্যে এমন মারাত্মক আত্ম-করুণা জেগে উঠল যে চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না। পাছে বাচ্চারা জেগে ওঠে সেই ভয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে বারান্দাটা পার হয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে ধপাস্ করে সোফাটাতে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

'মনে মনে বললাম "বাবা-মার সন্তান আমি, খুবই সৎ; সারাটা জীবন একটা সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছি; আমি ওর স্বামী, অজান্তেও ওকে কখনও ঠকাইনি—আর ও পাঁচ ছেলের মা হওয়ার পরও কিনা শেষ পর্যন্ত একটা বাজনদারের কণ্ঠলগ্না হল! ও মানুষ নয়, কুত্তী, একেবারে একটা লেডি কুত্তী! পাশের ঘরেই বাচ্চারা শুয়ে রয়েছে—ওদেরকে ভালবাসার কী ভানটাই না করে এসেছে এতদিন, আর চিঠিতেও তো লিখেছে কত কথা। অথচ এমন বেহায়ার মত লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি তো? হ্যাঁ, বরাবরই ও এরকম করে এসেছে। হয়ত চাকরবাকরদের ঔরসে বাচ্চার জন্ম দিয়ে সেগুলোকে আমার বাচ্চা বলেই চালিয়ে যাচ্ছে। কাল যদি বাড়ি ফিরতাম তবে সে আমাকে অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে মধুর হেসে আপ্যায়িত করত আমাকে, আর আমার বুকে লুকিয়ে থাকা ঈর্ষার কালসাপটা যতই দিন যেত ততই আমাকে বিষিয়ে তুলত। জায়া কী ভাবল! তাছাড়া ইয়েগর! আর লিজা! মনে হয় ও কিছু টের পেয়েছে নিশ্চয়! উঃ কী নির্লজ্জতা! কী পশুর মত লালসা!"

'উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। বুকটা এত বেশি ধুকধুক করছিল যে আমার পক্ষে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোই অসম্ভব হয়ে উঠল। ভাবলাম, হঠাৎই মারা যাব; ও আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। ও তো তাই চায়। ও কি আমাকে খুন করবে? তবে তো পারই পেয়ে গেল। না, সে আনন্দ অনুভব করতে ওকে দেব না। একি, আমি এখানে বসে আছি, আর ওরা ওখানে খাচ্ছে, গল্প করছে, হাসছে···হ্যাঁ, ও একেবারে আনকোরা জিনিস নয় ঠিকই, তবে ওকে ভোগ করতে লোকটা একটুও ইতস্ততঃ করবে না। আর চেহারাটাও তো ওর খুব একটা খারাপ নয়। তাছাড়া সব থেকে বড় কথা হল আমার স্ত্রী তার দামী শরীরটার কোন বিপদ ঘটাবে না। গত সপ্তাহে তাকে পড়ার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম, জিনিসপত্র ভেঙেছিলাম, সেই কথা মনে হওয়াতে নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, "তখনই ওকে মেরে ফেললাম না কেন?" সে সময়ে আমার মানসিক অবস্থা যা ছিল সে কথা মনে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে আবার সবকিছু তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হল, আবার সবকিছু ভাঙবার বাসনা জাগল অন্তরে। তখন ভয়ঙ্কর কিছু একটা করার ইচ্ছে ছাড়া আর সব চিন্তাই মাথা থেকে লোপ পেয়ে গেল। আমার মনের অবস্থা তখন ঠিক সেই জন্তু কিংবা মানুষের মত যে বিপদের সময় এতটুকু তাড়াহুড়া না করেই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে চলে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য।

॥ সাতাশ ॥

'জুতো খুলে শুধু মোজা পায়ে সোফার কাছটায় গেলাম; তার পেছনে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা বন্দুক, আর একটা ছোরা। ছোরাটা এর আগে আর কখনও ব্যবহার করা হয়নি, ফলে সেটায় প্রচণ্ড ধার। খাপ থেকে বের করলাম সেটাকে। মনে আছে বের করতে গিয়ে খাপটা পেছন দিকে পড়ে গেল। তখন বলেছিলাম, "ঠিক আছে, পরে কুড়িয়ে নেব ওটাকে, নইলে হারিয়ে যাবে।" তারপর

ওভারকোটটা খুলে রেখে মোজা পায়ে, এগোলাম।

'নিঃশব্দে এগিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেললাম। ওদের মুখটা দেখে একটা যন্ত্রণাময় আনন্দে বুকটা টনটন করে উঠল। ওদের মুখে তখন বিভীষিকার ভাব; আমি সেটাই চেয়েছিলাম। সেই মরিয়া ভাবটা আমার চিরকাল স্মরণে থাকবে। লোকটা সম্ভবতঃ টেবিলের পাশটাতে বসেছিল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই এক লাফে উঠে আলমারির দিকে পিঠ রেখে দাঁড়াল। তার মুখটা বিভীষিকায় পরিপূর্ণ; তবে আমার স্ত্রীর মুখে বিভীষিকার সঙ্গে আরও একটা কিছু ছিল: আর সেটা হল প্রেম করার সুখে বাধা পড়ার বিরক্তি। ও আর কিছুই চাইত না, শুধু যাতে বাধা না আসে সেটাই ছিল ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ভাবটাও রইল ক্ষণিকের জন্য। লোকটার মুখে বিভীষিকার ভাব কেটে গিয়ে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। অর্থাৎ সে ভাবল মিথ্যে বলা সম্ভব কিনা; আর যদি সম্ভব হয় তো এক্ষুণি শুরু করা দরকার। না হলে অন্য কিছু ঘটবেই। কিন্তু সেটা কি? আমার স্ত্রীর দিকে তাকাল সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। লোকটার দিকে তাকাবার পর আমার স্ত্রীর মুখ থেকে হতাশা আর বিরক্তি অন্তর্হিত হল, এবার এল তার জন্য উৎকণ্ঠার ভাব। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল সেদিন।

'ছোরাটা পেছনে রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম দোরগোড়ায়। সে সামান্য হেসে নির্বোধের মত বলল, "আমরা একটু বাজাচ্ছিলাম।"

'ওর গলার সুরে সুর মিলিয়ে আমার স্ত্রী বলল, 'একেবারে ভাবতেই পারিনি ...'

'কিন্তু কেউই কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। গত সপ্তাহের সেই প্রচণ্ড রাগে আমি তখন আচ্ছন্ন— আবার সেই ভাঙচোরার তাড়না—আমি নিজেকে সেই উন্মত্ততার হাতে সঁপে দিলাম।

'দুজনের একজনও কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। যেটা ঘটবে বলে ভাবছিল সেটা ঘটতে শুরু করেছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্ত্রীর ওপর। তার স্তনের নিচে বুকের কাছে সেটা বসাতে যাতে লোকটা বাধা দিতে না পারে সেজন্য ছোরাটা পেছনে লুকোনো। প্রথম থেকেই জায়গাটা নির্বাচন করে রেখেছিলাম। কিন্তু লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ছোরা দেখতে পেয়ে আমার হাতটা ধরে ফেলল: এটা যে হবে তা আমি আগে ভাবিনি। সে চিৎকার করে উঠল, "করছেন কী আপনি, পাগলামি ছাড়ুন! বাঁচাও!"

'এক ঝটকায় হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। চোখাচোখি হল, ঠোঁটটা ওর সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে, তবু পিয়ানোর নিচ দিয়ে ঢুকে দরজার দিকে ছুটল। এমন হবে তা ভাবিনি। ওর পেছনে ধাওয়া করতাম কিন্তু বাঁহাতে প্রচণ্ড ভার থাকায় তা হলনা। আমার স্ত্রী আমাকে আঁকড়ে ধরে যেতে দিল না। এমন অপ্রত্যাশিত বাধায়, ওর স্পর্শে ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। বুঝলাম উন্মাদ হয়ে গেছি; নিজেকে যে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তারজন্য মনে মনে খুশিই হলাম। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কনুই দিয়ে সোজা মারলাম ওর মুখে; সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সে হাতটা ছেড়ে দিল। ভাবলাম লোকটার পিছু ধাওয়া করি, কিন্তু মোজা পায়ে স্ত্রীর নাগরের পেছনে দৌড়নোটা খুবই হাস্যকর হবে চিন্তা করে আত্ম সম্বরণ করলাম। আমি হাস্যকর হতে চাইছিলাম না, চাইছিলাম ভয়ঙ্কর হতে। অমন

উন্মত্ত অবস্থায় ওদের ওপর আমার যে প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছিল সে ব্যাপারে সবসময় সজাগ ছিলাম। ওর দিকে ফিরে দেখলাম যে চোখটায় মেরেছি সেটায় হাত দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ও সোফায় পড়ে রয়েছে। ইঁদুর ধরা পড়ার পর কলটা তুলে ধরলে তার মুখে যে ছাপ আসে ওর মুখেও তাই। আমি ওর মুখে সেই ধরনের ভয় আর ঘৃণা, যার অর্থ অপর পুরুষের প্রতি ভালবাসা, তা ছাড়া অন্য কিছুই দেখলাম না। তবু ও যদি চুপ করে থাকত তাহলেও হয়ত আমি আত্মসংযম করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু হঠাৎ ও আমার যে হাতে ছোরাটা ছিল সে হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল, "তুমি কী করছ? পাগলামি বন্ধ কর। তোমায় ছুঁয়ে বলছি, কিছু করিনি আমরা, কিছু না।"

'হয়ত একটু ইতস্ততঃ করতাম, কিন্তু ওর শেষ কথাগুলোর মানে দাঁড়াল, সবই ঘটেছে; সুতরাং উত্তর একটা দিতে হবেই। আর সে উত্তরটা হতে হবে আমি নিজেকে যেভাবে চরম অবস্থার দিকে নিয়ে চলেছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ উন্মত্ততার তো একটা নিজস্ব নিয়ম আছে।

'চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মিথ্যে কথা, খানকী কোথাকার।' বাঁ হাত দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম, কিন্তু ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তখন ছোরাটাকে ডান হাতে চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ওর টুঁটি চেপে ধরে ওকে চিৎ করে ফেলে গলায় যত জোরে পারলাম চাপ দিতে লাগলাম। উঃ কী শক্ত গলা! টুঁটি ছাড়িয়ে নেবার আশায় ও দু হাত দিয়ে আমার হাতটাকে চেপে ধরল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে, যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম, তাই করলাম—প্রাণপণে বুকের বাঁ দিকটায়, পাঁজরের ঠিক নিচে ছোরাটাকে সজোরে বসিয়ে দিলাম।

'লোকে যে বলে থাকে রাগের মাথায় মানুষ কী করছে তার কোন খেয়ালই থাকে না, সেটা একেবারে মিথ্যে কথা, বাজে কথা। আমার প্রতিটি কথা মনে আছে, একটাও ভুলিনি। প্রচণ্ড রাগে মনের মধ্যে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়েছিল, আমার চেতনাও ঠিক ততটাই ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছিল, তাই যা করছিলাম তার কোনটাই চোখে না পড়ে কোন উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তেই জানতাম, কী করছি। যা করব সেটা যে আগে থাকতেই জানতাম তেমন কথা জোর করে বলতে পারি না, তবে ঠিক সেই মুহূর্তে যে কী করে চলেছি তা ভাল করেই বুঝতে পারছিলাম; আর সম্ভবতঃ একটু আগেই তা জেনে গিয়েছিলাম, আর জেনেছিলাম বোধহয় এ কারণেই যে এই জঘন্য কাজটার জন্য যেন পরে এ ভেবে একটু অনুশোচনা করতে পারি যে, আমি তখন চেষ্টা করলে হয়ত থেমেও যেতে পারতাম। জানতাম পাঁজরার নিচটাতেই ছোরাটাকে বসাব। আবার ছোরা বসাবার মুহূর্তেও বুঝতে পেরেছিলাম যে এখন এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার করছি যা আগে কোনদিন করিনি, আর এর পরিণাম হবে খুবই সাংঘাতিক। বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে ঝলকে উঠেছিল চেতনার ঝিলিক আর তার পরমুহূর্তের সমাধা হল কাজ। সে কাজের উপলব্ধি অসম্ভব রকমের স্পষ্ট। মনে আছে, অন্তর্বাস আর অন্য কি একটা বস্তুর সামান্য প্রতিরোধ অনুভব করেছিলাম, কিন্তু তারপরই নরম মাংসে অতি অনায়াসে ঢুকে গেল ফলাটা। দুহাত দিয়ে ছোরাটাকে চেপে ধরল সে, হাত কেটে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। পরে জেলে থাকার সময়, যখন আমার নৈতিক রূপান্তর ঘটে গেছে তখন বহুবার সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা ভেবেছি, চেয়েছি সবটা তলিয়ে

দেখতে। একটি মহিলাকে হত্যা করছি, একটি অসহায় মহিলাকে, আমার নিজের স্ত্রীকে—এই ভয়ঙ্কর চেতনাটা যে কর্ম সমাপনের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা আমার মনে আছে। তখন ছুরিটা বসে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটাকে টেনে বের করে এনেছিলাম এই ইচ্ছায় যে এবার ক্ষান্ত হই, কৃতকর্মকে শোধরাই। একমুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম যা ঘটে গেছে সেটাকে দেখার জন্য, সেটাকে শোধরাবার জন্য। ও লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিল, 'আয়া, আমাকে ও মেরে ফেলল।'

'শব্দ শুনেই আয়া দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম, অপেক্ষা যে করছি তা আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। হঠাৎ ওর অন্তর্বাসের ভেতর থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, আর শোধরাবার প্রয়োজন নেই, যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। ও পড়ে গেল। আয়া "হে ভগবান" বলে চিৎকার করে ছুটে এল ওর কাছে, আর আমি ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

'ওর ঘ' আয়ার দিকে না তাকিয়ে নিজেকে বললাম, "এখন আর উত্তেজিত হলে চলবে না, যা করেছি সেটাকে ভেবে দেখতে হবে।" আয়া চিৎকার করে ঝিকে ডাকছিল, আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "এখন কি করতে হবে?" উত্তর পেলাম তক্ষুণি। দেওয়ালের কাছটায় রাখা রিভলভারটা নামিয়ে নিয়ে, তাতে টোটা ভরা আছে কিনা দেখে সেটাকে লেখবার টেবিলটার ওপর রাখলাম। তারপর সোফার পেছনে পড়ে যাওয়া ছোরার খাপটা তুলে নিয়ে সোফার ওপর বসে পড়লাম।

'অনেকক্ষণ এভাবে কাটল। কিছুই ভাবলাম না, আর কিছু মনেও পড়ল না। শুনলাম গাড়ির আওয়াজ, সোরগোল। দেখলাম, ইয়েগর আমার মাল নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ মালপত্রে এখন দরকারটাই বা কি!

'ওকে বললাম, "কি ঘটেছে শুনেছ কি? দারোয়ানকে বল পুলিশে খবর দিতে।"

'একটাও কথা না বলে ও বেরিয়ে গেল। উঠে দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরিয়ে টান দিতে শুরু করলাম। সেটা শেষ না হতেই ঘুম এসে গেল। বোধহয় ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়েছিলাম। মনে আছে স্বপ্ন দেখছিলাম, ওর আর আমার মধ্যে ঝগড়ার পর আবার ভাব হয়ে গেছে। দরজায় কেউ ধাক্কা দেওয়াতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে মনে হল, "পুলিশ এসেছে।" তারপর ভাবলাম, "হয়ত কিছুই ঘটেনি, তাই ও নিজেই এসেছে।" আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল, তবু খুললাম না। ভাবতে লাগলাম, সত্যিই কি ব্যাপারটা ঘটেছে, নাকি ঘটেনি? মনে হল, হ্যাঁ, ঘটেছে। ওর সেই অন্তর্বাসের বাধা, তারপর ছোরাটার বসে যাওয়া! শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল; মনে মনে বললাম, "এবার আমার পালা।" কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। তবু উঠে রিভলভারটা হাতে নিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, মনে পড়ে গেল পুরনো স্মৃতি। কতবার যে ভেবেছি আত্মহত্যা করব, এই তো কালই ট্রেনে আসতে আসতে ভাবছিলাম। মনে হত ব্যাপারটা সহজ, কারণ তাতে ওকে শাস্তি দেওয়া যেত; কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন আত্মহত্যা করব?" জবাব পেলাম না। আবার দরজায় ধাক্কা

হল। ভাবলাম, "প্রথমে দেখা যাক দরজায় ধাক্কাটা দিচ্ছে কে, তারপর নয় আত্মহত্যা করা যাবে।" রিভলভারটাকে কাগজ দিয়ে চাপা দিলাম, তারপর খিল খুললাম। দেখলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সহৃদয়া সরল-সিধে বিধবা শালী।

'চোখের জলের বাঁধকে উন্মুক্ত করে সে জিজ্ঞেস করল, 'ভাসিয়া, এ তুমি কি করেছ?"

রূঢ় হওয়ার কোন দরকার নেই জেনেও রূঢ়ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে তোমার কি চাই?"

' "ভাসিয়া, ও তো প্রায় মরতে বসেছে। ইভান ফিওদরভিচ তাই বললেন।"

'ফিওদরভিচ আমার স্ত্রীর ডাক্তার, তার পরামর্শদাতা।

'জিজ্ঞেস করলাম, "ও, তিনিও এসেছেন নাকি?" বুঝলাম, স্ত্রীর প্রতি রাগটা আবার চড়তে শুরু করেছে। বললাম, "কিন্তু তাতে আমার কি?"

'সে বলল, "লক্ষ্মীটি, একবার ওর কাছে যাও। উঃ, কী ভয়ঙ্কর।"

'নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর কাছে যাব?" উত্তর পেলাম: হ্যাঁ, যাওয়াটা উচিত; নিজের স্ত্রীকে খুন করলে যাওয়াটা খুবই দরকার। নিজেকে বললাম, "যদি তাই হয়, তবে যেতেই হবে। আর প্রয়োজন পড়লে আত্মহত্যার জন্যও যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। এখন কত মুখ বিকৃতিই না দেখব, কিন্তু তাতে আমি মোটেও টলছি না।" তারপর শালীকে বললাম, "একটু দাঁড়াও, মোজা পায়ে গেলে লোকে হাসবে। অন্ততঃ চটিজোড়াটা পরে নিতে দাও।"

॥ আঠাশ ॥

'আশ্চর্য ব্যাপার! ঘর থেকে বার হয়ে পরিচিত কামরাগুলোর মধ্য থেকে যেতে যেতে আবার মনে হল যে, না কিছুই ঘটেনি। কিন্তু আয়োডোফর্ম, কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি ডাক্তারী শয়তানির বিশ্রী গন্ধে বিস্মিত হলাম। বুঝলাম, কিছু একটা ঘটেছে। বাচ্চাদের পড়ার ঘরে লিজাকে দেখলাম; ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। মনে হল আমার পাঁচটি সন্তানই সেখানে রয়েছে, সকলেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। দরজায় পৌঁছতে ঝি দরজা খুলে দিয়ে বার হয়ে গেল। চোখে পড়ল রক্তে ভিজে সাদা জামা কালো হয়ে গেছে। আমি খাটের যে দিকটায় শুতাম সেখানে সে হাঁটু মুড়ে শুয়ে আছে। গায়ের জ্যাকেটটা খুলে ফেলা হয়েছে, ক্ষতের ওপরটায় কী যেন একটা চাপা দেওয়া। সারা ঘর আয়োডোফর্মের তীব্র গন্ধে ভরে গেছে। সব থেকে আশ্চর্য হলাম ওর গাল, নাকের কিছুটা, আর চোখের কাছটার ফোলা দেখে। আমার কনুইয়ের আঘাতে এটা হয়েছে। এখন ওর চেহারায় সৌন্দর্যের কিছু নেই, বরং সেটা ভয়ঙ্কর কদর্য। দরজার কাছটাতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। শালী বলল, "যাও, ওর কাছে একটু যাও।"

'ভাবলাম, "ও হয়ত ক্ষমা ভিক্ষা করতে চাইছে। কি, ক্ষমা করব?" একটু বদান্যতা দেখালাম, "মারা যাচ্ছে, এ অবস্থায় মাফ করা উচিত।" এগিয়ে গেলাম। বহু কষ্টে ও আমার দিকে চোখ তুলে থেমে থেমে বলল, "তাহলে আমাকে শেষ পর্যন্ত মারলে। তোমার সাধ মিটল?" তারপর তার শারীরিক যন্ত্রণা, মৃত্যুর অনুভূতি সব কিছুকে ঠেলে পিছে সরিয়ে দিয়ে সেই পাশবিক ঘৃণার ভাবটা জেগে উঠল মুখে। বলল, "কিন্তু ছেলেমেয়েদের···তোমাকে দেব না, ওদেরকে নিয়ে যাবে ও···" (ওর বোন)

'আমার বিবেচনায় আসল কথা যেট', অর্থাৎ ওর পাপ, ওর প্রবঞ্চনা—তার কথা ও উল্লেখ করা প্রয়োজনই বোধ করল না।

'দরজার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই খুশি হও ; একবার দেখ কী করেছ!" দোরগোড়ায় ছেলেমেয়েদের সাথে ওর বোন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালাম, তারপর তাকালাম ওর দিকে : ওর ফুলো মুখটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম আমি আমার গর্বের কথা ভুলে গিয়ে ওকে মানুষ হিসেবে দেখলাম। আর যেসব ব্যাপারে আমার মর্যাদাহানি হয়েছে বলে ভেবেছি, আমার সেই ঈর্ষা—সবকিছুই আমার কাছে অতি তুচ্ছ বলে বোধ হল। ইচ্ছে হল, ওর সামনে নতজানু হয়ে মাফ চাই, কিন্তু সাহসে কুললো না।

'ও চুপ করল, চোখ বুজল, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল প্রায়। ওর ক্ষত-বিক্ষত মুখটা থরথর করে কেঁপে উঠল, কুঁচকে গেল। দুর্বল হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে দিল। বলল, "কেন এটা হল ? কেন ?"

'আমি বললাম, "আমায় মাফ করে দাও।"

'নিজের চোখটাকে আমার চোখের ওপর রেখে ও চিৎকার করে উঠল, "মাফ করব ? যদি মরতে না হত! তোমার সাধ তো এখন মিটেছে! তুমি আমার দু চোখ বিষ! উঃ!" বিকারের ঘোরে ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে, "মারো, সবাইকে খুন করে ফেল। আর আমি ভয় পাইনা। না, তোমাকেও না। ওই যে, ও পালাচ্ছে পালিয়ে গেল…!"

'বিকার আর কাটল না, আমাদের কাউকেই আর চিনতে পারল না। সেদিন দুপুরেই মারা গেল। তার আগে পুলিশ এসে আমায় নিয়ে গেল থানায়—সেখান থেকে জেলে। সেখানে বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন নিজেকে নিয়ে অনেক ভাবলাম, ভাবলাম নিজের অতীতের কথা,—আর বুঝলাম, সেটা কি। তৃতীয় দিন থেকেই সেটা বোঝা শুরু হল। তৃতীয় দিনেই ওরা এসে আমাকে নিয়ে গেল—'

ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু চাপা কান্নাটাকে ধরে রাখতে না পারার জন্য থামতে বাধ্য হলেন। শেষে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওকে কফিনে দেখার সময় থেকে আমার বোঝার পালা শুরু হব।' হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত বলে চললেন, 'ওর মৃত মুখটা দেখার সাথে সাথেই বুঝলাম যে কী সর্বনাশ করেছি। বুঝলাম, আমিই ওকে মেরেছি। এককালে ও ছিল জীবন্ত, উচ্ছল, আর আজ আমার জন্যই ও নিস্তব্ধ, ঠাণ্ডা, মোমের মত নিথর। যা করেছি তার আর কোনদিন প্রতিকার হবে না। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে না গেলে ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়। উঃ'। ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার আর্তনাদ করে শেষে চুপ করলেন।

অনেকক্ষণ দুজনেই কোন কথা বললাম না। ভদ্রলোক ফোঁপাচ্ছেন, চাপা কান্নায় তার সারাটা শরীর কাঁপছে। বললেন, 'মাফ করবেন।'

গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। সকাল আটটায় আমার গন্তব্য স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। ওর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। ঘুমোচ্ছেন, না মটকা মেরে শুয়ে আছেন সেটা বুঝতে পারলাম না, কারণ উনি

একেবারেই নড়াচড়া করছেন না। ওর হাত ছুঁলাম। সঙ্গে সঙ্গে উনি কম্বলটা সরিয়ে নিলেন, দেখলাম জেগে আছেন।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এবার তাহলে আসি।'

উনি মৃদু হেসে আমার দিকে হাতটা বাড়ালেন। হাসিটা এত করুণ যে আমার কান্না পেয়ে গেল।

যে কথা বলে এই কাহিনীর শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই কথাতেই উপসংহার টানলেন, 'মাফ করবেন।'

॥ সমাপ্ত ॥